

মিঞা মুজিবুর রহমান একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, লেখক ও গবেষক। তিনি নিয়মিত সমসাময়িক ইস্যুতে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় কলাম লিখছেন। তিনি বাংলাদেশ মিডিয়া এন্ড ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং ইনিস্টিটিউট এর চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, বাংলাদেশ ইন্ডিয়া সিটিজেন সোসাইটির সহ-সভাপতি ও ইন্টাররিলিজিয়ন হারমনি সোসাইটির (আইআরএইচএস) চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ইতোপূর্বে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের কমিশনার ও ভারপ্রাপ্ত মেয়র হিসেবে সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন।



Pathak Shamabesh
Since
1987
Jatir Jonoker Nutrit
*5147801*
Tk. 700.00

জাতির জনকের নেতৃত্বে

# মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা

মিঞা মুজিবুর রহমান



# জাতির জনকের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা

মিঞা মুজিবুর রহমান

*[বিশ্ববিদ্যালয় ও সমমানের শিক্ষার্থী ও সন্ধিৎসু গবেষকদের সহায়ক গ্রন্থরূপে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে লিখিত।]*

গ্লোবাল পাবলিশার্স

জাতির জনকের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা
মিঞা মুজিবুর রহমান

স্বত্ব : লেখক

দ্বিতীয় প্রকাশ
একুশে বই মেলা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

প্রকাশক
গ্লোবাল পাবলিশার্স
৩৭৩ দিলু রোড (৩য় তলা), মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ০১৭৭২-৬৮২৮১৬

পরিবেশক
শিল্পতরু প্রকাশনী
২৭/১০, (দ্বিতীয় তলা), তাজমহল রোড, ব্লক-সি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
প্রচ্ছদ : তুষার রায়

অক্ষরায়ন
ডি.জি টেক
১৬/৯ ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, হাতির পুল, ঢাকা-১২০৫
মোবা : ০১৯৬৬৮৯৪০৩৮

মুদ্রণ
আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং
২৭ বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ০১৯৭১ ১১৮২৪৩

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৫০০ (ছবি সম্বলিত)

মূল্য : সাতশত টাকা

Jatir Jonoker Natrittyae Muktijuddho O Swadhinata by Mian Muzibur Rahman, Published by Global Publishers 2nd Edition 30 August 2016, Price: Tk. 700 Hundred Only.

ISBN : 978-984-34-2064-0

## উৎসর্গ

জাতির জনকের দৌহিত্র ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা
ও
সুযোগ্য পুত্র যিনি তথ্যপ্রযুক্তির বিস্ময়কর উন্নয়নের মাধ্যমে
বাঙালি জাতির নতুন প্রজন্মকে
আলোর পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন–
বাঙালির সেই কৃতি সন্তান
**সজিব ওয়াজেদ জয়কে**

## বঙ্গবন্ধুর প্রতি একনিষ্ঠ ভালোবাসা বইটির পঠন সহজসাধ্য করেছে

মিঞা মুজিবুর রহমান প্রণীত *জাতির জনকের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা* নামক বিপুলতায়ন গ্রন্থটি বহু শ্রম সাধ্য রচনা। এই গ্রন্থে নানা উৎস থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে বাংলাদেশের সামগ্রিক পটভূমিতে বঙ্গবন্ধুকে উপস্থাপন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবন সবিস্তৃত রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকা সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে এই গ্রন্থে। তিনি অবশ্য সর্বত্র তার বক্তব্যের উৎস নির্দেশ করেন নি– তবে তাঁর গভীর ভাবাবেগ এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতি একনিষ্ঠ ভালোবাসা বইটির পঠন সহজসাধ্য করেছে। আমি গ্রন্থকারকে গ্রন্থ প্রকাশকালে অভিনন্দন জানাই এবং গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

**ড. আনিসুজ্জামান**
অ্যামেরিটাস অধ্যাপক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১০.০১.২০১৭



## গ্রন্থকারের স্বকীয়তাই গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য

মুক্তিযুদ্ধ আমাদের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীরত্বগাঁথা। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-আঞ্চলিকতা নির্বিশেষে সহজ স্বাভাবিক জীবনের ভেতর থেকে জেগে উঠেছিল নির্ভীক, উদার বলিষ্ঠ চেতনার অধিকারী মহীয়ান এক জাতি। শৌর্য-বীর্য আর আত্মত্যাগে তুলনাহীন। বিশ্বের সর্বকালের বর্বরতম সেনাবাহিনী– চেঙ্গিস, হালাকু গলদের উত্তরসূরি পাকবাহিনী ১৯৭১ এ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নিরস্ত্র নিরীহ বাঙালি সর্বসাধারণের উপর। তাদের হাতে ছিল সর্বাধুনিক মারণাস্ত্র যা কখনোই বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে এক জাতি অন্য কোনো জাতির উপর এত দীর্ঘকাল ব্যবহার করেনি। মানব সভ্যতা হয়ত আর কোনোদিক ব্যবহার করতে দেবে না।

দানবীয় এ শক্তিকে মোকাবেলা করতে বাঙালি কোন দ্বিধা করেনি। চিরকাল এ জাতি তার প্রয়োজনে শক্ত হাতে মোকাবিলা করেছে বহিঃশত্রুদের। কিন্তু ১৯৭১ এর যুদ্ধে সবচেয়ে দুঃখের বিষয় ছিল পাকিস্তানিদের এ নির্মম নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের সময় তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আর তার মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক এক দানবীয় চক্র, ধর্মের নামে কিছু দেশি-দোসর। মাত্র ন'মাসের মধ্যে ত্রিশ লক্ষ লোকের মৃত্যু, সমপরিমাণ লোক আহত অথবা পঙ্গু হওয়া, পাঁচ লক্ষাধিক মা-বোনের সম্ভ্রম হানি করা, কোনো কিছুই এ নিষ্ঠুরদের হৃদয়ে মানবতাকে জাগাতে পারেনি। তারপরও আমাদের এ বাংলায় জীবন জেগে উঠেছিল মহাসমুদ্রের গর্জনের মতো– পশুশক্তিকে পরাভূত করে নতুন মানবিক জীবনে উজ্জীবিত হয়েছিল। এ যুদ্ধ আমরা চাইনি, তবুও চাপিয়ে দিয়েছিল এক বর্বরশক্তি– মেধা ও মননের চাইতে পশুত্ব যাদের কাছে প্রিয়।

স্বাধীন জাতি হিসাবে বেঁচে থাকার স্বপ্ন শুরু থেকেই দেশে এবং বিদেশে মুক্তিযুদ্ধের উপর লেখা হয়েছে প্রচুর বই। দেশি লেখকদের পাশাপাশি যথেষ্ট বিদেশী লেখকও রয়েছেন– যাদের লেখনী আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্য-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। অনেক অজানা তথ্য উদ্ঘাটনে সহায়ক হয়েছে। মিঞা মুজিবুর রহমান প্রণীত গ্রন্থ 'জাতির জনকের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা' এই ধারাবাহিকতারই সম্প্রসারণ। প্রত্যাশা করা যায় আলোচ্য গ্রন্থটিও সন্ধিৎসু গবেষকদের সহায়ক গ্রন্থরূপে সমাদৃত হবে। যেহেতু গ্রন্থকার নিজে মুক্তিযোদ্ধা তাই সঙ্গত কারণেই বলা যায়, বর্তমান গ্রন্থটির তথ্য-উপাত্ত প্রামাণিকভাবেই উপস্থাপিত হয়েছে। গ্রন্থের সামগ্রিক আলোচনা-দৃষ্টিভঙ্গি, মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজন ও মূল্যায়ন সবই গ্রন্থকারের নিজস্ব। আশা করি গ্রন্থকারের এই স্বকীয়তাই গ্রন্থটি বিশিষ্টতার স্বীকৃতি প্রদান করবে।

অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

# কৌশলী রাজনীতির আনুপূর্বিক বর্ণনায় সমৃদ্ধ একটি গ্রন্থ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন সাধারণ মানুষের লোক। ছিলেন জনতার নেতা। রাজনীতির তাত্ত্বিক পণ্ডিত ছিলেন না তিনি। তিনি বিশেষ জ্ঞানী কিংবা বিশেষজ্ঞও হয়ত ছিলেন না। কিন্তু তিনি ছিলেন অসাধারণ স্মৃতিশক্তির প্রজ্ঞাবান একজন রাজনৈতিক নেতা। তিনি মানুষকে বুঝাতেন, বুঝতেন জনমনস্তত্ত্ব। মানুষের কাছ থেকে তিনি গ্রহণ করতে পারতেন। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের রসদ তিনি সংগ্রহ করতেন মানুষের কাছ থেকে। একজন বিরাট মাপের মানবতাবাদী হিসেবে শেখ মুজিব বিংশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনায়ক– এ কথা যেন আমরা ভুলে না যাই। একটি অসহযোগ আন্দোলন তিনি পরিচালনা করেছেন। সামরিক জান্তার উস্কানি, হত্যা, রক্তপাত এবং অবাঙালিদের দিয়ে বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি সত্ত্বেও তিনি শান্তিপূর্ণ আন্দোলন থেকে সরে আসেননি। তিনি দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বেই সামরিক বাহিনীর সশস্ত্র অবস্থানের মধ্যে বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনা করেছেন দক্ষতার সাথে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মাত্র তিন মাসের মধ্যে বাংলাদেশের ভূখণ্ড থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করা হয়েছিল বঙ্গবন্ধুরই ঐকান্তিক আগ্রহে। এ থেকেও তাঁর ব্যক্তিত্বের অসাধারণত্ব প্রকাশ পায়। দেশপ্রেমের অনমনীয়তাই অনন্য করেছে তাঁকে। মিঞা মুজিবুর রহমান প্রণীত 'জাতির জনকের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা' গ্রন্থে উল্লিখিত তথ্য-উপাত্ত বিন্যাসের বিশ্লেষণী উৎকর্ষতায় উত্তীর্ণ হয়েছে। গ্রন্থটি ইতিহাস সন্ধিৎসু পাঠকসহ সাধারণ ছাত্রছাত্রীদেরও সহায়ক পাঠে যথার্থ ভূমিকা রাখবে। এই গ্রন্থ অধ্যয়নের মধ্য দিয়েই শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা জন্মাবে যে, এই উপমহাদেশে ধর্ম ও রাজনীতিকে পৃথকভাবে চর্চার পথপ্রদর্শক বঙ্গবন্ধু। যদিও স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে দ্রুত নানা মেরুকরণ হতে থাকে। দেশি-বিদেশি পরাজিত শক্তি শুরু করে নানা চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র। দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক-সামাজিক ক্ষেত্রে দেখা যায় অস্থিরতা। স্তাবকের দল তাঁকে জনগণ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে সচেষ্ট ছিল। চাটুকার বেষ্টিত এসকল লোভী অলিক রাজনীতিবিদদের এক সম্মোহনী শক্তির মাধ্যমেই পরাস্ত করতে পেরেছিলেন তিনি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই কৌশলী রাজনীতির আনুপূর্বিক বর্ণনায় সমৃদ্ধ হয়েছে বর্তমান গ্রন্থটি। আমি এই গ্রন্থের সর্বব্যাপী প্রচার ও প্রসার প্রত্যাশা করছি।

শেখ কবির হোসেন
সভাপতি
বাংলাদেশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি



# লেখকের কথা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে রাজনৈতিক 'জনযুদ্ধ'। মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি দীর্ঘ অথচ ধারাবাহিক আন্দোলনের ফসল। সংগ্রামের ধারাবাহিকতা– স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা এবং চূড়ান্ত লড়াই সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় অসংখ্য ঘটনা, প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যের দিক, গোপন পরিকল্পনা-সিদ্ধান্ত জানা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। স্বাধীনতা যুদ্ধে কত মানুষের অপরিসীম ত্যাগ-অসম সাহসিকতা-বীরত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে তা সবার জ্ঞাত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। যে কাজের সঙ্গে যে যতটুকু সম্পৃক্ত, সে ততটুকুই জানে। সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যারা যুক্ত নয় তাদের সবকিছু জানার কথা নয়।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে তাঁর অনুপস্থিতিতেই বঙ্গবন্ধুর নামে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে। 'প্রকাশ্যে' ও 'অপ্রকাশ্যে' এই দুই ধরনের কর্মকাণ্ডের সমন্বয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বীরত্ব নিঃসন্দেহে জাতির জন্য গৌরবের। ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণে 'আমি যদি হুকুম দেবার না-ও পারি তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে'–এটা কি নির্দেশনা নয়?

বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো-বাংলাদেশ স্বাধীন করো, তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা-মেঘনা-যমুনা, পাঞ্জাব না বাংলা–বাংলা বাংলা, পিণ্ডি না ঢাকা–ঢাকা ঢাকা, জিন্না মিঞার পাকিস্তান–আজিমপুরের গোরস্থান। জাতির অস্তিত্বের নির্যাস 'জয় বাংলা শ্লোগান' নির্ধারণ–'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদান, 'বিএলএফ' গঠন, পতাকা উত্তোলন, ইশতেহার পাঠ, ৭ মার্চের ভাষণ, অস্ত্র সংগ্রহ করে ছাত্র-যুবকের ট্রেনিং, মেয়েদের ট্রেনিং–এসব কি প্রস্তুতি নয়? পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র ভেঙে বাংলাদেশ নামক জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পেছনে আছে বাঙালি জাতির সুদীর্ঘকালের লড়াই-সংগ্রামের এক জাজ্বল্যমান ইতিহাস। জাতির মনন প্রস্তুত–বিশ্ববাসীর সমর্থন আদায় প্রশ্নে বঙ্গবন্ধুর কৌশল ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়েই তো স্বাধীনতা সংগ্রামকে মূল্যায়ন করতে হবে।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণের পেছনেও রয়েছে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৬২ সালের প্রথমার্ধে তৎকালীন ছাত্রনেতা সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক এবং কাজী আরেফ আহমেদের (তিনজনই ছাত্রলীগ সদস্য) সমন্বয়ে তিন সদস্যবিশিষ্ট গোপন সংগঠন 'নিউক্লিয়াস' (স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ) 'বিএলএফ' গঠিত হয়। ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে সিরাজুল আলম খান ও আবদুর রাজ্জাক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে নেতৃবৃন্দ 'নিউক্লিয়াস' ও 'বিএলএফ'-এর গঠন এবং সাংগঠনিক বিস্তৃতি সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুকে অবহিত করেন। এই বৈঠকের কয়েক দিন পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব লন্ডনে যান এবং সেখানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিশেষ দূতের সঙ্গে বাঙালির স্বাধীনতার বিষয়ে আলাপ-

আলোচনা করেন। লন্ডন থেকে দেশে ফিরে তিনি 'নিউক্লিয়াস' নেতৃবৃন্দকে ডেকে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। সে অনুযায়ী 'নিউক্লিয়াস' নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলের দুটি সীমান্ত এলাকা দিয়ে অস্ত্র সংগ্রহের ব্যবস্থা সম্পন্ন করেন। ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসের শেষের দিকে বঙ্গবন্ধু 'বিএলএফ'-এর চার নেতা সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, শেখ ফজলুল হক মণি এবং তোফায়েল আহমেদকে ডেকে চিত্তরঞ্জন সুতার এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। 'বিপ্লবী বাংলা' এবং 'জয় বাংলা' নামে গোপন পত্রিকা প্রকাশ, বুকলেট, লিফলেট, পুস্তিকা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক সাহিত্য সৃষ্টি করে স্বাধীনতার চেতনায় জাতিকে উজ্জীবিত করার কাজটি অত্যন্ত সুকৌশলে 'নিউক্লিয়াস' পালন করে চলছিল।

'৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, '৬৬-র ৬-দফা ও ১১-দফা আন্দোলন এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার আন্দোলনকে এক দফায় রূপান্তর করে স্বাধীনতার বিষয়কে সামনে নিয়ে আসার রূপরেখা প্রণয়নসহ আন্দোলনের মূল দায়িত্ব পালন করে ছাত্র-যুব নেতৃত্ব। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৮-১৯ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিএলএফের চার নেতাসহ তাজউদ্দীন আহমদকে নিয়ে স্বাধীনতা বিষয়ে আলোচনায় বসেন। বৈঠকে বঙ্গবন্ধু তাজউদ্দীন আহমদকে স্বাধীনতার প্রশ্নে বিএলএফের চার নেতা সম্পর্কে বিস্তারিত বিষয়ে অবগত করেন। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান বেতার ভাষণে ৩ মার্চ তারিখে গণপরিষদের অধিবেশন বাতিল করলে ছাত্র-জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে। এ সময় বঙ্গবন্ধু হোটেল পূর্বাণীতে পার্লামেন্টারি দলের বৈঠক করছিলেন। বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলে তিনি (নিউক্লিয়াসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী) আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুকুম দেন। শুরু হয় স্বাধীনতার জন্য প্রত্যক্ষ আন্দোলন।

১৯৭১ সালের মার্চের ৩ তারিখ রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিএলএফের চার নেতার সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে স্বাধীনতা আন্দোলন বিষয়ে আলোচনা হয়। মার্চের ৪ তারিখে বঙ্গবন্ধু বিএলএফের চার নেতা সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মণি, আবদুর রাজ্জাক এবং তোফায়েল আহমেদকে ডেকে ৭ মার্চের ভাষণ নিয়ে গঠিত আওয়ামী লীগের হাইকমান্ড সম্পর্কে অবহিত করেন। বঙ্গবন্ধু জানান, তার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের হাইকমান্ড গঠিত হয়েছে। ৫ ও ৭ মার্চের ভাষণের বিষয় নিয়ে প্রথমে বিএলএফের হাইকমান্ড সিরাজুল আলম খানসহ চার নেতার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর আলোচনা হয়। ৬ মার্চ রাত ১২টায় বিএলএফ 'হাইকমান্ড'-এর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর পুনরায় আলোচনা হয়। সেদিন গভীর রাতে ৭ মার্চের ভাষণ বিষয়ে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়। ৭ মার্চেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা করা হয়। এর ভিত্তিতেই জনগণ বিকল্প রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলে। 'জয় বাংলা' বলেই বঙ্গবন্ধু তার ভাষণ শেষ করেন। পতাকা উত্তোলন, স্বাধীনতার ইশতেহার ঘোষণা, ৭ মার্চের ভাষণের নির্দেশনা দিয়ে কি মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র ভিত্তি রচিত হয়নি? এরপরও ঘোষণার আর কী বাকি থাকে?

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণে 'আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি..., প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো' এভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। ঘোষণা



করেছেন–'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম–এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। জাতি এভাবেই অসহযোগ আন্দোলনকে সশস্ত্র আন্দোলনের দিকে নিয়ে যায়। জাতির এই লৌহকঠিন ঐক্যবদ্ধ প্রস্তুতির কারণেই তখনকার সেনাবাহিনী থেকে বিদ্রোহ করে বাঙালি বীর সন্তানরা এমনকি সুদূর পাকিস্তান থেকেও মৃত্যুকে উপেক্ষা করে সেনাবাহিনীর সদস্যরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সমগ্র জনগণের অন্তরাত্মার প্রস্তুতি অনুভব করেই পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে বিদ্রোহ করার জন্য তারা নৈতিক শক্তি পেয়েছেন।

জাতিভিত্তিক একটি রাষ্ট্রের অভ্যুদয় রাজনৈতিক সংগ্রাম ও জাতির সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব 'নিউক্লিয়াস' ও ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ড গণতান্ত্রিক এবং সশস্ত্র যুদ্ধের বীরত্বব্যঞ্জক ঘটনাবলি ও ত্যাগের ইতিহাসকে গোপন করে রাখাই হবে অপকৌশল। অগ্নিঝরা মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের সময় দিনের প্রতিটি ঘণ্টা অর্থাৎ যতই ২৬ মার্চ ঘনিয়ে আসছিল ততই তখনকার জনগোষ্ঠীর মধ্যকার ছাত্র-যুব সমাজের অদম্য এবং সাহসিক প্রত্যয় সবকিছুকে অতিক্রম করে স্বাধীনতার জন্য শেষ লড়াই সশস্ত্র যুদ্ধ সংঘটিত করার প্রস্তুতি চলছিল, তাও প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। ২৩ মার্চ পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবসের পরিবর্তে 'বিএলএফ' ও 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে'র পক্ষ থেকে প্রতিরোধ দিবস পালিত হয় এবং সারা দেশের ঘরে ঘরে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলিত হয়। ছাত্ররাই ভোরে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির ছাদে, হাইকোর্ট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পতাকা উড়িয়ে দেয়। তারাই দুপুরে জয় বাংলা বাহিনীর পক্ষে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর হাতে স্বাধীন বাংলার পতাকা তুলে দেয়। ২৩ মার্চ গভীর রাতে 'নিউক্লিয়াস' ও 'বিএলএফ'-এর নেতাদের সঙ্গে ৪ ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক হয়। পরদিন ২৪ মার্চ সকালে অনির্ধারিতভাবে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ইয়াহিয়ার বৈঠকের জন্য তৎকালীন গণভবনে বঙ্গবন্ধু রওনা হলেন। তখন গাড়ির এক পাশে কালো পতাকা আর অন্য পাশে স্বাধীন বাংলার পতাকা বেঁধে দেন আ স ম রব। অসহযোগ আন্দোলনের সময় বাঙালির সংগ্রামী চরিত্র আরও বিকশিত হয়েছিল–সুদৃঢ় হয়েছিল–প্রত্যক্ষ তা সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণে উন্মুখ ছিল।

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধুকে প্রধান করে গঠিত সরকারই ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার। ১০ এপ্রিলের ঘোষণা ছিল স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে গঠিত রাজনৈতিক সরকারের নেতৃত্বেই আমরা সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করি। ৭ মার্চের ভাষণের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ভিত্তি রচনা করেন। তাই বঙ্গবন্ধুই হলেন আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক।

পরিশেষে বলতে হয়, কিছু কিছু জ্ঞানপাপীর জানার সীমাবদ্ধতা আর অজ্ঞতা ও সংকীর্ণতা মুক্তিযুদ্ধের মহান উচ্চতম গৌরবকে ম্লান করতে পারে না। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বেই মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদানকে স্বাধীনতার পর শাসনক্ষমতার দ্বন্দ্বে সম্পর্কিত করে মূল্যায়ন করার কোনো সুযোগ নেই।

১০ অক্টোবর ২০১৫

মিঞা মুজিবুর রহমান

# দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধ আমাদের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীরত্বগাথা। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-আঞ্চলিকতা নির্বিশেষে সহজ স্বাভাবিক জীবনের ভেতর থেকে জেগে উঠেছিল নির্ভীক, উদার বলিষ্ঠ চেতনার অধিকারী মহীয়ান এক জাতি। শৌর্য-বীর্য আর আত্মত্যাগে তুলনাহীন। বিশ্বের সর্বকালের বর্বরতম সেনাবাহিনী– চেঙ্গিস, হালাকু গলদের উত্তরসূরি পাকবাহিনী ১৯৭১ এ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নিরস্ত্র নিরীহ বাঙালি সর্বসাধারণের উপর। তাদের হাতে ছিল সর্বাধনিক মারণাস্ত্র যা কখনই বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে এক জাতি অন্য কোনো জাতির উপর এত দীর্ঘকাল ব্যবহার করেনি। মানব সভ্যতা হয়ত আর কোনোদিক ব্যবহার করতে দেবে না।

দানবীয় এ শক্তিকে মোকাবেলা করতে বাঙালি মুহূর্তের দ্বিধা করেনি। চিরকাল এ জাতি তার প্রয়োজনে শক্ত হাতে মোকাবিলা করেছে বহিঃশত্রুদের। কিন্তু ১৯৭১ এর যুদ্ধে সবচেয়ে দুঃখের বিষয় ছিল পাকিস্তানিদের এ নির্মম নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের সময় তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল বর্বর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আর তার মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক এক দানবিক চক্র। ধর্মের নামে কিছু দেশি-দোসর। মাত্র ন'মাসের মধ্যে ত্রিশ লক্ষ লোকের মৃত্যু, সমপরিমাণ লোক আহত অথবা পঙ্গু হওয়া, কোনো কিছুই এ নিষ্ঠুরদের হৃদয়ে মানবতাকে জাগাতে পারেনি। তারপরও আমাদের এ বাংলায় জীবন জেগে উঠেছিল মহাসমুদ্রের গর্জনের মতো– পশুশক্তিকে পরাভূত করে নতুন মানবিক জীবনে উজ্জিবিত হয়েছিল। এ যুদ্ধ আমরা চাইনি, তবুও চাপিয়ে দিয়েছিল এক বর্বরশক্তি– মেধা ও মননের চাইতে পশুত্ব যাদের কাছে প্রিয়।

স্বাধীন জাতি হিসাবে বেঁচে থাকার স্বপ্ন শুরু থেকেই দেশে এবং বিদেশে মুক্তিযুদ্ধের উপর লেখা হয়েছে প্রচুর বই। দেশি লেখকদের পাশাপাশি যথেষ্ট বিদেশি লেখকও রয়েছেন– যাদের লেখনী আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্য-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। অনেক অজানা তথ্য উদ্ঘাটনে সহায়ক হয়েছে। মৎ প্রণীত গ্রন্থ 'জাতির জনকের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা' এই ধারাবাহিকতারই সম্প্রসারণ। বর্তমান সংস্করণটি বিশ্ববিদ্যালয় ও সমমানের শিক্ষার্থী এবং সন্ধিৎসু গবেষকদের সহায়ক গ্রন্থরূপে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে নতুনভাবে বিন্যস্ত ও উপস্থাপিত হয়েছে। আশা করি বর্তমান সংস্করণটি উল্লিখিত উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক হবে।

৩০ আগস্ট ২০১৬

মিঞা মুজিবুর রহমান



# সূচিপত্র

*বিশেষজ্ঞ অভিমত*
বঙ্গবন্ধুর প্রতি একনিষ্ঠ ভালোবাসা বইটির পঠন সহজসাধ্য করেছে/
অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ৪
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভিরশ্মি/অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ৫
বস্তুনিষ্ঠতায় সমৃদ্ধ এক অবিস্মরণীয় জীবনেতিহাস/শেখ কবির হোসেন ৬

লেখকের কথা ৭
দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা ১০

*প্রথম অধ্যায়*
বাঙালির মহানায়ক ১৩
পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন ৩৯
স্বাধীনতার ঘোষণা ৪৮

*দ্বিতীয় অধ্যায়*
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সেক্টরসমূহের তালিকা ৫১
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র ৭১

*তৃতীয় অধ্যায়*
বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ ৮৬
বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেম ১২৮

*চতুর্থ অধ্যায়*
একাত্তর-পূর্ব বঙ্গবন্ধুর সমরচিন্তা ২০৫
মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশ ২৪৫

*পঞ্চম অধ্যায়*
দুর্দশা ও দুর্যোগ ২৭০
প্রাকৃতিক দুর্যোগ ২৮০
১৯৭০-এর নির্বাচন ২৮৭
সহিংসতা ও সঙ্কট ২৯৬
নিধনযজ্ঞ ও গণহত্যা ৩০৩
উত্তাল মার্চ ৩১২
গণহত্যা ৩৬৩
গোপন চক্রান্ত ৩৬৭

*ষষ্ঠ অধ্যায়*
জয়বাংলা ও বাংলাদেশ ৩৭৭
স্বাধীন বাংলা, স্বাধীন সরকার ৩৮২
স্বাধীন বাংলা, স্বাধীন কার্যক্রম ৩৮৫
স্বাধীন বাংলা, স্বাধীন সেনানী ৩৯৩

*সপ্তম অধ্যায়*
শরণার্থী ও দেশত্যাগ ৩৯৭
বাঙালির দেশত্যাগ ৪০৬
বাঙালি শূন্যের অভিযান ৪১০

*অষ্টম অধ্যায়*
বাঙালি পিতা ৪১৯
জিন্দাবাজ ও পাকিস্তান ৪২২
অগ্নিঝরা উত্তাল মার্চের দিনগুলো ৪২৮

*নবম অধ্যায়*
বঙ্গবন্ধুর শাসনের সাড়ে তিন বছর ৪৬৪
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৪৮৪

*দশম অধ্যায়*
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অসামান্য অবদান ৪৯৩
একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বিদেশিদের অবদান ৪৯৫

*সহায়ক গ্রন্থ* ৪৯৯



# প্রথম অধ্যায়

## বাঙালির মহানায়ক

বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবজনক অধ্যায় একাত্তরের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধ। যার উদ্যোক্তা ছিলেন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হামলার মুখে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা এবং নির্বাচিত প্রতিনিধি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা। আমাদের স্বাধীনতা তো শেখ মুজিবের অমর কাব্য–'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম।' পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) তথা সমগ্র পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ অর্থাৎ বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব ছয় দফা দাবির মাধ্যমে বাঙালিকে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বপ্নে উজ্জীবিত করেন। ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে এ দেশের মানুষ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ছয় দফার প্রতি জানায় অকুণ্ঠ সমর্থন। শুরু হয় জনরায়ের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্রের ষড়যন্ত্র। আসে '৭১-এর আগুনঝরা মার্চ। বাঙালির হাতে পাকিস্তানের ক্ষমতা হস্তান্তর না করার দুরভিসন্ধির প্রতিবাদে জেগে ওঠে বাংলাদেশ। দলমত নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে শুরু করে অসহযোগ আন্দোলন। সে আন্দোলন রূপ নেয় স্বাধীনতা সংগ্রামে। জাতির মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে নিজ কণ্ঠে ধারণ করে ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু মুজিব রেসকোর্স ময়দানের (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে ডাক দেন স্বাধীনতার। শোনান মুক্তির মহাকাব্য–'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। তার ৭ মার্চের ভাষণ ছিল স্বাধীনতার সমার্থক। সেই ডাকে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন রূপ নেয় স্বাধীনতা সংগ্রামে। চলে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি। ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী অতর্কিত ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘুমন্ত মানুষের ওপর।

বাঙালি জাতিসত্তাকে নিশ্চিহ্ন করতে পরিকল্পিত সামরিক অভিযানের মাধ্যমে শুরু করে ভয়াবহ গণহত্যা, যার নাম অপারেশন সার্চলাইট। হানাদার বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাসভবন থেকে ঘোষণা করেন : আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। তৎকালীন ইপিআরের (বিডিজি) ওয়্যারলেসের মাধ্যমে সারা দেশে পাঠানো স্বাধীনতার বার্তায় বন্ধবন্ধু বলেন, 'পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিতে পিলখানার ইপিআর ঘাঁটি ও রাজারবাগ পুলিশ লাইনস আক্রমণ করেছে এবং শহরের লোকদের হত্যা করছে। ঢাকা, চট্টগ্রামের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলছে।

আমি বিশ্বের জাতিগুলোর কাছে সাহায্যের আবেদন করছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমি মুক্ত করার জন্য শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ, দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনসারদের সাহায্য চান। কোনো আপস নেই, জয় আমাদের হবেই। আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রুকে বিতাড়িত করুন। সব আওয়ামী লীগ নেতা, কর্মী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতাপ্রিয় লোকদের এ সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা।' শুরু হয় সশস্ত্র প্রতিরোধ, মুক্তিযুদ্ধ। দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র যুদ্ধ শেষে ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে দখলদার পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী। বিশ্ব মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ ঘটে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবজনক অধ্যায় একাত্তরের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধ। যার উদ্যোক্তা ছিলেন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

যে কোনো কিছু বর্ণনা করতে হলে সেটি একটু আগে থেকে বলতে হয়, তাই বাংলাদেশের ইতিহাস জানার জন্যেও একটু আগে গিয়ে ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করা যেতে পারে। ব্রিটিশরা এই অঞ্চলটিকে প্রায় দুশো বছর শাসন-শোষণ করেছে। তাদের হাত থেকে স্বাধীনতার জন্যে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ দিয়েছে, জেল খেটেছে, দ্বীপান্তরে গিয়েছে।



বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে প্রাক-পূর্ব পূর্বপাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের সভা

**বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন**

বঙ্গভঙ্গ বাংলার ইতিহাসে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবরে তৎকালীন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের বড়লাট লর্ড কার্জনের আদেশে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করা হয়। বাংলা বিভক্ত করে ফেলার ধারণাটি অবশ্য কার্জন থেকে শুরু হয়নি। ১৭৬৫





সালের পর থেকেই বিহার ও উড়িষ্যা বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফলে সরকারি প্রশাসনিক এলাকা হিসেবে বাংলা অতিরিক্ত বড় হয়ে যায় এবং ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে এটির সুষ্ঠু শাসনক্রিয়া দুরূহ হয়ে পড়ে। বঙ্গভঙ্গের সূত্রপাত এখান থেকেই। কিন্তু ১৯১১ সালে, প্রচণ্ড গণআন্দোলনের ফলশ্রুতিতে বঙ্গভঙ্গ রহিত হয়। দ্বিতীয়বার বঙ্গভঙ্গ হয় ১৯৪৭ সালে। এর ফলে পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানে এবং পশ্চিমবঙ্গ ভারতে যুক্ত হয়। এই পূর্ববঙ্গই পরবর্তীকালে পাকিস্তানের কাছ থেকে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভ করে।

**বাংলা ও আসাম**

বঙ্গ প্রদেশের আয়তন ছিল ১,৮৯,০০০ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ছিল ৭৮.৫ মিলিয়ন। বঙ্গের পূর্বাঞ্চল ভৌগোলিক এবং অপ্রতুল যাতায়াত ব্যবস্থার কারণে পশ্চিমাঞ্চল হতে প্রায় বিচ্ছিন্ন ছিল। ১৮৩৬ সালে উত্তরাঞ্চলের প্রদেশগুলোকে বঙ্গ থেকে পৃথক করে একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের অধীনে ন্যস্ত করা হয় এবং ১৮৫৪ সালে বঙ্গের প্রশাসনিক দায়িত্ব হতে গর্ভনর-জেনারেল-ইন-কাউন্সিলকে অব্যাহতি দিয়ে একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের ওপর অর্পণ করা হয়। ১৮৭৪ সালে সিলেটসহ আসামকে বঙ্গ হতে বিচ্ছিন্ন করে চিফ-কমিশনারশিপ গঠন করা হয় এবং ১৮৯৮ সালে লুসাই পাহাড়কে এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ১৯০৩ সালে প্রথম বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করা হয়। তখন বঙ্গ হতে চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করা এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাদ্বয়কে আসাম প্রদেশে অন্তর্ভুক্ত করার একটি প্রস্তাবও ছিল। তেমনিভাবে ছোট নাগপুরকে মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে আত্তীকরণেরও একটি প্রস্তাব ছিল। ১৯০৪ সালের জানুয়ারিতে সরকারিভাবে এই পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয় এবং ফেব্রুয়ারিতে লর্ড কার্জন বঙ্গের পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে এক সরকারি সফরের মাধ্যমে এই বিভক্তির ব্যাপারে জনমত যাচাইয়ের চেষ্টা করেন। তিনি বিভিন্ন জেলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহে এই বিভক্তির বিষয়ে সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা দেন।

পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্য, চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজশাহী (দার্জিলিং বাদে) বিভাগ এবং মালদা জেলা, আসাম প্রদেশের সঙ্গে একীভূত হয়ে এই নতুন প্রদেশ গঠন করবে। এর ফলে বঙ্গ শুধু তার বৃহৎ পূর্বাঞ্চলই হারাবে না, তাকে হিন্দীভাষী পাঁচটি রাজ্যও মধ্যপ্রদেশকে ছেড়ে দিতে হবে। অন্যদিকে পশ্চিমে সম্বলপুর এবং মধ্যপ্রদেশের পাঁচটি ওড়িয়া-ভাষী রাজ্যের সামান্য অংশ বঙ্গকে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। ফলে বঙ্গের আয়তন দাঁড়ায় ১,৪১,৫৮০ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ৫৪ মিলিয়ন যার মধ্যে ৪২ মিলিয়ন হিন্দু ও ৯ মিলিয়ন মুসলিম।

নতুন প্রদেশটির নামকরণ করা হয় 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' যার রাজধানী হবে ঢাকা এবং অনুষঙ্গী সদর দপ্তর হবে চট্টগ্রাম। এর আয়তন হবে ১,০৬,৫৪০ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা হবে ৩১ মিলিয়ন, যাদের মধ্যে ১৮ মিলিয়ন মুসলিম ও ১২ মিলিয়ন হিন্দু। এর প্রশাসন একটি আইন পরিষদ ও দুই সদস্যবিশিষ্ট একটি রাজস্ব বোর্ড নিয়ে গঠিত হবে এবং কলকাতা হাইকোর্টের এখতিয়ার বজায় থাকবে। সরকার নির্দেশ দেয় যে, পূর্ববঙ্গ ও আসামের পশ্চিম সীমানা স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট থাকবে সাথে সাথে এর ভৌগোলিক, জাতিক, ভাষিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যাবলিও নির্দিষ্ট থাকবে।

১৯০৪ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি লর্ড কার্জন পূর্ববঙ্গ থেকে অস্থায়ী ভারত সচিবকে লেখা এক পত্রে উল্লেখ করেছেন– 'বাঙালিরা নিজেদের এক মহাজাতি মনে করে এবং এক বাঙালি বাবুকে লাট সাহেবের গদিতে বসাতে চায়, বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব তাদের এই স্বপ্নের সফল রূপায়ণে বাধা দেবে। আমরা যদি তাদের আপত্তির কাছে নতিস্বীকার করি তবে ভবিষ্যতে কোনোদিনই বাংলা ভাগ করতে পারব না এবং আপনারা ভারতের পূর্ব পার্শ্বে এমন এক শক্তিকে জোরদার করবেন, যা এখনই প্রবল এবং ভবিষ্যতে বর্ধমান বিপদের উৎস হয়ে দাঁড়াবে।'

কার্জন ইতিপূর্বে গৃহীত প্রস্তাবের সঙ্গে দার্জিলিং বাদে মালদাহসহ পুরো রাজশাহী বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের বাকি জেলাগুলো আসামের সঙ্গে জুড়ে দেয়ার প্রস্তাব করেন। এ প্রসঙ্গে ব্রিটিশ আমলা রিজলি মন্তব্য করেছেন, 'সংযুক্ত বাংলা শক্তিশালী, বিভক্ত বাংলা বিভিন্ন দিকে আকৃষ্ট হবে। কংগ্রেস নেতারা এ ভয় করছেন। তাঁদের আশঙ্কা নির্ভুল এবং সেটাই এই প্রস্তাবের সবচেয়ে বড় গুণ। আমাদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ব্রিটিশ রাজত্বের বিরোধী একটি সুসংহত দলকে টুকরো করে দুর্বল করে দেওয়া।' ঢাকায় লর্ড কার্জন এক ভাষণে ঘোষণা করেন–মুসলিমদের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য আলাদা প্রদেশ রচনাই তার লক্ষ্য। ছোটলাট এন্ড্রু ফ্রেজার ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ জেলায় ইতোমধ্যে তৎপর চরমপন্থিদের নতুন প্রদেশে দমন সহজ হবে বলে মন্তব্য করেন। লর্ড কার্জন মূল প্রস্তাবটি লন্ডন পাঠান ১৯০৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে। ব্রিটিশ সরকারের ভারত বিষয়ক মন্ত্রী সেন্ট জন ব্রড্রিখ জুনে এই প্রস্তাব সঞ্চালন করেন। সরকার তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে ১৯ জুলাই, ১৯০৫ সালে এবং বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয় একই বছরের ১৬ই অক্টোবর।

## প্রাচীন বাংলা

উয়ারি-বটেশ্বর অঞ্চলে ২০০৬ সালে প্রাপ্ত পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন অনুযায়ী বাংলাদেশ অঞ্চলে জনবসতি গড়ে উঠেছিল প্রায় ৪ হাজার বছর আগে। ধারণা করা হয়, দ্রাবিড় ও তিব্বতীয়-বর্মী জনগোষ্ঠী এখানে সেসময় বসতি স্থাপন করেছিল। পরবর্তীকালে এই অঞ্চলটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয় এবং স্থানীয় ও বিদেশি শাসকদের দ্বারা শাসিত হতে থাকে। আর্য জাতির আগমনের পর খ্রিস্টীয় চতুর্থ হতে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত গুপ্ত রাজবংশ বাংলা শাসন করেছিল। এর ঠিক পরেই শশাঙ্ক নামের একজন স্থানীয় রাজা স্বল্প সময়ের জন্য এ এলাকার ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হন। প্রায় একশ বছরের অরাজকতার (যাকে মাৎসন্যায় পর্ব বলে অভিহিত করা হয়) শেষে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজবংশ বাংলার অধিকাংশের অধিকারী হয় এবং পরবর্তী চারশ বছর ধরে শাসন করে। এরপর হিন্দু ধর্মাবলম্বী সেন রাজবংশ ক্ষমতায় আসে। দ্বাদশ শতকে সুফি ধর্মপ্রচারকদের হাতে বাংলায় ইসলামের প্রবর্তন ঘটে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে সামরিক অভিযান এবং যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে মুসলিম শাসকেরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ১২০৫-০৬ সালের দিকে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজী নামের একজন তুর্কি বংশোদ্ভূত সেনাপতি রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে সেন রাজবংশের পতন ঘটান। ষোড়শ শতকে মোঘল সাম্রাজ্যের অধীনে আসার আগে পর্যন্ত বাংলা স্থানীয় সুলতান ও ভূস্বামীদের হাতে শাসিত হয়। মোঘল





বিজয়ের পর ঢাকায় বাংলার রাজধানী স্থাপিত হয় এবং এর নামকরণ করা হয় জাহাঙ্গীরনগর।

## ঔপনিবেশিক শাসন

বাংলায় ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের আগমন ঘটে পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ থেকে। ধীরে ধীরে তাদের প্রভাব বাড়তে থাকে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের মাধ্যমে বাংলার শাসনক্ষমতা দখল করে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহি বিপ্লবের পর কোম্পানির হাত থেকে বাংলার শাসনভার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আসে। ব্রিটিশ রাজার নিয়ন্ত্রণাধীন একজন ভাইসরয় প্রশাসন পরিচালনা করতেন। ঔপনিবেশিক শাসনামলে ভারতীয় উপমহাদেশে বহুবার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এর মধ্যে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষে আনুমানিক ৩০ লাখ লোক মারা যায়।

১৯০৫ হতে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গের ফলশ্রুতিতে পূর্ববঙ্গ ও আসামকে নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ গঠিত হয়েছিল, যার রাজধানী ছিল ঢাকায়। তবে কলকাতাকেন্দ্রিক রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের চরম বিরোধিতার ফলে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যায় ১৯১১ সালে। ভারতীয় উপমহাদেশের দেশভাগের সময় ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে আবার বাংলা প্রদেশটিকে ভাগ করা হয়। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অংশ হয়, আর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অংশ হয়। ১৯৫৪ সালে পূর্ববঙ্গের নাম পাল্টে পূর্ব পাকিস্তান করা হয়।

## পাকিস্তান আমল (১৯৪৭-১৯৭১)

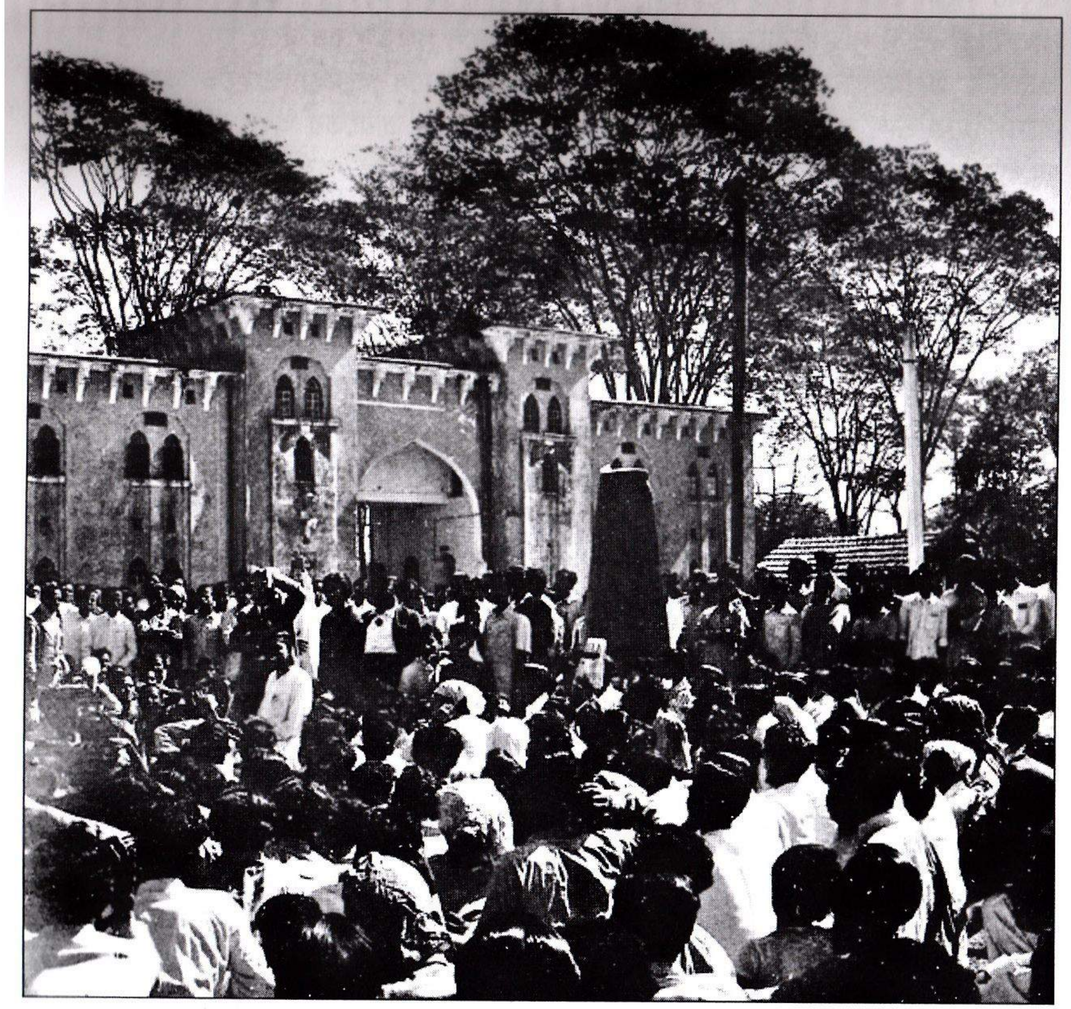
১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত করে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয় যথা ভারত ও পাকিস্তান। মুসলিম আধিক্যের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সীমানা চিহ্নিত করা হয়। যার ফলে পাকিস্তানের মানচিত্রে দুটি পৃথক অঞ্চল অনিবার্য হয়ে ওঠে, এর একটি পূর্ব পাকিস্তান এবং অপরটি পশ্চিম পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তান গঠিত হয়েছিল প্রধানত পূর্ব বাংলা নিয়ে যা বর্তমানের বাংলাদেশ। পূর্ব পাস্তিানের ইতিহাস মূলত পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের হাতে নিগ্রহ ও শোষণের ইতিহাস যার অন্য পিঠে ছিল ১৯৫৮ থেকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সামরিক শাসন।

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ভূমি সংস্কারের অধীনে জমিদার ব্যবস্থা রদ করা হয়। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও জনসংখ্যাগত গুরুত্ব সত্ত্বেও পাকিস্তান সরকার ও সেনাবাহিনী পশ্চিম পাকিস্তানিদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছিল। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলন পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সংঘাতের প্রথম লক্ষণ হিসেবে প্রকাশ পায়। পরবর্তী দশক জুড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে নেওয়া নানা পদক্ষেপে পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ মানুষের মনে বিক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে।

পাকিস্তানি প্রভাব ও স্বৈর দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে প্রথম পদক্ষেপ ছিল মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে এই দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের যুক্তফ্রন্ট নিবার্চনে বিজয় এবং ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে

পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসক জেনারেল আইয়ুব খানকে পরাজিত করার লক্ষ্য নিয়ে সম্মিলিত বিরোধী দল বা 'কপ'-প্রতিষ্ঠা ছিল পাকিস্তানি সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানি রাজনীতিবিদদের নেতৃত্বমূলক আন্দোলনের মাইলফলক। পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকারের প্রশ্ন ১৯৫০-এর মধ্যভাগ থেকে উচ্চারিত হতে থাকে।

১৯৬০ দশকের মাঝামাঝি বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা হিসেবে আওয়ামী লীগের উত্থান ঘটে, এবং ১৯৬৯ নাগাদ দলটি পূর্ব পাকিস্তান তথা বাঙালি জাতির প্রধান রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি ৬ দফা আন্দোলনের সূচনা ঘটে। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে কারাবন্দি করা হয়। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় মাধ্যমে আবার তাঁকে বন্দি করা হয়। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ফলে আইয়ুব খানের সামরিক জান্তার পতন ঘটলেও সামরিক শাসন অব্যাহত থাকে। কারাবন্দিত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে শেখ মুজিব ১৯৭০-এ অনুষ্ঠিত জেনারেল ইয়াহিয়া প্রদত্ত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করেন।



১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন প্রাককালে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ঐতিহাসিক সমাবেশ





## আন্দোলনের সূত্রপাত

বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব কার্যকর হবার আগেই ১৯০৫ সালের ৭ জুলাই তারিখে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর *দি বেঙ্গলী* পত্রিকার সম্পাদকীয়তে আসন্ন ঘটনাকে বলেছিলেন 'একটি ভয়ঙ্কর জাতীয় দুর্যোগ' এবং সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, সরকার যদি তার সিদ্ধান্ত না পাল্টায়, তাহলে সামনে সর্বোচ্চ মাত্রার একটি জাতীয় প্রতিরোধ অপেক্ষমাণ রয়েছে। বাস্তবেই এই ঘটনা এক প্রচণ্ড রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে। পূর্ব বঙ্গের মুসলিমদের এই ধারণা হয় যে, নতুন প্রদেশের ফলে শিক্ষা, কর্মসংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের সুযোগ বেড়ে যাবে। যদিও পশ্চিমবঙ্গের জনগণ এই বিভক্তি মেনে নিতে পারল না এবং প্রচুর পরিমাণে জাতীয়তাবাদী লেখা এই সময় প্রকাশিত হয়। ১৯০৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গভঙ্গ রদ করার প্রস্তাবকদের জন্য এক মর্মস্পর্শী গান 'আমার সোনার বাংলা' লেখেন, যা অনেক পরে, ১৯৭২ সালে, বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হয়। এই আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে বৃহৎ বঙ্গের অধিবাসী বাঙালি হিন্দু মুসলমানের চেতনার জগতে আলোড়ন সৃষ্টির জন্যই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য দেশাত্মবোধক সঙ্গীত রচনা, সুরারোপ করেন এবং চারণ কবিদের যত মিছিলে মিছিলে সেসব সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর তারিখ থেকে ব্রিটিশ সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী ওই আইন কার্যকর হওয়ার কথা। সুতরাং ওই তারিখে রাজধানী কলকাতায় হরতাল আহ্বান করা হয়। সেদিন কোনো বাড়িতে রান্নাবান্না হবে না। বাঙালি জনসাধারণ অরন্ধন পালন করে উপোষ থাকবে। বাঙালির ঐক্য বজায় রাখার জন্য দেশজুড়ে হবে রাখিবন্ধন উৎসব।

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা এবং তা কার্যকর করার পর বাংলায় সশস্ত্র আন্দোলন বিকাশ লাভ করে। ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশনে 'স্বরাজ' শব্দ গৃহীত হয়। স্বরাজ বলতে কংগ্রেসের নরমপন্থিরা বুঝলো ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন, চরমপন্থিরা বুঝল স্বাধীনতা। এর থেকে উৎপত্তি হলো বিদেশি পণ্য বর্জন প্রসঙ্গ। চরমপন্থিরা চাইল সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীন বয়কট।

ইতিহাসবিদ সুমিত সরকার দেখিয়েছেন, স্বদেশী আন্দোলন তিনটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল সে সময়। প্রথমধারাকে বলা যায় গঠনমূলক স্বদেশী। 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এ ধরনের গঠনমূলক কাজের কথা বিশদ করেছিলেন। তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, আত্মশক্তির উদ্বোধন। দ্বিতীয় ধারা বয়কটকে প্রাধান্য দিয়েছিল। তৃতীয় ধারায় ছিল চরমপন্থিরা। তাদের কাছে স্বদেশী আন্দোলন এবং বয়কট গৌণ হয়ে যায়। মুখ্য হয়ে ওঠে স্বরাজ। এ নিয়ে কংগ্রেসে তুমুল বিতর্কও হয়। এরই মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষে জনমত সংগঠনের জন্য জেলায় জেলায় সমিতি গড়ে ওঠে। গৃহীত নীতি কার্যকর করার জন্য তৈরি করা হয় জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী দল। বরিশালে 'স্বদেশ বান্ধব', ময়মনসিংহে 'সুহৃদ' ও 'সাধনা', ফরিদপুরে 'ব্রতী' আর সবচেয়ে বিখ্যাত ঢাকার 'অনুশীলন' সমিতি। জেলা সমিতির অধীনে অনেক শাখাও স্থাপিত হয়। কলকাতায় গড়ে ওঠে 'যুগান্তর' নামে আরেক সংগঠন। এই দলের নেতা অরবিন্দ ঘোষ। সহোদর বারীন ঘোষ তার সহযোগী। এরা অস্ত্র হিসেবে বোমা ব্যবহার চালু করেন।

## চরমপন্থিদের ভূমিকা

চরমপন্থিদের নেতা ছিলেন বালগঙ্গাধর তিলক এবং মূলত অরবিন্দ ঘোষ। অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন বিলাত ফেরত। আইসিএস পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েও তিনি চাকরিতে যোগ দেননি। অরবিন্দ চরমপন্থি রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর চিন্তায় আপসের কোনো জায়গা ছিল না। ১৯০৭ সালে অরবিন্দ বলেছেন, 'প্রথমে এবং সবার আগে চাই রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে লক্ষ্যবস্তু হিসেবে গ্রহণ করা; তা না করে জাতির সামাজিক সংস্কার, শিক্ষা সংস্কার, শিল্পে প্রসার ও নৈতিক উন্নতির চেষ্টা করাটা চরম অজ্ঞতা ও অর্থহীনতা ভিন্ন অন্যকিছু নয়।' ইতিহাসবিদ অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে, 'প্রকাশ্যে কংগ্রেসের মাধ্যমে এবং গোপনে বিপ্লবীদের মাধ্যমে অরবিন্দ যুগপৎ আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন। তার অনুসারীরা পুরোপুরি সন্ত্রাসবাদে ঝুঁকে পড়ে।' ১৯০৭ সালে সুরাটে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস সম্মেলনে লাঠালাঠি, চেয়ার ভাঙাভাঙি, মাথা ফাটানোর ঘটনা ঘটে। ব্রিটিশ সাংবাদিক নেভিনসন এই ঘটনার নিখুঁত বর্ণনা রেখে গেছেন। অরবিন্দ ঘোষ পরবর্তীকালে লিখেছেন, 'আমি তিলকের (কংগ্রেস নেতা বালগঙ্গাধর তিলক) সঙ্গে পরামর্শ না করেই হুকুম দিয়েছিলাম কংগ্রেস অধিবেশন ভেঙে দিতে।'

উনবিংশ শতকের শেষে ভারতবর্ষে ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনের মূল হাতিয়ার ছিল পিস্তল, রিভলবার। আর এসময় বোমার অনুপ্রবেশ ঘটায় বাঙালিরা। নেতৃত্ব ছিলেন এই অরবিন্দ ঘোষ। বারীন ঘোষ 'যুগান্তর' নামে একটি উপদল গঠন করেন ১৯০৫ সালে অনুশীলন সমিতির কলকাতা শাখা ভেঙে। এই সমিতি বোমা তৈরি শেখার জন্য হেমচন্দ্র কানুনগো নামে একজন বিপ্লবীকে প্যারিসে পাঠায়। উন্নতমানের বিস্ফোরক তৈরি শিখতে হেমচন্দ্র সুইজারল্যান্ড ও প্যারিসে গিয়ে সুবিধা করতে না পেরে চলে যান লন্ডনে। সেখানে সুযোগ না পেয়ে আবার ফিরে যান প্যারিসে। ফরাসি সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে এবং বিস্ফোরক রসায়ন ও বিস্ফোরক ঘটাবার কায়দাকানুন শিখে নেন। রুশ সন্ত্রাসবাদী দলের বিপ্লবী নিকোলাস সাফ্রানস্কির কাছে প্রশিক্ষিত হয়ে হেমচন্দ্র কলকাতায় ফিরে আসেন ১৯০৮ সালের জানুয়ারিতে। হেমচন্দ্র নির্মিত প্রথম বোমাটি কিংসফোর্ডকে ১০৭৫ পৃষ্ঠার বইয়ের ভেতরে করে পাঠানো হয়েছিল, যা বিস্ফোরিত হয়নি। মার্চ মাসে হেমচন্দ্র বোমা তৈরির স্কুল খোলেন পাঁচ ছাত্রকে নিয়ে। তার তৈরি বোমাটিই নিক্ষেপ করেছিলেন ক্ষুদিরাম বসু। ক্ষুদিরামের এই ঘটনার পর পুলিশ বিভিন্ন স্থানে হানা দিয়ে ৩৪ জন বিপ্লবীকে গ্রেফতার এবং বোমা বানানো বিষয়ক বইপত্র ও সরঞ্জাম আটক করে।

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ২ জুন কলকাতার মানিকতলা অঞ্চলে একটি বোমা প্রস্তুতের কারখানা আবিষ্কৃত হয়। এ ব্যাপারে অরবিন্দ ঘোষকে গ্রেফতার করা হয়। অরবিন্দের ভাই বারীন ঘোষ, উল্লাস কর দত্ত, কানাই লালসহ ৪৭ জন চরমপন্থি ধরা পড়েন।

বালগঙ্গাধর তিলক ১৯০৮ সালে ছয় বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। অরবিন্দ ঘোষ ১৯১০ সালের দিকে পণ্ডিচেরিতে চলে যান এবং সেখানে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন।





## বঙ্গভঙ্গ রদ

এই সকল রাজনৈতিক প্রতিবাদের ফলশ্রুতিতে ১৯১১ সালে বঙ্গ আবার একত্রিত হয়। ভাষাতাত্ত্বিক এক নতুন বিভক্তির মাধ্যমে হিন্দি, ওড়িয়া এবং অসমি অঞ্চলগুলো বঙ্গ হতে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা প্রশাসনিক কাঠামোর আওতায় আনা হয়। এরই সাথে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে নয়া দিল্লিতে স্থানান্তর করা হয়।

## ব্রিটিশ প্রতিক্রিয়া

বদরুদ্দীন উমরের ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন থেকে জানা যায়–'বঙ্গভঙ্গবিরোধী যে আন্দোলন ১৯০৫ সালের পরে দ্রুত শক্তি সঞ্চয় করতে শুরু করে সেটা প্রধানত মধ্যশ্রেণির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এজন্য এই শ্রেণির ওপরই সরকারের নির্যাতন সব থেকে বেশি হয়। পূর্ব বঙ্গ ও আসামের লেফটেন্যান্ট গভর্নর ব্যাম্পফিল্ড ফুলার বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনকে ছত্রভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে নির্যাতন শুরু করেন এবং সেই সঙ্গে বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করেন সাম্প্রদায়িকতা। তিনি ঘোষণা করেন যে তাঁর দুই স্ত্রী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মুসলমানই হলো প্রিয়পাত্রী। এই সময় বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনকারীরা বঙ্কিম রচিত 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীতকে জাতীয় সঙ্গীতের পর্যায়ে নিয়ে যান ও তার ব্যাপক প্রচার করেন। ফুলার বরিশালে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্সের অধিবেশনে 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত পরিবেশিত হলে পুলিশ দ্বিতীয় দিনে লাঠিচার্জ করে সমাবেশকে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে। কিন্তু এই পুলিশি নির্যাতন সত্ত্বেও আবদুর রসুলের সভাপতিত্বে বরিশালের এই অধিবেশনে সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা, বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা, ব্রিটিশ পণ্য বর্জন ইত্যাদি সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।"

## ভারত বিভাজন

ভারত বিভাজন হলো ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক বিভাজন। ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট ব্রিটিশ ভারত ভেঙে পাকিস্তান অধিরাজ্য ও ভারত অধিরাজ্য নামে দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করা হয়। পাকিস্তান অধিরাজ্য পরবর্তীকালে আবার দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ নামে দুটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ভারত অধিরাজ্য পরবর্তীকালে ভারতীয় প্রজাতন্ত্র বা ভারত গণরাজ্য নামে পরিচিত হয়। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাজনের ফলে ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি ও পাঞ্জাব প্রদেশও দ্বিখণ্ডিত হয়। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি ভেঙে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য (ভারত) ও পূর্ব বাংলা/পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশ (পাকিস্তান) গঠিত হয়। পাঞ্জাব প্রদেশ ভেঙে পাঞ্জাব প্রদেশ (পাকিস্তান) ও পাঞ্জাব রাজ্য (ভারত) গঠিত হয়। ভারত বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনী, ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস ও অন্যান্য প্রশাসনিক কৃত্যক এবং রেলপথ ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় সম্পদ দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বিভক্ত করে দেওয়া হয়।

ভারত বিভাজনের অব্যবহিত পূর্বে পাঞ্জাব অঞ্চলে যে ধর্মীয় দাঙ্গা বেধেছিল, তাতে উভয় ধর্মের ২০০,০০০ থেকে ৫০০,০০০ জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন। ইউএনএইচসিআর-এর হিসাব অনুসারে, ১ কোটি ৪০ লক্ষ হিন্দু, শিখ ও মুসলমান ভারত

বিভাজনের ফলে বাস্তুচ্যুত হয়েছিলেন এবং এর ফলে মানব ইতিহাসের বৃহত্তম দেশত্যাগের ঘটনাটি ঘটেছিল।

সিলোন (অধুনা শ্রীলঙ্কা) ১৭৯৫ থেকে ১৭৯৮ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতের মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারপর এটি ভারত থেকে পৃথক হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি পৃথক ক্রাউন কলোনি ঘোষিত হয়। ১৮২৬-৮৬ সালের মধ্যে ব্রিটিশরা ধীরে ধীরে ব্রহ্মদেশকে (অধুনা মায়ানমার) ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত করেছিল। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত ব্রহ্মদেশ ছিল ব্রিটিশ ভারতীয় প্রশাসনের দ্বারা শাসিত অঞ্চল। তারপর থেকে ব্রহ্মদেশ পৃথকভাবে শাসিত হতে থাকে। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ব্রহ্মদেশ এবং ওই বছরই ৪ ফেব্রুয়ারি সিলোন স্বাধীনতা পায়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর পাকিস্তান দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়। ভারত থেকে সিলোন ও ব্রহ্মদেশের বিভাজন বা পাকিস্তানের বিভাজন ভারত বিভাজনের অন্তর্গত নয়।

ভুটান, নেপাল ও মালদ্বীপ–এই তিনটি অধুনা দক্ষিণ এশীয় রাষ্ট্রে ভারত বিভাজনের কোনো প্রভাব পড়েনি। নেপাল ও ভুটান ব্রিটিশদের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে 'স্বাধীন রাষ্ট্রে'র মর্যাদা অর্জন করেছিল এবং কখনই ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তাই এই দুই রাষ্ট্রের সীমানা ভারত বিভাজনের সময় অপরিবর্তিত থেকে যায়। মালদ্বীপ ১৮৮৭ সালে ব্রিটিশ ক্রাউনের প্রোটেক্টোরেট মর্যাদা পায় এবং ১৯৬৫ সালে স্বাধীন হয়। এই রাষ্ট্রের সীমানাও ভারত বিভাজনের সময় অপরিবর্তিত ছিল।

**প্রেক্ষাপট**

১৯০৫ সালে তাঁর দ্বিতীয় কার্যকালে তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড কার্জন ব্রিটিশ ভারতের বৃহত্তম প্রশাসনিক বিভাগ বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিকে রাজনৈতিকভাবে দ্বিখণ্ডিত করেন। এই বিভাজনের ফলে গঠিত হয় মুসলমান-প্রধান পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ (অধুনা বাংলাদেশ রাষ্ট্র, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জলপাইগুড়ি বিভাগ) এবং হিন্দু-প্রধান বঙ্গপ্রদেশ (অধুনা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের প্রেসিডেন্সি ও বর্ধমান বিভাগ, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা রাজ্য)। কারো কারো মতে কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রশাসনিক দিক থেকে খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের সময় থেকে এই ধরনের প্রশাসনিক সংস্কারের কথা অনেকবার ভাবা হলেও তা বাস্তবায়ন করা হয়নি। যদিও ভারতীয় জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে এই ঘটনার ফলে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, তেমনটি আগে ঘটেনি। বাঙালি হিন্দু উচ্চবিত্ত গোষ্ঠী বঙ্গভঙ্গের তীব্র বিরোধিতা করেন। এঁদের অনেকেরই পূর্ববঙ্গে জমিদারি ছিল এবং সেই জমিদারির প্রজারা ছিলেন মুসলমান কৃষক। বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত বা ভদ্রলোক সমাজও নবগঠিত বঙ্গপ্রদেশে বিহারি ও ওড়িয়াদের দিয়ে বাঙালিদের সংখ্যালঘু করে দেওয়ার জন্য বঙ্গভঙ্গের তীব্র প্রতিবাদ জানান। তাঁরা মনে করেন, তাঁদের রাজনৈতিক সক্রিয়তার জন্যই কার্জন বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কার্জনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে স্বদেশি আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন দুইবারের কংগ্রেস সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ দ্রব্য বয়কট। ইচ্ছাকৃতভাবে না হলেও কখনো কখনো আন্দোলনকারীরা রাজনৈতিক সহিংসতার





আশ্রয় নিতেন। এর ফলে সাধারণ নাগরিকরা আক্রান্ত হতেন। সহিংস আন্দোলন কার্যকর হয়নি। কারণ সেগুলি ব্রিটিশরা প্রতিহত করেছিল এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেগুলি ব্যর্থ হয়েছিল। উভয় ধরনের আন্দোলনের প্রধান শ্লোগান ছিল 'বন্দে মাতরম্'। এটি ছিল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত একটি গানের শিরোনাম। গানটি একাধারে বঙ্গজননী, ভারতমাতা ও হিন্দু দেবী কালীর উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল। কলকাতার ইংরেজি-শিক্ষিত ছাত্ররা যখন কলকাতা থেকে তাদের গ্রাম বা মফঃস্বলে যান, তখন আন্দোলন বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। 'বন্দে মাতরম্' শ্লোগানটির ধর্মীয় উন্মাদনা ও বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিবাদ যুগান্তর ইত্যাদি দলের অধীনে যুবকদের একত্রিত করে। এরা সরকারি ভবনে বোমা বিস্ফোরণ, সশস্ত্র ডাকাতি ও ব্রিটিশ আধিকারিকদের হত্যা করতে শুরু করে। কলকাতা যেহেতু সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল, তাই এই রাজনৈতিক আন্দোলন ও 'বন্দে মাতরম্' শ্লোগানটি জাতীয় স্তরে পরিচিত ও স্বীকৃত হয়।

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দুদের সর্বব্যাপী প্রতিবাদ আন্দোলন এবং তার ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের মধ্যে সংস্কারের ভয়ে ভারতের মুসলমান উচ্চবিত্ত সম্প্রদায় ১৯০৬ সালে নতুন ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার দাবি জানায়। প্রাক্তন শাসক এবং ব্রিটিশদের সঙ্গে তাদের সহায়তার নথি তুলে ধরে মুসলমান উচ্চবিত্তরা আইনসভায় তাঁদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের দাবি জানান। এরপরই ১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ স্থাপিত হয়। লর্ড কার্জন সেই সময় তাঁর সামরিক প্রধান লর্ড কিচেনারের সঙ্গে মতবিরোধের জেরে ইস্তফা দিয়ে ইংল্যান্ডে ফিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু লীগ তাঁর বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনার সমর্থক ছিল। ১৮৭১ সালে ব্রিটিশ ভারতের জনগণনায় প্রথম ভারতের মুসলমান-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির কথা জানা গিয়েছিল। এরপর তিন দশক ধরে মুসলমান উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের অবস্থান নির্ধারিত হয়েছিল। সেই অবস্থানই ছিল মুসলিম লীগের অবস্থান। (কার্জন পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। ১৮৭১ সালের জনগণনার পর থেকে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের অবস্থান ব্রিটিশদের কাছে আশঙ্কাজনক হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া সিপাহি বিদ্রোহ ও দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ-মুসলমান বিরোধ তাঁর বিশেষ চিন্তার কারণ হয়েছিল। ১৮৭১ সালের জনগণনার পর থেকে উত্তর ভারতের মুসলমান নেতৃবর্গ নবগঠিত হিন্দু রাজনৈতিক ও সামাজিক গোষ্ঠীগুলির গণপ্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল। যেমন, আর্যসমাজ শুধুমাত্র গোরক্ষাকারী গোষ্ঠীগুলিকে সমর্থনই করেনি, বরং মুসলমানদের হিন্দুধর্মে পুনরায় ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছিল। ১৯শ শতাব্দীর শেষভাগে যুক্তপ্রদেশে (অধুনা উত্তরপ্রদেশ) রাজনৈতিক প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে হিন্দুরা অধিক ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। সেই সময় হিন্দি-উর্দু বিতর্ক রাজনৈতিক মোড় নেয় এবং ১৮৯৩ সালে গোহত্যা-বিরোধী দাঙ্গা বাধে। এর ফলে মুসলমানরা আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। ১৯০৫ সালে লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক ও লালা লাজপত রাই কংগ্রেসে নেতা হয়ে ওঠার চেষ্টা করেন এবং কংগ্রেসও কালীর প্রতীকতত্ত্বকে আন্দোলনের সামনে নিয়ে আসে। তাতে মুসলমানদের ভয় বৃদ্ধি পায়। কারণটা হলো 'বন্দেমাতরম্' শ্লোগানটি বঙ্কিমচন্দ্রের যে আনন্দমঠ উপন্যাস থেকে গৃহীত হয়েছিল, সেই উপন্যাসের উপজীব্য ছিল পূর্বতন মুসলমান শাসনে শাসক কর্তৃক হিন্দুদের অবদমন ও হিন্দুদের বিদ্রোহ। এসব বিবেচনা

মুসলমান উচ্চবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি ঢাকার নবাব খাজা সলিমুল্লাহ শাহবাগে নিজের বাড়িতে মুসলিম লীগের প্রথম অধিবেশন ডেকেছিলেন। তিনি জানতেন, নবগঠিত প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগুরু এবং এতে মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের সুবিধাই হবে।

১৯৪৭ সালে শেষ পর্যন্ত যা পাওয়া গেল সেটাকে স্বাধীনতা বলার উপায় নেই। সেটা ছিল ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত অবস্থায় ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনের মধ্য দিয়ে প্রদত্ত ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস লাভ। এর অর্থ দাঁড়ায় ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রাপ্তি। ব্রিটিশ শাসকরা স্বাধীনতা দেবে না এটাই ছিল স্বাভাবিক। না দেওয়ার জন্য যা যা দরকার তারা সেগুলোর কোনোটা করা থেকেই বিরত থাকেনি। তাদের জন্য সবচেয়ে কার্যকর পদক্ষেপ ছিল সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহারের ব্যবস্থা করে দেওয়া। দৃশ্যত কাজটা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগই করেছে। কিন্তু ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ঔপনিবেশিক শাসকরা যে ছিল সেটা মোটেই মিথ্যা নয়। কংগ্রেস ও লীগের কলহ এবং সংঘর্ষের দরুণই দেশ ভাগ হয়েছিল এবং স্বাধীনতার বদলে দেশবাসীর ঘাড়ে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন চেপে বসেছিল, এটা দৃশ্যমান সত্য; নেপথ্য দুর্বৃত্ত ছিল শাসকরা। কিন্তু এটাও তো মানতেই হবে যে, ১৯৪৭ সালের সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটিতে কংগ্রেস ও লীগ উভয় দলই ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে, দেশকে ভাগ করে দেওয়ায় মাউন্টব্যাটেনকে নানা মাত্রায় ধন্যবাদ জানিয়েছে এবং বাইরে যা-ই বলুক না কেন সংঘর্ষে লিপ্ত দুই দলের কোনো দলই প্রকৃত স্বাধীনতা চায়নি। প্রয়োজনে দেশবাসীকে তারা গৃহযুদ্ধের দিকে পরিচালিত করতেও প্রস্তুত ছিল। সেই প্রয়োজনটা অন্য কিছুই নয়, নিজেদের হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত করা ছাড়া।

তাঁরা স্বাধীনতা চাননি, চেয়েছেন ক্ষমতার হস্তান্তর। তাই ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনে তাদের অসুবিধা হয়নি, বরঞ্চ সুবিধাই হয়েছে। কারণ ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে আগে যারা দেশ শাসন করত তাদের ছেড়ে-দেওয়া ও সাজানো-গোছানো আসনগুলোতে নতুন শাসক হিসেবে এঁরা বসে পড়ার সুযোগ পেয়ে গেছেন। দেশভাগও মেনে নিয়েছেন। কেননা দেশভাগ না ঘটলে দুই দলের ভেতর ক্ষমতা নিয়ে যে বিরোধ তার কোনো মিমাংসা হচ্ছিল না এবং ব্রিটিশ শাসকরা কিছুটা কৌতুকের সঙ্গেই তাগাদা দিচ্ছিল দ্রুত মিমাংসায় পৌঁছার জন্য। ভাবটা এই রকমের যে, তারা তো উড়োজাহাজ তৈরি রেখেছে প্রস্থান করবে বলে, কিন্তু হানাহানি না থামলে ক্ষমতা যে দিয়ে যাবে সেটা কার হাতে। অতএব, মিমাংসা প্রয়োজন। দেশভাগ সেই মিমাংসারই নাম। তাতে নেতাদের সুবিধাই হয়েছে, দাম যা দেওয়ার দিতে হয়েছে হতভাগা দেশবাসীকেই, নাকের বদলে নরুন পাওয়ার মর্মান্তিক ঘটনা যদি ঘটে থাকে তবে তা ঘটেছে সাধারণ মানুষের জীবনেই।

স্বাধীনতার প্রশ্নে অত্যন্ত পরিষ্কার ও দৃঢ় অবস্থান গান্ধী বা জিন্নাহ কারোরই ছিল না, বরঞ্চ ছিল পরবর্তী প্রজন্মের দুই প্রতিনিধি সুভাষ চন্দ্র বসু এবং জওহরলাল নেহেরুর। অপরদিকে জিন্নাহ আগাগোড়াই ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের কথা ভেবেছেন, নতুন রাষ্ট্রের গভর্নর জেনারেল হতে আপত্তি করবেন কেমন অন্যদের ভিন্নমত প্রকাশের সুযোগ না দিয়ে নিজের সঙ্গে নিজের গোপন পরামর্শ সভা বসিয়ে ঠিক করে ফেলেছেন যে ওই পদটিতে তাঁকেই কেবল মানাবে। লাহোর প্রস্তাবে independent states-এর কথা ছিল; কিন্তু সেই independence বলতে যে প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা বোঝানো হয়েছে তা নয়, কী বোঝানো





হয়েছে সেটা টের পাওয়া যায় ইংরেজরা চলে গেলে মুসলমানদের (অর্থাৎ জিন্নাহর নিজের) ভাগে কতটা পড়বে তা নিয়ে তাঁর ব্যস্ত থাকা দেখে। পরে independent states-এর বদলে যে তিনি একটি state-এর কথা বলা শুরু করেছিলেন তার পেছনে মনোভাবটা ছিল এই রকম যে, ওই অখণ্ড রাষ্ট্রে ইংরেজরা থাকবে না ঠিকই, কিন্তু তাদের তৈরি করা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাটা থাকবে। ইংরেজরা জিন্নাহকে কখনো কখনো বিরক্তিকর ব্যক্তি বলে হয়তো মনে করেছে, কিন্তু কখনই শত্রু ভাবেনি বরঞ্চ কংগ্রেসের প্রতিপক্ষ হিসেবে জিন্নাহকে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য সুযোগ করে দিয়েছে। কংগ্রেসের নেতারা বারবার কারাবন্দী হয়েছেন, কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসকরা গান্ধীর পরেই যে নেতার নাম শোনা যেত সেই জিন্নাহকে একদিনের জন্য বন্দি করাটাও আবশ্যক মনে করেনি।

সুভাষ বসু যে সরকারি চাকরির মোহ ত্যাগ করে রাজনীতিতে এসেছিলেন তার পেছনে অনুপ্রেরণা ছিল একটিই, ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা। দেশে ফিরে সুভাষ স্বাধীনতার কথাই ভাবতেন, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের কথা নয়। তাঁর নিজের ওপর গান্ধীর তুলনায় চিত্তরঞ্জনের প্রভাবই বরঞ্চ অধিক পরিমাণে পড়েছিল এবং চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে তিনি এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে, একটি পরাধীন দেশে যে-সমস্যার কথাই ভাবা যাক না কেন, চূড়ান্ত বিচারে সেটি একটি রাজনৈতিক সমস্যা হতে বাধ্য। স্বাধীনতার যে কোনো বিকল্প নেই এটি তাঁর কাছে অল্প সময়েই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এবং স্বাধীনতা না পেলে যে ভারতের মুক্তি নেই এটি তাঁর জানা হয়ে গিয়েছিল তবে অরবিন্দের মতো তিনি আধ্যাত্মিকতার পথ ধরেননি, গান্ধীর অহিংসার পথকেও কার্যকর বলে মনে করেননি। উভয় পন্থার বিরুদ্ধে তিনি প্রকাশ্যেই বলেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ধারাবাহিক গণআন্দোলনে।

স্বাধীনতার প্রশ্নে জওহরলাল নেহেরুর অবস্থানও সুভাষ বসুর মতোই স্পষ্ট ছিল। তাত্ত্বিক ও দার্শনিকভাবে নেহেরুর সঙ্গে তুলনীয় নেতা ভারতবর্ষে সেকালে কমই ছিলেন। কিছুটা কাছাকাছি ছিলেন এম এন রায়, কিন্তু রায় ভারতবর্ষকে তেমনভাবে জানেননি, বুঝতেও পারেননি, নেহেরু যেভাবে জেনেছেন ও বুঝেছেন। ১৯৩৪-৩৬-এ লেখা তাঁর আত্মজীবনীতে নেহেরু স্বাধীনতা বলতে কী বোঝেন সেটা সুন্দরভাবে বলেছেন। তাঁর কাছে স্বাধীনতার অর্থ ক্ষমতা হস্তান্তর ছিল না, ছিল সমাজব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন। ইংরেজ চলে যাবে, তার জায়গায় স্থানীয়রা ক্ষমতা পাবে। অথচ সমাজ ও রাষ্ট্র আগের মতোই রয়ে যাবে, ওই ব্যবস্থাকে তিনি স্বাধীনতা বলে মানতে আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। জমিদারি ও মহাজনী শোষণ অক্ষুণ্ন রেখে স্বাধীনতার লাভ যে অসম্ভব তা তিনি প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকে বুঝেছেন।

স্মরণীয় যে, এসব নেতার অনেকেই ছিলেন আইনজীবী। স্বাধীনতা এঁদের জন্য ছিল ব্যক্তিগত লাভের প্রতিশ্রুতি। নেহেরুর আত্মজীবনীর প্রামাণ্য বাংলা অনুবাদ করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার; স্বাধীনতার বিষয়ে উদারপন্থিদের মনোভাব সম্পর্কে নেহেরুর মন্তব্যকে বাংলায় উপস্থাপিত করতে গিয়ে তিনি যোগ করে দিয়েছেন 'রামের বদলে শ্যামে'র উপমা। অর্থাৎ উদারপন্থিরা চেয়েছে রামের বদলে শ্যামকে; এর বেশি কিছু নয়। এই বাংলা উপমা মূল বইতে নেই। দেশবাসীর অভিজ্ঞতা অবশ্য বলছে কিছুটা ভিন্ন কথা। সেটা এই যে, রাষ্ট্রীয় গদিতে রামের জায়গায় শ্যাম বসে পড়বে এমন সম্ভাবনা দেখে রহিমও এসে হাজির হয়েছে, সেও বলছে ওই আসনে তার জায়গা চাই। আর ওই যে রাম

অর্থাৎ ইংরেজরা সে তখন করতালি দিয়ে রহিমকে বলেছে, হ্যাঁ, তাই তো, রহিম কেন বঞ্চিত হবে; আমি রাম তো তৈরি আছি ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাব বলে, তোমরা শ্যাম ও রহিম নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নাও কে কোন অংশ নেবে। শেষ পর্যন্ত ভাগাভাগিটা অবশ্য ইংরেজরাই করে দিয়েছে, ভারতবর্ষের মানচিত্রের ওপর কলমের দাগ দিয়ে র‍্যাডক্লিফের যে সীমানা কেটে দেওয়া সেও তো এক ইংরেজ ব্যারিস্টারেরই ঔপনিবেশিক কর্তব্য পালন।

সুভাষ ও নেহেরু উভয়েই আন্তর্জাতিকতাবাদী ছিলেন, গান্ধী যা ছিলেন না; গান্ধী সারা বিশ্বে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু বিশ্বে, বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে, কী ঘটছে সে-বিষয়ে মোটেই অবহিত ছিলেন না। অপরদিকে সুভাষ ও নেহেরু উভয়েই ছিলেন সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন না-করতে পারলে স্বাধীনতা যে কেবল কথার কথাই রয়ে যাবে, তার চেয়ে গভীর কিছু হবে না, এ বিষয়ে নেহেরু স্পষ্ট জানতেন। মার্কসের লেখা এবং লেনিনের কাজ সম্পর্কে তিনি কেবল অবহিত নন, তাঁদের দ্বারা প্রভাবিতও হয়েছিলেন। লেনিনকে তিনি একজন পূর্ণাঙ্গ নেতা বলে মনে করতেন। এসব বক্তব্য তাঁর আত্মজীবনীতে পাওয়া যায়। সমাজতন্ত্রের প্রতি আস্থা সুভাষেরও ছিল।

অনেক ব্যাপারেই সুভাষকে গান্ধীর বিপরীত অবস্থানে দাঁড়াতে হয়েছিল, তবু গান্ধী যেমন স্বাধীনতাকে একটি ভারতীয় রূপ দিতে চেয়েছেন, সুভাষও তেমনি বলতেন যে সমাজতন্ত্রকেও ভারতীয় রূপ দেওয়া আবশ্যক হবে। কমিউনিজম সম্পর্কে সুভাষের আপত্তি ছিল দুটি। একটি হলো, এই মতবাদ নাস্তিক্যবাদকে প্রশ্রয় দেয়, অপরটি হলো কমিউনিজম জাতীয়তাবাদবিরোধী। উভয় আপত্তিই অবশ্য ছিল অপ্রাসঙ্গিক। ধর্মনিরপেক্ষ ও ইহজাগতিক বিষয়ে, কমিউনিজমের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক আছে, নাকি বিরোধ রয়েছে এ নিয়ে নেহেরু মোটেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন না। যদিও ভারতীয় কমিউনিস্টরা ভারতকে ঠিক বোঝেননি এমন অভিযোগ তাঁর সব সময়েই ছিল।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ব্যাপারে নেহেরুর ভূমিকার তুলনায় সুভাষের ভূমিকা অবশ্যই বড় ও আপসহীন, আজাদ হিন্দ ফৌজের মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে তিনি যে মাপের একটি ধাক্কা দিয়েছিলেন, নেহেরু তেমনটি দিতে পারেননি। তদুপরি গান্ধীর সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌলিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও নেহেরু যেভাবে গান্ধীর নেতৃত্ব মেনে নিয়ে আপস করে ফেলেছিলেন, সুভাষ তেমনটি করেননি; এতে সুভাষ অনেক বেশি স্বাধীনচেতা ছিলেন। কিন্তু মতাদর্শগত দার্শনিক প্রশ্নে সুভাষ নেহেরুর তুলনায় যে পিছিয়ে ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই দুই নায়ক যদি একত্রে কাজ করতে পারতেন তাহলে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং দেশভাগের পরিবর্তে হয়তো এক প্রকারের স্বাধীনতাই পাওয়া যেত; কিন্তু তাঁদের পক্ষে কাছাকাছি এসেও একযোগে কাজ করা সম্ভব হয়নি। যার জন্য ক্ষতি হয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামের এবং পরবর্তী ইতিহাসের। গান্ধী ধর্মীয় ভারত, নৈতিক ভারত, আধ্যাত্মিক ভারত, সনাতন ভারত ইত্যাদির কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁর কালে মূল সত্য ছিল রাজনৈতিক ভারতই, যেখানে লড়াইটা চলছিল স্বাধীনতার জন্য এবং যাতে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা স্বয়ং গান্ধীরই। কিন্তু রাজনীতি থেকে গান্ধী মাঝে মধ্যেই সরে যেতেন, কাজ নিতেন সমাজ সংস্কারের। তবে সমস্যাটা তো রয়েই যায় যে, সমাজে





মৌলিক সংস্কার আসবে কী করে, রাষ্ট্র যদি সমাজকে শাসন করতে থাকে এবং সমাজের যত দুর্বলতা সেগুলোর রক্ষক ও পরিপালক হয়ে দাঁড়ায়? এ ধরনের প্রশ্নের জবাব গান্ধীর লেখায় তো পাওয়া যায়ইনি, তাঁর কাজের মধ্যেও সন্ধান মেলেনি। স্বাধীনতাকে তিনি একটি ভারতীয় চেহারা দিতে চেয়েছেন, যেমনভাবে পরবর্তীকালে পাকিস্তানে ও বাংলাদেশে ক্ষমতা জবরদখলকারী স্বৈরশাসকদের সবাই গণতন্ত্রকে 'দেশীয়' সাজে, অর্থাৎ নিজেদের সুবিধামতো রূপে সজ্জিত করতে চেয়েছেন। স্বাধীনতাকে ভারতীয় রূপ দানের প্রসঙ্গে গান্ধী রামরাজ্যের কথা বলতেন। তাঁর মতে রামরাজ্যই হলো ভারতীয় গণতন্ত্র, যে রাজ্যে জনগণের সার্বভৌমত্বের ভিত্তিটা রাজনৈতিক নয়, নৈতিক বটে। গান্ধী রামের ভক্ত ছিলেন; আমরা স্মরণ করি যে, আঁততায়ীর আঘাতে প্রাণ হারানোর চরম মুহূর্তে তিনি রাম নামই উচ্চারণ করেছিলেন, অন্য কিছু নয়।



পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝিতে রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির দাবিতে মিছিলের অগ্রভাগে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সঙ্গে শেখ মুজিব

## বাংলাদেশ ও তার ঐতিহাসিক পটভূমি

বাঙালি একটি সংকর জনগোষ্ঠী। প্রাচীনকাল হতে বিশ্বের নানা অঞ্চল থেকে অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, মঙ্গোলয়েড, ভোটচীন, নেগ্রিটো, সেমেটিক, আর্য ইত্যাকার নানা নরগোষ্ঠী বাংলা অঞ্চলে এসে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছে। কিন্তু তখনও বাংলা ও বাঙালি সংহত কোনো সত্তা হয়ে ওঠেনি। ইতিহাসে এ সময়কে প্রত্নবাংলা হিসেবে আখ্যাত করা হয়। তখন বাংলা ও বাঙালি নৃগোষ্ঠী সৃজ্যমান (formative stage) একটা পর্যায়ে ছিল। কারণ এই জনগোষ্ঠীর কোনো সাধারণ (common) ভাষা তখন পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। অপভ্রংশ ও প্রাকৃত ভাষায় ভাবের আদান-প্রদানের স্তরে এই জনগোষ্ঠীর অবস্থান। বাংলা ভাষা গড়ে উঠেছে মাত্র হাজার খানেক বছর আগে। আর সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছে ৭০০-৮০০ বছর আগে। একটি সাধারণ ও সংহত ভাষা ছাড়া কোনো জাতি গড়ে ওঠে না। বঙ্গদেশে বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতি গড়ে উঠেছে একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। প্রাচীন অনার্য অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ইত্যাকার ভাষার বহু কিছু ছেড়ে দিয়ে আর্য ভাষা গোষ্ঠীর মাগধি প্রাকৃত অংশ বাংলা সাধারণ ভাষায় (common language) রূপান্তরিত হয়। তাতে সংস্কৃতের প্রভাব থাকল প্রবলভাবে। এভাবেই বাঙালির জাতি গঠনের প্রাথমিক স্তরটি সম্পন্ন হয়। জাতি গঠনের অন্য সমস্যার একটা জটিল দিকও ছিল। কারণ এসব আদিম জনগোষ্ঠী নানা আচার-বিশ্বাস-সংস্কার-ধর্মমত এবং সাধনপন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন। এদের রক্তধারা ও সাংস্কৃতিক বোধ-বিশ্বাস, উপকরণও ছিল বহু বিচিত্র। এত বিচিত্র জীবনযাত্রা ও ঐতিহ্যের মানবগোষ্ঠীর জীবন পদ্ধতি নির্ধারণ এবং যাপিত জীবনকে সহনীয় করার লক্ষ্যে যে কোনো বিরোধ বা অলঙ্ঘনীয় বাধার সৃষ্টি হয়নি বা সর্বব্যাপী দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশে সমন্বিত জীবনধারা গড়ে উঠেছে, সেটিই আমাদের পূর্ব পুরুষদের বিচক্ষণতার পরিচয় বহন করে। জীবনযাত্রায় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধির জন্য এ ধরনের গ্রহণক্ষম ও মিলেমিশে বাস করার বোধ আমাদের প্রাচীন বংশধরদের এক অসামান্য কীর্তি।

এই আদি বা প্রত্ন-বাঙালির ধর্ম-দর্শন, ঐতিহ্য ও সামাজিক জীবনযাত্রায় কিছু কিছু পার্থক্য এমনকি বিপরীতধর্মিতা থাকা সত্ত্বেও সমন্বয়ের একটি ধারাই ক্রমশ বলবান হয়ে জাতি গঠনের রূপ নিতে থাকে। বাঙালির আদি ইতিহাসের সূচনা এভাবে হয়েছে বলেই ইতিহাস থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অসাধারণ গ্রহণ ক্ষমতা, পরমতসহিষ্ণুতা, অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা এবং বিভিন্ন কৌম সমাজের মত-পথ-পন্থার গ্রহণ-বর্জন-সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে আমাদের এ অঞ্চলের নানা ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী ধীরে ধীরে যে সমাজ, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা গড়ে তুলেছে তাকেই আমরা বাঙালি জীবন বলে আখ্যাত করেছি। অষ্টম শতকের পাল আমলকে এই জীবনের কিছুটা সংহত সূচনা বলে মনে করা যেতে পারে। পাল আমলে শিল্প-সংস্কৃতি-ভাস্কর্য-চিত্রকলার যে অসামান্য বিকাশ ঘটেছিল তাও বোধহয় নানা জাতিগোষ্ঠীর মানুষের সমন্বিত চিন্তনেরই ফল। শুধু শিল্প-সংস্কৃতি নয়, রাজনৈতিক জীবনধারায়ও এই কাল এক নতুন মাত্রা যোগ করে।





গণতন্ত্রের এক ধরনের অনুশীলনও পাল আমলে লক্ষ করা যায়। জনসাধারণ মানুষ মিলিত হয়ে গোপাল নামের এক সৎ-সজ্জন সাধারণ মানুষকে তাদের রাজা নির্বাচন করে। এখানে দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা বিবেচনা করে দেখতে পারি। প্রথম কথা হলো, সপ্তম শতকে রাজা শশাঙ্ক বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যায় তার বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। কিন্তু এই শিবভক্ত রাজার রাজত্বের শেষেই তৎকালীন বঙ্গদেশে মাৎস্যন্যায় অর্থাৎ অরাজকতার অবস্থা সৃষ্টি হয়। সেই অরাজকতার অবস্থায় নানা বিষয়ে তর্ক-তদন্ত নিশ্চয়ই অনেক হয়েছিল। কিন্তু বিদ্যমান অবস্থায় কী বিহিত করা যায় তার একটা গণতান্ত্রিক পন্থা তৎকালীন সাধারণ মানুষ যে উদ্ভাবন করতে পেরেছিলেন সেটি ওই জনগোষ্ঠীর প্রাজ্ঞ বিবেচনা শক্তিকেই তুলে ধরে। অন্যদিকে শক্তিশালী রাজতন্ত্র যে টেকসই ব্যবস্থা নয় এবং তাতে সাধারণ মানুষের কল্যাণ নেই। এই বোধ থেকেও হয়তো গণতান্ত্রিক পন্থায় একজন সাধারণ এবং সৎ মানুষকেই রাজা নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এ ঘটনা থেকে ইতিহাস আমাদের কী শিক্ষা দেয়? শিক্ষা তো এটাই দেয় যে, বিশেষ কোনো ধর্ম (সেকালের শৈব ধর্ম। একালে অন্য যে কোনো ধর্ম) বা প্রচণ্ড শক্তিশালী রাজতন্ত্র জনগণের সমস্যার কোনো সমাধান দিতে পারে না। বিকল্প পন্থা হিসেবে সংলাপ, সমন্বয় এবং ধর্মকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে স্থিত রেখেই সাধারণ মানুষের কল্যাণমূলক রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে তোলা সমীচীন। সেই প্রাচীনকালে জনসাধারণের ভোটে একালের মতো জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করা সম্ভব না হলেও এই ভূখণ্ডের মানুষ যে অষ্টম শতকেই গণতান্ত্রিকভাবে একজন সাধারণ মানুষকে রাজা নির্বাচন করেছিল তার গুরুত্বও ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখতে গেলে মোটেই সামান্য নয়।

পাল রাজাদের রাজত্বকালের গুরুত্ব বাংলার ইতিহাসে অনস্বীকার্য। ইতোপূর্বে আমরা তাদের আমলের শিল্প-সংস্কৃতি-চিত্রকলা-ভাস্কর্যের অসামান্য বিকাশের কথা বলেছি। কিন্তু বাংলা ভাষার উৎপত্তিও তো ঘটে পাল আমলেই। পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। তাদের ৪০০ বছরের রাজত্বকালে ধর্মীয় নির্যাতনের উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু দশম-একাদশ শতকে দক্ষিণ ভারতের (কর্নাটক) সেন রাজারা তাদের আমলে সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রীয় ধর্ম-দর্শনের বিকাশের দিকেই অধিক মনোযোগী হয়ে পড়েন। তাদের আত্যন্তিক ধর্মবোধ অন্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের জন্য যে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ বাংলা সাহিত্যের আদি কবি বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা দেশ থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। আর সেজন্যই বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ মাত্র শতাধিক বছর আগে নেপালের রাজদরবার থেকে উদ্ধার করেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রাসাদ শাস্ত্রী।

সেন রাজাদের ধর্মীয় উগ্র শাসনের পরবর্তীকালে প্রায় ২০০ বছরকে যে 'অন্ধকার যুগ' বলা হয় তা সৃষ্টির দায়িত্ব ধর্মীয়ভাবে অসহিষ্ণু সেন রাজা এবং ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকের (১২০৪) মুসলিম বহিরাগত বিজয়ীদের উন্মত্ততার ওপরই বর্তায়। তবে বাংলাদেশ চিরকালই সমন্বয়বাদী; নানা মত-পথ-পন্থা-কাল্ট এখানে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। বাংলাদেশে ইতিহাসের নানা পর্যায়ে জাতিসত্তাগত যে বিকাশ ঘটেছে তাতে অস্ট্রিক,

দ্রাবিড়, মিশ্র আর্য জাতিসত্তাগত উপাদান এবং ধর্ম-দর্শন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধক, নাথযোগী, বাউল-সুফি, বৈষ্ণব এবং মারেফতি-মুর্শিদীর অনুসারী কবিয়াল-বয়াতীসহ গ্রামীণ সাধকেরাই এদেশে এক জীবনঘনিষ্ঠ সমন্বয়বাদী জীবনধারা গড়ে তুলেছেন। বাংলা অঞ্চল চিরকালই কেন্দ্রীয় শাসন থেকে দূরবর্তী অবস্থানে থাকার প্রয়াস চালিয়ে যাওয়ায় তাদের এই সাধনা মানবপন্থি সাধনায় পরিণত হয়েছে। এই সাধনা ধর্মনিরপেক্ষ এবং হৃদয়সংবেদী। বাঙালি জাতিসত্তাই গড়ে উঠেছে নানা জাতিগোষ্ঠীর আচার-অনুষ্ঠান-বিশ্বাস ও মতাদর্শের মিশ্রণের মাধ্যমে। ফলে যে দেশজ চিন্তা-চেতনা ও দর্শনে বাঙালির বাঙালিত্ব বা দেশগত-সত্তা তার ভিত্তি পরমতসহিষ্ণুতা এবং ধর্মীয় সহনশীলতায়। ফলে ধর্মনিরপেক্ষ না হলে বাঙালি হওয়া সম্ভব ছিল না। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন : 'মানবপন্থি বাংলাদেশ প্রাচীনকালেও ভারতের শাস্ত্রপন্থি সমাজ নেতাদের কাছে নিন্দনীয় ছিল। তীর্থযাত্রা ছাড়া এখানে এলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। তার মানে বাংলাদেশ চিরদিনই শাস্ত্রগত সংস্কারমুক্ত।' বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষতার দর্শন এই ঐতিহাসিক বিকাশ ধারার মধ্যেই অনুসন্ধেয়। আধুনিককালে পাশ্চাত্য বিশ্বে জাতিরাষ্ট্রের মৌল রাষ্ট্রনীতি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে সেক্যুলারিজম। অষ্টাদশ শতকের ফ্রান্সে সেক্যুলারিজম, ভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠে। রাজকীয় স্বৈরাচার এবং যাজক সম্প্রদায়ের অনাচারও ছিল তার মূলে। অন্যদিকে মধ্যযুগের ইউরোপের অন্যত্র তিক্ত ধর্মীয় হানাহানি ও ধর্মযুদ্ধের বিনাশী অভিজ্ঞতার মধ্য থেকেই গড়ে উঠেছিল এই সেক্যুলারিজম। ফলে রেনেসাঁ, শিল্পবিপ্লব, রিফরমেশন, আলোকায়নের প্রজনন জাতিরাষ্ট্রের ধর্মই হয়ে ওঠে। আমরা যাকে বলি 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বা পাশ্চাত্য অভিধায় 'সেক্যুলারিজম'। এই সেকুলারিজমের সৃষ্টিতে দার্শনিক ও রাষ্ট্রচিন্তক জে.এম. মিল, কোঁৎ, রুশো, ভলটেয়ারের অবদান বিরাট। তাদের প্রভাবে প্রথমে ফরাসি দেশে, পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতি গড়ে ওঠে। ঠিক সেই অর্থে যুক্তরাজ্যে গণতন্ত্রের চরম বিকাশ ঘটলেও ধর্মনিরপেক্ষতা সেখানে প্রাধিকার পায়নি। সেখানে রাজাকে বিশেষ ধর্মের হতে হয় এবং রাজার ধর্মই হয় প্রজার ধর্ম ও রাষ্ট্রধর্ম। তাই বলা যায়, পাশ্চাত্যের নবজাগরণের প্রভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে যে খণ্ডিত জাগরণ ঘটেছিল তার সামান্য কিছু প্রভাব পড়েছিল নগরবাসী হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে। গ্রামবাংলার বিপুল বিশাল অঞ্চলকে তা স্পর্শ করেনি। গ্রামবাংলায় যে পাশ্চাত্য রেনেসাঁর প্রভাবিত জাগরণের চেয়েও শক্তিশালী অসাম্প্রদায়িক তথা সমন্বিত সংস্কৃতি ও জীবনধারা গড়ে উঠেছিল তার পেছনে ছিল বঙ্গদেশের গ্রামাঞ্চলের বাউল, বৈষ্ণব, সুফি, সাধক, নাথযোগী, বৌদ্ধ-জৈনদের অবদান। তারাই বিশাল বাংলায় পরমত ও পরধর্মসহিষ্ণু এবং সহ-অবস্থানের নীতিতে অভ্যস্ত এক বাঙালি জীবনদর্শন গড়ে তোলেন।

সেন রাজাদের ধর্মীয় উগ্রশাসনের পরবর্তীকালে ২০০ বছরের যে 'অন্ধকার যুগে'র সৃষ্টি হয় তার দায় উগ্র হিন্দুত্ববাদী সেন রাজাদের এবং প্রথম দিকের বহিরাগত মুসলিম দখলদার উভয়ের ওপরই বর্তায়। তবে রাষ্ট্রপরিচালনায় বহু মত-পথ-গোত্র ও





ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য ধর্মনিরপেক্ষতার কোনো বিকল্প নাই। ভারতবর্ষে শাসন করতে এসে মুসলিম শাসকরা এ বিষয়টি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেই ইসলামি রাষ্ট্রতত্ত্বের পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র শাসননীতির উদ্ভাবন করেন। আমরা বর্তমান আলোচনায় প্রথম পর্বেই দেখেছি ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের মধ্যে বহু আগে থেকেই নানা ধর্মমতের সহ-অবস্থান থাকলেও রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মনিরপেক্ষকতার প্রবর্তক মুসলিম শাসকরাই। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় মুসলিম ইতিহাসবিদ জিয়াউদ্দিন বারানির ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দে লেখা তিনখানা বইয়ে। বইগুলোর নাম : তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, ফতোয়া-ই জাহানদারি এবং শাফিয়া-ই-নাট-ই আহমদি। তারিখ-ই-ফিরোজশাহীতে বারানি দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন : "আমার প্রভু ইলতুৎমিশ বলতেন যে, সুলতানের পক্ষে ধর্মবিশ্বাস (দীনদারী) মেনে রাষ্ট্র শাসন করা সম্ভব নয়; ধর্মবিশ্বাস রক্ষা (দীনপানাহি) করতে পারাই তাঁর জন্য যথেষ্ট। সুলতানের ঘোষিত আদর্শ ছিল 'ন্যায়বিচার'।" মধ্যযুগের ভারতে ন্যায়বিচারের অর্থ ছিল : 'সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা অর্থাৎ ধর্মনির্বিশেষে সকলের অধিকার রক্ষা; সমাজ বা ধর্মসম্প্রদায়ের এক অংশ যেন অন্য অংশের উপর আধিপত্য না করে এমন ব্যবস্থা।' বারানি আলাউদ্দিন খলজির (১২৯৬-১৩১৬) মত উদ্ধৃত করে বলেন, তিনি বলেছিলেন, "শরিয়তে কী লেখা আছে, তার পরোয়া না করে রাষ্ট্রের স্বার্থে যা করা উচিত বলে মনে করবেন, সুলতানের তাই করা উচিত" একেই বলা হয়েছে 'জাহানদারি' বা ইহজাগতিকতা অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতা। রাজ্য বিস্তার, ভিন্ন ধর্মের জনগোষ্ঠীর সমর্থন লাভ ও শাসন পরিচালনার জন্য ধর্মনিরপেক্ষতা ছাড়া অন্য কোনো লাগসই বিকল্প তারা খুঁজে পাননি। এমনকি রাজা ও প্রজা উভয়ই মুসলমান এমন দেশেও ধর্মনিরপেক্ষতাই ছিল অপরিহার্য রাষ্ট্রনীতি। উদাহরণ, মধ্য এশিয়ার দেশসমূহ। ধর্মনিরপেক্ষতার ফলে সমাজ-সংস্কৃতি ও সভ্যতার অগ্রগতি আর শিল্প-সংস্কৃতির অপূর্ব-বিকাশ ঘটে এবং ধর্মান্ধতা এমনকি ধর্ম-প্রবণতার ফলেও সামাজিক বিপর্যয় ও সংস্কৃতির অবক্ষয় লক্ষ করা যায়।

আমাদের উপর্যুক্ত আলোচনার বক্তব্য আরও স্পষ্ট হবে বাংলায় সুলতানী আমলের ইতিহাসের দিকে তাকালে। দিল্লির মতো বাংলার সুলতানরাও ছিলেন বিদেশি, বিভাষী ও বিধর্মী। তবে তারা শাসক হলেও শাসিতের দেশে নিজ ধর্মের প্রয়োগে জোরজুলুম ও জবরদস্তি করেননি। বরং বাংলা ও বাঙালিকে ভালোবেসে এদেশকে আপন করে নিয়েছিলেন। হোসেন শাহী আমলে বাংলায় এক নব ভাববিপ্লবেরই সূচনা হয়েছিল। একদিকে শ্রীচৈতন্য দেবের হিন্দু ধর্মের গণমুখী সংস্কারমূলক ভক্তিবাদী আন্দোলন ও ধর্মীয় গোঁড়ামিমুক্ত মানবপন্থি সাধনাধারা; অন্যদিকে মুসলিম মরমি সুফি-সাধকদের অধ্যাত্মচেতনা-প্রসূত মানবতাবাদ বাংলার সামাজিক জীবনে এনেছিল এক নবতর সাংস্কৃতিক উজ্জীবন। এই ভাব-আন্দোলনকে হয়তো পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের বাংলার নবজাগরণ বলে আখ্যাত করা চলে। কারণ বাংলার স্বাধীন মুসলিম সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের নবযুগের সূত্রপাত ঘটে। সুলতানদের উদারতাবাদী ও

ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির ফলেই মহাভারত ও ভাগবৎ এই প্রথম সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনূদিত হয়। ভাগবৎ অনুবাদ করে মালাধর বসু সুলতান শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ'র কাছ থেকে 'গুণরাজখান' উপাধিতে ভূষিত হন। সংস্কৃতি সমন্বয়ের এই নীতি সমন্বয়বাদী বাঙালি জাতিসত্তা গঠনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। শুধু তাই নয়, বহিরাগত এই মুসলিম সুলতানরা বিকাশমান বাঙালি জাতি গঠনে যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা পালন করেছেন ইতিহাসনিষ্ঠ কোনো বাঙালির তা দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ার কথা নয়। একথা বলাই বাহুল্য যে, এই জাতি গঠন প্রক্রিয়াটি নৃবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন হতে শুরু করে চতুর্দশ-পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে। বাঙালি জাতি ও বাঙালিত্ব নিয়ে এক ধরনের অহঙ্কারও বোধ করেছেন সুলতানরা। সেজন্যই শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ নিজেকে 'শাহে বাঙালিয়ান' বলে ঘোষণা করেন। পরবর্তীকালে মুর্শিদাবাদের নবাবরাও বাঙালিদের দেশজ উৎসব-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে সুলতানদের প্রবর্তিত ধারাকে আরও গভীরতা দান করেন। নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ ও আলীবর্দী খাঁর বেড়াভাসান উৎসব, বাংলা নববর্ষে পুণ্যাহ উৎসবে যোগদান এর প্রমাণ বহন করে। অতএব বঙ্গদেশে ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি নির্মাণে মুসলিম শাসকদের অবদান দিক-নির্দেশক। দিল্লি ও বাংলার সুলতানদের এই প্রয়াসকে একটি গ্রহণযোগ্য ও চলমান ঐতিহাসিক ধারা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েই নেহেরু-মওলানা আজাদ স্বাধীন ভারতে এবং বঙ্গবন্ধু-তাজউদ্দীন ও তাদের সহযোদ্ধারা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত নবীন গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রনীতি হিসেবে গ্রহণ করেন। উপমহাদেশের ইতিহাস জানতেন বলেই তারা ওই প্রাজ্ঞ রাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেন।

মুসলিম সুলতান ও নবাবরা বাঙালির মানস প্রবণতাকে খুব যথার্থভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই সে স্পর্শকাতর বিষয়ে কোনো বিরূপ ধারণা বা অসূয়া পোষণ না করে বাঙালির আচার-অনুষ্ঠান উৎসবকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। তার ফলে কেন্দ্রীয় শাসন থেকে দূরে থাকা গ্রামীণ বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতিধারার বিকাশে কোনো বাধার সৃষ্টি হয়নি। তারা সব সময়ই তাদের নানা মত-পথ ও পন্থার বহুত্ববাদী (Pluralistic) সংস্কৃতিকে সমন্বয়ের মাধ্যমে শাস্ত্রীয় অনুশাসন ও রাষ্ট্রীয় আধিপত্যবাদী নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ থেকে দূরে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলার মানুষের এই মানসিক সামাজিক পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ধর্মনিরপেক্ষ জাতিরাষ্ট্র গঠনের একটি প্রাথমিক উদ্যোগ চোখ পড়ে। জনৈক ভাষ্যকার বলেছেন : "অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের ওপর সুবায় সুবায় নতুন রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। লক্ষ্য করিলে এইসব রাষ্ট্রে একটি সম্পূর্ণ নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব চোখে পড়ে। ইউরোপে নতুন বাণিজ্য পথ আবিষ্কারের সঙ্গে এই শ্রেণীর প্রথম সূত্রপাত; অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের কৃপায় এই শ্রেণীটি ইতিমধ্যেই বিশেষ অর্থবান হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া নূতন নূতন শহর বন্দর গড়িয়া উঠিল। গ্রাম, গ্রামান্তর হইতে নিপুণ কারিগর শ্রেণী ও অনিপুণ মজুরের দল সুরাট, হুগলি





সুতানটি ও মুর্শিদাবাদে ভিড় জমাইল। বাংলাদেশে পলাশী যুদ্ধের সমকালে এই শ্রেণীর রূপটি খুব স্পষ্টভাবে নজরে পড়ে। মুঘল সামন্ততন্ত্রের ইতিহাসে যাহা কখনো পড়ে নাই। এই সময় তাহা দেখা যায়। দেখা যায় সামন্ততন্ত্রের কাঠামোর মধ্য হইতে একটি সম্পূর্ণ নূতন শ্রেণী বাড়িয়া উঠিয়াছে। বিলক্ষণ শক্তি সঞ্চয় করিয়া রাষ্ট্র ক্ষমতা ছিনাইয়া নেওয়ার জন্য হাত বাড়াইয়াছে। আর তাহার প্রথম ধাপ হিসেবে বাংলার মসনদে বসাইবার জন্য 'হাতের লোক' খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাংকার জগৎ শেঠ, বণিকরাজ উমিচাঁদ, নিমকের একচেটিয়া কারবারী খোঁজা বাজিদ, ইংরেজ কুঠির সঙ্গে গোপন কারবারে প্রভূত বিত্তশালী ঢাকার ডেপুটি দেওয়ান রাজা রাজবল্লভ এই নূতন শ্রেণীর প্রতিনিধি। উল্লেখযোগ্য যে ইহাদের একজন জৈন, একজন নানকপন্থি, একজন মুসলমান, অপরজন বাঙালি হিন্দু অর্থাৎ ইহাদের ঐক্যের ভিত্তি সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক। ইহারা আবার বণিক পুঁজির (Mercantile Capital) প্রতিনিধি। আর এই পুঁজিই সর্বদেশে ধনতন্ত্রের অগ্রদূত। এই শ্রেণীর দ্বারা এদেশেও হয়তো বুর্জোয়া বিপ্লবের ভূমিকা রচিত হইত। কিন্তু ইংরেজরা এদেশ দখল করে নেওয়ায় সৃজ্যমান ধর্মনিরপেক্ষ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব এদেশে সূচনালগ্নেই চাপা পড়ে যায় এবং ঔপনিবেশিক শাসনকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে ইংরেজ শাসকরা ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করে শাসন করার লক্ষ্যে Divide and Rule Policy চালু করে। এভাবেই তারা ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক ভিত্তির ওপর ভারতবর্ষে আধুনিক জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ রুদ্ধ করে দেয়। তারই বিষময় ফল, ধর্মের ভিত্তিকে ভারতবর্ষকে ভাগ করে 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' নামে দুটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, ভয়াবহ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় বিপুল নিরীহ মানুষের প্রাণহানি, অগণন মানুষের ভিটেমাটি ছেড়ে দেশ ত্যাগ ও দুঃসহ বাস্তুহারা জীবন গ্রহণ। বাংলার সাধারণ মানুষের মানবপন্থি সাধনা, দিল্লির সুলতানদের রাষ্ট্রনৈতিক দর্শন তথা ইহজাগতিকতা এবং বাংলার সুলতানদের সমন্বিত জীবনবাদী ধারা পরিত্যাগ করে সাম্প্রদায়িক দ্বি-জাতিতত্ত্ব গ্রহণ করায় এই বিশাল মানবিক বিপর্যয় ঘটে।

'দুই-পাকিস্তান'ভিত্তিক আন্দোলন অংশ নিলেও অপরাষ্ট্র [এক] পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই পূর্ব-বাংলার বাঙালি বুঝতে পারে তারা প্রতারিত হয়েছে। এখন তারা শোষণ-নির্যাতন ও জাতিগত নিপীড়নের শিকার। তাই ১৯৪৭-৪৮ সালেই ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি শুরু করে নৃতাত্ত্বিক জাতিসত্তাভিত্তিক নতুন ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। সে আন্দোলনে বাঙালির সংস্কৃতি ও রাজনীতি একাত্ম হয়ে যায়। ফলে বাংলা ভাষা ও বাংলার ভূ-প্রকৃতিভিত্তিক নবচেতনা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে ওঠে। তখনই প্রকৃত ধার্মিক, বিবেকবান ও ইতিহাসনিষ্ঠ বুদ্ধিজীবী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতিসত্তার স্বরূপটি নির্ধারণ করে দেন এই ভাষায়:

'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোনো আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন দাগ মেরে দিয়েছেন যে মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে তা ঢাকবার জোটি নেই' (পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন, কার্জন হল, ঢাকা, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৪৮, সভাপতির ভাষণ)।

প্রখ্যাত পণ্ডিত ও ধর্মবেত্তা উপর্যুক্ত তাত্ত্বিক সূত্র ধরে নিজেই সংস্কৃতি ক্ষেত্র থেকে বাঙালি জাতিসত্তা রক্ষার আন্দোলন শুরু করেন। ড. শহীদুল্লাহর দিক-নির্দেশক চিন্তাধারাকে মূলসূত্র হিসেবে গ্রহণ করে পূর্ব-বাংলার নবপ্রজন্মের রাজনৈতিক নেতাকর্মী ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের সক্রিয়বাদীরা (Cultural Activists) বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৪৮ ও ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনের সাংস্কৃতিক পাটাতনের ওপর নবধারার ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক সংগ্রামের সূত্রপাত। এরই ধারাবাহিকতায় ২৩ বছর ধরে চলে উপনিবেশবিরোধী, সামরিক শাসনবিরোধী জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম। ১৯৬২-এ 'দেশ ও কৃষ্টি' শীর্ষক পাঠ্যবইয়ে বাঙালি জাতিসত্তাবিরোধী তথ্য অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবের ৬-দফাভিত্তিক পূর্ব-বাংলার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের আন্দোলন বাঙালির স্বাধিকার সংগ্রামকে গুণগত রাজনৈতিক পরিবর্তনের স্তরে উন্নীত করে। এই আন্দোলন দমনে পাকিস্তান সরকার বাঙালির জনপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবকে শুধু গ্রেফতার করেই ক্ষান্ত হয়নি, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় তাকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। তাকে মুক্ত করার দুর্বার আন্দোলনকে জনগণ ১৯৬৯-এ গণঅভ্যুত্থানে পরিণত করে। গণঅভ্যুত্থানে মুক্ত শেখ মুজিব বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত হয়ে পূর্ব-বাংলার অবিসংবাদিত রাজনৈতিক নেতার মর্যাদা লাভ করেন। এই গণঅভ্যুত্থান ছিল বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের ড্রেস রিহার্সালস্বরূপ। ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভূমিধস বিজয়ের পরও বঙ্গবন্ধুকে ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি পাকিস্তানি স্বৈরশাসকরা। পূর্ব বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়েও তিনি ক্ষমতা পাননি। ফলে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। বঙ্গবন্ধু ১৯৭১-এর ৭ মার্চ তৎকালীন রমনা রেসকোর্স ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন : 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এই অনন্য ভাষণে তিনি মুক্তি সংগ্রামের জন্য গেরিলা যুদ্ধের রূপরেখাও নির্দেশ করে দেন। বঙ্গবন্ধুর দিক-নির্দেশনা ও তার যোগ্য সহযোগী তাজউদ্দীন আহমদ ও অন্যদের নেতৃত্ব মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভ করে বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্নের, সংগ্রামের, সাধনার, গণতান্ত্রিক, জাতীয়তাবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক সাম্যমূলক অর্থনৈতিক আদর্শভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ জাতিরাষ্ট্র, বাংলাদেশ। পাকিস্তানি বন্দিশিবির থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে ১৯৭১-এর ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন : 'আমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই যে, বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। আর তার ভিত্তি বিশেষ কোনো ধর্মীয়ভিত্তিক হবে না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্ম-নিরপেক্ষতা। এদেশের কৃষক, শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।' এর আগে মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্বে ১৯৭১-এর ১০ এপ্রিল স্বাধীনতার ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্রেও স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্ম-নিরপেক্ষতা রাষ্ট্রনীতি হিসেবে গৃহীত হয় এবং সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন বা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করা নিষিদ্ধ করা হয়। তাতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয় : 'ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি





বাস্তবায়নের জন্য সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, রাষ্ট্রীয়ভাবে কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের ব্যবহার এবং কোনো বিশেষ ধর্মাবলম্বীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ করা হলো।'

এমন এক রাষ্ট্র গঠন ও সংবিধান রচনা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক বোধ, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার পরিচায়ক। বাঙালি জাতির এর চেয়ে বড় সাফল্য, বড় অর্জন ইতিহাসে আর নাই। বাংলাদেশের ১৯৭২-এর সংবিধানের প্রশংসা করে তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Center for Inquiry-Transnational-এর শিক্ষা ও গবেষণা পরিচালক ড. অস্টিন ডেইসি বলেন : 'Thomas Jefferson could have learnt a lot about secular democracy from Sheikh Mujibur Rahman..' কিন্তু বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস এবং মধ্যযুগের ভারতবর্ষে মুসলিম শাসকদের রাষ্ট্র ও ধর্ম-নীতির ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং আধুনিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক বোধের পশ্চাৎপদতার জন্য স্বৈরশাসক জিয়া-এরশাদ এবং পাকিস্তানের গোপন দোসর মোশতাক ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা মিলে বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্নের জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা শেখ মুজিবকেই শুধু হত্যা করেনি, রাষ্ট্রের মূলনীতি পরিবর্তন করে একটি পাকিস্তানি ধাঁচের ধর্মপ্রবণ পশ্চাৎপদ রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব গোটা বাঙালি জাতিকে চার মূল রাষ্ট্রনীতির পেছনে যেভাবে সুদৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ করে তুলেছিলেন তার বিপরীতে উপরোক্ত তিন শাসক তাদের কূপমণ্ডুক ও অপরাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু সরকারের দেওয়া '৭২-এর সংবিধানকে কাটাছেঁড়া করে এমন কলুষিত করে ফেলে যে, তা এখন জাতিকে দুটি ক্ষতিকর ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে। এর বিষাক্ত প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশকে দুঃশাসন, সামরিক ও ছদ্মসামরিক স্বৈরাচারের মৃগয়া ক্ষেত্রে পরিণত করা হয়। ফলে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি নানা প্রতিকূলতায় বিপন্ন, আর ধর্মীয় জঙ্গিবাদী ধর্মান্ধ ও স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি জিয়ার দলের সঙ্গে জোট বেঁধে বাংলাদেশে দাপিয়ে বেড়াতে থাকে। স্বাধীনতাবিরোধী ও রাজাকারদের মন্ত্রী বানিয়ে তাদের গাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা উড়ানোর সুযোগ করে দেওয়া হয়। জিয়া যেখানে গোপনে স্বাধীনতাবিরোধী ধর্মব্যবসায়ী জামাতকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন, স্বাধীনতাবিরোধী শাহ আজিজকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছেন, খালেদা জিয়া সেখানে মন্ত্রিত্ব দিয়েছেন, তাদের সঙ্গে জোট বেঁধেছেন এবং জিয়া-পুত্র তারেক রহমান প্রকাশ্যে বলেছেন : 'বিএনপি ও জামায়াত একই পরিবারের সদস্য।' এ সূত্রেই ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মৌলসত্তা-বিরোধী একটি শক্তিশালী চক্র নানা ক্রুর চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র-জালের ছক ফেলে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত জনগণের এই রাষ্ট্রটিকে তার জন্ম-ইতিহাসের স্বাভাবিক গতিপথে বিকশিত হতে দেয়নি। আর এজন্যই বাড়-বাড়ন্ত হয় দুর্বৃত্তায়ন দুঃশাসন আর স্বৈরাচার ও জঙ্গিবাদের। ফলে মুজিব-তাজউদ্দীনসহ বহু দেশপ্রেমিকের প্রাণ নিয়েও রাষ্ট্রশক্তির গোপন কুঠুরিতে স্থায়ী আসনপাতা দুষ্টচক্র তথা ধর্মব্যবসায়ী বা উগ্রধর্মীয় জঙ্গি ও তাদের মদদদাতারা বাংলাদেশকে চক্রান্ত ষড়যন্ত্রের বৃত্ত ভেঙে বের হতে দিচ্ছে না। বাংলাদেশ

রাষ্ট্রের মূল সংকট এখানেই। এদের চিরতরে দমন এবং স্বাধীনতা বিরোধিতা ও যুদ্ধাপরাধের সঙ্গে যুক্ত অপরাধীদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে শাস্তি দিতে না পারলে বাংলাদেশ বিপদমুক্ত হবে না। বর্তমান সরকার এ কাজে হাত দিয়েছে। সর্বোচ্চ বিচারালয় শাসনযন্ত্রের পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করে ঐতিহাসিক রায় দিয়েছেন। এর ফলে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশের মৌল রাষ্ট্রসত্তার পুনর্গঠনের যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তাকে বাস্তবায়িত করতে হবে। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের ফাঁসির রায় আংশিকভাবে কার্যকর হয়েছে, দেশে আইনের শাসন ও নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য এবং গোপন ও ষড়যন্ত্রমূলক রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড চিরতরে বন্ধ করার জন্য পলাতক খুনিদের বিদেশ থেকে নিয়ে এসে তাদেরও ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাতে হবে।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রগঠনে বঙ্গবন্ধুর ধারাবাহিক ঐতিহাসিক সংগ্রাম ছিল সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত। এ ব্যাপারে ১৯৬০-এর দশকে ছাত্রলীগের নেতৃত্বে নিউক্লিয়াস গঠন, পদ্মা মেঘনা যমুনা তোমার আমার ঠিকানাসহ উপযোগী গ্লোগান প্রচার বিশেষ করে 'জয় বাংলা'র মতো লক্ষ্যভেদী শস্ত্র মরণাস্ত্রে সজ্জিত হানাদার পাকিস্তানিদের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেয়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর অতি স্বল্প সময়ে তিনি এবং তার সরকার যে সংবিধান (১৯৭২) তৈরি করেন বাংলাদেশকে তা দক্ষিণ এশিয়ার বিপুল সম্ভাবনাময় এবং মানবকল্যাণকামী রাষ্ট্রে পরিণত করে।

মনে রাখতে হবে, কোনো দেশকে সেনাবাহিনী রক্ষা করতে পারে না। সামাজিক ন্যায় এবং সুশাসনই দেশকে রক্ষা করতে পারে। সেক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা দেশ রক্ষার সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। যে দেশ নানা ধর্মের হানাহানিতে বিভক্ত সে দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা সবসময়ই ঝুঁকির মুখে থাকে। পাকিস্তানে এখন সেই পর্যায়ে পৌঁছেছে। আমাদের এ থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

## বিভেদ, বৈষম্য, শোষণ আর ষড়যন্ত্র

পূর্ব আর পশ্চিম পাকিস্তানের মাঝে শুধু যে প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার দূরত্ব তা নয়, মানুষগুলোর ভেতরেও ছিল বিশাল দূরত্ব। তাদের চেহারা, ভাষা, খাবার, পোশাক, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সবকিছু ছিল ভিন্ন, শুধু একটি বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষগুলোর মাঝে মিল ছিল–সেটি হচ্ছে ধর্ম। এরকম বিচিত্র একটি দেশ হলে সেটি টিকিয়ে রাখার জন্যে আলাদাভাবে একটু বেশি চেষ্টা করার কথা, কিন্তু পাকিস্তানের শাসকরা সেই চেষ্টা করল না। দেশভাগের সময় পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল দুই কোটি, পূর্ব পাকিস্তানের ছিল চার কোটি, কাজেই সহজ হিসেবে বলা যায় শিক্ষাদীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, পুলিশ-মিলিটারি, সরকারি কর্মচারী-কর্মকর্তা সবকিছুতেই যদি একজন পশ্চিম পাকিস্তানের লোক থাকে, তাহলে সেখানে দুইজন পূর্ব পাকিস্তানের লোক থাকা উচিত। বাস্তবে হলো ঠিক তার উল্টা,





সবকিছুতেই পশ্চিম পাকিস্তানের ভাগ ছিল শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ। বাজেটের ৭৫% ব্যয় হতো পশ্চিম পাকিস্তানে, ২৫% ব্যয় হতো পূর্ব পাকিস্তানে, যদিও পূর্ব পাকিস্তান থেকে রাজস্ব আয় ছিল বেশি, শতকরা ৬২ ভাগ। সবচেয়ে ভয়ংকর ছিল সেনাবাহিনীর সংখ্যা, পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্যের সংখ্যা ছিল ২৫ গুণ বেশি।

## ভাষা আন্দোলন

অর্থনৈতিক নিপীড়ন থেকে অনেক বড় নিপীড়ন হচ্ছে একটি জাতির ভাষা, সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যের ওপর নিপীড়ন আর পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ঠিক সেটিই শুরু করেছিল। পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল ১৯৪৭ সালে। ১৯৪৮ সালেই পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকা এসে ঘোষণা করলেন উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। সাথে সাথে পাকিস্তানের বাঙালিরা তার প্রতিবাদ করে বিক্ষোভ শুরু করে দিল। আন্দোলন তীব্রতর হয়ে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সারা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিয়েছিল রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার এবং আরো অনেকে। তারপরেও সেই আন্দোলনকে থামানো যায়নি, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীকে শেষ পর্যন্ত ১৯৫৬ সালে বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দিতে হয়েছিল। যেখানে আমাদের ভাষাশহীদরা প্রাণ দিয়েছিলেন, সেখানে এখন আমাদের প্রিয় শহীদ মিনার, আর ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখটি শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, এখন সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।



৬ দফা আন্দোলে মুজিবের সমর্থনে পূর্বাপাকিস্তানে গণমিছিল

## সামরিক শাসন

একেবারে গোড়া থেকেই পাকিস্তানে শাসনের এক ধরনের ষড়যন্ত্র হতে থাকে, আর সেই ষড়যন্ত্রের সবচেয়ে বড় খেলোয়াড় ছিল সেনাবাহিনী। দেশের বাজেটের ৬০% ব্যয় করা

হতো সেনাবাহিনীর পিছনে। তাই তারা তাদের অর্থ, বিত্ত, ক্ষমতা, সুবিধার লোভনীয় জীবন বেসামরিক মানুষের হাতে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিল না। নানা রকম টালবাহানা করে রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের সেনাপতি আইয়ুব খান পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করে নেন। সেই ক্ষমতায় তিনি একদিন-দুইদিন ছিলেন না, ছিলেন টানা এগারো বছর। সামরিক শাসন কখনো কোথাও শুভ কিছু আনতে পারে না, সারা পৃথিবীতে একটিও উদাহরণ নেই যেখানে সামরিক শাসন একটি দেশকে এগিয়ে নিতে পেরেছে–আইয়ুব খানও পারেননি।

### ছয় দফা

দেশে সামরিক শাসন, তার ওপর পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ওপর এতরকম বঞ্চনা, কাজেই বাঙালিরা সেটি খুব সহজে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। বাঙালিদের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের তেজস্বী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের জন্যে স্বায়ত্তশাসন দাবি করে ১৯৬৬ সালে ছয় দফা ঘোষণা করলেন। ছয় দফা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের সবকরম অর্থনৈতিক শোষণ, বঞ্চনা আর নিপীড়ন থেকে মুক্তির এক অসাধারণ দলিল। তখন পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের ওপর যে রকম অত্যাচার-নির্যাতন চলছিল, তার মাঝে ছয় দফা দিয়ে স্বায়ত্তশাসনের মতো একটি দাবি তোলায় খুব সাহসের প্রয়োজন। ছয় দফার দাবি করার সাথে সাথেই আওয়ামী লীগের ছোট-বড় সব নেতাকে গ্রেপ্তার করে জেলে পুরে দেয়া হলো। শুধু তাই নয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে একটি কঠিন শাস্তি দেয়ার জন্য তাঁকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে দেশদ্রোহিতার একটি মামলার প্রধান আসামি করে দেওয়া হলো।

পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা কিছুতেই এটা মেনে নিল না এবং সারাদেশে আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। জেল-জুলুম, পুলিশ, ইপিআর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস)-এর গুলি, কিছুই বাকি থাকল না। কিন্তু সেই আন্দোলনকে থামিয়ে রাখা গেল না। আন্দোলনের নেতৃত্ব দিল ছাত্ররা, তাদের ছিল এগারো দফা দাবি। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন জেলের বাইরে, তিনিও এগিয়ে এলেন। দেখতে দেখতে সেই আন্দোলন একটি গণবিস্ফোরণে রূপ নিল কার সাধ্যি তাকে থামায়? '৬৯-এর গণআন্দোলনে প্রাণ দিয়েছিল ফুটফুটে কিশোর মতিউর, প্রাণ দিয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদ যার নামে আইয়ুব গেটের নাম হয়েছিল আসাদ গেট। পাকিস্তান সরকার শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ সব নেতাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলো। শুধু তাই নয়, প্রবল পরাক্রমশালী প্রেসিডেন্ট আইয়ুর খান পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে ক্ষমতা দিয়ে বিদায় নিল।

তারিখটি ছিল ১৯৬৯-এর ২৫ মার্চ, কেউ তখন জানত না ঠিক দুই বছর পর একই দিনে এই দেশের মাটিতে পৃথিবীর জঘন্যতম একটি গণহত্যা শুরু হবে।



## পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন

জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় এসেই পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথম সাধারণ নির্বাচন দেবার কথা ঘোষণা করে, তারিখটি শেষ পর্যন্ত ঠিক করা হয় ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর। নির্বাচনের কিছুদিন আগে ১২ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের উপকূল এলাকায় পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে গেল। এই প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় দশ লক্ষ লোক মারা গেল। এত বড় একটি ঘটনার পর পাকিস্তান সরকারের যেভাবে সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসা উচিত ছিল, তারা মোটেও সেভাবে এগিয়ে এলো না। ঘূর্ণিঝড়ের পরেও যারা কোনোভাবে বেঁচে ছিল তাদের অনেকে মারা গেল খাবার আর পানির অভাবে। ঘূর্ণিঝড়ে কষ্ট পাওয়া মানুষগুলোর প্রতি এরকম অবহেলা আর নিষ্ঠুরতা দেখে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সরকারের প্রতি বিতৃষ্ণা আর ঘৃণার ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। প্রচণ্ড ক্ষোভে মওলানা ভাসানী একটি প্রকাশ্য সভায় স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান দাবি করে একটি ঘোষণা দিয়ে দিলেন।

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বড় বড় জেনারেলের রাজনৈতিক নেতাদের জন্যে কোনো শ্রদ্ধাবোধ ছিল না। তারা ধরেই নিয়েছিল, নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না, তাই দলগুলো নিজেদের ভেতর ঝগড়াঝাটি আর কোন্দল করতে থাকবে আর সেটিকে কারণ হিসেবে দেখিয়ে সেনাবাহিনী ক্ষমতায় থেকে দেশটাকে লুটেপুটে খাবে। কাজেই নির্বাচনের ফলাফল দেখে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, ফলাফলটি ছিল অবিশ্বাস্য। পূর্ব পাকিস্তানের ১৬২ আসনের ভেতরে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটের ব্যবধানে ১৬০টি আসন পেয়েছে। যখন সকল আসনে নির্বাচন শেষ হলো তখন দেখা গেল, মনোনীত মহিলা আসনসহ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি আসনের মাঝে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি, পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর দল পিপলস পার্টি ৮৮টি এবং অন্যান্য সব দল মিলে পেয়েছে বাকি ৫৮টি আসন।

সোজা হিসাবে এই প্রথম পাকিস্তান শাসন করবে পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ। বঙ্গবন্ধু পরিষ্কার করে বলে দিলেন, তিনি ছয় দফার কথা বলে জনগণের ভোট পেয়েছেন এবং তিনি শাসনতন্ত্র রচনা করবেন ছয় দফার ভিত্তিতে, দেশ শাসিত হবে ছয় দফার ভিত্তিতে।

পাকিস্তানের সেনাবাহিনী তখনই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল, কোনোভাবেই বাঙালিদের হাতে পাকিস্তানের শাসনভার তুলে দেয়া যাবে না। নিজের অজান্তেই জেনারেল ইয়াহিয়া খান আর তার দলবল 'বাংলাদেশ' নামে নতুন একটি রাষ্ট্র জন্ম দেবার প্রক্রিয়া শুরু করে দিল।

### ষড়যন্ত্র

জেনারেলদের ষড়যন্ত্রে সবচেয়ে বড় সাহায্যকারী ছিল সেনাশাসক আইয়ুব খানের একসময়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, পশ্চিম পাকিস্তানের পিপলস পার্টির সভাপতি জুলফিকার আলী ভুট্টো। হঠাৎ করে জুলফিকার আলী ভুট্টো জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে লারকানায় 'পাখি

শিকার' করতে আমন্ত্রণ জানাল। 'পাখি শিকার' করতে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সাথে যোগ দিল পাকিস্তানের বাঘা বাঘা জেনারেল। বাঙালিদের হাতে কেমন করে ক্ষমতা না দেয়া যায় সেই ষড়যন্ত্রের নীলনকশা সম্ভবত সেখানেই তৈরি হয়েছিল। ভেতরে ভেতরে ষড়যন্ত্র চলতে থাকলেও জেনারেল ইয়াহিয়া খান বাইরে বোঝাতে চাইল না। তাই সে ১৩ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করল ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন হবে। সবাই তখন গভীর আগ্রহে সেই দিনটির জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে।

এর মাঝে ১৯৭১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাঙালিদের ভালোবাসা এবং মমতার শহীদ দিবস উদযাপিত হলো অন্য এক ধরনের উন্মাদনায়। শহীদ মিনারে সেদিন মানুষের ঢল নেমেছে, তাদের বুকের ভেতর এর মাঝেই জন্ম নিতে শুরু করেছে স্বাধীনতার স্বপ্ন। ২১ ফেব্রুয়ারিতে বাঙালিদের সেই উন্মাদনা দেখে পাকিস্তান সেনাশাসকদের মনের ভেতরে যেটুকু দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল সেটিও দূর হয়ে গেল। জুলফিকার আলী ভুট্টো ছিল সংখ্যালঘু দলে, তার ক্ষমতার অংশ পাবার কথা নয়। কিন্তু সে ক্ষমতার জন্যে বেপরোয়া হয়ে উঠল। জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের ঠিক দুই দিন আগে ১ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করে দিল। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের বুকের ভেতর ক্ষোভের যে বারুদ জমা হয়েছিল, সেখানে যেন অগ্নিস্ফূলিঙ্গ স্পর্শ করল। সারাদেশে বিক্ষোভের যে বিস্ফোরণ ঘটল তার কোনো তুলনা নেই।

## উত্তাল মার্চ

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত হয়ে গেছে–এ ঘোষণাটি যখন রেডিওতে প্রচার করা হয়েছে, তখন ঢাকা স্টেডিয়ামে পাকিস্তানের সাথে কমনওয়েলথ একাদশের খেলা চলছে। মুহূর্তের মাঝে জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, ঢাকা স্টেডিয়াম হয়ে ওঠে একটি যুদ্ধক্ষেত্র। স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, দোকান-পাট সবকিছু বন্ধ হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ পথে নেমে আসে, ঢাকা শহর দেখতে দেখতে মিছিলের নগরীতে পরিণত হয়ে যায়। মানুষের মুখে তখন উচ্চারিত হতে থাকে স্বাধীনতার গ্লোগান: 'জয় বাংলা'। 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর।'

বঙ্গবন্ধু ঢাকা এবং সারাদেশে মিলিয়ে ৫ দিনের জন্যে হরতাল ও অনির্দিষ্টকালের জন্যে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন। সেই অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান সরকারকে কোনোভাবে সাহায্য না করার কথা বলেছিলেন এবং তাঁর মুখের একটি কথায় সারা পূর্ব পাকিস্তান অচল হয়ে গেল। অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্যে কারফিউ দেয়া হলো। ছাত্র জনতা সেই কারফিউ ভেঙে পথে নেমে এলো। চারদিকে মিছিল, গ্লোগান আর বিক্ষোভ, সেনাবাহিনীর গুলিতে মানুষ মারা যাচ্ছে তারপরেও কেউ থেমে রইল না, দলে দলে সবাই পথে নেমে এলো।

২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক বটতলায় বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলার পতাকা তোলা হলো। ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের জনসভায় জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা' গানটি নির্বাচন করা হলো।





পাঁচ দিন হরতালের পর ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ভাষণ দিতে এলেন। ততদিনে পুরো পূর্ব পাকিস্তান চলছে বঙ্গবন্ধুর কথায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর ভাষণ শুনতে এসেছে, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান আক্ষরিক অর্থে একটি জনসমুদ্র। বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে ঘোষণা করলেন–'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম ভাষণ খুব বেশি দেয়া হয়নি। এই ভাষণটি সেদিন দেশের সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় অকাতরে প্রাণ দিয়ে দেশকে স্বাধীন করার শক্তি জুগিয়েছিল।



পাক হানাদারদের পরাজয় এবং বাঙালির বিজয় উল্লাস

বঙ্গবন্ধুর ডাকে একদিকে যখন সারাদেশে অসহযোগ আন্দোলন চলছে, অন্যদিকে প্রতিদিন দেশের আনাচে-কানাচে পাকিস্তান মিলিটারির গুলিতে শত শত মানুষ মারা যাচ্ছে। পাকিস্তান মিলিটারির গতিবিধি থামানোর জন্যে ছাত্র-শ্রমিক-জনতা পথে পথে ব্যারিকেড গড়ে তুলছে। সারাদেশে ঘরে ঘরে কালো পতাকার সাথে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। দেশের ছাত্র-জনতা স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য ট্রেনিং নিচ্ছে। মওলানা ভাসানী ৯ মার্চ পল্টন ময়দানের জনসভায় পরিষ্কার ঘোষণা দিয়ে বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানিরা যেন আলাদা করে তাদের শাসনতন্ত্র তৈরি করে, কারণ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ একটি স্বাধীন দেশের জন্ম দিয়ে নিজেদের শাসনতন্ত্র নিজেরাই তৈরি করে নেবে।

ঠিক এই সময় জেনারেল ইয়াহিয়া খান গণহত্যার প্রস্তুতি শুরু করে দিল। বেলুচিস্তানের কসাই নামে পরিচিত জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর করে

পাঠাল। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের কোনো বিচারপতি তাকে গভর্নর হিসেবে শপথ করাতে রাজি হলেন না। ইয়াহিয়া খান নিজে মার্চের ১৫ তারিখ ঢাকায় এসে বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার ভান করতে থাকে, এর মাঝে প্রত্যেক দিন বিমানে করে ঢাকায় সৈন্য আনা হতে থাকে। যুদ্ধজাহাজে করে অস্ত্র এসে চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর করে, অথচ জনগণের বাধার কারণে সেই অস্ত্র তারা নামাতে পারছিল না। ২১ মার্চ এই ষড়যন্ত্রে ভুট্টো যোগ দিল, সদলবলে ঢাকা পৌঁছে সে আলোচনার ভান করতে থাকে।

১৯ মার্চ জয়দেবপুরে বাঙালি সেনারা বিদ্রোহ করে বসে। তাদের থামানোর জন্যে ঢাকা থেকে যে সেনাবাহিনী পাঠানো হয় তাদের সাথে সাধারণ জনগণের সংঘর্ষে অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারায়। ২৩ মার্চ ছিল পাকিস্তান দিবস, কিন্তু সেনাবাহিনীর ক্যান্টনমেন্ট আর গভর্নমেন্ট হাউস ছাড়া বাংলাদেশে কোথাও পাকিস্তানের পতাকা খুঁজে পাওয়া গেল না। ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধুর বাসাতেও সেদিন 'আমার সোনার বাংলা' গানের সাথে সাথে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তোলা হলো।

পরদিন ২৪ মার্চ, সারা দেশে একটি থমথমে পরিবেশ। মনে হয় এই দেশের মাটি, আকাশ, বাতাস আগেই গণহত্যার খবরটি জেনে গিয়ে গভীর আশঙ্কায় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করে ছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল ১৯৭১ সালে সংঘটিত তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের সশস্ত্র সংগ্রাম, যার মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি নিধনে ঝাঁপিয়ে পড়লে একটি জনযুদ্ধের আদলে মুক্তিযুদ্ধ তথা স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা ঘটে। পঁচিশে মার্চের কাল রাতে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ঢাকায় অজস্র সাধারণ নাগরিক, ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, পুলিশ হত্যা করে। গ্রেফতার করা হয় ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাপ্রাপ্ত দল আওয়ামী লীগ প্রধান বাঙালির তৎকালীন প্রি নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। গ্রেফতারের পূর্বে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।

পরিকল্পিত গণহত্যার মুখে সারাদেশে শুরু হয়ে যায় প্রতিরোধ যুদ্ধ; জীবন বাঁচাতে প্রায় ১ কোটি মানুষ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর), ইস্ট পাকিস্তান পুলিশ, সামরিক বাহিনীর বাঙালি সদস্য এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী সাধারণ মানুষ দেশকে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর কব্জা থেকে মুক্ত করতে কয়েক মাসের মধ্যে গড়ে তোলে মুক্তিবাহিনী। গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ চালিয়ে মুক্তিবাহিনী সারাদেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশ ভারতের কাছ থেকে অর্থনৈতিক, সামরিক ও কূটনৈতিক সাহায্য লাভ করে। ডিসেম্বরের শুরুর দিকে যখন পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর পতন আনিবার্য হয়ে ওঠে, তখন পরিস্থিতিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

অতঃপর ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরিভাবে জড়িয়ে পড়ে। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণের মুখে ইতোমধ্যে পর্যুদস্ত ও হতোদ্যম





পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানের ৯৩,০০০ সৈন্যসহ আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে। এরই মাধ্যমে নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের অবসান হয়; প্রতিষ্ঠিত হয় বাঙালি জাতির প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

## পটভূমি

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতীয় উপমহাদেশ স্বাধীন হয় এবং ভারত বিভক্ত হয়ে দুটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে গঠিত হয় পাকিস্তান এবং হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় ভারত। নবগঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তান দুই হাজার মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত দুটি প্রদেশের সমন্বয়ে গঠিত হয়–পূর্ব পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ) ও পশ্চিম পাকিস্তান। ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে যোজন যোজন ব্যবধানে অবস্থিত এ দুটি অংশের মধ্যে মিল ছিল কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মে। পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই এর পূর্ব অংশ পশ্চিম অংশের তুলনায় নানাভাবে বঞ্চিত হতে থাকে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের আগ পর্যন্ত দীর্ঘ ২৩ বছর ছিল পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ-বঞ্চনার ইতিহাস।

## পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য

পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল। মোট জাতীয় বাজেটের সিংহভাগ বরাদ্দ থাকত পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য। পাকিস্তানের মূল শাসকগোষ্ঠী ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের। পশ্চিমা শাসকেরা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বিমাতাসূলভ আচরণ করতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তান চরম অর্থনৈতিক বঞ্চনার শিকার হয়। এ কারণে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ পাকিস্তান সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়ে এবং মানুষের মনে ক্ষোভ দানা বাঁধতে শুরু করে।

## ভাষা আন্দোলন : ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির গণমিছিল

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমি অনুসন্ধান করে দেখা যায়, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই শুরু হয় পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণমূলক আচরণ। কেবল অর্থনৈতিক শোষণ নয়, বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ওপরও নিপীড়ন শুরু হয় এবং এর প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয় যখন পাকিস্তানের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় এসে ঘোষণা দেন–'উর্দু এবং কেবলমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। সাথে সাথে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা এই ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষার জন্যে এই আন্দোলন তীব্রতম রূপ ধারণ করে। এদিন পুলিশের গুলিতে প্রাণ দেন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরো অনেকে। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীকে শেষ পর্যন্ত ১৯৫৬ সালে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিতে হয়। আজ পৃথিবীব্যাপী ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়।



নারী মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় মহড়া

### সামরিক অসমতা

পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতে বাঙালিরা অবহেলিত ছিল। সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন অংশে সমগ্র বাহিনীর মাত্র ৫ শতাংশ ছিল বাঙালি অফিসার এবং এদের মধ্যে অধিকাংশই প্রযুক্তিগত বা ব্যবস্থাপনার পদে ছিলেন। খুব অল্প সংখ্যক বাঙালি অফিসার আদেশদানকারী পদ লাভের সুযোগ পেতেন। পশ্চিম পাকিস্তানিরা বিশ্বাস করত বাঙালিরা পশতুন বা পাঞ্জাবিদের মতো 'সাহসী' নয়। পাকিস্তানের বাজেটের একটি বিশাল অংশ সামরিক খাতে বরাদ্দ থাকলেও পূর্ব পাকিস্তান এর সুফল সামান্যই পেত। ১৯৬৫ সালে কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বাঙালিদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি আরও বাড়িয়ে দেয়।

### রাজনৈতিক অসমতা

জনসংখ্যার দিক দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানের বৃহত্তর অংশ হওয়া সত্ত্বেও দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তান কুক্ষিগত করে রাখে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে ক্ষমতার বণ্টন পূর্ব পাকিস্তানের অনুকূল হওয়ায় পশ্চিম পাকিস্তান 'এক ইউনিট তত্ত্ব' নামে এক অভিনব ধারণার সূত্রপাত করে, যেখানে সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তান একটি প্রদেশ হিসেবে





বিবেচিত হয়। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের ভোটের ভারসাম্য আনা। মজার ব্যাপার হলো, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর পাঞ্জাব প্রদেশ প্রস্তাব করে পাকিস্তানে সরাসরি জনসংখ্যার বণ্টনের ভিত্তিতে ভোট অনুষ্ঠিত হোক, কারণ পাঞ্জাবিরা ছিল সিন্ধি, পশতুন, বালুচ বা পাকিস্তানের অন্য যে কোনো গোত্রের তুলনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। একেবারে শুরু থেকেই পাকিস্তানে শাসনের নামে ষড়যন্ত্র শুরু হয়, আর এই ষড়যন্ত্রে মূল ভূমিকা পালন করে সামরিক বাহিনী। যখনই পূর্ব পাকিস্তানের কোনো নেতা, যেমন, খাজা নাজিমুদ্দিন, মোহাম্মদ আলী বগুড়া, অথবা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হতেন, তখনই পশ্চিম পাকিস্তানিরা কোনো না কোনো অজুহাতে তাদের পদচ্যুত করত। নানা রকম টালবাহানা করে জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা দখল করে নেন এবং দীর্ঘ ১১ বছর ধরে পাকিস্তানে তার স্বৈরতান্ত্রিক শাসন চালু থাকে। পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের এই অনৈতিক ক্ষমতা দখল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দূরত্ব বাড়িয়েই চলে।

### ১৯৭০-এর সাইক্লোনের প্রতিক্রিয়া

১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর ভোলার সাইক্লোন পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রবল জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করে, সেই সাথে জোয়ারের কারণে প্রায় ৩,০০,০০০ থেকে ৫,০০,০০০ মানুষ প্রাণ হারায়। প্রাণহানির সঠিক সংখ্যা জানা না গেলেও এটিকে ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ হারিকেন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক সরকার এমন ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরও জরুরি ত্রাণকার্য পরিচালনায় গড়িমসি করে। ঘূর্ণিঝড়ের পরও যারা বেঁচে ছিল তারা মারা যায় খাবার আর পানির অভাবে। ঘূর্ণিঝড়ের এক সপ্তাহ পরে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান স্বীকার করে সরকার দুর্যোগের ভয়াবহতা বুঝতে না পারার কারণেই ত্রাণকার্য সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। ঘূর্ণিঝড়ে বিপর্যস্ত মানুষগুলোর প্রতি পাকিস্তান সরকারের এমন নিষ্ঠুরতা দেখে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ২৪ নভেম্বর এক সভায় মওলানা ভাসানী পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে অদক্ষতার অভিযোগ তোলেন এবং অবিলম্বে তার পদত্যাগ দাবি করেন। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একটি প্রাকৃতিক ঘটনা একটি দেশে গৃহযুদ্ধের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি চূড়ান্ত নাটকীয়তার মুখোমুখি হয় যখন ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় দল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। দলটি পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসন হতে ১৬৭টি আসনে জয়লাভ করে এবং ৩১৩ আসনবিশিষ্ট জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়, যা আওয়ামী লীগকে সরকার গঠনের অধিকার প্রদান করে। কিন্তু নির্বাচনে দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতাপ্রাপ্ত দল পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো শেখ মুজিবের পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বিরোধিতা করেন। তিনি প্রস্তাব করেন পাকিস্তানের দুই প্রদেশের জন্যে থাকবে দুজন প্রধানমন্ত্রী। 'এক ইউনিট কাঠামো' নিয়ে ক্ষুব্ধ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মধ্যে এরূপ অভিনব প্রস্তাব নতুন করে ক্ষোভের সঞ্চার করে। ভুট্টো এমনকি মুজিবের ৬-দফা দাবি মেনে নিতেও অস্বীকৃতি প্রকাশ করেন। মার্চের

৩ তারিখ পূর্ব ও পশ্চিম অংশের এই দুই নেতা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে সঙ্গে নিয়ে দেশের ভাগ্য নির্ধারণে ঢাকায় বৈঠকে মিলিত হন। তবে বৈঠক ফলপ্রসূ হয় না। মুজিব সারা দেশে ধর্মঘটের ডাক দেন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। এই ভাষণে তিনি ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের আগেই বাস্তবায়নের জন্য চার দফা দাবি পেশ করেন : অবিলম্বে মার্শাল ল' প্রত্যাহার করতে হবে। সামরিক বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরে যেতে হবে। নিহত ব্যক্তিদের সঠিক সংখ্যা অনুসন্ধান করতে হবে। ২৫ মার্চে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের আগে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

### মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক

সারা দেশ যখন ক্ষোভে উত্তাল, তখন ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এসে শেখ মুজিবের সাথে সরকার গঠন ও ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে আলোচনা শুরু করে। কিন্তু একই সঙ্গে সামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যা চালানোর পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। বেলুচিস্তানের কসাই হিসেবে পরিচিত জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে ঢাকায় প্রেরণ করা হয়। কিন্তু কোনো বাঙালি বিচারপতি তাকে শপথ পাঠ করাতে রাজি হন না। পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র আনা হতে থাকে। ১০ থেকে ১৩ মার্চের মধ্যে পাকিস্তান এয়ারলাইন্স তাদের সব আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বাতিল করে পূর্ব পাকিস্তানে জরুরি ভিত্তিতে 'সরকারি যাত্রী' পরিবহন করতে। এই 'সরকারি যাত্রী'দের প্রায় সবাই ছিল শাদা পোশাকে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সেনা। এমভি সোয়াত নামে গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই একটি পাকিস্তানি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে ভিড়ে। কিন্তু বন্দরের নাবিক ও শ্রমিকেরা মালামাল খালাস করতে অস্বীকার করে। ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের একটি দল বাঙালি প্রতিবাদকারীদের ওপর গুলি চালাতে অস্বীকার করে, যার মাধ্যমে শুরু হয় বাঙালি সৈনিকদের বিদ্রোহ। অনেক আশা সত্ত্বেও মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক সফল হয় না। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে বাঙালি নিধনযজ্ঞের সবুজ সংকেত প্রদান করে সন্ধ্যায় গোপনে পশ্চিম পাকিস্তান যাত্রা করে।

### ৯৭১ সালের বাংলাদেশ গণহত্যা

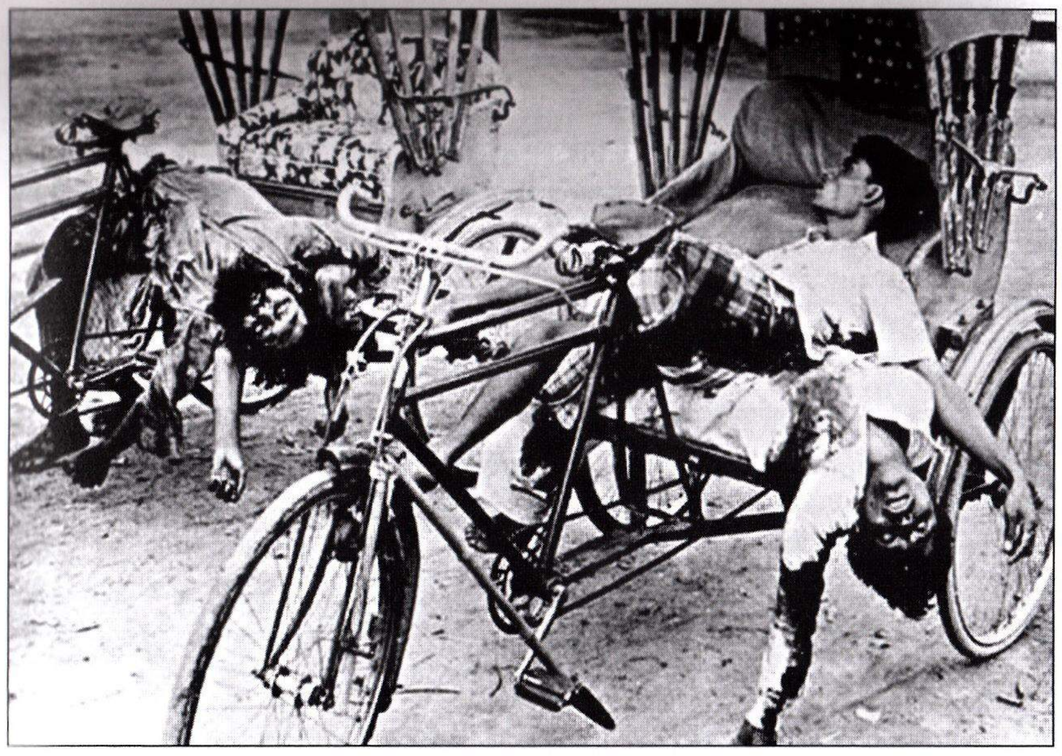
২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী শুরু করে অপারেশন সার্চলাইট নামের গণহত্যাযজ্ঞ। এশিয়া টাইমসের ভাষ্য অনুযায়ী, সামরিক বাহিনীর বড় বড় অফিসারকে নিয়ে বৈঠকে ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করে 'তিরিশ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা কর, তখন দেখবে তারা আমাদের হাত চেটে খাবে।' সে পরিকল্পনা মতোই ২৫ মার্চের রাতে পাকিস্তানি আর্মি অপারেশন সার্চলাইট আরম্ভ করে যার উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে দেয়া। এরই অংশ হিসাবে সামরিক বাহিনীর বাঙালি সদস্যদের নিরস্ত্র করে হত্যা করা হয়, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী সমাজ নিধন করা হয় এবং সারাদেশে নির্বিচারে সাধারণ মানুষ হত্যা করা হয়।

হত্যাকাণ্ডের খবর যাতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে না পৌঁছায় সে লক্ষ্যে ২৫ মার্চের আগেই বিদেশি সাংবাদিককে ঢাকা পরিত্যাগে বাধ্য করা হয়। তারপরও ব্রিটিশ সাংবাদিক





সাইমন ড্রিং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঢাকায় অবস্থান করে ওয়াশিংটন পোস্টের মাধ্যমে সারা পৃথিবীকে এই গণহত্যার খবর জানিয়েছিলেন। যদিও এই হত্যাযজ্ঞের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল ঢাকা, বাঙালি হত্যা পুরো দেশজুড়ে চালানো হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো ছিল তাদের বিশেষ লক্ষ্য। একমাত্র হিন্দু আবাসিক হল–জগন্নাথ হল পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয় পাকিস্তান সেনাবাহিনী। এতে ৬০০ থেকে ৭০০ আবাসিক ছাত্র নিহত হয়। যদিও পাকিস্তান সেনাবাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ধরনের ঠাণ্ডা মাথার হত্যাকাণ্ডের কথা অস্বীকার করেছে। তবে হামিদুর রহমান কমিশনের মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ব্যাপক শক্তি প্রয়োগ করেছিল। জগন্নাথ হল এবং অন্যান্য ছাত্র হলগুলোতে পাকিস্তানিদের হত্যাযজ্ঞের চিত্র ভিডিওটেপে ধারণ করেন তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনলজি (বর্তমান বুয়েট)-এর প্রফেসর নূরুল উল্লাহ। পুরো বাংলাদেশেই হিন্দু এলাকাগুলো বিশেষ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। মধ্যরাতের আগেই, ঢাকা পুরোপুরি জ্বলছিল, বিশেষভাবে পূর্ব দিকের হিন্দু প্রধান এলাকাগুলো। ২ আগস্ট, ১৯৭১ টাইম সাময়িকীর প্রতিবেদন অনুযায়ী, 'হিন্দু, যারা মোট রিফিউজিদের তিন-চতুর্থাংশ, পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর ক্রোধ ও আক্রোশ বহন করছিল'।



গণহত্যা ১৯৭১

# স্বাধীনতার ঘোষণা

টেক্সাসে বসবাসরত মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত নথি সংগ্রাহক মাহবুবুর রহমান জালাল বলেন, 'বিভিন্ন সূত্র ও দলিল থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী এই প্রমাণ হয় যে, ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, যা ছিল তার বা অন্য কারো হয়ে ঘোষণা দেওয়ার অনেক পূর্বে। ২৫ মার্চে মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক ভেঙে গেলে ইয়াহিয়া গোপনে ইসলামাবাদে ফিরে যান এবং গণহত্যা চালানোর পর পাকিস্তানি সেনারা সেই রাতেই বঙ্গবন্ধুসহ তার পাঁচ বিশ্বস্ত সহকারীকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের পূর্বে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা লিখে যান। মূল ঘোষণার অনুবাদ নিম্নরূপ :

'এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের মানুষকে আহ্বান জানাই, আপনারা যেখানেই থাকুন, আপনাদের সর্বস্ব দিয়ে দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ চালিয়ে যান। বাংলাদেশের মাটি থেকে সর্বশেষ পাকিস্তানি সৈন্যটিকে উৎখাত করা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের আগ পর্যন্ত আপনাদের যুদ্ধ অব্যাহত থাকুক।'

## বিভিন্ন মাধ্যমে ঘোষণাপত্র

২৫ মার্চ থেকে ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অবস্থানরত সকল সাংবাদিককে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী দুই দিন অবরুদ্ধ করে রাখে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষণা হয় যে 'শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানে সাড়ে সাত কোটি জনগণকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা দেশের নাগরিক হিসেবে ঘোষণা করেছেন'। গত তিন দশকের বেশি সময় ধরে স্বাধীনতার মূল ঘোষক কে ছিলেন তা নিয়ে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এই কারণে ১৯৮২ সালে সরকারিভাবে একটি ইতিহাস পুস্তক প্রকাশিত হয় যাতে ৩টি বিষয় উপস্থাপিত হয়। শেখ মুজিবুর রহমান একটি ঘোষণাপত্র লিখেন ২৫ মার্চ মাঝ রাত কিংবা ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে। শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণাপত্রটি ২৬ তারিখে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়। কিন্তু সীমিতসংখ্যক মানুষ সেই সম্প্রচারটি শুনেছিল। পূর্ব বাংলা রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হয়ে ২৭ মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাট থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। যা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম প্রচার করে, ফলে বিশ্ব বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে জানতে পারে। ঘোষণাটি ছিল নিম্নরূপ :

'On behalf of our great national leader, supreme commander of Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman do hereby proclaim the independence of Bangladesh. It is further proclaimed that Sheikh Mujibor Rahman is sole leader of elected representatives of 75 million people of Bangladesh. I therefore appeal on behalf of our great leader Sheikh Mujibur Rahman to the government of all democratic countries of the world specially big world part and neighboring countries to take effective steps to stop immediately.





The awful genocide that has been carried on by the army of occupation from Pakistan. The legally elected representatives of the majority of the people as repressionist, it is cruel joke and contradiction in terms which should be fool none. The guiding principle of a new step will be first neutrality, second peace and third friendship to all and anonymity to none. ? May Allah help us, Jai Bangla'

অনুবাদ :

'আমাদের মহান নেতা, বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক শেখ মুজিবুর রহমানের হয়ে আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। এটি আরও ঘোষণা করা হচ্ছে যে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি জনগণের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের একমাত্র নেতা হচ্ছেন শেখ মুজিবুর রহমান। আমি সেই কারণে আমাদের মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের হয়ে বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিশেষ করে বৃহৎ বিশ্ব ও প্রতিবেশিদের কাছে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়ার জন্য অনুরোধ করছি। পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর হামলার ফলে ভয়াবহ গণহত্যা শুরু হয়েছে। অধিকাংশ জনগণের বৈধভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নিপীড়নকারী, এটি একটি ক্রুর কৌতুক ও মিথ্যা অপবাদ যার কাউকে বোকা বানানো উচিত নয়। বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রধান পদক্ষেপগুলোর মধ্যে প্রথম হতে হবে নিরপেক্ষতা, দ্বিতীয় শান্তি এং তৃতীয় সকলের সাথে বন্ধুভাবাপন্ন ও কারো সম্বন্ধে অজ্ঞানতা নয়। আল্লাহ্ সহায় হোক, জয় বাংলা।'

## অস্থায়ী সরকার গঠন

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার-এর আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা হয় কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমা (বর্তমানে জেলা) বৈদ্যনাথতলার অন্তর্গত ভবেরপাড়া (বর্তমান মুজিবনগর) গ্রামে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে তাকে রাষ্ট্রপতি করে সরকার গঠন করা হয়। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব অর্পিত হয় তাজউদ্দীন আহমদের ওপর। বাংলাদেশের প্রথম সরকার দেশি-বিদেশি সাংবাদিকের সামনে শপথ গ্রহণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব পালন শুরু করে। এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠের মাধ্যমে ২৬ মার্চ হতে বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

১৯৭১ সালের অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ বিস্তারিত ১৯৭১ সালের অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার আগস্টের পরপরই বিপুলসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা গেরিলা পদ্ধতিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ও তাদের দোসরদের ওপর হামলা চালাতে থাকে। পাকিস্তানি সামরিক ঘাঁটি থেকে শুরু করে সামরিক স্থাপনা, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট ইত্যাদি মুক্তিযোদ্ধাদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। গেরিলা হামলায় পাকিস্তানের চৌকস সামরিক বাহিনীকে নাজেহাল করে তোলে স্বল্প দিনের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলা যোদ্ধারা। এমনকি

রাজধানী ঢাকায় ক্র্যাক প্লাটুন দুঃসাহসী সব অভিযান চালায়। ১৬ আগস্ট ১৯৭১ নৌ-কমান্ডোরা অপারেশন জ্যাকপটের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙ্গর করে থাকা পাকিস্তানি যুদ্ধজাহাজ মাইন দিয়ে ধ্বংস করে দেয়। ধীরে ধীরে বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চল শত্রুমুক্ত হতে শুরু করে।

### মুক্তিযুদ্ধ : জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর

ঢাকায় গণহত্যা চালানোর পর পাকিস্তানি বাহিনী ১০ এপ্রিলের মধ্যে সারা বাংলাদেশ নিজেদের আয়ত্তে আনার পরিকল্পনা করে। কিন্তু বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর সদস্যরা এবং ছাত্র ও সাধারণ জনতা তাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। চট্টগ্রামে বাঙালি সেনাবাহিনীর সদস্য ও ইপিআরের সদস্যরা বিদ্রোহ করে শহরের বড় অংশ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। চট্টগ্রাম শহরের নিয়ন্ত্রণ পেতে পাকিস্তানি বাহিনীকে যুদ্ধজাহাজ থেকে গোলাবর্ষণ করতে হয় এবং বিমান আক্রমণ চালাতে হয়। কুষ্টিয়া, পাবনা, বগুড়া, দিনাজপুর ইত্যাদি জেলাতেও বাঙালি সেনারা বিদ্রোহ করে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে পাকিস্তানিরা বিপুলসংখ্যক সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রের বলে মে মাসের শেষ নাগাদ এসব মুক্তাঞ্চল দখল করে নেয়।

মার্চের শেষদিক হতেই পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থক এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা বিশেষভাবে তাদের রোষের শিকার হয়। দলে দলে মানুষ ভারত সীমান্তের দিকে পালাতে শুরু করে। এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া শরণার্থীদের এই স্রোত নভেম্বর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল এবং এ সময় প্রায় এক কোটি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে।



হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রযাত্রা



## দ্বিতীয় অধ্যায়

# বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সেক্টরসমূহের তালিকা

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ের যুদ্ধগুলো ছিল পরিকল্পনাহীন ও অপ্রস্তুত। ২৬ মার্চ সারা দেশে প্রতিরোধ শুরু হয় এবং ১৭ই এপ্রিল প্রবাসী সরকার গঠিত হয়। কিন্তু অস্ত্রপাতি ও প্রশিক্ষণ–এই দুই কারণে বাংলাদেশের স্বাধীনতার লড়াই পরিকল্পিত রূপ পেতে পেতে জুন মাস পার হয়ে যায়। ১১ জুলাই বাংলাদেশের সামরিক কমান্ড তৈরি করা হয়। কর্নেল এম এ জি ওসমানীকে কমান্ডার-ইন-চিফ, লেফটেনেন্ট কর্নেল আবদুর রবকে চিফ অফ আর্মি স্টাফ এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকারকে ডেপুটি চিফ অফ আর্মি স্টাফ ও চিফ অফ এয়ার ফোর্সের দায়িত্ব দেয়া হয়। বাংলাদেশকে সর্বমোট ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয় এবং পাকিস্তান আর্মি থেকে পালিয়ে আসা অফিসারদের মধ্য থেকে প্রতিটি সেক্টরের জন্য একজন কমান্ডার নির্বাচন করা হয়। ১নং সেক্টর চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে ফেনী নদী পর্যন্ত মেজর জিয়াউর রহমান (এপ্রিল-জুন), মেজর রফিকুল ইসলাম (জুন-ডিসেম্বর) ২নং সেক্টর নোয়াখালী জেলা, কুমিল্লা জেলার আখাউড়া-ভৈরব রেললাইন পর্যন্ত এবং ফরিদপুর ও ঢাকার অংশবিশেষ মেজর খালেদ মোশাররফ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর), মেজর এ.টি.এম. হায়দার (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর)।

৩নং সেক্টর সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমা, কিশোরগঞ্জ মহকুমা, আখাউড়া-ভৈরব রেললাইন থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে কুমিল্লা ও ঢাকা জেলার অংশবিশেষ মেজর কে.এম. শফিউল্লাহ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর), মেজর এ.এন.এম. নুরুজ্জামান (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর)।

৪নং সেক্টর সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল এবং খোয়াই-শায়েস্তাগঞ্জ রেললাইন বাদে পূর্ব ও উত্তর দিকে সিলেট-ডাউকি সড়ক পর্যন্ত মেজর সি.আর. দত্ত, ৫নং সেক্টর সিলেট-ডাউকি সড়ক থেকে সিলেট জেলার সমগ্র উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চল মীর শওকত আলী।

৬নং সেক্টর সমগ্র রংপুর জেলা এবং দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও মহকুমা উইং কমান্ডার এম. কে. বাশার ৭নং সেক্টর দিনাজপুর জেলার দক্ষিণাঞ্চল, বগুড়া, রাজশাহী এবং পাবনা জেলা মেজর কাজী নুরুজ্জামান।

৮নং সেক্টর সমগ্র কুষ্টিয়া ও যশোর জেলা, ফরিদপুরের অধিকাংশ এলাকা এবং দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়কের উত্তরাংশ মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (এপ্রিল-আগস্ট), মেজর এম.এ. মনজুর (আগস্ট-ডিসেম্বর)।

৯নং সেক্টর দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়ক থেকে খুলনার দক্ষিণাঞ্চল এবং সমগ্র বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা মেজর এম.এ. জলিল (এপ্রিল-ডিসেম্বর প্রথমার্ধ), মেজর জয়নুল আবেদীন (ডিসেম্বরের অবশিষ্ট দিন)।

১০নং সেক্টর কোনো আঞ্চলিক সীমানা নেই। নৌবাহিনীর কমান্ডো দ্বারা গঠিত। শত্রুপক্ষের নৌযান ধ্বংসের জন্য বিভিন্ন সেক্টরে পাঠানো হতো।

১১নং সেক্টর কিশোরগঞ্জ মহকুমা বাদে সমগ্র ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা এবং নগরবাড়ি-আরিচা থকে ফুলছড়ি-বাহাদুরাবাদ পর্যন্ত যমুনা নদী ও তীর অঞ্চল মেজর জিয়াউর রহমান (জুন-অক্টোবর), মেজর আবু তাহের (অক্টোবর-নভেম্বর), ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এম হামিদুল্লাহ (নভেম্বর-ডিসেম্বর)।

টাঙ্গাইল সেক্টর সমগ্র টাঙ্গাইল জেলা ছাড়াও ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার অংশ নেন কাদের সিদ্দিকী।

আকাশপথ বাংলাদেশের সমগ্র আকাশসীমা গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার।

১০নং সেক্টরটি ছিল কমান্ডার ইন চিফের (সি-ইন-সি) সরাসরি তত্ত্বাবধানে, যার মধ্যে নৌ-বাহিনী ও সি-ইন-সির বিশেষ বাহিনীও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে উপযুক্ত কোনো অফিসার ছিল না বলে ১১নং সেক্টরের (নৌ সেক্টর) কোনো সেক্টর কমান্ডার ছিল না; এ সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা যখন যে সেক্টরে অপারেশন চালাতেন, তখন সে সেক্টরের সেক্টর কমান্ডারের অধীনে থাকতেন। মুক্তিযোদ্ধাদের বেশির ভাগ ট্রেনিং ক্যাম্প ছিল সীমান্ত এলাকায় এবং ভারতের সহায়তায় মুক্তিযোদ্ধারা প্রশিক্ষণ লাভ করত। সম্মুখযুদ্ধে লড়াই করার জন্য তিনটি ব্রিগেড (১১ ব্যাটালিয়ন) তৈরি করা হয়। এছাড়া প্রায় ১,০০০ মুক্তিযোদ্ধাকে গেরিলা প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশের ভেতরে নিয়মিত বিভিন্ন অপারেশনে পাঠানো হতো। আগস্ট মাস থেকে শুরু হয় ঐতিহাসিক হামলা, ইতিহাসে এ হামলা অপারেশন জ্যাকপট নামে পরিচিতও।

### মুক্তিযুদ্ধ : অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর

মুক্তিবাহিনীর তীব্র আক্রমণের মাধ্যমে সীমান্তবর্তী বর্ডার পোস্টগুলো একে একে দখল করে নিতে শুরু করে। বাংলাদেশের নিয়মিত বাহিনী কমলপুর, বিলোনিয়া, বয়রা প্রভৃতি বর্ডার পোস্টে হামলা করে এবং ৩০৭টি পোস্টের ৯০টিই দখল করে নেয়। পাশাপাশি গেরিলা বাহিনীর হামলাও তীব্রতর হয়ে ওঠে। পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার বাহিনীর নিয়মিত কাজ ছিল সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার করা এবং দেশপ্রেমিক বাঙালিদের নির্যাতন করা। সীমান্তে ও দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড আক্রমণের জবাবে তারা এ অত্যাচারের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু অক্টোবরের শেষের দিকে মুক্তিবাহিনীর প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে তারা দিনেও নিজেদের সামরিক ঘাঁটি থেকে বের হতে ভয় পেত। এমন পরিস্থিতিতে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে জরুরি ভিত্তিতে ৫ ব্যাটালিয়ন সৈন্য তলব করা হয়।

### ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ

মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণে ক্রমান্বয়ে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর অবস্থা এতটাই শোচনীয় হয়ে পড়ে যে উপায়ান্তর না দেখে ঘটনা ভিন্ন খাতে পরিচালিত করতে তারা ডিসেম্বরের ৩ তারিখ ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৭১-এর ৩ ডিসেম্বর বিকেল পাঁচটায় রেডিও পাকিস্তান সংক্ষিপ্ত এক বিশেষ সংবাদ প্রচার করে যে 'ভারত





পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্তজুড়ে আক্রমণ শুরু করেছে। বিস্তারিত খবর এখনো আসছে।' পাঁচটা ৯ মিনিটে পেশোয়ার বিমানবন্দর থেকে ১২টি যুদ্ধবিমান উড়ে যায় কাশ্মীরের শ্রীনগর ও অনন্তপুরের উদ্দেশ্যে এবং সারগোদা বিমানঘাঁটি থেকে আটটি মিরেজ বিমান উড়ে যায় অমৃতসর ও পাঠানকোটের দিকে। দুটি যুদ্ধবিমান বিশেষভাবে প্রেরিত হয় ভারত ভূখণ্ডের গভীরে আগ্রায় আঘাত করার উদ্দেশ্যে। মোট ৩২টি যুদ্ধবিমান অংশ নেয় এই আক্রমণে। ৩ ডিসেম্বর বিকেলে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড ময়দানে এক বিশাল জনসভায় বক্তৃতাদানকালে ভারতের বিভিন্ন বিমান ঘাঁটিতে পাকিস্তানের উল্লিখিত বিমান-আক্রমণ শুরু হয়। অবিলম্বে তিনি দিল্লি প্রত্যাবর্তন করেন। মন্ত্রিসভার জরুরি বৈঠকের পর মধ্যরাত্রির কিছু পরে বেতার বক্তৃতায় তিনি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে বলেন, এতদিন ধরে 'বাংলাদেশে যে যুদ্ধ চলে আসছিল তা ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরিণত হয়েছে।' ভারতও এর জবাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং তাদের পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তানের হামলা প্রতিহত করে। ভারতের সামরিক বাহিনী বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর সাথে যুক্ত হয়ে যৌথবাহিনী তৈরি করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ৪ ডিসেম্বর থেকে ভারতীয় স্থলবাহিনীর সম্মুখ অভিযান শুরু হয় চারটি অঞ্চল থেকে : ১. পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে তিন ডিভিশনের সমবায়ে গঠিত ৪র্থ কোর সিলেট-ব্রাহ্মণবাড়িয়া-কুমিল্লা-নোয়াখালী অভিমুখে; ২. উত্তরাঞ্চল থেকে দুই ডিভিশনের সমবায়ে গঠিত ৩৩তম কোর রংপুর-দিনাজপুর-বগুড়া অভিমুখে; ৩. পশ্চিমাঞ্চল থেকে দুই ডিভিশনের সমবায়ে গঠিত ২য় কোর যশোর-খুলনা-কুষ্টিয়া-ফরিদপুর অভিমুখে; এবং ৪. মেঘালয় রাজ্যের তুরা থেকে ডিভিশন অপেক্ষা কম আর একটি বাহিনী জামালপুর-ময়মনসিংহ অভিমুখে। যৌথবাহিনীর প্রবল আক্রমণের মুখে সারা দেশের সীমান্তবর্তী যুদ্ধক্ষেত্রগুলো থেকে পাকিস্তানিরা পিছু হটতে শুরু করে। একের পর এক পাকিস্তানি ঘাঁটির পতন হতে থাকে। পাকিস্তানিরা অল্প কিছু জায়গায় তাদের সামরিক শক্তি জড়ো করেছিল; যৌথবাহিনী তাদের এড়িয়ে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ঢাকার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। বাংলাদেশের আপামর জনতাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায় এগিয়ে আসে। আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ঘোষণার মাত্র ১৩ দিনের মাথায় যৌথবাহিনী ঢাকার দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়। এর আগেই বিমান হামলা চালিয়ে পাকিস্তানি বিমান বাহিনীকে পরাস্ত করে ঢাকার সকল সামরিক বিমান ঘাঁটির রানওয়ে বিধ্বস্ত করে দেওয়া হয়। তৎকালীন পাকিস্তানি উর্ধ্বতন অফিসাররা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আশ্বাস পেয়েছিল উত্তরে চীন ও দক্ষিণে আমেরিকা থেকে তাদের জন্য সহায়তা আসবে, কিন্তু বাস্তবে তার দেখা মেলে না।

### পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণ ও বিজয়

ডিসেম্বরের শুরুতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারত সরাসরিভাবে জড়িয়ে পড়ে। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণের মুখে ইতোমধ্যে পর্যুদস্ত ও হতোদ্যম পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তান ৯৩,০০০ সৈন্যসহ আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে। এরই মাধ্যমে নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের অবসান হয়; প্রতিষ্ঠিত হয় বাঙালি জাতির প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

পাকিস্তানি ইস্টার্ন কমান্ড সেনাবাহিনীর কমান্ডার, লে জেনারেল এ.এ.কে নিয়াজি, ভারত ও বাংলাদেশ বাহিনীর চিফ, অফিসার পূর্ব থিয়েটার, লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা সামনে আত্মসমর্পণের নিদর্শনপত্রে স্বাক্ষর করছেন, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১।

৯ ডিসেম্বর এক বার্তায় গভর্নর মালিক পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে জানান, 'সামরিক পরিস্থিতি নাজুক হয়ে পড়েছে। পশ্চিমে শত্রু ফরিদপুরের কাছে চলে এসেছে এবং পূর্বে লাকসাম ও কুমিল্লায় আমাদের বাহিনীকে পাশ কাটিয়ে মেঘনা নদীর ধারে পৌঁছেছে। বাইরের সাহায্য যদি না আসে, তবে শত্রু যে কোনো দিন ঢাকার উপকণ্ঠে পৌঁছে যাবে। পুনরায় আপনাকে বলছি, আশু যুদ্ধবিরতি ও রাজনৈতিক সমাধানের কথা বিবেচনা করুন।' এরপর ১০ ডিসেম্বর গভর্নরের সামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী ও মুখ্য সচিব পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসার মুজাফফর হোসেন ক্যান্টনমেন্টে জেনারেল নিয়াজির সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং ঢাকায় জাতিসংঘের প্রতিনিধির কাছে 'আত্মসমর্পণের' আবেদন হস্তান্তর করেন। এতে অবশ্য কৌশলে আত্মসমর্পণ শব্দটি বাদ দিয়ে অস্ত্রসংবরণ কথাটি ব্যবহার করা হয়। এই আবেদনে আরো লেখা ছিল–



পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণ পরবর্তী মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় উল্লাস

'যেহেতু সংকটের উদ্ভব হয়েছে রাজনৈতিক কারণে, তাই রাজনৈতিক সমাধান দ্বারা এর নিরসন হতে হবে। আমি তাই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট দ্বারা অধিকারপ্রাপ্ত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ঢাকায় সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানাই। আমি শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জাতিসংঘকে আহ্বান জানাই।'

এই আবেদন ঢাকায় জাতিসংঘের প্রতিনিধি পল মার্ক হেনরির হাতে তুলে দেওয়া হয়। পাকিস্তানি মহলে বার্তাটি মালিক-ফরমান আলী বার্তা হিসেবে পরিচিতি পায়। পরদিন তা আবার প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় সেনারা ঢাকা ঘেরাও করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে আত্মসমর্পণ করার জন্য আহবান জানায়। গভর্নর হাউসে (বর্তমান বঙ্গভবন) বোমা ফেলার কারণে গভর্নর মালেকের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তানের পদলেহী সরকারও ইতোমধ্যে পদত্যাগ করে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল (বর্তমান হোটেল রূপসী বাংলা) আশ্রয় নেয়। সময়





থাকতে শান্তিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়ে আকাশ থেকে অনবরত লিফলেট ফেলতে থাকে।

অবশেষে নিয়াজির অনুরোধে ১৫ ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে পরদিন সকাল সাড়ে ন'টা পর্যন্ত ভারতীয় বিমান আক্রমণ স্থগিত রাখা হয়। পরদিন সকালে বিমান আক্রমণ বিরতির সময়সীমা শেষ হওয়ার কিছু আগে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী জাতিসংঘের প্রতিনিধি জন কেলির মাধ্যমে ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষকে অস্থায়ী যুদ্ধবিরতির সময়সীমা আরও ছ'ঘণ্টার জন্য বাড়িয়ে দিয়ে ভারতের একজন স্টাফ অফিসার পাঠানোর অনুরোধ জানান। যাতে অস্ত্র সমর্পণের ব্যবস্থাদি স্থির করা সম্ভব হয়। এই বার্তা পাঠানোর কিছু আগে অবশ্য মেজর জেনারেল নাগরার বাহিনী কাদের সিদ্দিকী বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে মিরপুর ব্রিজে হাজির হয় এবং সেখান থেকে নাগরা নিয়াজিকে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানান। নিয়াজির আত্মসমর্পণের ইচ্ছা ব্যক্ত হওয়ার পর সকাল ১০:৪০ মিনিটে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে নাগরার বাহিনী ঢাকা শহরে প্রবেশ করে। পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণের দলিল এবং সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাদি চূড়ান্ত করার জন্য ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ডের চিফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জ্যাকব মধ্যাহ্নে ঢাকা এসে পৌঁছান। বিকেল চারটার আগেই বাংলাদেশ নিয়মিত বাহিনীর দুটি ইউনিটসহ মোট চার ব্যাটালিয়ন সৈন্য ঢাকায় প্রবেশ করে। সঙ্গে কয়েক সহস্র মুক্তিযোদ্ধা। ঢাকার জনবিরল পথঘাট ক্রমে জনাকীর্ণ হয়ে উঠতে শুরু করে 'জয় বাংলা' মুখরিত মানুষের ভিড়ে। বিকেল চারটায় ভারতের ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান ও ভারত-বাংলাদেশ যুগ্ম-কমান্ডের অধিনায়ক লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা, বাংলাদেশের ডেপুটি চিফ অব স্টাফ গ্রুপ ক্যাপ্টেন আবদুল করিম খন্দকার এবং ভারতের অপরাপর সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধিগণ ঢাকা অবতরণ করেন। কিছু পরেই ইন্দিরা গান্ধী পূর্ব ও পশ্চিম উভয় রণাঙ্গনে ভারতের পক্ষ থেকে এককভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন।

১৬ ডিসেম্বর বিকেলে রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বাংলাদেশে অবস্থিত পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর অধিনায়ক লে. জে. এ. এ. কে নিয়াজি হাজার হাজার উৎফুল্ল জনতার সামনে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন। প্রায় ৯৩,০০০ পাকিস্তানি সৈন্য আত্মসমর্পণ করে, যা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সর্ববৃহৎ আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান। বাংলাদেশের মানুষের বহু আকাঙ্ক্ষিত বিজয় ধরা দেয় যুদ্ধ শুরুর নয় মাস পর। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করলেও সারা দেশে সব পাকিস্তানিকে আত্মসমর্পণ করাতে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত হয়ে যায়। পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের দিনই সপ্তম নৌবহর প্রবেশ করে বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণতম প্রান্তে। কিন্তু বাংলাদেশ তখন পাকিস্তানের দখল থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত।

### জাতিসংঘে কূটনৈতিক তৎপরতা

৪ ডিসেম্বর ওয়াশিংটনে হেনরি কিসিঞ্জার নিরাপত্তা পরিষদের আহূত অধিবেশনে যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহারের দাবি সম্বলিত মার্কিন প্রস্তাব পেশ করার প্রস্তুতি নেন। মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর এক বিবৃতিতে উপমহাদেশের সংঘাতের জন্য মুখ্যত ভারতকে দায়ী করেন।

নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন শুরু হবার পর মার্কিন প্রতিনিধি জর্জ এইচ ডবিব্লউ বুশ অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা, ভারত ও পাকিস্তানের সৈন্য স্ব-স্ব সীমান্তের ভিতরে ফিরিয়ে নেওয়া এবং সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ মহাসচিবকে ক্ষমতা প্রদান করার জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সোভিয়েত প্রতিনিধি এই প্রস্তাবকে 'একতরফা' বলে অভিহিত করে ভেটো প্রয়োগ করেন। পোল্যান্ডও প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেয়। ফ্রান্স ও ব্রিটেন ভোট দানে বিরত থাকে। পরদিন ৫ ডিসেম্বরে নিরাপত্তা পরিষদের পুনরায় যে অধিবেশন বসে তাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের এক প্রস্তাবে বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তানে এমন এক 'রাজনৈতিক নিষ্পত্তি' প্রয়োজন, যার ফলে বর্তমান সংঘর্ষের অবসান নিশ্চিতভাবেই ঘটবে এবং পাকবাহিনীর যে সহিংসতার দরুণ পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে তাও অবিলম্বে বন্ধ করা প্রয়োজন। একমাত্র পোল্যান্ড প্রস্তাবটি সমর্থন করে। চীন ভোট দেয় বিপক্ষে। অন্য সকল সদস্য ভোটদানে বিরত থাকে। ওই দিন আরও আটটি দেশের পক্ষ থেকে যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহারের পক্ষে নিরাপত্তা পরিষদে আর একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এবার সোভিয়েত ইউনিয়ন তার দ্বিতীয় ভেটো প্রয়োগ করে। একই সময় 'তাস' মারফত এক বিবৃতিতে সোভিয়েত সরকার 'পূর্ব বাংলার জনগণের আইনসঙ্গত অধিকার ও স্বার্থের স্বীকৃতির ভিত্তিতে' সংকটের রাজনৈতিক সমাধানের দাবি জানায়। এই সংঘর্ষ সোভিয়েত সীমান্তের সন্নিকটে সংঘটিত হওয়ায় 'এর সঙ্গে সোভিয়েত নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত' উল্লেখ করে এবং পরিস্থিতির অবনতি রোধকল্পে বিবদমান পক্ষদ্বয়ের যে কোনোটির সঙ্গে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য বিশ্বের সকল দেশের প্রতি আহ্বান জানান।

## আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

৬ ডিসেম্বরে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয় বাংলাদেশ সম্পর্কে কূটনৈতিক স্বীকৃতি। বেলা এগারোটার সময় 'অল ইন্ডিয়া রেডিও' মারফত ঘোষণা করা হলো যে, ভারত বাংলাদেশকে সার্বভৌম রাষ্ট্র বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। ভারতের পার্লামেন্টের বিশেষ অধিবেশনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের প্রস্তাব উত্থাপন করে ইন্দিরা গান্ধী বলেন, "বাংলাদেশের সব মানুষের ঐক্যবদ্ধ বিদ্রোহ এবং সেই সংগ্রামের সাফল্য এটা ক্রমান্বয়ে স্পষ্ট করে তুলেছে যে, তথাকথিত মাতৃরাষ্ট্র পাকিস্তান বাংলাদেশের মানুষকে স্বীয় নিয়ন্ত্রণে ফিরিয়ে আনতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। বাংলাদেশ সরকারের বৈধতা সম্পর্কে বলা যায়, গোটা বিশ্ব এখন সচেতন যে তারা জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটায়, জনগণকে প্রতিনিধিত্বকারী অনেক সরকারই যেমনটা দাবি করতে পারবে না। গভর্নর মরিসের প্রতি জেফারসনের বহু খ্যাত উক্তি অনুসারে বাংলাদেশের সরকার সমর্থিত হচ্ছে 'পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত জাতির আকাঙ্ক্ষা বা উইল অব দ্য নেশন' দ্বারা। এই বিচারে পাকিস্তানের সামরিক সরকার, যাদের তোষণ করতে অনেক দেশই বিশেষ উদগ্রীব, এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণেরও প্রতিনিধিত্ব করে না।"

৪ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির জন্য বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ যুগ্মভাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে অনুরোধ জানিয়ে একটি পত্র প্রেরণ করেন।



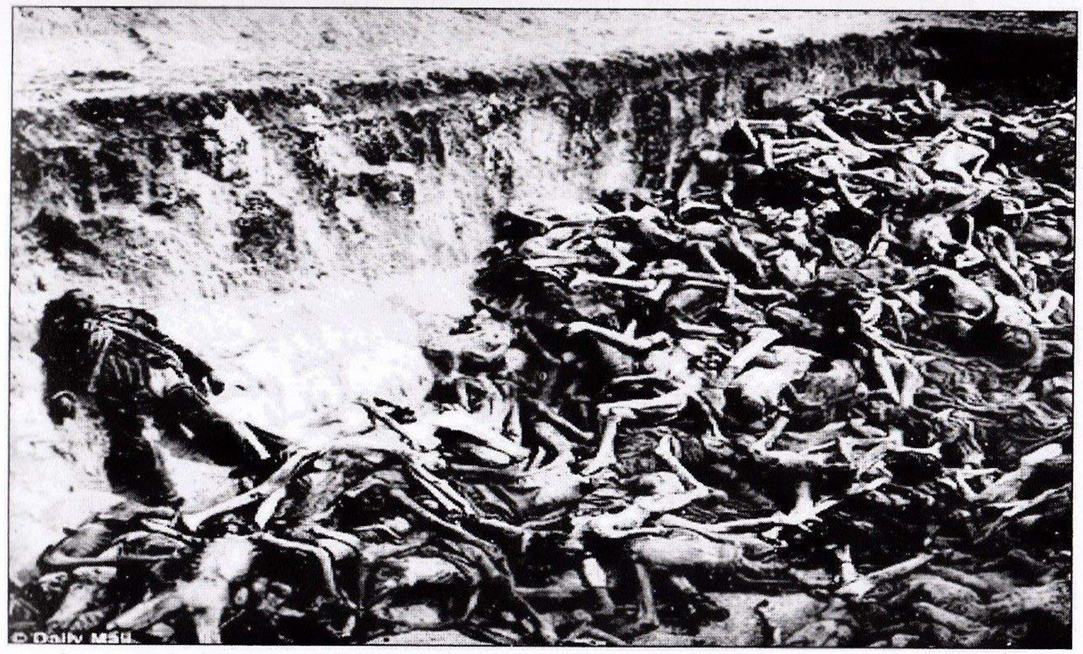


বাংলাদেশ সরকারের ৪ ডিসেম্বরের পত্রের জবাবে ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়ে যে পত্র প্রেরণ করেন তার আংশিক বঙ্গানুবাদ :

'সত্যের জয় হোক প্রধানমন্ত্রী নয়াদিল্লি ডিসেম্বর ৬, ১৯৭১ প্রিয় প্রধানমন্ত্রী, মহামান্য অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও আপনি ৪ঠা ডিসেম্বর আমাকে যে বাণী প্রেরণ করেছেন তাতে আমি ও ভারত সরকারে আমার সহকর্মীবৃন্দ গভীরভাবে অভিভূত হয়েছি। এই পত্র পাবার পর আপনার বিচক্ষণ নেতৃত্বে পরিচালিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি স্বীকৃতি প্রদানের অনুরোধ ভারত সরকার পুনরায় বিবেচনা করেছে। আমি সানন্দে জানাই যে, বর্তমানে বিরাজিত পরিস্থিতির আলোকে ভারত সরকার স্বীকৃতি অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আমি একটি অনুলিপি সংযুক্ত করছি। আপনার বিশ্বস্ত ইন্দিরা গান্ধী।'

## গণহত্যা

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশে ইতিহাসের নৃশংসতম গণহত্যা চালানো হয়। ২৫ মার্চের কালোরাতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর শুরু করা অপারেশন সার্চলাইট নামে ধ্বংসযজ্ঞ বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত চলে এবং এ নয় মাসে বাংলাদেশি কিছু ঘাতক দোসরদের সহায়তায় বিপুল পরিমাণ বাঙালি হত্যা করা হয়।




গণহত্যা ১৯৭১

ঢাকার মুজিবনগরে অবস্থিত একটি ভাস্কর্য যা পাকিস্তানি সৈন্য দ্বারা একজন বাঙালি নারীর সম্ভ্রমহানি নির্দেশ করছে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন কত মানুষ প্রাণ হারিয়েছে তা নিয়ে গণমাধ্যমে বিভিন্ন রকম পরিসংখ্যান প্রচলিত রয়েছে। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন এনাসাইক্লোপেডিয়া ও বইতে এই সংখ্যাটিকে ২,০০,০০০ থেকে শুরু করে ৩০,০০,০০০ পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধে শহীদের সংখ্যাটিকে ৩০,০০,০০০ হিসেবে অনুমান করা হয়। যুদ্ধের সময় প্রায় এক কোটি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে, যারা সে সময় দেশত্যাগ না করলে হয়তো গণহত্যার শিকার হতো। স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে ১৪ ডিসেম্বর রাজাকার আল-বদর ও আল-শামস বাহিনী পাকিস্তান আর্মির নির্দেশে বাংলাদেশের প্রায় ৩০০ জন বুদ্ধিজীবীকে–যাদের মধ্যে রয়েছেন শিক্ষক, ডাক্তার, প্রকৌশলী, শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী–ধরে নিয়ে যায় এবং নির্মমভাবে হত্যা করে। পাকিস্তানের পদলেহী বাংলাদেশি বিশ্বাসঘাতক রাজাকারের দল ডিসেম্বরের শুরুতেই যুদ্ধের পরিণতি বুঝতে পেরে স্বাধীনতার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সুপরিকল্পিতভাবে এ হত্যাকাণ্ড ঘটায়। বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে তারা সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের অগ্রগতির পথ বন্ধ করে দেওয়াই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। ১৪ ডিসেম্বরে নিহত বুদ্ধিজীবীদের লাশ বিভিন্ন গণকবরে ফেলে আসা হয়, যার মধ্যে রায়েরবাজার বধ্যভূমি অন্যতম (বর্তমানে এ বধ্যভূমিতে বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ গড়ে তোলা হয়েছে)। ঢাকা এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় পরবর্তী সময় বেশ কিছু গণকবর ও বধ্যভূমির সন্ধান পাওয়া গেছে এবং মাঝে মাঝেই এমন নতুন বধ্যভূমি আবিষ্কৃত হচ্ছে (উদাহরণস্বরূপ ঢাকায় অবাঙালি অধ্যুষিত এলাকায় ১৯৯৯ সালের আগস্ট মাসে একটি কূপের ভেতর গণকবরের সন্ধান পাওয়া যায়)। ঢাকায় অবস্থিত আমেরিকান কনসুলেটের স্টেট ডিপার্টমেন্টে পাঠানো টেলিগ্রামেও যুদ্ধ শুরুর রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও সাধারণ জনতার ওপর চালানো নৃশংস হত্যাকাণ্ডের উল্লেখ রয়েছে।

স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন বহুসংখ্যক বাঙালি নারী সম্ভ্রম হারায়; যার সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। বাংলাদেশে ধারণা করা হয় প্রায় ২,০০,০০০ নারী মুক্তিযুদ্ধের সময় ধর্ষিত হয় এবং তাদের গর্ভে অনেক যুদ্ধশিশু জন্ম নেয়। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে পাকিস্তান আর্মি বহুসংখ্যক মেয়েকে ধরে নিয়ে যায়, যাদের অধিকাংশই ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও সাধারণ পরিবারের মেয়ে।

## মুক্তিযুদ্ধ ও বিশ্বসমাজ

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমেরিকার নিক্সন সরকার পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানকে সমর্থন প্রদান করে।

অন্যদিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রতিবেশি রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের অবদান অপরিসীম। শরণার্থীদের আশ্রয় দান, প্রবাসী সরকারে গঠনে সহায়তা এবং সর্বোপরি মুক্তিবাহিনীর সংগঠন, প্রশিক্ষণ ও সমরাস্ত্র সরবরাহে ভারতের ভূমিকা ছিল প্রত্যক্ষ। ১৯৭১-এর শেষভাগে সোভিয়েত রাশিয়ার সমর্থন নিশ্চিত হওয়ার পর ভারত সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপ করে। যার ফলে এই যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হয়নি। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন মুক্তিযুদ্ধকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার হিসেবে





উল্লেখ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে তাদের কিছুই করার নেই বলে অভিমত প্রকাশ করেন। পাকিস্তানের পুরনো বন্ধু চীন কৌশলগত কারণে যুদ্ধবিরতির জন্য চাপ প্রয়োগ করেছিল। অন্যদিকে দীর্ঘ আলোচনার পর ৭ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুযায়ী সিদ্ধান্ত নিয়ে আহবান জানায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহার করতে হবে। তবে বিশ্বজনমত ছিল পূর্ব পাকিস্তানের নিরীহ মানুষের পক্ষে। পূর্ব পাকিস্তানের সংকটের বিষয়ে জাতিসংঘের অবহেলা ও নিস্পৃহতা ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়।

## স্বাধীন বাংলাদেশ

কমান্ডো বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে ধরে নিয়ে যাবার আগে তিনি বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে ঘোষণা করেন। সেই ঘোষণায় তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার আহ্বান জানিয়ে গেলেন। তাঁর ঘোষণাটি তৎকালীন ই.পি.আরের ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম হয়ে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ল। যখন ঘোষণাটি প্রচারিত হয় তখন মধ্যরাত পার হয়ে ২৬ মার্চ হয়ে গেছে, তাই আমাদের স্বাধীনতা দিবস হচ্ছে ২৬ মার্চ।

পূর্ব পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি পৃথিবীর মানচিত্র থেকে চিরদিনের জন্য মুছে গেল, জন্ম নিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। কিন্তু সেই বাংলাদেশ তখনো ব্যথাতুর, যন্ত্রণাকাতর। তার মাটিতে তখনো রয়ে গেছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিষ্ঠুর দানবেরা।

## প্রতিরোধ আর প্রতিরোধ

ঢাকা শহরে পৃথিবীর একটি নিষ্ঠুরতম হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে ২৭ মার্চ সকাল আটটা থেকে বিকেল তিনটা পর্যন্ত কারফিউ শিথিল করা হলে শহরের ভয়ার্ত নারী-পুরুষ-শিশু নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য গ্রামের দিকে ছুটে যেতে লাগল। জেনারেল টিক্কা খান ভেবেছিল সে যেভাবে ঢাকা শহরকে দখল করেছে, এভাবে সারা বাংলাদেশকে এপ্রিলের দশ তারিখের মাঝে দখল করে নেবে। কিন্তু বাস্তবে সেটি সম্ভব হলো না। বিভিন্ন এলাকা থেকে পালিয়ে আসা বাঙালি সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা, এই দেশের ছাত্র-জনতা সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল তার কোনো তুলনা নেই।

চট্টগ্রামে বাঙালি সেনাবাহিনী এবং ই.পি.আর বিদ্রোহ করে শহরের বড় অংশের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। ২৭ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে আবার স্বাধীনতা ঘোষণা পড়ে শোনান। এই ঘোষণাটি সেই সময় বাংলাদেশের সবার ভেতরে নতুন একটি অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছিল। চট্টগ্রাম শহরের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে যুদ্ধজাহাজ থেকে গোলাবর্ষণ করতে হয় এবং বিমান আক্রমণ চালাতে হয়। বাঙালি যোদ্ধাদের হাত থেকে চট্টগ্রাম শহরকে পুরোপুরি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এপ্রিল মাসের ১০ তারিখ হয়ে যায়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী কুষ্টিয়া এবং পাবনা শহর প্রথমে দখল করে নিলেও বাঙালি সৈন্যরা তাদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে শহরগুলো পুনর্দখল করে এপ্রিলের

মাঝামাঝি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখে। বগুড়া দিনাজপুরেও একই ঘটনা ঘটে। বাঙালি সৈন্যরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাত থেকে শহরগুলোকে পুনর্দখল করে নেয়। যশোরে বাঙালি সৈনদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করার সময় তারা বিদ্রোহ করে, প্রায় অর্ধেক সৈন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে প্রাণ হারালেও বাকিরা ক্যান্টনমেন্ট থেকে মুক্ত হয়ে আসতে পারে। কুমিল্লা, খুলনা ও সিলেট শহর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিজেদের দখলে রাখলেও বাঙালি সৈন্যরা তাদের আক্রমণ করে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী এই সময় পাকিস্তান থেকে দুটি ডিভিশন সৈন্য বাংলাদেশে নিয়ে আসে। এছাড়া পরবর্তী সময়ে অসংখ্য মিলিশিয়া বাহিনী আনা হয়, তার সাথে সাথে আনা হয় যুদ্ধজাহাজে করে অস্ত্র আর গোলাবারুদ। বিশাল অস্ত্রসম্ভার এবং বিমানবাহিনীর সাহায্য নিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাংলাদেশের ভেতরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। মে মাসের মাঝামাঝি তারা শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের বড় বড় শহর নিজেদের দখলে নিয়ে আসতে পারে।

পাকিস্তান সরকার ১১ এপ্রিল টিক্কা খানের পরিবর্তে জেনারেল এ.এ.কে নিয়াজিকে সশস্ত্র বাহিনীর দায়িত্ব দিয়ে পাঠায়। মুক্তিযোদ্ধারা তখন যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করার জন্যে গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে।

## শরণার্থী

২৫ মার্চের গণহত্যা শুরু করার পর বাংলাদেশে কেউই নিরাপদ ছিল না। তবে আওয়ামী লীগের কর্মী বা সমর্থক আর হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর রাগ ছিল সবচেয়ে বেশি। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে পারে এরকম তরুণেরাও সেনাবাহিনীর লক্ষ্যবস্তু ছিল। সবচেয়ে বেশি আতঙ্কের মাঝে ছিল কমবয়সী মেয়েরা। সেনাবাহিনীর সাথে সাথে বাংলাদেশের বিহারি জনগোষ্ঠীও বাঙালি নিধনে যোগ দিয়েছিল এবং তাদের ভয়ংকর অত্যাচারে এই দেশের বিশাল এক জনগোষ্ঠী পাশের দেশ ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। জাতিসংঘ কিংবা নিউজ উইকের হিসেবে মোট শরণার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় এক কোটি। সে সময় বাংলাদেশের জনসংখ্যাই ছিল মাত্র সাত কোটি যার অর্থ দেশের প্রতি সাতজন মানুষের মাঝে একজনকেই নিজের দেশ ও বাড়িঘর ছেড়ে শরণার্থী হিসেবে পাশের দেশে আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

ভারত এই বিশাল জনসংখ্যাকে আশ্রয় দিয়েছিল, কিন্তু তাদের ভরণপোষণ করতে গিয়ে প্রচণ্ড চাপের মাঝে পড়েছিল। শুনে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু আগরতলায় মোট অধিবাসী থেকে শরণার্থীর সংখ্যা ছিল বেশি। শরণার্থীদের জীবন ছিল খুবই কষ্টের, খাবার অভাব, থাকার জায়গা নেই, রোগেশোকে জর্জরিত, কলেরা ডায়ারিয়া এরকম রোগে অনেকে মারা যায়। ছোট শিশু এবং বৃদ্ধদের সবচেয়ে বেশি মূল্য দিতে হয়েছিল। দেখা গিয়েছিল, যুদ্ধ শেষে কোনো কোনো শরণার্থী ক্যাম্পে একটি শিশুও আর বেঁচে নেই।







১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধকালীন শরণার্থীদের ভারতের উদ্দেশে দেশত্যাগ

## বাংলাদেশ সরকার

একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের আকাঙ্ক্ষা এই দেশের মানুষের বুকের মাঝে জাগিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন পাকিস্তানের কারাগারে। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে যে মানুষটি এই সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন তাজউদ্দীন আহমদ। তিনি তাঁর পরিবারের সবাইকে তাঁদের নিজেদের ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে ৩০ মার্চ সীমান্ত পাড়ি দেন। তখন তাঁর সাথে অন্য কোনো নেতাই ছিলেন না, পরে তিনি তাঁদের সবার সাথে যোগাযোগ করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করেন। এপ্রিলের ১০ তারিখ মুজিবনগর থেকে ঐতিহাসিক স্বাধীনতা সনদ ঘোষণা করা হয়। এই সনদটি দিয়েই বাংলাদেশ নৈতিক এবং আইনগতভাবে স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই নতুন রাষ্ট্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি ও বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে (মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা) বাংলাদেশের প্রথম সরকার দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের সামনে শপথ গ্রহণ করে তাদের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। তাদের প্রথম দায়িত্ব বাংলাদেশের মাটিতে রয়ে যাওয়া পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করা।

## পাল্টা আঘাত

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ের যুদ্ধেগুলো ছিল পরিকল্পনাহীন এবং অপ্রস্তুত। ধীরে ধীরে মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের সংগঠিত করে পালটা আঘাত হানতে শুরু করে। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ডার ইন চিফের দায়িত্ব দেয়া হয় কর্নেল (অব) এম. আতাউল গণি

ওসমানীকে, চিফ অফ স্টাফ করা হয় লে. কর্নেল আবদুর রবকে এবং ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকারকে। পুরো বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। ১নং সেক্টরের (চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম) কমান্ডার ছিলেন প্রথমে মেজর জিয়াউর রহমান, পরে মেজর রফিকুল ইসলাম। ২নং সেক্টরের (নোয়াখালী, কুমিল্লা, দক্ষিণ ঢাকা, আংশিক ফরিদপুর) কমান্ডার প্রথমে ছিলেন মেজর খালেদ মোশাররফ, তারপর ক্যাপ্টেন আব্দুস সালেক চৌধুরী এবং সবশেষে ক্যাপ্টেন এ.টি.এম হায়দার। ৩নং সেক্টরের (উত্তর ঢাকা, সিলেট ও ময়মনসিংহের অংশবিশেষ) কমান্ডার প্রথমে ছিলেন মেজর কে.এম সফিউল্লাহ এবং তারপর মেজর এ.এন.এম. নুরুজ্জামান। ৪, ৫ এবং ৬নং সেক্টরের (যথাক্রমে দক্ষিণ সিলেট, উত্তর সিলেট এবং রংপুর, দিনাজপুর) কমান্ডার যথাক্রমে মেজর সি.আর. দত্ত, মেজর মীর শওকত আলী এবং উইং কমান্ডার এম. কে বাশার। ৭নং সেক্টরের (রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা) কমান্ডার ছিলেন মেজর নাজমুল হক, একটি গাড়ি দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যুর পর মেজর কাজী নুরুজ্জামান সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব নেন। ৮নং সেক্টরের (কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর) কমান্ডার প্রথমে ছিলেন মেজর আবু ওসমান চৌধুরী, এবং তারপর মেজর এম.এ মনজুর। ৯নং সেক্টরের (খুলনা, বরিশাল) কমান্ডার ছিলেন মেজর এম.এ. জলিল। ১০নং সেক্টর ছিল নৌ-অঞ্চলের জন্য, সেটি ছিল সরাসরি কমান্ডার ইন চিফের অধীনে। কোনো অফিসার ছিল না বলে এই সেক্টরের কোনো কমান্ডার ছিল না। নৌ-কমান্ডোরা যখন যে সেক্টরে তাদের অভিযান চালাতেন, তখন সেই সেক্টর কমান্ডারের অধীনে কাজ করতেন। এই নৌ-কমান্ডোরা অপারেশন জ্যাকপটের অধীনে একটি অবিশ্বাস্য দুঃসাহসিক অভিযানে অংশ নিয়ে আগস্টের ১৫ তারিখ চট্টগ্রামে অনেকগুলো জাহাজ মাইন দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। ১১নং সেক্টরের (টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ) কমান্ডার ছিলেন মেজর এম. আবু তাহের, নভেম্বরে একটি সম্মুখযুদ্ধে আহত হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি এর দায়িত্ব পালন করেন।

এই এগারোটি সেক্টর ছাড়াও জিয়াউর রহমান, খালেদ মোশাররফ এবং সফিউল্লাহর নেতৃত্বে তাঁদের ইংরেজি নামের আদ্যাক্ষর ব্যবহার করে জেড ফোর্স, কে ফোর্স এবং এস ফোর্স নামে তিনটি ব্রিগেড তৈরি করা হয়। এছাড়া টাঙ্গাইলে আব্দুল কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে একটি অঞ্চলভিত্তিক বাহিনী ছিল। তিনি যে শুধু কাদেরিয়া বাহিনী নামে একটি অত্যন্ত সুসংগঠিত বাহিনী গড়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেছিলেন তা নয়, এই বাহিনীকে সাহায্য করার জন্যে একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীও গড়ে তুলেছিলেন। যুদ্ধের শেষের দিকে সশস্ত্র বাহিনীর সাথে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীও যোগ দিয়েছিল এবং এই যুদ্ধে প্রথম বিমান আক্রমণের কৃতিত্বও ছিল বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর।

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান মিলিটারির নাকের ডগায় ঢাকা শহরে দুঃসাহসিক গেরিলা অপারেশন করে আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ক্র্যাক প্লাটুন নামে দুঃসাহসী তরুণ গেরিলা যোদ্ধার একটি দল।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল সত্যিকার অর্থে একটি জনযুদ্ধ। এই দেশের অসংখ্য ছাত্র-জনতা-কৃষক-শ্রমিক যোগ দেয় সমতল ও পাহাড়ি আদিবাসী মানুষ। মুক্তিযোদ্ধাদের পায়ে জুতো কিংবা গায়ে কাপড় ছিল না, প্রয়োজনীয় অস্ত্র ছিল না এমনকি যুদ্ধ করার জন্যে





প্রশিক্ষণ নেবার সময় পর্যন্ত ছিল না। খালেদ মোশাররফের ভাষায়, যুদ্ধক্ষেত্রেই তাদের প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছিল। তাদের বুকের ভেতরে ছিল সীমাহীন সাহস আর মাতৃভূমির জন্য গভীর মমতা। বাংলাদেশের নিয়মিত বাহিনী যখন প্রচলিত পদ্ধতিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেছে, তখন এই গেরিলা বাহিনী দেশের ভেতরে থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে আঘাতে আঘাতে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। তাদেরকে বাধ্য করেছে তাদের গতিবিধি নিজেদের ঘাঁটির মাঝে সীমাবদ্ধ রাখতে।

এই মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা বলে কখনো শেষ করা যাবে না। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অফিসারের নিজেদের লেখা বইয়ে একটি ছোট কাহিনী এরকম : '১৯৭১ সালের জুন মাসে রাজশাহীর রোহনপুর এলাকায় একজন মুক্তিযোদ্ধা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়েছে। শত অত্যাচারেও সে মুখ খুলছে না। তখন পাকিস্তানি মেজর তাঁর বুকে স্টেনগান ধরে বলল, 'আমাদের প্রশ্নের উত্তর দাও, তা না হলে তোমাকে আমি গুলি করে মেরে ফেলব।' নির্ভীক সেই তরুণ মুক্তিযোদ্ধা নিচু হয়ে মাতৃভূমির মাটিতে শেষবারের মতো চুমু খেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত। আমার রক্ত আমার প্রিয় দেশটাকে স্বাধীন করবে'। এই হচ্ছে দেশপ্রেম, এই হচ্ছে বীরত্ব এবং এই হচ্ছে সাহস। এদের দেখেই পাকিস্তান সেনাবাহিনী জানত এই দেশটিকে তারা কখনোই পরাজিত করতে পারবে না, আগে হোক পরে হোক, পরাজয় স্বীকার করে তাদের এই দেশ ছেড়ে যেতেই হবে।'

মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেনি। কিন্তু প্রকৃত যোদ্ধাদের মতোই অবদান রেখেছিল, সেরকম প্রতিষ্ঠানটির নাম হচ্ছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। আমাদের কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী এবং সাংস্কৃতিক কর্মীদের সাহায্যে এই বেতার কেন্দ্র বাংলাদেশের অবরুদ্ধ জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস আর অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। সেই সময়ের অনেক দেশের গান এখনো বাংলাদেশের মানুষকে উজ্জীবিত করে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অবদানের কথা আলাদা করে না বললে ইতিহাসটি অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। তাঁদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্যই মুক্তিযোদ্ধারা দেশের অভ্যন্তরে নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে যুদ্ধ করতে পেরেছেন। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নারীরা মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন, যুদ্ধাহতদের চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন, এমনকি অস্ত্র হাতে সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বীরোচিত ভূমিকা রেখেছেন।

## দেশদ্রোহীর দল

বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কোনো বন্ধু ছিল না, তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল কিছু দেশদ্রোহী। বাংলাদেশের মানুষ এদের সবাইকে নির্বাচনে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছিল, সেই দেশদ্রোহী লোকেরা ছিল কাউন্সিল মুসলিম লীগের খাজা খয়েরউদ্দিন, কনভেনশন মুসলিম লীগের ফজলুল কাদের চৌধুরী, কাইয়ুম মুসলিম লীগের খান এ সবুর খান, জামায়াতে ইসলামীর গোলাম আযম এবং নেজামে ইসলামীর মৌলভী ফরিদ আহমেদ। এদের মাঝে জামায়াতে ইসলামী নামের রাজনৈতিক দলটির কথা

আলাদা করে বলতে হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সাহায্য করার জন্যে দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকদের নিয়ে রাজাকার বাহিনী গঠন করা হয়েছিল। সেটি ছিল মূলত জামায়াতে ইসলামীরই সশস্ত্র একটি দল। সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিম পাকিস্তানের একটি রাজনৈতিক প্রতিনিধি দল জেনারেল নিয়াজির কাছে এটা নিয়ে অভিযোগ করলে জেনারেল নিয়াজি তার অধস্তন কর্মকর্তাকে এক বিশেষ নির্দেশ দেয়এ তখন থেকে রাজাকারদের আলবদর এবং আলশামস বলে ডাকতে! এই রাজাকার কিংবা আল বদর ও আল শামসের মুক্তিযোদ্ধাদের মুখোমুখি হওয়ার ক্ষমতা বা সাহস কোনোটাই ছিল না, কিন্তু পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পদলেহী হিসেবে থেকে এরা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের ওপর যে অত্যাচার এবং নির্যাতন করেছে তার অন্য কোনো নজির নেই। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এই দেশের মানুষকে চিনত না–আল বদর, আল শামস প্রকৃত অর্থ যাই হোক না কেন, বাংলাদেশের মানুষের কাছে এর চাইতে ঘৃণিত কোনো শব্দ নেই, কখনো ছিল না, কখনো থাকবে না।

## দেশের বাইরে মুক্তিযুদ্ধ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় প্রবাসী অনেক বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করেছেন। তাঁরা মুক্তিযোদ্ধা এবং বাংলাদেশ সরকারের জন্য টাকা তুলেছেন, পাকিস্তানের গণহত্যার কথা পৃথিবীকে জানিয়েছেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে জনমত তৈরি করেছেন। যাঁদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়, তাঁরা হচ্ছেন জাস্টিস আবু সায়ীদ চৌধুরী, স্থপতি এফ. আর. খান, প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস এবং প্রফেসর রেহমান সোবহান। শুধু যে বাংলাদেশের মানুষই এগিয়ে এসেছিলেন তা নয়, আগস্টের ১ তারিখ নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ারে রবিশংকর, জর্জ হ্যারিসনসহ অসংখ্য শিল্পীকে নিয়ে স্মরণাতীত কালের বৃহত্তম একটি কনসার্ট সারা পৃথিবীর বিবেককে নাড়িয়ে দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কবি অ্যালেন গিনসবার্গ শরণার্থীদের কষ্ট নিয়ে 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড' নামে যে অসাধারণ কবিতাটি রচনা করেন, সেটি এখনো মানুষের বুকে শিহরণের সৃষ্টি করে।

## পক্ষের দেশ বিপক্ষের দেশ

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যার কথা পৃথিবীতে প্রচার হওয়ার পর পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেরই সমবেদনা বাংলাদেশের পক্ষে ছিল, তবে দুটি খুব গুরুত্বপূর্ণ দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন পাকিস্তানের পক্ষে থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। একাত্তরে যদিও ইসলামের নামে বাংলাদেশের বেশির ভাগ মুসলমানকেই হত্যা করা হচ্ছিল, তারপরও পৃথিবীর প্রায় সকল মুসলিম দেশও পাকিস্তানের পক্ষে থেকে আমাদের মুক্তিসংগ্রামের বিরোধিতা করেছে। যদিও রাজনৈতিক কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার পাকিস্তানের পক্ষে ছিল, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যার দৃশ্য দেখে সে সময়কার মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্চার কে. রুড ক্ষুব্ধ হয়ে স্টেট ডিপার্টমেন্টে যে টেলিগ্রামটি পাঠিয়েছিলেন সেটি কূটনৈতিক জগতে সবচেয়ে কঠিন ভাষায় লেখা চিঠি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।





স্বাধীনতা সংগ্রামের একেবারে শেষের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সপ্তম নৌবহরের যুদ্ধজাহাজ বঙ্গোপসাগরে পাঠিয়ে দিয়েছিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়নও নিউক্লিয়ার ক্ষমতাধারী যুদ্ধজাহাজ এই এলাকায় রওনা করিয়ে দিয়েছিল। শুনে অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটি সত্যি যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে উপলক্ষ করে বিশ্বের দুই পরাশক্তি নিউক্লিয়ার অস্ত্র নিয়ে পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল।

স্বাধীনতা যুদ্ধের একেবারে শেষ মুহূর্তে যখন বাংলাদেশ এবং ভারতের যৌথবাহিনীর জয় একেবারে সুনিশ্চিত তখন সেই বিজয়ের মুহূর্তটিকে থামিয়ে দেবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বারবার জাতিসংঘের সিকিউরিটি কাউন্সিলে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেটো দিয়ে এ প্রস্তাবকে নাকচ করে আমাদের বিজয়ের পথ সুনিশ্চিত করেছিল। তবে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে যে দেশটির ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি, সেই দেশ হচ্ছে ভারত। এই দেশটি প্রায় এক কোটি শরণার্থীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিয়েছিল, আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র, প্রশিক্ষণ আর আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করেছিল। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার পর ভারত মুক্তিবাহিনীর সাথে মিত্রবাহিনী হিসেবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নেয়। এই যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রায় দেড় হাজার সৈনিক প্রাণ দিয়েছিল।

## যৌথবাহিনী

জুলাই মাসের দিকে নতুন করে যুদ্ধ শুরু করে অক্টোবর মাসের ভেতর বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী দেখতে দেখতে শক্তিশালী আর আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। তাঁরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বর্ডার আউটপোস্টগুলো নিয়মিতভাবে আক্রমণ করে দখল করে নিতে শুরু করে। গেরিলাবাহিনীর আক্রমণও অনেক বেশি দুঃসাহসী হয়ে উঠতে থাকে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এই আক্রমণের জবাব দিত রাজাকারদের নিয়ে গ্রামের মানুষের বাড়িঘর পুড়িয়ে আর স্থানীয় মানুষদের হত্যা করে। ততদিনে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙে পড়তে শুরু করেছে, তারা সহজে তাদের ঘাঁটির বাইরে যেতে চাইত না।

বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অবস্থা দেখতে দেখতে এত খারাপ হয়ে গেল যে পাকিস্তান তার সমাধান খুঁজে না পেয়ে ডিসেম্বরের তিন তারিখ ভারত আক্রমণ করে বসে। পাকিস্তানের উদ্দেশ্য ছিল, হঠাৎ আক্রমণ করে ভারতের বিমানবাহিনীকে পুরোপুরি পঙ্গু করে দেবে, কিন্তু সেটি করতে পারল না। ভারত সাথে সাথে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সাথে যৌথভাবে বাংলাদেশে তার সেনাবাহিনী নিয়ে প্রবেশ করে। বাংলাদেশের ভেতর তখন পাকিস্তানের পাঁচটি পদাতিক ডিভিশন। যুদ্ধের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী আক্রমণের জন্য তিনগুণ বেশি অর্থাৎ ১৫ ডিভিশন সৈন্য নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ভারতীয়রা মাত্র আট ডিভিশন সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ শুরু করার সাহস পেয়েছিল। কারণ তাদের সাথে ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের বাহিনী। সেই মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে এর মাঝেই পুরোপুরি অচল করে রাখতে পেরেছিল। শুধু যে মুক্তিযোদ্ধারা ছিল তা নয়, এই যুদ্ধে দেশের সাধারণ মানুষও ছিল যৌথবাহিনীর সাথে। যুদ্ধ শুরু হবার পর সেটি চলেছে মাত্র তেরো দিন। একেবারে প্রথম দিকেই বোমা মেরে এয়ারপোর্টগুলো অচল করে দেবার পর পাকিস্তান এয়ার ফোর্সের সব পাইলট পালিয়ে গেল

পাকিস্তানে। সমুদ্রে যে কয়টি পাকিস্তানি যুদ্ধজাহাজ ছিল সেগুলো ডুবিয়ে দেবার পর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাকি রইল শুধু তার স্থলবাহিনী। নিরীহ জনসাধারণ হত্যা করতে তারা অসাধারণ পারদর্শী কিন্তু সত্যিকার যুদ্ধে কেমন করে, সেটি দেখার জন্য মুক্তিযোদ্ধা এবং ভারতীয় বাহিনী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর একটি একটি করে পাকিস্তানের ঘাঁটির পতন হতে থাকল। তারা কোনোমতে প্রাণ নিয়ে অল্প কিছু জায়গায় মাটি কামড়ে পড়ে রইল। ভারতীয় বাহিনী আর মুক্তিবাহিনী তাদেরকে পাশ কাটিয়ে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় ঢাকার কাছাকাছি এসে হাজির হয়ে যায়। মেঘনা নদীতে কোনো ব্রিজ ছিল না, সাধারণ মানুষ তাদের নৌকা দিয়ে সেনাবাহিনীকে তাদের ভারী অস্ত্রসহ পার করিয়ে আনল!

ঢাকায় জেনারেল নিয়াজি এবং তার জেনারেলরা বাংলাদেশের যুদ্ধে টিকে থাকার জন্য যে দুটি বিষয়ের ওপর ভরসা করছিল, সেগুলো ছিল অত্যন্ত বিচিত্র। প্রথমত, তারা বিশ্বাস করত পশ্চিম পাকিস্তানের যুদ্ধে তারা ভারতকে এমনভাবে পর্যুদস্ত করবে যে, বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় বাহিনীর সরে যাওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর থাকবে না। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধে তাদের সাহায্য করার জন্য উত্তর দিক থেকে আসবে চীনা সৈন্য আর দক্ষিণ দিক থেকে আসবে আমেরিকান সৈন্য। কিন্তু দেখা গেল, তাদের দুটি ধারণাই ছিল পুরোপুরি ভুল। পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তে পাকিস্তানিরাই চরমভাবে পর্যুদস্ত হলো আর কোনো চীনা বা আমেরিকান সৈন্য তাদের সাহায্যে এগিয়ে এলো না!

## আত্মসমর্পণ

মুক্তিযোদ্ধা আর ভারতীয় সৈন্যরা ঢাকা ঘেরাও করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে আত্মসমর্পণ করার জন্য আহ্বান করল। গভর্নর হাউসে বোমা ফেলার কারণে তখন গভর্নর মালেক আর তার মন্ত্রীরা পদত্যাগ করে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে (বর্তমান রূপসী বাংলা) আশ্রয় নিয়েছে। ভারতীয় বিমানবাহিনী ঢাকার সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ লিফলেট ফেলেছে, সেখানে লেখা–'মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়ার আগে আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ কর।'

ঢাকার 'পরম পরাক্রমশালী' পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তখন আত্মসমর্পণ করার সিদ্ধান্ত নিল। আত্মসমর্পণের দলিলে বাংলাদেশ এবং ভারতের যৌথ নেতৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করার কথাটি দেখে একজন পাকিস্তান জেনারেল দুর্বলভাবে একবার সেখান থেকে বাংলাদেশের নামটি সরানোর প্রস্তাব করেছিল কিন্তু কেউ তার কথাকে গুরুত্ব দিল না, ইতিহাসে সত্যকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই!

১৬ ডিসেম্বর বিকেল বেলা রেসকোর্স ময়দানে হাজার হাজার মানুষের সামনে জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণ করে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটি থেকে মাথা নিচু করে বিদায় নেয়ার দলিলে স্বাক্ষর করল। যে বিজয়ের জন্যে এই দেশের মানুষ সুদীর্ঘ নয় মাস অপেক্ষা করছিল, সেই বিজয়টি এই দেশের স্বজন হারানো সাত কোটি মানুষের হাতে এসে ধরা দিল।





বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গায় পাকিস্তানের সব সৈন্য আত্মসমর্পণ করে শেষ করতে করতে ডিসেম্বরের ২২ তারিখ হয়ে গেল।



পাকিস্তান ইন্টার্ন কমান্ড সেনাবাহিনীর কমান্ডার লে জেনারেল এ.এ.কে নিয়াজি, ভারত ও বাংলাদেশ বাহিনীর চিফ, অফিসার পূর্ব থিয়েটার, লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অররার সামনে আত্মসমর্পণের নিদর্শনপত্রে স্বাক্ষর করছেন, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল ১৯৭১ সালে সংঘটিত তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের সশস্ত্র সংগ্রাম, যার মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি নিধনে ঝাঁপিয়ে পড়লে একটি জনযুদ্ধের আদলে মুক্তিযুদ্ধ তথা স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা ঘটে। পঁচিশে মার্চের কালো রাতে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ঢাকায় অজস্র সাধারণ নাগরিক, ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, পুলিশ হত্যা করে। গ্রেফতার করা হয় ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাপ্রাপ্ত দল আওয়ামী লীগ প্রধান বাঙালির তৎকালীন প্রিয়নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। গ্রেফতারের পূর্বে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। পরিকল্পিত গণহত্যার মুখে সারাদেশে শুরু হয়ে যায় প্রতিরোধযুদ্ধ; জীবন বাঁচাতে প্রায় ১ কোটি মানুষ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর), ইস্ট পাকিস্তান পুলিশ, সামরিক বাহিনীর বাঙালি সদস্য এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী সাধারণ মানুষ দেশকে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর কব্জা থেকে মুক্ত করতে কয়েক মাসের মধ্যে গড়ে তোলে মুক্তিবাহিনী। গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ চালিয়ে মুক্তিবাহিনী সারাদেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশ ভারতের কাছ থেকে অর্থনৈতিক, সামরিক ও কূটনৈতিক সাহায্য লাভ করে। ডিসেম্বরের শুরুর দিকে যখন পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর পতন আনিবার্য হয়ে ওঠে, তখন পরিস্থিতিকে ভিন্ন খাতে

প্রবাহিত করতে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। অতঃপর ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরিভাবে জড়িয়ে পড়ে। এরই মধ্যে নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের অবসান হয়; প্রতিষ্ঠিত হয় বাঙালি জাতির প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

### বিজয়ের আনন্দ দুঃখের হাহাকার

পাকিস্তানি সৈন্য আত্মসমর্পণ করার পর বিজয়ের অবিশ্বাস্য আনন্দ উপভোগ করার আগেই একটি ভয়ংকর তথ্য বাংলাদেশের সকলকে স্তম্ভিত করে দিল। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে যখন সবাই বুঝে গেছে এই যুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, সত্যি সত্যি বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে নিজের স্থান করে নিচ্ছে, সেসময় এই দেশের বিশ্বাসঘাতকের দল আল বদর বাহিনী দেশের প্রায় তিনশত শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সাংবাদিক, শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানীকে ধরে নিয়ে যায়। তাঁদের উদ্ধার করার জন্য দেশের মানুষ যখন পাগলের মতো হন্যে হয়ে খুঁজছে তখন তাদের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ রায়েরবাজার বধ্যভূমি এবং অন্যান্য জায়গায় খুঁজে পাওয়া যেতে থাকল। দেশটি যদি সত্যি সত্যি স্বাধীন হয়ে যায় তারপরেও যেন কোনোদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে, সেই ব্যাপারটি এই বিশ্বাসঘাতকের দল নিশ্চিত করে যাওয়ার জন্য এই দেশের সোনার সন্তানদের ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করেছে।

বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডে জড়িত আল বদর বাহিনীতে ছিল জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য চৌধুরী মইনুদ্দিন, আশরাফুজ্জামান খান, মতিউর রহমান নিজামী (পূর্ব পাকিস্তান আল বদর সর্বাধিনায়ক) এবং আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ (পূর্ব পাকিস্তান আল বদর বাহিনীর কেন্দ্রীয় সংগঠক)।

### আমাদের অহংকার

আমাদের মাতৃভূমির যে মাটিতে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, উপরে তাকালে যে আকাশ আমরা দেখতে পাই কিংবা নিঃশ্বাসে যে বাতাস আমরা বুকের ভেতর টেনে নিই, তার সবকিছুর জন্যই আমরা আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে ঋণী। সেই ঋণ বাঙালি জাতি কখনোই শোধ করতে পারবে না, বাঙালি কেবল তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতাটুকু প্রকাশ করার একটুখানি সুযোগ পেয়েছে তাঁদেরকে বীরত্বসূচক পদক দিয়ে সম্মানিত করে। পুরস্কারপ্রাপ্তদের মাঝে সাতজন হচ্ছেন মরণোত্তরে সবচেয়ে বড় পদকপ্রাপ্ত বীরশ্রেষ্ঠ। তাঁরা হচ্ছেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর, হামিদুর রহমান, মোস্তফা কামাল, রুহুল আমীন, মতিউর রহমান, মুন্সী আব্দুর রউফ এবং নূর মোহাম্মদ শেখ। এঁদের মাঝে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের দেহাবশেষ ছিল পাকিস্তানে এবং বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের দেহাবশেষ ছিল ভারতে। তাঁদের দুজনের দেহাবশেষই এখন বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। অন্য বীরশ্রেষ্ঠ এবং অসংখ্য শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সাথে সাথে তাঁদের দুজনকেও এখন গভীর মমতায় আলিঙ্গন করে আছে আমাদের মাতৃভূমির মাটি। ১৯৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বসূচক অবদান রাখার জন্য যাঁদের বীরত্বসূচক পদক দেওয়া হয়, তাঁদের মাঝে নারী মুক্তিযোদ্ধাও আছেন।





মুক্তিযুদ্ধের সময় এই দেশের নারীরা শুধু যে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছেন, সাহায্য সহায়তা করেছেন তা নয়, অস্ত্র হাতে পুরুষদের পাশাপাশি তাঁরা যুদ্ধও করেছেন।



**জানুয়ারি ১৯৬৯। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধুকে ট্রাইব্যুনালে জেলখানা থেকে নিয়ে যাওয়ার পথে।**

### যুদ্ধের গ্লানি

যে কোনো যুদ্ধই হচ্ছে মানবতার বিরুদ্ধে এক ধরনের নিষ্ঠুরতা। যুদ্ধের সাথে কোনোভাবে সম্পর্ক না থাকার পরও যুদ্ধের সময় অসংখ্য নিরপরাধ মানুষকে প্রাণ দিতে হয়। আমাদের দেশেও সে ধরনের ঘটনা ঘটেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশে বসবাসকারী বিহারিরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পক্ষে থেকে এক ধরনের অমানুষিক নৃশংসতায় বাঙালিদের নির্যাতন নিপীড়ন আর হত্যাকাণ্ডে অংশ নিয়েছিল। তাদের নৃশংসতার জবাবে মুক্তিযুদ্ধের আগে, পরে এবং চলাকালে অনেক বিহারিকে হত্যা করা হয়, যার ভেতরে অনেকেই ছিল নারী, শিশু কিংবা নিরপরাধ। বিহারিদের প্রায় সবাই পাকিস্তানে ফেরত যাবার ইচ্ছে প্রকাশ

করলেও পাকিস্তান সরকার তাদের নিজের দেশে নিতে আগ্রহী নয় বলে এই হতভাগ্য সম্প্রদায় দীর্ঘদিন থেকে জেনেভা ক্যাম্পে মানবেতর জীবনযাপন করে আসছে।

**গণহত্যার পরিসংখ্যান**

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বাংলাদেশের মাটিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৮০ হাজার, মিলিশিয়া বাহিনী ছিল আরো ২৫ হাজার, বেসামরিক বাহিনী প্রায় ২৫ হাজার, রাজাকার, আল বদর, আলশামস আরো ৫০ হাজার। অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ভারতীয় সেনা মিত্রবাহিনী হিসেবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগ দেয়। যুদ্ধ শেষে আত্মসমর্পণের পর প্রায় একানব্বই হাজার পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দি ভারতে স্থানান্তর করা হয়।

যুদ্ধ চলাকালে প্রায় আড়াই লক্ষ নারী পাকিস্তান সেনাবাহিনী আর তাদের পদলেহী বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহীদের নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। যুদ্ধের সময় প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি, এই এক কোটি মানুষ দেশত্যাগ না করলে তাদের প্রত্যেককেই হয়তো এই দেশে হত্যা করা হতো।

মুক্তিযুদ্ধের সময় গণহত্যা চলাকলে কতজন মানুষ মারা গিয়েছে সে সম্পর্কে গণমাধ্যমে বেশ কয়েক ধরনের সংখ্যা রয়েছে। ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড আলমানাকে সংখ্যাটি ১০ লক্ষ, নিউইয়র্ক টাইমস (২২ ডিসেম্বর ১৭৭২) অনুযায়ী ৫ থেকে ১৫ লক্ষ, কম্পটনস এনসাইক্লোপিডিয়া এবং এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা অনুযায়ী সংখ্যাটি ৩০ লক্ষ। প্রকৃত সংখ্যাটি কত, সেটি সম্ভবত কখনই জানা যাবে না। তবে বাংলাদেশের এই সংখ্যাটি ৩০ লক্ষ বলে অনুমান করা হয়।

## বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র

'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র' বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর পনেরো খণ্ডে রচিত একটি দালিলিক প্রকাশনা। এ দলিলপত্রাদি ইতিহাসবিদ অধ্যাপক মফিজুল্লাহ কবীর ও সাংবাদিক হাসান হাফিজুর রহমানের যৌথ নেতৃত্বে একটি প্রামাণ্যকরণ কমিটি কর্তৃক প্রণীত। প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠাব্যাপী বিপুলায়তন ও সংগৃহীত উপাত্ত থেকে নির্বাচন করে প্রামাণ্যকরণ কমিটি কর্তৃক অনুমোদনের পর কালপঞ্জি অনুসারে বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারের উদ্যোগে ১৯৭৩ সালে বাংলা একাডেমির মাধ্যমে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের তথ্য সংগ্রহের প্রকল্প শুরু হয়। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাসনামলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বাধীনতার ইতিহাস সংক্রান্ত একটি প্রকল্প প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর কাজ শুরু হয় ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি থেকে। তবে প্রকল্পটি সরকারি অনুমোদন লাভ করে ১৮ জুলাই ১৯৭৮-এ বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী (নং ৫১/২/৭৮/ডেব/২৬১)। এই প্রকল্পের সদস্য সচিব হাসান হাফিজুর রহমান বাংলা একাডেমি কর্তৃক ইতোপূর্বে সংগৃহীত দলিলপত্রসমূহ স্ব-উদ্যোগে গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি এরশাদ সরকারের শাসনামলে ১৯৮২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে খণ্ডগুলোর প্রকাশ শুরু হয়।

দলিল এবং তথ্য প্রামাণ্যকরণের জন্য সরকার নয় সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেন। এর গঠন কাঠামো ছিল : চেয়ারম্যান প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীর, সদস্য সচিব হাসান হাফিজুর রহমান, সদস্যবৃন্দ : প্রফেসর সালাহউদ্দীন আহমদ, প্রফেসর আনিসুজ্জামান, ড. সফর আলী আকন্দ, ড. এনামুল হক, ড. কে.এম করিম, ড. কে.এম মোহসীন ও ড. শামসুল হুদা হারুন। ইতিহাস রচনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হলে এই কমিটি শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু দলিলপত্র সংগ্রহের সীমা স্বাধীনতা যুদ্ধকেন্দ্রিক হওয়া সত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধের পশ্চাতে বিশাল পটভূমিরও রয়েছে সমান গুরুত্ব। মুক্তিযুদ্ধকে এই পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। এই পটভূমির ঘটনাবলি যাকে মুক্তি সংগ্রাম বলা যায় তার অনিবার্য পরিণতি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ। অর্থাৎ মুক্তিসংগ্রামের স্বরূপ জানা ছাড়া ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। এই কারণে দুখণ্ডে পটভূমি সংক্রান্ত দলিলপত্র প্রকাশ করা হয়েছে। প্রধানত বিশেষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ এবং বিষয়ভিত্তিকভাবে (themetic) খণ্ডগুলি পৃথক করা হয়েছে। যেমন, প্রথমখণ্ড : পটভূমি (১৯০৫-১৯৫৮); দ্বিতীয় খণ্ড : পটভূমি (১৯৫৮-১৯৭১); তৃতীয় খণ্ড : মুজিবনগর: প্রশাসন; চতুর্থ খণ্ড : মুজিবনগর: প্রবাসী বাঙালিদের তৎপরতা; পঞ্চম খণ্ড : মুজিবনগর: বেতার মাধ্যম; ষষ্ঠ খণ্ড: মুজিবনগর: গণমাধ্যম; সপ্তম খণ্ড : পাকিস্তানি দলিলপত্র (সরকারি ও বেসরকারি); অষ্টম খণ্ড : গণহত্যা, শরণার্থী শিবির ও প্রাথমিক ঘটনা; নবম খণ্ড : সশস্ত্র সংগ্রাম (১); দশম খণ্ড : সশস্ত্র সংগ্রাম (২); একাদশ খণ্ড : সশস্ত্র সংগ্রাম (৩); দ্বাদশ খণ্ড : বিদেশি প্রতিক্রিয়া, ভারত; ত্রয়োদশ খণ্ড : বিদেশি প্রতিক্রিয়া: জাতিসংঘ ও বিদেশি রাষ্ট্র; চতুর্দশ খণ্ড : বিশ্ব জনমত; পঞ্চদশ খণ্ড : সাক্ষাৎকার; এবং ষোড়শ খণ্ড : কালপঞ্জী, গ্রন্থপঞ্জী ও

নির্ঘণ্ট। তবে পরিকল্পনায় থাকলেও ষোড়শ খণ্ডটি প্রকাশিত হয়নি এবং সর্বশেষে পঞ্চদশ খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ সালে।

তবে কিছু ক্ষেত্রে খণ্ড পরিকল্পনায় পৃষ্ঠা সংখ্যার সুবিধাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, পটভূমি সংক্রান্ত দুটো খণ্ডের বিভাজনের ক্ষেত্রে এই নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের জনগণ অংশগ্রহণ করেছিলেন, প্রবাসেও বাংলাদেশ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়েছিলেন ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত বাঙালি এবং বিখ্যাত বিদেশি নাগরিকগণ। প্রকল্পের আওতায় মার্কিন কংগ্রেস, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট, সোভিয়েত ইউনিয়ন, জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ, বিশ্বব্যাংক, বিভিন্ন বেসরকারি আন্তর্জাতিক সংস্থার বহু সংখ্যক দলিল প্রামাণ্য কমিটি কর্তৃক প্রাসঙ্গিকতা ও মূল্য বিচারের পর প্রকাশিত হয়েছে। মুজিবনগর সরকার ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মূল্যবান দলিলসমূহ মোট চারটি খণ্ডে প্রকাশ করা হয়েছে।

কেন দলিলপত্র ১৯০৫ সাল থেকে শুরু করা হয়েছে তার একটি ব্যাখ্যা সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান ভূমির বৈশিষ্ট্য এবং এখানে বসবাসকারী জনগণের আকাঙ্ক্ষার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত যেসব ঘটনা, আন্দোলন ও কার্যকারণ এদেশের মানুষকে মুক্তি সংগ্রামের দিকে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করেছে, প্রধানত সেরকম প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র ও তথ্যই পটভূমি বিষয়ক দুটি খণ্ডে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের অতীত ঘাঁটতে গিয়ে সুদূর অতীতে প্রত্যাবর্তন করা হয়নি, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ থেকেই পটভূমি সংক্রান্ত দলিল তথ্যাদির সন্নিবেশন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সম্পাদকমণ্ডলীর দাবি হলো যে, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ব্যাখ্যায় এই শুরুর সীমাটি বাহুল্য বর্জিত, প্রত্যক্ষ ও যুক্তিযুক্ত।

দলিলপত্র ও তথ্যাদির বেলায় সংগ্রহের ধরন বিস্তৃততর হয়েছে। কারণ এই যুদ্ধের সাথে বাংলাদেশের মানুষ ও সমগ্র বিশ্ব জড়িত হয়ে পড়েছিল। ফলে কেবল বাংলাদেশ নয়, সমগ্র বিশ্বের বিষয়াদির প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র সংগ্রহ করে প্রকাশ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত ডায়েরি, চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার, স্মৃতিকথা, সরকারি নথিপত্র, রণকৌশল ও যুদ্ধসংক্রান্ত লিখিত তথ্যাদি, মুক্তাঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর এবং মুজিবনগর সরকারের তৎপরতা, জনসাধারণের অংশগ্রহণ, কমিটি গঠন, বিবৃতি, বিশ্বজনমত, বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী, জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার দলিলপত্র প্রকাশ করা হয়েছে। যেহেতু চারিত্র্যগত দিক থেকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি জনযুদ্ধ, যেহেতু সম্পাদকমণ্ডলীর উদ্দেশ্য ছিল সর্বসাধারণের মনোভাবের প্রতিফলন করানো এবং এজন্য গণসহযোগিতার প্রতি স্তরের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডে প্রধানত মূল দলিল সন্নিবেশিত হয়েছে। তবে যেসব দলিল ঐতিহাসিক গুরুত্ব অর্জন করেছে এবং যেগুলি বাদ দিলে ঘটনার ধারাবাহিকতা থাকে না, সেগুলি প্রকাশিত সূত্র থেকেও গ্রহণ করা হয়েছে।

দলিলপত্রাদিতে প্রকল্পের সম্পাদকমণ্ডলী নিজস্ব কোনো মন্তব্য এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেননি, বরং বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে দলিল ও তথ্যাদি বাছাই, সম্পাদনা এবং বিন্যাস করেছেন। যাতে কারো প্রতিনিধিত্ব ক্ষুণ্ন না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি





দিয়েছেন। যার যা ভূমিকা ও গুরুত্ব তা যথাযথভাবে তুলে ধরার সযত্ন প্রয়াস তাদের মধ্যে ছিল। মোট পনেরটি খণ্ডে প্রকাশিত দলিলপত্র ও তথ্যাদির একটি সাধারণ বিশ্লেষণ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৭১ সালে জনগণের মধ্যে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ছিল অনেক পরিণত ও অপ্রতিরোধ্য এবং একই কারণে জনগণের মধ্য থেকে সফল ও যোগ্যতম নেতৃত্বের অভ্যুদয় ঘটেছিল। যে কোনো মূল্যে স্বাধীনতার চিন্তা একটা সার্বভৌম দেশ ও জাতির পূর্বাপর জনস্রোতকেই সামনে তুলে ধরেছিল। এই প্রকল্পের আওতায় প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ পৃষ্ঠার দলিল সংগ্রহ করা হলেও প্রকাশ করা হয়েছে মাত্র পনের হাজারের বেশি নির্বাচিত দলিল। তারপরও সম্পাদকমণ্ডলী স্বীকার করেছেন যে, বহু দলিল ও তথ্য তাদের সংগ্রহের বাইরে থেকে গেছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি মানুষ কোনো না কোনোভাবে মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িয়ে ছিলেন। গ্রামে গ্রামে, শহরে বন্দরে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বহু ঘটনার উদ্ভব হয়েছে, বহু বীরত্বগাঁথা, সীমাহীন ত্যাগ, বিশ্বাসঘাতকতা, অত্যাচার, নিপীড়নের কাহিনি স্তরে স্তরে গড়ে উঠেছে। এর পরিমাণ অনুধাবন করা কঠিন। সারা বিশ্বজুড়েও ছিল এ সম্পর্কে সমর্থন ও প্রতিক্রিয়া এবং প্রবাসী বাঙালিদের তৎপরতা। মফিজুল্লাহ কবীর ও হাসান হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে এই বিশাল ঘটনাপ্রবাহের সমগ্রতা ধারণ করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

## মুক্তিযুদ্ধ প্রকৃতপক্ষেই জনযুদ্ধ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ প্রকৃতপক্ষেই জনযুদ্ধ। ইতিহাস প্রমাণ দেয়, স্বাধীনতা অর্জিত না হলে মুক্তির স্বর্ণদ্বারে এগিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। এই সত্যটি হৃদয়ে ধারণ করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ৭ মার্চ ১৯৭১ রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার সামনে ঘোষণা করেছিলেন–'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। তিনি বাংলাদেশ স্বাধীন করার লক্ষ্যে আজীবন সংগ্রাম করেছেন। কারাবরণ করেছেন। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন। আন্দোলনের প্রত্যেক স্তরে তার জীবনদর্শনের প্রতিফলন ঘটেছে। জনগণের প্রত্যাশা পূরণে বারবার তিনি ইতিহাসের গতিপথে অগ্রসর হয়েছেন। ইতিহাস নির্মাণ করেছেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর উপলব্ধি করলেন, এ পাকিস্তান জনগণের কোনো কল্যাণ আনতে পারবে না। ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক চেতনাকে অপসারিত করার লক্ষ্যে তিনি বাঙালি জাতিকে জাতীয়তাবাদী চেতনায় সংগঠিত করেন। প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদ মানে তা সাম্প্রদায়িকতাবিরুদ্ধ। সেই জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করেই তিনি বাঙালির আত্মপরিচয়ের সন্ধান দিয়েছেন। '৪৮ সালে তিনি বুঝতে পারলেন বাঙালিদের শোষণ ও শাসন করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাকিস্তান, যেখানে গণমানুষের অংশিদারিত্ব নেই। সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র এবং ধনিক-বণিক শ্রেণি পাকিস্তানের সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্র কব্জা করে গরিব-দুঃখী মানুষকে শোষণের শৃঙ্খলে বেঁধে ফেলেছে।

২. ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে তিনি বললেন, 'বাঙালিদের ওপর যদি এভাবে শোষণ-নির্যাতন চলতে থাকে তাহলে বাংলার তরুণেরা গেরিলা যুদ্ধ শুরু করলে আমাকে ও আমার দল আওয়ামী লীগকে আপনারা দোষ দিতে পারবেন না।' নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের ওপর ভিত্তি করে লাহোর প্রস্তাবকে সামনে রেখে

৬ দফা রচনা করেন। ৬ দফার খসড়া কপি নিয়ে আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খানের বাসায় গেলেন। ৬ দফার খসড়া কপি তার হাতে তুলে দিলেন। আতাউর রহমান খান পুরো খসড়াটি পড়লেন। তারপর শেখ মুজিবকে বললেন, '৬ দফা আমি জাতির সামনে দিতে পারব না, তাহলে আমার ফাঁসি হবে। আর তোমাকেও বলছি, তুমিও ছয় দফা প্রকাশ করো না, তাহলে তোমাকেও ফাঁসিতে যেতে হবে।' শেখ মুজিব বললেন, 'দেশ ও জাতির স্বার্থে' স্বাধীনতা ও মুক্তির লক্ষ্যে কাউকে না কাউকে ফাঁসির ঝুঁকি নিতে হবে।'

৩. ৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারতের যুদ্ধের পর ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান লাহোরে গোলটেবিল বৈঠক ডাকেন। বঙ্গবন্ধু সেখানে ৬ দফা পেশ করেন এবং এর যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেন। পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক আমলা এবং গণবিচ্ছিন্ন নেতৃবৃন্দ ৬ দফার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান অস্ত্রের ভাষায় কথা বললেন। বললেন, 'এইসব বিচ্ছিন্নতাবাদীকে কঠোর হাতে দমন করা হবে।' কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে দমানো গেল না। ৬ দফা নিয়ে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে কীভাবে শোষণ-নির্যাতন করা হচ্ছে, কীভাবে রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর বৈষম্য সৃষ্টি করা হচ্ছে তা তুলে ধরেন। ৬ দফা হয়ে দাঁড়াল বাঙালি জাতির কাছে স্বাধীনতা ও মুক্তির সনদ।

৪. সে সময় মওলানা ভাসানীকে চীনের চেয়ারম্যান মাও সেতুং 'ডন্ট ডিস্টার্ব আইয়ুব'–এই পরামর্শ দিলেন। মওলানা ভাসানী যিনি মুসলিম লীগের জুলুম-অত্যাচরের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন, নির্যাতন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন, তিনি নির্বাক ও নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। শোষিত-নিপীড়িত বাঙালি জাতির পক্ষে বঙ্গবন্ধু ছাড়া আর কেউ এগিয়ে এলেন না। ইতোমধ্যে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেরে বাংলা ইন্তেকাল করেছেন। বঙ্গবন্ধুকে লাহোরে প্রশ্ন করা হলো, বাঙালিদের পক্ষে কথা বলবে কে? বঙ্গবন্ধুর স্পষ্ট উত্তর ছিল, 'কেন আমি তো আছি।' ৬ দফা নিয়ে বঙ্গবন্ধু সারা বাংলায় চারণের বেশে ঘুরে আত্মবিস্মৃত জাতিকে জাগ্রত করলেন। আইয়ুব খান তার ডায়েরিতে লিখেছেন, '৬ দফা ছিল একটি পিন ছাড়া গ্রেনেড। এটা বিস্ফোরিত হলেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যাবে। শেখ মুজিব তাই চায়।' আগরতলা মামলায় তাকে ফাঁসি দেয়ার ষড়যন্ত্র হয়। গণঅভ্যুত্থানে বঙ্গবন্ধু কারাগার থেকে বীরের বেশে বেরিয়ে এলেন। ছাত্র নেতৃবৃন্দ তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ৬ দফার পরে কী? তিনি স্পষ্ট বলেছেন, '৬ দফা না মানলে ১ দফা অর্থাৎ স্বাধীনতা।' ১৯৬৪ সালে রাজশাহীতে তিনি আমাদের বলেছিলেন, 'আমাদের স্বাধীনতা পেতে হবে।'

৫. যেসব উগ্র বাম ঘরানার বুদ্ধিজীবী বলেন, 'জনগণের মুক্তির জন্য নয়, আওয়ামী লীগ কেবল স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছে', তাদের ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধু জাতির উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা পাঠ শেষে গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে। এই ভাষণে শোষণ-বঞ্চনার অবসান ও মুক্তিকামী মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে শোষকের হাত থেকে শোষিতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ছিনিয়ে আনার প্রত্যয়দৃপ্ত আহ্বান জানান তিনি। তিনি এও বলেছিলেন, 'গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশে একটা সামাজিক বিপ্লব ঘটানো সম্ভব এবং অন্যায়-অবিচার শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।'





তিনি অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে জাতীয়করণের কথা ঘোষণা করেন। এর মাধ্যমে ব্যাংক-বীমা কোম্পানিগুলোসহ বড় শিল্প-কারখানা জনগণের মালিকানায় আনা অত্যাবশ্যক বলে ঘোষণা দেন। ভাষণে বলেন, শ্রমিকরা শিল্প ব্যবস্থাপনায় ও মূলধন পর্যায়ে অংশিদার হবেন। একচেটিয়াবাদ ও কার্টেল প্রথা সম্পূর্ণভাবে বিলোপ করা হবে। অর্থনীতির সর্বত্র মজুরি কাঠামো ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে পুনর্বিন্যাস করতে হবে। এভাবে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা অর্জনের পাশাপাশি জনগণের মুক্তির রূপরেখা ঘোষণা করেন। যারা বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে ক্ষমতার ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে আলোচনা করছিলেন, তারা সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ না করেই ভুল তথ্যে বেখাপ্পা কথা বলেন। তারা ইতিহাস বিকৃতির দোষে দুষ্ট।

৬. পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভেতরে একটি পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র নির্মাণে একদিকে যেমন অসহযোগ আন্দোলনকে সশস্ত্র আন্দোলনের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি (৭ মার্চ ভাষণ দ্রষ্টব্য)। জাতিসংঘের চার্টার অনুযায়ী প্রথম আক্রমণকারী হিসেবে চিহ্নিত হলে বিশ্ববিবেক ও জনমত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করত। সেই সময় এ বিষয়ে স্পষ্ট উদাহরণ হলো এই যে, চীনের সমর্থনে নাইজেরিয়ার জেনারেল উজুকো বায়াফ্রা প্রদেশকে স্বাধীন করতে গেলে ১০ লাখ লোক নিহত হয় এবং বিশ্বের দেশসমূহ এই সশস্ত্র বিদ্রোহকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসেবে আখ্যা দেয়। বিশ্ববিবেক ও দেশসমূহ 'টু' শব্দ করেনি তখন। সেই অভিজ্ঞতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান সামরিক বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার পর বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পদ গ্রহণে বারবার অনুরোধ করেছেন। তার জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেছেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, বাংলার মানুষের অধিকার চাই।' এছাড়া আওয়ামী লীগ নেতা জনাব তাজউদ্দীন-কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ২৪ মার্চ যে খসড়া শাসনতন্ত্র পেশ করা হয়, পাকিস্তানের সামরিক জান্তা মনে করেছে, এটা মানলে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যাবে। এসব ঐতিহাসিক ঘটনা ও এর তাৎপর্য একচোখা আওয়ামী বিদ্বেষী বামপন্থিদের পক্ষে জানা বা বোঝা সম্ভব ছিল না। তারা শ্রেণিশত্রু খতমের বাস্তবতাহীন রাজনীতিতে বেহুঁশ ছিলেন।

৭. ইতিহাসের পরিক্রমায় জাতি হিসেবে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের প্রথমেই প্রয়োজন ছিল স্বাধীনতা অর্জন। বঙ্গবন্ধু জানতেন রাজনৈতিক স্বাধীনতাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন, একই সঙ্গে মুক্তির পথে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি বললেন, 'অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে যাবে।'

৮. বাংলাদেশ স্বাধীন হলে ১৯৭২ সালে সংবিধানের প্রস্তাবনায় লিখিত হলো, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা–যেখানে সব নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে। রক্তাক্ষরে লেখা হলো, প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণ, রাষ্ট্রীয় খাত ও সমবায়ে তাদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। ১৪ অনুচ্ছেদে লেখা হলো, কৃষক শ্রমিক মেহনতী মানুষের শোষণ মুক্তির

কথা। ১৫ অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তা ও মৌলিক চাহিদা পূরণের অঙ্গিকার। ১৬ অনুচ্ছেদে শহর ও গ্রামের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য হ্রাস ও কৃষি বিপ্লবের প্রত্যয়। ১৯ অনুচ্ছেদে লিখিত হলো সুযোগের সমতা এবং সম্পদের সুষম বণ্টনের কথা এবং ২০ অনুচ্ছেদে লেখা হলো, কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে কর্ম হচ্ছে তাদের অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয়। বিশেষভাবে লেখা হলো প্রত্যেকের যোগ্যতা অনুসারে ও প্রত্যেককে কর্ম অনুযায়ী পারিশ্রমিক প্রদানের ব্যবস্থা।

৯. এরপরও বিদ্বিষ্ট হয়ে যারা লেখেন বা বলেন, আওয়ামী লীগ জনগণের জন্য মুক্তিযুদ্ধ করেনি, তাদের স্পষ্ট ভাষায় বলতে হয়, শোষিত-বঞ্চিত গণমানুষের মুক্তির লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেসব বক্তব্য দিয়েছিলেন ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তাদের তা ভালোভাবে জেনে, শুনে, পড়ে, বুঝে এ সম্পর্কে লেখা উচিত বা কথা বলা উচিত। এ কথা সত্য যে, জাতির পিতা শ্রেণিসংগ্রাম তত্ত্বে বিশ্বাসী না থেকেও দেশের মাটি ও মানুষের প্রত্যাশা অনুযায়ী শোষণ মুক্তির মশাল হাতে এগিয়ে যান। কিন্তু এসব উগ্র চীনপন্থি, প্রতিক্রিয়াশীল ও স্বাধীনতাবিরোধী প্রতিবিপ্লবী চক্রের সহযোগিতায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে মুক্তির অভিযাত্রাকে স্তব্ধ করে দেয়া হয়।

## ৭ মার্চ বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের এক ঐতিহাসিক দিন

৭ মার্চ বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের এক ঐতিহাসিক দিন। এই দিনে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে মুক্তিকামী মানুষের এক ঐতিহাসিক দলিল।

প্রকৃতপক্ষে এ ভাষণের মাধ্যমেই সূচনা হয়েছিল আমাদের মুক্তি সংগ্রাম। এতে ছিল জাতির সম্ভাব্য ভবিষ্যতের সব ধরনের দিক নির্দেশনা। নিঃসন্দেহে ২৬ মার্চ ওই ভাষণেরই আনুষ্ঠানিক পুনরাবৃত্তি। এদিক থেকে স্বাধীনতার মহান নায়ক বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ পৃথিবীর ইতিহাসেও এক অনন্য মুক্তির সনদ।

কিন্তু দেশ স্বাধীনের ৪৩ বছর পর আজ আমরা কী দেখছি? বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্নে সেদিন ভাষণ দিয়েছিলেন এবং দেশ স্বাধীন করেছিলেন আমরা কী তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পেরেছি? না সেই সময়কার পাকিস্তানিদের মতো আজো তাদের প্রেতাত্মারা দেশের উন্নয়নের গতিকে নানা ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে আবদ্ধ করে রেখেছে। বিভিন্নভাবে বাধাগ্রস্ত করছে দেশের অগ্রযাত্রা। ফলে আজকের প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুর সেই ৭ মার্চের ভাষণ ও ভাষণের চেতনা নিয়ে আলোচনা বেশ প্রাসঙ্গিক বলেই মনে করছি।

১৯৭১ সাল আমার (লেখক) বয়স তখন ১২ বছর, রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ি। তবে বাবা বঙ্গবন্ধুর সাথে সরাসরি রাজনীতি করার কারণে আমরা দেশের সার্বিক পরিস্থিতি সহজেই অবগত থাকতাম।

প্রসঙ্গত, বহু আন্দোলন-সংগ্রামের পর ১৯৭০ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। স্বাভাবিকভাবেই তারা সরকার গঠন





করবে। কিন্তু তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তর না করে যে কোনোভাবে ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে কুক্ষিগত করার চেষ্টা করে।

বঙ্গবন্ধুর অনড় অবস্থানে পরিস্থিতি বেগতিক দেখে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে ১ মার্চ এই অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেন। এতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সারাদেশে একযোগে হরতাল পালিত হয়। তিনি ৩ মার্চ পল্টন ময়দানের বিশাল জনসভায় পূর্ব পাকিস্তানে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এতে পাকবাহিনী নির্বিচারে জনতার ওপর নির্যাতন চালায়। রক্তে রঞ্জিত হয় ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুরের রাজপথ।

মূলত এই পটভূমিতেই ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জনসভা জনসমুদ্রে পরিণত হয়। এই জনতা এবং সার্বিকভাবে সমগ্র জাতির উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণটি প্রদান করেন। এরপরের ঘটনাপ্রবাহ তো সবারই জানা।

১৯ মিনিটের ঐতিহাসিক ভাষণে বাঙালির মুক্তি সংগ্রাম ও অধিকারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক লক্ষ্যণীয়। প্রথমত: বিখ্যাত এই ভাষণটি ৭ কোটি বাঙালির স্বাধীনতা লাভের অদম্য স্পৃহাকে চাঙ্গা করেছিল। দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর সেরা ভাষণগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম, কেননা, এ ভাষণে বঙ্গবন্ধু শোষিত বাঙালিদের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তৃতীয়ত, পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকে পূর্ব-পাকিস্তানিরা যে স্বাধীনতার স্বপ্ন লালন করেছিল, সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন যে অবশ্যম্ভাবী সেটা স্পষ্ট হয়েছিল ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণে। এর সূত্র ধরেই ৭ কোটি বাঙালির প্রচেষ্টায় এনেছিল আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। চতুর্থত, ভাষণে ছিল এদেশের নিপীড়িত-শোষিত মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির দিকনির্দেশনা। পঞ্চমত, এই ভাষণের অন্যতম দিক ছিলো- অহিংস আন্দোলনের দিকনির্দেশনা–তিনি বলেছিলেন, গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেই জন্য অন্যান্য যে সমস্ত জিনিস আছে সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, ঘোড়ারগাড়ি, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে–শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তরগুলো, ওয়াপদা কোনো কিছু চলবে না।

বঙ্গবন্ধুর সেদিনের ভাষণের গুরুত্ব স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়েই বিলীন হয়ে যায়নি, বরং তাতে বর্তমান বাংলাদেশের প্রতিটি বাঙালির চলার পথের দিক-নির্দেশনা, অনুপ্রেরণা আজও চির অম্লান।

ইতোপূর্বে এ ভূখণ্ডের জনতা এক রেনেসাঁয় অংশ নিয়ে '৪৮, '৫২, '৬২, '৬৬, সবশেষে '৬৯–এ ২৩ বছর ধরে যে মহাজাগরণের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল। তার চূড়ান্ত পরিণতি হয় ১৯৭১ এ।

কিন্তু দেশ স্বাধীনের ৪৪ বছর পর আমরা কী দেখছি–রাজনীতি ও আন্দোলনের নামে চলছে সহিংসতা, অধিকার আদায়ের নামে অধিকার হরণ, জনগণের স্বার্থ রক্ষার নামে

নিজেদের রক্ষায় সন্ত্রাস-নৈরাজ্য, নিজ দেশের নাগরিককে নৃশংসভাবে পেট্রোল বোমায় পুড়িয়ে এবং ধারালো অস্ত্রের ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হচ্ছে। অর্থাৎ মানুষের রক্তে গড়ে ওঠা গণতন্ত্রকে হত্যার এক মহোৎসব।

গত দুই মাস ধরে বিরোধী জোটের টানা হরতাল-অবরোধে মানুষের ব্যবসা-বাণিজ্য, লেখাপড়া সবকিছুই বন্ধ। বোমা-পেট্রোলের আগুনে জ্বলছে যানবাহন, পুড়ছে সম্পদ, বোমায় ঝলসে হতাহত হচ্ছে শত শত মানুষ। মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে চলছে দগ্ধ মানুষের আর্তনাদ। কোনো মতেই যেন থামছে না তাদের এই খেলা। আর আমরা মানুষের আকাশভারী করা আর্তনাদ সহ্য করে যাচ্ছি। একবিংশ শতাব্দীর এই সভ্য সমাজে এমন নৃশংস হত্যা সন্ত্রাস-নৈরাজ্য দেখছি আমরা!

এই অপরাজনীতির বোমার আগুনে ঝলসে ইতোমধ্যে ৬২ জন নিরীহ মানুষ মারা গেছে। কয়েক শত মানুষ বোমার আঘাতে ঝলসে অসহ্য মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। এছাড়া ১৩১৭টি যানবাহন ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে।

শুধু তাই নয়, সরকারি হিসেবে ইতোমধ্যে ক্ষতি হয়েছে ১ লাখ ২০ হাজার কোটি টাকা। কোমলমতি শিশুদের পরীক্ষা বারবার পেছানো হচ্ছে। ১৫ লাখ পরীক্ষার্থী চরম আতঙ্কের মধ্যে সপ্তাহের শুধু শুক্রবার-শনিবারে পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে।

এর আগেও অনেক আন্দোলন হয়েছে। বিভিন্ন দল মিলে দীর্ঘ কয়েক বছর স্বৈরাচারি শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে। কিন্তু তখন তো এভাবে বোমায় পুড়িয়ে মারা হয়নি নিরপরাধ মানুষকে। তখনও তো পাবলিক পরীক্ষা হয়েছে। কিন্তু এমন তো দেখেনি দেশবাসী।

কিন্তু এই বোমা-ককটেল ও হিংস্রতার হানাহানি দেখে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম শিক্ষার্থীরা কী শিখবে রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে? মানবতা কিংবা দেশ-জাতির স্বার্থের চেয়েও যেন ক্ষমতার স্বাদটাই বেশি উপভোগ করতে চাচ্ছেন ওরা। ক্ষমতার স্বাদ এতটাই প্রিয় যে, দেশ জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী হতে হবে!

এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, বেগম খালেদা জিয়ার আদেশে, পরামর্শে কিংবা প্ররোচনায় তাঁর দলের ছেলেরা বাসে, ট্রাকে, লঞ্চে আগুনবোমা ছুড়ছে। মানুষ মরছে। বোমা ছুড়তে গিয়ে ধরা পড়ছে পুলিশের হাতে তার দল ও জোটের লোকেরাই।

মিডিয়ায় দেখেছি খালেদা জিয়া মুখে মানুষের অধিকার ও গণতন্ত্রের কথা বলেন, মানবতার কথা বলেন। অথচ তাঁরই দেয়া কর্মসূচিতে বোমা মেরে মানুষ হত্যা করে উল্লাস করছে। তিনি কি তাঁর দলের লোকেদের বোমা বানাতে বা বোমা ছুড়তে নিষেধ করেছেন? এই যে চোখের সামনে মানুষকে আগুনে ঝলসে দেয়া হচ্ছে, পুড়িয়ে মারা হচ্ছে, তিনি কি কেঁদেছেন কারো জন্য? তিনি কি অনুশোচনা করেছেন, দুঃখ করেছেন, কাউকে হাসপাতালে দেখতে গেছেন, বন্ধ করেছেন হত্যার খেলা? না করেননি। কারণ তিনি ভেবেছেন এভাবেই মানুষের জানমাল জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিলেই তাঁর পক্ষে ক্ষমতায় যাওয়া সম্ভব।

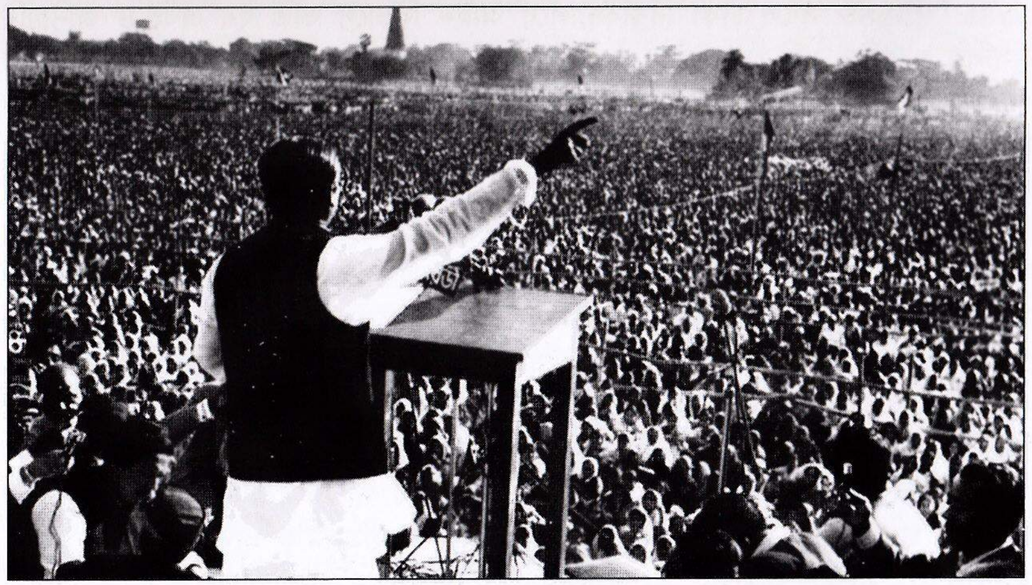
আর আগুন-বোমায় মারা যাওয়া মানুষের বেশির ভাগই গরিব-দুঃখী। ওই গরিব মানুষগুলো কারো না কারো সন্তান। ওদের রোজগারেই হয়তো সংসার চলত। ওদের





মৃত্যুতে পরিবারগুলোর কত সর্বনাশ হয়েছে। জ্বলে যাওয়া পুড়ে যাওয়া মানুষগুলো আর ফিরে পাবে না তাদের আগের স্বাভাবিক জীবন। হয়তো পঙ্গু হয়ে বাকি জীবন বেঁচে থাকতে হবে। যদি প্রশ্ন করি–ওদের এই পরিণতির জন্য দায়ী কে? অবশ্যই সবার কাছ থেকে জবাব মিলবে, এর জন্য দায়ী আজকের রাজনৈতিক হানাহানি। এভাবেই ওরা অসহায় নিরপরাধ মানুষকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে পঙ্গু করে মেরে ক্ষমতার গদি দখল করতে চান। আমরা এ ধরনের পুড়িয়ে মানুষ মারার অপরাজনীতির ধিক্কার জানাই। ঘৃণা করি ওইসব সন্ত্রাস-অপরাধ নির্ভর রাজনীতিবিদদের।

আজও বঙ্গবন্ধুর নামটি উচ্চারিত হলে শ্রদ্ধায় হৃদয় বিনয়াবনত। যেন অনুভব করি, আজও বজ্র কণ্ঠে ঘোষণা করছেন–'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণ যতবার শুনি ততবার নতুন করে শিহরণ অনুভূত হয়। বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে আমাদেরকে শিখিয়েছিলেন সহনশীলতা, পরমতসহিষ্ণুতা। দিয়েছিলেন ন্যায়ের পক্ষে জীবন বাজি রাখার প্রেরণা। বিশ্বের সব বাঙালিকে তার অমোঘ ঘোষণার মাধ্যমে শিখিয়েছিলেন কীভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ এবং অন্যায়কে প্রতিহত করতে হবে। বঙ্গবন্ধু তার বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলেছিলেন এই বলে, 'আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়, তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল–প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো, তোমাদের যা কিছু আছে, তা দিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।'



১৯৭১-এর ৭ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্দানে জনতার উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু

প্রকৃত বিচারে ৭ মার্চের ভাষণের হাত ধরেই আমরা পেয়েছিলাম স্বাধীনতা, একটি স্বাধীন ভূখণ্ড-বাংলাদেশ। জাতি হিসেবে আমরা অকৃতজ্ঞ, বঙ্গবন্ধুকে ও তাঁর আদর্শকে যথাযথভাবে ধারণ করতে পারিনি। অথচ বিশ্ববাসী তাকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে একটুও ভুল করেনি। তার ৭ মার্চের ভাষণটি স্থান পেয়েছে দুনিয়া কাঁপানো ভাষণগুলোর শীর্ষের দিকে। এমন কি স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে আজও পৃথিবীর কোনো মহান নেতা

সংক্ষিপ্ত সময়ে এত তাৎপর্যমণ্ডিত ভাষণ দিতে পারেননি। রাজনৈতিক গবেষণা সংস্থা ইউএসবি (USB) বঙ্গবন্ধুকে 'World political poet' উপাধিতে ভূষিত করেছে। সুতরাং ৭ মার্চের ভাষণের প্রেরণায় উজ্জীবিত হোক গোটা দেশ, সমগ্র বাঙালি সমাজ। স্বাধীনতা অর্জনের মানসে উৎসর্গিত ত্রিশ লাখ শহীদের বুকের তাজা খুন এবং দুই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রম যেন বৃথা না যায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্বাধীন দেশের ১৬ কোটি মানুষ যেন হাতে হাত রেখে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে পারি, এই হোক ২০১৫ সালের ৭ মার্চের প্রারম্ভে দাঁড়িয়ে ঐতিহাসিক ৭ মার্চের শিক্ষা এবং আমাদের শপথ।

তাই ২০ দলীয় জোটের নেতানেত্রীদের প্রতি আহবান রাখব–অবিলম্বে মানুষ মারার রাজনীতি, হানাহানি বন্ধ করেন, অহিংস গণতান্ত্রিক পথে ফিরে আসুন। অন্যথা দেশবাসী আপনাদের ক্ষমা করবে না। সরকারের প্রতি আহ্বান জানাব–মানুষের জানমালের নিরাপত্তার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। ফলে যারাই এ ধরনের অপরাধ করুক না কেন তা কঠোর হস্তে দমন করুন এবং অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে শাস্তি নিশ্চিত করুন। সেই সাথে দেশবাসীকে এসব সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ৭ মার্চের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে আবারো সোচ্চার ও শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি।

**জাতির জনকের জেল জীবন**

১৯৪৮ : ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন এবং ৪ জানুয়ারি মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন আইন পরিষদে 'পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেবে' বলে ঘোষণা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে বঙ্গবন্ধু এর প্রতিবাদ জানান। খাজা নাজিমউদ্দিনের বক্তব্যে সারাদেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। শেখ মুজিব মুসলিম লীগের এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রসূতি গ্রহণের জন্য কর্মতৎপরতা শুরু করেন। বঙ্গবন্ধু ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করেন। ২ মার্চ বাংলা ভাষা প্রশ্নে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ফজলুল হক মুসলিম হলে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাবক্রমে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। সংগ্রাম পরিষদ বাংলা ভাষা নিয়ে মুসলিম লীগের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ১১ মার্চ সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। ১১ মার্চ বাংলা ভাষার দাবিতে ধর্মঘট পালনকালে বঙ্গবন্ধু সহকর্মীদের সাথে সচিবালয়ের সামনে বিক্ষোভরত অবস্থায় গ্রেফতার হন। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারে সারাদেশে ছাত্রসমাজ প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। মুসলিম লীগ সরকার ছাত্রদের আন্দোলনের চাপে বঙ্গবন্ধুসহ গ্রেফতারকৃত ছাত্র নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। বঙ্গবন্ধু ১৫ মার্চ মুক্তিলাভ করেন। বঙ্গবন্ধু মুক্তি লাভের পর ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ছাত্র-জনতার সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় বঙ্গবন্ধু সভাপতিত্ব করেন। সভায় পুলিশ হামলা চালায়। পুলিশি হামলার প্রতিবাদে সভা থেকে বঙ্গবন্ধু ১৭ মার্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালনের আহ্বান জানান। ১১ সেপ্টেম্বর ফরিদপুরে কর্ডন প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য তাকে গ্রেফতার করা হয়।





১৯৪৯ -১৯৫২ : ১৯৪৯ সালের ২১ জানুয়ারি শেখ মুজিব কারাগার থেকে মুক্তি পান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা তাদের দাবি-দাওয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে ধর্মঘট ঘোষণা করলে বঙ্গবন্ধু ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন জানান। কর্মচারীদের এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার অভিযোগে ২৯ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অযৌক্তিকভাবে তাকে জরিমানা করে। তিনি এ অন্যায় নির্দেশ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হন। ১৯ এপ্রিল উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করার কারণে গ্রেপ্তার হন। ২৩ জুন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয় এবং জেলে থাকা অবস্থায় বঙ্গবন্ধু এ দলের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। জুলাই মাসের শেষের দিকে মুক্তিলাভ করেন। জেল থেকে বেরিয়েই দেশে বিরাজমান প্রকট খাদ্য সংকটের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করতে থাকেন। সেপ্টেম্বরে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের দায়ে গ্রেপ্তার হন ও পরে মুক্তিলাভ করেন। ১১ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের সভায় নূরুল আমিনের পদত্যাগ দাবি করেন।

১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি খাজা নাজিমউদ্দিন ঘোষণা করেন 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু'। এর প্রতিবাদে বন্দি থাকা অবস্থায় ২১ ফেব্রুয়ারিকে রাজবন্দি মুক্তি এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি দিবস হিসেবে পালন করার জন্য বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রতি আহ্বান জানান। ১৪ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু এ দাবিতে জেলখানায় অনশন শুরু করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ছাত্র সমাজ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করে। মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে সালাম, বরকত, রফিক, শফিউর শহীদ হন। বঙ্গবন্ধু জেলখানা থেকে এক বিবৃতিতে ছাত্র মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। একটানা ১৩ দিন অনশন অব্যাহত রাখেন। জেলখানা থেকে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার দায়ে তাকে ঢাকা জেলখানা থেকে ফরিদপুর জেলে সরিয়ে নেয়া হয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি ফরিদপুর জেল থেকে তিনি মুক্তিলাভ করেন।

১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি খাজা নাজিমউদ্দিন ঘোষণা করেন 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু'। এর প্রতিবাদে বন্দি থাকা অবস্থায় ২১ ফেব্রুয়ারিকে রাজবন্দি মুক্তি এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি দিবস হিসেবে পালন করার জন্য বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রতি আহ্বান জানান। ১৪ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু এ দাবিতে জেলখানায় অনশন শুরু করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ছাত্র সমাজ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করে। মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে সালাম, বরকত, রফিক, শফিউর শহীদ হন। বঙ্গবন্ধু জেলখানা থেকে এক বিবৃতিতে ছাত্র মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। একটানা ১৩ দিন অনশন অব্যাহত রাখেন। জেলখানা থেকে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার দায়ে তাকে ঢাকা জেলখানা থেকে ফরিদপুর জেলে সরিয়ে নেয়া হয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি ফরিদপুর জেল থেকে তিনি মুক্তিলাভ করেন।

১৯৫৪ : ১৯৫৪ সালের ১০ মার্চ প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ২৩৭টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট লাভ করে ২২৩ আসন। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ পায় ১৪৩টি আসন। বঙ্গবন্ধু গোপালগঞ্জের আসনে মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা ওয়াহিদুজ্জামানকে ১৩ হাজার ভোটে পরাজিত করে নির্বাচিত হন। ১৫ মে বঙ্গবন্ধু প্রাদেশিক সরকারের কৃষি ও বনমন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন। ৩০ মে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করে দেয়। ৩০ মে

বঙ্গবন্ধু করাচি থেকে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং গ্রেফতার হন। ২৩ ডিসেম্বর তিনি মুক্তিলাভ করেন।

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ১১ অক্টোবর বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয় এবং একের পর এক মিথ্যা মামলা দায়ের করে হয়রানি করা হয়। প্রায় চৌদ্দ মাস জেলখানায় থাকার পর তাকে মুক্তি দিয়ে তাকে পুনরায় জেলগেটেই গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬১ সালের ৭ ডিসেম্বর হাইকোর্টে রিট আবেদন করে তিনি মুক্তিলাভ করেন। সামরিক শাসন ও আইয়ুববিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু গোপন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। এ সময়ই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য বিশিষ্ট ছাত্র নেতৃবৃন্দের দ্বারা 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' নামে একটি গোপন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

**১৯৬২ :** ১৯৬২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়। ২ জুন চার বছরের সামরিক শাসনের অবসান ঘটলে ১৮ জুন বঙ্গবন্ধু মুক্তিলাভ করেন।

**১৯৬৪-১৯৬৫ :** ১৯৬৪ সালের ২৫ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে অনুষ্ঠিত এক সভায় আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। এই সভায় দেশের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটের মাধ্যমে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি ও সাধারণ মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায় সম্বলিত প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১১ মার্চ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়। দাঙ্গার পর আইয়ুব বিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য বঙ্গবন্ধু উদ্যোগ গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ১৪ দিন পূর্বে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬৫ সালে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও আপত্তিকর বক্তব্য প্রদানের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয় এবং তাকে এক বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে হাইকোর্টের নির্দেশে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে তিনি মুক্তিলাভ করেন।

**১৯৬৬ :** ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলসমূহের জাতীয় সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি পেশ করেন। প্রস্তাবিত ৬ দফা ছিল বাঙালি জাতির মুক্তি সনদ। ১ মার্চ বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। বঙ্গবন্ধু ৬ দফার পক্ষে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সারা বাংলায় গণসংযোগ সফর শুরু করেন। এ সময় তাকে সিলেট, ময়মনসিংহ ও ঢাকায় বারবার গ্রেফতার করা হয়। বঙ্গবন্ধু এ বছরের প্রথম তিন মাসে আটবার গ্রেফতার হন। ৮ মে নারায়ণগঞ্জে পাটকল শ্রমিকদের জনসভায় বক্তৃতা শেষে তাকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়। ৭ জুন বঙ্গবন্ধু ও আটক নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে সারাদেশে ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘটের সময় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গীতে পুলিশের গুলিতে শ্রমিকসহ বেশ কয়েকজন নিহত হয়।





**১৯৬৮-১৯৬৯**

১৯৬৮ সালের ৩ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে এক নম্বর আসামি করে মোট ৩৫ জন বাঙালি সেনা ও সিএসপি অফিসারের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ এনে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। ১৭ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় জেল গেট থেকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনাসিবাসে আটক রাখা হয়। বঙ্গবন্ধুসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত আসামিদের মুক্তির দাবিতে সারা দেশে বিক্ষোভ শুরু হয়। ১৯ জুন ঢাকা সেনানিবাসে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামিদের বিচার কার্য শুরু হয়। ১৯৬৯ সালের ৫ জানুয়ারি ৬ দফাসহ ১১ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলন গণআন্দোলনে পরিণত হয়। পরে ১৪৪ ধারা ও কারফিউ ভঙ্গ, পুলিশ-ইপিআরের গুলিবর্ষণ, বহু হতাহতের মধ্য দিয়ে গণঅভ্যুত্থানে রূপ নিলে আইয়ুব সরকার ১ ফেব্রুয়ারি গোলটেবিল বৈঠকের আহ্বান জানায় এবং বঙ্গবন্ধুকে প্যারোলে মুক্তিদান করা হবে বলে ঘোষণা দেয়। বঙ্গবন্ধু প্যারোলে মুক্তিদান প্রত্যাখ্যান করেন। ২২ ফেব্রুয়ারি জনগণের অব্যাহত চাপের মুখে কেন্দ্রীয় সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য আসামিকে মুক্তিদানে বাধ্য হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ময়দানে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুকে সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। প্রায় ১০ লাখ ছাত্র জনতার এই সংবর্ধনা সমাবেশে শেখ মুজিবুর রহমানকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানের ভাষণে ছাত্র সমাজের ১১ দফা দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান।

৫ ডিসেম্বর শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু পূর্ববাংলার নামকরণ করেন 'বাংলাদেশ'। তিনি বলেন, "এদেশের বুক হইতে, মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে 'বাংলা' কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকুও চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইতেছে। ... একমাত্র 'বঙ্গোপসাগর' ছাড়া আর কোনো কিছুর নামের সঙ্গে 'বাংলা' কথাটির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ... জনগণের পক্ষ হইতে আমি ঘোষণা করিতেছি–আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম 'পূর্ব পাকিস্তানে'র পরিবর্তে শুধুমাত্র 'বাংলাদেশ'।

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বরে সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আওয়ামী লীগ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০টি আসনের মধ্যে ৩০৫টি আসন লাভ করে।

**১৯৭১-১৯৭২ :** ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি রেসকোর্সের জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জনপ্রতিনিধিদের শপথ গ্রহণ পরিচালনা করেন। আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যরা ৬ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা এবং জনগণের প্রতি আনুগত্য থাকার শপথ গ্রহণ করেন। ৭ মার্চ রেসকোর্সের জনসমুদ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা'। ঐতিহাসিক ভাষণে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে শৃঙ্খল মুক্তির আহ্বান জানিয়ে ঘোষণা

করেন, 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।... প্রত্যেকে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে মোকাবেলা করতে হবে।' বঙ্গবন্ধু শত্রুর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেবার আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধু ইয়াহিয়া খানের সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। একদিকে রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইয়াহিয়ার নির্দেশ, অপরদিকে ধানমন্ডি ৩২নং সড়ক থেকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ, কিন্তু বাংলার মানুষ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশই মেনে চলতে লাগল। অফিস-আদালত, ব্যাংক-বীমা, স্কুল-কলেজ, গাড়ি, শিল্প-কারখানা সবই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে চলেছে। ইয়াহিয়ার সব নির্দেশ অমান্য করে অসহযোগ আন্দোলনে বাংলার মানুষের সেই অভূতপূর্ব সাড়া ইতিহাসে বিরল ঘটনা। মূলত ৭ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হিসেবে বঙ্গবন্ধুই রাষ্ট্রপরিচালনা করেছেন। ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালির ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে। আক্রমণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিলখানা রাইফেল সদর দফতর ও রাজারবাগ পুলিশ হেড কোয়ার্টার।

## বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চ রাত ১২টা ২০ মিনিটে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন

'সম্ভবত এটাই আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনসাধারণকে আহ্বান জানাচ্ছি তোমরা যে যেখানেই আছ এবং যাই তোমাদের হাতে আছে তার দ্বারাই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দখলদার সৈন্যবাহিনীকে প্রতিরোধ করতে হবে। যতক্ষণ না পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ ব্যক্তি বাংলাদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত হবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হবে, তোমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।'

এই ঘোষণা বাংলাদেশের সর্বত্র ট্রান্সমিটারে প্রেরিত হয়।

এর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বাংলায় নিম্নলিখিত একটি ঘোষণা পাঠান :

'পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিতভাবে পিলখানা ইপিআর ঘাঁটি, রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করেছে এবং শহরের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলছে, আমি বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন করছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমি মুক্ত করার জন্য শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনসারদের সাহায্য চান। কোনো আপস নাই। জয় আমাদের হবেই। পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রুকে বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক প্রিয় লোকদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুক। জয় বাংলা।'

তিনি হানাদার পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বাঙালি সামরিক ও বেসামরিক যোদ্ধা, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষকসহ সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর এই আহ্বান বেতার যন্ত্র মারফত তাৎক্ষণিকভাবে বিশেষ ব্যবস্থায় সারাদেশে পাঠানো হয়। রাতেই এই বার্তা পেয়ে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও যশোর সেনানিবাসে বাঙালি জওয়ান ও অফিসাররা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে





বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা প্রচার করা হয় গভীর রাতে। স্বাধীনতার ঘোষণা দেবার অপরাধে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ১-১০ মিনিটে বঙ্গবন্ধুকে ধানমন্ডির ৩২নং বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যায় এবং ২৬ মার্চ তাকে বন্দি অবস্থায় পাকিস্তান নিয়ে যাওয়া হয়। ২৬ মার্চ জে. ইয়াহিয়া এক ভাষণে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বঙ্গবন্ধুকে দেশদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করে।

প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পরিচালনায় মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৬ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়। বাংলাদেশ লাভ করে স্বাধীনতা। তার আগে ৭ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের লায়ালপুর সামরিক জেলে বঙ্গবন্ধুর গোপন বিচার করে তাকে দেশদ্রোহী ঘোষণা করে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। বিভিন্ন দেশ ও বিশ্বের মুক্তিকামী জনগণ বঙ্গবন্ধুর জীবনের নিরাপত্তার দাবি জানায়। ২৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে জাতির জনক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি প্রদানের দাবি জানানো হয়। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। তিনি বাংলাদেশের স্থপতি, কাজেই পাকিস্তানের কোনো অধিকার নেই তাকে বন্দি করে রাখার। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে বহু রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করেছে।

১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার আন্তর্জাতিক চাপে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়। জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি ঢাকায় পৌঁছলে তাকে অবিস্মরণীয় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বঙ্গবন্ধু বিমানবন্দর থেকে সরাসরি রেসকোর্স ময়দানে গিয়ে লক্ষ জনতার সমাবেশ থেকে অশ্রুসিক্ত নয়নে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। ১২ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।



পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বদেশে ফিরে কান্নায় ভেঙে পড়েন বঙ্গবন্ধু

# তৃতীয় অধ্যায়

## বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ

বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ শব্দ দুটি একে অপরের পরিপূরক বা পরিবর্তক শব্দ হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত। আপেক্ষিক বিচারে শব্দ দুটির গভীরতা অনুধাবন করে পার্থক্য খুঁজে বের করা অনেকটাই দুষ্কর! বঙ্গবন্ধু থেকেই মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের গহিন অরণ্যে চষে বেড়িয়েছেন বঙ্গবন্ধু। সেই সূত্রে শব্দ দুটি একই সূত্রে গাঁথা। 'যুদ্ধ মানেই শান্তি' বলা হয়ে থাকলেও যুদ্ধ শেষেই শান্তি আসে; আসে স্বাধীনতাও।

ভারতবর্ষে ঘটে যাওয়া দেশ বিভক্তি, দ্বিজাতি তত্ত্বের আলোকে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাও দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়ের ফসলই বটে। তবে বাংলা মায়ের ক্ষেত্রে ঘটে যাওয়া ঘটনা ভিন্ন কিছু; যেন এক প্রলয়ঙ্করী মহাযুদ্ধ, জনযুদ্ধ।

যুদ্ধের ওই সময়টিতে কম বেশি সবাই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, সাহায্য করেছেন যোদ্ধাদের। খাসিয়া সম্প্রদায়ের মুক্তির বেটি কাকন বিবির মতো দুঃসাহসী নারীরা আরও একধাপ এগিয়ে ছিলেন। জীবনবাজি রেখে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তাদের দেওয়া তথ্যানুযায়ী পরিচালিত হয়েছে রেকি। সফলভাবে তা সম্পন্ন হলে ঝাঁপিয়ে পড়া, মূল যুদ্ধ; মুক্তিযুদ্ধ।

শিশুরাও পিছিয়ে ছিলো না তখন, কচুরিপানার ভিতর লুকিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে বিধ্বংসী জাহাজ। সম্মুখযুদ্ধের কথা বাদই দিলাম। যুদ্ধের সময় কত লোক পাগল বেশে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে তারও ইয়াত্তা নেই, যেমন নেই বীরাঙ্গনাদের; আমাদের বীর মাতাদের! তবু যুদ্ধ মানেই শান্তি, যুদ্ধ মানেই জয়-পরাজয়! তবে জনযুদ্ধে পরাজয় বলতে কোনো শব্দ নেই। মাত্র নয় মাসের রক্ষক্ষয়ী এ সংগ্রামে দেশের তরুণেরা ছিনিয়ে আনে লাল সবুজের পতাকা।

জনযুদ্ধ প্রসঙ্গে জাতির পিতা মুজিব বলেছিলেন, 'শুধু মুক্তিবাহিনীর ভায়েরাই অস্ত্র নিয়ে সংগ্রাম করে নাই। জনগণকেও লড়তে হয়েছে স্বাধীনতার শত্রুদের বিরুদ্ধে।' কি সাবলীল স্বীকার। স্বাধীন বাংলাদেশেই তিনি বলেছিলেন এ কথা, কিন্তু এর প্রতিফলন নেই কোথাও! বিভক্ত দুটি শ্রেণি মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে দিনের পর দিন ব্যবসা করেই চলছে। হঠাৎ করেই বঙ্গবন্ধুর পোস্টার ছেয়ে যায় সর্বত্র! তখন হয়তো জাতির পিতার মৃত আত্মাও লজ্জা পায়, অপমানিত হয়ে ধিক্কার দেয় ওই সব নেতাদের।

শোকের মাস আগস্ট এলে তো কথাই নেই। বাড়তে থাকে এ প্রবণতা। ব্যানার, পোস্টার, ফেস্টুন, ম্যাগাজিন, লিটল ম্যাগ কত্ত কি! তবে এক দিক দিয়ে ভালোই, আলোচনা হচ্ছে। ফলে প্রতিনিয়তই আমরা নতুন নতুন তথ্য-উপাত্তের সাথে পরিচিত





হচ্ছি। খবর আকারেও প্রকাশিত হচ্ছে সদ্য ইতিহাস খুঁড়ে আনা অজানা কোনো তথ্য। আর তথ্যের দোহাই দিয়ে হলেও বলি, 'পিতা হত্যার প্রতিশোধের অন্যতম অস্ত্র হচ্ছে তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী।'

বর্তমানে রিকশাওয়ালা থেকে শুরু করে কোটিপতি সকলেই জাতির পিতা সম্পর্কে জ্ঞাত। জ্ঞাত বাঞ্ছনীয়ও বটে! তবে তারা যা জানেন, আংশিক কিংবা অর্ধ সত্য! পুরোটা জানা হয় না তাদের। ইতিহাস পড়ার সময় কই? অর্ধা-অর্ধি দিয়েই চলে তর্কাতর্কি, এমনকি ওটা ভোটব্যাংক পর্যন্তও গড়ায়! তবু পুরো ইতিহাস জানা হয় না অনেকেরই।

আরেকটি কথা প্রচলিত আছে, জাতির পিতা সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন না এমন মূর্খ খুঁজে পাওয়াও দুষ্কর। তবে সে জ্ঞানের পরিধিও খুব সীমিত। অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে প্রগতিশীল বাংলাদেশ গড়তে সীমিত জ্ঞানকে প্রসারিত করার সহজ পন্থাও বাতলে দেয়া হয়েছে। আছে নেতা হওয়ার সহজ রাস্তাও। তবু নেতারাই কেন যেন বইবিমুখ! এমনকি জাতির পিতার বইটির ক্ষেত্রেও!

বঙ্গবন্ধুর জন্ম এক জমিদার পরিবারে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ এলাকার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে শেখ বংশ নামে একটি জমিদার পরিবারের বসবাস ছিল। সে বংশেই জন্ম নেন স্বাধীন বাংলার স্থপতি। তবে বঙ্গবন্ধুর জন্মের পূর্বাপর সময়েই জমিদারিত্ব হারায় ওই বংশ। আর যে ঘরে জাতির পিতার জন্ম হয় তা ছিল মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। শেখ পরিবারের জমিদারিত্বের রেখে যাওয়া নিদর্শনের পাশেই ছিল কয়েকটি টিনের ঘর, আর এমন একটি টিনের ঘরেই জন্ম হয় জাতির পিতার। সেখানে ছিল না কোনো আভিজাত্য। ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ শেখ লুৎফর রহমান ও সায়েরা খাতুনের ঘরকে আলোকিত করে তথা পুরো পূর্ববঙ্গকে সূর্যের আভায় আলোকিত করে জন্ম হয় মুজিবের। নাম তাঁর শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধু তাঁর বংশধর ও জন্ম সম্পর্কে লিখতে গিয়ে অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'আমার জন্ম হয় এই টুঙ্গিপাড়া শেখ বংশে। শেখ বোরহানউদ্দিন নামে এক ধার্মিক পুরুষ এই বংশের গোড়াপত্তন করেছেন বহুদিন পূর্বে। শেখ বংশের যে একদিন সুদিন ছিল তার প্রমাণস্বরূপ মোগল আমলের ছোট ছোট ইটের দ্বারা তৈরি চকমিলান দালানগুলি আজও আমদের বাড়ির শ্রীবৃদ্ধি করে আছে।' আরও লিখেন, 'জমিদারির সাথে সাথে তাদের বিরাট ব্যবসাও ছিল।'

ছাত্ররাজনীতি থেকেই জাতীয় রাজনীতিতে পদার্পণ। ১৯৩৮ সালেই ছাত্ররাজনীতি দিয়ে শুরু। মিশন স্কুলের রাজনীতি শেষে কলকাতা ধাপিয়ে দেশ বিভক্তির সময় আবার ঢাকায়। তখন তিনি মুসলিম লীগের বড় নেতা। মুসলিম লীগ প্রসারিত করতে ভারতের এ রাজ্য থেকে ও রাজ্য ছুটে বেড়াচ্ছেন। তবে খুব সম্ভবত একটি সুটকেস নিয়ে রাজধানী কলকাতা থেকে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করতে হয়। দেশে তখন দিন্দু মুসলিম দাঙ্গাও চলে, তাও সামলান মুজিব।

ঢাকায় স্থায়ী হওয়ার পর এক সময় মুসলিম লীগ ভেঙে আওয়ামী লীগ গঠন। জড়িয়ে পড়েন ঢাবিতে। ১৯৫২ সালের দিকে তিনটি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত ছিলেন মুজিব। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীদের দাবি

আদায়ের আন্দোলন এবং নির্বাচন ও দুর্ভিক্ষবিরোধী আন্দোলন। তখন তাঁর রাজনৈতিক যৌবন চলছে।

সময়ের পরিক্রমায় বাঙালির জীবনে আসে ৭ মার্চ। অবহেলা ও নিষ্পেষণ থেকে মুক্তির নিঃশ্বাস নেওয়ার সময়। তার আগেই চলছিল জল্পনা কল্পনা। ৭ মার্চ বিকেল তিনটায় ভাষণ দেবেন বাঙালির প্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। ভোরের আলো ফুটে উঠার সাথে সাথেই পাল্টে যেতে লাগে ঢাকা রেসকোর্স ময়দানের চারপাশ। সকালের পর থেকেই জনস্রোত বয়ে যেতে লাগে পুরো ঢাকায়, বিশেষত সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। কবি নির্মলেন্দু গুণ তার কবিতায় বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ নিয়ে লিখেন–"একটি কবিতা লেখা হবে তার জন্য অপেক্ষার উত্তেজনা নিয়ে/ লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত অধীর ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা বসে আছে/ ভোর থেকে জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে: 'কখন আসবে কবি?" সকল জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে তিনটা বিশ মিনিটে মঞ্চে আসেন বক্তৃতার শ্রেষ্ঠ কবি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দীর্ঘ ১৯ মিনিট বক্তৃতা করেন। ভাষণ চলতে থাকা সময়ে গর্জে ওঠে উত্তাল ওই জনসমুদ্র।

এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক 'যোগাযোগ বিদ্যার দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ' নিবন্ধে লিখেছেন, 'প্রতি মিনিটে গড়ে ৫৮ থেকে ৬০টি শব্দ উচ্চারণ করে বঙ্গবন্ধু ১৯ মিনিটে এই কালজয়ী ভাষণটি শেষ করেছিলেন।' তিনি আরও লিখেছেন, 'এ ভাষণ যুগ যুগ ধরে বাঙালি জাতিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় উজ্জীবিত রাখবে।'

বিদেশি প্রভাবশালী পত্রিকা নিউজউইকে আখ্যা দেয়। 'পোয়েট অব পলিটিক্স' বলে আখ্যা আর পায়নি কোনো নেতা। ওই ভাষণের সমতুল্য ভাষণ পৃথিবীতে আর একটিও নেই! এখানে সমতুল্য শব্দটি ব্যবহার করার অনেকটা পিতার মূল্যায়নকে অবমূল্যায়ন করার শামিল! এর পর আনুষ্ঠানিক ঘোষণার তেমন কোনো প্রয়োজন ছিল না বলে মনে করে বিজ্ঞ রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ।

অন্যদিকে আরেক যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা কাজী জাকির হাসান চন্দন বিডিনিউজের এক মতামত বিষয়ক সাক্ষাৎকারে স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণা শুনেছেন, এমন প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'দেখুন, ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পরেই কিন্তু লড়াইয়ের জন্য মানসিকভাবে আমরা তৈরি হয়ে যাই। বুঝে যাই, সংগ্রাম করেই স্বাধীনতা আনতে হবে। ওই ভাষণটাই ছিল স্বাধীনতার ভাষণ। এরপর মুক্তিযোদ্ধাদের আর কোনো ঘোষণারই প্রয়োজন পড়ে নাই।' (সূত্র : যুদ্ধাহতের ভাষ্য : ৩৫ 'অনেক মুক্তিযোদ্ধাকেই রাজাকার হতে দেখেছি')

এর পরের ভয়াবহ ঘটনাটিই হচ্ছে ২৫ মার্চ কাল রাত। বাঙালির জীবনে এক ভয়াবহ অন্ধকারের রাত। সারা দেশে চলে অপারেশন সার্চ লাইট। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে মেধা ও মননের চিন্তাশীল প্রতিটি স্থানে আসে আঘাত। রাতের অন্ধকারে শুরু হয় নির্বিচারে মানুষ হত্যা। তবে ২৬ শে মার্চের প্রথম প্রহরেই বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন জিয়াউর রহমান। বঙ্গবন্ধু তখন আর্মিদের হাতে বন্দি। যা করার তা আগেই করে গিয়েছেন, সকল ছক কষে গিয়েছিলেন।

ধারাবাহিকভাবে বাঙালিরা নয় মাসের যুদ্ধ জয় করে বাংলাদেশ। ত্রিশ লক্ষ শহীদ ও মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আসে স্বাধীনতা। পিতা মুজিব যুদ্ধের অনেক পর দেশে





ফিরেন। যদিও বন্দিদশায় তাকে পাকিস্তানিরা হত্যা করার ষড়যন্ত্রও করে সফল হয়নি। ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। শুরু করে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ পুনর্গঠন। খাদ্য সংকটসহ নানা সংকটে জর্জরিত একটি ভূখণ্ড। কোনো সম্পদ নেই, নেই অর্থও। আছে মনোবল, আর কিছু বিদেশি সাহায্য। সাহায্য বণ্টনেও শুরু হয় হরিলুট। ইতিহাস প্রায় সকলেরই জানা। তবু বলার জন্যে বলা।

দেশ স্বাধীনের পর সব দিকে সফল হলেও গণমাধ্যমও শুরু করে নতুন ষড়যন্ত্র। সাথে যোগ দেয় তথাকথিত কিছু সংগঠন। যারা পাকিস্তান কায়েম করতে চেয়েছিল তারাও শেষ ছোবল দিতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯৭২ সালের ১৬ জুলাই সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে জাতীয় প্রেসক্লাবে একটি ভাষণ দেন। বঙ্গবন্ধু ও গণমাধ্যম বইয়ে ওই ভাষণের শিরোনাম করা হয়েছে 'সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে'। ওই ভাষণে বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, 'আমরা গণতন্ত্র চাই কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলা চাই না, কারও বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করতে চাই না। অথচ কোনো কাগজে লেখা হয়েছে "মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য সংঘবদ্ধ হও"। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতেও অনেক সংবাদ মাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জামায়াত-শিবির হায়েনারা একইভাবে কুৎসা রটনায় ব্যস্ত। শুধু ওই সময়টিতে নয়, এখনও। মনে রাখতে হবে আমাদের।

জানা যায়, দেশ স্বাধীন হতে না হতেই একাধিক সংবাদপত্রের ব্যবসা শুরু হয়ে যায় এ দেশে। দেশি-বিদেশি টাকায় ওই সব সংবাদপত্র পরিচালিত হতো বলে জানা যায়। বঙ্গবন্ধু এ সম্পর্কে ওই ভাষণে বলেন, 'আপনারা সরকারী কর্মচারীদের স্ক্রিনিং চান, শিক্ষকদের স্ক্রিনিং চান, বেতারের স্ক্রিনিং চান। অনুগ্রহ করে একটু নিজেদের স্ক্রিনিং করুন। একটু বলুন, এই লোকগুলো এই কাজ করছে। আমরা তা মেনে নেব। আর যদি নিজেরা কিছু না করেন আমাকে বলবেন। আমি করব। আমাকে করতেই হবে। কারণ, পাকিস্তানের নামে পয়সা নিয়ে এসে যদি কেউ রাতারাতি খবরের কাগজ বের করে, আর মানুষের স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে আমাদের সব নীতির বিরুদ্ধে কথা বলে, বন্ধু রাষ্ট্রের সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করাবার চেষ্টা করে, এখানে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়াবার চেষ্টা করে, জাতির আদর্শের বিরুদ্ধে কথা বলে, তবে সেটাকে স্বাধীনতা বলা যায় না। সে স্বাধীনতা কোনো সরকার, কোনো জনগণ, কোনো প্রগতিশীল দল কোনো দিন সমর্থন করতে পারে না।' ক্ষিপ্ত হতে থাকে খুনি ও তার দোসররা! অপেক্ষা করে নতুন ছক কষে সামনে এগিয়ে যাবার। পন্থাও তৈরি হয় দেশের বৈরী পরিস্থিতিতে।

জাতির ইতিহাসে আসে ভয়াল অন্ধকার। ১৫ আগস্ট। পৃথিবীর ইতিহসে এমন দুর্ভাগ্যজনক দিন আর আসেনি কোনোদিন। ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়িটিকে টার্গেট করে একদল উন্মাত সেনাবাহিনী।

১৫ আগস্টের বর্ণনা দিতে আন্থনি ম্যাসকার্নহাস তাঁর 'বাংলাদেশ : এ লিগ্যাসি অব ব্লাড' গ্রন্থে লিখেছেন, ১৫ আগস্ট ভোর ৪:৪০ মিনিট। ফারুকের বাহিনী আঘাতের জন্য

সংগঠিত হয়ে যার যার জায়গামতো পৌঁছার জন্যে প্রস্তুত। রশিদের আর্টিলারি বাহিনী তাদের কামান নিয়ে নতুন এয়ারপোর্টের প্রান্তে দণ্ডায়মান। ল্যান্সার সারিবদ্ধভাবে সাজানো আছে ২৮টি ট্যাংক, ১২টি ট্রাক, ৩টি জিপ আর একটি ১০৫ মি.মি. হাউইটজার। এগুলোর সাথে রয়েছে রণ সাজে সজ্জিত ৪০০ সৈন্যের একটি শক্তিশালী দল। তাদের দুই-তৃতীয়াংশ ছিল কালো উর্দি যা পরবর্তীকালে বাংলাদেশিদের মনে এক ভয়ঙ্কর পোশাক বলে পরিগণিত হতে পারে।

দিনটি ছিল শুক্রবার। এই শুক্রবারে ভূমিষ্ঠ হয় ফারুক। বাইরে বেরিয়ে আসতেই তার কানে ভেসে আসে সুমধুর আজানের ধ্বনি। হয় আজ ফারুকের নবজীবনের সূচনা, নতুবা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া। ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর বাড়ির অবস্থা তখন গোলযোগপূর্ণ। ভোর সোয়া পাঁচটার মধ্যেই অন্য আরেকটি দল হাজির। মেজর মহিউদ্দিন, নূর আর হুদার নেতৃত্বে পরিচালিত প্রধান ঘাতক দলটি শেখ মুজিবের বাড়ি পৌঁছে যায়। রক্ষীবাহিনীর সম্মুখ দিয়েই ফারুক বাহিনী অতিক্রম করে, তবু তারা ছিল নির্বিকার। মূলত বাধ্য হয়েই। নিজেদের সামনে ট্যাংক দেখে ওরা গায়ের মশা পর্যন্ত নাড়াবার সাহস দেখায়নি।

৩২ নম্বরের বাড়ির সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে ঘাতকেরা! মহিউদ্দিন, হুদা আর নূর বাড়ির প্রতিটি কামরা মুজিবের খোঁজে তন্ন তন্ন করে চষে বেড়ায়। হঠাৎ মহিউদ্দিন মুজিবকে পেয়ে যায়। সে দোতলায় উঠতে সিঁড়ির গোঁড়ায় পা ফেলতেই শেখ মুজিবকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পায়। তাদের মধ্যে দূরত্ব ২০ ফুটের বেশি হবে না। মহিউদ্দিন শেখের সামনে দাঁড়িয়ে পুরোপুরিভাবে মনোবল হারিয়ে ফেলে। মহিউদ্দিন আমতা আমতা করে তাঁকে বলেছিল, 'স্যার আপনি আসুন।'

'তোমরা কী চাও?' মুজিব কর্কশ ভাষায় জিজ্ঞেস করেন। 'তোমরা কি আমাকে খুন করতে চাও? ভুলে যাও। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তা করতে পারেনি। তোমরা কী মনে কর তা করতে পারবে?'

ওই দিনের ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে কর্নেল ফারুক অ্যান্থনি ম্যাসকার্নহাসকে বলেছিল, 'শেখ মুজিবের ব্যক্তিত্ব ছিল অত্যন্ত প্রবল। মহিউদ্দিন তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে একেবারে নতজানু হয়ে পড়েছিল। ওই মুহূর্তে নূর চলে না আসলে কী যে ঘটত তা আমার আন্দাজের বাইরে।' মহিউদ্দিন তখনো ওই একই কথা বলে চলছিল, স্যার আপনি আসুন। আর অন্যদিকে শেখ মুজিব অত্যন্ত কড়া ভাষায় ধমকিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় নূর এসে পড়ে। তার হাতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। সে বুঝে ফেলে, মুজিব সময় কাটাতে চাইছেন। মহিউদ্দিনকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে নূর চিৎকার করে আবোলতাবোল বকতে বকতে তার স্টেনগান থেকে মুজিবের প্রতি 'ব্রাশফায়ার' করে। শেখ মুজিব তাকে কিছু বলার আর সুযোগ পেলেন না। স্টেনগানের গুলি তাঁর বুকের ডানদিকে একটা ছিদ্র করে বেরিয়ে গেল। বাঙালি জাতীয়তাবাদের মহান নেতার প্রাণহীন দেহ সিঁড়ি দিয়ে কিছু দূর গড়িয়ে গিয়ে থেমে রইল। তাঁর ধূমপানের প্রিয় পাইপটি তখনও তিনি শক্তভাবে ডান হাত দিয়ে ধরে রেখেছিলেন। সময় তখন সকাল ৫টা ৪০ মিনিট। বাঙালি জাতির সঙ্গে শেখ মুজিবের প্রচণ্ড ভালোবাসার চিরতরে অবসান ঘটল।'





সেই দিন সপরিবারে শহীদ হন পিতা মুজিব। ছোট শিশু রাসেল থেকে শুরু করে সবাই, শুধু বেঁচে যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। দেশের বাইরে ছিলেন বলে! ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরের বাড়িতে আজও লেগে আছে রক্তের ছোপ ছোপ দাগ। আজও ওখানেই রাসেলের আত্মা কেঁদে ওঠে বলে, 'আমার মতো শিশুকে গুলি করে হত্যা করতে হয়? কি ছিল আমার অন্যায়?' আর মুজিবের আত্মা কি ধিক্কার দেয় বাঙালিদের; যিনি আজন্ম যুদ্ধ করেছেন বাঙালিদের হয়ে? মৃত্যুর সময়ও যার ভাবনায় ছিল, অন্তত বাঙালিরা আমাকে হত্যা করতে পারে না!

## ১০ জানুয়ারিতেই বিজয়ের পূর্ণতা পেয়েছিল বাঙালি

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি জান্তার আত্মসমর্পণের মাধ্যমে কার্যত বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হলেও এদেশের মুক্তিকামী মানুষ ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন প্রিয় নেতা, যার নাম নিয়ে এবং যার ডাকে তারা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে এদেশ মুক্ত করেছেন তার উপস্থিতি দেখতে, সান্নিধ্য পেতে। স্বপ্নের স্বাধীন স্বদেশে প্রিয়নেতার দীপ্ত পদচারণা ছাড়া যেন পূর্ণতা পাচ্ছিল না বিজয়ের স্বাদ।

বাংলার মানুষের মনে শঙ্কা ছিল বর্বর পাকিস্তানিরা কি বাঁচিয়ে রেখেছে মুক্তিকামী বাঙালির স্বপ্নের মহানায়ক, বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে?

কারণ এদেশ থেকে আত্মসমর্পণ করলেও পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্র থেমে ছিল না। বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে নানা টালবাহানা শুরু করে তারা। অবশেষে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ব্যাপক আন্তর্জাতিক জনমত সৃষ্টি হওয়ায় মুক্তি দিতে বাধ্য হয় পাক জান্তা। সে সময়ের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের মহানায়ক, জননেতা তোফায়েল আহমেদ তার একটি লেখায় লিখেছেন; 'পাকিস্তানের লায়ালপুরের মিয়ানওয়ালী কারাগারের বন্দিদশা থেকে মুক্তিলাভ করার আগে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট কুচক্রী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে নানারূপ ছলচাতুরি করেন। কিন্তু বাংলার মানুষের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ছিল প্রগাঢ় ভালোবাসা আর অসীম আস্থা। আর এই আস্থা ও আত্মবিশ্বাসের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে মুক্তি পাওয়ার আগ মুহূর্তেও তিনি ভুট্টোর ষড়যন্ত্র ও ছলনায় ভুলেননি। শেষ মুহূর্তে ভুট্টো একব্যাগ দলিলপত্র নিয়ে বঙ্গবন্ধুর মুখোমুখি হয়ে বলেছিলেন, একটি যৌথ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করতে। যাতে লেখা ছিল, 'জনাব ভুট্টো ও জনাব শেখ মুজিবের মধ্যে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক বিষয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে।' বঙ্গবন্ধু চিরাচরিত প্রথায় নীরব থেকে এ ধরনের বিবৃতিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেন। অসহিষ্ণু কণ্ঠে উত্তেজিত হয়ে ভুট্টো বঙ্গবন্ধুকে বলেন, 'এ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করবেন না কেন? এতে তো দোষের কিছু নেই।' বঙ্গবন্ধুর একটিই উত্তর, 'কারণ, মুক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি কিছু স্বাক্ষর করব না।' প্রত্যুত্তরে ভুট্টো তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, 'কিন্তু এখন তো আপনি মুক্ত। আমার বিমান অপেক্ষা করছে, আপনার যেখানে খুশি আপনাকে নিয়ে যাবে এখন এই মুহূর্তে!' বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'তাহলে কি আমি ঢাকা যেতে পারি?' ভুট্টো বললেন, 'না অন্য কোথাও।' বঙ্গবন্ধু ভুট্টোকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'জনাব ভুট্টো, না বলবার হৃদয়বিদারক শক্তি নিঃসন্দেহে আপনার আছে।' তখন ভুট্টো কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন, 'না

বলার যথেষ্ট কারণ আছে। পাকিস্তানি বিমান ভারতের ওপর দিয়ে উড়ার অনুমতি নেই। ভারতের আকাশসীমায় আপনার বিমানকে গুলি করে নামাতে পারে। সেটা নিশ্চয় খুব সাংঘাতিক ব্যাপার হবে। সে ক্ষেত্রে আমরা আমাদের বিমানটিকেও খোয়াব। সেটিও সাংঘাতিক ক্ষতির কারণ হবে আমাদের জন্য। আপনার নিরাপত্তার বিষয়ে আমার এতসব ভাবনার জন্য অন্তত কিছুটা কৃতিত্ব পেতে পারি। ঢাকা ছাড়া অন্য যে কোনো জায়গায় আপনি যেতে পারেন।' তখন বঙ্গবন্ধু বলেন, 'তাহলে আমি লন্ডন যেতে চাই।' এভাবেই মুক্তি পাওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর অভিপ্রায় অনুযায়ী লন্ডন যাত্রা স্থির হয়।''

পাকিস্তানের কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধু মুক্তিলাভ করেন ৮ জানুয়ারি। পিআইএ'র একটি বিশেষ বিমানে বঙ্গবন্ধু লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে পৌঁছান।

বিমান হতে অবতরণের পর বঙ্গবন্ধুকে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে লন্ডনে বাংলাদেশ মিশনের কর্মকর্তারা তাঁকে লন্ডনের হোটেল ক্লারিজেসে নিয়ে যান। লন্ডনে বঙ্গবন্ধুর আগমন সংবাদে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি ফেলে ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিটে ছুটে এলে বঙ্গবন্ধু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর কুশলাদি ও তাঁর স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কুশলাদি বিনিময়ের পর ভারতে সংক্ষিপ্ত যাত্রা বিরতির অনুরোধ জানান। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহায়তার কথা উল্লেখ করে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নিকট বঙ্গবন্ধু গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বলেন, 'আমি আপনার নিকট একান্ত কৃতজ্ঞ।' প্রত্যুত্তরে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আসলে আমরাই আপনার নিকট কৃতজ্ঞ। কারণ আপনিই আপনার দেশবাসীকে প্রেরণা জুগিয়েছেন।' এরপর লন্ডন থেকে ঢাকা ফেরার পথে দিল্লিতে সাময়িক যাত্রা বিরতির জন্য ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত অনুরোধে বঙ্গবন্ধু সম্মতি প্রদান করেন।

লন্ডনে এক জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে তিনি বাংলার জনগণের কাছে ফিরে আসার জন্য ব্যাকুল হয়ে বলেছিলেন, 'আমি আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে রাজি নই। আমি আমার জনগণের কাছে ফিরে যেতে চাই।' এরপর ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। পালাম বিমানবন্দরে দিল্লির জনসাধারণ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে এক অভূতপূর্ব রাষ্ট্রীয় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে।

সংক্ষিপ্ত যাত্রা বিরতিকালে লাখ লাখ মানুষের সমাবেশে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে ভারতবাসীর উদ্দেশে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বঙ্গবন্ধু বক্তৃতায় বলেন, 'আমার জন্য এটা পরম সন্তোষের মুহূর্ত। বাংলাদেশে যাওয়ার পথে আমি আপনাদের মহতী দেশের ঐতিহাসিক রাজধানীতে যাত্রাবিরতির সিদ্ধান্ত নিয়েছি এ কারণে যে, আমাদের জনগণের সবচেয়ে বড় বন্ধু ভারতের জনগণ এবং আপনাদের মহীয়সী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী যিনি কেবল মানুষের নন, মানবতারও নেতা। তাঁর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারের কাছে এর মাধ্যমে আমি আমার ন্যূনতম ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারব।'





অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে লন্ডন থেকে দিল্লি হয়ে বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী ব্রিটিশ রাজকীয় বিমানবাহিনীর কমেট বিমানটি ঢাকার আকাশ সীমায় দেখা দিতেই জনসমুদ্র উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।

সেদিন বাংলাদেশে ছিল এক মহোৎসবের আমেজ। গোটা বাঙালি জাতি রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিল কখন তাদের প্রিয় নেতা, স্বাধীন বাংলার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীন দেশের মাটিতে পা রাখবেন। পুরো দেশের মানুষই যেন জড়ো হয়েছিল ঢাকা বিমানবন্দর এলাকায়। বিমানবন্দর থেকে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দান (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পর্যন্ত রাস্তা ছিল লোকেলোকারণ্য।

অবশেষে বন্দির নাগপাশ ছিন্ন করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বিজয়ী বেশে নামলেন বিমান থেকে। পা রাখলেন লাখো শহিদের রক্তস্নাত স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে। গোটা জাতি হর্ষধ্বনি দিয়ে তেজোদীপ্ত 'জয় বাংলা' শ্লোগানে তাদের অবিসংবাদিত প্রিয় নেতাকে স্বাগত জানায়। জয় বাংলা, তোমার নেতা নেতা আমার নেতা; শেখ মুজিব, শেখ মুজিব শ্লোগানে সেদিন মুখরিত হয়েছিল বাংলার আকাশ বাতাস।



স্বাধীন স্বদেশ ভূমিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

১০ জানুয়ারি দুপুর ১-৫১ মিনিটে বিমানবন্দরে বিমানটি অবতরণ করে। বিমানের সিঁড়ি বেয়ে জাতির জনক তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলায় পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে ৩১বার তোপধ্বনি করে রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতি সম্মান জানানো হয়। এরপর বঙ্গবন্ধুকে মঞ্চের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। চারদিক থেকে তাঁর ওপর পুষ্পবৃষ্টি হতে থাকে। বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা শেষে সুদৃশ্য তোরণ, বাংলাদেশের পতাকা ও বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি দিয়ে সজ্জিত রাজপথের দু'পাশে দাঁড়ানো জনসমুদ্র পেরিয়ে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যখন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পৌঁছলাম তখন বিকাল সাড়ে ৪টা। অর্থাৎ কুর্মিটোলা বিমানবন্দর থেকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান পর্যন্ত আসতে সময় লেগেছে ২ ঘণ্টা ৩৯ মিনিট। চতুর্দিকে করতালি

আর জয়বাংলা শ্লোগানে মুখরিত কানায়-কানায় পরিপূর্ণ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সেদিন কোনো সীমানা ছিল না, ছিল না তিল ধারণের ঠাঁই। প্রকৃতপক্ষে ১০ জানুয়ারিতেই বিজয়ের পূর্ণতা পেয়েছিল বাঙালি।

স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পা রেখেই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন বঙ্গবন্ধু। দীর্ঘ ৯ মাস পাকহানাদার বাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দোসরদের গণহত্যার সংবাদ শুনে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। ফাঁসির মঞ্চ থেকে ফিরে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বাংলার এই অবিসংবাদিত নেতা আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলেছিলেন, 'আমার সারাজীবনের স্বপ্ন আজ পূরণ হয়েছে। আমার বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হয়েছে। একজন বাঙালি বেঁচে থাকতেও এ স্বাধীনতা নষ্ট হতে দেব না'।

ঐতিহাসিক ১০ জানুয়ারি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লাখো জনতার উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঘোষণা দেন, 'রক্ত দিয়ে হলেও আমি বাঙালি জাতির এই ভালোবাসার ঋণ শোধ করে যাব।' কথা রেখেছেন জাতির পিতা। হিংস্র পাকহানাদাররাও যার গায়ে আঁচড় দেয়ার সাহস দেখাতে পারেনি, স্বাধীন দেশে বাঙালি নামক একশ্রেণির কুলাঙ্গার-বিশ্বাসঘাতকের হাতে তাঁকে জীবন দিতে হয়েছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে নিজের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর কথা রেখে গেছেন।

সে সময় ব্রিটেনের প্রভাবশালী *দৈনিক গার্ডিয়ান* এক সম্পাদকীয়তে লেখে যে, 'তাঁহার এই মুক্তি বাংলাদেশকে বাঁচার সুযোগ দিয়াছে। ইহার আগে দীর্ঘ নয় মাস পাকিস্তানের কারাপ্রকোষ্ঠে অন্তরীণ থাকাকালে তাঁহার জীবন নাশের উপক্রম হইয়াছিল। প্রহসনমূলক বিচারের রায় অনুযায়ী তাঁহার ফাঁসি নিশ্চিত করার জন্য কবরও খনন করা হইয়াছিল। এই সময় তিনি বীরের ন্যায় বলিয়াছিলেন, আমার লাশটা বাংলার মানুষের কাছে পাঠিয়ে দিও। কোনো প্রলোভন ও ভয়-ভীতিই তাঁহাকে বাঙালির জনদাবি ও গণতান্ত্রিক আদর্শ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। তাঁহার দৃঢ়তার কারণে পাকিস্তানের নতুন প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জুলফিকার আলী ভুট্টোর কনফেডারেশনের স্বপ্নও ধূলিসাৎ হয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কারাবন্দি বঙ্গবন্ধু ছিলেন অধিক প্রভাবশালী ও অনুপ্রেরণার উৎস। তিনি সশরীরে না থাকিলেও ছিলেন সবখানে। পৃথিবীতে এমন ঘটনা বিরল যে, জননেতা ১১ শত মাইল দূরে কারাগারে অবস্থান গ্রহণ করিলেও তাঁহার নামের ওপর ভিত্তি করিয়া একটি দেশ স্বাধীন হইয়া গিয়াছে। তাঁহার মুক্তি ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পিছনে বিশ্বের গণতন্ত্রকামী মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন এবং ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর বিশ্বজনমত সৃষ্টি ও অন্যান্য অবদান অনস্বীকার্য ও চিরস্মরণীয়।'

'৭২-এর ১০ জানুয়ারি ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জনতার মহাসমুদ্রে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে স্বীয় অঙ্গীকারের কথা ব্যক্ত করে বলেছিলেন, 'গত পঁচিশে মার্চ থেকে এ পর্যন্ত দীর্ঘ নয় মাসে বর্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী এ দেশের প্রায় সব বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করেছে। হাজার হাজার মা-বোনের সম্ভ্রম নষ্ট করেছে। বিশ্বকে মানব ইতিহাসের জঘন্যতম কুকীর্তির তদন্ত অবশ্যই করতে হবে। একটি নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করে এসব কুকীর্তির বিচার করতে হবে।' ১৫ আগস্টের ঘাতকের বুলেট সে কাজ সমাপ্ত করতে দেয়নি। তবে তার সুযোগ্য কন্যা অসহায়, অবহেলিত, গরিব,





দুঃখী, বঞ্চিত, শোষিত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সর্বশেষ আশ্রয়স্থল দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে কুখ্যাত আলবদর নেতা কসাই কাদের মোল্লার ফাঁসি সম্পন্ন হয়েছে।

বাংলার মানুষের প্রতি ভালোবাসা সম্পর্কে তিনি তাঁর বক্তৃতায় সব সময় বলতেন, 'আমাকে মোনেম খান কাবু করতে পারেনি, এমনকি আইয়ুব খানও পারেনি। কিন্তু আমাকে দুর্বল করে দিয়েছে আপনাদের এই অকুণ্ঠ ভালোবাসা। আপনারা দোয়া করবেন যেন আপনাদের এই ভালোবাসার মর্যাদা দিতে পারি।' বাংলার মানুষের প্রতি ভালোবাসার মর্যাদা তিনি রক্ত দিয়ে পরিশোধ করে গেছেন। কবিগুরুর ভাষায়, আমৃত্যু দুঃখের তপস্যা এ জীবন, সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে, মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।'



১০ জানুয়ারি ১৯৭২। স্বপ্নের স্বাধীন স্বদেশ ভূমিতে ফিরে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় ভাষণের এক পর্যায়ে আবেগে কান্নায় ভেঙে পড়েন স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

স্বাধীনতাকে সার্থক ও চির অক্ষয় করিয়া রাখার জন্য তিনি সর্বাগ্রে অর্থনৈতিক মুক্তির কথা বলেন। তাঁহার ভাষায়, এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেটভরে ভাত না খায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এদেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণি আছে তারা চাকরি না পায় বা কাজ না পায়। স্বাধীনতার চার দশক পর আজ বিশেষজ্ঞরা পৃথিবীর উদীয়মান ১১টি অর্থনীতির দেশের তালিকায় বাংলাদেশের নাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বঙ্গবন্ধুর সেই দিনের সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে হলে এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দেশ গঠনের লক্ষ্যে গণতন্ত্রের নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলন অত্যাবশ্যকীয়। তবেই বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিবসে এই হোক আমাদের দৃঢ় অঙ্গিকার।

আমাদের জাতীয় জীবনে মহিমাপূর্ণ এ দিবসটি বঙ্গবন্ধুর ভাষায়, 'অন্ধকার থেকে আলোয়, বন্দিদশা থেকে স্বাধীনতায়, নিরাশা থেকে আশায়' উত্তরণের বিজয়ের পরিপূর্ণ দীপ্তিতে ভাস্বর।

## শেখ মুজিবুর রহমান

শেখ মুজিবুর রহমান (মার্চ ১৭, ১৯২০-আগস্ট ১৫, ১৯৭৫) বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক নেতা যিনি পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব এবং বাংলাদেশের জাতির জনক হিসেবে বিবেচিত। তিনি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী লীগের সভাপতি, বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি এবং পরবর্তীকালে এদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। জনসাধারণের কাছে তিনি 'শেখ মুজিব' এবং 'শেখ সাহেব' হিসেবে বেশি পরিচিত এবং তার উপাধি 'বঙ্গবন্ধু'। তার কন্যা শেখ হাসিনা ওয়াজেদ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বর্তমান সভানেত্রী এবং বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী।

১৯৪৭-এ ভারত বিভাগ পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির প্রাথমিক পর্যায়ে শেখ মুজিব ছিলেন ছাত্রনেতা। ক্রমে তিনি আওয়ামী লীগের জাতীয় নেতৃত্বের উচ্চপদে আসীন হয়েছিলেন। তার বড় গুণ ছিল তুখোড় বক্তৃতা প্রদানের ক্ষমতা। সমাজতন্ত্রের পক্ষসমর্থনকারী একজন অধিবক্তা হিসেবে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তনের জনগোষ্ঠীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। জনগণের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি একসময় ছয় দফা স্বায়ত্তশাসন পরিকল্পনা প্রস্তাব করেন, যাকে পশ্চিম পাকিস্তানে একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী পরিকল্পনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল। ছয় দফা দাবির মধ্যে প্রধান ছিল বর্ধিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, যার কারণে তিনি আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের অন্যতম বিরোধী পক্ষে পরিণত হন। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকারের সাথে যোগসাজশ ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তার বিচার শুরু হয় এবং পরবর্তীকালে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে তার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ বিপুল বিজয় অর্জন করে। তথাপি তাকে সরকার গঠনের সুযোগ দেয়া হয়নি।

পাকিস্তানের নতুন সরকার গঠন বিষয়ে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিবিদ জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে শেখ মুজিবের আলোচনা বিফলে যাওয়ার পর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মার্চ ২৫ মধ্যরাত্রে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঢাকা শহরে গণহত্যা পরিচালনা করে। একই রাতে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং পরবর্তীকালে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। রহিমুদ্দিন খান সামরিক আদালতে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। তবে তা কার্যকর হয়নি। ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ-ভারত যৌথবাহিনীর কাছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নামে স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ শেখ মুজিব পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করেন। পরবর্তীকালে তিনি প্রধানমন্ত্রী হন। সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে ভিত্তি করে সংবিধান প্রণয়ন এবং সে অনুযায়ী রাষ্ট্র চালনার চেষ্টা সত্ত্বেও তীব্র দারিদ্র্য, বেকারত্ব, সর্বব্যাপী অরাজকতা এবং সেই সাথে ব্যাপক দুর্নীতি মোকাবেলায়





তিনি কঠিন সময় অতিবাহিত করেন। ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অস্থিরতা দমনের লক্ষ্যে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি সকল দলীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে নিজেকে আজীবনের জন্য রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন। এর সাত মাস পরে, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে একদল সামরিক কর্মকর্তার হাতে তিনি সপরিবারে নিহত হন।

### জন্ম ও শিক্ষা

শেখ মুজিবুর রহমান তদানীন্তন ভারতীয় উপমহাদেশের বঙ্গ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার পাটগাতি ইউনিয়নের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা শেখ লুৎফর রহমান গোপালগঞ্জ দায়রা আদালতের সেরেস্তাদার (যিনি আদালতের হিসাব সংরক্ষণ করেন) ছিলেন এবং মায়ের নাম সায়েরা খাতুন। চার কন্যা এবং দুই পুত্রের সংসারে তিনি ছিলেন তৃতীয় সন্তান। তার বড় বোন ফাতেমা বেগম, মেজ বোন আছিয়া বেগম, সেজ বোন হেলেন ও ছোট বোন লাইলী; তার ছোট ভাইয়ের নাম শেখ আবু নাসের। ১৯২৭ সালে শেখ মুজিব গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করেন যখন তার বয়স সাত বছর। নয় বছর বয়সে তথা ১৯২৯ সালে গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে ভর্তি হন এবং এখানেই ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। ১৯৩৭ সালে গোপালগঞ্জ মাথুরানাথ ইনস্টিটিউট মিশন স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৯৩৪ থেকে চার বছর তিনি বিদ্যালয়ের পাঠ চালিয়ে যেতে পারেননি। কারণ তার চোখে জটিল রোগের কারণে সার্জারি করাতে হয়েছিল এবং এ থেকে সম্পূর্ণ সেরে উঠতে বেশ সময় লেগেছিল। গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। ১৯৩৮ সালে আঠারো বছর বয়সে তার সাথে ফজিলাতুন্নেসার বিয়ে হয়। এই দম্পতির ঘরে দুই কন্যা এবং তিন পুত্রের জন্ম হয়। কন্যারা হলেন শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা। আর পুত্রদের নাম শেখ কামাল, শেখ জামাল এবং শেখ রাসেল। তিনজন পুত্রই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতে আততায়ীর হাতে নিহত হন।

### রাজনৈতিক জীবনের সূচনা

মুজিবের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল ১৯৩৯ সালে মিশনারি স্কুলে পড়ার সময় থেকেই। এ বছর স্কুল পরিদর্শনে এসেছিলেন তদানীন্তন অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং পরবর্তীকালে বাংলার প্রধানমন্ত্রী এবং এমনকি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকারী হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। তিনি স্কুলের ছাদ সংস্কারের দাবির ওপর ভিত্তি করে একটি দল নিয়ে তাদের কাছে যান, যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি নিজেই। ১৯৪০ সালে নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দেন। সেখানে তিনি এক বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৪২ সালে এনট্র্যান্স পাস করার পর কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে (বর্তমান নাম মাওলানা আজাদ কলেজ) আইন পড়ার জন্য ভর্তি হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত এই কলেজটি তখন বেশ নামকরা ছিল। এই কলেজ থেকে সক্রিয়ভাবে ছাত্র রাজনীতি শুরু করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি বেঙ্গল মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং অগ্রণী কাশ্মিরী বংশোদ্ভূত বাঙালি মুসলিম নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সান্নিধ্যে আসেন। এখানে তার ছাত্র আন্দোলনের মুখ্য বিষয় ছিল একটি

পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন। ১৯৪৩ সালে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন।

১৯৪৪ সালে বর্তমান বাংলাদেশের কুষ্টিয়ায় নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে শেখ মুজিব বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তিনি কলকাতায় বসবাসকারী ফরিদপুরবাসীদের নিয়ে তৈরি 'ফরিদপুর ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশনের' সেক্রেটারি মনোনীত হন। এর দুই বছর পর ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের মহাসচিব নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে অর্থাৎ দেশবিভাগের বছর মুজিব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইসলামিয়া কলেজ থেকে বিএ ডিগ্রি লাভ করেন। ভারত ও পাকিস্তান পৃথক হওয়ার সময়ে কলকাতায় ভয়ানক হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হয়। এসময় মুজিব মুসলিমদের রক্ষা এবং দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সোহরাওয়ার্দীর সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক তৎপরতায় শরিক হন।

পাকিস্তান-ভারত পৃথক হয়ে যাওয়ার পর শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারির ৪ তারিখে প্রতিষ্ঠা করেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, যার মাধ্যমে তিনি উক্ত প্রদেশের অন্যতম প্রধান ছাত্রনেতায় পরিণত হন। এ সময় সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও জীবনযাত্রার নিম্নমানের উন্নয়নের জন্য এটিকেই একমাত্র সমাধান হিসেবে মনে করতে থাকেন।

### প্রাথমিক রাজনৈতিক তৎপরতা : রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন

বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত আন্দোলনে অংশ নেয়ার মাধ্যমেই শেখ মুজিবের রাজনৈতিক তৎপরতার সূচনা ঘটে। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারির ২৩ তারিখে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন গণ-পরিষদের অধিবেশনে বলেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। তার এই মন্তব্যে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। প্রতিবাদী শেখ মুজিব অবিলম্বে মুসলিম লীগের এই পূর্ব পরিকল্পিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরুর সিদ্ধান্ত নেন। এই বছরের ২ মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে একটি সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মিলনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করা হয়, যাতে শেখ মুজিব একটি প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। এখান থেকেই সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই পরিষদের আহ্বানে ১১ মার্চ ১৯৪৮ তারিখে ঢাকায় ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘট পালনকালে শেখ মুজিবসহ আরও কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মীকে সচিবালয় ভবনের সামনে থেকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু ছাত্রসমাজের তীব্র প্রতিবাদের মুখে ১৫ মার্চ শেখ মুজিব এবং অন্য ছাত্র নেতাদের মুক্তি দেয়া হয়। এদের মুক্তি উপলক্ষে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় র‍্যালি হয়, যাতে মুজিব সভাপতিত্ব করেন। পুলিশ এই র‍্যালি অবরোধ করেছিল। পুলিশি কার্যক্রমের প্রতিবাদে শেখ মুজিব অবিলম্বে ১৭ মার্চ ১৯৪৮ তারিখে দেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘটের ঘোষণা দেন। ১৯ মার্চ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে একটি আন্দোলন পরিচালনা করেন। এতে ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ তারিখে তাকে আবার আটক





করা হয় এবং বহিষ্কৃত হন। উল্লেখ্য, ২০১০ সালের ১৪ আগস্ট তাঁর হৃত ছাত্রত্ব (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ফিরিয়ে দেয়া হয়।

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২১ জানুয়ারি শেখ মুজিবকে জেল থেকে মুক্তি দেয়া হয়। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি আবার চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবি আদায়ের আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন যার জন্য তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জরিমানা করা হয়। কিন্তু তিনি এই জরিমানাকে অবৈধ ঘোষণা করে তা আদায় থেকে বিরত থাকেন। এরই ধারাবাহিকতায় ২৬ এপ্রিল মুসলিম লীগ বিরোধী প্রার্থী শামসুল হক টাঙ্গাইলে একটি উপনির্বাচনে বিজয় লাভ করেন। শেখ মুজিব তার সেই আন্দোলনের সফলতার জন্য উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অনশনের ধর্মঘট করেন, যার জন্য তাকে আবার আটক করা হয়। এ সময় তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মাচারীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান। ২৩ জুন সোহরাওয়ার্দী এবং মওলানা ভাসানী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করার পর শেখ মুজিব মুসলিম লীগ ছেড়ে দিয়ে এই নতুন দলে যোগ দেন। তাঁকে দলের পূর্ব পাকিস্তান অংশের যুগ্মসচিব নির্বাচিত করা হয়। জুনের শেষ দিকে জেল থেকে ছাড়া পান। ছাড়া পাওয়ার পরই খাদ্য সংকটের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগ দেন। এ বছরের সেপ্টেম্বর মাসে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে তাঁকে সাময়িকভাবে আটক করে রাখা হলেও অচিরেই ছাড়া পেয়ে যান। এর পর মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সাথে মিলে লিয়াকত আলি খানের কাছে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণের চেষ্টা করায় ভাসানী এবং তাঁকে আটক করা হয়। এটি ছিল অক্টোবরের শেষদিকের কথা।

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের প্রথমদিকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের পূর্ব পাকিস্তান আগমনকে উপলক্ষ করে আওয়ামী মুসলিম লীগ ঢাকায় দুর্ভিক্ষবিরোধী মিছিল বের করে। এই মিছিলের নেতৃত্ব দেয়ার কারণে এবারও শেখ মুজিব আটক হন। সেবার তার দুই বছর জেল হয়েছিল। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন ঘোষণা করেন, উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে। এ ঘোষণার পর জেলে থাকা সত্ত্বেও মুজিব প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আয়োজনে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। জেল থেকে নির্দেশনা দেয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদকে পরিচালনায় তিনি ভূমিকা রাখেন। এরপরই ২১ ফেব্রুয়ারিকে রাষ্ট্রভাষার দাবি আদায়ের দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। একই সময় শেখ মুজিব জেলে থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে অনশন পালনের সিদ্ধান্ত নেন। তার এই অনশন ১৩ দিন কার্যকর ছিল। ২৬ ফেব্রুয়ারি তাকে জেল থেকে মুক্তি দেয়া হয়।

### যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন

১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ৯ জুলাই তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনের শেষে দলের সেক্রেটারি জেনারেল (মহাসচিব) নির্বাচিত হন। একই বছরের ১৪ নভেম্বর সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য অন্যান্য দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৫৪ সালের ১০ মার্চ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি

আসনের মধ্যে ২২৩টিতে বিপুল ব্যবধানে বিজয় অর্জন করে যার মধ্যে ১৪৩টি আসনই আওয়ামী লীগ লাভ করেছিল। শেখ মুজিব গোপালগঞ্জে আসনে ১৩,০০০ ভোটের ব্যবধানে বিজয় লাভ করেন। সেখানে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল শক্তিশালী মুসলিম লীগ নেতা ওয়াহিদুজ্জামান। ১৫ মে তাকে কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়। ২৯ মে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দেয়। ৩০ মে করাচি থেকে ঢাকা ফেরার পর বিমানবন্দর থেকেই তাকে আটক করা হয়। ২৩ ডিসেম্বর মুক্তিলাভ করেন। ১৯৫৫ সালের ৫ জুন শেখ মুজিব আইন পরিষদের সদস্য মনোনীত হন। ১৭ জুন আওয়ামী লীগ পল্টন ময়দানে আয়োজিত এক সম্মেলনে ২১ দফা দাবি পেশ করে, যার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২৩ জুন দলের কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত হয়, পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন অর্জিত না হলে আইন সভার সকল সদস্য পদত্যাগ করবেন। ২৫ আগস্ট পাকিস্তানের করাচিতে গণপরিষদের অধিবেশনে শেখ মুজিব বলেন :

"Sir [President of the Constituent Assembly], you will see that they want to place the word "East Pakistan" instead of "East Bengal." We had demanded so many times that you should use Bengal instead of Pakistan. The word "Bengal" has a history, has a tradition of its own. You can change it only after the people have been consulted. So far as the question of one unit is concerned it can come in the constitution. Why do you want it to be taken up just now? What about the state language, Bengali? We will be prepared to consider one-unit with all these things. So I appeal to my friends on that side to allow the people to give their verdict in any way, in the form of referendum or in the form of plebiscite."

২১ অক্টোবর বাংলাদেশ আওয়ামী মুসলিম লীগের বিশেষ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেয়া হয়। শেখ মুজিব পুনরায় দলের মহাসচিব নির্বাচিত হন। ৩ ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আওয়ামী লীগের বৈঠকে দল থেকে খসড়া সংবিধানে স্বায়ত্তশাসন অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানানো হয়। ১৪ জুলাই রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে সামরিক উপস্থিতির বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব রাখা হয়, যা তিনিই সরকারের কাছে পেশ করেন। সেপ্টেম্বর মাসের ৪ তারিখ তাঁর নেতৃত্বে একটি দুর্ভিক্ষবিরোধী মিছিল বের হয়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের কারণে এই মিছিলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে কমপক্ষে তিনজন নিহত হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর শেখ মুজিব কোয়ালিশন সরকারে যোগ দিয়ে একযোগে শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতিরোধ এবং গ্রামীণ সহায়তা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দলের জন্য সম্পূর্ণ সময় ব্যয় করার তাগিদে ১৯৫৭ সালে ৩০ মে মন্ত্রিপরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন। ৭ আগস্ট সরকারি সফরে চীন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন গমন করেন। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা এবং সেনাবাহিনী প্রধান আইয়ুব খান দেশে সামরিক আইন জারি করে সকল ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এই বছরেরই ১১ অক্টোবর তাঁকে আটক করা হয়। জেলে থাকা অবস্থায় তাঁর বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি ভিত্তিহীন অভিযোগ আনা হয়। ১৪ মাস একটানা আটক





থাকার পর তাঁকে মুক্তি দেয়া হলেও জেলের ফটক থেকে পুনরায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

উচ্চ আদালতে একটি রিট পিটিশন দায়ের করার মাধ্যমে তিনি ১৯৬১ সালে জেল থেকে ছাড়া পান। এবার শুরু করেন গুপ্ত রাজনৈতিক তৎপরতা। অন্যান্য সাধারণ ছাত্রনেতাদের নিয়ে গোপনে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন, যার উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা আদায়ের লক্ষ্যে কাজ করা। ১৯৬২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি জননিরাপত্তা আইনে তাকে আবার আটক করা হয়েছিল। জুনের ২ তারিখে চার বছরব্যাপী মার্শাল ল' অপসারণের পর একই মাসের ১৮ তারিখে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। ২৫ জুন অন্য রাজনৈতিক নেতাদের সাথে মিলে আইয়ুব খান আরোপিত বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমে পড়েন। ৫ জুন পল্টন ময়দানে আয়োজিত এক সম্মেলনে আইয়ুব খানের সমালোচনা করেন। ২৪ সেপ্টেম্বর লাহোর যান এবং সেখানে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে মিলে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তোলেন। এটি মূলত বিরোধী দলসমূহের একটি সাধারণ কাঠামো হিসেবে কাজ করেছিল। অক্টোবর মাস জুড়ে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে মিলে বাংলার বিভিন্ন স্থান সফর করেন এই যুক্তফ্রন্টের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে। ১৯৬৩ সালে সোহরাওয়ার্দীর সাথে আলোচনার উদ্দেশ্যে লন্ডন যান, সোহরাওয়ার্দী সেখানে চিকিৎসারত ছিলেন। এই বছরের ৫ ডিসেম্বর তিনি বৈরুতে মৃত্যুবরণ করেন।

সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর ১৯৬৪ সালের ২৫ জানুয়ারি মুজিবের বাসায় অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে আওয়ামী লীগকে পুনরায় সংহত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই বৈঠকের প্রস্তাবের ভিত্তিতে শেখ মুজিব তৎকালীন পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের মহাসচিব ও মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশকে দলের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ১১ মার্চ একটি সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় যার মাধ্যমে মুজিব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধকল্পে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সেনাশাসক আইয়ুব খানের বেসিক ডেমোক্রেসিস প্ল্যান, সামরিক শাসন এবং এক-ইউনিট পদ্ধতির বিরোধী নেতাদের মধ্যে অগ্রগামী ছিলেন শেখ মুজিব। এই পদ্ধতি অনুযায়ী ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার পরিকল্পনা করা হয় এবং প্রদেশগুলোকে একত্রে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে কাজ করতে গিয়ে, মুজিব আইয়ুববিরোধী দল প্রার্থী ফাতিমা জিন্নাহকে সমর্থন করেন। যথারীতি নির্বাচনের দুই সপ্তাহ পূর্বে তাকে আটক করা হয়। তাকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং আপত্তিকর প্রস্তাব পেশের অভিযোগে অভিযুক্ত করে এক বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। অবশ্য উচ্চ আদালতের এক রায়ে তার আগেই তিনি মুক্তি পেয়ে যান। এ সময় সামরিক বাহিনীর গণহত্যা আর বাঙালিদের চাহিদা পূরণে সামরিক শাসকদের ঔদাসীন্য পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে ক্ষুব্ধ করে তোলে।

### ছয় দফা আন্দোলন

১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলসমূহের একটি জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনেই শেখ মুজিব তার ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি পেশ করেন, যাতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের পরিপূর্ণ রূপরেখা উল্লিখিত হয়েছিল। শেখ মুজিব এই দাবিকে

'আমাদের বাঁচার দাবি' শিরোনামে প্রচার করেছিলেন। এই দাবির মূল বিষয় ছিল একটি দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পরিচালিত পাকিস্তানি ফেডারেশনে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন। এই দাবি সম্মেলনের উদ্যোক্তারা প্রত্যাখ্যান করেন এবং শেখ মুজিবকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করেন। এ কারণে তিনি উক্ত সম্মেলন বর্জন করে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসেন। মার্চ মাসের এক তারিখে শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনের পর তিনি ছয় দফার পক্ষে সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে দেশব্যাপী অভিযান পরিচালনা করেন। প্রায় পুরো দেশই ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণের সময় তিনি সিলেট, ময়মনসিংহ এবং ঢাকায় বেশ কয়েকবার পুলিশের হাতে বন্দি হন। বছরের প্রথম চতুর্থাংশেই তাকে আটবার আটক করা হয়েছিল। এই বছরের মে মাসের ৮ তারিখে নারায়ণগঞ্জে পাট কারখানার শ্রমিকদের এক র‍্যালিতে অংশগ্রহণের জন্য তাকে আবার গ্রেফতার করা হয়। তার মুক্তির দাবিতে ৭ জুন দেশব্যাপী ধর্মঘট পালিত হয়। পুলিশ এই ধর্মঘট চলাকালে গুলিবর্ষণ করে, যার কারণে ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জে আনুমানিক তিনজনের মৃত্যু হয়।

### আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

সেনাবাহিনী কর্তৃক আটক হয়ে জেলে দুই বছর থাকার পর ১৯৬৮ সালের প্রথমদিকে পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিব এবং আরও ৩৪ জন বাঙালি সামরিক ও সিএসপি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে, যা ইতিহাসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে সুপরিচিত। মামলায় উল্লেখ করা হয়েছিল শেখ মুজিবসহ এই কর্মকর্তারা ভারতের ত্রিপুরা অঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত আগরতলা শহরে ভারত সরকারের সাথে এক বৈঠকে পাকিস্তানকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা তৈরি করেছে। এতে শেখ মুজিবকে এক নম্বর আসামি করা হয় এবং পাকিস্তান বিভাগের এই ষড়যন্ত্রের মূল হোতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অভিযুক্ত সব আসামিকে ঢাকা সেনানিবাসে অন্তরীণ করে রাখা হয়। এর অব্যবহিত পরেই পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। এই মামলাকে মিথ্যা আখ্যায়িত করে সর্বস্তরের মানুষ শেখ মুজিবসহ অভিযুক্ত সবার মুক্তির দাবিতে রাজপথে নেমে আসে। এহেন পরিস্থিতিতে একই বছরের ১৯ জুন ঢাকা সেনানিবাসের অভ্যন্তরে কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে অভিযুক্ত আসামিদের বিচারকার্য শুরু হয়।

### ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

বিচারকার্য চলাকালীন ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি ৫ তারিখে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাদের এগার দফা দাবি পেশ করে, যার মধ্যে শেখ মুজিবের ছয় দফার সব দফাই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলনের প্রস্তুতি গৃহীত হয়। এই সংগ্রাম এক সময় গণআন্দোলনে রূপ নেয়। এই গণআন্দোলনই ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত। মাসব্যাপী প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলন, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ, কারফিউ, পুলিশের গুলিবর্ষণ এবং বেশ কিছু হতাহতের পর আন্দোলন চরম রূপ ধারণ করলে পাকিস্তান সরকার ছাড় দিতে বাধ্য হয়। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খান রাজনৈতিক নেতাদের সাথে এক গোলটেবিল বৈঠকের পর এই মামলা প্রত্যাহার করে নেন। এর সাথে শেখ মুজিবসহ অভিযুক্ত সকলকে মুক্তি





দেয়া হয়। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এই বছরের ২৩ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবের সম্মানে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক সভার আয়োজন করে। লাখো জনতার এই সম্মেলনে শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদান করা হয়। উপাধি প্রদানের ঘোষণা দিয়েছিলেন জনাব তোফায়েল আহমেদ। এই সভায় রাখা বক্তৃতায় শেখ মুজিব ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগার দফা দাবির পক্ষে তার পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন।

১৯৬৯ সালে আইয়ুব খানের আহ্বানে অনুষ্ঠিত একটি সর্বদলীয় সম্মেলনে মুজিব তাঁর ছয়-দফাসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের চাহিদাগুলো মেনে নেওয়ার আহ্বান জানান এবং তা প্রত্যাখ্যাত হলে সম্মেলন থেকে বের হয়ে আসেন। ১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক জনসভায় মুজিব ঘোষণা করেন, এখন থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে 'বাংলাদেশ' নামে অভিহিত করা হবে :

"একটা সময় ছিল যখন এই মাটি আর মানচিত্র থেকে 'বাংলা' শব্দটি মুছে ফেলার সব ধরনের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। 'বাংলা' শব্দটির অস্তিত্ব শুধু বঙ্গোপসাগর ছাড়া আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যেত না। আমি পাকিস্তানের পক্ষ থেকে আজ ঘোষণা করছি যে, এখন থেকে এই দেশকে 'পূর্ব পাকিস্তানের' বদলে 'বাংলাদেশ' ডাকা হবে"।

মুজিবের এই ঘোষণার ফলে সারা দেশে গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদ এবং সামরিক কর্তারা তাঁকে একজন বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হিসেবে মূল্যায়িত করতে শুরু করেন। মুজিবের বাঙালি সংস্কৃতি ও জাতিগত আত্মপরিচয়ের বহিঃপ্রকাশ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করে। অনেক বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিত্বের মতে, বাঙালিদের আন্দোলন দ্বিজাতিতত্ত্বকে অস্বীকার করার নামান্তর। এই দ্বিজাতিতত্ত্বের মাধ্যমেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। বাঙালিদের জাতিগত ও সংস্কৃতিগত এই আত্মপরিচয় তাদেরকে একটি আলাদা জাতিসত্তা প্রদান করে। মুজিব পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক জনমত গড়ে তুলতে সমর্থ হন এবং কার্যত ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন।

### ১৯৭০-এর নির্বাচন ও স্বাধীনতা যুদ্ধ

১৯৭০ সালের নির্বাচনে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক আইনসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পূর্ব পাকিস্তানের কোটার ২টি আসন ছাড়া বাকি সবগুলোতে জয়ী হওয়ার জন্য জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাও অর্জন করে আওয়ামী লীগ। নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে মেরুকরণ সৃষ্টি করে। পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টো, মুজিবের স্বায়ত্তশাসনের নীতির প্রবল বিরোধিতা করেন। ভুট্টো অ্যাসেম্বলি বয়কট করার হুমকি দিয়ে ঘোষণা দেন যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান মুজিবকে সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানালে তিনি সে সরকারকে মেনে নেবেন না।

রাজনৈতিক অস্থিশীলতার মধ্যে ইয়াহিয়া খান সংসদ ডাকতে দেরি করছিলেন। বাঙালিরা এতে বুঝে ফেলে যে, মুজিবের দলকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও সরকার গঠন করতে দেয়া হবে না। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় শেখ মুজিব

স্বাধীনতার ডাক দেন এবং জনগণকে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করেন।

ইয়াহিয়া খান সামরিক আইন জারি করেন, আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং মুজিবসহ আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতাদের গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী রাজনৈতিক ও জনসাধারণের অসন্তোষ দমনে ২৫ মার্চ অপারেশন সার্চলাইট শুরু করে। সামরিক বাহিনীর অভিযান শুরু হলে মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।

মূল ঘোষণার অনুবাদ নিম্নরূপ : 'এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের মানুষকে আহ্বান জানাই, আপনারা যেখানেই থাকুন, আপনাদের সর্বস্ব দিয়ে দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ চালিয়ে যান। বাংলাদেশের মাটি থেকে সর্বশেষ পাকিস্তানি সৈন্যটিকে উৎখাত করা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের আগ পর্যন্ত আপনাদের যুদ্ধ অব্যাহত থাকুক'।

মুজিবকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ফয়সালাবাদের একটি জেলে কড়া নিরাপত্তায় রাখা হয়। পাকিস্তানি জেনারেল রহিমুদ্দিন খান মুজিবের মামলার পরিচালনা করেন। মামলার আসল কার্যপ্রণালী এবং রায় কখনই জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি। এ মামলাটি 'লায়ালপুর ট্রায়াল' হিসেবে অভিহিত।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরিচালিত অভিযান অল্প সময়ের মধ্যেই হিংস্রতা ও তীব্র রক্তপাতে রূপ নেয়। রাজাকারদের সহায়তায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালি বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ ও ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দসহ সাধারণ মানুষকে আক্রমণ করে। বাঙালি ও অবাঙালি হিন্দুদেরকে লক্ষ্য করে বিশেষ অভিযানের কারণে সারা বছরজুড়ে প্রচুর হিন্দু জনগোষ্ঠী সীমান্ত অতিক্রম করে পার্শ্ববর্তী পশ্চিম বঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায় আশ্রয় গ্রহণ করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ও পুলিশ রেজিমেন্টে কর্মরত পূর্ব বাংলার সদস্যবৃন্দ দ্রুত বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং লীগ সদস্যবৃন্দ কলকাতায় তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে প্রবাসে বাংলাদেশ সরকার গঠন করে। পূর্ব পাকিস্তানে মুক্তি বাহিনীর নেতৃত্বে বড় রকমের বিদ্রোহ সংঘটিত হতে থাকে। আন্তর্জাতিক চাপ থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানি সরকার মুজিবকে ছেড়ে দিতে এবং তাঁর সাথে সমঝোতা করতে অস্বীকৃতি জানায়।

যুদ্ধবর্তী সময়ে মুজিবের পরিবারকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়। তাঁর সন্তান শেখ কামাল মুক্তি বাহিনীর একজন গুরুত্বপূর্ণ অফিসার ছিলেন। মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তান বাহিনীর ভিতরে সংঘটিত যুদ্ধটিই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ নামে পরিচিত। ১৯৭১ সালে ভারতীয় সরকারের অংশগ্রহণের পর, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর যৌথ দলের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং লীগ নেতৃবৃন্দ ঢাকায় ফিরে সরকার গঠন করেন। পাকিস্তানি শাসকবৃন্দ মুজিবকে ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি মুক্তিদান করে। এরপর তিনি লন্ডন হয়ে নতুন দিল্লিতে ফিরে আসেন এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাতের পর জনসমক্ষে 'ভারতের জনগণ, আমার জনগণের শ্রেষ্ঠ বন্ধু' বলে তাঁকে





সাধুবাদ জানান। তিনি ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশে ফিরে আসেন। গান্ধীর সাথে সেদিন তিনি ঢাকায় জড়ো হওয়া প্রায় পাঁচ লাখ মানুষের সামনে বক্তৃতা দেন।

### বাংলাদেশের শাসন

শেখ মুজিবুর রহমান অল্পদিনের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন রাষ্ট্রপতি ছিলেন এবং পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭০-এ পূর্ব পাকিস্তান আইনসভার জন্য নির্বাচিত রাজনীতিবিদরা নতুন রাষ্ট্রের প্রথম সংসদ গঠন করেন। মুক্তিবাহিনী এবং অন্যান্য মিলিশিয়াদের নিয়ে নতুন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গঠিত হয়। তাঁরই অভিপ্রায়ক্রমে ১৭ মার্চ ১৯৭২ ভারতীয় বাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের ভূখণ্ড ত্যাগ করে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব গ্রহণ সম্পর্কে টাইম ম্যাগাজিন ইউএসএ ১৭ জানুয়ারি ১৯৭২ ভাষায়, গত মার্চে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর পর বিশ্বব্যাংকের পরিদর্শকদের একটি বিশেষ টিম কিছু শহর প্রদক্ষিণ করে বলেছিলেন, ওগুলোকে দেখতে ভুতুড়ে নগরী মনে হয়। এরপর থেকে যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত এহেন ধ্বংসলীলার ক্ষান্তি নেই। ৬০ লাখ ঘরবাড়ি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ২৪ লাখ কৃষক পরিবারের কাছে জমি চাষের মতো গরু বা উপকরণও নেই। পরিবহনব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, পুল-কালভার্টের চিহ্নও নেই এবং অভ্যন্তরীণ নৌ-যোগাযোগেও অনেক বাধাবিঘ্ন। এক মাস আগে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ পর্যন্ত দেশের ওপর নির্বিচার বলাৎকার চলেছে। যুদ্ধের শেষদিকে পাকিস্তানি মালিকানাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো (কার্যত প্রতিটি ব্যবসা ক্ষেত্রই পাকিস্তানিদের দখলে ছিল) তাদের সব অর্থ-সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করে দেয়। যুদ্ধ শেষে চট্টগ্রামে পাকিস্তান বিমানের অ্যাকাউন্টে মাত্র ১১৭ রুপি জমা পাওয়া গিয়েছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ব্যাংক নোট ও কয়েনগুলো ধ্বংস করে দেয়। ফলে সাধারণ মানুষ নগদ টাকার প্রকট সংকটে পড়ে। রাস্তা থেকে প্রাইভেটকারগুলো তুলে নেওয়া হয়, গাড়ির ডিলারদের কাছে থাকা গাড়িগুলো নিয়ে নেওয়া হয় এবং এগুলো নৌবন্দর বন্ধ হওয়ার আগ মুহূর্তে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করে দেওয়া হয়।

বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে স্বীকৃতি লাভের পর শেখ মুজিব পাকিস্তান, ওআইসি, জাতিসংঘ ও জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে বাংলাদেশের সদস্যপদ নিশ্চিত করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে ভ্রমণ করে বাংলাদেশের জন্য মানবীয় ও উন্নয়নকল্পের জন্য সহযোগিতা চান। তিনি ভারতের সাথে একটি ২৫ বছর মেয়াদী মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষর করেন যাতে অর্থনৈতিক ও মানব সম্পদ উন্নয়নে ব্যাপক সাহায্যের আশ্বাস দেয়া হয়। চুক্তিতে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনী ও সরকারী কর্কমর্তাদের প্রশিক্ষণের শর্ত অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুজিব ইন্দিরা গান্ধীর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখেন। মুজিবের জীবদ্দশায় দুই সরকারের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা ছিল।

মুজিব তাঁর অন্তর্বর্তী সংসদকে একটি নতুন সংবিধান রচনার দায়িত্ব দেন এবং চারটি মূলনীতি হিসেবে 'জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র' ঘোষণা করেন যা মুজিববাদ নামেও পরিচিত। মুজিব শতাধিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও কোম্পানি রাষ্ট্রীয়করণ করেন এবং ভূমি ও মূলধন বাজেয়াপ্ত করে ভূমি পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে কৃষকদের সাহায্যের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধকালে ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী ১ কোটি শরণার্থীর পুনর্বাসনের জন্য

বড় পদক্ষেপ নেয়া হয়। এর ফলে অর্থনৈতিক সঙ্কট হ্রাস পেতে শুরু করে এবং সমূহ দুর্ভিক্ষ এড়ানো সম্ভব হয়। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর থেকে নতুন সংবিধান কার্যকর করা হয় এবং ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে শেখ মুজিব ও তাঁর দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং তিনি বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচিত সরকার গঠন করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, খাদ্য, স্বাস্থ্য, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি ঘটান। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় কৃষি, গ্রামীণ অবকাঠামো ও কুটির শিল্প উন্নয়নে প্রাগ্রাধিকারমূলক সরকারি অর্থ বরাদ্দের নির্দেশ দেয়া হয়।

ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও মুজিব ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইসলামি অনুশাসনের পথে অগ্রসর হন। তিনি পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে আঁতাতের অভিযোগে ১৯৭২ সালে নিষিদ্ধ ঘোষিত ইসলামিক একাডেমি পুনরায় চালু করেন। ইসলামিক গোত্রগুলোর জোর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মদ তৈরি ও বিপণন এবং জুয়া খেলা নিষিদ্ধ করেন। তাঁরই সিদ্ধান্তক্রমে বাংলাদেশ অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স ও ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক-এর সদস্যপদ গ্রহণ করে। মুজিব ১৯৭৪ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত ওআইসি সম্মেলনে যোগ দিতে যান যা পাকিস্তানের সাথে কিছুমাত্রায় সম্পর্ক উন্নয়ন ও পাকিস্তানের স্বীকৃতি পেতে সহায়তা করে। জনসাধারণের সামনে উপস্থিতি ও ভাষণের সময় শেখ মুজিব ইসলামিক সম্ভাষণ ও গ্লোগান ব্যবহার বাড়িয়ে দেন এবং ইসলামিক আদর্শের উল্লেখ করতে থাকেন। শেষ বছরগুলোতে মুজিব তাঁর স্বভাবসুলভ 'জয় বাংলা' অভিবাদনের বদলে ধার্মিক মুসলিমদের পছন্দনীয় 'খোদা হাফেজ' বলতেন।

## ১৫ আগস্ট ১৯৭৫

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট প্রত্যুষে একদল তরুণ সেনা কর্মকর্তা ট্যাঙ্ক দিয়ে রাষ্ট্রপতির ধানমন্ডিস্থ বাসভবন ঘিরে ফেলে এবং শেখ মুজিব, তাঁর পরিবার এবং তাঁর ব্যক্তিগত কর্মচারীদের হত্যা করে। কেবল তাঁর দুই মেয়ে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা পশ্চিম জার্মানিতে অবস্থান করার কারণে বেঁচে যান। তাদের বাংলাদেশে ফিরে আসার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। সেনা অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেন বিক্ষুব্ধ আওয়ামী লীগের সদস্য এবং সামরিক কর্মকর্তারা। এদের মধ্যে ছিলেন শেখ মুজিবের প্রাক্তন সহকর্মী খন্দকার মোশতাক আহমেদ, যিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

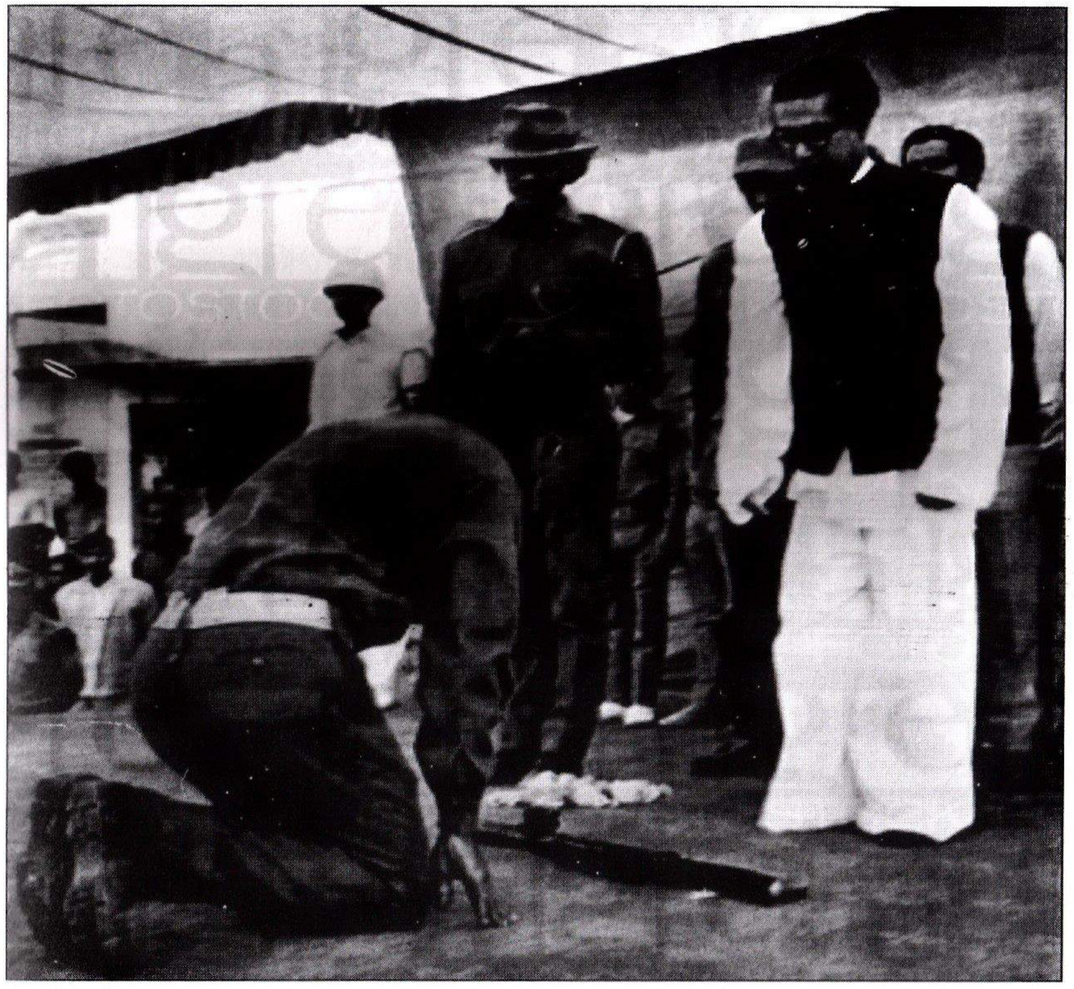
সংকীর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী খন্দকারকে অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষক,পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠ চর বলে ও সন্দেহ করেন। পাকিস্তানের ভুট্টো সরকারই প্রথম স্বীকৃতি দিয়েছে এই নতুন সরকারকে।

২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫ তারিখে মুজিব হত্যাকাণ্ডের বিচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে খন্দকার মোশতাক সরকার ইমডেমনিটি (দায়মুক্তি) অধ্যাদেশ জারি করে এবং জেনারেল জিয়াউর রহমান ও পাকিস্তানপন্থি প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীতে তার বৈধতা দেয়া হয়, যা ১২ আগস্ট, ১৯৯৬ তারিখে সংসদে রহিত





করা হয়।। সংবাদ মাধ্যমে এ হত্যাকাণ্ডের ইন্ধনদাতা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি 'সিআইএ'কে দায়ী করা হয়। বাংলাদেশে অবস্থিত তৎকালীন রাষ্ট্রদূত ইউজিন দিয়ে লরেন্স লিফসুল্‌জ সিআইএ-কে অভ্যুত্থান ও গণহত্যার জন্য দোষারোপ করেন। মরদেহ তাঁর জন্মস্থান টুঙ্গিপাড়ায় হেলিকপ্টারে করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সামরিক তত্ত্বাবধানে দাফন করা হয়। অন্যদের ঢাকার বনানী কবরস্থানে দাফন করা হয়।



যুদ্ধোত্তর নবগঠিত বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের বঙ্গবন্ধুর কাছে অস্ত্রসমর্পণ

মুজিবের মৃত্যু বাংলাদেশকে বহু বছরের রাজনৈতিক সংঘাতের দিকে টেনে নেয়। সেনা অভ্যুত্থানের নেতারা অল্পদিনের মধ্যেই উচ্ছেদ হয়ে যান এবং অভ্যুত্থান, পাল্টা অভ্যুত্থান আর রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে দেশ অচল হয়ে পড়ে। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর আরেকটি সেনা অভ্যুত্থানের ফলশ্রুতিতে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসীন হয়।

সেনা অভ্যুত্থানের অন্যতম প্রধান নেতা কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমানসহ ১৪ জন সেনা কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করা হয়। বাকিরা বিদেশে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

**স্বাধীনতা যুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু দুটি শব্দ একই সূত্রে গাঁথা**

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু দুটি শব্দ একই সূত্রে গাঁথা। বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাংলাদেশের জন্ম হতো না। ১৯৭০ সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের জনগণের জাতীয় প্লাটফর্মে পরিণত হয়েছিল এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাঙালি জনগণের অবিসংবাদিত জাতীয় নেতা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। বস্তুত 'বাংলাদেশ' ও 'বঙ্গবন্ধু'–এ দুটি শব্দ পরস্পরের সঙ্গে এমন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে পড়েছিল যে 'জয় বাংলা' ধ্বনির সঙ্গে যে ধ্বনিটি তখন প্রায়ই শোনা যেত সেটা হলো 'তোমার দেশ আমার দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ'। আর এই গ্লোগানকে ধারণ করেই আমরা অর্জন করেছি স্বাধীন বাংলা।

বাঙালি জাতির সবচেয়ে বড় অর্জন স্বাধীনতা। টানা ৯ মাসের সশস্ত্র যুদ্ধ ও ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এ স্বাধীনতা। ১৯৫২ সাল থেকেই শুরু হয়েছিল রক্তদানের পালা। তারপর রাজনীতির দীর্ঘ চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে আসতে হয়েছিল স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে। একাত্তরের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'যার যা আছে, তা-ই নিয়ে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার' আহ্বান জানিয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন–'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। বলতে গেলে সেদিনই বাঙালির বুকে স্বাধীনতার বীজমন্ত্র বোনা হয়ে যায়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো, তিনি আমাদের বাঙালি জাতিসত্তাকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই প্রক্রিয়া হঠাৎ করে হয়নি। বাঙালির দীর্ঘদিনের আত্মানুসন্ধান, দীর্ঘদিনের আন্দোলন ও সংগ্রামের অমোঘ পরিণতি হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু তাঁর বিখ্যাত ভাষণে বাংলার জনগণকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন–'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল।' মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার সপক্ষে এর চেয়ে বলিষ্ঠ ও পরিষ্কার আহ্বান আর কী হতে পারত সে সময়? বস্তুত আমাদের মুক্তিযুদ্ধ তো তখন থেকে শুরু হয়ে গিয়েছিল। একাত্তরের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বেচ্ছায় পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর হাতে ধরা দেওয়ার পেছনে বোধ হয় একটা কৌশলগত কারণ ছিল। এর ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি বিশ্ব জনমতের সমর্থন লাভ করা সহজতর হয়েছিল।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার জন্য পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে যে এককভাবে দায়ী করেছিল, সেটা পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রকাশিত শ্বেতপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। জেনারেল ইয়াহিয়া দম্ভভরে ঘোষণা করেছিল–'This time Mujib will not go unpunished' পাকিস্তান রাষ্ট্রকে ভেঙে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করার পথ সুগম করার অপরাধে পাকিস্তানি সামরিক সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে মৃত্যুদণ্ড দিতে বদ্ধপরিকর হয়েছিল। কিন্তু বিশ্ব জনমতের ভয়ে তারা সেই দণ্ড কার্যকর করতে পারেনি। শুধু তা-ই নয়, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই শেখ মুজিবকে তারা মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিল।





বঙ্গবন্ধু, বাঙালি ও বাংলাদেশ অবিচ্ছেদ্য। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা। বাঙালি জাতির ভাবমূর্তি ও গণতন্ত্রের মানসপুত্র, কিংবদন্তির মহানায়ক। যার সুদীর্ঘ আত্মত্যাগ, আন্দোলন, কারাবরণ, সংগ্রাম ও নেতৃত্বের ফলে বাঙালি জাতি তাদের নিজস্ব একটি আবাসভূমি–একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ পেয়েছে। স্বাধীনতা পেয়েছে। শেখ মুজিব শুধু একজন মানুষের নাম নয়, তিনি একটি ইতিহাস, তিনি একটি প্রতিষ্ঠান। একটি দেশের নাম। একটি ভূখণ্ডের নাম। একটি মানচিত্রের নাম। একটি জাতির নাম। বঙ্গবন্ধু সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাঙালি জাতির সবচেয়ে বড় সম্পদ।

তবে একটা কথা সত্য কাঁদতে চায়নি বাংলাদেশ, তবুও কেঁদেছে। মুজিবকে হারিয়ে, হেরেছে বাংলাদেশ। কিন্তু স্বাধীনতা বিরোধীদের ষড়যন্ত্রের কবল থেকে তিনি বাঁচতে পারেননি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে শহীদ হন। দেশের জন্য এই আত্মত্যাগ বাঙালি জাতি কোনো দিন ভুলবে না। বাঙালি মুক্তির ত্রাণকর্তা স্বাধীন বাংলার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি ছিলেন সবার মাঝে, আছেন, থাকবেন। বাঙালির হৃদয়ে চির অম্লান।

**স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধু**

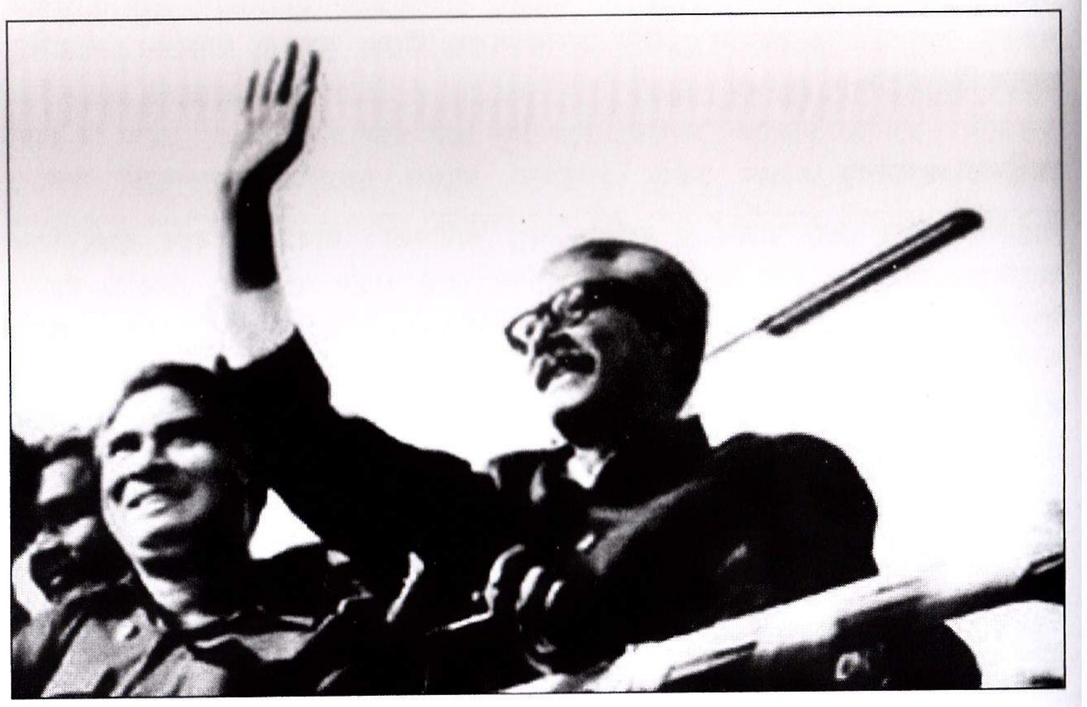
বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন ও লালিত স্বপ্ন স্বাধীনতা। দীর্ঘ ২৩ বছর রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীনতা এবং ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় স্বাধীনতার চূড়ান্ত বিজয়। বাঙালি জাতিকে একটি স্বাধীন দেশের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন বাঙালির মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্থপতি এবং স্বপ্নদ্রষ্টা। স্বাধীনতার জন্য বঙ্গবন্ধু দীর্ঘ ২৩ বছর অনবরত শত নির্যাতন, জেল জুলুম অসংখ্যবার কারাবরণ করেছেন। তিনি বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে জয় ছিনিয়ে আনেন।

বাঙালি জাতীয়তাবাদ এক মহাকাব্য আর সেই মহাকাব্যের নায়ক ছিলেন বঙ্গবন্ধু। পাকিস্তানি রাষ্ট্রকাঠামোর অধীনে বাঙালি জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থান ঘটান বঙ্গবন্ধু। এর পরিণতিতে নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা। বাঙালি জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থান ও স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর মতো সাহস আর কারোর মধ্যে দেখা যায়নি। ফাঁসির মঞ্চ থেকে তিনি একাধিকবার ফিরে এসেছেন, আপস করেননি। আর সেই স্বাধীনতার শক্তি আর বাঙালি জাতীয়তাবোধের চেতনাকে লালন করে স্বাধীনতার ৪৪ বছর পরেও আমরা আমাদের স্বপ্নপূরণ করতে পারিনি।

স্বদেশবিরোধী কুচক্রী মহলের কর্মকাণ্ড, দলতন্ত্র, সামরিকতন্ত্র ও সুশাসনের অভাব আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে ও সোনার বাংলা গড়ায় বড় ধরনের বাধা। ৪৪ বছরে আমাদের যতটুকু এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল তা হয়নি, ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে যে রাজনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি হয় তা আমাদের উন্নয়নের পথকে বাধাগ্রস্ত করেছে। দূরে সরে গেছে অনেকখানি স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য থেকে। আর বঙ্গবন্ধুর নাম ইতিহাস মুছে ফেলতে চেয়েছে। শেষ পর্যন্ত পারেনি। আবার কখনো সামরিক শাসন

আবার কখনো স্বৈরশাসক শাসনে ভুগতে হয়েছে বাঙালিকে। এ সময় বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা রাজনীতিতে সক্রিয় হন। দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যদিয়ে ২১ বছর পর ক্ষমতায় আসেন তিনি। পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন দেখা গেছে আজকের প্রজন্মের মাঝেও।

আজকের প্রজন্মকে বুঝতে হবে, ইতিহাসবিদরা দেশের জন্য স্বপ্ন দেখেন না। দেশের জন্য স্বপ্ন দেখেন রাজনীতিবিদরা। এ স্বপ্নে আদর্শ থাকে, দর্শন থাকে। এ রকম স্বপ্ন যাঁরা দেখেন তাঁরাই স্বাপ্নিক। সেই স্বাপ্নিক রাজনীতিবিদরাই ইতিহাস সৃষ্টি করেন। ইতিহাসবিদরা ইতিহাস সৃষ্টি করেন না, তারা কেবল ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন ও বিশ্লেষণ করেন। আজকের প্রজন্মকে আরও বুঝতে হবে, অবিসংবাদিত রাজনীতিবিদ হিসেবে বাঙালি জাতির জন্য এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।



বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পাকিস্তান থেকে দেশের মাটিতে পা রাখলে এভাবে প্রাণঢালা সংবর্ধনার মাধ্যমে বরণ করে নেয়া হয় তাকে

বাংলাদেশের স্বাধীনতার আন্দোলন ও সংগ্রামের দীর্ঘ পথচলায় যে কয়টি তারিখ উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করছে, একাত্তরের ২৬ মার্চ তার অন্যতম। একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্য বাঙালি জাতির গভীর আবেগজড়িত বিজয়গাথার নাম একাত্তর। একাত্তরে নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে এবং এই একাত্তরে (১৯৭১ সাল) বাংলাদেশ পরাধীন থেকে স্বাধীন হয়েছে। একাত্তর হঠাৎ করে আসেনি। সুদীর্ঘ সময়ের আন্দোলন-সংগ্রামের পথ বেয়ে এমন এক পর্যায়ে আসে একাত্তর, আর সেটাই হয় বাঙালির স্বপ্ন-স্বাধীনতার আন্দোলন-সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্ব।





একাত্তরের ইতিহাস লিখতে গেলে যে পরিসরেই হোক না কেন, তার সঙ্গে লিখতে হবে তার পূর্ববর্তী ইতিহাসও। পাকিস্তান সৃষ্টির সাত মাসের মধ্যেই বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার দাবিতে বাঙালি সোচ্চার হয়েছে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিকে এমনভাবে একাট্টা করেছিল যে, তার দু'বছরের মাথায় নির্বাচনে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মুসলিম লীগকে রাজনৈতিকভাবে এদেশ থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছিল। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুলভাবে বিজয়ী হয়ে পূর্ব বাংলার (পূর্ব পাকিস্তান) উন্নয়নে কাজ করার গণরায় পেল। বাঙালিরা প্রাদেশিক সরকার গঠন করে।

মাত্র ৫৫ দিনের মাথায় নির্বাচিত প্রাদেশিক সরকারকে অন্যায়ভাবে বাতিল করে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। যুক্তফ্রন্ট সরকারকে কাজ করতে দেয়া হলো না। সেই সাথে বাধাগ্রস্ত হয়েছে বাঙালির গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা।

১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের গণপরিষদে খসড়া শাসনতন্ত্র বিল পাস করা হয়। এ শাসনতন্ত্রে বাংলার (এ দেশের) দাবি উপেক্ষিত হওয়ার প্রতিবাদে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সদস্যগণ পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করেন।

এভাবে বাঙালির দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য গণপরিষদে শেখ মুজিব তাঁর দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞা দিয়ে নিজেকে একজন অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে নেয়। এই সামরিক জান্তা গণতান্ত্রিক শক্তিকে ধ্বংস করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। গায়ের জোরে দেশ চালাতে লাগেন। রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতার, নির্যাতন ও নিষেধাজ্ঞা জারির মাধ্যমে আইয়ুব খান একরকম ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য স্বার্থান্বেষী রাজনীতিকদের নিয়ে রাজনৈতিক দল গঠন করে। আইয়ুব খান প্রবর্তন করে এক নতুন পদ্ধতি 'মৌলিক গণতন্ত্র'। অর্থনীতি, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করা হলো। এর বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতা প্রতিবাদে ফুঁসে উঠতে থাকে।

১৯৬১ সালের শেষ দিকে সামরিক জান্তা আইয়ুব খান ও সামরিক আইনের বিরুদ্ধে বাঙালির আন্দোলন-সংগ্রাম তীব্রতর হতে শুরু করে। বাঙালির ঐতিহ্য পরিপন্থি শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করে। আন্দোলনের প্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান শিক্ষানীতি বাতিল করতে বাধ্য হয়। বাঙালির বিজয় হয় এই আন্দোলনে। গত শতকের ষাট দশকের প্রথম পর্বে বাঙালির মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের মূল সংগঠকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

১৯৬৩ সালে আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবনে তিনিই মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি সব গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বাঙালি এ ক'বছর রাজনৈতিক ঘটনাবলির মধ্য দিয়ে রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে ওঠে। বাঙালির মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের উৎসাহে তৎকালীন ছাত্রলীগের নেতৃত্বে গড়ে তোলা হয় সশস্ত্র সংগ্রামের একটি বিপ্লবী প্রক্রিয়া, সেটি স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ বা নিউকিয়াস বলে খ্যাত। এ নিউকিয়াসের দায়িত্বে ছিলেন সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও

কাজী আরেফ আহমেদ। এ সংগঠনের পরবর্তী নেতৃত্বে যুক্ত হন শেখ ফজলুল হক মণি ও তোফায়েল আহমেদ। এ নিউকিয়াসের লক্ষ্য ছিল সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা। সারাদেশব্যাপী শিক্ষা আন্দোলনসহ সকল রাজনৈতিক আন্দোলনে নিউকিয়াসের ভূমিকা স্মরণযোগ্য। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার বাঙালির নিরাপত্তা বিধানে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।

স্বৈরশাসক সামরিক জান্তা আইয়ুব খান এ দেশের গণতান্ত্রিক শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে বাঙালিকে শৃঙ্খলিত করার ষড়যন্ত্রে যখন লিপ্ত তখন ১৯৬৬ সালে ৫ ফেব্রুয়ারি লাহারে বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সম্মিলিত বিরোধী দলগুলোর এক কনভেনশনে স্বাধিকারের দাবি সংবলিত বাঙালির মুক্তির সনদ ঐতিহাসিক ছয় দফা উত্থাপন করেন। এদিকে ছয় দফা কর্মসূচি আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। এ ছয় দফা ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ। এ জন্য বঙ্গবন্ধু ছয় দফা সম্পর্কে বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন–'সাঁকো দিলাম, স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতায় উন্নীত হওয়ার জন্য।'

ছয় দফার পক্ষে জনমত সংগঠিত করার লক্ষ্যে সারাদেশে পঁয়ত্রিশ দিনে বত্রিশটি জনসভায় বঙ্গবন্ধু ভাষণ দেন। জনমত প্রবল হয়ে ওঠায় বঙ্গবন্ধুসহ আওয়ামী লীগের নেতাদের ওপর নেমে আসে গ্রেফতার ও নির্মম নির্যাতন। বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হওয়ার পরও ৬ দফা আন্দোলন চলতে থাকে। ১৯৬৬ সালের ৭ জুন সারা বাংলায় সাধারণ ধর্মঘট (হরতাল) পালিত হয়।

৭ জুনের সাধারণ ধর্মঘটের সময় পুলিশের গুলিতে সরকারি হিসেবমতে ১০ বাঙালি নিহত হয়। এরপর পাকিস্তান সরকার প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, তৎকালীন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা তাজউদ্দীন আহমদ সর্বদাই বঙ্গবন্ধুর পাশে ছিলেন। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হয়ে তাজউদ্দীন আহমদ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের ছায়াতলে নীরবে কাজ করেন। তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর আদর্শে নিবেদিতপ্রাণ। দলের সংগ্রামে ও সংকটে তাজউদ্দীন আহমদ হাল ধরেন।

রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান গং (আগরতলা ষড়যন্ত্র বলে খ্যাত) মামলায় অভিযুক্তদের সাক্ষাৎকার ও প্রবন্ধ-নিবন্ধে লেখনীর মাধ্যমে জানা যায়, ১৯৬৪ সালে স্বাধীনতাকামী ও মুক্তিকামী সেনা নেতৃত্ব তাদের সশস্ত্র সংগ্রামের পরিকল্পনা নিয়ে আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা সশস্ত্র সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ মুজিবকে অনুরোধ করেন। এ ঘটনাটি পাকিস্তানি গোয়েন্দার কাছে ফাঁস হয়ে যায়। এর পরিণতিতে বাঙালির মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে কঠিন শাস্তি দেয়ার জন্য দায়ের করা হলো আগরতলা মামলা (পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর দৃষ্টিতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা আর বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিতে ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র মামলা)।

আসামি করা হলো বাঙালির প্রাণপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগ ও বাঙালি জাতীয়তাবোদের চেতনায় বিশ্বাসী অনেক দেশপ্রেমিককে। এই মামলাকে কেন্দ্র করে





বাংলার জনমনে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। বাঙালি বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। দেশের সর্বত্র গ্লোগান ওঠে 'জেলের তালা ভাঙবো, শেখ মুজিবকে আনবো।'

১৯৬৯ সালে আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য দেশের ছাত্র সমাজ এগারো দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। শুরু হলো ছয় দফার আন্দোলনের সঙ্গে এগারো দফার আন্দোলন। পাকিস্তান সরকার শেষ পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল নেতাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

২২ ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতি গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাঙালির নয়নমনি শেখ মুজিবকে মুক্ত করে আনে। ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদের সভাপতিত্বে ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি এক বিরাট সংবর্ধনা সভায় বাঙালির মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত হলেন। বঙ্গবন্ধুর মুক্তিলাভের পর আন্দোলন-সংগ্রাম বেড়ে যায়। অন্যদিকে ১৯৬৯ সালে ২৫ মার্চ আইয়ুব খান পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিয়ে বিদায় নিল।

১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু এ দেশের নাম রাখেন বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর ভাষণে পূর্ব বাংলার (পূর্ব পাকিস্তান) নাম ঘোষণা করেন বাংলাদেশ। এদিকে বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙালির রাজনৈতিক আন্দোলন উত্তাল হয়ে ওঠে। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হলো সাধারণ নির্বাচন। সে নির্বাচনে বাঙালির বিপুল ভোটে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন হয়। এ বিজয় ছিল ছয় দফার রাজনৈতিক বিজয়।

একদিকে বাঙালির বিজয় অন্যদিকে বাঙালির বিজয়কে নস্যাৎ করে দেয়ার জন্য পাকিস্তানের সামরিক জান্তা ও পিপলস পার্টির জুলফিকার আলী ভুট্টো চক্রান্ত করতে থাকে। বাঙালির বিজয়কে তারা মেনে নিতে পারেনি। একাত্তরের ১ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দেয়। মুহূর্তের মধ্যে বাঙালি বিক্ষুব্ধ হয়ে রাস্তায় নেমে এসে এর প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে। উচ্চারিত হতে থাকে স্বাধীনতার গ্লোগান : 'জয় বাংলা, বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর।'

এলো ৭ মার্চ। এই দিনটি ছিল স্বাধীনতার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দিন। একাত্তরের এই দিনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) লাখো বাঙালির সামনে স্বাধীনতার ডাক দেন। বাঙালি সেদিন মন্ত্রমুগ্ধের মতো আবিষ্ট হয়েছিল রাজনৈতিক কবি বঙ্গবন্ধুর সেই বজ্রকণ্ঠে। আর তাঁর এই ঐতিহাসিক ভাষণ বাঙালি জাতিকে দারুণভাবে আন্দোলিত করে। তাঁর ভাষণে যুদ্ধের প্রস্তুতির কথাও ছিল : 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তা-ই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।' সেদিনের ভাষণে সুস্পষ্ট ঘোষণা ছিল : 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে যে দেশটি আজ প্রতিষ্ঠিত তার অবয়ব তৈরির কাজটি করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে।

১৯ মার্চ ১৯৭১। এটি বাঙালির জাতীয় চেতনার একটি অবিস্মরণীয় দিন। বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার সাতদিন আগেই বীরপ্রসবিনী জয়দেবপুরের মাটিতে শুরু হয় সংগ্রামী শ্রমিক-ছাত্র-জনতার প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ। আর পাকিস্তানি হানাদারের বিরুদ্ধে এই জয়দেবপুরেই (বর্তমান গাজীপুর) প্রথমে গর্জে ওঠে বাঙালির অস্ত্র। জয়দেবপুরের সর্বদলীয় মুক্তি সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দের সাহসী ভূমিকার কারণে সেদিন জয়দেবপুরের সর্বস্তরের জনতা অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠেন। ১৯ মার্চের পর থেকে সারাদেশে শ্লোগান ওঠে 'জয়দেবপুরের পথ ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।'

২৩ মার্চ ১৯৭১। বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষ এদিন পালন করেছে বাংলাদেশ দিবস হিসেবে। সেদিন পাকিস্তান দিবস হিসেবে পালনের কথা থাকলেও সেদিন তা হয়নি। এদিকে সেদিন বাংলার ঘরে ঘরে বাংলাদেশের নতুন পতাকা উড়েছে। দু-একটি জায়গা ছাড়া কোথাও পাকিস্তানের পতাকা উড়তে দেখা যায়নি। আর এই দিনেই বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সূর্যোদয়ের পর তাঁর বাসভবনে (ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডস্থ) স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন।

এলো ২৫ মার্চ। বাঙালির ইতিহাসে কালরাত্রি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার আন্দোলন ও অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার লক্ষ্যে পাকিস্তানি সামরিক শাসক তার বর্বর বাহিনী নিয়ে অপারেশন সার্চ লাইট নামে এ দেশের নিরস্ত্র মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাকিস্তানি বাহিনী রাতের আঁধারে প্রথমে ঢাকায় গণহত্যা শুরু করে। পাকিস্তানি বর্বর বাহিনী পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে একাত্তরের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটি দ্রুত তৎকালীন ইপিআর ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে সম্প্রচারিত হয়।

স্বাধীনতা ঘোষণা হওয়ার পরপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি কমান্ডো দল বঙ্গবন্ধুকে তাঁর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার কারণেই আমাদের স্বাধীনতা দিবস ২৬ মার্চ। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার প্রেক্ষিতে লাখ লাখ বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করে। সে সঙ্গে পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করার প্রচেষ্টা চালায়। গোটা দেশ রণাঙ্গনে পরিণত হয়। এদিকে ২৬ মার্চ দুপুর ২:৩০ মিনিটে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র (আগ্রাবাদ) সর্বপ্রথম চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের নেতা এম এ হান্নান বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন।

একাত্তরের ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক ভাষণের মধ্য দিয়ে বাঙালি মানসিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। মার্চের শেষের দিকে সারাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। দেশের বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বাঙালিদের সংগঠিত করার চেষ্টা করে। পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য সামরিক ও বেসামরিক বাহিনীর বাঙালি সদস্যরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। কৃষক-শ্রমিক ও ছাত্ররা এই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের নিমিত্তে মুক্তিবাহিনীতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে থাকে। একদিকে বাঙালিরা





প্রতিশোধ-স্পৃহায় উন্মত্ত, অন্যদিকে দেশকে শত্রুমুক্ত করার কামনায় উত্তপ্ত, ক্ষোভ-ক্রোধ ও আবেগে উত্তেজিত। দেশকে শত্রুমুক্ত করার প্রত্যয়ে যুদ্ধে গিয়েছিল মুক্তিকামী বাঙালি।

একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের আকাঙ্ক্ষা এই দেশের মানুষের মধ্যে জাগ্রত করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন পাকিস্তানের কারাগারে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যে মানুষটি এই যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন, তিনি হলেন তাজউদ্দীন আহমদ। ৩ এপ্রিল দিল্লিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তিনি বৈঠক করেন।

ওই বৈঠককালে তাজউদ্দীন মনস্থির করেন, যুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে সরকার গঠনের বিকল্প নেই, আর তা না হলে বহির্বিশ্বের সাহায্য-সহযোহিতা পাওয়া যাবে না। একাত্তরের ১০ এপ্রিল আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। সৈয়দ নজরুল ইসলাম হলেন উপরাষ্ট্রপতি (বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি) এবং প্রধানমন্ত্রী হলেন তাজউদ্দীন আহমদ।

১৭ এপ্রিল প্রথম বাংলাদেশ সরকার শপথ গ্রহণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। দেশের বিভিন্ন স্থানে বাঙালিদের অতর্কিত আক্রমণে পাকিস্তানি বাহিনীর ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য মে মাসের মধ্যে তাদের নিজস্ব শক্তি বৃদ্ধি করে। বাংলাদেশে তাদের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা চালায়। মুক্তিযুদ্ধকে ব্যাপক ও জোরদার করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার এগারোটি সেক্টরে বিভক্ত করে।

বাংলাদেশে গণহত্যা শুরুর পর ভারত ও রাশিয়াসহ কয়েকটি দেশ তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানালেও যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাকে 'পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়' বলে উল্লেখ করে। যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও পৃথিবীর প্রায় মুসলিম দেশ পাকিস্তানের পক্ষে থেকে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে। রাজনৈতিক কারণে যুক্তরাষ্ট্র সরকার পাকিস্তানকে সহযোগিতা করে। কিন্তু ওই দেশের জনগণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে বিভিন্ন উপায়ে সহযোগিতা করেছে। একাত্তরের ১১ আগস্ট পাকিস্তানের কোনো এক অজ্ঞাত স্থানে সামরিক আদালতে গোপনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার শুরু হয়। বিচারের নামে চলে প্রহসন। এদিকে দেশে চলতে থাকে ছোট ছোট যুদ্ধ। আমাদের স্মরণে রাখতে হবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বাঙালিরাই প্রথম জাতি, যারা সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে স্বাধীনতার চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করেছে।

অন্যদিকে আর ছয় বছর অতিক্রান্ত হলেই বাঙালি জাতি স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করবে। আবার এর মধ্যে আমরা ক্রমশ হারাতে থাকবো একাত্তরের আগের বীর সংগ্রামী সন্তান ও একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের। ইতোমধ্যে অনেক বীর সেনানিকে হারাতে হয়েছে। এখন বাংলাদেশে একাত্তরের পরে জন্ম নেওয়া নাগরিকেই বেশি, যাদের স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামের অভিজ্ঞতা নেই। ধীরে ধীরে এ জাতিকে আন্দোলন-সংগ্রামের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা থেকে দূরে সরে যেতে হবে। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। নতুন প্রজন্মকে স্বাধীনতা আন্দোলনে-সংগ্রামের অকুতোভয় বীর সন্তান ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যাঁরা জীবিত রয়েছেন, তাঁদের সান্নিধ্যে বেশি বেশি করে আসতে হবে।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর বহুবছর নতুন প্রজন্মের কাছে স্বাধীনতার ভুলপাঠ হাজির করা হয়েছে। সেদিকে নজর রেখে বাংলাদেশের শেকড়ের সন্ধান করে জানতে হবে স্বাধীনতার ইতিহাসের ইতিকথা ও বিস্তারত পটভূমি। জানতে হবে তাঁদের কথা, যাঁদের আন্দোলন-সংগ্রামের ফল হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে একদিন লাল-সবুজের পতাকা জয়যুক্ত হয়েছিল। আজকের তরুণ প্রজন্ম স্বাধীনচেতা হয়ে ২০১৩ সালে যেভাবে এগিয়ে এসেছে, সেই দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম এ চেতনা সজাগ থাকে সে রকম দৃষ্টান্তমূলক কর্ম সম্পন্ন করতে হবে।

ঘুরে দাঁড়াতে হবে সকল অনাচার, সকল অপকর্ম ও সকল দুরাচারে বিরুদ্ধে। মেধা-মনন, সাহস ও সত্যনিষ্ঠায় নিজেকে সোনার মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব হবে। সেই সাথে সার্থক হবে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের আত্মদান আর অগণিত মানুষের অবর্ণনীয় ত্যাগ-তিতিক্ষা। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের প্রকৃত ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংগ্রাম, অর্জন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে হবে। তাহলেই সার্থক হবে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের সব আনুষ্ঠানিকতা।

## বঙ্গবন্ধুকে ছাড়া বাংলার ইতিহাস অচল

১০ জানুয়ারি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগারে দীর্ঘ সাড়ে নয় মাসের বন্দি জীবন শেষে ১৯৭২ সালের এই দিনে স্বদেশে ফিরে আসেন। বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি এক ঐতিহাসিক দিন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর অবদান অবিস্মরণীয়। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে তিনি স্বাধীনতার ঐতিহাসিক ঘোষণা দেন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমবেত লাখো জনতার জনসমুদ্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তি ও স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা দিয়ে যান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছিলেন এক নিবেদিতপ্রাণ মধ্যবিত্ত চরিত্রের অধিকারী। যার জীবনের বেশিরভাগ সময়ই কাটে কারাগারে। তরুণ এই রাজনীতিবিদের সংগ্রামী জীবনের মূল অধ্যায় শুরু হয়েছিল অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ সালে। তিনি হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার মতো বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে রাতারাতি নেতা বনে যাননি। তিনি গড়েছিলেন এক রক্তাক্ত ও আদর্শের লাল-সবুজের পতাকা। ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহে ১৯৭১ সালে বিশ্বের মানচিত্রে প্রথমবারের মতো অঙ্কিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ। দীর্ঘ মুক্তিসংগ্রাম ও একটি স্বাধীনতা যুদ্ধ। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে তিনি ভাষণদানকালে বলেন–'প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে, সবকিছু আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দিবে।' বঙ্গবন্ধুর এ আহ্বানে সমগ্র বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সে সংগ্রামে। মাত্র ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতা প্রাপ্তি বাঙালির





শ্রেষ্ঠ অর্জন। যার নেতৃত্বে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। তাই ইতিহাসের পাতায় তাঁর নাম অক্ষয়-অম্লান হয়ে থাকবে চিরকাল। বঙ্গবন্ধুর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাসব্যাপী মরণপণ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৬ ডিসেম্বর দুর্ধর্ষ পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। কিন্তু ওই সময় পাকিস্তানি বর্বর জান্তা শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের প্রত্যন্ত এলাকা লায়ালপুরের কারাগারে বন্দি করে রাখে। তাঁর নির্জন সেলের সামনে কবর খুঁড়ে শেখ মুজিবকে ভয় পাইয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু অসম সাহসী বাঙালির নেতা শেখ মুজিব ভয় পাননি, বরং পাকিস্তান কর্তৃপক্ষকে বলেছে, 'আমি বাঙালি, আমি মুসলমান, আমি মানুষ। মানুষ একবারই মরে বার-বার মরে না। আমি কখনোই আত্মসমর্পণ করব না। যদি তোমরা আমাকে মেরে ফেলো মৃত্যুর পর আমার লাশটা আমার দেশে আমার মানুষদের কাছে পৌঁছাইয়া দিও।' এমন করে বাঙালির তরে আর কেউ কি কোনোদিন নিজেকে উৎসর্গ করবে? ফলে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে যখন পাকিস্তান বাহিনীর প্রায় এক লাখ সৈনিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু যেখান থেকে ৭ মার্চ স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন সেই স্থানে আত্মসমর্পণ করে। তখন বঙ্গবন্ধুবিহীন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যেন পূর্ণতা লাভ করেনি। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ থেকে সমগ্র জাতি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছিল, তাদের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুর বিজয়ীর বেশে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায়। এরই মধ্যে একদিন বঙ্গবন্ধুর মুক্তিলাভ ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের গুজবে ঢাকা মহানগরীর সব মানুষ পথে নেমে এসেছিল, রণাঙ্গনে ফেরত সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধারা আকাশে গুলি ছুঁড়ে উৎসব শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু সেদিন বঙ্গবন্ধু তার মানুষের কাছে ফিরে আসতে পারেননি। পরে স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ জানতে পারে, তাদের প্রিয় নেতা পাকিস্তানের বন্দিশালা থেকে মুক্তিলাভের পর সরাসরি দেশে না ফিরে লন্ডন ও দিল্লি হয়ে ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ স্বদেশে ফিরে আসবেন। আবার শুরু হয় অধীর আগ্রহে অপেক্ষার পালা। লন্ডন থাকাকালীন, বঙ্গবন্ধু এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের বিপরীতে জবাব দিয়েছিলেন, 'আমার দেশের মানুষের সঙ্গে স্বাধীনতার অধিক আনন্দ উপভোগ করার জন্য আজ আমি মুক্ত। মহাকাব্যিক এক মুক্তিসংগ্রামের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। এই সংগ্রামের ফসল হিসেবে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। যেখানে আমার মানুষেরা আমাকে এই দেশের রাষ্ট্রপতি বানিয়েছে। যখন কনডেম সেলে বন্দি থাকা অবস্থায় ফাঁসির রশি গলায় পরার অপেক্ষায় আমি দিন গুনছিলাম। স্বাধীনতার জন্য বাংলাদেশের মানুষকে যত দাম দিতে হয়েছে এবং কষ্টভোগ করতে হয়েছে, অন্য কাউকে তা করতে হয় নাই।' তিনি বলেন, 'আমার দেশের মানুষের কাছে ফেরার জন্য আমি এক মুহূর্তও দেরি করতে পারি না। দেশ-বিদেশের বীর জনতাকে আমি অভিনন্দন জানাই, বিশেষ করে মুক্তিবাহিনীর সবাইকে। যারা জনগণকে তাদের বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা এনে দিয়েছে। মুক্তিসংগ্রামে প্রাণ হারানো লাখো শহীদের পবিত্র স্মৃতিকে আজ আমি স্মরণ করছি এবং তাঁদের বিদেহী আত্মার শান্তির জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহর দরবারে দোয়া করছি।' তিনি বলেন, 'সংগ্রামের ফসল হিসেবে যে স্বাধীন-সার্বভৌম বাঙালি প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ পেয়েছে, তা আজ প্রশ্নহীন বাস্তবতা। স্বাধীনতার পর যেসব দেশ আমাদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন করেছে বিশেষ করে ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড, পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য দেশ, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স তাদের আমি ধন্যবাদ জানচ্ছি। যুক্তরাষ্ট্রসহ সারা বিশ্বের স্বাধীনতা প্রেমিক

যেসব মানুষ আমাদের অবস্থানকে সমর্থন করেছে, তাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখন আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে সব দেশের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। বাংলাদেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক করা এবং শিগগির জাতিসংঘে তার প্রবেশে সমর্থন দিতেও আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তানের নতুন প্রেসিডেন্ট জনাব ভুট্টোর সঙ্গে আমার যে কথা হয়েছিল, তাতে তিনি দুই দেশের মানুষের সঙ্গে গোপনে কিছু সম্পর্ক বজায় রাখার কথা বলেছিলেন। আমি তাকে বলেছিলাম, আমার জনগণের কাছে ফেরার আগে এ বিষয়ে কোনো কথা দিতে পারব না। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্তিত্ব আজ প্রশ্নহীন বাস্তবতা এবং মূল বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করে যে কোনো দেশের সঙ্গে ভবিষ্যৎ সম্পর্কের বিষয়টি নির্ভর করবে।' অবশেষে বঙ্গবন্ধুর সেই বহু প্রতীক্ষিত স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ঐতিহাসিক দিবস ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ এসে গেল। বঙ্গবন্ধু ব্রিটিশ রাজকীয় বিমান বাহিনীর একটি বিশেষ বিমানে লন্ডন ও নয়াদিল্লি হয়ে তাঁর প্রিয় স্বদেশভূমিতে ফিরে আসেন। বঙ্গবন্ধুর বিমান যখন ঢাকার আকাশে তখন সমগ্র বাংলাদেশের মানুষের দৃষ্টি ঊর্ধ্বমুখী। তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আসতে বঙ্গবন্ধুকে যে জনসমুদ্র পাড়ি দিতে হয়েছিল সে দৃশ্য অবর্ণনীয়। তারপর বঙ্গবন্ধু সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যেখান থেকে ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন, সেই স্থানে নির্মিত মঞ্চে দাঁড়ালেন, তখন সেই মহামিলনের মুহূর্তে মহান নেতা ও জনতা উভয়েই অশ্রুসিক্ত। তারপর বঙ্গবন্ধু জনতার উদ্দেশ্যে দেয়া অবিস্মরণীয় সেই ভাষণের কিছু অংশ ছিল এরকম–'আমার বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হয়েছে। আমার বাংলার জীবনের সবই আজ পূর্ণ হয়েছে। আমার বাংলা স্বাধীন থাকবে। আমি জানতাম না আপনাদের কাছে আমি ফিরে আসব। তাই খালি একটা কথা বলেছিলাম, তোমরা যদি আমাকে মেরে ফেলে দাও আমার আপত্তি নাই। মৃত্যুর পর আমার লাশটা আমার বাঙালির কাছে দিয়ে দিও। আজ থেকে আমার অনুরোধ, আজ থেকে আমার আদেশ, আজ থেকে আমার হুকুম, ভাই হিসেবে, নেতা হিসেবে নয়, প্রেসিডেন্ট হিসেবে নয়, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নয়, আমি তোমাদের ভাই। তোমরা আমার ভাই। এই স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমরা বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবেনা, যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এদেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণি আছে, তারা চাকরি না পায় বা কাজ না পায়। আমরা মানুষ, মানুষকে ভালোবাসি। তবে যারা দালালি করেছে, যারা আমার লোকদের ঘরে ঢুকে হত্যা করেছে, তাদের বিচার হবে এবং শাস্তি হবে। বিচারের দায়িত্ব বাংলার স্বাধীন সরকারের হাতে ছেড়ে দেন। একজনকেও ক্ষমা করা হবে না। তবে আমি চাই, স্বাধীন দেশে স্বাধীন নাগরিকের মতো স্বাধীন আদালতে বিচার হয়ে এদের শাস্তি হবে। আমি দেখায়ে দিবার চাই, দুনিয়ার কাছে যে শান্তিপূর্ণ বাঙালি রক্ত দিতে জানে, শান্তিপূর্ণ বাঙালি শান্তি বজায় রাখতেও জানে। আমরা মুসলমান। আমার রাষ্ট্রে এই বাংলাদেশ হবে সমাজতন্ত্র ব্যবস্থা। এই বাংলাদেশ হবে গণতন্ত্র, এই বাংলাদেশ হবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ভাইয়েরা আমার, যদি কেউ চেষ্টা করেন ভুল করবেন আমি জানি ষড়যন্ত্র শেষ হয় নাই, স্বাধীন বাঙালিরা, ষড়যন্ত্র শেষ হয় নাই। একদিন বলেছিলাম ঘরে-ঘরে দুর্গ তৈরি করো। বলেছিলাম যার যা আছে, তাই নিয়ে যুদ্ধ করো। বলেছিলাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। এই জায়গায় ৭ মার্চ তারিখে। আজ বলে যাচ্ছি, তোমরা ঠিক থাকো,





একতাবদ্ধ থাকো, কারো কথা শুনো না। ইনশাল্লাহ স্বাধীন যখন হয়েছে, স্বাধীন থাকব। একজন মানুষ এই বাংলাদেশে বেঁচে থাকতে কেউ আমাদের স্বাধীনতা কেড়ে নিতে পারবে না।' অবশেষে বঙ্গবন্ধু ২৪ বছরের দুঃশাসনপীড়িত এবং নয় মাসের পাকিস্তানি গণহত্যাযজ্ঞের শিকার, ধ্বংসস্তূপে পরিণত স্বাধীন বাংলাদেশ পুনর্গঠনে মাত্র সাড়ে তিন বছর সময় পেয়েছিলেন। একটি ভয়াবহ যুদ্ধ, একটি নারকীয় গণহত্যাযজ্ঞ, ইতিহাসের নজিরবিহীন ধর্ষণের ঘটনা এবং নয় মাসের লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞ নব্যস্বাধীন বাংলাদেশকে একটি নারকীয় পরিস্থিতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল। এহেন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনাটা ছিল অত্যন্ত দুরূহ কাজ। সেজন্য প্রয়োজন ছিল বঙ্গবন্ধুর মতো বলিষ্ঠ নেতার। ইতিহাস যা সাক্ষ্য দেয়, তা হলো বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরেই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সমগ্র মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে দেশের পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। একাত্তরের অব্যবহিত পরবর্তী বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষের আশা-ভরসার নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু। শরণার্থী শিবির থেকে প্রত্যাগত বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি মানুষ, পাকিস্তানিদের দ্বারা ধর্ষিতা লাখ-লাখ মা-বোন ও হাজার হাজার 'যুদ্ধশিশু' এবং অসংখ্য যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা বঙ্গবন্ধুর দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে ছিলেন। এছাড়াও ছিল সাড়ে সাত কোটি মানুষকে দু মুঠো ভাত তুলে দেয়ার দায়িত্ব। বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরেই রাষ্ট্রপতির পদ ছেড়ে প্রধান মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ৩২ নম্বরের বাসস্থান ও পুরাতন গণভবন থেকে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের কাজে সর্বশক্তি নিয়ে আত্মনিয়োগ করেন। বিশেষ করে ২-১টা কাজ করে একটি সংবিধান তৈরি করেন চমৎকারভাবে। শিক্ষানীতি, পরিকল্পনা কমিশন, শিশুনীতি সব করলেন। কিন্তু ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করলেন। কারণ তারা জনসাধারণের সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে না। এতে অন্য কোনো কারণ ছিল না এবং সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন লোকের নাগরিকত্ব নিয়ে গেলেন। গোলাম আযম পাকিস্তান চলে গেলেন। পাকিস্তানের পাসপোর্ট দিয়ে। গোলাম আযম, জুলমত আলী খান, আব্দুল জাব্বার খাচ্চর মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশে গিয়ে বলল যে, হিন্দুস্থান বানিয়ে ফেলেছে। ১৯৭৩ সালের মধ্যে সংবিধান প্রণয়ন এবং সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে স্বগৌরবে যাত্রা শুরু করে। বঙ্গবন্ধু এটা করেছিলেন। সে জন্য তাঁর প্রতি আক্রোশ। এজন্য এদেশের পরাজিত শক্তি ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবন পর্যালোচনা করলে একজন রূপকথার রাষ্ট্রনায়ককে পেয়ে যাই। যে নায়ক বাংলার হতদরিদ্র মানুষের মুক্তির জন্য নিজের জীবনতো বটেই, স্ত্রী, পুত্র, কন্যাসহ সাড়ে সাত কোটি মানুষকে বাজি রেখে লড়াই করেছেন আমৃত্যু-বাঙালির হাজার বছরের আরধ্য মুক্তির জন্য। হাজার বছরের বাঙালির মানসকাঠামোর ভেতর থেকে শত সহস্র সাধনায় তিনি এসেছিলেন বাংলার মুক্তির মিছিলে শ্রেষ্ঠ সাহসী-সারথী হিসেবে। তাঁর অর্জন মানে বাঙালির অর্জন। সাড়ে সাত কোটি বাঙালি আর একজন শেখ মুজিব এক এবং একাকার হয়ে গিয়েছিল। গড়পড়তার বাঙালির গড়নের চেয়ে বলিষ্ঠ আকারের লোকায়ত সৌষ্ঠবের মোহনীয় সৌন্দর্য ছিল শরীর কাঠামোয়। তাঁর কণ্ঠে ছিল হাজার বজ্রের একক ধ্বনি। মননে ছিল সাহসের পুঞ্জ। আর ছিল বুক ভরা অকৃত্রিম দেশপ্রেম। পরাজিত শক্তির হাত থেকে আমরা তাকে রক্ষা করতে পারিনি। এখন সময় এসেছে আত্মআবিষ্কারের-আত্মজিজ্ঞাসার।

বঙ্গবন্ধুকে ছাড়া বাংলার ইতিহাস অচল। তাই আমরা তাঁরই চৈতন্যের উত্তরাধিকার বহন করে চলেছি, যুগ-যুগ ধরে।

## জাতির জনক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি

আগস্ট মাস বাঙালির ইতিহাসের শোকের মাস। এ মাসে আমরা হারিয়েছি তিনজন মহান বাঙালিকে : রবীন্দ্রনাথ, বঙ্গবন্ধু এবং নজরুল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পৃথিবীর প্রথম অশ্বেতাঙ্গ নোবেল বিজয়ী। এই মহান মনীষীর মহাপ্রয়াণের ঠিক ত্রিশ বছর পর স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয় এমন আর এক বাঙালির নেতৃত্বে কালের বিবর্তনে তাকে মনে করা হয় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, এমনকি রবীন্দ্রনাথের মতন কালজয়ী বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে ডিঙিয়ে, ঠিক যেমনটা ইংরেজরা উইনস্টন চার্চিলের গলায় শ্রেষ্ঠ ইংরেজের বরমাল্য পরিয়ে দিয়েছেন সেকসপিয়রের মতন আর এক কালজয়ী মানুষকে ডিঙিয়ে।

১৯৯৫ সালে কানাডার দুজন সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞ কানাডা থেকে ক্যুবেক প্রদেশের সম্ভাব্য বিচ্ছেদ এর আইনগত দিক বিশ্লেষণ করতে যেয়ে লিখছিলেন, '১৯৪৫ সালের পর বাংলাদেশই একমাত্র দেশ যে সফলভাবে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পাকিস্তান থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার কৃতিত্ব অর্জন করে। এ সশস্ত্র সংগ্রামের প্রধান শক্তি ছিল ওই জাতির সহজাত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান, যার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে এক অতুলনীয় বিজয় ছিনিয়ে আনে। তিনি যে আস্বাদিত জনসমর্থন পেয়েছিলেন সেটা একটি পশ্চিমা গণতন্ত্রে অভাবনীয়।' অনুরূপ মতামত যেমন, 'শেখ মুজিব এর একমাত্র অপরাধ একটি গণতান্ত্রিক নির্বাচনে তিনি জয়ী হয়েছিলেন'–আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে, ক্যাপিটল হিলে যেটা নিরন্তর প্রতিধ্বনিত হয়েছিল।

নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার লেখক পেগী ডারদিন যিনি ১৯৭১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকায় অবস্থান করছিলেন তিনি ২ মে ১৯৭১ সালে, 'পূর্ব পাকিস্তানে তাড়িত রাজনৈতিক জোয়ার' শিরোনামে একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন। যেটাতে তিনি লেখেন, "সমস্ত মার্চে শেখ মুজিব এবং তার সহকর্মীরা আঁকাবাঁকা গেম খেলেন এবং তাদের লক্ষ্য ও কৌশল স্পষ্ট করতে অস্বীকার করেন। অবশ্য তাদের এটা করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। স্বাধীনতার জন্য একটি খোলা স্ট্যান্ড হতো সরাসরি বিশ্বাসঘাতকতা এবং তাদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের অভিযোগ আনা যেত। ... শেখ মুজিব পূর্ব ও পশ্চিমের এক জাতীয় নেতা হয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখাননি, যদিও একটি সর্বপাকিস্তান সরকারের প্রধানমন্ত্রীর পদ পাওয়ার মতন সংখ্যাগরিষ্ঠতা জাতীয় পরিষদে তাঁর ছিল।"

জেনারেল রাও ফরমান আলী অবশ্য বলেন ভিন্ন কথা। "সবশেষে তারা (বাঙালিরা) পাকিস্তান শাসন করার সম্ভাবনা দেখেছিল। মুজিব (পাকিস্তানের) প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত হয়ে যাওয়ার পর তাঁর উপদেষ্টারা তাঁকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে সামরিক এবং পিপিপির সম্মিলিত বাহিনীর শক্তি তাঁকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ইচ্ছা সত্যে পরিণত হতে দেবে না। অতএব, তিনি একটি নতুন জাতির 'জনক' হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।"





জেমস জে নোভাক (১৯৭০ সাল থেকে যিনি ২০ বছর ধরে বাংলাদেশে বসবাস করেছিলনে) তার সুন্দর বই : 'Bangladesh: Reflections on the water' নামের বইতে রাজনীতিবিদ এবং আমাদের স্বাধীনতার নেতা হিসেবে শেখ মুজিবের এক উজ্জ্বল চিত্রাঙ্কন এবং তাঁকে উপস্থাপন করেছেন। নোভাক এর ভাষায়, 'শেখ মুজিব রাজনৈতিক পরিবেশে এক ধরনের তাৎক্ষণিতা নিয়ে আসেন। সূক্ষ্ম কূটচাল অথবা খাপছাড়া পদক্ষেপ নিয়ে তিনি জনগণকে ক্লান্ত করতেন না। সরকারি পদের প্রতি তাঁর কোনো মোহ ছিল না। যদিও কখনো প্রকাশ্যে বলেননি বা লেখেননি তথাপি তাঁর উত্থানের সময় থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর দিনে তাকে গ্রেফতার করা পর্যন্ত সবাই জানত এবং বুঝত তিনি স্বাধীনতার পক্ষেই কথা বলছেন। তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য সম্পর্কে কোনো ঘোষণা না দিয়ে তিনি পাকিস্তানিদের ভীত সন্ত্রস্ত করে রেখেছেন এবং পুরোটা সময় মুজিব চোখ পিটপিটিয়েছেন এবং মিটমিটিয়ে হেসেছেন এবং বাংলা এবং বাংলাদেশের কথা বলে গেছেন, যেন চাইলেই ছাদের উপর লাল সবুজের পতাকার পত পত করে উড়ার দৃশ্য উপভোগ করা যেতো"।

যাই হোক, তাঁর ছয় দফা থেকে এক দফায় রূপান্তর একটি দিন বা একটি মাসে ঘটেনি। নোভাক এর কথায়, 'মুক্তিযুদ্ধের বহু আগেই, মুজিব পূর্ববাংলাবাসীদের মনে সাফল্যের সাথে এই বোধ সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন যে তারা পাকিস্তানি আগ্রাসন ও অবিচারের শিকার। এর ফলে আন্দোলনরত বাঙালিরা সব সময় এক ধরনের নৈতিক স্বস্তিতে থেকেছে যে, তারা নির্দোষ এবং যা করছে তা ন্যায্য। তাঁর বিশ্বাস যাই হোক না কেন, তাঁর ব্যক্তিত্বই তাঁকে তার যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিতে পরিণত করেছিল। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন ধূমকেতুর মতো। বস্তুত তিনি ছিলেন এক সজ্ঞাত শক্তি, যার ব্যক্তিত্ব এবং কর্মকাণ্ড বাংলাদেশ মানসের গভীরতম প্রদেশকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি ছিলেন এক নৌকা যাতে চেপে জনগণের আকাঙ্ক্ষা বয়ে যেতে পারতো।'

বহুদিন আগে সক্রেটিস যেমনটা বুঝেছিলেন তেমনি রাজনীতিবিদ শেখ মুজিবও বুঝেছিলেন যুক্তি এবং আবেগের সংমিশ্রণের। নোভাক এর কথায়, 'মুজিব সামরিক এবং মার্শাল পাকিস্তানি পাঞ্জাবিদের তুলনায় বাংলা সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্বের বোধকে সব সময় উসকে দিয়েছেন। এটা করতে গিয়ে তিনি বাঙালি কবিদের কবিতা দিয়ে পাকিস্তানের মহান কবি ইকবালের কবিতাকে প্রতিস্থাপিত করেছেন। জনগণকে উদ্দীপ্ত করার জন্য তিনি ব্যবহার করেছেন কাজী নজরুলের উদ্দীপনাময় গান এবং কবিতা। অকৃত্রিম বাঙালি মনের সূক্ষ্ম এবং শৈল্পিক গুণাবলি এবং সেই মনের নৈতিক অবস্থান ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে কবিতার ভূমিকা কি তা মুজিব বুঝেছিলেন। এটা বিশ্বাস করা হয়, 'বাংলাদেশ কখনোই কিছু বিশ্বাস করে না যতক্ষণ না একজন কবির দ্বারা তা উচ্চারিত হয়'। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ইকবালের সমকক্ষ বাঙালি কবি। তার চেয়ে বড় যেটা, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাংলার সন্তান, ফলে ইকবালের চাইতে অনেক বেশি প্রিয়। মুজিবের এই কবিতা কৌশল এত ফলপ্রসূ হয়েছিল যে, এক পর্যায়ে পাকিস্তান সরকার রবীন্দ্রনাথের গান ও সাহিত্য গাওয়া এবং পাঠ করাকে দেশদ্রোহিতা আখ্যা দিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। বলার অপেক্ষা রাখে না, এটাই মুজিব চেয়েছিলেন। অন্যদিকে উদ্দীপনাময় গান ও কবিতার কারণে বিদ্রোহের পূর্বক্ষণে নজরুল হয়ে উঠেছিলেন আওয়ামী লীগের কর্মী বাহিনীর কাব্যিক কণ্ঠস্বর।'

তাঁর কঠোর পরিশ্রম, সরলতা এবং সত্যবাদিতার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে নোভাক লিখেছেন, "পশ্চিমা ধ্যান-ধারণায় অভ্যস্ত মুসলিম লীগাররা ঢাকা অথবা চট্টগ্রামের চেয়ে লন্ডনে থাকতে এবং দেশি নৌকার তুলনায় অ্যারোপ্লেনে ভ্রমণ করতে বেশি স্বাছন্দ্য বোধ করতেন। একইভাবে তারা ভোট প্রার্থনা বা ভোট অর্জনের চাইতে ভোট কিনতেন। অন্যদিকে শেখের রীতি ছিল কঠোর পরিশ্রম। অক্লান্তভাবে তিনি জেলায় জেলায়, মহকুমা মহকুমায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে মাঠের পর মাঠ হেঁটে মানুষের সঙ্গে মিশেছেন, মানুষদের সংগঠিত করেছেন। তাদের চা, ভাত, ডাল, লবণ ভাগ করে খেয়েছেন; নাম মনে রেখেছেন, তাদের সঙ্গে মসজিদে নামাজ আদায় করেছেন, ফসলের মাঠে প্রখর রোদে ঘর্মাক্ত হয়েছেন, কেউ মারা গেলে শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে কেঁদেছেন এবং কুলখানিতে উপস্থিত থেকেছেন। শেখ মুজিব অন্যের আবেগ-অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম হতেন আন্তরিকতার সঙ্গে, আচরণ করতেন সহানুভূতির সঙ্গে এবং হাত বাড়িয়ে যা স্পর্শ করতেন তা গলফ ক্লাব বা ক্লাবের চেয়ার নয়, জনগণের ঘর্মাক্ত ধূলিমলিন হাত। জনগণ কি বিশ্বাস করে, কি চায় তা তিনি জানতেন এবং তাদের বোধগম্য ভাষায় সবকিছু ব্যাখ্যা করতে পারতেন। জনগণও এটা জানতো বলে তারা বিশ্বাস করতো তাঁর মিথ্যা বলার প্রয়োজন নেই।'

গণহত্যা, সশস্ত্র সংগ্রাম এবং অনুচ্চারিত দুঃখভোগের নয় মাসে, শেখ মুজিবের নাম লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তরে রাতদিন প্রজ্বলিত হয়েছিল এবং তিনি হয়ে উঠেছিলেন বাংলাদেশের জনগণের এক উপদেবতা। জেনারেল রাও ফরমান আলীর ভাষায়, বাংলাদেশের জনগণের ৯০% শেখ মুজিবের ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা দ্বারা বিমোহিত হয়েছিল এবং তারা বাংলাদেশ সৃষ্টির জন্য তাদের জীবন দিতে প্রস্তুত ছিল।

বিবিসির বাংলা বিভাগের শ্রোতাদের পৃথিবীব্যাপী জরিপে তিনি যখন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে বিবেচিত হন তখন বিবিসি শ্রোতাদের মতামতের সংক্ষিপ্ত সার ছিল নিম্নরূপ : "তিনি ছিলেন বাঙালি জনগণের অন্ধকার আচ্ছন্ন যুগের আলোর বাতি ঘর। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, বাঙালিদের স্বার্থের জন্য আপসহীনতা শুধু বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে নয়, সারা বিশ্বের বাঙালিদেরকে প্রথমবারের মতন ঐক্যবদ্ধ করে এবং তিনিই তাদের জাতীয়তা দিয়েছেন। সারা পৃথিবীর বাঙালি, যারা বাংলাদেশের নাগরিকত্ব লালন করেন, তারা এক ব্যক্তির নেতৃত্বের কাছে এই জাতীয়তার জন্য ঋণী এবং তিনি শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়া অন্য কেউ নন।"

অ্যারিস্টটল লিখেছেন, বিয়োগান্তের নায়ক হওয়ার কারণ তার 'ত্রুটিময় বিবেচনা' বা তার নেতৃত্বের 'দুঃখজনক ত্রুটির' কারণে। তার দৈবদুর্বিপাক, যতটুকু তার ভাগ্যে প্রাপ্য তার চেয়ে অনেক বেশি। মুজিব প্রকৃতপক্ষে এক বিয়োগান্তক নায়ক।

তুরস্কের জাতীয় বীর কামাল আতাতুর্ক একটি তুর্কি প্রবচন প্রায়শই উদ্ধৃত করতে অনুরাগী ছিলেন : 'ইতিহাসে নির্মমতা ছাড়া যিনি তাকেই নির্মমতার শিকার হতে হয়'। বাংলাদেশের প্রথম পররাষ্ট্র সচিব এস এ করিম তার *Sheikh Muijib: Triumph and Tragedy* গ্রন্থের এপিটাফে উপসংহার টেনেছেন এভাবে, 'মুজিব তার নিজের আগে তার দেশের মানুষের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি যদি ব্যর্থ হয়ে থাকেন তবে তার কারণ তিনি একটি রাষ্ট্রের এক কঠিন সময়ে নির্মমতার সাথে শাসন করতে পারেননি। কিন্তু





শাসক হিসেবে তাঁর ব্যর্থতা তাঁর মানবিক সত্তার জাঁকজমককে কোনোদিনও হ্রাস করবে না। তিনি তার দেশের মানুষের অন্তরে অনাদিকাল ধরে বেঁচে থাকবেন।'

নোভাক-এর বই থেকে একটি উদ্ধৃতাংশ দিয়ে এ নিবন্ধের ইতি টানছি। নোভাক-এর কথায়, 'বঙ্গবন্ধু ছিলেন সহজ-সরল একজন মানুষ, নিজের জাতির ও জনগণের জন্যে যাঁর ছিল কিছু সহজ সরল বিশ্বাস। কিন্তু তিনি তাদের জন্য যা করতে চেয়েছিলেন তা করতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। দেশের মানুষ তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি; তারা তার ভিতর থেকে সব সময় ভালোটাই বের করে এনেছেন। তবুও তিনি বঙ্গবন্ধু, জাতির পিতা—না একজন নিখুঁত রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে নয়, তাঁর জনগণের জন্য তাঁর নিখাঁদ ভালোবাসার জন্যে। একজন মানুষ যতদূরে উঠতে পারে তিনি ততদূরই উঠেছিলেন। আমাদের ক'জন এর চেয়ে ভালো করতে পারত?

## বঙ্গবন্ধু একজন অনন্য সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব

বঙ্গবন্ধুর ভাবনা জুড়ে ছিল হাজার বছরের বাংলাদেশ। তার সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখার ইতিকথা কেবল পাকিস্তান আমলে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন যুগের নয়, তারও আগের। শেখ মুজিব সর্বভারতীয় রাজনীতি অপেক্ষা বাংলার রাজনীতি, বাংলার ভাগ্য নিয়ে বেশি ভাবতেন, বাংলার দুঃখী মানুষের কথা তার রাজনৈতিক কর্মে ও ভাবনায় কৈশোর থেকেই স্থান করে নিয়েছিল, আর এ কারণেই তাকে প্রদত্ত 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি জনগণের ভালোবাসার দান হিসেবে সার্থক হয়ে উঠেছে। তাই শেখ মুজিবের জীবন ও কর্ম তথা রাজনৈতিক ইতিহাসকে বাংলাদেশের মর্মকথার নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাস, বাংলাদেশের বহির্জগতের রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনীতির ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে চিত্রায়ণ করা সম্ভব নয়। একটি সমাজ, জনজীবন বা জাতির ভাবধারায় সঠিক স্থান নির্দেশই শুধু ইতিহাসের বিষয়বস্তু নয়, তার বিচার-বিশ্লেষণ ইতিহাসের অন্তর্গত। তাই বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ইতিহাস সর্বতোভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত।

মনে রাখতে হবে যে, বঙ্গবন্ধু পূর্বাপর একজন অনমনীয় ও অনন্যসংগ্রামী ব্যক্তিত্ব। এক্ষেত্রে তাকে ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারায় ১৮৫৭-এর প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর সংগ্রামীদের এবং তিতুমীর ও শরীয়ত উল্লাহ প্রমুখের সংগ্রামী ঐতিহ্যধারায় উত্তর-সাধক বলা চলে। সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব হিসেবে তার দৃষ্টান্ত তিনি নিজেই। অশৈশব সংগ্রামী ভূমিকায় বাংলার স্বার্থের প্রশ্নে তিনি কখনো কোথাও কোনো আপস করেননি অথবা কোনো চাপের সামনে নতিস্বীকার করেননি। এ কারণেই তাকে বারবার কারাবন্দি হতে হয়েছিল। এ কারণেই তাকে ছয় দফা আন্দোলন-পরবর্তীকালে দেশের মাটিতে আগরতলা মামলার আসামি হিসেবে এবং ১৯৭১-এর মুক্তিসংগ্রামকালে মৃত্যু-খড়্গ মাথার উপরে ঝুলন্ত অবস্থায় পাকিস্তানের দুঃসহ বন্দি জীবনযাপন করতে হয়েছে। আর ঠিক একই আপসহীন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই তাকে ১৯৭৫-এর রাজনৈতিক সহযোদ্ধা এবং আত্মীয়-পরিজনসহ নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়ে জীবন দিতে হয়েছে। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের হত্যাকাণ্ড একই সূত্রে গাঁথা।

আবার বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে উপমহাদেশের ইতিহাসের সঙ্গে তার গভীর সম্পর্ক সমাজ, ধর্ম ও দর্শনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। সেখানে সংঘাত, বহিরাক্রমণ, শাসন ব্যবস্থা ও রাজ্য পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যে যে নতুন সম্পর্ক দেখা দিয়েছে, সেই প্রেক্ষাপটে তাকে বিশ্লেষণের সুযোগ আছে। উনিশ শতক থেকে, বিশেষভাবে তার দ্বিতীয়ার্ধে রাজনৈতিক উপাদানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সাম্প্রদায়িকতার ভাবাদর্শ সমাজ-সংক্রান্ত একটি দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে গড়ে ওঠে এবং সমাজ-জীবনকে সংগঠিত করার পন্থা হিসেবে বিবেচিত হয়। ভারতীয় সমাজ দেশজ ধর্মীয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত, এটাই ছিল সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ। একই সঙ্গে ইহজাগতিক সাধারণ স্বার্থ? যেমন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলো সম্প্রদায় নির্বিশেষে জনগণ একইভাবে ভোগ করত। তারপরও তা পাশ্চাত্য সমাজ থেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ছিল। লোকাচার, পেশার অপরিবর্তনীয় উত্তরাধিকার, সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস একই সম্প্রদায়ের মধ্যে দুস্তর বিভাজন সৃষ্টি করেছিল; পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যা ছিল অবমাননাকর।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের পাশাপাশি অবস্থানের কারণে কালেভদ্রে ধর্মীয় সংঘাত বিরাজ করলেও সাম্প্রদায়িকতা রাজনৈতিক উপসর্গ হিসেবে ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে স্থান করে নেয় এবং বিশ শতকে এসে তার উগ্রতা প্রকাশ পায় বিদেশি শক্তি কূটকৌশলে। এক্ষেত্রে উপনিবেশবাদের ভূমিকা ছিল মুখ্য। আর এ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল হিন্দু ও মুসলিম মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের মধ্যে অসম বিকাশ সূত্রে। ঔপনিবেশিক শাসন এ দেশের বুকে স্থান করে নেয় বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলকে আশ্রয় করে, যেখানে মুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল দরিদ্রশ্রেণির। আধুনিক ঔপনিবেশিক শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বিত্তবানের পক্ষে সহজ হয়েছিল। মুসলিম সমাজের এ সুযোগ গ্রহণ উনিশ শতকের সত্তরের দশকে শুরু হলেও তাদের সমাজের রক্ষণশীল অংশের প্রবল বিরোধিতার মুখে তার বিকাশ ছিল মন্থর। ভারতের রাজনীতিও এ অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত ছিল।

এ প্রেক্ষাপটে ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন জনসাধারণের ইহজাগতিক পরিচয়–শ্রেণি, এলাকা, ভাষা ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে বিকাশের পরিবর্তে নৈর্ব্যক্তিক ভারতীয় তথা হিন্দু জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। বাংলাদেশের অবস্থাটা ছিল ভিন্ন রকম।

লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী ব্যবস্থা বাংলার ভূমি ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনে। আমাদের কৃষিজীবী জনগণ বিশিষ্ট জমিদারশ্রেণিকে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হিসেবে দেখতে পায়, যাদের পেছনে ছিল ব্রিটিশ শাসকশ্রেণির সমর্থন। শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাংলায় কৃষক বিদ্রোহ হয়েছে বারবার। ইতিহাসের এ ঘটনাবলি বাঙালির বিদ্রোহের স্পৃহাকে বারবার উন্মোচন করেছে।

বঙ্গবন্ধুর আন্দোলন আপাতদৃষ্টিতে যা পাকিস্তানি শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে, তার সঙ্গে এর কী সম্পর্ক? এ প্রশ্ন উঠতে পারে। তিনি তো বিশ শতকের মধ্যভাগে এসে ভিন্নতর ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সম্প্রদায়গত বৈষম্য, যা অবিভক্ত ভারতে মুসলিম লীগের





রাজনীতিতে যুক্তি হিসেবে এসেছিল, তার সামাজিক দিকটির সত্যতা আপেক্ষিক, তাই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানি শাসকদের ধর্মীয়-সামাজিক পটভূমিতে বৃহত্তর জনগণের দুঃখ-দারিদ্র্য ব্যাখ্যার সুযোগ অন্তর্নিহিত হলো। শোষণের ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব পুনর্ব্যক্ত হলো বাঙালির কাছে। জাতীয় চেতনার ক্ষেত্রে দ্বিজাতিতত্ত্বের ধারণা থেকে বাঙালির মোহমুক্তি ঘটে পাকিস্তানি শাসন ও শোষণের নগ্ন বহিঃপ্রকাশ এবং জাতীয় ঐক্যের বন্ধন হিসেবে ভাষা ও সংস্কৃতি প্রধান স্থান দখল করে। এক্ষেত্রে তরুণ ছাত্র ও যুব নেতৃত্বের কারণেই ভাষা আন্দোলনকে ব্যাপকভাবে জনগণের মধ্যে নিয়ে যেতে পারে ১৯৫২ সালে এবং এর পরবর্তী সময়কালে।

শেখ মুজিব বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে পাকিস্তানি শাসকশ্রেণির মনোভাবের জন্যই ১৯৪৮ সালে আট দফা চুক্তির অসাড়তা উপলব্ধি করে পরিষদ ভবন ঘেরাও করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, আট দফা চুক্তিপত্রে ১৫ মার্চ প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন ও সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে কামরুদ্দিন আহমদ স্বাক্ষর করেন। 'চুক্তিপত্রটি স্বাক্ষরিত হওয়ার আগে সংগ্রাম পরিষদের সদস্যরা ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে গিয়ে... শেখ মুজিবুর রহমান... প্রমুখ বন্দী ছাত্রনেতাকে চুক্তিপত্রটি দেখিয়ে তাদের সম্মতি নিয়ে আসেন। ৫ মার্চ সন্ধ্যায় ছাত্রবন্দীদের সকলকে মুক্তি দেওয়া হয়। ...১৬ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ ছাত্রসভার পরে শেখ মুজিবুরের নেতৃত্বে ছাত্ররা শোভাযাত্রা করে পরিষদ ভবনে যায় এবং পরিষদ ঘেরাও করে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিক্ষোভ করে।' চুক্তিটি যথারীতি খাজা নাজিমউদ্দিন ভঙ্গ করেন। বঙ্গবন্ধুর আশঙ্কা যথার্থ প্রমাণ হয়।

বঙ্গবন্ধুর জীবন ও রাজনীতির ওপর তথ্যনির্ভর ও বস্তুনিষ্ঠ এ নিবন্ধে এ ধরনের বিভ্রান্তি ও অপপ্রচারের স্বরূপ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের পর বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ছয় দফাকে ঘিরে শুধু পাকিস্তানের শাসকশ্রেণিই অসত্য প্রচারে এবং আন্দোলন দমনে লিপ্ত হয়নি, ডান ও বামসহ উগ্র রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকাও এক্ষেত্রে কম বিভ্রান্তিকর ছিল না।

বিশ শতকের রাজনীতির বৈশিষ্ট্য হলো ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, গণতান্ত্রিক ধারার সংগঠনের বিকাশ, হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির অবনতি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং পরিশেষে বাংলা ও ভারত বিভাগ। ভারত বিভাগোত্তর যুগের রাজনীতির লক্ষণীয় দিক হচ্ছে পূর্ব বাংলায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ২১ দফার ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্টের কাছে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ছিল তাদের রাজনৈতিক ধ্যানধারণার বিপর্যয়। তেমনি বাঙালি জাকির সত্তা সংরক্ষণের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রকাশ পায় প্রথম বাংলা ভাষা আন্দোলনে, পরে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ে এবং সবশেষে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ছয় দফা আন্দোলনে। যুগান্তকারী ভাষা আন্দোলন ও ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচির পর ১১ দফার ভিত্তিতে ঊনসত্তরের গণআন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা স্থগিত ও বঙ্গবন্ধুর মুক্তির পর সত্তরের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় এবং গণরায় নস্যাতের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। এ অসহযোগ আন্দোলনের সূচনায় ১৯৭১ সালের ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি ইতিহাসে এক

অমর গাথা। 'নিউজ উইক' সাময়িকীর রিপোর্টার রবার্ট জেঙ্কিন্স বঙ্গবন্ধুকে যথার্থই 'পোয়েট অব পলিটিকস' বা 'রাজনীতির কবি' বলে অভিহিত করেছিলেন।

বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের মার্চে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পরিচালিত অভূতপূর্ব অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমি ও ব্যাপকতা ভারতে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে কোনো দিক দিয়েই তুলনীয় নয়। স্থান-কালের ব্যবধান ছাড়াও শেখ মুজিবের অসহযোগ আন্দোলন একটি সমান্তরাল বেসামরিক সরকার পরিচালনার এক অনন্যদৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল, যা মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও প্রভাব থেকে প্রকৃতিগতভাবেই আলাদা। বাংলাদেশের মানুষ, সংগঠন, রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবের ডাকে ঐক্যবদ্ধভাবে সাড়া দিয়েছে ও অংশগ্রহণ করেছে। একদিকে সামরিক বাহিনী শত শত লোককে গুলি করে হতাহত করেছে; অন্যদিকে বাংলাদেশের মৃত্যুঞ্জয় জনতা বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে শান্তিপূর্ণভাবে অসম সাহসে গুলির মুখে বুক পেতে দিয়ে আন্দোলন করেছে। কারফিউ ভেঙেছে জনগণ, তাদের কানে বেজেছিল বঙ্গবন্ধুর অমোঘ নির্দেশ–'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এ অসহযোগ আন্দোলনকে সঙ্গতভাবেই বাংলাদেশের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায় হিসেবে অভিহিত করা যায়। তিন সপ্তাহব্যাপী একটি সমান্তরাল সরকার পরিচালনা করে বঙ্গবন্ধু তার নেতৃত্ব ও সাহসের এমন এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, যার উদাহরণ ইতিহাসে নেই। তার পরই শুরু হয়েছিল সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধ বাংলাদেশের অবিসংবাদী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নামে ও দিকনির্দেশনায়। অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বঙ্গবন্ধু একজন প্রকৃত জাতীয়তাবাদী নেতায় রূপান্তর হন।

বঙ্গবন্ধুর জীবনে এবং তার অব্যবহিত আগে উপমহাদেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বিশেষভাবে মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু প্রমুখ এবং তার রাজনৈতিক জীবনের পথপ্রদর্শক, সহযোদ্ধা, জাতীয় নেতাদের প্রভাব বঙ্গবন্ধুর জীবনে কতোখানি, তারও আভাস আছে এ প্রবন্ধে। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীসহ বহু নেতা ও কর্মীর মধ্য থেকে কীভাবে শেখ মুজিবুর রহমানের অভ্যুদয় ঘটে, তার পরিচয় এ নিবন্ধে রয়েছে।

উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িক চেতনা থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণাকে মুক্ত করে একটি আধুনিক জাতীয়তাবাদী ধারা সৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধুর প্রগতিশীল অবদানও এ পরিসরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর অবদান ও তার বিশদ তথ্য তুলে ধরা এবং একই সময়ে স্বাধীন বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক রূপরেখা এবং তার অর্থনীতির ধ্রুবপদী ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের বাইরে তার গণতান্ত্রিক চরিত্রের ওপর বঙ্গবন্ধু জোর দিয়েছেন কেন ও কোন্ লক্ষ্যে, তাও তুলে ধরার যথাসাধ্য আয়োজন করা হয়েছে এ প্রবন্ধে। আসলে প্রবন্ধটিতে তুলে ধরা হয়েছে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আত্মপ্রতিকৃতির আদলে বাংলাদেশ নামক অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাস। 'বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু অবিচ্ছেদ্য' কথাটি এ অর্থেই গ্রহণ করা হয়েছে।





'স্বদেশকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে আমরা উপলব্ধি করতে চাই। এমন একটি লোক চাই যিনি আমাদের সমস্ত সমাজের প্রতিমাস্বরূপ হইবেন। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই আমরা আমাদের বৃহৎ স্বদেশীয় সমাজকে ভক্তি করিব, সেবা করিব। তাঁহার সঙ্গে যোগ রাখিলেই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের যোগ রক্ষিত হইবে।'

বাংলাদেশকে স্বাধীন করাই বঙ্গবন্ধুর একমাত্র কৃতিত্ব নয়। সাম্প্রদায়িকতার অন্ধ প্রকোষ্ঠ থেকে, শতাব্দী-লালিত মূঢ়তা থেকে মুক্তির মন্ত্র শোনা গিয়েছিল তার কণ্ঠে, তাই সেই মহানায়কের অভাব বাঙালি জাতির কাছে অন্য সব দুর্যোগকে ছাপিয়ে এমন নিদারুণভাবে অনুভূত হচ্ছে।




১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নবনির্বাচিত এমএনএ ও এমপিদের সমাবেশে শেখ মুজিব

# বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেম

মানুষের যে সকল বিশেষ গুণাবলি একে অপর থেকে পৃথক করে দেখায় তার নাম ব্যক্তিত্ব। '৫২-র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৭১-র মহান মুক্তিযুদ্ধ পূর্ব সময়ে তৎকালীন আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান পশ্চিমা সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে বাঙালির অধিকার আদায়ে সংগ্রাম করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। '৬৯-র গণঅভ্যুত্থানের সময় কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে আন্দোলনে সামিল হলে তখন তাকে তৎকালীন ছাত্রনেতা ও বর্তমান বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমদের নেতৃত্বে বাংলার ছাত্র-জনতা 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা অর্জনের পর এক ভাষণে উল্লেখ করেছিলেন যে, 'আমার ভাষা বাংলা, আমি বাঙালি, আমার দেশ বাংলাদেশ; বাঙালি যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন বাংলাদেশ স্বাধীন থাকবে'। সে কারণেই বাংলাদেশের সংবিধানের ৬ ধারায় স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পরিচয় বাংলাদেশি হলেও জাতিসত্তায় বাঙালি।' সম্প্রতি বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ইমেরিটাস প্রফেসর ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, 'বাঙালি হওয়া সহজ নয়, তা অর্জনও করতে হয়'। আর প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী তার এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, 'একুশ আমাদের নতুন করে বাঙালি করে নিয়েছে।' '৭১-র মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বঙ্গবন্ধু ছিলেন কারাগারে। অথচ তার নামে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলে এবং স্বাধীনতা অর্জিত হয়। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা অর্জনের পর পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করে লন্ডন থেকে দিল্লি হয়ে ঢাকার তেজগাঁও বিমানবন্দরে গণসংবর্ধনায় (১০ জানুয়ারি ১৯৭২) প্রসঙ্গক্রমে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন– 'কবিগুরু আপনি বলেছিলেন 'রেখেছো বাঙালি করে, মানুষ করোনি', আজ আপনার এ উক্তি ভুল প্রমাণিত। বাঙালি আজ স্বাধীন মানুষ হয়েছে'।

আমরা নেতা মুজিবের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব দেখতে পাই ১৯৫৪ সালে। পাকিস্তান আমলে প্রাদেশিক নির্বাচনের পর যুক্তফ্রন্ট দেশ শাসনের সুযোগ পায়। তখন পাকিস্তান গণপরিষদে 'ওয়ান ইউনিট বিল' আনা হয়। যার মাধ্যমে পূর্ব বাংলার নাম রাখা হয় পাকিস্তান। তখন তিনি গণপরিষদের স্পিকারকে উদ্দেশ করে বলেন–"মাননীয় স্পিকার স্যার, আপনি দেখবেন, এ নাম বাঙালিরা মেনে নেবেন না। তখন তিনি স্পিকারের উদ্দেশে উচ্চারণ করেন–'Sir, you will see that they want to place the words "East Pakistan instead of East Bengal". We have demanded so many times that you should make it Bengal (Pakistan). The word ÒBengalÓ has a history, has a tradition of its own. You can change it only after the people have been consulted. If you want to change it then we will have to go back to Bengal and ask them whether they accept it'. আমরা বহুবার দাবি জানিয়েছি, আপনারা পূর্বাঞ্চলকে 'বাংলা' নামে ডাকেন"। অথচ সেই প্রতিবাদ সত্ত্বেও পাকিস্তানি





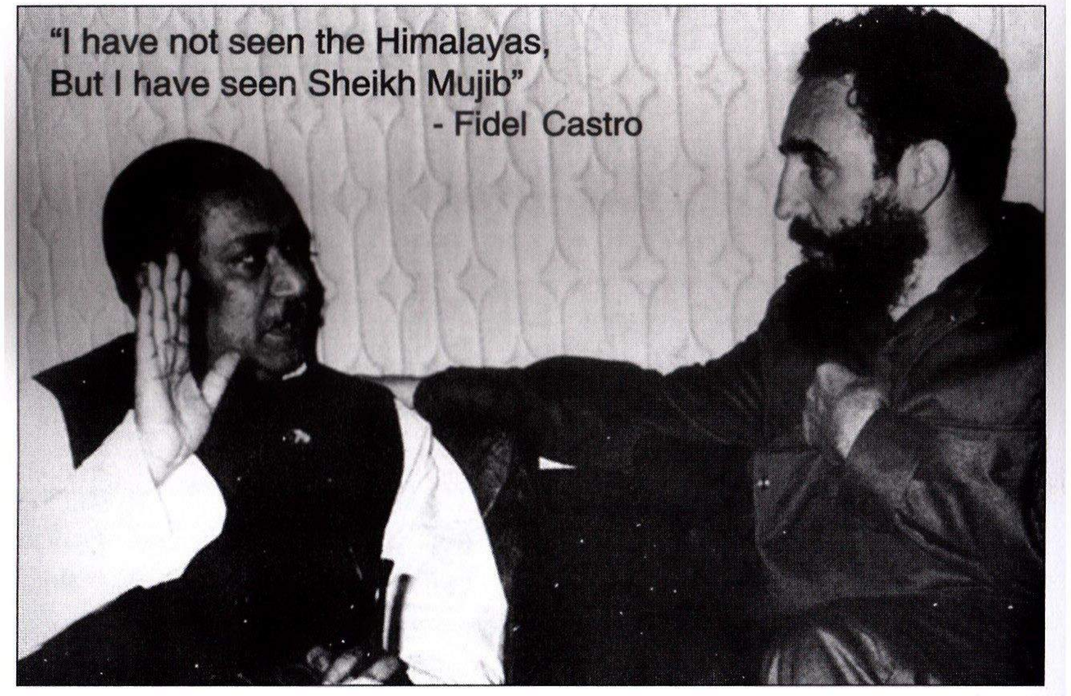
শাসকেরা বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তান নামকরণ করেন। সুতরাং তাঁর দেশপ্রেম ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনো অবকাশ নেই। তিনি কতবারই না জেলে গেছেন এবং মৃত্যু ও ফাঁসির মঞ্চ থেকে ফিরে এসেছেন। বঙ্গবন্ধুর অপরাধ–তিনি বাংলা ও বাঙালির স্বার্থে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর।

স্বাধীনতা অর্জন পূর্ববর্তী সময় আমরা জানি যে, ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় পলাশীর আম্রকাননে নবাব সিরাজদৌলার পতনের পর, সিপাহী বিপ্লবের নেতারা, শহীদ তিতুমীর, হাজী শরিয়ত উল্লাহ, সূর্যসেন, প্রীতিলতা, নেতাজী সুভাষ বসু, শেরে বাংলা, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানীসহ আরো অনেকেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে বাঙালি জাতির মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করে গেছেন। কিন্তু মওলানা ভাসানী ব্যতীত কেউ স্বাধীনতার সূর্যের আভা দেখে যেতে পারেননি। আর হিন্দু-মুসলিম দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে '৪৭-র স্বাধীনতা পরবর্তী সময় বাঙালির অধিকার আদায়ে বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, ব্যক্তিত্ব ও দূরদর্শিতার গুণে তেইশ বছরের আন্দোলন পরবর্তী নয় মাসের যুদ্ধ শেষে ৭১'র ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বুকে স্বাধীনতার সূর্য উদিত হয়।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু আমেরিকার নিউইয়র্কে জাতিসংঘে সাধারণ অধিবেশনে দৃঢ় মনোবল নিয়ে (স্থায়ী পরিষদের সদস্য না হওয়া সত্ত্বেও) তিনি প্রথম বাংলায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। যদিও তিনি ইংরেজি, উর্দু ও হিন্দি ভালো জানতেন। তার ভাষণের সময় ইংরেজি, রাশিয়ান, ফরাসি, স্পেনিশ, চাইনিজ ও আরবি ভাষায় তার বক্তব্য যাতে বুঝতে পারে জাতিসংঘকে তজ্জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল। অন্যদিকে তৎকালীন সময়ে বিশ্বজোড়া খ্যাতিমান নেতৃবৃন্দ যেমন–সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী লিওনিদ ব্রেজনেভ, প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতা আন্দোলনের মহান নেতা প্রয়াত ইয়াসির আরাফাত, যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটু, কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিদেল ক্যাস্ত্রো, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সা'দাত এবং ইসলামি সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট হুয়ারি বুমেদিন প্রমুখদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয় তাঁর মহান ব্যক্তিত্বের কারণে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানের লাহোরে ইসলামি সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর যোগদান এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠ কারিশমা দেখিয়ে ইসলামি সম্মেলন শেষে বাংলাদেশে সগর্বে ফিরে এসেছিলেন। অতঃপর বিশ্ব শান্তি পরিষদের সভাপতি রমেশ চন্দ্রের হাত থেকে 'জুলিও কুরি' পদক লাভ, স্বাধীন বাঙালি ও বাংলাদেশের জন্য একটি অনন্য ঘটনা। এটি বঙ্গবন্ধুর বাঙালিত্বের বিজয় ব্যতীত অন্য কিছুই নয়।

এমনকি জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও বঙ্গবন্ধু তাঁর ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দেননি। ১৫ আগস্ট কালো রাত্রির ঘাতকদের কাছে আত্মসমর্পণ বা প্রাণভিক্ষা বা পলায়ন করতে চাইলে অনায়াসেই বেঁচে যেতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। মিথ্যা, অন্যায় ও কাপুরুষতার কাছে মহাপুরুষ ও বীরপুরুষেরা কখনো মাথানত করেন না। বঙ্গবন্ধু ঠিক তারই প্রতিচ্ছবি। আজ ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু নেই, তারপরও তিনি অমরত্বে আমাদের মাঝে আছেন। তার পরিবারের আরো যারা '৭৫-র ১৫ আগস্ট ঘাতকের হাতে প্রাণ হারিয়ে ছিলেন সবার আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

স্বাধীন বাংলাদেশ আছে, থাকবে বাঙালির মুখে উচ্চারিত বাংলা ভাষা। আর থাকবে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান নির্বিশেষে আমরা যারা বাংলা ভাষায় কথা বলি তাদের বলিষ্ঠ বাঙালিত্বের গৌরবগাঁথা। এতদ্ব্যতীত আমাদের মাঝে যারা অবাঙালি বা উপজাতি কিন্তু নাগরিকত্বে বাংলাদেশি, তারাও এই গৌরবময় ইতিহাসের সম্মানে এই গৌরবের অংশিদার। কারণ বাংলার স্বাধীনতার ইতিহাসে তাদের ও অবদান অনস্বীকার্য। সর্বোপরি এই গৌরবের অবিসংবাদিত মহান নেতা হচ্ছেন বীর বাঙালির পৌরুষ জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান। আমরা মহান এ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে ও দেশপ্রেমে উদ্বেলিত হই। আসুন তাঁর অমর স্মৃতির প্রতি বিনয় চিত্তে আজীবন ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায় অবনত হই।




কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিদেল ক্যাস্ট্রোর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

**ইতিহাস স্রষ্টা বঙ্গবন্ধু**

আমাদের প্রজন্ম, যারা বাংলাদেশকে স্বাধীনভাবে আবির্ভূত হতে দেখেছে এবং তার পেছনে বঙ্গবন্ধুর যে অসামান্য অবদান তা প্রত্যক্ষ করেছে, তাদের পক্ষে বঙ্গবন্ধুর কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন সহজ ভাষায় ব্যক্ত করা অত্যন্ত কঠিন। আমি নিজে যখনই বঙ্গবন্ধুর কথা ভাবি তখনই আমার প্রথমে মনে পড়ে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের সেই উত্তাল দিনগুলোর কথা। আমি তখন ঢাকাতেই ছিলাম। ১৯৭০ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনের পর থেকেই আমরা বিপুল আশা-উদ্দীপনার মধ্যে ছিলাম। বাংলাদেশ যে সৃষ্টি হতে যাচ্ছে তা নিয়ে আমাদের মনে আর কোনো সন্দেহ ছিল না। তখন একমাত্র প্রশ্ন ছিল আমরা কি শান্তিপূর্ণভাবে আলোচনার মাধ্যমে এই স্বাধীন দেশ সৃষ্টি করতে পারব নাকি আমাদের একটা বিরাট





রক্তাক্ত সংঘাতের পথে যেতে হবে। আমার মনে পড়ে ১ মার্চ যখন জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিত করলেন এবং তারপর যখন বঙ্গবন্ধু ৩ মার্চ থেকে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন, বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষই তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। প্রশাসন, বিচার বিভাগ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যবর্গ, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সবাই পাকিস্তান সরকারের পক্ষ ত্যাগ করে বঙ্গবন্ধুর প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করল। পৃথিবীর আর কোনো দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনেই সংশ্লিষ্ট দেশটির জাতীয় স্বাধীনতা স্বীকৃতি না পাওয়া পর্যন্ত প্রশাসনকে এভাবে তাদের আনুগত্য পরিবর্তন করতে দেখা যায়নি। এর একটি প্রধান কারণ, বঙ্গবন্ধু আহূত অসহযোগ আন্দোলন এমনই ব্যাপক ও সর্বজনগ্রাহ্য ব্যাপার হয়ে পড়েছিল যে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সচল রাখার প্রয়োজনে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালেই বঙ্গবন্ধুকে সারাদেশের শাসনভার পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হয়। আমাদের দেশে স্বাধীনতার ঘোষণার দিনক্ষণ নিয়ে যে বিতর্ক চলে তা একান্তই অবান্তর।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে আমার কাছে ফরাসি দার্শনিক রুশোর 'সামাজিক চুক্তি' (social contract) বইটি খুব প্রিয় ছিল, বিশেষ করে রুশোর একটি তাত্ত্বিক ধারণা general will। যখন ক্লাসে আমি এটা পড়াতাম, তখন ভাবতাম general will কেমন হতে পারে। ১৯৭১ সালের ২ মার্চের পর যখন আমি অসহযোগ আন্দোলনে হাজার হাজার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ দেখলাম এবং সবার মুখে শুধু স্বাধীনতার কথা শুনতাম তখন বুঝতে পারলাম রুশোর general will কথাটির অর্থ কী। আমি স্পষ্টই দেখতে পেলাম আমাদের স্বাধীনতার পক্ষে general will সৃষ্টি হয়েছে। সারাদেশের মানুষ তখন ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতার দাবির ডাকে। এই general will এই ঐক্যবদ্ধ জনমত গঠিত হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর বহু বছরের সাধনা, ত্যাগ এবং কর্মকাণ্ডের ফলে।

আমি নিজেকে খুবই ভাগ্যবান মনে করি যে, আমি নিজের চোখে ১৯৭১ সালের মার্চ মাস এবং বঙ্গবন্ধুর সেদিনের ভূমিকাকে প্রত্যক্ষ করেছি। খুব কম লোকেরই ভাগ্য হয় ইতিহাস সৃষ্টি হতে দেখা। আমি ইতিহাস সৃষ্টি হতে দেখেছি। স্বাধিকার আন্দোলনকে স্বাধীনতার আন্দোলনে রূপান্তরিত হতে দেখেছি। এসব ঐতিহাসিক ঘটনার মূল নায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অসম্ভব সম্ভব করতে দেখেছি। পৃথিবীর অনেক দেশেই অনেক সময় অনেক নেতা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। দেশ পরিচালনা করতে পারেন। কিন্তু খুব অল্পসংখ্যক নেতাই ইতিহাস রচনা করতে পেরেছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন তেমনই একজন অনন্য কালজয়ী ইতিহাসের মহানায়ক।

আত্মপরিচিতি ও মূল্যবোধ : তার 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বইটির প্রথমেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত নোট বইয়ের একটি উদ্ধৃতি রয়েছে, যা তিনি ১৯৭৩ সালের ৩০ মে লিখেছিলেন। উদ্ধৃতিটি আমাদের সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো; কারণ মাত্র তিনটি বাক্যে ওই উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি তার আত্মপরিচিতি ও মূল্যবোধ অতি পরিষ্কার করেছেন। তিনি লিখেছেন :

'একজন মানুষ হিসেবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসেবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।'

বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের জন্য তার যে ভালোবাসা এবং প্রতিদানে জনগণের যে ভালোবাসা তিনি পেয়েছেন তার কথা তিনি নানা ভাষণে বারবার ব্যক্ত করেছেন। যেমন ১৯৭০ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনের পরে ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি জনপ্রতিনিধিদের শপথবাক্য পাঠ অনুষ্ঠানে তিনি বলেন :

'প্রধানমন্ত্রী হবার কোনো ইচ্ছা আমার নেই। প্রধানমন্ত্রী আসে এবং যায়। কিন্তু যে ভালোবাসা ও সম্মান দেশবাসী আমাকে দিয়েছেন, তা আমি সারাজীবন মনে রাখব। অত্যাচার, নিপীড়ন এবং কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠকেও আমি ভয় করি না। কিন্তু জনগণের ভালোবাসা যেন আমাকে দুর্বল করে ফেলেছে।'

পৃথিবীর অন্য নেতাদের ভাষণ আমি যখন পড়ি এবং তাদের ভাষণের সঙ্গে যখন বঙ্গবন্ধুর ভাষণের তুলনা করি তখন আমার কাছে তার এই অভিব্যক্তিটি 'জনগণের প্রতি ভালোবাসা' তা অনন্য বলে মনে হয়।

অনেক সময়ই যারা বড় মাপের নেতা হন তারা জনগণের সঙ্গে তেমন সম্পৃক্ত হন না। তারা জনগণকে কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে পরিচালনার কথা বলেন। তারা অনেক সময়ই থেকে যান জনগণের উর্ধ্বে। তাই জনগণকে ভালোবাসার কথা তারা বলেন না। বঙ্গবন্ধু এর ব্যতিক্রম। তিনি সবসময়ই বাংলাদেশের জনসাধারণের সঙ্গে নিজেকে এক করে দেখতেন এবং তাই তিনি বারে বারে একদিকে তার জনগণের জন্য ভালোবাসা এবং অন্যদিকে জনগণের তার জন্য ভালোবাসার কথা উল্লেখ করতেন।

বঙ্গবন্ধু রাজনীতিবিদ ছিলেন, তিনি আজীবন রাজনীতি করেছেন। আমরা প্রায়ই বলে থাকি রাজনীতি করতে হলে অনেক সময় নীতির কথা ভাবা যায় না। অনেক সময় আপস করতে হয়। বঙ্গবন্ধুকেও রাজনীতির পথ পরিক্রম করতে হয়েছে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে এবং কখনো কখনো বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে সাময়িকভাবে আপসও করতে হয়েছে। কিন্তু মূল বিষয়গুলোতে তিনি কখনো নীতিবিচ্যুত হননি। জনগণের যে ভালোবাসা তিনি পেয়েছেন তার পেছনে ছিল জনগণের এই অগাধ বিশ্বাস যে, তিনি কখনো তার প্রতিশ্রুতির খেলাপ করবেন না। বাঙালি জাতির স্বার্থ তিনি কোনো অবস্থাতেই বিকিয়ে দেবেন না। তার প্রতি জনগণের এই বিশ্বাস ছিল বলেই তিনি হতে পেরেছিলেন জনগণের অবিসংবাদিত নেতা।

বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির কেন্দ্র ছিল জনগণ। জনগণের জন্য ভালোবাসা ছিল তার সব কর্মকাণ্ডের প্রেরণা, জনগণের ওপর বিশ্বাস ছিল তার কর্মকাণ্ডের ভিত্তি এবং জনগণের কল্যাণই ছিল তার সব কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য। তার কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য তিনি খুব সহজ দুটি ভাষায় প্রায়ই ব্যক্ত করতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, তার লক্ষ্য হচ্ছে 'সোনার বাংলা গড়ে তোলা', কিংবা তিনি বলতেন 'দুঃখী মানুষের মুখে তিনি হাসি ফোটাতে চান'। বঙ্গবন্ধু তার জনসভায় খুবই সহজ-সরল ভাষায় বক্তৃতা করতেন। তাই তার বক্তব্য ছিল সুস্পষ্ট। যেমন বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭২ সালে এক জনসভায় তিনি বলেন :

'আমি কী চাই? আমি চাই বাংলার মানুষ পেটভরে ভাত খাক। আমি কী চাই? আমার বাংলার মানুষ সুখী হোক। আমি কী চাই? আমার বাংলার মানুষ হেসেখেলে বেড়াক। আমি কী চাই? আমার সোনার বাংলার মানুষ আবার প্রাণভরে হাসুক।'





**রাজনৈতিক সূচনা :** ছাত্ররাজনীতির মাধ্যমে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। তিনি প্রথমে গোপালগঞ্জ ও পরবর্তীকালে কলকাতায় ছাত্রদের সংগঠিত করতে শুরু করেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মাধ্যমে তার রাজনীতির হাতেখড়ি। যার সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল ১৯৩৮ সালে। ১৯৪২-৪৭ সাল পর্যন্ত শেখ মুজিব পাকিস্তান আন্দোলনে এবং মুসলিম ছাত্রলীগকে সংগঠিত করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন কিন্তু তিনি কখনও সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ছিলেন না। তিনি সবসময় সাম্প্রদায়িক সহিংসতাবিরোধী ছিলেন। তিনি মুসলিম লীগের প্রগতিশীল সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম জোটের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন এবং তার লক্ষ্য ছিল মুসলিম লীগকে সামন্তবাদীদের হাত থেকে উদ্ধার করা।

১৯৪৭ সালের পূর্বে শেখ মুজিব যদিও পাকিস্তানের একজন সমর্থক ছিলেন, কিন্তু এই নতুন রাষ্ট্রটির জন্মের শুরু থেকে তার রাজনীতির যে ধরন তা দেখে মুজিব ক্রমেই তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। পাকিস্তানের জন্মলগ্নে তার রাজনৈতিক গুরু শহীদ সোহরাওয়ার্দী মুসলিম লীগের দলীয় কোন্দলে হেরে যান এবং মুসলিম লীগের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্বাধীন জোটের হাতে। যারা ছিলেন জমিদার শ্রেণির। তিনি উল্লেখ করেন, নতুন পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাজনীতি শুরু হয় ষড়যন্ত্রের হাত ধরে।

১৯৪৯ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবনের বিবর্তন যদি আমরা দেখি তাহলে এটা স্পষ্ট হয় যে, তিনি এই দীর্ঘ সময় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কাজে যুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রথমে দলটির যুগ্ম সম্পাদক এবং পরে সাধারণ সম্পাদক। ১৯৬৩ সালে সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর শেখ মুজিব আওয়ামী লীগে শীর্ষ নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তারপরই তিনি শুরু করেন বাঙালি জাতীয়তাবাদের সুস্পষ্ট আন্দোলন। তিনি 'বাংলা' শব্দটি পুনরায় ব্যবহার করতে শুরু করেন। ১৯৬৪ সালে যখন তিনি জনগণকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করতে শুরু করেন তখন তার গ্লোগান ছিল 'পূর্ববাংলা রুখিয়া দাঁড়াও'। ১৯৬৬ সালে তিনি ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন, যা ছিল মূলত পাকিস্তানকে একটি কনফেডারেশন করার দাবি। এরপর তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং সারাদেশে ছয় দফা আন্দোলন শুরু করেন। এরপর থেকে তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের এজেন্ডাকে একমাত্র দাবি হিসেবে উপস্থাপন করেন। এরপর শেখ মুজিব পুনরায় কারাবরণ করেন এবং কারাগারে থাকা অবস্থায় পাকিস্তান সরকার তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা করে (আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা)।

ছয় দফা দাবি ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শেখ মুজিবের খ্যাতিকে আরও বাড়িয়ে তোলে এবং ১৯৬৯ সালে প্রচণ্ড ছাত্র আন্দোলনের মুখে আইয়ুব সরকারের পতন হয় এবং শেখ মুজিব কারামুক্ত হন। কারামুক্তির পর ছাত্র সমাজ তাকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনী প্রচারণায় বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের ছয় দফা এবং ছাত্র সমাজের ১১ দফার দাবিতে জনগণের ভোট চান। এই সময় তিনি 'বাংলাদেশ' ও 'জয় বাংলা' এ দুটি গ্লোগান ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন। জনগণ তার প্রতি বিপুল সমর্থন দেয় এবং আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অসামান্য জয়লাভ করে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭ আসনে জয়লাভ করে। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭০ মাত্র চার বছরের মধ্যে বঙ্গবন্ধু একটি জাতিসত্তার পক্ষে দেশে ঐকমত্য গড়ে তুলতে

পারেন। এত অল্পসময়ের মধ্যে পৃথিবীতে অন্য কোনো স্থানে জনগণকে এমন সংঘবদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

**বাংলাদেশের জন্ম :** প্রথমেই আমি বলেছি, পাকিস্তানের শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের মার্চে গণপরিষদের পূর্বনির্ধারিত বৈঠক স্থগিত করেন, যা বাংলাদেশে অভূতপূর্ব গণআন্দোলনের জন্ম দেয়। বঙ্গবন্ধু শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন, যার ফলে অভূতপূর্বভাবে বঙ্গবন্ধুর হাতে প্রশাসনিক ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটে। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে তিনি তার বিখ্যাত ভাষণ 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' প্রদান করেন। যদিও তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে সেদিন স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি তবুও তার এ ভাষণে পরিষ্কারভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন :

'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।'

১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ তিনি তার ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর বাড়িতে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেন। এরপর ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর নির্মমভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দ্বারা গ্রেফতার হন। এর পরদিন ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে আওয়ামী লীগ নেতা এমএ হান্নান বঙ্গবন্ধুর নামে একটি স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। অবশ্য আমি আগেই বলেছি এ ধরনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার বহু পূর্বেই ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের প্রথম থেকেই বাংলাদেশের জনগণ নিজেদের এক স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে ভাবতে আরম্ভ করেছিল।

যদিও স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে বঙ্গবন্ধু ছিলেন পাকিস্তানে কারাবন্দি অবস্থায় তবুও স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুপ্রেরণা ছিলেন তিনি। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যে অভূতপূর্ব জয়লাভ করে তা আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণাকে বৈধতা প্রদান করে। এই নির্বাচনের পর বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত ও একক নেতারূপে বঙ্গবন্ধুর পরিচিতি সারাবিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। বস্তুত ১৯৭১ সালে জনগণের ওপর বঙ্গবন্ধুর যেমন প্রশ্নাতীত এবং একক কর্তৃত্ব ছিল তেমন ম্যান্ডেট পৃথিবীর অন্য কোনো নেতা এমনকি মহাত্মা গান্ধী, নেহেরু, মাও, হো চি মিন, ম্যান্ডেলাও অর্জন করতে পারেননি। তারা সবাই নির্বাচনী বৈধতা পান স্বাধীনতার পর। এ কথা অনস্বীকার্য যে, বঙ্গবন্ধু যদি মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে বাঙালিদের মধ্যে জাতীয় আত্মসচেতনতা গড়ে না তুলতেন, তাদের ঐক্যবদ্ধ না করতেন এবং তাদের প্রদত্ত ম্যান্ডেটের বলে তাদের হয়ে বিশ্ববাসীর সামনে কথা না বলতেন, তাহলে আমাদের মুক্তি সংগ্রামের ভবিষ্যৎ একটি অনিশ্চিত প্রক্রিয়ার বেড়াজালে আটকে পড়ত।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, বঙ্গবন্ধুর সব কাজই কি বিতর্কের ঊর্ধ্বে ছিল? তিনি কি মাঝে মাঝে ভুল করেননি? প্রত্যেক মানুষ, এমনকি ঐতিহাসিক নেতাদের কাজ নিয়েও পরে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বঙ্গবন্ধুর কর্মকাণ্ড নিয়েও বিতর্ক হয়েছে। কাজের ভুল সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর নিজের জীবনীতে লেখা একটি কথা আমি উদ্ধৃত করতে চাই। তিনি লিখেছেন :





'আমি অনেকের মধ্যে একটা জিনিস দেখেছি, কোনো কাজ করতে গেলে শুধু চিন্তাই করে। চিন্তা করতে করতে সময় পার হয়ে যায়, কাজ আর হয়ে ওঠে না। আমি চিন্তাভাবনা করে যে কাজটা করব তা করেই ফেলি। যদি ভুল হয়, সংশোধন করে নেই। কারণ যারা কাজ করে তাদেরই ভুল হতে পারে, যারা কাজ করে না তাদের ভুলও হয় না।'

বঙ্গবন্ধু তার স্বপ্নের সোনার বাংলায় কোনো বৈষম্য দেখতে চাননি। ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া এক ভাষণে তিনি বলেন :

'বাংলাদেশে মানুষে মানুষে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য থাকবে না। সম্পদের বণ্টন ব্যবস্থায় সমতা আনতে হবে এবং উচ্চতর আয় ও নিম্নতম উপার্জনের ক্ষেত্রে যে আকাশচুম্বী বৈষম্য এতদিন ধরে বিরাজ করছিল সেটা দূর করতে হবে।'

## বঙ্গবন্ধু, ইসলাম ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের পথিকৃৎ এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি, বাঙালি জাতির এক অবিসংবাদিত নেতা। তিনি বাঙালির অধিকার এবং স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদান রাখেন। এদেশের সাধারণ মানুষের অধিকার, আকাঙ্ক্ষা পূরণের সংগ্রামে তিনি জাতিকে নেতৃত্ব দেন, এজন্য তাঁকে বারবার কারা বরণসহ অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, সাহস, বাগ্মিতা এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এদেশের সাধারণ মানুষকে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রাণিত করে। বঙ্গবন্ধুর হৃদয় ছিল ইসলামের উদারনৈতিকতায় বিশ্বাসী, অসাম্প্রদায়িক, সাম্য ও মৈত্রীর চিরন্তন আদর্শে উদ্ভাসিত। বঙ্গবন্ধু সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসীদের সম্প্রীতিতে বিশ্বাস করতেন। তিনি ধর্মীয় সংঘাত এড়ানোর জন্য সৃষ্টিকর্তাকেই উৎখাত করে যে নাস্তিকতা তাকে ঘৃণা করতেন। তিনি ছিলেন ইসলামের উদারনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী। মদিনা সনদ ছিল তাঁর শাসনের ভিত্তি। এদেশে তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে ইসলামের প্রচার-প্রসারে তিনি যে যুগান্তকারী অবদান রেখে গেছেন তা সমকালীন ইতিহাসে বিরল। তবুও ইসলামের তথাকথিত লেবাসধারীরা অব্যাহতভাবে তাঁকে ইসলাম-বিদ্বেষী বলে মিথ্যা প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে পাকিস্তান বেতারে জাতির উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে ইসলামের চিরন্তন কল্যাণকামী রূপের প্রতি তিনি কতটুকু মোহিত এবং তিনি যে ইসলামের প্রকৃত উদার মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, 'আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হচ্ছে আমরা ইসলামে বিশ্বাসী নই। এ কথার জবাবে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য, আমরা লেবাসসর্বস্ব ইসলামে বিশ্বাসী নই। আমরা বিশ্বাসী ইনসাফের ইসলামে। আমাদের ইসলাম হযরত রাসূল করীম (সা)-এর ইসলাম, যে ইসলাম জগৎবাসীকে শিক্ষা দিয়েছে ন্যায় ও সুবিচারের অমোঘ মন্ত্র। ইসলামের প্রবক্তা সেজে পাকিস্তানের মাটিতে বারবার যারা অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ বঞ্চনার পৃষ্ঠপোষকতা করে আমাদের সংগ্রাম সেই মুনাফেকদের বিরুদ্ধে, যে দেশের শতকরা ৯৫ জন মুসলমান সে দেশে ইসলাম বিরোধী আইন পাসের ভাবনা ভাবতে পারেন তারাই ইসলামকে যারা ব্যবহার করেন দুনিয়াটা শায়েস্তা করার জন্য।' বঙ্গবন্ধু তাঁর এ অমূল্য বক্তব্যে রাসূল (সা)-এর ইসলাম, ইসলামের সুমহান শিক্ষা, অন্যায় অত্যাচার

শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে ইসলামের আপসহীন অবস্থানের প্রতি তাঁর সুদৃঢ় অঙ্গিকার ব্যক্ত করেন। বঙ্গবন্ধুর সারা জীবনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূলে ছিল অঙ্গিকার বাস্তবায়নের আপ্রাণ প্রচেষ্টা। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে বঙ্গবন্ধুর ধর্মনিরপেক্ষতার উৎস ছিল মদিনার সনদের সেই শিক্ষা, যেখানে উল্লেখযোগ্য শর্ত ছিল–'মদিনায় ইহুদি-নাসারা পৌত্তলিক এবং মুসলমান সকলেই নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে।' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেমন একজন খাঁটি বাঙালি তেমনি ছিলেন একজন ঈমানদার মুসলমান। ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশে তিনি যে নির্বাচনী অঙ্গিকার ব্যক্ত করেছিলেন, নির্বাচনের সেই অঙ্গিকার তিনি তাঁর সাড়ে তিন বছরের সংক্ষিপ্ত শাসনামলে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন। তিনি ওয়াদা খেলাফ বা ধোঁকাবাজির রাজনীতি করেননি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি এমন এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন, যদি তিনি পূর্বের অঙ্গিকার ভুলে নতুনভাবে নতুন পন্থায় কাজ করতেন তবুও তার বিরুদ্ধে বাধা দেয়ার সাহস কেউ পেত না। কিন্তু ঈমানদার মানুষ কখনোই তাঁর অঙ্গিকার খেয়ানত করতে পারে না। বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বল্পকালীন শাসনামলে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জনমানসে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে যে অবদান রেখে গেছেন সমকালীন মুসলিম বিশ্বে এর দৃষ্টান্ত বিরল। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক গৃহীত ইসলাম ধর্মীয় কার্যক্রমের কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হলো ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা–১৯৭৫ সালের ২৮ মার্চ বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক অধ্যাদেশ বলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন এখন সরকারি অর্থে পরিচালিত মুসলিম বিশ্বের অন্যতম সংস্থা হিসেবে পরিচিত। এ প্রতিষ্ঠান থেকে এ পর্যন্ত পবিত্র কোরআনের বাংলা তরজমা, তাফসির, হাদিস গ্রন্থের অনুবাদ, রাসূল (সা)-এর জীবন ও কর্মের ওপর রচিত ও অনুদিত গ্রন্থ ইসলামের ইতিহাস, ইসলামি আইন ও দর্শন, ইসলামী অর্থনীতি, সমাজনীতি, সাহাবি ও মনীষীগণের জীবনী ইত্যাদি নানা বিষয়ে সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটি আর্ত-মানবতার সেবায় ২৮টি ইসলামিক মিশন, ৭টি প্রশিক্ষণ একাডেমি, ২৮ খণ্ডে ইসলামী বিশ্বকোষ, ১২ খণ্ডে সিরাত বিশ্বকোষ প্রকাশ করে ইসলামি জ্ঞানের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছে। বাংলাদেশ সিরাতি মজলিশ প্রতিষ্ঠা–স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু সর্বপ্রথম হাক্কানি আলেম-ওলামাদের সংগঠিত করে ইসলামের সঠিক রূপ জনগণের সামনে তুলে ধরার প্রয়াসে তাঁর নির্দেশনা ও পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকায় 'সিরাত মজলিস' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। সিরাত মজলিশ ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে রবিউল আউয়াল মাসে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম বৃহত্তর আঙ্গিকে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) মাহফিল উদযাপনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। সরকার প্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধুর জাতীয়ভাবে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) মাহফিলের উদ্বোধন উপমহাদেশের ইতিহাসে প্রথম দৃষ্টান্ত। হজ পালনের জন্য সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা–পাকিস্তান আমলে হজ যাত্রীদের জন্যে কোনো সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা ছিল না। বঙ্গবন্ধুই স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে প্রথম হজযাত্রীদের জন্যে সরকারি তহবিল থেকে অনুদানের ব্যবস্থা করেন। মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড পুনর্গঠন–ইসলামী আকিদাভিত্তিক জীবন গঠন ও ইসলামি শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন করেন। এ লক্ষ্যে মাদ্রাসা বোর্ডকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে নাম দেন 'বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা





বোর্ড।' বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম বেতার ও টিভিতে অত্যন্ত গুরুত্ব ও মর্যাদার সাথে কোরআন তিলাওয়াত ও তাফসির প্রচার শুরু হয়। ফলে বেতার ও টিভির অনুষ্ঠানের শুভ সূচনাকাল ও দিনের কর্মসূচির সমাপ্তি কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। ঈদে মিলাদুন্নবী (সা), শব-ই কদর, শব-ই-বরাত উপলক্ষে সরকারি ছুটি–বঙ্গবন্ধুই প্রথম বাংলাদেশে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা), শবেকদর, শবেবরাত উপলক্ষে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন। দিনগুলোতে পবিত্রতা রক্ষার জন্যে সিনেমা হলে চলচ্চিত্র প্রদর্শন বন্ধ রাখার নির্দেশ প্রদান করেন। তাবলীগ জামাত একটি অরাজনৈতিক সংগঠন। ইসলামের পথে দাওয়াত দেওয়াই হচ্ছে এ সংগঠনের একমাত্র কাজ। এ সংগঠনটি যাতে বাংলাদেশে অবাধে ইসলামের দাওয়াত কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে এ উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু তাবলীগ জামাতের বিশ্ব এজতেমার জন্য টঙ্গীতে সুবিশাল জায়গা বরাদ্দ করেন। এছাড়া কাকরাইলের তাবলীগ জামাতের মারকাজ মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য জমি বরাদ্দ, ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা নিষিদ্ধকরণ, রাশিয়াতে প্রথম তাবলীগ জামাত প্রেরণের ব্যবস্থা, আরব-ইসরাইল যুদ্ধে আরব বিশ্বের পক্ষ সমর্থন ও সাহায্য প্রেরণ, ওআইসি সম্মেলনে যোগদান ও মুসলিম বিশ্বের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন বঙ্গবন্ধুর উল্লেখযোগ্য ইসলাম ধর্মীয় কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। বঙ্গবন্ধু তাঁর সাড়ে তিন বছরের সংক্ষিপ্ত শাসনামলে ইসলামের খেদমতে যে বিপুল পরিমাণ কাজের আঞ্জাম দিয়েছেন এবং অভূতপূর্ব নিদর্শন রেখে গেছেন শুধু বাংলাদেশ নয়, গোটা বিশ্বেই এটি এক অনন্য দৃষ্টান্ত। যেদিন আমরা অপবাদ আর বিভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে ইসলামের অসাম্প্রদায়িক চেতনায় ঋদ্ধ বঙ্গবন্ধুর আজন্ম লালিত সোনার বাংলা গড়ে তুলতে পারব সেদিনই সম্ভব হবে তাঁর অসামান্য ঋণের কিঞ্চিৎ পরিশোধ করতে। বঙ্গবন্ধু ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিষয়টি বর্ণনা করতে হলে একটু আগে আমরা ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করতে পারি। ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে মীরজাফরদের বিশ্বাসঘাতকতায় বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের মাধ্যমে মুসলমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। রাজা নয়, বাদশা নয়, বর্গী নয় বা নয় কোনো বর্গীমার্কা জনগোষ্ঠী। সাত সাগর পাড়ের একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের (ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি) কাছে পরাজয়ের বেদনা এবং অপমানের মধ্য দিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশ আধুনিক যুগে পা রাখে। দেশিয় অমাত্যবর্গ এবং বিদেশি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেই কোম্পানির বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড লাভ করে। বিভেদনীতি ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ইউরোপীয় শিক্ষার যে মুক্ত বাতাস এসেছিল তা রুদ্ধ হয়ে পড়ে। শোষণ, বঞ্চনা ও অমানুষিক নির্যাতনের মাধমে ব্রিটিশরা যাত্রা শুরু করে। দেখা দেয় সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬০-১৮০০), রংপুর বিদ্রোহ (১৭৮৩), শমসের গাজীর বিদ্রোহ (১৭৬৭-১৭৬৮), চাকমা বিদ্রোহ (১৭৭৬-১৭৮৭), সিরাজগঞ্জ বিদ্রোহ (১৮৭২-১৮৭৩), গারো বিদ্রোহ (১৮৩৭-১৮৮২), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-১৮৫৭), সন্দীপ বিদ্রোহ (১৭৬৯), নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯-১৮৬১), ওয়াহাবী বিদ্রোহ (১৮৩১), ফরায়েজী বিদ্রোহ (১৮৩৮-১৮৪৮) এবং সর্বোপরি সিপাহি বিদ্রোহ (১৮৫৭)। এখানেই থেমে থাকেনি বঙ্গভঙ্গকে (১৯০৫) কেন্দ্র করে স্বদেশী আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন এবং চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন উল্লেখযোগ্য। প্রায় দুশো বছরের ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হিসেবে বাংলা ছিল ব্রিটিশদের উপনিবেশ। তবে স্বাধীনতার ডাক এ উপমহাদেশে সর্বপ্রথম বাঙালিরাই দেয়। তিতুমীর থেকে সূর্যসেন, মজনু শাহ থেকে সিপাহি বিদ্রোহের প্রথম বিদ্রোহী সিপাহি মঙ্গল

পান্ডে সবাই বাংলার কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, বাঙালিদেরই সৃষ্টি। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, শেষ মুহূর্তে হিন্দু-মুসলমানদের দ্বিধাবিভক্তি ব্রিটিশদের কূটকৌশলেই ঘটে। ১৯২০ সালের তেমনি এক মুহূর্তে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন। কিশোর বয়স থেকেই তিনি বিপ্লবী বাঙালির সূর্যসন্তান। লাখো শহীদ অগ্রজ ভাইদের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠলেন পরে। ১৯৪২ সালে মেট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শেখ মুজিব উচ্চ শিক্ষার্থে কলকাতার বিখ্যাত ইসলামিয়া কলেজে (বর্তমান মাওলানা আবুল কালাম আজাদ কলেজ) ভর্তি হন এবং সুখ্যাত বেকার হোস্টেলে আবাসন গ্রহণ করেন। সময়টি ছিল বাংলার ইতিহাসে এক উত্তাল সময়। শেরেবাংলা, নেতাজি, সোহরাওয়ার্দী আর আবুল হাশিমের মতো বাঘা বাঘা নেতা বাংলার রাজনীতিতে সক্রিয়। দেশপ্রেম, স্বজাত্যবোধ আর হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পাশাপাশি কংগ্রেস-মুসলিম লীগের বিভেদের রাজনীতিতে ক্ষতবিক্ষত বাংলার সামাজিক রাজনৈতিক জীবন। মুজিবের বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক বিকাশ হয়েছিল এহেন বিরাজমান আবহে। উদার গণতান্ত্রিক চেতনার পাশাপাশি অসাম্প্রদায়িক ও জাতীয় ঐক্যের চেতনায় তাঁর দীক্ষা গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছিল সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিমের সান্নিধ্যে। শেখ মুজিব এ সময় ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৪৬-এর হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় শান্তি স্থাপনে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতা হিসেবে যে অসম সাহসী ভূমিকা পালন করেছিলেন তা তাঁকে পরবর্তী জীবনে হিংসা-দ্বেষের বিপরীতে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি আস্থাবান করে তুলেছিল। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর তিনি চলে আসেন পূর্ব বাংলায় এবং ঢাকাকে তাঁর কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসেবে বেছে নেন। দেশ বিভাগের পূর্বে স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক বাংলা গঠনের দাবি নিয়ে এগিয়ে আসেন সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, শরৎ চন্দ্র বসু। বিভক্ত ভারত ও পাকিস্তান দাবি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর ও স্বতন্ত্র এই প্রস্তাব কার্যত বাঙালি জাতীয়তাবাদের সারোৎসার। কিন্তু সময় ছিল বৈরী। হিন্দু-মুসলিমের বিভেদ বুদ্ধি সম্প্রদায় দুটিকে এত দূরত্বে নিয়ে গিয়েছিল যে, অবিভক্ত বাংলার দাবি কাগজপত্রে বক্তৃতা-বিবৃতিতে সীমাবদ্ধ থেকে যায়। কিন্তু স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক বাংলা গঠনের এই দাবি শেখ মুজিবের অন্তরাত্মায় এক স্বাধীন বাংলার স্বপ্নকে চিরস্থায়ী করে গেঁথে দেয়।

**ভাষা আন্দোলন :** দেশ বিভাগের পরপরই পূর্ব বাংলার রাজনীতি উত্তাল হয়ে ওঠে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালে পূর্ব-বাংলা সফরে এসে ঘোষণা দেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে একমাত্র উর্দু। তাঁর এ ঘোষণা দেশের বিশেষত পূর্ববাংলার জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল না। শেখ মুজিবসহ ছাত্র নেতারা তীব্র ভাষায় এ ঘোষণার প্রতিবাদ জানিয়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেন এবং বাংলাকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এখানেই শেষ নয়, পাকিস্তানের গণপরিষদে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব উত্থাপিত হলে পূর্ব বাংলায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১১ মার্চ ১৯৪৮-এ আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। সদ্য প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ নেতা শেখ মুজিবসহ পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল ছাত্রনেতৃবৃন্দ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। আন্দোলন তীব্রতর হয়ে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সারা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। পুলিশের গুলিতে প্রাণ





দিয়েছিল রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার এবং আরো অনেকে। তারপরেও সেই আন্দোলনকে থামানো যায়নি। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীকে শেষ পর্যন্ত ১৯৫৬ সালে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিতে হয়েছিল।

**সামরিক শাসন :** পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদে বিশৃঙ্খলা ও ডেপুটি স্পিকার নিহত হওয়ার কারণে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী সহজেই এ অঞ্চলে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের অজুহাত খুঁজে পায়। এ ঘটনার পর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মীর্জা ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর এক ঘোষণা বলে দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। তিনি দেশের শাসনতন্ত্র আইন পরিষদ, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা বাতিল করে দেন এবং রাজনৈতিক দলগুলো নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সকল রাজনৈতিক কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। নতুন সামরিক সরকার পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনে আবুল মনসুর আহমদ এবং শেখ মুজিবসহ বহু নেতা ও পরিষদ সদস্যকে গ্রেফতার করে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মীর্জার ভাগ্যে বিপর্যয় ঘটে। প্রধান সেনাপতি মেজর জেনারেল আইয়ুব খান মাত্র ২০ দিনের ব্যবধানে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মীর্জাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং দেশ ত্যাগে বাধ্য করেন। সামরিক শাসন কখনো শুভ কিছু আনতে পারে না। পৃথিবীতে একটিও উদাহরণ নেই, যেখানে সামরিক শাসন একটি দেশকে এগিয়ে নিতে পেরেছে। আইয়ুব খানও পারেনি।

**ছয় দফা :** দেশে সামরিক শাসন, তার ওপর পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ওপর এক রকম বঞ্চনা। কাজেই বাঙালিরা সেটি সহজে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। বাঙালিদের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের তেজস্বী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের স্বায়ত্তশাসন দাবি করে ১৯৬৬ সালে ৬ দফা ঘোষণা করেন। ছয় দফা ছিল পূর্বপাকিস্তানের বাঙালিদের সবরকম অর্থনৈতিক শোষণ বঞ্চনা আর নিপীড়ন থেকে মুক্তির এক অসাধারণ দলিল। ফলে দিনে দিনে ৬ দফা কর্মসূচির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ৬ দফার এ জনপ্রিয়তায় সরকার ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং ৬ দফাকে রাষ্ট্রবিরোধী আন্দোলন বলে অপব্যাখ্যা করতে থাকে। এরপর সরকার ৬ দফা আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য দমন নীতির আশ্রয় নিয়ে ১৯৬৬ সালের ৮ মে শেখ মুজিবসহ বহু আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করে। এ গ্রেফতারের বিরুদ্ধে ঢাকাসহ প্রদেশের সর্বত্র দারুণ ক্ষোভের সঞ্চার হয়। অতঃপর বন্দি নেতাদের মুক্তির দাবিতে ১৯৬৬ সালের ৭ জুন প্রদেশব্যাপী এক সর্বাত্মক হরতালের ডাক দেয়। সরকার হরতাল বন্ধ করতে ১৪৪ ধারা জারি করে কিন্তু জনগণ নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিছিল বের করলে পুলিশ মিছিলকারীদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। এই গুলিতে কিশোর মনু মিয়াসহ ১১ ব্যক্তি নিহত ও শত শত লোক আহন হন।

**আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা :** ৬ দফা আন্দোলন নস্যাৎ করতে না পেরে সরকার ১৯৬৮ সালের জানুয়ারিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে মোট ৩৫ জন সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মিথ্যা মামলা দায়ের করে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, তাঁরা ভারতের সহায়তায় সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য আগরতলায় ষড়যন্ত্র করছিল। আসামিরা নিজেদের নির্দোষ বলে দাবি করে। কিন্তু স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য তাঁদের ওপর চালানো হয় অমানুষিক নির্যাতন। ষড়যন্ত্র মামলার প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী গণআন্দোলন শুরু হয়।

**ছাত্রদের ১১ দফা :** ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরে প্রচণ্ড গণআন্দোলন চলাকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ ডাকসুর সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমেদের নেতৃত্বে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। এ সংগ্রাম পরিষদ ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে ৬ দফাকে অন্তর্ভুক্ত রেখে ১১ দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে। ১১ দফা কর্মসূচিতে বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিলসহ শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি, জরুরি নিরাপত্তা প্রত্যাহার ও রাজবন্দীদের মুক্তি প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

**ঊনসত্তরের গণআন্দোলন :** আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে কেন্দ্র করে গণআন্দোলনের উচ্চারণ ছিল স্পষ্ট 'জাগো জাগো বাঙালি জাগো,' 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর'। এই আন্দোলনের চরম পর্যায়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদ চেতনারও চরম অভিব্যক্তি ঘটে 'জয় বাংলা' গ্লোগান এবং 'তোমার দেশ, আমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ' ধ্বনির মাধ্যমে। ঊনসত্তরের গণআন্দোলন শুরুর পেছনে ৬ দফা ও ১১ দফার ভূমিকা অপরিসীম। মওলানা ভাসানীর ঘেরাও আন্দোলন এখান থেকেই। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ১৯৬৯ সালের ১৯ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা মিছিল বের করে, আহত অবস্থায় বন্দি হন বীর ছাত্ররা। ২০ জানুয়ারি বীর-ছাত্র-যুবক পুলিশ, ই.পি.আরের সঙ্গে বীর বিক্রমে লড়াই করেছিল এবং এদেরকে পেছনে হটিয়ে দিয়েছিল। এই আন্দোলনেই আসাদুজ্জামানকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ২৪ জানুয়ারি প্রতিবাদ দিবস হয়ে ওঠে গণঅভ্যুত্থান দিবস। সেক্রেটারিয়েটের সামনে কিশোর রুস্তম আলী, মকবুল এবং নবম শ্রেণির ছাত্র মতিয়ুর রহমান পুলিশের গুলিতে শহীদ হন। তখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারাধীন বন্দিদের হত্যার ষড়যন্ত্র হয়। শেখ মুজিব প্রাণে বেঁচে গেলেও কিন্তু সার্জেন্ট জহুরুল হক রেহাই পেলেন না। ১৫ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ড. শামসুজ্জোহাকে হত্যা করা হয়। সে রাতেই কারফিউ ভেঙে হাজার হাজার মানুষ সামরিক বাহিনীর সাথে লড়াই করে। ২২ ফেব্রুয়ারি কুখ্যাত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হয়।



কবুতর উড়িয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব





**সত্তরের সাধারণ নির্বাচন :** প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৬৯ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর এক বেতার-টিভি ভাষণে ১৯৭০ সালের ২৭ ডিসেম্বর পাকিস্তানব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। তাঁর ঘোষণায় তিনি এক ইউনিট ভেঙে দেন, এক ব্যক্তি এক ভোট নীতি ঘোষণা করেন এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কায়েমসহ বেশ কিছু মৌলিক নীতির কথা তুলে ধরেন। নানা ষড়যন্ত্র ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগ ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭ আসনে জয়লাভ করে নির্বাচনে তাৎপর্যময় বিজয় অর্জন করে। নির্বাচনের কিছুদিন আগে ১২ নভেম্বর পূর্ববাংলার দক্ষিণাঞ্চলে স্মরণকালের এক বিপর্যয়কর ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় দশ লক্ষাধিক মানুষ প্রাণ হারায়। বঙ্গবন্ধু দুর্গত এলাকায় দলের পক্ষ থেকে ব্যাপক ত্রাণ তৎপরতা ও পুনর্বাসনের কাজ চালান। এ সময় দুর্গত মানুষের প্রতি পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর অবহেলা ও উপেক্ষায় ক্ষুব্ধ শেখ মুজিব শাহবাগ হোটেলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা দেন, 'ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে নিহত ১০ লাখ লোকের মতো আরো ১০ লাখ প্রাণ দিয়ে হলেও আমরা স্বাধীন জাতি হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকার আদায় করে নেব।'

**বৈষম্য :** পাকিস্তানের ২৪ বছরে উভয় অঞ্চলের মধ্যে যে বৈষম্য গড়ে ওঠে তা যেমন বেদনাদায়ক তেমনি বিস্ময়কর।

মুক্তিযুদ্ধ বাংলার মানুষের স্বাধিকার তথা স্বাধীনতার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু তাঁর সমগ্র জীবনের কর্মপ্রয়াসকে কাজে লাগিয়ে ১৯৭০-৭১-এর নির্বাচনে বাংলার মানুষের পক্ষে কথা বলার একক ম্যান্ডেট ও আইনি অধিকার লাভ করেন। নির্বাচন পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ দ্রুত আমাদেরকে একটি পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। চক্রান্ত চলতে থাকে যাতে বঙ্গবন্ধু ক্ষমতায় বসতে না পারেন এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার না হয়। ৬ দফার ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়ন করতে সামরিক বাহিনী ও শাসকগোষ্ঠীর বেসামরিক মুখপাত্র জুলফিকার আলী ভুট্টোর প্রকাশ্য বিরোধিতার ফলে পাকিস্তানের ঐক্যবদ্ধ কাঠামো ধ্বংসের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়। বঙ্গবন্ধু তাঁদের মনোভাব বুঝতে পেরে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নীতি-কৌশল গ্রহণ করতে থাকেন।

৭ মার্চ ১৯৭১ তিনি রেসকোর্স ময়দানের সুবিশাল জনসভায় ঘোষণা করেন–'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম...। প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।' ২৫ মার্চ ১৯৭১ পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী বাংলাদেশকে চির পদানত করার লক্ষ্যে সংকটের সমাধানে সামরিক চক্রান্ত নিয়ে স্বাধীনতাকামী বাঙালিদের ওপর রাতের আঁধারে হামলে পড়ে। পাকিস্তানিদের এই আক্রমণের মোকাবেলায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন; ২৫ মার্চ মধ্যরাতের অবসানে ২৬ মার্চের প্রত্যুষে। শুরু হলো আমাদের মুক্তি সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায় সশস্ত্র যুদ্ধ। বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণার প্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বেতার টিভি ভাষণে ঘোষণা করেছিলেন–'Mujib is a traitor to the nation, this time he will not go unpunished'; সমগ্র বাংলাদেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম। এই সংগ্রামকে সুসংঘবদ্ধ করতে আওয়ামী লীগের নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হয় গণপরিষদ। এ পরিষদের মাধ্যমে ১০ এপ্রিল স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র গ্রহণ করা হয়। ১৭ এপ্রিল

মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামরুজ্জামানের নেতৃত্বে সুদীর্ঘ ৯ মাস বঙ্গবন্ধুর নামে চলে আমাদের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধ। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে ৩০ লক্ষ শহীদ ও ২ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময় শেষে আমরা পরিপূর্ণ বিজয় অর্জন করি। ওই দিন রেসকোর্স ময়দানে ৯৩ হাজার সদস্যবিশিষ্ট পাকিস্তানি সেনা ও সহযোগী বাহিনীসমূহ ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত মিত্র বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং বাংলাদেশ থেকে চিরতরে পাকিস্তানি দখলদারিত্বের অবসান ঘটে। ১৯৪৭ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ঘটনাবলির বিশ্লেষণ করলে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর অবদান স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁকে বাদ দিয়ে প্রাক্ ও উত্তর বাংলাদেশের তথা বাঙালি জাতীয়তাবাদের ইতিহাস রচনা অসম্ভব। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাজার বছরের বাঙালির লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের অগ্রপথিক এবং তিনি গঠনে সহায়তা করেছিলেন বাঙালিদের জন্য একটি স্বাধীন ভূখণ্ড, যার নাম 'বাংলাদেশ'। এজন্য আমরা গর্বিত, আমাদের আগামী প্রজন্মও হবে গর্বিত। বঙ্গবন্ধু, বাঙালি এবং বাংলাদেশ বেঁচে থাকবে সেজন্য। আর এ অমরত্বকে আমরা কেবল কবির ভাষাতেই যথার্থ বলে বোধ করতে পারি। 'যতদিন রবে পদ্মা, মেঘনা, গৌরি যমুনা বহমান ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।'

শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক নেতা যিনি পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব এবং বাংলাদেশের জাতির জনক হিসেবে বিবেচিত। তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি, বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি এবং পরবর্তীকালে এদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। জনসাধারণের কাছে তিনি 'শেখ মুজিব' এবং 'শেখ সাহেব' হিসেবে বেশি পরিচিত এবং তার উপাধি 'বঙ্গবন্ধু'।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল ১৯৩৯ সালে মিশনারি স্কুলে পড়ার সময় থেকেই। এ বছর স্কুল পরিদর্শনে এসেছিলেন তদানীন্তন অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং পরবর্তীতে বাংলার প্রধানমন্ত্রী এবং এমনকি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকারী হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। তিনি স্কুলের ছাদ সংস্কারের দাবির ওপর ভিত্তি করে একটি দল নিয়ে তাদের কাছে যান যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি নিজেই। ১৯৪০ সালে নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দেন। সেখানে তিনি এক বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৪২ সনে এনট্র্যান্স পাস করার পর কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে (বর্তমান নাম মাওলানা আজাদ কলেজ) আইন পড়ার জন্য ভর্তি হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত এই কলেজটি তখন বেশ নামকরা ছিল। এই কলেজ থেকে সক্রিয়ভাবে ছাত্র রাজনীতি শুরু করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি বেঙ্গল মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং অগ্রণী কাশ্মিরী বংশোদ্ভূত বাঙালি মুসলিম নেতা হুসেইন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সান্নিধ্যে আসেন। এখানে তার ছাত্র আন্দোলনের মুখ্য বিষয় ছিল একটি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন। ১৯৪৩ সালে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন।





১৯৪৪ সালে বর্তমান বাংলাদেশের কুষ্টিয়ায় নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে শেখ মুজিব বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তিনি কলকাতায় বসবাসকারী ফরিদপুরবাসীদের নিয়ে তৈরি 'ফরিদপুর ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশনের' সেক্রেটারি মনোনীত হন। এর দুই বছর পর ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের মহাসচিব নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে অর্থাৎ দেশবিভাগের বছর মুজিব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইসলামিয়া কলেজ থেকে বিএ ডিগ্রি লাভ করেন। ভারত ও পাকিস্তান পৃথক হওয়ার সময়ে কলকাতায় ভয়ানক হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হয়। এসময় মুজিব মুসলিমদের রক্ষা এবং দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক তৎপরতায় শরিক হন।

পাকিস্তান-ভারত পৃথক হয়ে যাওয়ার পর শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারির ৪ তারিখে প্রতিষ্ঠা করেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। যার মাধ্যমে তিনি উক্ত প্রদেশের অন্যতম প্রধান ছাত্রনেতায় পরিণত হন। এ সময় সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও জীবনযাত্রার নিম্নমানের উন্নয়নের জন্য এটিকেই একমাত্র সমাধান হিসেবে মনে করতে থাকেন।

বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত আন্দোলনে অংশ নেয়ার মাধ্যমেই শেখ মুজিবের রাজনৈতিক তৎপরতার সূচনা ঘটে। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারির ২৩ তারিখে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন গণপরিষদের অধিবেশনে বলেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। তার এই মন্তব্যে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। প্রতিবাদী শেখ মুজিব অবিলম্বে মুসলিম লীগের এই পূর্ব পরিকল্পিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরুর সিদ্ধান্ত নেন। এই বছরের ২ মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে একটি সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মিলনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করা হয় যাতে শেখ মুজিব একটি প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। এখান থেকেই সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই পরিষদের আহ্বানে ১১ মার্চ ১৯৪৮ তারিখে ঢাকায় ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘট পালনকালে শেখ মুজিবসহ আরও কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মীকে সচিবালয় ভবনের সামনে থেকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু ছাত্রসমাজের তীব্র প্রতিবাদের মুখে ১৫ মার্চ শেখ মুজিব এবং অন্য ছাত্র নেতাদের মুক্তি দেয়া হয়। এদের মুক্তি উপলক্ষে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় র‍্যালি করে, যাতে মুজিব সভাপতিত্ব করেন। পুলিশ এই র‍্যালি অবরোধ করেছিল। পুলিশি কার্যক্রমের প্রতিবাদে শেখ মুজিব অবিলম্বে ১৭ মার্চ ১৯৪৮ তারিখে দেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘটের ঘোষণা দেন। ১৯ মার্চ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে একটি আন্দোলন পরিচালনা করেন। এরপর ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ তারিখে তাকে আবার আটক করা হয় এবং বহিষ্কৃত হন। উল্লেখ্য, ২০১০ সালের ১৪ আগস্ট তার হৃত ছাত্রত্ব (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ফিরিয়ে দেয়া হয়।

১৯৪৯ সালের ২১ জানুয়ারি শেখ মুজিবকে জেল থেকে মুক্তি দেয়া হয়। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি আবার চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবি আদায়ের আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন

যার জন্য তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জরিমানা করা হয়। কিন্তু তিনি এই জরিমানাকে অবৈধ ঘোষণা করে তা আদায় থেকে বিরত থাকেন। এরই ধারাবাহিকতায় ২৬ এপ্রিল মুসলিম লীগ বিরোধী প্রার্থী শামসুল হক টাঙ্গাইলে একটি উপনির্বাচনে বিজয় লাভ করেন। শেখ মুজিব তার সেই আন্দোলনের সফলতার জন্য উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অনশনের ধর্মঘট করেন যার জন্য তাকে আবার আটক করা হয়। এ সময়ই তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণির কর্মাচারীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান। ২৩ জুন সোহরাওয়ার্দী এবং মওলানা ভাসানী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করার পর শেখ মুজিব মুসলিম লীগ ছেড়ে দিয়ে এই নতুন দলে যোগ দেন। তাঁকে দলের পূর্ব পাকিস্তান অংশের যুগ্ম সচিব নির্বাচিত করা হয়। জুনের শেষ দিকে জেল থেকে ছাড়া পান। ছাড়া পাওয়ার পরই খাদ্য সংকটের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগ দেন। এ বছরের সেপ্টেম্বর মাসে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে তাকে সাময়িকভাবে আটক করে রাখা হলেও অচিরেই ছাড়া পেয়ে যান। এর পর মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সঙ্গে মিলে লিয়াকত আলি খানের কাছে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণের চেষ্টা করায় ভাসানী এবং তাকে আটক করা হয়। এটি ছিল অক্টোবরের শেষদিকের কথা।

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের প্রথমদিকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের পূর্ব পাকিস্তান আগমনকে উপলক্ষ করে আওয়ামী মুসলিম লীগ ঢাকায় দুর্ভিক্ষবিরোধী মিছিল বের করে। এই মিছিলের নেতৃত্ব দেয়ার কারণে এবারও শেখ মুজিব আটক হন। সেবার তার দুই বছর জেল হয়েছিল। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন ঘোষণা করেন, উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে। এ ঘোষণার পর জেলে থাকা সত্ত্বেও মুজিব প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আয়োজনে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। জেল থেকে নির্দেশনা দেয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদকে পরিচালনায় তিনি ভূমিকা রাখেন। এরপরই ২১ ফেব্রুয়ারিকে রাষ্ট্রভাষার দাবি আদায়ের দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। একই সময়ে শেখ মুজিব জেলে থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে অনশন পালনের সিদ্ধান্ত নেন। তার এই অনশন ১৩ দিন কার্যকর ছিল। ২৬ ফেব্রুয়ারি তাকে জেল থেকে মুক্তি দেয়া হয়।

১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ৯ জুলাই তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনের শেষে দলের সেক্রেটারি জেনারেল (মহাসচিব) নির্বাচিত হন। একই বছরের ১৪ নভেম্বর সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য অন্যান্য দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৫৪ সালের ১০ মার্চ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি আসনের মধ্যে ২২৩টিতে বিপুল ব্যবধানে বিজয় অর্জন করে যার মধ্যে ১৪৩টি আসনই আওয়ামী লীগ লাভ করেছিল। শেখ মুজিব গোপালগঞ্জ আসনে ১৩,০০০ ভোটের ব্যবধানে বিজয় লাভ করেন। সেখানে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল শক্তিশালী মুসলিম লীগ নেতা ওয়াহিদুজ্জামান। ১৫ মে তাকে কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়। ২৯ মে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দেয়। ৩০ মে করাচি থেকে ঢাকা ফেরার পর বিমানবন্দর থেকেই তাকে আটক করা হয়। ২৩ ডিসেম্বর মুক্তিলাভ করেন। ১৯৫৫ সালের ৫ জুন শেখ মুজিব





আইন পরিষদের সদস্য মনোনীত হন। ১৭ জুন আওয়ামী লীগ পল্টন ময়দানে আয়োজিত এক সম্মেলনে ২১ দফা দাবি পেশ করে যার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২১ অক্টোবর বাংলাদেশ আওয়ামী মুসলিম লীগের বিশেষ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেয়া হয়। শেখ মুজিব পুনরায় দলের মহাসচিব নির্বাচিত হন। ৩ ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আওয়ামী লীগের বৈঠকে দল থেকে খসড়া সংবিধানে স্বায়ত্তশাসন অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানানো হয়। ১৪ জুলাই রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে সামরিক উপস্থিতির বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব রাখা হয় যা তিনিই সরকারের কাছে পেশ করেন। সেপ্টেম্বর মাসের ৪ তারিখ তার নেতৃত্বে একটি দুর্ভিক্ষ বিরোধী মিছিল বের হয়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের কারণে এই মিছিলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে কমপক্ষে তিনজন নিহত হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর শেখ মুজিব কোয়ালিশন সরকারে যোগ দিয়ে একযোগে শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতিরোধ এবং গ্রামীণ সহায়তা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দলের জন্য সম্পূর্ণ সময় ব্যয় করার তাগিদে ১৯৫৭ সালে ৩০ মে মন্ত্রী পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন। ৭ আগস্ট সরকারি সফরে চীন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন গমন করেন। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা এবং সেনাবাহিনী প্রধান আইয়ুব খান দেশে সামরিক আইন জারি করে সকল ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এই বছরেরই ১১ অক্টোবর তাকে আটক করা হয়। জেলা থাকা অবস্থায় তার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি ভিত্তিহীন অভিযোগ আনা হয়। ১৪ মাস একটানা আটক থাকার পর তাকে মুক্তি দেয়া হলেও জেলের ফটক থেকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়।

উচ্চ আদালতে একটি রিট পিটিশন দায়ের করার মাধ্যমে তিনি ১৯৬১ সালে জেল থেকে ছাড়া পান। এবার শুরু করেন গুপ্ত রাজনৈতিক তৎপরতা। অন্যান্য সাধারণ ছাত্রনেতাদের নিয়ে গোপনে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন যার উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা আদায়ের লক্ষ্যে কাজ করা। ১৯৬২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি জননিরাপত্তা আইনে তাকে আবার আটক করা হয়েছিল। জুনের ২ তারিখে চার বছরব্যাপী মার্শাল ল' অপসারণের পর একই মাসের ১৮ তারিখে তাকে মুক্তি দেয়া হয়। ২৫ জুন অন্য রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে মিলে আইয়ুব খান আরোপিত বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমে পড়েন। ৫ জুন পল্টন ময়দানে আয়োজিত এক সম্মেলনে আইয়ুব খানের সমালোচনা করেন। ২৪ সেপ্টেম্বর লাহোর যান এবং সেখানে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে মিলে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তোলেন। এটি মূলত বিরোধী দলসমূহের একটি সাধারণ কাঠামো হিসেবে কাজ করেছিল। অক্টোবর মাসজুড়ে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে মিলে বাংলার বিভিন্ন স্থান সফর করেন এই যুক্তফ্রন্টের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে। ১৯৬৩ সালে সোহরাওয়ার্দীর সাথে আলোচনার উদ্দেশ্যে লন্ডন যান, সোহরাওয়ার্দী সেখানে চিকিৎসারত ছিলেন। এই বছরের ৫ ডিসেম্বর তিনি বৈরুতে মৃত্যুবরণ করেন।

সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর ১৯৬৪ সালের ২৫ জানুয়ারি মুজিবের বাসায় অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে আওয়ামী লীগকে পুনরায় সংহত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই বৈঠকের প্রস্তাবের

ভিত্তিতে শেখ মুজিব তৎকালীন পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের মহাসচিব ও মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশকে দলের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ১১ মার্চ একটি সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় যার মাধ্যমে মুজিব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধকল্পে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সেনাশাসক আইয়ুব খানের বেসিক ডেমোক্রেসিস প্ল্যান, সামরিক শাসন এবং এক-ইউনিট পদ্ধতির বিরোধী নেতাদের মধ্যে অগ্রগামী ছিলেন শেখ মুজিব। এই পদ্ধতি অনুযায়ী ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার পরিকল্পনা করা হয় এবং প্রদেশগুলোকে একত্রে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে, মুজিব আইয়ুববিরোধী দল প্রার্থী ফাতিমা জিন্নাহকে সমর্থন করেন। যথারীতি নির্বাচনের দুই সপ্তাহ পূর্বে তাকে আটক করা হয়। তাকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং আপত্তিকর প্রস্তাব পেশের অভিযোগে অভিযুক্ত করে এক বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। অবশ্য উচ্চ আদালতের এক রায়ে তার আগেই তিনি মুক্তি পেয়ে যান। এ সময় সামরিক বাহিনীর গণহত্যা আর বাঙালিদের চাহিদা পূরণে সামরিক শাসকদের ঔদাসীন্য পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে ক্ষুব্ধ করে তোলে।

১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলসমূহের একটি জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনেই শেখ মুজিব তার ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি পেশ করেন যাতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের পরিপূর্ণ রূপরেখা উল্লেখিত হয়েছিল। শেখ মুজিব এই দাবিকে 'আমাদের বাঁচার দাবি' শিরোনামে প্রচার করেছিলেন। এই দাবির মূল বিষয় ছিল একটি দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পরিচালিত পাকিস্তানি ফেডারেশনে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন। এই দাবি সম্মেলনের উদ্যোক্তারা প্রত্যাখ্যান করেন এবং শেখ মুজিবকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করেন। এ কারণে তিনি উক্ত সম্মেলন বর্জন করে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসেন। মার্চ মাসের এক তারিখে শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনের পর তিনি ছয় দফার পক্ষে সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে দেশব্যাপী অভিযান পরিচালনা করেন। প্রায় পুরো দেশই ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণের সময় তিনি সিলেট, ময়মনসিংহ এবং ঢাকায় বেশ কয়েকবার পুলিশের হাতে বন্দি হন। বছরের প্রথম চতুর্থাংশেই তাকে আটবার আটক করা হয়েছিল। এই বছরের ৮ মে নারায়ণগঞ্জে পাট কারখানার শ্রমিকদের এক র‍্যালিতে অংশগ্রহণের জন্য তাকে আবার গ্রেফতার করা হয়। তার মুক্তির দাবিতে ৭ জুন দেশব্যাপী ধর্মঘট পালিত হয়। পুলিশ এই ধর্মঘট চলাকালে গুলিবর্ষণ করে। যার কারণে ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জে আনুমানিক তিনজনের মৃত্যু হয়।

সেনাবাহিনী কর্তৃক আটক হয়ে জেলে দুই বছর থাকার পর ১৯৬৮ সালের প্রথমদিকে পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিব এবং আরও ৩৪ জন বাঙালি সামরিক ও সিএসপি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে যা ইতিহাসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে সুপরিচিত। মামলায় উল্লেখ করা হয়েছিল শেখ মুজিবসহ এই কর্মকর্তারা ভারতের ত্রিপুরা অঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত আগরতলা শহরে ভারত সরকারের সাথে এক বৈঠকে পাকিস্তানকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা তৈরি করেছে। এতে শেখ মুজিবকে এক নম্বর আসামি করা হয় এবং পাকিস্তান বিভাগের এই ষড়যন্ত্রের মূল হোতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অভিযুক্ত সকল আসামিকে ঢাকা সেনানিবাসে অন্তরীণ করে রাখা হয়। এর





অব্যবহিত পরেই সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। এই মামলাকে মিথ্যা আখ্যায়িত করে সর্বস্তরের মানুষ শেখ মুজিবসহ অভিযুক্ত সকলের মুক্তির দাবিতে রাজপথে নেমে আসে। এহেন পরিস্থিতিতে একই বছরের ১৯ জুন ঢাকা সেনানিবাসের অভ্যন্তরে কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে অভিযুক্ত আসামিদের বিচারকার্য শুরু হয়।

বিচারকার্য চলাকালীন ১৯৬৯ সালের ৫ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাদের এগার দফা দাবি পেশ করে যার মধ্যে শেখ মুজিবের ছয় দফার সবগুলোই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলনের প্রস্তুতি গৃহীত হয়। এই সংগ্রাম এক সময় গণআন্দোলনে রূপ নেয়। এই গণআন্দোলনই ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত। মাসব্যাপী প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলন, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ, কারফিউ, পুলিশের গুলিবর্ষণ এবং বেশ কিছু হতাহতের পর আন্দোলন চরম রূপ ধারণ করলে পাকিস্তান সরকার ছাড় দিতে বাধ্য হয়। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খান রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে এক গোলটেবিল বৈঠকের পর এই মামলা প্রত্যাহার করে নেন। এর সাথে শেখ মুজিবসহ অভিযুক্ত সকলকে মুক্তি দেয়া হয়। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এই বছরের ২৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে শেখ মুজিবের সম্মানে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক সভার আয়োজন করে। লাখো জনতার এই সম্মেলনে শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদান করা হয়। উপাধি প্রদানের ঘোষণা দিয়েছিলেন জনাব তোফায়েল আহমেদ। এই সভায় রাখা বক্তৃতায় শেখ মুজিব ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগার দফা দাবির পক্ষে তার পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন।

১৯৬৯ সালে আইয়ুব খানের আহ্বানে অনুষ্ঠিত একটি সর্বদলীয় সম্মেলনে মুজিব তার ছয়-দফাসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের চাহিদাগুলো মেনে নেওয়ার আহ্বান জানান এবং তা প্রত্যাখ্যাত হলে সম্মেলন থেকে বের হয়ে আসেন। ১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক জনসভায় মুজিব ঘোষণা করেন যে, এখন থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে 'বাংলাদেশ' নামে অভিহিত করা হবে :

'একটা সময় ছিল যখন এই মাটি আর মানচিত্র থেকে 'বাংলা' শব্দটি মুছে ফেলার সব ধরনের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। 'বাংলা' শব্দটির অস্তিত্ব শুধু বঙ্গোপসাগর ছাড়া আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যেত না। আমি পাকিস্তানের পক্ষ থেকে আজ ঘোষণা করছি যে, এখন থেকে এই দেশকে 'পূর্ব পাকিস্তানের' বদলে 'বাংলাদেশ' ডাকা হবে।'

মুজিবের এই ঘোষণার ফলে সারা দেশে গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদ এবং সামরিক কর্তারা তাকে একজন বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হিসেবে মূল্যায়িত করতে শুরু করেন। মুজিবের বাঙালি সংস্কৃতি ও জাতিগত আত্মপরিচয়ের বহিঃপ্রকাশ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করে। অনেক বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিত্বের মতে, বাঙালিদের আন্দোলন দ্বিজাতিতত্ত্বকে অস্বীকার করার নামান্তর। এই দ্বিজাতিতত্ত্বের মাধ্যমেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। বাঙালিদের জাতিগত ও সংস্কৃতিগত এই আত্মপরিচয় তাদেরকে একটি আলাদা জাতিসত্তা প্রদান করে। মুজিব পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক জনমত গড়ে তুলতে সমর্থ হন এবং কার্যত ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক আইনসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পূর্ব পাকিস্তানের কোটার ২টি আসন ছাড়া বাকি সবগুলোতে জয়ী হওয়ার জন্য জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাও অর্জন করে আওয়ামী লীগ। নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে মেরুকরণ সৃষ্টি করে। পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো, মুজিবের স্বায়ত্তশাসনের নীতির প্রবল বিরোধিতা করেন। ভুট্টো এ্যাসেম্বলি বয়কট করার হুমকি দিয়ে ঘোষণা দেন যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান মুজিবকে সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানালে তিনি সে সরকারকে মেনে নেবেন না।

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মধ্যে ইয়াহিয়া খান সংসদ ডাকতে দেরি করছিলেন। বাঙালিরা এতে বুঝে ফেলে যে, মুজিবের দলকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও সরকার গঠন করতে দেয়া হবে না। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় শেখ মুজিব স্বাধীনতার ডাক দেন এবং জনগণকে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করেন।

ইয়াহিয়া খান সামরিক আইন জারি করেন, আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং মুজিবসহ আওয়ামী লীগের অন্য নেতাদের গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী রাজনৈতিক ও জনসাধারণের অসন্তোষ দমনে ২৫ মার্চ অপারেশন সার্চলাইট শুরু করে। সামরিক বাহিনীর অভিযান শুরু হলে মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।

মুজিবকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ফয়সালাবাদের একটি জেলে কড়া নিরাপত্তায় রাখা হয়। পাকিস্তানি জেনারেল রহিমুদ্দিন খান মুজিবের মামলা পরিচালনা করেন। মামলার আসল কার্যপ্রণালী এবং রায় কখনোই জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি। এ মামলাটি 'লায়ালপুর ট্রায়াল' হিসেবে অভিহিত।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরিচালিত অভিযান অল্প সময়ের মধ্যেই হিংস্রতা ও তীব্র রক্তপাতে রূপ নেয়। রাজাকারদের সহায়তায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালি বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ ও ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দসহ সাধারণ মানুষকে আক্রমণ করে। বাঙালি ও অবাঙালি হিন্দুদেরকে লক্ষ্য করে বিশেষ অভিযানের কারণে বছরজুড়ে প্রচুর হিন্দু জনগোষ্ঠী সীমান্ত অতিক্রম করে পার্শ্ববর্তী পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায় আশ্রয় গ্রহণ করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ও পুলিশ রেজিমেন্টে কর্মরত পূর্ব বাংলার সদস্যবৃন্দ দ্রুত বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং লীগ সদস্যবৃন্দ কলকাতায় তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে প্রবাসে বাংলাদেশ সরকার গঠন করেন। পূর্ব পাকিস্তানে মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্বে বড় রকমের বিদ্রোহ সংঘটিত হতে থাকে। আন্তর্জাতিক চাপ থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানি সরকার মুজিবকে ছেড়ে দিতে এবং তাঁর সাথে সমঝোতা করতে অস্বীকৃতি জানায়।

যুদ্ধবর্তী সময়ে মুজিবের পরিবারকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়। তার সন্তান শেখ কামাল মুক্তিবাহিনীর একজন গুরুত্বপূর্ণ অফিসার ছিলেন। মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তান বাহিনীর ভিতরে সংঘটিত যুদ্ধটিই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ নামে পরিচিত। ১৯৭১ সালে ভারতীয়





সরকারের অংশগ্রহণের পর, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর যৌথ দলের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং লীগ নেতৃবৃন্দ ঢাকায় ফিরে সরকার গঠন করেন। পাকিস্তানি শাসকবৃন্দ মুজিবকে ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি মুক্তিদান করে। এরপর তিনি লন্ডন হয়ে নয়া দিল্লিতে ফিরে আসেন এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাতের পর জনসমক্ষে 'ভারতের জনগণ, আমার জনগণের শ্রেষ্ঠ বন্ধু' বলে তাঁকে সাধুবাদ জানান। তিনি ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশে ফিরে আসেন। সেদিন তিনি ঢাকায় জড়ো হওয়া প্রায় পাঁচ লাখ মানুষের সামনে বক্তৃতা দেন।

শেখ মুজিবুর রহমান অল্পদিনের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন রাষ্ট্রপতি ছিলেন এবং পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭০-এ পূর্ব পাকিস্তান আইনসভার জন্য নির্বাচিত রাজনীতিবিদরা নতুন রাষ্ট্রের প্রথম সংসদ গঠন করেন। মুক্তিবাহিনী এবং অন্যান্য মিলিশিয়াদের নিয়ে নতুন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গঠিত হয়। তারই অভিপ্রায়ক্রমে ১৭ মার্চ ১৯৭২ ভারতীয় বাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের ভূখণ্ড ত্যাগ করে।

বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে স্বীকৃতি লাভের পর শেখ মুজিব পাকিস্তান, ওআইসি, জাতিসংঘ ও জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনে বাংলাদেশের সদস্যপদ নিশ্চিত করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে ভ্রমণ করে বাংলাদেশের জন্য মানবীয় ও উন্নয়নকল্পের জন্য সহযোগিতা চান। তিনি ভারতের সঙ্গে একটি ২৫ বছর মেয়াদি মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষর করেন, যাতে অর্থনৈতিক ও মানব সম্পদ উন্নয়নে ব্যাপক সাহায্যের আশ্বাস দেয়া হয়। চুক্তিতে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনী ও সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের শর্ত অন্তর্ভুত ছিল। মুজিব ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখেন। মুজিবের জীবদ্দশায় দুই সরকারের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা ছিল।

মুজিব তার অন্তর্বর্তী সংসদকে একটি নতুন সংবিধান রচনার দায়িত্ব দেন এবং চারটি মূলনীতি হিসেবে 'জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র' ঘোষণা করেন যা মুজিববাদ নামেও পরিচিত। মুজিব শতাধিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও কোম্পানি রাষ্ট্রীয়করণ করেন এবং ভূমি ও মূলধন বাজেয়াপ্ত করে ভূমি পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে কৃষকদের সাহায্যের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধকালে ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী ১ কোটি শরণার্থীর পুনর্বাসনের জন্য বড় পদক্ষেপ নেয়া হয়। এর ফলে অর্থনৈতিক সংকট হ্রাস পেতে শুরু করে এবং সমূহ দুর্ভিক্ষ এড়ানো সম্ভব হয়। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর থেকে নতুন সংবিধান কার্যকর করা হয় এবং ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে শেখ মুজিব ও তাঁর দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং তিনি বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচিত সরকার গঠন করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, খাদ্য, পানি ও বিদ্যুত সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি ঘটান। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় কৃষি, গ্রামীণ অবকাঠামো ও কুটির শিল্প উন্নয়নে প্রাগ্রাধিকারমূলক সরকারি অর্থ বরাদ্দের নির্দেশ দেয়া হয়।

ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও মুজিব ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইসলামি অনুশাসনের পথে অগ্রসর হন। তিনি পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে আঁতাতের অভিযোগে ১৯৭২ সালে নিষিদ্ধ ঘোষিত ইসলামিক একাডেমি পুনরায় চালু

করেন। ইসলামিক গোত্রগুলোর জোর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মদ তৈরি ও বিপণন এবং জুয়া খেলা নিষিদ্ধ করেন। তারই সিদ্ধান্তক্রমে বাংলাদেশ অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স ও ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক-এর সদস্যপদ গ্রহণ করে। মুজিব ১৯৭৪ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত ওআইসি সম্মেলনে যোগ দিতে যান যা পাকিস্তানের সাথে কিছুমাত্রায় সম্পর্ক উন্নয়ন ও পাকিস্তানের স্বীকৃতি পেতে সহায়তা করে। জনসাধারণের সামনে উপস্থিতি ও ভাষণের সময় শেখ মুজিব ইসলামিক সম্ভাষণ ও গ্লোগান ব্যবহার বাড়িয়ে দেন এবং ইসলামিক আদর্শের উল্লেখ করতে থাকেন।

## মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশ

১৯৭১ সালের ২৬ ডিসেম্বর বাঙালি জাতি হানাদার পাকিস্তানি সামরিক স্বৈরশাসনের কবল থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার ১ বছর পর অর্থাৎ ১৯৪৮ সালে ভাষার অধিকারের দাবিতে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর আসল চেহারা বাঙালিদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। ১৯৫২ সালে ভাষার দাবিতে রক্তদানের মাধ্যমে বাঙালি জাতি তাদের ভাষার অধিকার আদায় করে। এরপর ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় '৫৪-র নির্বাচন, '৫৮-র সামরিক শাসন বিদ্রোহ আন্দোলন, '৬৬-র ৬ ও ১১ দফা আন্দোলন এবং '৬৯-র গণঅভ্যুত্থান। এ সময়ে গণআন্দোলনের চাপের মুখে আইয়ুব খান ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন লাভ করে। পাকিস্তান পিপলস পার্টি ৮৮টি আসন লাভ করে। পূর্বপাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৮৮টি আসন লাভ করে। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের ১ম অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। এই অধিবেশন স্থগিতের প্রতিবাদে বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এক সাংবাদিক সম্মেলনে ২ ও ৩ মার্চ হরতাল পালনের আহ্বান জানান। ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ দেশব্যাপী পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়। ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে এক বিশাল ছাত্র জমায়েত অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ১০ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এক সম্মেলন আহ্বান করেন। এর আগে ৬ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন ২৫ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে। অপরদিকে টিক্কা খানকে পূর্বপাকিস্তানের সামরিক প্রশাসক ও গভর্নর নিযুক্ত করেন। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেসকোর্সের ঐতিহাসিক জনসভায় ঘোষণা করলেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম। স্বাধীনতার সংগ্রাম।' তিনি ডাক দিলেন অসহযোগ আন্দোলনের। ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন। ১৬ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠক হয়। ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করেন এবং ঐ রাতেই পাক হানাদার বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে ঢাকার ঘুমন্ত নিরস্ত্র মানুষের ওপর। তারা কয়েক হাজার বাঙালিকে হত্যা করে। এ সময় শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর শেখ মুজিবের পক্ষে চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে (বর্তমানে মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথ তলার আমবাগানে) আনুষ্ঠানিক





ভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি করা হয়। এ ঘোষণা পত্রে বাংলাদেশকে একটি প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ঐদিন সরকার গঠন করা হয়। এই সরকার ১৭ এপ্রিলই শপথ গ্রহণ করে। তখন মুজিবনগর হয় দেশের অস্থায়ী রাজধানী। নবগঠিত এই সরকারের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান, উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ। শেখ মুজিব পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি থাকায় অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান হন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। মন্ত্রী পরিষদের অন্যরা হলেন–খন্দকার মোশতাক আহমেদ, এম মনসুর আলী এবং এ এইচ এম কামরুজ্জামান। সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান হলেন কর্নেল এম এ জি ওসমানী। এছাড়া সরকারকে পরামর্শ দেয়ার জন্য স্বাধীনতার পক্ষের কয়েকটি দল থেকে একজন করে নিয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। এ সময় বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বা রণাঙ্গনে ভাগ করে মুক্তিযুদ্ধ চালানো হয়। সে সময় ভারতসহ কয়েকটি দেশ মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন ও রণসম্ভার সরবরাহ করে। যুদ্ধ চলাকালে ইয়াহিয়া খান রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে শেখ মুজিবের বিচারের কথা ঘোষণা করেন। নভেম্বরের মাঝামাঝি কুষ্টিয়া, যশোর, রংপুর, দিনাজপুর, সিলেট প্রভৃতি জেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর খুলনা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, রাজশাহী ও কুমিল্লার মুক্তাঞ্চলে তাদের অবস্থান সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের নৌবাহিনীগুলো চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, বরিশাল, চালনা প্রভৃতি বন্দরে সাফল্যজনক অভিযান চালায়। মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে বিমান বাহিনী গঠন করা হয়। তারাও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে অংশগ্রহণ করে। ইয়াহিয়া খান এ যুদ্ধ আন্তর্জাতিক রূপ দেয়ার জন্য ভারতের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বিমান বাহিনী ভারতের কয়েকটি বিমান ঘাঁটিতে বোমাবর্ষণ করে। ঐদিন ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ৪ ডিসেম্বর থেকে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী যৌথভাবে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে থাকে। ৬ ডিসেম্বর ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ইতোমধ্যে দখলদার বাহিনী বাংলাদেশে তাদের সবকটি জঙ্গি বিমান হারায়। ৯ ও ১০ ডিসেম্বর আরও বহু অঞ্চল যৌথ বাহিনীর দখলে আসে। ১৪ ডিসেম্বর যৌথবাহিনী ঢাকার মাত্র ১৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করে ঢাকাকে ঘেরাও করে ফেলে। স্বাধীনতার প্রাককালে হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার, আলবদর ও আলশামসরা বহু সংখ্যক শিক্ষক, ডাক্তার, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও অন্য বুদ্ধিজীবীদের ধরে নিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজী ৯৩ হাজার সহযোগী সৈন্য, বিপুল পরিমাণ রসদ ও আগ্নেয়াস্ত্রসহ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিনাশর্তে যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। এ আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। ৩০ লাখ শহীদের রক্ত আর ২ লাখ মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামের রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।

## বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী

বাংলাদেশে ভারতের প্রথম ডেপুটি হাইকমিশনার এবং পরবর্তীকালে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব জেএন দীক্ষিত তার গ্রন্থে (Liberation and Beyond, Dhaka : UPL, 1999) বাংলাদেশের জাতীয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের চরিত্র চিত্রণের লক্ষ্যে 'Persona of Sheikh Mujibur Rahman' শীর্ষক একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করেছেন। জেএন দীক্ষিত

কাছ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে দেখেছেন দীর্ঘকাল, বিশেষ করে স্বাধীনতার পরপরই যখন তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, হাজারো সমস্যায় ক্লিষ্ট বাংলাদেশের প্রাথমিক পর্যায়ে ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতের কোনো কূটনীতিকের এমন সুযোগ কমই হয়েছে। তাই তার বিবরণ ভারতের অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেও ভারতের অধিপতি শ্রেণির কাছে বঙ্গবন্ধু আস্থাভাজন ব্যক্তি ছিলেন না। তাদের মনের মতো নীতি তিনি নির্ধারণে সক্ষম হননি।

জেএন দীক্ষিত ঠিকই লিখেছেন, শেখ মুজিব পূর্ব বাংলার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুল পর্যায়ে লেখাপড়া শেষ করে তিনি কলেজ পর্যায়ে শিক্ষা লাভের জন্য কলকাতায় যান এবং অন্যান্য মুসলমান ছাত্রের মতোই মুসলিম লীগের ছাত্রফ্রন্টে প্রভাবশালী ভূমিকা রেখেছেন। ১৯৪৫-৪৭ সময়কালে তিনি মুসলিম লীগের আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় তার ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। দীক্ষিতের কথায়, তিনি অনুধাবন করেন যে, এভাবেই বাংলার মুসলমানরা এক সম্মানজনক অবস্থানের অধিকারী হতে পারেন। ধর্মীয়ভাবে তিনি গোঁড়া ছিলেন না; কিন্তু তার স্থির বিশ্বাস জন্মেছিল যে, বাংলার মুসলমানদের ইসলামী স্বাতন্ত্র্যই শুধু হিন্দু-প্রধান ভারতের কাছ থেকে তাদের যথার্থ দাবি আদায় সক্ষম হবে।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ সালের মধ্যে পাকিস্তানে আর্থ-সামাজিক এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সাধিত হয়, বিশেষ করে পূর্ব বাংলার জনগণের ওপর রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুকে যেভাবে চাপিয়ে দেয়া হয়, তা মুজিবের মনে গভীর রেখাপাত করে। পূর্ব বাংলার যে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রয়েছে এবং পূর্ব বাংলার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা যে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে স্বতন্ত্র এবং তা অর্জনের জন্য পূর্ব বাংলার যে আনুপাতিক ভূমিকা পালন একান্ত প্রয়োজন, তা তিনি এ সময় অনুভব করেন। পঞ্চাশের দশকে তাই তিনি পূর্ব বাংলার জনসমষ্টির চিন্তাভাবনার প্রধান মুখপাত্রে পরিণত হন। পাকিস্তানের উভয় অংশে বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্য, পূর্ব বাংলায় পশ্চিম পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের আধিপত্য এবং পূর্ব বাংলার জনগণের বঞ্চনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বিশ্বাস করতে শুরু করেন, পাকিস্তানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য অপরিহার্য হল ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন। এজন্য তিনি শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দাবিতে উচ্চকণ্ঠ হন। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কেও তিনি হয়ে ওঠেন প্রতিবাদমুখর। কিন্তু তিনি পাকিস্তান ভেঙে দেয়া অথবা পূর্ব বাংলাকে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে কোনো সময় চিন্তাভাবনা করেননি। দীক্ষিতের কথা, ১৯৪৬-৭১ সময়কালে কখনোই তিনি পাকিস্তান সরকারের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করেননি অথবা ভারতের সমর্থনে কোনো কথা বলেননি। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, পূর্ব পাকিস্তানিদের স্বতন্ত্র মুসলিম অস্তিত্ব ভারত সরকারের সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের প্রভাবে ম্রিয়মাণ হয়ে যেতে পারে।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজয় লাভের পর যখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্ব থেকে তিনি অন্যায় ও অবৈধভাবে বঞ্চিত হন, তারপরই শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের পৃথকীকরণ এবং বাংলাদেশ সৃষ্টির পক্ষে মতপ্রকাশ করেন।

স্বাধীন বাংলাদেশের সরকারপ্রধানরূপে এ উপমহাদেশে একটি স্বতন্ত্র সামাজিক নৃতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক ফোর্স হিসেবে বাংলাদেশকে তিনি সর্বত্র তুলে ধরতে চেয়েছেন।





তিনি তার ভাবনায় সব সময় সুস্পষ্ট ছিলেন যে, পূর্ব বাংলার নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে স্বতন্ত্র। তিনি প্রায়ই 'বাঙাল' ও 'ঘটির' মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরতেন। তিনি এ বিশ্বাসে অত্যন্ত সুদৃঢ় ছিলেন যে, সদ্য সৃষ্ট বাংলাদেশের জাতীয় অস্তিত্ব শক্তিশালী হবে যদি বাংলাদেশিদের মুসলিম ঐতিহ্য বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের প্রাথমিক উপাদান হয়ে ওঠে (পৃ. ২২৪)। বাংলাদেশের ইসলামিক ঐতিহ্যের প্রতি এ গুরুত্ব আরোপ কিন্তু শেখ মুজিবের কাছে কোনোরূপ ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল না, ছিল না বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের প্রতি কোনোরূপ বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিফলন। ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তিনি ধর্মনিরপেক্ষতাকে যদিও অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেন; কিন্তু ধর্ম থেকে রাজনীতির পূর্ণ পৃথকীকরণে তিনি বিশ্বাস করতেন না। জাতীয় সংহতি দৃঢ়কল্পে মিলন সূত্র হিসেবে ইসলামের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। তিনি আরও অনুভব করেন, ইসলামিক ঐতিহ্য তুলে ধরা প্রয়োজন এ কারণে যে, বাংলাদেশের সংস্কৃতি যেন পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের সংস্কৃতি প্রবাহে নিমজ্জিত না হয়ে পড়ে।

জেএন দীক্ষিত আরও বলেছেন, অনেকটা বিপ্লবাত্মক ঢংয়ে শেখ মুজিব চেয়েছিলেন বাংলাদেশকে উপমহাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে। জনসংখ্যার দিক থেকে পাকিস্তান থেকে বৃহত্তর বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় হয়ে উঠবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম রাষ্ট্র। এ কারণেই স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকেই পাকিস্তানের স্বীকৃতি লাভে আগ্রহী হয়ে ওঠেন শেখ মুজিব। তারপর বাংলাদেশ হবে ইসলামী সংহতি পরিষদের (Organization of Islamic Conference- OIC) সদস্য এবং মুসলিম বিশ্বে লাভ করবে গৌরবজনক এক অবস্থান। দীক্ষিত আরও লিখেছেন, মুজিব চেয়েছিলেন বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুসলিম রাষ্ট্র এবং পশ্চিম এশিয়া ও গালফ অঞ্চলের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে এক সেতুবন্ধ রচনা করুক (পৃ. ২২৪)। এসব কারণেই শেখ মুজিব পাকিস্তানের স্বীকৃতি, ওআইসির সদস্যপদ এবং মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার লিবিয়া, আলজেরিয়া, মিসর ও সৌদি আরবের সঙ্গে অর্থনৈতিক এবং নিরাপত্তা সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হতে চেয়েছেন। শেখ মুজিব আরও চেয়েছিলেন, মুক্তিযুদ্ধে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন যে ভূমিকা পালন করেছে এবং এর ফলে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর বাংলাদেশের যে মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক নির্ভরশীলতা গড়ে উঠেছে, তা সঠিকভাবে ব্যালান্স করার জন্য চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে, যদিও মুক্তিযুদ্ধে তাদের ভূমিকা মোটেই সুখকর ছিল না। বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ সমুন্নত রাখতে এবং ইসলামী সৌভ্রাতৃত্বের লক্ষ্যে তিনি চেয়েছিলেন মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও সৌদি আরবের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে।

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে তার অবস্থান ছিল অনেকটা একজন বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদীর মতো, যার কাছে ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং যিনি চীন ও পাশ্চাত্যের সঙ্গে অব্যাহত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় জাতীয় স্বার্থ সমুন্নত রাখবেন। ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থিতিশীল থাক এবং দূরবর্তী সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গেও সুসম্পর্ক বজায় থাকুক। কিন্তু তা এমন পর্যায়ে যেন না আসে যার ফলে 'সোভিয়েত-ভারত অক্ষশক্তি' কোনোক্রমে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপে সক্ষম হয় (পৃ. ২২৫)। জেএন দীক্ষিতের মতে, শেখ মুজিবের

এ দৃষ্টিভঙ্গি ভারতের নীতিনির্ধারকদের অনেক উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, বিশেষ করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর। ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশের ওআইসির সদস্যপদ লাভ, জুন মাসে জুলফিকার আলী ভুট্টোর ঢাকা সফরের ফলে দুই-এর মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। তাছাড়া ওই সময় বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমগুলোর ভারতের তীব্র সমালোচনা এবং সে ক্ষেত্রে মুজিবের নীরব ভূমিকা, গঙ্গার পানিবণ্টন এবং সমুদ্রসীমারেখা নির্ধারণে জটিলতা, 'তিনবিঘা' হস্তান্তরে ভারতের গড়িমসি এবং বাংলাদেশে ভারতবিরোধী আন্দোলন এবং তাতে কিছুটা মুজিবের নীরব উৎসাহ–সব মিলিয়ে ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কের উষ্ণতা প্রচুর পরিমাণে হ্রাস পায়। এ সময় শেখ মুজিবও বাংলাদেশে বহিঃশক্তির প্রভাব (প্রকারান্তরে তা ছিল ভারতের আধিপত্য), বাংলাদেশের স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণে ইসলামের প্রতি তার অধিক পরিমাণে গুরুত্ব আরোপ এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় সরকারের দৃঢ় ভূমিকা সম্পর্কে ঘোষণা দানও ভারতকে কিছুটা বিচলিত করে তোলে। তিনি মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান সকৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করেও সমতা ও সম-সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ককে স্থিতিশীল করার কথাও ঘোষণা করেন। শেখ মুজিব এসব কথা বাংলাদেশে ভারতের হাইকমিশনার সুবিমল দত্তকে এবং ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওআইবি চ্যাবনকে ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে বলেছেন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারাও শেখ মুজিবের এ ধারণা ভারতের পররাষ্ট্র সচিব কেওয়াল সিংকে জানিয়েছেন ১৯৭৪ সালের শেষদিকে। অন্যদিকে মিসর ও আলজেরিয়া থেকে বাংলাদেশের ভারি অস্ত্রশস্ত্র লাভ এবং ভারত ছাড়া অন্যত্র বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ লাভের বিষয়ও ভারতের নেতাদের শেখ মুজিব সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা পোষণে উৎসাহিত করে। ১৯৭৫ সালের প্রথমদিকে বহুদলীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে বাংলাদেশে শেখ মুজিবের একদলীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং কর্তৃত্ববাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন ছিল অনেকটা কফিনে শেষ পেরেকের মতো। ভারতীয় নেতারা শেখ মুজিবকে 'লস্ট কেস' হিসেবে তখন থেকে গ্রহণ করতে শুরু করেন। বিশেষ করে ১৯৭৫ সালের প্রথমদিকে ভারতীয় মন্ত্রী চ্যাবনের ঢাকা সফরের পর থেকে। শেখ মুজিব সম্পর্কে জেএন দীক্ষিতের গ্রন্থের এ অধ্যায়ে তার মন-মানসিকতা সম্পর্কে এমনই বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

জেএন দীক্ষিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে চিত্র অংকন করেছেন তা তো একজন দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদীর। এ চিত্রের সঙ্গে বাংলাদেশের যে কোনো জাতীয় নেতার চিত্রের মিল এত বেশি যে, তা কি দীক্ষিত কোনো সময়ে ভেবেছেন? এ ছবি আবুল কাশেম ফজলুল হকের, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর, মওলানা ভাসানীর। এ যে বাংলাদেশের যে কোনো জাতীয়তাবাদীর চিত্র। ভারতের নেতারা এ দিকটা কোনো সময় তেমন গুরুত্বের সঙ্গে ভেবে দেখেননি বলেই তাদের মধ্যে হতাশা দেখা দেয়। ভারতের সঙ্গে সবাই চেয়েছেন সৎ প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক; কিন্তু কোনো দেশপ্রেমিক চান না ভারত বাংলাদেশ সম্পর্কে মুরব্বিয়ানা করুক। কোনো একজন 'দাদা' বা 'বিগ ব্রাদার' হোক। বঙ্গবন্ধুও তা-ই চেয়েছেন মাত্র। গণতন্ত্র সম্পর্কে তার ভাবনা যেমনই হোক না কেন, নিজেকে এবং নিজের নেতৃত্বকে তিনি সবার ওপরে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু দেশপ্রেম সম্পর্কে তিনি ছিলেন আপসহীন এবং বাংলাদেশের নেতানেত্রীর দেশপ্রেমকে কোনোদিন ভারতীয়





নেতারা খুব গুরুত্বের সঙ্গে ভেবে দেখেননি। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক অনুধাবনের ক্ষেত্রে এ 'গ্যাপ' কোনোদিন হ্রাস পায়নি এবং আজও তা অব্যাহত রয়েছে।

**বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম**

'৭১ আমাদের স্বাধীনতার বছর, ডিসেম্বর বিজয়ের মাস আর মার্চ আমাদের স্বাধীনতার মাস।' বাঙালির হাজার বছরের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামে লক্ষ লক্ষ নেতা-কর্মীদের অবদান রয়েছে। তবে চূড়ান্ত বিজয়টি অর্জিত হয়েছে একাত্তরের শেখ মুজিবের অলৌকিক নেতৃত্বে। বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান শেখ মুজিব আসলেই ব্যতিক্রমধর্মী রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণ পুরো বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে। কোনো কোনো রাজনৈতিক গবেষক ও ইতিহাসবিদের মতে, প্রকৃতপক্ষে ৭ মার্চের ভাষণেই পাকিস্তান ভেঙে যায়। সত্তরের নির্বাচনে পূর্ব বাংলার প্রায় শতভাগ মানুষ মুজিবের দলকে ভোট দেয়। যা বিশ্ব ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা। অসহযোগ আন্দোলনের ২৫ দিন দেশের সামরিক সরকার বহাল থাকা অবস্থায় পূর্ব বাংলা মুজিবের নির্দেশে পরিচালিত হয়। মূলত ১ মার্চ থেকে ২৬ মার্চ ঐ ২৬ দিনেই বাংলাদেশ এক স্বাধীন জাতিতে পরিণত হয়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর দ্বারা গ্রেফতার হওয়ার আগে স্বদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন মহান নেতা বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীনতা যুদ্ধের পুরো নয় মাস শত্রুর দ্বারা বন্দি থাকা সত্ত্বেও এই কালজয়ী নেতার নামেই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। অনুপস্থিত সেনাপতির এমন সেনাপতিত্বের দ্বিতীয় কোনো নজির আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে কি? বিরোধী দলের নেতা হওয়া সত্ত্বেও ১৯৭১' এর ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশ শাসিত হয়েছে। একজন বিরোধী নেতার প্রায় এক মাস এভাবে দেশ শাসন করার কোনো ঘটনা বিশ্ব ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীনতা। আর এই স্বাধীনতার মহানায়ক হচ্ছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ২৩ বছরের আন্দোলন সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে জাতিকে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করেন তিনি। বাংলা ও বাংলার মানুষের সৌভাগ্য তারা শেখ মুজিবের মতো অসাধারণ গুণসম্পন্ন একজন নেতা পেয়েছিল। সাহসে-সততায়, শৌর্যে-বীর্যে, দুরদর্শিতা-যোগ্যতা, কৌশলে-দেশপ্রেমে যার কোনো তুলনা হয় না। শেখ মুজিব ছিলেন একজন দূরদর্শী রাজনীতিবিদ। পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ৬ দফা দাবি জাতির সামনে পেশ করেন। মাত্র কয়েক মাসেই ৬ দফা বাঙালির মুক্তির সনদে পরিণত হয়। আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগের হাজার হাজার নেতাকর্মীকে এ সময় গ্রেফতার করা হয়। শেখ মুজিবসহ দলের কেন্দ্রীয় নেতাদেরও গ্রেফতার করা হয়। বঙ্গবন্ধু জানতেন পাকিস্তানিরা ৬ দফা না মানলে তা এক দফায় পরিণত হবে। শেষ পর্যন্ত একাত্তর সালে তাই হয়। ১৯৬৮ সালে জেলে থাকা অবস্থাতেই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত রাষ্ট্রদ্রোহী মামলায় ১ নম্বর আসামী করা হয় শেখ মুজিবরকে। ১৯৬৯ সালে গণআন্দোলনে মুজিবসহ রাজবন্দিরা মুক্তি পায়। এরই মধ্যে মুজিবের ৬ দফা বাঙালির বাঁচার দাবিতে পরিণত হয়ে যায়। তথাকথিত লৌহমানব আইয়ুব খান গদি টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে লাহোরের রাজনীতিবিদদের গোলটেবিলে বৈঠকে শেখ মুজিবকে আমন্ত্রণ জানায়। গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিয়ে মুজিব বাঙালির দাবি দাওয়ার প্রশ্নে অটল থাকেন। শেখ মুজিবকে ফাঁসি দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে আইয়ুব-মোনায়েম

চক্র তাকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ১ নম্বর আসামি করেছিল। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস ক্ষমতায় টিকে থাকতে সেই আইয়ুব খানকেই মুজিবের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল। গভর্নর মোনায়েম খান গর্ব করে ঘোষণা করেছিল আমি যতদিন গভর্নর থাকব শেখ মুজিবকে ততদিন জেলেই থাকতে হবে। শেষ পর্যন্ত আইয়ুব-মোনায়েমকে পেছন দরজা দিয়ে ক্ষমতা ছাড়তে হয়েছে। আর আপসহীন শেখ মুজিব বাংলার মুকুটহীন রাজায় পরিণত হন। শেখ মুজিব কোনোদিনই বাংলা ও বাঙালির দাবির প্রশ্নে আপস করেননি। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সবসময়ই জনগণের পাশে থেকেছেন। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের কারাগারে শেখ মুজিবের সেলের পাশে কবর খোড়া হয়। সেই নয় মাস পাকিস্তানি চক্র মুজিবের মুখ দিয়ে একটি কথাও বের করতে পারেনি। মুজিবের এক কথা কোনো কিছু বলতে হলে আমাকে আমার জনগণের কাছে যেতে হবে। ক্ষমতার পালাবদলে জেনারেল ইয়াহিয়া বিদায় নিল। প্রেসিডেন্ট পদ দখল করে জেড.এ ভুট্টো দ্বারস্থ হয় মুজিবের। বাংলার সঙ্গে কনফেডারেশনের জন্য ভূট্টোর কি আকুতি মিনতি। এদিকে বাংলাদেশ যে স্বাধীন হয়ে গেছে তা বঙ্গবন্ধুকে জানানো হয়নি। পাকিস্তানি চক্র বঙ্গবন্ধুকে গোটা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। কিন্তু ভূট্টোকে কোনো প্রতিশ্রুতিই দেননি মুজিব। সেই আগের কথা মুজিবের ভুট্টোকে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, আমার জনগণ কি চায় আমার তা জানতে হবে। এভাবে দেশপ্রেম, দৃঢ়তা, আপসহীনতা এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জনগণের দাবির প্রতি বিশ্বস্ত থাকাই ছিল মুজিবের নেতৃত্বের বৈশিষ্ঠ্য। ১৯৬৯ এবং ১৯৭১ দুবারই পাকিস্তানি শাসক ও শোষকচক্র সাজানো রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় মুজিবকে ফাঁসি দেওয়ার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু শেখ মুজিব ক্ষমতা ও আপসের পরিবর্তে ফাঁসির দড়িকেই বেছে নেন। ১৯৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারি দিবাগত গভীর রাতে মুজিবকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে জেলগেটেই সামরিক চক্র গ্রেফতার করে। সামরিক বাহিনীর গাড়িতে তাকে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। অকুতোভয় শেখ মুজিব জেলগেটে এক মুঠো মাটি কপালে ছুঁয়ে শুধু এই কামনা করেন এদেশেতে জন্ম আমার, এদেশেতেই যেন মৃত্যু হয়। একইভাবে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি কারাগারে মুজিবকে ফাঁসি দিয়ে হত্যার ষড়যন্ত্র হয়। তখনো তিনি বলেন, ফাঁসির পরে আমার লাশটা আমার বাংলায় পাঠিয়ে দিয়ো। যে মানুষ মরতে চায় তাকে কেউ মারতে পারে না। ১৯৭১'র ৭ মার্চ মুজিব রেসকোর্স ময়দানে তার ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন, আমরা যখন মরতে শিখেছি কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবা না। এভাবেই শেখ মুজিব মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে মৃত্যুঞ্জয়ী হয়েছেন। ১৯৬৮ সালে জেলগেট থেকে গভীর রাতে সামরিক যানে ওঠার আগে মুজিব কি বলেছিলেন তার বর্ণনায় রয়েছে শেখ মুজিব একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের মনেই বলে উঠলেন, বুঝলাম সংগ্রাম ঘনিয়ে আসছে, বাংলার মুক্তি। বঙ্গবন্ধু বিদায়ের পূর্বে কারাকক্ষের সঙ্গী আবদুল মোমেনকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন–'ভাই, বাংলাদেশকে আপনাদের হাতে রেখে গেলাম। জানি না কোথায় এরা আমাকে নিয়ে যাবে। হয়তো বাংলার মাটি থেকে এই আমার শেষ যাত্রা। যাওয়ার সময় আপনাকে শুধু একটা কথা বলে গেলাম। বাংলাদেশের সঙ্গে আমি কোনোদিন বিশ্বাসঘাতকতা করিনি, কোনোদিন করব না। আপনারা রইলেন, বাংলাদেশ রইলো। এদেশকে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। সার্বভৌম স্বাধীনতা আমার স্বপ্ন, আমার লক্ষ্য।' এই ছিলেন শেখ মুজিব। স্বাধীন বাংলাদেশ হঠাৎ করে আকাশ থেকে পড়েনি। মুজিব তার সমগ্র জীবন স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে লালন করেছেন। আর





লক্ষ্য নিয়ে তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে গেছেন। স্বাধীনতার প্রস্তুতি নিয়েছেন। ২৬ মার্চ স্বাধীনতার প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধু মুজিবই যে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন সে প্রসঙ্গে দুয়েকটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। কোনো দেশের মুক্তি সংগ্রাম একদিনে হয় না। ২৩ বছরের আন্দোলন সংগ্রামের ফলে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। আর যে কেউ ইচ্ছা করলে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারেন না। স্বাধীনতা ঘোষণা করার এখতিয়ার থাকতে হয়। যে কোনো একজন স্বাধীনতা ঘোষণা দিলেই কেউ স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে না। '৭০-র নির্বাচনে বাংলাদেশের প্রায় শতভাগ মানুষ ভোট দিয়ে তাদের পক্ষে কথা বলার অধিকার একমাত্র শেখ মুজিবকেই দিয়েছিল। কাজেই একাত্তরে বাংলার মানুষ স্বাধীনতা ঘোষণার অধিকার একমাত্র শেখ মুজিবকেই দিয়েছে অন্য কাউকে নয়। তাছাড়া কোনো অপরিচিত ব্যক্তির কথায়, ডাকে বা আহ্বানে জনগণ জীবনবাজি রেখে অস্ত্র হাতে তুলে নেয় না। একাত্তরের ১৫ মার্চ বিখ্যাত টাইম সাময়িকী লিখেছিল, আসন্ন বিভক্তি অর্থাৎ পাকিস্তানকে দুটি পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত করার পশ্চাতে যে মানবটি রয়েছেন তিনি নিঃসন্দেহে শেখ মুজিব। একাত্তরের ২৭ মার্চ ব্রিটেনের গার্ডিয়ান পত্রিকার প্রথম পাতায় লেখা হয় শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। '৭১-র ৫ এপ্রিল আমেরিকার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাময়িকী *নিউজ উইক* প্রচ্ছদে বঙ্গবন্ধুর ছবি ছেপে বলা হয়, ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। একইভাবে শেখ মুজিবকে রাজনীতির কবি বলে আখ্যায়িত করা হয়। এমনিভাবে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নামিদামি অসংখ্য পত্রিকা, ম্যাগাজিনে মুজিবের স্বাধীনতা ঘোষণার খবর ছাপানো হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের নামকরণও করেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৬৯'র ৫ ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর স্মরণ সভায় শেখ মুজিব বলেন আজ থেকে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের এই প্রদেশের নাম হবে বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর একক নেতৃত্বেই ২৩ বছরের আন্দোলন, সংগ্রামে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। ২০০৪ সালে বিবিসির বিশ্বব্যাপী বাংলাভাষী শ্রোতা জরিপে বঙ্গবন্ধু মুজিব সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচিত হয়েছেন।

### বঙ্গবন্ধু রাজনীতি করেছেন মানুষের মুক্তির জন্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজনীতি করেছেন এদেশের মানুষের মুক্তির জন্য। তিনি তার জীবনের বেশিরভাগ সময় কারাভোগ করেছেন এদেশের মানুষের অধিকার ফিরিয়ে আনতে। বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনের সংগ্রামের কাহিনি খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন তার লেখা *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থে। তাঁর এই গ্রন্থের শুরুতেই বলেছেন, তিনি রাজনীতির মানুষ, লেখক নন। অথচ তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থটি পড়লে বোঝা যায় তার লেখনীর মাঝে কত ধার ছিল। শব্দ আর বাক্যের ব্যবহারে, ভাষা আর অলংকারে, উপমা আর রূপকের কারুকার্যে তিনি গ্রন্থটি যেভাবে রচনা করেছেন তা সত্যিই অসাধারণ। সহজ বাক্য, সহজ শব্দ, হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে আসা, ঠিক তাঁর ভাষণগুলোর মতোই ফুটে উঠেছে তাঁর জীবনের বর্ণনার বিষয়গুলো। বন্ধু-বান্ধব ও স্ত্রীর অনুরোধে জেলখানায় লিখতে শুরু করেছিলেন তাঁর জীবনের গল্প। বইয়ের একেবারে শুরুতেই তিনি সরল স্বীকারোক্তিতে বলেছেন, লিখতে যে পারি না; আর এমন কী করেছি যা লেখা যায়। আমার জীবনের ঘটনাগুলো জেনে জনসাধারণের কি কোনো কাজে লাগবে? কিছুইতো করতে পারলাম না। শুধু এতটুকু বলতে পারি, নীতি ও আদর্শের জন্য সামান্য একটু ত্যাগ স্বীকার করতে চেষ্টা

করেছি। তিনি যে ভালো লেখক ছিলেন এই গ্রন্থের মাধ্যমেই তার প্রমাণ রেখেছেন। এছাড়া ১৯৭১ সালেই আমেরিকা থেকে প্রকাশিত মার্কিন সাপ্তাহিকী *নিউজ উইক* এ তাঁকে নিয়ে কাভার স্টোরি প্রকাশ করেছিল যেখানে বঙ্গবন্ধুকে রাজনীতির কবি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল ১৯৩৯ সালের মিশনারি স্কুলে পড়ার সময় থেকেই। ১৯৪০ সালে তিনি যোগ দেন নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে। এরপর ১৯৪২ সালে এন্ট্রান্স পাস করে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হবার পর সক্রিয়ভাবে ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪৩ সালে তিনি বেঙ্গল মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। শেখ মুজিব তরুণ বয়সেই বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান পৃথক হয়ে যাওয়ার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানে তথা বাংলাদেশে ফিরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন। ৪ জানুয়ারি, ১৯৪৮ অন্যতম সদস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, যার মাধ্যমে তিনি পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশের অন্যতম প্রধান ছাত্রনেতা পরিণত হন। এ সময় সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও জীবনযাত্রার নিম্নমানের উন্নয়নের জন্য এটিকেই একমাত্র সমাধান হিসেবে মনে করতে থাকেন।

২৩ জুন ১৯৪৯ ঢাকার কে. এম. দাস লেনের রোজ গার্ডেনে প্রতিষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্থান আওয়ামী মুসলীম লীগ। মওলানা ভাসানী সভাপতি ও শামছুল হক সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন। আর জেল থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হন দলের যুগ্ম সম্পাদক। ১৩ নভেম্বর ১৯৫৩ সালে তিনি এ দলটির সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯৬৬ সালে সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ হিসেবে খ্যাত ৬ দফা পেশ করেন ১৯৬৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের লাহোরে। বিরোধী দলগুলোর জাতীয় সম্মেলনে তিনি এ দাবি পেশ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত ঐতিহাসিক ৬ দফাকে বলা হয় বাঙালি জাতির 'মুক্তির সনদ' বা 'বাঙালির ম্যাগনাকার্টা'। এর মধ্যেই নিহিত ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমানসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্তদের এক গণসম্বর্ধনা দেয়া হয়। সভার সভাপতি তৎকালীন ডাকসু ভিপি তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবুর রহমানকে সম্মানসূচক 'বঙ্গবন্ধু' খেতাবে ভূষিত করেন।

৫ ডিসেম্বর ১৯৬৯ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব বাংলার নামকরণ করেন 'বাংলাদেশ'। তিনি বলেন, একসময় এদেশের বুক হইতে, মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে, বাংলা কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকুও চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইয়াছে। একমাত্র 'বঙ্গোপসাগর' ছাড়া আর কোনো কিছুর নামের সাথে বাংলা কথাটির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। জনগণের পক্ষ হইতে আমি ঘোষণা করিতেছি আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধুমাত্র 'বাংলাদেশ'।





১৯৭০ সালের পাকিস্তানের প্রাদেশিক ও জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক দুটিতেই নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে। নির্বাচনে জয়লাভ করলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আওয়ামী লীগ ও তার নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এমন পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ ১৯৭১ ঢাকার রমনা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জাতীর উদ্দেশে এক ভাষণ দেন, যার শেষ কথা ছিল 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' জয় বাংলা। যা ইতিহাসে ৭ মার্চের ভাষণ নামে পরিচিত।

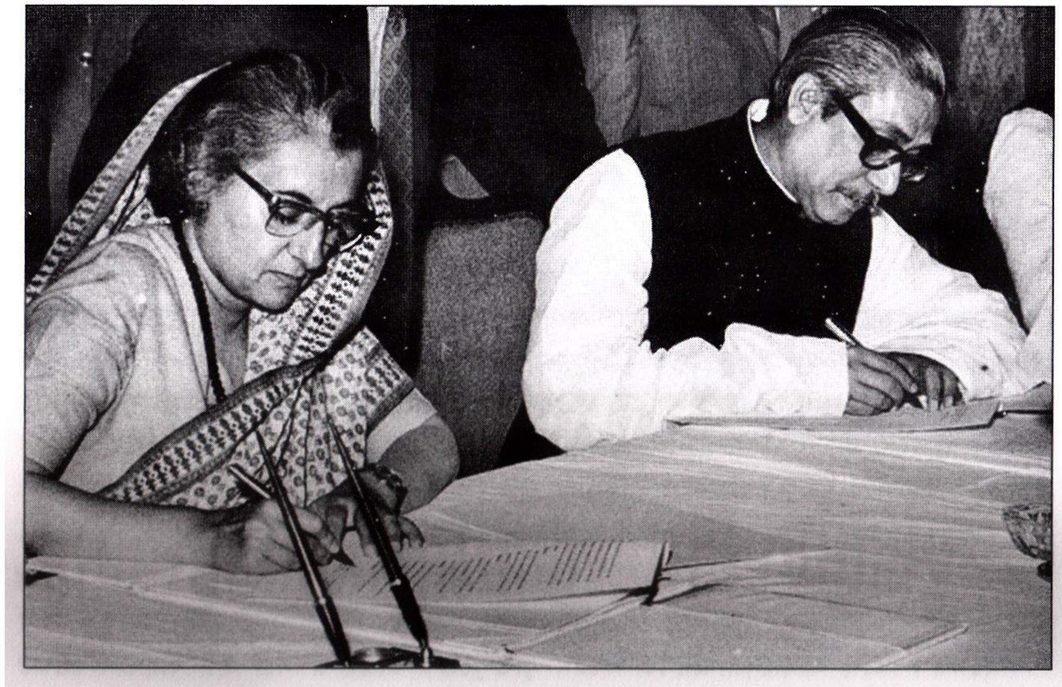
১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের স্থপতি বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজ বাসভবনে সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্চাভিলাষী বিশ্বাসঘাতক অফিসারের হাতে সপরিবারে নিহত হন। ১৫ আগস্ট বাঙালি জাতির জীবনে একটি কলঙ্কময় দিন। এই দিনটিকে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে বাঙালি জাতি পালন করে থাকে।

বাংলাদেশের হৃদয়-গভীর শ্যামল একটি গ্রাম টুঙ্গিপাড়া থেকে ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ উত্থিত হন তিনি, তারপর দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের ধারাবাহিকতায় নিজেকে স্থাপিত করেন ইতিহাসের পটভূমিতে, বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্নের অনন্য মুক্তিদাতা রূপে। স্থির পদবিক্ষেপে তিনি আমাদের প্রাণিত করেন মুক্তিযুদ্ধে। তাঁরই রণমন্ত্র জয় বাংলা কণ্ঠে ও বাহুতে ধারণ করে আমাদের বিজয় অর্জিত হয় ১৯৭১ এ। কোটি কণ্ঠের জয় বাংলা ধ্বনির প্লাবনে ভেসে যায় পৃথিবীর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত।

বিশ্ব অবাক হয়ে চেয়ে রয় বাঙালি ও বঙ্গবন্ধুর দিকে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বের ও নিপীড়িত শৃঙ্খলিত সকল স্তরের মানুষের কাছে হয়ে ওঠেন মুক্তির প্রতীক। তাঁকে ঘিরেই বাঙালি জাতি স্বপ্ন দেখেছে নিজের সত্তা নিয়ে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার। তিনি বাঙালি জাতিকে যার যা কিছু আছে তা নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন। ৭ মার্চের ভাষণে তিনি বলেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।' তাই তাঁরই ডাকে বাংলার সর্বস্তরের জনগণ দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধ করে এই সোনার বাংলাকে স্বাধীন করে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের এই সবুজ শ্যামল বাংলাদেশের স্থপতি। এ দেশের মানুষের সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে মুক্তির জন্য তিনি জীবনের অনেকটা সময় কারাগারে কাটিয়েছেন। দেশকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন, প্রধানমন্ত্রিত্বের চেয়ে সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সব সময় সোচ্চার থেকেছেন।

বঙ্গবন্ধুর আমৃত্যু স্বপ্ন ছিল–সোনার বাংলা গড়া। তিনি ভালোবেসেছিলেন বাংলাদেশকে; ভালোবেসেছিলেন বাংলাদেশের মানুষকে। তাই তিনি বলেছিলেন, ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময়ও আমি বলব–'আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ রাতে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে বন্দি হওয়ার পূর্বে আমার সহকর্মীরা আমাকে চলে যেতে অনুরোধ করেন।



বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করছেন ইন্দিরা-মুজিব

আমি তখন তাদের বলেছিলাম, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে বিপদের মুখে রেখে আমি যাব না। মরতে হলে আমি এখানেই মরব। বাংলা আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। তাজউদ্দীন এবং আমার অন্য সহকর্মীরা তখন কাঁদতে শুরু করেন। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে ফিরে ঢাকা বিমানবন্দর থেকে সরাসরি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মঞ্চের ভাষণে আরো বলেন, আপনারা আরো জানেন যে, আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। আমার সেলের পাশে আমার জন্যে কবরও খোঁড়া হয়েছিল।

আমি মুসলমান। আমি জানি, মুসলমান একবারই মরে।

তাই আমি ঠিক করেছিলাম, আমি তাদের নিকট নতি স্বীকার করব না। 'তিনি তাঁর ৫৫ বছরের ক্ষণস্থায়ী জীবনে কখনো অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেনওনি। এই সংক্ষিপ্ত জীবনের সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন ২৫ বছর–তিনি স্বাধীন দেশের স্বপ্ন দেখেছেন এবং তা বাস্তবায়নও করতে পেরেছিলেন। তিনি আমাদের স্বপ্ন দেখিয়েছেন। তিনি আমাদের মানচিত্র, জাতীয় পতাকা ও জাতীয়তা দিয়েছেন। তিনি সব সময় গরীব-দুঃখী, বঞ্চিত-নিপীড়িত, দরিদ্র, অবহেলিত মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন।

তিনি তার সকল ভাষণে অনবরতই বলেছেন, গণমানুষের অধিকারের কথা। দেশবাসীর কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন মানুষ হিসেবে মর্যাদার সঙ্গে বাস করার মৌলিক সত্য। বিশ শতকের সেই চল্লিশ দশক থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত সময়টুকু যদি বিবেচনা করি, তাহলে দেখব শেখ মুজিবুর রহমান শেখ মুজিব বা বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেছিলেন কয়েকটি কারণে–সেগুলো হলো : লক্ষ্যবিচ্যুত না হওয়া, লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য একাগ্রতা, সাহস,





সহৃদয়তা, মানবিকতা, আত্মত্যাগ, সত্যনিষ্ঠা এবং সহিষ্ণুতা। তাঁর চলাফেরা, পোশাক-আশাক, কথাবার্তা, চালচলন সবকিছুর মধ্যেই ছিল বিশাল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বন্ধন অটুট রাখার ইচ্ছা। শৈশব থেকে দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন–সব সময় কাজ করে গেছেন সাধারণ মানুষের ভাগ্য বদলাতে।

ডেভিড ফ্রস্টের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, 'আমার একমাত্র যোগ্যতা মানুষকে ভালোবাসতে পারা। 'আবার সবচেয়ে বড় দুর্বলতার প্রশ্নেও তার একই উত্তর। বাংলাদেশের স্বপ্নের দাবিদার অনেকে। গত শতকের ষাটের দশকে মওলানা ভাষানীও বাঙালিদের জন্য স্বাধীন ভূখণ্ডের কথা বলেছেন, তবে তা ছিল তার ভাষায় স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান, বাংলাদেশ নয়।

সে যা-ই হোক, স্বাধীন ভূখণ্ডের স্বপ্নের রূপ বাস্তবে কেউ দিতে পারেনি। সেই স্বপ্ন ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাস্তবে রূপ পেয়েছিল একেবারে একজন খাঁটি বাঙালি শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে। তিনিই পেরেছিলেন বাঙালিদের জন্য নির্মাণ করে দিতে একটি ভৌগোলিক রাষ্ট্রের সীমানা। বঙ্গবন্ধু বলি, জাতির পিতা বা জাতির জনক বলি বা শেখ মুজিব বলি–যে নামেই তাকে সম্বোধন করি না কেন, বাংলাদেশের কথা বললেই ভেসে ওঠে তার অবয়ব এবং এ কারণেই তার স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গেছে ইতিহাসের পাতায় এবং সে কারণেই আমরা তাকে বারবার স্মরণ করি।

ইতিহাসে তিনিই অমর যিনি সমগ্র জাতিকে স্বপ্ন দেখাতে পারেন–ইতিহাস তারই পক্ষে যিনি সময়ের বিচারে নিজেকে যোগ্য বলে প্রমাণ করতে পারেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও ইতিহাসের সেই মহামানব সময় যাঁকে সৃষ্টি করেনি, যিনি সময়কেই নিজের করতলে নিয়ে এসেছেন। যিনি কঠিন স্বরে নিজস্ব ভঙ্গিতে উচ্চারণ করেছিলেন সর্বকালের উপযোগী ও সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সব দেশের জন্য প্রযোজ্য একটি অমর পঙ্‌ক্তি 'আর দাবায়ে রাখবার পারবা না।' বঙ্গবন্ধু তার ৭ মার্চের ভাষণে এই কথাটি সমগ্র জাতির সামনে উচ্চারণ করেছিলেন।

বর্তমান বিশ্বের আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের সামনেও তার এই অমর পঙ্‌ক্তিটি একটি মৌলিক দর্শন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। পৃথিবীর কোনো দেশই কারো কাছে পদানত হয়ে থাকার ন্যূনতম শর্ত গ্রহণ করে না। বঙ্গবন্ধু জাতির সামনে এই অমোঘ পঙ্‌ক্তিটি উচ্চারণ করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, বাঙালির জীবনে এই ঘটনার আর কোনো দিন পুনরাবৃত্তি হবে না। তিনিই বিশ্বের বাংলাভাষী মানুষের মধ্যে সেই মানুষ যিনি ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘে নিজ মাতৃভাষা বাংলায় বক্তৃতা করেছিলেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরে তিনিই সেই মানুষ যিনি বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাঙালির এই অসাধারণ অর্জন বঙ্গবন্ধুর মেধা ও তার রাষ্ট্রীয় দর্শনের কারণেই সম্ভব হয়েছিল। ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভের পর ২৫ সেপ্টেম্বর তিনি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ দেন। ভাষণের শুরুতে তিনি বলেছিলেন, 'আজ এই মহিমান্বিত সমাবেশে দাঁড়াইয়া আপনাদের সাথে আমি এইজন্য পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির ভাগীদার যে, বাংলাদেশের

সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ এই পরিষদের প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে পূর্ণতা চিহ্নিত করিয়া বাঙালি জাতির জন্য ইহা একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত।'

তিনি আরো বলেছিলেন, 'যে মহান আদর্শ জাতিসংঘ সনদে রক্ষিত আছে, আমাদের লক্ষ লক্ষ মানুষ সে আদর্শের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন।' আর এভাবেই তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রের মর্যাদা, মানুষের মর্যাদা, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

মাত্র সাড়ে তিন বছর সময়ে তিনি যে বিপুল কাজ করতে চেয়েছিলেন সেটি ছিল পর্বত সমান। তার সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও তিনি সব চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করেই এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সংঘটিত হলো বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক বেদনাবিধূর ও কলঙ্কজনক অধ্যায়। দেশের স্বাধীনতাবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে ঘাতকচক্রের হাতে ধানমণ্ডির নিজ বাসভবনে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে শহীদ হন। দেশি-বিদেশি চক্রান্তের সামনেও বঙ্গবন্ধু ছিলেন নির্ভীক। নিজের জীবনের জন্য তিনি কখনো ভীত ছিলেন না। বাঙালি জাতিকে অবিশ্বাস করার মতো মানসিক দীনতাও তাঁর মধ্যে কখনো ছিল না। 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ' কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই অমর বাণীটিকে তিনি ধ্রুব সত্য বলে মেনেছিলেন। আর সেজন্যই তিনি নিরাপত্তার স্বার্থে নিজ বাসভবন ছেড়ে সরকারি বাসভবনে প্রহরীবেষ্টিত হয়ে থাকার কথা ভাবেননি। তাহলে তো তাঁর গণমানুষের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হবে। কিন্তু বাংলার মানুষকে ভালোবাসার মূল্য দিয়েছেন তিনি নিজের জীবন দিয়ে।

শ্রদ্ধেয় অগ্রজ কবি অরুণ ভূষণ দাশের ভাষায় 'যারাই গিয়াছে জাগাতে শুধুই শোনিতে হয়েছে লাল, নিঝুম দ্বীপের লোহার গরাদ টুটেনিতো এতোকাল'। আজকের বাংলাদেশ কারো করুণায় পাওয়া নয়। আব্দুল লতিফের বিখ্যাত সেই গান 'দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা কারোর দানে পাওয়া নয়, আমি দাম দিছি প্রাণ লক্ষ কোটি জানা আছে জগৎময়'। সেই লোহার গারদ ভেঙে বাঙালিকে স্বাধীনতার সূর্য এনে দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৭ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৫তম জন্মবার্ষিকী। জাতীয় শিশু দিবসও। বঙ্গবন্ধু ১৯২০ সালের এই দিনে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার তৎকালীন গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়ার সম্ভ্রান্ত শেখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। খোকা নামের সেই শিশুটি পরবর্তীকালে হয়ে ওঠেন নির্যাতিত-নিপীড়িত বাঙালির ত্রাতা ও মুক্তির দিশারী। বাংলাদেশের নাম বললেই যে মানুষটির নাম আসে সর্বাগ্রে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। ইতিহাসের ভাষ্যমতে দু'হাজার বছরের বেশি সময় ধরে বাংলার মাটিতে পালাবদল ঘটেছে বহু রাজা-মহারাজা-সম্রাটের। যদিও তাদের কেউই বাঙালি ছিলেন না। বিদেশি হলেও পাল বংশ, তুর্কি, পাঠান, সুলতান ঈসা খাঁ, কেদার রায় ও নবাব সিরাজ বাংলাকে ভালোবেসেছিলেন। ১৭৫৭ সালে মীরজাফরের জঘন্য ষড়যন্ত্রে পলাশীর প্রান্তরে অস্তমিত হয়েছিল বাংলার স্বাধীনতার সূর্য। এর পর ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত রক্তাক্ত ইতিহাস। ১৯৪৭ থেকে আবার ১৯৭১ সাল পর্যন্ত





নির্যাতন-নিপীড়নের ইতিহাস প্রায় ২১৪ বছরের রক্তাক্ত ইতিহাস। আর সেই ইতিহাসের সিঁড়ি বেয়ে শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীসহ বহু নেতা বাংলার নেতৃত্ব দিয়েছেন। কিন্তু স্বাধীনতার ডাক কেউ দিতে পারেননি। নির্যাতন-নিপীড়নে বাঙালি যখন জর্জরিত, ঠিক সেই সময় বাঙালিকে ছুঁয়ে যায় বঙ্গবন্ধুর অস্তিত্ব। বাঙালির মুক্তির সুপ্ত বাসনাকে জাগ্রত করে সাত কোটি মানুষকে উপনীত করেন মুক্তির মোহনায়। কখনো ভাষার জন্য, কখনো স্বাধিকারের জন্য চলতে থাকে আন্দোলন। এসবের আড়ালে গড়ে ওঠে স্বাধীনতার আন্দোলন। '৬৬-এর ৬ দফা আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান পেরিয়ে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি বাঙালির অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হন। ১৯৪৮ সাল থেকে '৫২-এর মহান ভাষা আন্দোলন, '৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, '৬৬-এর ঐতিহাসিক ৬ দফা, স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে, কথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধু কারারুদ্ধ হন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর ৬ দফার পক্ষে অকুণ্ঠ সমর্থন জানায় বাঙালি জাতি। এতে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের সমর্থন লাভ করে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাঙালির এই নির্বাচনে বিজয়কে মেনে নেয়নি। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে তারা নানা ষড়যন্ত্র শুরু করে। ১৯৭১ সালের মার্চে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নজিরবিহীন অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। বাংলাদেশ তখন অগ্নিগর্ভ। পুরো জাতি অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় বঙ্গবন্ধুর নির্দেশের। শ্রদ্ধেয় কবি নির্মলেন্দু গুণ বলেন, 'শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে রবীন্দ্রনাথের মতো দীপ্ত পায়ে হেঁটে অতঃপর জনতার মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন কবি। শুনালেন তাঁর অমর কবিতাখানি/ এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম/ এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন স্বাধীনতার বীজমন্ত্র। বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক আহ্বানে সাড়া দিয়ে সেদিন পুরো বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। '৭১-এর ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী 'অপারেশন সার্চ লাইট'-এর নামে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর আক্রমণ শুরু করলে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু তাঁর ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাসভবন থেকে ওয়ারলেসের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এ ঘোষণার পর বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কারাগারে আটক রাখে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। মুজিব রইলেন কারাগারে। সাত কোটি বাঙালিই সেদিন ছিলেন একেকজন যোদ্ধা। ৩০ লাখ শহীদ আর ২ লাখ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে ২১৪ বছর পর জয় হলো বাংলার। বাংলার সুনীল আকাশে পতপত করে উড়ল লাল সবুজের পতাকা। জন্ম নিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের নতুন দেশ বাংলাদেশ। যার পরতে পরতে মিশে আছে বঙ্গবন্ধুর নাম। যার নামে গ্লোগান দিয়ে দিয়ে যোদ্ধারা যুদ্ধে গেছেন। যার নামে গঠিত হয়েছিল প্রবাসী সরকার। ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বীর বাঙালি ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় ছিনিয়ে নেয়। জন্ম হয় স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বিশ্ব নেতৃবৃন্দের চাপে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি নিজের দেশে বীরের বেশে ফিরে আসেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পুরো জাতি সেদিন দেশের ভার তুলে দিয়েছিল তাদের জাতির পিতার

হাতে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে নতুন করে গড়তে তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। কিন্তু বাংলার দুর্ভাগ্য, মীরজাফররা যুগে যুগে এদেশে থেকে যায়। '৭১-এর পাকিস্তানি শক্তির দোসর যারা ছিল তাদের শিরোমণিরা সেদিন অনেকে দেশ ছেড়ে পালিয়েছিল। কারো কারো বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। অনেকে সাজাও ভোগ করছিল সে সময়। সেসব রাজাকার-আলবদরের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল বিপথগামী কিছু সেনা অফিসার এবং মীর জাফর খন্দকার মোশতাক। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলার জমিনে নেমে আসে কালো এক রাতের। স্তব্ধ হয়ে যায় মানবতার কণ্ঠস্বর। স্তম্ভিত হয়ে যায় বিবেকমান প্রতিটি মানুষ। সপরিবারে খুন হন স্বাধীন বাংলার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। থেমে যায় হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার সুর। হায়েনাদের থাবা থেকে শিশু-নারী থেকে সেদিন কেউ রেহাই পায়নি। বঙ্গবন্ধু, বাঙালি ও বাংলাদেশ অভিন্ন এক সত্তা। একটি ছাড়া অন্যটি কল্পনা করা যায় না। বঙ্গবন্ধুকে একক ব্যক্তিসত্তার ভেতরে সীমাবদ্ধ করা যাবে না। বঙ্গবন্ধুকে মূল্যায়ন করতে হলে ১৭৫৭ সাল থেকে ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ নিতে হবে।

অবিভক্ত বাংলার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বাংলার মানুষ যেসব রাজনৈতিক নেতাকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় সিক্ত করেছেন তাদের নামের সঙ্গে যুক্ত করেছেন একটি বিশেষণ। যেমন চিত্তরঞ্জন দাশের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল 'দেশবন্ধু', সুভাষ বসুর নামের সঙ্গে 'নেতাজি', আবুল কাশেম ফজলুল হক হয়েছিলেন 'শেরে বাংলা'। একইভাবে শেখ মুজিবুর রহমান হয়েছিলেন 'বঙ্গবন্ধু'। এখন মহাত্মাজি বললে যেমন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে বোঝায়, কবিগুরু বললে যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বোঝায়, তেমনি শেখ মুজিবুর রহমানের পরিচিতি 'বঙ্গবন্ধু' হিসেবে। বাঙালির ঐতিহাসিক বিবর্তন ধারায় একটি ভৌগোলিক সীমারেখায় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও রাজনীতি ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাঙালির হাজার বছরের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বেদনা-বিক্ষোভ ও আবহমান বাংলার ঐতিহ্যকে তিনি নিজের চেতনায় আত্মস্থ করেছেন। তার কণ্ঠে বাঙালি জাতির সার্বিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তিনি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূর্ত প্রতীক; বিশ্বশান্তি আন্দোলনের অন্যতম সেনানী এবং মানবজাতির মুক্তি সংগ্রামে নিবেদিতপ্রাণ উৎসর্গীকৃত সন্তানদের একজন। শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা ও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা জাতির জনক। শেখ মুজিবুর রহমানের কৃতিত্ব একটি ভাষাভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

পৃথিবীর ইতিহাসে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন– যেমন ইতালিতে ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জর্জ ওয়াশিংটন, ভারতে মহাত্মা গান্ধী তারা সবাই বিশ্বের মহানায়ক। উপনিবেশবাদের কবল থেকে ভারতের স্বাধীনতার জন্য মহাত্মা গান্ধীর অবদান কিংবা হল্যান্ডের অধীনতা থেকে ইন্দোনেশিয়াকে স্বাধীন করার ক্ষেত্রে সুকর্নের ভূমিকার কথা স্মরণ রেখেও স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অবদানের বৈশিষ্ট্য এবং নেতৃত্বের পার্থক্য কোথায় তার বিশ্লেষণ প্রাসঙ্গিক। এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, ভারত উপমহাদেশে বিদেশি শাসকের অধীনতা ছিন্ন করার স্বাধীনতার সংগ্রাম, ফরাসি অধীনতা থেকে আলজিরিয়া, ভিয়েতনামের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি ব্যাপক অর্থে এক হলেও এই উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারার সঙ্গে





উল্লিখিত সংগ্রামগুলোর চরিত্রগত পার্থক্য রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ভাবনা জুড়ে ছিল হাজার বছরের বাংলাদেশ। তার সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখার ইতিকথা কেবল পাকিস্তান আমলে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের যুগের নয়, তারও আগের। শেখ মুজিব সর্বভারতীয় রাজনীতি অপেক্ষা বাংলার রাজনীতি, বাংলার ভাগ্য নিয়ে বেশি ভাবতেন; বাংলার দুঃখী মানুষের কথা তার রাজনৈতিক কর্মে ও ভাবনায় কৈশোর থেকেই স্থান করে নিয়েছিল। আর এ কারণেই তাকে প্রদত্ত 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি জনগণের ভালোবাসার দান হিসেবে সার্থক হয়ে উঠেছে। তাই শেখ মুজিবের জীবন ও কর্ম তথা রাজনৈতিক ইতিহাসকে বাংলাদেশের মর্মকথার নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাস, বাংলাদেশের বহির্জগতের রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনীতির ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে চিত্রিত করা সম্ভব নয়। একটি সমাজ, জনজীবন বা জাতির ভাবধারাতে সঠিক স্থান নির্দেশই শুধু ইতিহাসের বিষয়বস্তু নয়, তার বিচার-বিশ্লেষণ ইতিহাসের অন্তর্গত। তাই বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ইতিহাস সর্বতোভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত। ভারত বিভাগোত্তর যুগের রাজনীতির লক্ষণীয় দিক হচ্ছে পূর্ববাংলায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ২১ দফার ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্টের কাছে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ছিল তাদের রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার বিপর্যয়। তেমনি বাঙালি জাতিসত্তা সংরক্ষণের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা প্রকাশ পায় প্রথম বাংলা ভাষা আন্দোলনে, পরে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ে। সবশেষে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ছয় দফা আন্দোলনে। যুগান্তকারী ভাষা আন্দোলন ও ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচির পর, ১১ দফার ভিত্তিতে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ফলে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা স্থগিত, '৭০-এর নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় এবং গণরায় নস্যাতের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন, স্বদেশকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে আমরা উপলব্ধি করিতে চাই। এমন একটি লোক চাই যিনি আমাদের সমস্ত সমাজের প্রতিমাস্বরূপ হইবেন। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই আমরা আমাদের বৃহৎ স্বদেশীয় সমাজকে ভক্তি করিব, সেবা করিব। তাঁহার সঙ্গে যোগ রাখিলেই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের যোগ রক্ষিত হইবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'স্বদেশী সমাজ', রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড (কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৫৩৪ বঙ্গবন্ধু প্রসঙ্গে এই কথা শতভাগ প্রযোজ্য। একজন বিরাট মাপের মানবতাবাদী হিসেবে শেখ মুজিব বিংশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনায়ক এ কথা যেন আমরা ভুলে না যাই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে রণাঙ্গনের বীর যোদ্ধাদের উজ্জীবিত করতে কয়েকটি কালজয়ী গান প্রচার করা হয়। যেমন 'শোনো একটি মুজিবরের থেকে/লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি, আকাশে বাতাসে উঠে রণি। বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ।' তেমনি মুজিবনগর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে গীত একটি গানের প্রথম চরণ ছিল : 'সাড়ে সাত কোটি বাঙালির একটিই নাম মুজিবর, মুজিবর, মুজিবর।' প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল সে সময়ের সবচেয়ে নিরেট বাস্তব সত্য। বাংলাদেশের মুক্তিপাগল মানুষ জীবনবাজি রেখে স্বাধীনতার লাল সূর্যকে ছিনিয়ে নিতে যুদ্ধের প্রান্তরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তারই নির্দেশে, তারই নামে, তারই অনুপ্রেরণায়। সে সময় যারা স্বাধীনতা যুদ্ধে ছিলেন, যারা ভারতবর্ষের শরণার্থী শিবিরে ছিলেন, যারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে শত্রুর বেয়নেটের মুখেও স্বাধীনতার জন্য বুক বেঁধেছিলেন, তারা জানেন এটি কোনো অতিশয়োক্তি নয়। বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, একে অপরের সমার্থক হয়ে উঠেছিল। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে অগ্নিবীণার কবি কাজী নজরুল ইসলামের কথা। তিনি বলেছিলেন, 'বাঙালি যেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে বলতে পারবে 'বাঙালির

বাংলা' সেদিন তারা অসাধ্য সাধন করবে। বাঙালিকে, বাঙালির ছেলেমেয়েকে ছেলেবেলা থেকে শুধু এই এক মন্ত্র শেখাও এই পবিত্র বাংলাদেশ বাঙালির আমাদের। বাংলা বাঙালির হোক। বাংলার জয় হোক। বাঙালির জয় হোক।' বাঙালি রাজপথে বুকের রক্ত ঢেলে ১৯৫২ সালে 'রাষ্ট্র বাংলা চাই' দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। রক্ত ঝরা সেই আন্দোলনে শেখ মুজিব সেদিন সম্মুখ সারির নেতা ছিলেন। আজ বাঙালির একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি পেয়েছে। বাংলা ও বাঙালির জয়ের এই অসম্ভব কাজটি সম্ভব হয়েছিল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে। মাত্র ৫৫ বছরের জীবনে বাংলার মাটি ও মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই সংশপ্তক, শত্রুর নিশ্চিত ফাঁসির মঞ্চ থেকেও বেরিয়ে এসেছিলেন, দেশ ও বিশ্ববাসীর দাবির মুখে বীরের বেশে। কিন্তু এই ভালোবাসার কাঙাল মানুষটিকে শেষ পর্যন্ত বুকের রক্ত দিতে হলো বাংলার মাটিতে মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায়, অবিমৃষ্যকারী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রের ষড়যন্ত্রে। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন : 'সাত কোটি বাঙালির ভালোবাসার কাঙাল আমি। আমি সব হারাতে পারি, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের ভালোবাসা হারাতে পারব না। বাঙালির ভালোবাসার ঋণ বুকের রক্ত দিয়ে শোধ করব ইনশাআল্লাহ।' বঙ্গবন্ধু তার কথা রেখেছেন। এখন আমাদের ঋণ পরিশোধ করার পালা। বাঙালিশ্রেষ্ঠ বঙ্গবন্ধুর নামে ইতিহাসের নতুন অধ্যায় সৃষ্টি হয়েছে। আবহমানকালের প্রবহমান মানুষ তার নামে উদ্দীপ্ত হবে, অনুপ্রাণিত হবে, অনুরণিত হবে 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' ধ্বনিতে।

শেখ মুজিবুর রহমান অল্পদিনের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন রাষ্ট্রপতি ছিলেন এবং পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭০-এর নির্বাচিত রাজনীতিবিদরা নতুন রাষ্ট্রের অন্তর্বর্তী সংসদ গঠন করেন। মুক্তিবাহিনী এবং অন্যান্য মিলিশিয়াদের নিয়ে নতুন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গঠন করা হয়। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে স্বীকৃতি লাভের পর মুজিব জাতিসংঘ ও জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনে বাংলাদেশের সদস্যপদ নিশ্চিত করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে ভ্রমণ করে বাংলাদেশের জন্য মানবীয় ও উন্নয়ন কল্পের জন্য সহযোগিতা চান। তিনি ভারতের সাথে একটি বন্ধুত্বের চুক্তি স্বাক্ষর করেন, যাতে অর্থনৈতিক মানব সম্পদ উন্নয়নে ব্যাপক সাহায্যের আশ্বাস দেয়া হয়। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনী ও সরকারি কর্তাব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। মুজিব ইন্দিরা গান্ধীর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখেন। মুজিব তাঁর অন্তর্বর্তী সংসদকে একটি নতুন সংবিধান রচনার দায়িত্ব দেন এবং চারটি মূলনীতি হিসেবে "জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র" ঘোষণা করেন। মুজিব. শতাধিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও কোম্পানি রাষ্ট্রীয়করণ করেন এবং ভূমি ও মূলধন বাজেয়াপ্ত করে ভূমি পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে কৃষকদের সাহায্য করেন। ১ কোটি শরণার্থীর পুনর্বাসনের জন্য বড় ধরনের পদক্ষেপ নেন। এর ফলে অর্থনৈতিক সংকট কমে যেতে শুরু করে। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা, স্যানিটেশন, খাদ্য, স্বাস্থ্য, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি ঘটান। ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত পাঁচ বছর মেয়াদী পরিকল্পনায় কৃষি, গ্রামীণ অবকাঠামো ও কুটির শিল্পে রাষ্ট্রীয় অর্থ বরাদ্দের নির্দেশ দেয়া হয়। মুজিব ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইসলামী অনুশাসনের পথে অগ্রসর হন। ১৯৭২ সালে নিষিদ্ধ হওয়া ইসলামিক একাডেমি পুনরায় চালু করেন। বাংলাদেশ অর্গানাইজেশন অফ দি ইসলামিক কনফারেন্স ও ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের





সদস্যপদ গ্রহণ করেন। মুজিব ১৯৭৪ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত ওআইসি সম্মেলনে যোগ দেন।

### আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

১৯৬৮ সালের প্রথম দিকে পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিব এবং আরও ৩৪ জন বাঙালি সামরিক ও সিএসপি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে যা ইতিহাসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত। মামলায় উল্লেখ করা হয়েছিল শেখ মুজিবসহ এই কর্মকর্তারা ভারতের ত্রিপুরা অঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত আগরতলা শহরে ভারত সরকারের সাথে এক বৈঠকে পাকিস্তানকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা তৈরি করেছে। এতে শেখ মুজিবকে এক নম্বর আসামি করা হয় এবং পাকিস্তান বিভাগের এই ষড়যন্ত্রের মূল হোতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অভিযুক্ত সকল আসামিকে ঢাকা সেনানিবাসে অন্তরীণ করে রাখা হয়। এর অব্যবহিত পরেই সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। সর্বস্তরের মানুষ শেখ মুজিবসহ অভিযুক্ত সকলের মুক্তির দাবিতে রাজপথে নেমে আসে।

### উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও বঙ্গবন্ধু উপাধি

১৯৬৯ সালের জানুয়ারির ৫ তারিখে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাদের এগার দফা দাবি পেশ করে যার মধ্যে শেখ মুজিবের ছয় দফার সবগুলো দফাই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলনের প্রস্তুতি গৃহীত হয়। এই সংগ্রাম এক সময় গণ আন্দোলনের রূপ নেয়। এই গণআন্দোলন উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত। মাসব্যাপী প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলন, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ, কারফিউ, পুলিশের গুলিবর্ষণ এবং বেশ কিছু হতাহতের পর আন্দোলন যখন চরম রূপ ধারণ করে তখন পাকিস্তান সরকার ছাড় দিতে বাধ্য হয়। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খান রাজনৈতিক নেতাদের সাথে এক গোলটেবিল বৈঠকের পর এই মামলা প্রত্যাহার করে নেন। এবং শেখ মুজিবসহ অভিযুক্ত সকলকে মুক্তি দেন। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ একই বছরের ২৩ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবের সম্মানে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক বিশাল জনসভার আয়োজন করে। লাখো জনতার এই সম্মেলনে শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদান করা হয়।

### ১৯৭০-এর নির্বাচন, স্বাধীনতা যুদ্ধ

১৯৭০ সালের নির্বাচনে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক আইনসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে মেরুকরণ সৃষ্টি করে। পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো মুজিবের স্বায়ত্তশাসনের নীতির প্রবল বিরোধিতা করেন। ভুট্টো এ্যাসেম্বলি বয়কট করার হুমকি দিয়ে ঘোষণা দেন যে, ইয়াহিয়া খান মুজিবকে সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানালে তিনি সে সরকারকে মেনে নেবেন না। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মধ্যে ইয়াহিয়া খান সংসদ ডাকতে দেরি করেছিলেন। বাঙালিরা এতে বুঝে ফেলে যে, মুজিবের দলকে সংখ্যাগরিষ্ঠ পাওয়া সত্ত্বেও সরকার গঠন করতে দেয়া হবে না। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে মুজিব স্বাধীনতার ডাক দেন এবং জনগণকে সর্বাত্মক অসহযোগ

আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করেন। এক পর্যায়ে ইয়াহিয়া খান সামরিক আইন জারি করেন, আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং মুজিবসহ আওয়ামী লীগের অন্য নেতাদের গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেন। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী রাজনৈতিক ও জনসাধারণের অসন্তোষ দমনে ২৫ মার্চ অপারেশন সার্চলাইট শুরু করে। সামরিক বাহিনীর অভিযান শুরু হলে মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। মূল ঘোষণার অনুবাদ নিম্নরূপ : 'এটাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের মানুষকে আহ্বান জানাই, আপনারা যেখানেই থাকুন, আপনাদের সর্বস্ব দিয়ে দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ প্রতিরোধ চালিয়ে যান। বাংলাদেশের মাটি থেকে সর্বশেষ পাকিস্তানি সৈন্যটিকে উৎখাত করা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের আগে পর্যন্ত আপনাদের যুদ্ধ অব্যাহত থাকুক'।

এরপর মুজিবকে গ্রেপ্তার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ফয়সালাবাদের একটি জেলে কড়া নিরাপত্তায় রাখা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পরিচালিত অভিযান অল্প সময়ের মধ্যেই হিংস্রতা ও তীব্র রক্তপাতে রূপ নেয়। রাজাকারদের সহায়তায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালি বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ ও বিভিন্ন নেতৃবৃন্দসহ সাধারণ মানুষকে আক্রমণ করে। যুদ্ধপরবর্তী সময়ে মুজিবের পরিবারকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়। তাঁর সন্তান শেখ কামাল মুক্তি বাহিনীর একজন গুরুত্বপূর্ণ অফিসার ছিলেন। মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তান বাহিনীর মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধটিই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ নামে পরিচিত। ১৯৭১ সালে ভারতীয় সরকার বাংলাদেশকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর যৌথ দলের কাছে আত্মসমর্পণ করে। পাকিস্তানি শাসকবৃন্দ মুজিবকে ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি মুক্তিদান করে। এরপর তিনি লন্ডন হয়ে নতুন দিল্লিতে ফিরে আসেন এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ করার পর জনসমক্ষে 'ভারতের জনগণ, আমার জনগণের শ্রেষ্ঠ বন্ধু' বলে তাঁকে সাধুবাদ জানান। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন।

কিন্তু এ জাতির দুর্ভাগ্য হচ্ছে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট একদল তরুণ সেনা কর্মকর্তা ট্যাঙ্ক দিয়ে রাষ্ট্রপতির ভবন ঘিরে ফেলে এবং শেখ মুজিব, তাঁর পরিবার এবং তাঁর ব্যক্তিগত কর্মচারীদের হত্যা করে। কেবল তাঁর দুই মেয়ে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা পশ্চিম জার্মানিতে অবস্থান করার কারণে বেঁচে যান। মুজিবের মৃত্যুর পরবর্তী সরকারগুলোতে মুজিবের সম্পর্কে উদাসীনতা দেখতে পাওয়া যায়। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ নির্বাচিত হয়ে ফিরে আসার পর ১৫ আগস্টকে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। তিনি আওয়ামী লীগের আদর্শগত প্রতীক হয়ে আছেন এবং দলটি মুজিবের সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা ধারণ করে চলেছে। মুজিব বাংলাদেশসহ বিশ্বের সমস্ত বাঙালি জনগোষ্ঠী তথা বিশ্ববাসীর কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। পাকিস্তানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সকল প্রকার বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বাঙালিদের আন্দোলনকে স্বাধীনতার পথে ধাবিত করার জন্য বঙ্গবন্ধু অমর হয়ে আছেন।





**ইংল্যান্ডের ম্যাগনা কার্টা : বাংলাদেশের ছয় দফা**

ইংল্যান্ডের 'ম্যাগনা কার্টা' যেমন বিশ্বকে পরিবর্তিত করেছে, বাংলাদেশের 'ম্যাগনা কার্টা' 'ছয়দফা' তেমনি, অন্ততপক্ষে দক্ষিণ এশিয়াকে পরিবর্তিত করেছে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে উত্থাপিত বাঙালিদের দাবিনামা সংবলিত একটি কর্মসূচি ছয় দফাকে, ১২১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত ইংরেজ ব্যারনদের অধিকার সংবলিত দলিল 'ম্যাগনা কার্টা' নামে অভিহিত করার বিষয়টি মূলত প্রতীকী। এর দ্বারা বুঝানো হচ্ছে ইংল্যান্ডে রাজার নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব বিলুপ্ত করে নাগরিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য 'ম্যাগনা কার্টা' দ্বারা যা সাধিত হয়েছে, বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর ছয়দফা কর্মসূচি দিয়ে পাকিস্তানি শাসক ও শোষক গোষ্ঠীর সার্বভৌমত্ব বিলুপ্ত করে 'স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের' মধ্য দিয়ে বাঙালিদের মুক্তি অর্জনের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে এবং হচ্ছে। ধর্মের দোহাই দিয়ে বাঙালিদের ওপর শাসন-শোষণ সংক্রান্ত পাকিস্তানিদের 'নিরঙ্কুশ সার্বভৌম ক্ষমতা' ছয়দফা দ্বারা বাধাগ্রস্ত করে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ অর্জনের পথ সুগম করা হয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও বাঙালি জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি অর্জনের ক্ষেত্রে ছয়দফার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। ১৯৭০-এর নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচারণার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ১৯৬৬ সালে ঘোষিত ছয়দফার প্রতি বাঙালিদের সমর্থন নিশ্চিত করা। উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনতা অর্জন। তবে স্বাধীনতা অর্জনের মধ্যেই বিষয়টি সীমিত না থেকে তা 'মুক্তির' সংগ্রামের দিকে প্রবাহিত হয়েছে। রাজনৈতিক কাব্যময়তার মধ্য দিয়ে ১৯৭১-এর ৭ মার্চে প্রদত্ত তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু তা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম'। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে এ দেশের মানুষ 'মুক্তি ও স্বাধীনতার' সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ত্রিশ লাখ বাঙালির আত্মত্যাগ ও প্রায় চার লাখ বাঙালি মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ অর্জিত হয়েছিল।

১৯৬৬ সালের ৭ জুন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা ছয়দফা দাবিতে হরতাল পালন করেছিল। জিন্নাহর 'দ্বিজাতিতত্ত্ব' থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঘোষণা করেছিলেন 'দুই অর্থনীতি'ভিত্তিক ছয়দফা কর্মসূচি। পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তান আলাদাভাবে গড়ে ওঠার কারণে দুই অংশে দুটি আলাদা অর্থনীতি এবং দুটি আলাদা রাজনৈতিক সত্তা গড়ে উঠেছিল। ১৯৬০-এর দিকে পাকিস্তানের রাজনৈতিক অর্থনীতির বৈষম্যমূলক সম্পর্কের সঙ্গে ভাষা আন্দোলনের ফলে সৃষ্ট বাঙালি সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের সমন্বয়ে ধর্মভিত্তিক পাকিস্তানি চেতনার বিরুদ্ধে বাঙালি জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছিল। ধর্মের নামে বাঙালিদের ওপর শাসন ও শোষণের কারণে পাকিস্তানের ভেতরে, পূর্ব ও পশ্চিম অংশের আলাদা দুই অর্থনীতি ও আলাদা দুই রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। ফলে পাকিস্তানি জাতীয়তার বিপরীতে বাঙালি জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা ধর্মভিত্তিক 'দ্বিজাতিতত্ত্ব' থেকে ভিন্ন ধরনের ছিল। বাঙালিদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ নস্যাৎ করে দেয়ার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৬ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে গড়ে এক বছরে ৪৯৪৬টি

রাজনৈতিক দাঙ্গা হয়েছিল, একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে গড়ে এক বছরে হয়েছিল ১০৫৩টি দাঙ্গা।

এ ধরনের অভ্যন্তরীণ উত্তেজনাপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ১৯৬৫ সালে কাশ্মীরের বিবাদপূর্ণ এলাকা নিয়ে পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে একটি যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। এ সময় সম্ভাব্য ভারতীয় আক্রমণের মুখে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার জন্য শুধু এক ডিভিশন পদাতিক এবং এক স্কোয়াড্রন যুদ্ধবিমান ডেপ্লয় করা হয়েছিল। সতের দিনের জন্য পূর্ব পাকিস্তান বায়ু ও সমুদ্র উভয় পথে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। যদিও ভারত পূর্বাঞ্চলে একটি ফ্রন্ট খোলা থেকে বিরত ছিল, তবে সম্ভাব্য ভারতীয় হামলার ব্যাপারে বাঙালিরা শঙ্কিত ছিল। এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেছিলেন, ১৯৬৫ সালের যুদ্ধ পাকিস্তানে একটি রাজনৈতিক সংকটের জন্ম দিয়েছিল, যা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিল। এ সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের উক্তি জানা যায় অধ্যাপক তালুকদার মনিরুজ্জামানের 'ন্যাশনাল ইন্টিগরেশন এন্ড পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট ইন পাকিস্তান' শীর্ষক গবেষণা নিবন্ধ থেকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'যুদ্ধের পরে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে সবদিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার সময় উপস্থিত হয়।'

এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ছয়দফা কর্মসূচি তুলে ধরেন। ছয়দফা দাবির ইতিহাস হচ্ছে পাকিস্তানি ধর্মীয় ঔপনিবেশিক শাসন থেকে বেরিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সমাপনী পর্বের সূচনা। ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত সম্মিলিত বিরোধী দলের এক কনভেনশনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ছয়দফা দাবি উত্থাপন করেন। তবে কনভেনশনের সভাপতি চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ছয়দফা নিয়ে সেখানে বিস্তারিত আলোচনা করতে দেননি। স্মরণ করা যেতে পারে, ১৯৬৫ সালের সেপ্টেবর মাসে ভারতে পশ্চিম ফ্রন্টে সংঘটিত ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বিরোধী দলের এই সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যুদ্ধটি যদিও অচলাবস্থার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছিল তথাপি ভারতীয় বাহিনীর কাছে পাকিস্তানের ভূখণ্ডের বড় একটি মূল্যবান অংশ হারিয়েছিল। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের উদ্যোগ এবং পরে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মধ্যে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের তাসখন্দে ১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত বৈঠকের মধ্য দিয়ে এটি মীমাংসিত হয়। এখানে দুই বিবদমান প্রতিবেশী সম্মত হয় যে উভয় দেশ তাদের দখলিকৃত ভূখণ্ড থেকে সৈন্য অপসারণ করবে এবং ভবিষ্যতে সব ধরনের সমস্যা দ্বিপাক্ষিক আলাপ-আলোচনা এবং কূটনৈতিক দেন-দরবারের মাধ্যমে সমাধান করা হবে।

বিরোধী দলগুলো লাহোর কনভেনশনে উত্থাপিত হলেও সেখানে ছয় দফা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে না দেয়ার কারণে বঙ্গবন্ধু ১১ ফেব্রুয়ারি দেশে ফিরে এসে ঢাকা বিমানবন্দরে সংবাদ সম্মেলন করে ছয় দফা সম্পর্কে বিস্তারিত জনসমক্ষে তুলে ধরেন। এরপর ২০ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ছয়দফা দলীয় কর্মসূচি





হিসেবে গৃহীত হয়। ছয়দফা প্রচার ও প্রকাশের জন্য বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ছয় সদস্যবিশিষ্ট উপকমিটি গঠন করা হয়। ১৯৬৬ সালের ১৮ থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই কাউন্সিলে ১৪৪৩ জন কাউন্সিলর বঙ্গবন্ধুকে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি, তাজউদ্দীন আহমদকে সাধারণ সম্পাদক এবং মিজানুর রহমান চৌধুরীকে সাংগঠনিক সম্পাদক পদে নির্বাচিত করেন। ছয়দফা কর্মসূচিভিত্তিক আন্দোলনের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর একান্ত ঘনিষ্ঠ অনুসারী, বর্তমান সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বলেন, "ছয় দফা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু বলতেন, 'সাঁকো দিলাম, স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতায় উন্নীত হওয়ার জন্য।' বস্তুত ছয় দফা ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজমন্ত্র তথা অঙ্কুর।"

ছয় দফা দাবি কালক্রমে ব্যাপক বিস্তৃত আন্দোলন এবং পরবর্তীকালে একটি সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার দিকে এগিয়ে নিয়েছিল। ছয়দফা কর্মসূচি প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে ছয় দফার ভিত্তিতে দলীয় গঠনতন্ত্র এবং নেতৃত্ব নির্বাচনে যে পরিবর্তন সাধিত হয়, তা পরবর্তীকালে ছয়দফার চূড়ান্ত পরিণতি একদফা তথা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত বহন করে।

ছয় দফা পরিকল্পনাটি বঙ্গবন্ধুকে এবং আওয়ামী লীগের বেশ কিছু সংখ্যক বাঙালি নেতাকর্মীকে নবাবজাদা নসরুল্লা খানের নেতৃত্বাধীন নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সঙ্গে একটি মুখোমুখি সংঘাতমূলক পথে নিয়ে যায়। এটি তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের প্রচণ্ড ক্রোধের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পাকিস্তানের এই লৌহশাসক আইয়ুব খান প্রকাশ্যে ছয় দফার প্রবক্তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রের ভাষায় কথা বলার ঘোষণা দিয়েছিলেন। আইয়ুব শাহী এবং তার সহযোগীরা মনে করতেন যে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা কর্মসূচি পাকিস্তানকে ভেঙে এর পূর্ব অংশকে দেশের অবশিষ্ট অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা নিয়ে তৈরি করা হয়েছে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ১৯৬৬ সালের যে ছয় দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করেছিল তা ছিল নিম্নরূপ :

এক নম্বর দফায় বলা হয়েছিল, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা; সংসদীয় পদ্ধতির সরকার; সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন। দুই নম্বর দফায় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে দুটি বিষয় ন্যস্ত থাকার কথা বলা হয়েছিল, প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র; অন্য বিষয়গুলো ইউনিটগুলোর হাতে ন্যস্ত থাকবে। তিন নম্বর দফায় মুদ্রানীতির কথা বলা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, দুটি পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা দুই অঞ্চলে প্রবর্তন, অথবা একক মুদ্রা। কিন্তু সে ক্ষেত্রে পূর্ব থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচার বন্ধে সাংবিধানিক বিধান রাখতে হবে। পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ভ রাখতে হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক রাজস্ব ও মুদ্রানীতি গ্রহণ করতে হবে। চার নম্বর দফায় যুক্তরাষ্ট্রে ইউনিটগুলোর হাতে করারোপ ও রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রের হাতে এরকম কোনো ক্ষমতা থাকবে না। তবে কেন্দ্র তার নিজ ব্যয় বা চাহিদা মেটানোর জন্য প্রদেশগুলোর করের একটা অংশ পাবে। পাঁচ নম্বর দফায় দেশের দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের জন্য দুটি পৃথক বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার হিসাব রাখা; এ দেশের অর্জিত বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা এ দেশের সরকারের নিয়ন্ত্রণে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত

বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে; কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন দুই অঞ্চল কর্তৃক সমান হারে অথবা নির্ধারণযোগ্য অনুপাতে দুই অঞ্চল কর্তৃক মেটানো হবে; দেশজ পণ্য দেশের দুই অঞ্চলের মধ্যে শুল্কমুক্তভাবে অবাধে চলাচল করবে; সাংবিধানিক ক্ষমতাবলে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিটের সরকারগুলো বিদেশে বাণিজ্য মিশন খোলা এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করবে। ছয় নম্বর দফায় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি সামরিক বা আধা-সামরিক বাহিনী গঠনের কথা বলা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ঘোষিত ছয় দফা অতি দ্রুত বাঙালিদের মুক্তি সনদ হিসেবে (পূর্ব) বাঙালি জনগণের প্রাণের দাবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

১৯৬৬ সালের মার্চ এবং মে মাসে বঙ্গবন্ধু এবং তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এম মনসুর আলী এবং আরো অনেকে ছয় দফার পক্ষে জনসমর্থন সৃষ্টির লক্ষ্যে পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী সফর করেছেন। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ছয় দফার পক্ষে ব্যাপক জনসমর্থন দেখে আইয়ুবের তোষামোদে এক অনুগত গভর্নর আব্দুল মোনোয়েম খান আওয়ামী লীগ নেতাদের কারান্তরীণ করার হুমকি প্রদান করেন। ওই বছরের ৮ মে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনের আওতায় বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয়। বঙ্গবন্ধুর অধিকাংশ সহযোগীকেও কারান্তরীণ করা হয়েছিল। এ সময় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মিজানুর রহমান চৌধুরী আওয়ামী লীগ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। মিজানুর রহমান চৌধুরী ছিলেন তখন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ (ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি অব পাকিস্তানের) সদস্য। সংগ্রামার্থে সজ্জিত আওয়ামী লীগ ছয় দফার পক্ষে সমর্থন সংগঠিত করা এবং বন্দি নেতাদের মুক্তির দাবিতে ১৯৬৬ সালের ৭ জুন সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল আহ্বান করে। মিজানুর রহমান চৌধুরী এ সময় খুব দৃশ্যমান এবং প্রসিদ্ধ ভূমিকা পালন করেন, মনোবল ভেঙে পড়া একটি দলকে উজ্জীবিত করে তিনি হরতালের জন্য প্রস্তুত করান। একই সঙ্গে তিনি এবং অধ্যাপক ইউসুফ আলীসহ আওয়ামী লীগের এমএনএবৃন্দ আওয়ামী লীগের ওপর সরকারি নিপীড়নের কথা আইন সভায় উত্থাপন করেন। আর এভাবে ছয়দফা দাবিকে সমগ্র (পূর্ব) বাঙালিদের দাবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। অপরদিকে পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরাচারী সরকার পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সংবাদ মাধ্যমগুলোর ওপর হরতালের খবর না ছাপানোর আদেশ দেন। গণমাধ্যমের ওপর সেন্সরশিপ সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী হরতাল পালিত হয়। হরতাল পালনকারীদের ওপর পুলিশ এবং ইপিআরের গুলিবর্ষণের ফলে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, টঙ্গী এবং দেশের অন্যান্য স্থানে আন্দোলনরত দশজন শহীদ হন। পরের দিন ৮ জুন সংবাদপত্রগুলোতে আগের দিনের ঘটনা সম্বন্ধে সরকারি ভাষ্যই কেবল প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে ছিল রাজপথে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের সহিংসতার কথা।

এভাবে ইতিহাস পুনঃসংজ্ঞায়িত করার কাজ শুরু হয়। (পূর্ব) বাঙালি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবি সংবলিত বাংলাদেশের 'ম্যাগনা কার্টা' হিসেবে ঐতিহাসিক ছয়দফা আন্দোলনের ফলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে 'জাতীয় চেতনা' সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের যৌথ মানসিকতায় নিশ্চিত এবং দ্রুততার সঙ্গে জাতীয়তাবাদের চেতনায় বাঙালিরা নিজেদের পুনরায় আবিষ্কার করে। ছয়দফা





আন্দোলনের পথ ধরে এরপরে আসে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭০-এর নির্বাচন। ১৯৭০-এর নির্বাচনের মাধ্যমে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের প্রতি এ দেশের জনগণ তাদের সমর্থন ব্যক্ত করে। পাকিস্তানি ধর্মীয় ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতীয় পরিচিতি উদ্ভব এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ছয়দফা অন্যতম একটি মাইলফলক। ১৯৭০-এর নির্বাচনের পরে আসে 'জাতীয় পরিচিতি' ও 'স্বাধীন বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত পর্যায় ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ। ত্রিশ লাখ বাঙালির আত্মদান, প্রায় তিন লাখ বাঙালি মা-বোনের ইজ্জত এবং প্রায় কয়েক হাজার ভারতীয় সৈন্যের আত্মাহুতি এবং সমগ্র বাংলাদেশকে একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার মধ্য দিয়ে বিশ্বের রাজনৈতিক মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামের রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু বাঙালি জাতির মুক্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময়েই খুনিরা বঙ্গবন্ধুকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে হত্যা করে। ফলে বাংলাদেশের অগ্রগতি থমকে যায়। এরপর দীর্ঘ ছয় বছর পরে ১৯৮১ সালের ১৭ মে বঙ্গবন্ধুর রক্তের উত্তরাধিকার জননেত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে দেশে ফিরে আসেন। তারপর থেকে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার, যুদ্ধাপরাধী ও মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচারের জন্য ট্র্যাইব্যুনাল গঠন, চল্লিশ বছর পর মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি বাস্তবায়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিশ্ব দরবারে স্বীকৃতি পাচ্ছে। তবে বাঙালি জাতির সার্বিক মুক্তির জন্য তথা 'ভিশন ২০২১' এবং 'ভিশন ২০৪১' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আরো অনেক দূর যেতে হবে। ২৯ মে, ২০১৫ তারিখে জাতীয় নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে দেয়া গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে দেশরত্ন শেখ হাসিনাও বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির জন্য আরো অনেক পথ চলার অঙ্গিকার ব্যক্ত করলেন। তার বক্তব্যে স্পষ্টতই বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ১৯৬৬ সালে সর্ব প্রথম ঘোষিত বাঙালির 'ম্যাগনা কার্টা' ছয়দফা কর্মসূচির জন্য তথা বাঙালির মুক্তির জন্য নিরলসভাবে সংগ্রাম করার দৃঢ় প্রত্যয় লক্ষ্য করা যায়।

## বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

ব্রিটিশ শাসিত একটি অবহেলিত মহকুমার নাম গোপালগঞ্জ। বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত (বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলা) একটি অখ্যাত গ্রাম ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় টুঙ্গিপাড়া। সে গ্রামে সুদূর মক্কা থেকে আগত এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯২০ খ্রি. ১৭ মার্চ পিতা শেখ লুৎফর রহমানের ঔরসে ও মাতা শেখ সাহেরা খাতুনের গর্ভে জন্ম নিলেন শিশু মুজিব। বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান।

যিনি পরবর্তীতে স্বীয় যোগ্যতা, প্রতিভা ও নেতৃত্বের গুণে শিশু মুজিব হতে ধীরে ধীরে মুজিব ভাই, বঙ্গবন্ধু, সর্বোপরি জাতির জনকে পরিণত হন। তিনি শুধু বাঙালি জাতির জনকই নন বরং তৃতীয় বিশ্বের নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের মুক্তির অগ্রদূত।

শিশু মুজিব বাড়ন্ত বটবৃক্ষের মতো ধাপে ধাপে বাঙালি জাতির সামনে উদ্ভাসিত হলেন। শেরে বাংলা, সোহরাওয়ার্দী, দেশবন্ধু, নেতাজী সুভাষ বোস, মওলানা ভাসানীর অনুপ্রেরণায় শেখ মুজিব প্রতিটি স্বদেশী, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ও সংগ্রামে প্রথম কাতারে উঠে এলেন। তাঁর পদচিহ্ন ধরেই ক্রমান্বয়ে বাঙালি জাতি এগিয়ে চলেছে। তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে এই অবহেলিত নির্যাতিত, শোষিত সাড়ে সাত কোটি জনগোষ্ঠীর মর্মবাণী। তাঁর চোখে প্রতিবিম্বিত হয়েছে তিমির রাত্রির অবসানে প্রতীক্ষা ব্যাকুল বাঙালি জাতির আকাঙ্ক্ষিত আলোকোজ্জ্বল প্রভাতের স্বপ্ন। এক কথায়, বাঙালি জাতিই যেন শেখ মুজিব–আর শেখ মুজিবের অপর নাম বাঙালি জাতি। এমনি করেই তিনি জাতির সত্তায় অস্তিত্বে একাকার হয়ে গেছেন। বিশ্বের অন্য কোনো জননেতার পক্ষে যা সম্ভব হয়নি। এখানেই তিনি চিরকালের মতো ব্যতিক্রম।

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার সরলতার সুযোগ নিয়ে মীরজাফর গং বিশ্বাসঘাতকতা করে। যার ফলে আমরা বাংলার স্বাধীনতা হারাই এবং ১৯০ বছরের জন্য ব্রিটিশদের গোলামীর জিঞ্জিরে বন্দি হই। এরপর বহু ত্যাগ, তিতীক্ষা সংগ্রাম ও রক্তের বিনিময়ে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট একটি অনাকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভ করে বাঙালি জাতি। পাকিস্তানিরা জাতি ধর্মের দোহাই দিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে পূর্ব বাংলায় বিভেদ ও বৈষম্যের প্রাচীর সৃষ্টি করলো। তিনি বুঝলেন, ইংরেজ বিদায় নিয়েছে সত্য, কিন্তু হাত বদল হয়ে নতুন সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত এদেশের মাটিতে তার সর্বনাশা নখর বিস্তার করেছে। ১৯৪৮ সালের সুপরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়ে দিল পাকিস্তানি কুচক্রীর দল। শেখ মুজিব তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে নিজের জীবন বাজী রেখে উলকা গতিতে ছুটে গেলেন দাঙ্গা বিক্ষুব্ধ প্রতিটি মহল্লায়। তার সুযোগ্য নেতৃত্বে অল্পতেই থেমে গেল ভাইয়ে ভাইয়ের রক্তের হোলি খেলা।

১৯৪৮ সালে গর্ভনর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান, ঢাকার নবাব নাজিম উদ্দিন ও নুরুল আমীনসহ এদেশীয় দোসরগণ পল্টন ময়দান ও কার্জন হলে ঘোষণা দেন, 'উর্দু, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা'। মুজিবের তারুণ্য দৃপ্ত কণ্ঠে প্রতিবাদী সোচ্চার না-না। সেই কণ্ঠের সঙ্গে হাজারো কণ্ঠে প্রতিধ্বনি তুললো, 'না-না-না। রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই।' সেদিন রাত্রেই মুজিবের নেতৃত্বে গঠিত হলো বাংলার প্রাণপ্রিয় বিপ্লবী ছাত্র সংগঠন 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ'। এ প্রতিবাদকে মেনে নিতে পারেনি পাকিস্তানি নরপশুগণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ন্যায্য দাবির পক্ষে কথা বলায়, মায়ের ভাষার পক্ষে কথা বলায় প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয় হতে নাম কেটে দিল। তাতেও কিছু না হওয়ায় মুজিবকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হয়। চক্রান্তকারীরা সেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন অঙ্কুরেই ধ্বংস করার মানসে শুরু করলো বাঙালিদের প্রতি চরম অত্যাচার ও নির্যাতন। মুজিবের নেতৃত্বে ইতোমধ্যে তৈরি হওয়া 'ভাষা সংগ্রাম কমিটি' সাংগঠনিকভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। এর কর্মীগণ নেতা মুজিবের অনুপ্রেরণায় সারাদেশে গড়ে তুললো দুর্বার গণআন্দোলন। গণঅসন্তোষ তখন চরম আকার ধারণ করেছে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পৃথিবীতে আমরাই রক্ত দিয়ে, জীবন দিয়ে মায়ের ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে পেলাম। এর নেপথ্য নায়ক তৎকালীন উদীয়মান নেতা শেখ মুজিবুর রহমান।





এরপর হলো '৫৪-এর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন। সেদিন জননেতা সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা ও মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে যে ঐতিহাসিক নির্বাচনী জোট গঠিত হলো তার প্রাণপুরুষ ও মূল চালিকাশক্তি ছিলেন শেখ মুজিব। ব্যালটের মাধ্যমে বাঙালি জাতি সেদিন ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে যেভাবে উৎখাত করলো, দুনিয়ার ইতিহাসে তার নজির মেলা ভার।

১৯৫৮ সালের ২৮ অক্টোবর গভর্নর ইস্কান্দার মীর্জাকে সরিয়ে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান ক্ষমতা গ্রহণ করে। সামরিক শাসন জারি করে সমস্ত গণতান্ত্রিক ও মৌলিক অধিকার হরণ করা হলো। এরপর '৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, '৬৬-এর বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ৬ দফা ও ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলন। '৬৯-এর মহান গণঅভ্যুত্থান, ঐতিহাসিক আগরতলা ষড়যন্ত্রের মামলাসহ প্রতিটি আন্দোলনের সফল রূপকার শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালিদের পক্ষে কথা বলার অজুহাতে বারবার বঙ্গবন্ধু মুজিবের সুযোগ্য সহকর্মীদের আন্দোলনের মুখে নতিস্বীকার করলো পাকিস্তানের লৌহমানব আইয়ুব খান ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা। মুক্তি দিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। বঙ্গবন্ধু মুজিবের মুক্তির অধিকার বিনা সংগ্রামে চেয়ে পাওয়া যাইনি। এজন্য অনেক ত্যাগ, রক্ত বিসর্জন দিতে হয়েছিল বাঙালি জাতিকে। বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান সার্জেন্ট জহুরুল, ছাত্র নেতা আসাদ, কিশোর মতিউর, শ্রমিক নেতা মনু মিয়া, শিক্ষক ডা. জোহাসহ শত শত দেশপ্রেমিক 'বঙ্গবন্ধু মুজিব' ভক্তকে নিঃসঙ্কোচে প্রাণ দিতে হয়েছিল।



রাণী এলিজাবেথ ও কমন ওয়েলথ রাষ্ট্র প্রধানদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

'শেখ মুজিব'–মুজিব ভাই হতে বঙ্গবন্ধুতে পরিণত হয়েছেন। বাংলার আকাশে বাতাসে শুধু মুজিবের জয়ধ্বনি। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে কৃষক, শ্রমিক, ছাত্রনেতা, বুদ্ধিজীবী সবাই একত্রিত হলো। তারা বুঝতে পারলো মুজিব ছাড়া এ শৃঙ্খল মুক্তির উপায় নেই। মুজিবের নেতৃত্বেই এই অন্ধকারাচ্ছন্ন উত্তাল সমুদ্র পাড়ি দিতে হবে। বঙ্গবন্ধু মুজিব বাঙালিদের শিখিয়েছেন–দেশ মাতৃকার জন্য আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে বুক উঁচু করে

দাঁড়াবার। গণআন্দোলনে আইয়ুব খান গদিচ্যুত হলেন। ক্ষমতার রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ঘটলো ইতিহাসের ঘৃণ্যতম ভিলেন জেনারেল ইয়াহিয়া খানের। ছলনার আবরণে তিনি তার আসলরূপ গোপন করে দেশে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দিলেন। জনচিত্তের ক্রোধ আপাতত প্রশমিত হলো। কিন্তু সেই মুহূর্তে বাঙালির ভাগ্যাকাশে দেখা দিল আর এক মুসিবত। ১৯৭০ সালে দেশের সমগ্র উপকূল এলাকায় সর্বনাশা ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে লক্ষ লক্ষ বাঙালি মারা গেল। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালির চরম দুর্দিনে সামান্যতম সমবেদনা জানালো না। বঙ্গবন্ধু ছুটে গেলেন জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত এলাকায়। আগে মানুষ বাঁচাও পরে নির্বাচন। পশ্চিম পাকিস্তানিদের এহেন বিমাতাসুলভ আচরণে ও বঙ্গবন্ধুর দেশ ও জাতির প্রতি ভালোবাসা বাঙালিদের আরো জোটবদ্ধ হতে অনুপ্রাণিত করলো। করলো দেশাত্মবোধে জাগ্রত। 'ইন্‌হাস্তওয়াতানম'। এ বাংলা মাকে মোগল, পর্তুগীজ, বর্গী, ব্রিটিশ বেনিয়া, স্বৈরাচারী পাকিস্তানিরাসহ হায়েনার দল যুগে যুগে শাসন-শোষণই করেনি–করেছে অত্যাচার, অপমান, ধর্ষণ ও রক্তশোষণ। এবার প্রতিশোধ নেবার সুযোগ এসেছে তাই '৭০-এর নির্বাচনে বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধু মুজিবের নৌকা প্রতীকে শতকরা ৯৮ ভাগ ভোট দিল।

স্বৈরাচারী পাকিস্তানিগণ ক্ষমতা হস্তান্তরের নামে তালবাহানা শুরু করলো। মুজিব ডানে গেলে ভুট্টো-ইয়াহিয়া যায় বায়ে। বাঙালিরা তখন অনেক সাহসী, অনেক বেশি সচেতন। বঙ্গবন্ধু মুজিব তাদের শিখিয়েছেন, 'এখন যৌবন যার মিছিলে যাওয়ার তার শ্রেষ্ঠ সময়, এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাওয়ার তার শ্রেষ্ঠ সময়।'

বঙ্গবন্ধু মুজিব বাঙালি জাতিকে কি সঞ্জীবনী সুধা পান করিয়ে ছিলেন তা ৭ মার্চের ঐতিহাসিক জনসভা যে না দেখেছে সে বুঝতে পারবে না। তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা আমরা দেখিনি, সূর্য সেনের চট্টগ্রামের অগ্নিযুদ্ধ আমরা দেখিনি। কিন্তু বঙ্গবন্ধু মুজিবের ৭ মার্চের অনন্য সাধারণ ঐ দিনের ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দান আমাদের অনেকেরই দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। এটা ছিল তৎকালীন বিশ্বের সর্ববৃহৎ সংগ্রামী গণসমাবেশ। স্বাধীনতাকামী মানুষের বাঁধভাঙা ঢল। আকারের বিশালতায়, অভিনবত্বের অনন্ত মহিমায়, সংগ্রামী চেতনার অতুল বৈভবে ঐ জনসমুদ্র ছিল নজিরবিহীন। বিকেল ৩টা ১৫ মিনিটে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের মহানায়ক শ্বেতশুভ্র বসন ও মুজিব কোট পরিহিত বঙ্গবন্ধু বলেন, "বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়। আমি যদি হুকুম... এবারের সংগ্রাম–আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম–আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।" মুজিবের নির্দেশে মুজিবের আদর্শে মুজিবের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠলো বাঙালি জাতি। তারা জানিয়ে দিল "আমরা হারবোনা-হারবোনা, তোমার মাটির একটি কণাও ছাড়বো না।" বাঙালি জাতি তাদের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে আসতে চায়। আলোচনার নামে অযথা সময়ক্ষেপণ করে হানাদার পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ পশ্চিম পাকিস্তান হতে অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্য আনতে শুরু করলো। বাংলার শোষিত বঞ্চিত মানুষকে অনাহারে অর্ধাহারে রেখে তাদের অর্থে কেনা অস্ত্র দিয়ে প্রতিদিন হত্যা করতে লাগলো বাঙালিকে। পশ্চিম পাকিস্তান হতে ভুট্টো এসে মুজিবকে নানা প্রলোভনের টোপ দিলেন। বঙ্গবন্ধু মুজিব দৃঢ়কণ্ঠে জানালেন, "বাংলার জনগণ ৬ দফা ও ১১ দফার পক্ষে ভোট দিয়েছেন। তার সাথে আমি





বেইমানি করতে পারি না। আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, বাংলার মানুষের স্বাধীনতা ও মুক্তি চাই।"

ইতোমধ্যে অস্ত্রভর্তি 'সেয়াত' জাহাজ চট্টগ্রামে এসে পড়েছে। এলো ২৫ মার্চ কালোরাত্রি। ঐ দিনই রাতের আঁধারে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র নিরপরাধ বাঙালিদের ওপর স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। রাজপথ হলো রক্তের নদী, চারিদিকে আগুনের লেলিহান শিখা। বিভিন্ন সূত্র থেকে ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধু মুজিব-এর কাছে পাকিস্তানিদের বর্ব্বর প্রিন্টের খবর এসে গেল। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে ওয়ারলেসের মাধ্যমে চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ নেতাদের কাছে স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষণা পাঠান। যা আওয়ামী লীগ নেতা এম.এ. হান্নান ২৬ মার্চ একাধিকবার রেডিওতে প্রচার করেন। জল্লাদ নরঘাতক ইয়াহিয়া খান রেডিও ভাষণে বলেন যে, "মুজিব ইজ এ ট্রেইটর টু দ্যা ন্যাশন, দিস টাইম হি উইল নট গো আন পানিসড্।" যে মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়নি, বাঙালির মুক্তি চায়নি, বাংলাদেশ চায়নি, তাহলে নরখাদক পাকিস্তান এর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের খাতায় তার নাম কেন?

সেক্টর কমান্ডার 'জেড ফোর্সের অধিনায়ক' প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সাহেব ১৯৭৪ সালের স্বাধীনতা দিবস সংখ্যায় সাপ্তাহিক বিচিত্রায় 'একটি জাতির জন্ম' নামক প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে, 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের রেসকোর্স ময়দানের ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে গ্রিন সিগন্যাল মনে হয়েছিল।' যার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ২৭ মার্চের রেসকোর্স ময়দানের ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে গ্রিন সিগন্যাল মনে হয়েছিল।" যার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ২৭ মার্চ স্বাধীন বাংলা বেতার সংগঠক বেলাল মোহাম্মদের অনুরোধে চট্টগ্রামের কালুরঘাটের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হতে যে ঘোষণা পত্রটি পাঠ করেন তাতে তিনি বলেন, 'I Major Zia declared the indeopendence of Bangladesh on behalf of our great national Leader Bangabandhu Shaikh Mujibur Rahman' এর পরেও কি স্বাধীনতার ঘোষক, স্থপতি জাতির জনক নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে? হায়রে সেলুকাস, সত্যিই এ এক বিচিত্র দেশ! বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চ বাঙালিকে রক্ষার জন্য সহকর্মীদের শত অনুরোধ উপেক্ষা করে আত্মগোপন না করে যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন তার চেয়ে বেশি নিয়ে ছিলেন জীবনের ঝুঁকি।

ইতোমধ্যে সারাদেশে দেশ প্রেমিক সৈনিক, ইপিআর, পুলিশ, আনসার, ছাত্র, শিক্ষক, শ্রমিক, জনতা যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুকে রুখে দাঁড়ালেন। বঙ্গবন্ধুকে ধ্যানে জ্ঞানে রেখে তাঁরই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন মুক্তি সংগ্রামে। পার্শ্ববর্তী বন্ধু রাষ্ট্র ভারতে পালিয়ে গিয়ে স্বল্প মেয়াদী গেরিলা ট্রেনিং নিয়ে ফিরে এলো স্বদেশ বিজয়ে। ১৭ এপ্রিল মুজিব নগর সরকার গঠন করা হলো। তার প্রধান হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী জীবন মরণ সংগ্রামে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে ২ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে আমাদের হারিয়ে যাওয়া স্বাধীনতার সূর্য আবার ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলার পূর্ব দিগন্তে উদিত হলো। "পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে, রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত লাল।"

বাঙালি জাতি আবার হাজার বছর পর একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ পেল, জাতীয় পতাকা ও সঙ্গীত পেল, কিন্তু তার স্বপ্নদ্রষ্টাকে পেলনা। কারণ বঙ্গবন্ধু মুজিব তখন পাকিস্তানিদের কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে দিনাতিপাত করছেন, মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন। বাঙালির হৃদয়ে তখন কারবালার মর্শিয়া। কেউ রোজা রাখে, নফল নামাজ পড়ে, আবার কেউ ঠাকুর বাড়িতে পূজা দেয় যেন তাদের প্রিয় নেতা জীবিতাবস্থায় স্বাধীন বাংলার বুকে ফিরে আসে। বহু চড়াই-উৎরাইয়ের পর পাকিস্তানি সামরিক জান্তা বিশ্ববাসীর চাপের মুখে বাঙালির নয়নমণি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিলেন। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে–তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশে মায়ের বুকে ফিরে এলেন।

যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশ। খাদ্য, বস্ত্র, অর্থ কিছুই নেই। সীমাহীন অভাব ও অপরিসীম চাহিদার মধ্যে শূন্য হাতে বাংলার মসনদে বসলেন মুকুটহীন সম্রাট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বিভিন্ন মুখী অসুবিধার মধ্যেও তিনি যখন ধীর পদক্ষেপে শোষণমুক্ত 'সোনার বাংলা' গড়ার দৃপ্ত প্রত্যয় এগিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই সাম্রাজ্যবাদী আন্তর্জাতিক চক্র ও তাদের এদেশীয় পদলেহী মানুষ্যরূপী পশুরা মেনে নিতে পারেনি। কারণ বঙ্গবন্ধু মুজিব শুধু বাঙালি জাতির জনক নন, বাংলাদেশের স্থপতি নন, স্বাধীনতার ঘোষক নন, তিনি ছিলেন তৃতীয় বিশ্বের নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের 'মুক্তির অগ্রদূত'। সকল দেশের জাতীয় ও মুক্তি সংগ্রামের প্রতীক। সাম্রাজ্যবাদী আন্তর্জাতিক চক্র ও তাদের এদেশীয় পদলেহী নরকের ঘৃণ্যকীটেরা প্রাসাদ ষড়যন্ত্র শুরু করে দিলেন। তারই পরিণতিতে এ দেশিয় কুলাঙ্গার ঘরের শত্রু বিভীষণ সাম্রাজ্যবাদী চক্রের দালাল নরপশু মোশতাক, তাহের উদ্দিন ঠাকুর, মাহবুবুল আলম চাষী, কর্নেল ফারুক, কর্নেল রশিদ, মেজর ডালিমসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালো রাত্রিতে বাঙালি জাতির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠতম সন্তান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করে।

কাঁদো বাঙালি কাঁদো, জাতির পিতার জন্য কাঁদো, বাংলার স্বপ্ন স্রষ্টার জন্য কাঁদো। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর দীর্ঘ ২১ বছর যারাই ক্ষমতার মসনদে আসীন ছিলেন তারা প্রতিনিয়ত রেডিও, টিভি, পত্র-পত্রিকাসহ সকল প্রচার মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধ ও তার সর্বাধিনায়ক এবং সিপাহশালারদের বিরুদ্ধে বিকৃত ইতিহাস ও কুৎসা প্রচার করে–এদেশের স্বাধীনতা-উত্তর নতুন প্রজন্ম ও সাধারণ মানুষকে করেছে বিভ্রান্ত। নির্লজ্জ ও গোয়েবলসীয় রীতি প্রচারের ফলে তারা এখন সত্য ও মিথ্যা পৃথক করার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছিল। জাতির জনকের রক্তের ঋণ শোধ করার সময় এসেছে। তাই তো তারা সগৌরবে তাদের মনের মণিকোঠায় বাংলার ঘরে ঘরে জাতির জনকের যোগ্য স্থান দিয়েছে। ১৯৯৬-এর ১২ জুনের ঐতিহাসিক নির্বাচনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শের রাজনৈতিক দল 'বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ' তাঁর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বিজয়ী হয়ে ২৩ জুন পুনরায় বাংলায় সিংহাসনে আসীন হয়। ২৯শে ডিসেম্বর ২০০৮ ব্রুট মেজরিটি নিয়ে ২য় বারের মতো মুজিবকন্যা শেখ হাসিনা সরকার গঠন করেন। জাতির জনক এর কতিপয় হত্যাকারীদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ফাঁসির রায় কার্যকর হয়েছে। ৮ নভেম্বর, ২০১০ বাঙালি জাতির জন্য স্মরণীয় দিন, দীর্ঘ দু'যুগ পর বাঙালি জাতি কিছুটা হলেও কলঙ্কমুক্ত হলো।

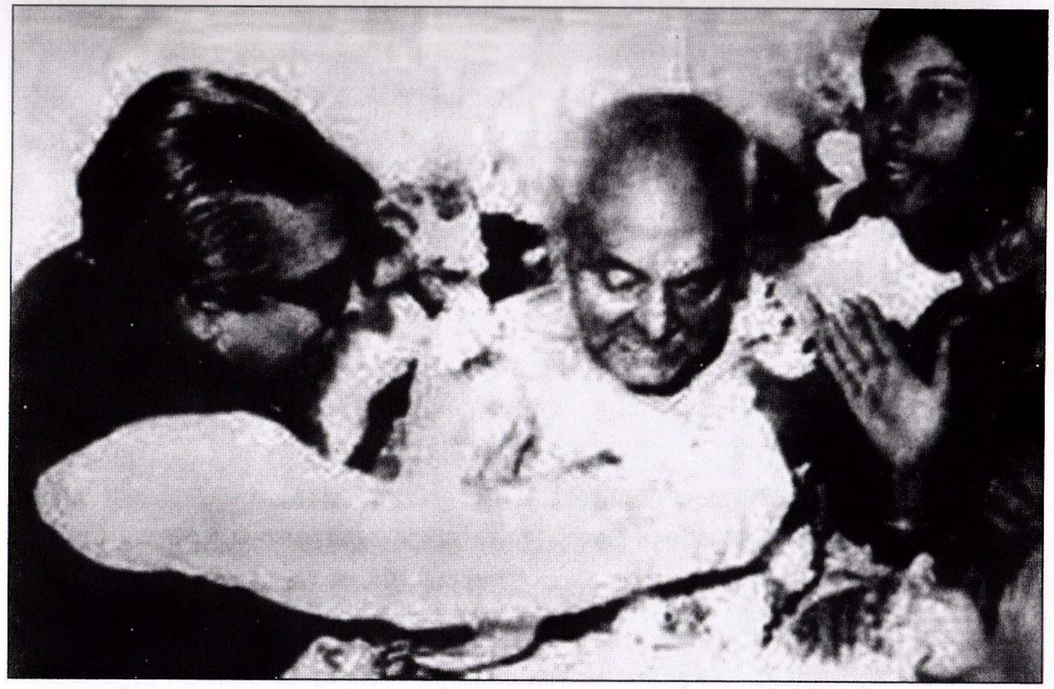




জাতির জনককে নিয়ে সম্প্রতি মুখচেনা গোষ্ঠীর বিতর্ক সম্পর্কে একটি উদাহরণ দিতে চাই, ১৯৭৫ সালের ১৫ জানুয়ারি ৪র্থ সংশোধনী জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়। ঐ সংশোধনীর ৩৫ অনুচ্ছেদের ই অংশে পরিষ্কার উল্লেখ আছে, "BANGBANDHU SHEIKH MUJIBUR RAHMAN, FATHER OF THE NATION, ...THE CONSTITUTION AS AMENDED BY THE ACT." ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর সামরিক আদেশ এবং অর্ডিন্যান্স বলে জেনারেল জিয়া সংবিধানের এই ৪র্থ সংশোধনীর অনেক ধারা বাতিল করেছেন। আবার ইনডেমনিটি বিলসহ অনেক অগণতান্ত্রিক ধারা সংযোজন করেছেন। কিন্তু ৪র্থ সংশোধনীর ৩৫ অনুচ্ছেদের ই ধারাটি বলবৎ রেখেছেন।

আজ আর কারফিউ নেই, রাস্তায় নেই ঘাতকের ট্যাংক আর কামান। তথাকথিত সূর্য সন্তানেরা এখন নেড়ী কুকুর, ইতিহাসে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত নরকের ঘৃণ্যকীট। মুজিব অতো ঠুনকো নয় যে তাকে নশ্বর পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিলেই সব শেষ। ঘাতক পশুরা তখন বুঝেনি যে, জীবিত মুজিবের চেয়ে মৃত মুজিব কোটি কোটি গুণ শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসবে এ বাংলায়। তাই তো প্রখ্যাত সাহিত্যিক অন্নদা শংকর রায় বলেছিলেন–

'যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা গৌরি যমুনা বহমান
ততোদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।'



২৪শে মে ১৯৭২, বিদ্রোহী কবি নজরুলকে ঢাকায় নিয়ে এলেন শেখ মুজিব

**ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান**

আমাদের জাতীয় ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ভাষা আন্দোলন আমাদের স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচক। ভাষা-আন্দোলনে জাতির জনক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি বিশেষ অবদান রয়েছে। আজন্ম মাতৃভাষাপ্রেমী এই মহান নেতা ১৯৪৭ সালে ভাষা আন্দোলনের সূচনা পর্ব এবং পরবর্তী সময়ে আইনসভার সদস্য হিসেবে এবং রাষ্ট্রপতি হিসেবে বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও বিকাশে কাজ করে গেছেন এবং বাংলা ভাষা ও বাংলাভাষীদের দাবির কথা বলে গেছেন। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এ আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদানের সত্যতা প্রমাণিত হয়। ১৯৮৭ সালে পাকিস্তান জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতার সিরাজউদ্দৌলা হোটেলে পূর্ব পাকিস্তানের পরবর্তী কর্তব্য নির্ধারণে সমবেত হয়েছিলেন কিছু রাজনৈতিক কর্মী। সেখানে পাকিস্তানে একটি অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগঠন করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়। সে প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তানের কর্মী সম্মেলনে গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠিত হয়। ওই সম্মেলনে ভাষা বিষয়ক কিছু প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্মেলনের কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাবগুলো পাঠ করেছিলেন সেদিনের ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান (সূত্র : 'ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা'-গাজীউল হজ, ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্র, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪)।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভারত থেকে তৎকালীন পূর্ব বাংলায় প্রত্যাবর্তন করার পর সরাসরি ভাষা আন্দোলনে শরিক হন। ভাষা আন্দোলনের শুরুতে তমদ্দুন মজলিসের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সংক্রান্ত কার্যক্রমে তিনি অংশগ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুর প্রথম জীবনীকার অধ্যাপক ড. মযহারুল ইসলাম এ প্রসঙ্গে বলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান এই মজলিসকে রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত বহু কাজে সাহায্য ও সমর্থন করেন' (সূত্র : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, মযহারুল ইসলাম : ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩ : পৃ. ১০৪)। ১৯৪৭ সালের ৫ ডিসেম্বর খাজা নাজিমুদ্দিনের বাসভবনে মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক চলাকালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে অনুষ্ঠিত মিছিলে তিনি অংশগ্রহণ করেন।

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে সমকালীন রাজনীতিবিদসহ ১৪ ভাষাবীর সর্বপ্রথম ভাষা আন্দোলনসহ অন্যান্য দাবি সংবলিত ২১ দফা দাবি নিয়ে একটি ইস্তেহার প্রণয়ন করেছিলেন। ওই ইস্তেহারে ২১ দফা দাবির মধ্যে দ্বিতীয় দাবিটি ছিল রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত। ঐতিহাসিক এই ইস্তেহারটি একটি ছোট পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছিল যার নাম 'রাষ্ট্রভাষা–২১ দফা ইস্তেহার–ঐতিহাসিক দলিল'। এই ইস্তেহার প্রণয়নে শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান ছিল অনস্বীকার্য এবং তিনি ছিলেন অন্যতম স্বাক্ষরদাতা (বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন : রাষ্ট্রভাষা-২১ দফা ইস্তেহার–ঐতিহাসিক দলিল, শায়খুল বারী, পুনঃপ্রকাশ জানুয়ারি ২০০২)।

১৫০নং মোগলটুলীর 'ওয়ার্কস ক্যাম্প' ছিল সে সময়ের প্রগতিশীল ছাত্র-যুবক ও রাজনৈতিক কর্মীদের মিলনকেন্দ্র। ওয়ার্কস ক্যাম্পের কর্মীরা বাংলা ভাষাসহ পাকিস্তানের অন্যান্য বৈষম্যমূলক দিক জাতির সামনে তুলে ধরেন। ভাষা আন্দোলনের সপক্ষের কর্মীবাহিনী এখানে নিয়মিত জমায়েত হতো এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার নানা কর্মপরিকল্পনা এখানেই নেয়া হতো। শেখ মুজিব ছিলেন এই ক্যাম্পের প্রাণশক্তি। (সূত্র : ১৫০ মোগলটুলী-বাহাউদ্দীন চৌধুরী, জনকণ্ঠ ঈদ সংখ্যা ২০০৮)। ১৯৪৮ সালের ৪





জানুয়ারি গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে সংগঠনটির ভূমিকা খুবই স্মরণীয়। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ছাত্রলীগের ১০ দফা দাবির মধ্যে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার ও সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের নিয়োগ এবং বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার দাবি ছিল অন্যতম দাবি। ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা ছিল খুবই স্মরণীয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘটে শেখ মুজিবুর রহমান বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দান করেন। শেখ মুজিবসহ সকল প্রগতিবাদী ছাত্রনেতাই বাংলা ভাষার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটি সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করেন (সূত্র : ভাষা আন্দোলন ও শেখ মুজিব, পূর্বোক্ত আন্দোলন ও শেখ মুজিব, পূর্বোক্ত পৃ. ১৯-২০)। ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ ফজলুল হক মুসলিম হলে তমদ্দুন মজলিস ও মুসলিম ছাত্রলীগের যৌথ সভায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়। এদেশের বিভিন্ন সংগঠনের কর্মীরা ২ মার্চ ফজলুল হক মুসলিম হলের এই সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম শেখ মুজিবুর রহমান। সভায় গণপরিষদ সিদ্ধান্ত ও মুসলিম লীগের বাংলা ভাষাবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। এই সংগ্রাম পরিষদ গঠনে শেখ মুজিব বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলেন এবং তাঁর ভূমিকা ছিল যেমন বলিষ্ঠ তেমনি সুদূরপ্রসারী।

১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে এক অনন্য অবিস্মরণীয় দিন। এই দিনে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সর্বাত্মক সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। এটাই ছিল ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে তথা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এদেশে প্রথম সফল হরতাল। এই হরতালে শেখ সাহেব নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়ে গ্রেফতার হন। ভাষাসৈনিক অলি আহাদ তাঁর 'জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫' গ্রন্থে লিখেছেন, "আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার নিমিত্তে শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ হতে ১০ মার্চ ঢাকায় আসেন। মোনায়েম সরকার সম্পাদিত বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি' শীর্ষক গ্রন্থে বলা হয়েছে, "স্বাধীন পাকিস্তানের রাজনীতিতে এটিই তাঁর প্রথম গ্রেফতার।" ১১ মার্চের হরতাল সফল করতে ১ মার্চ, ১৯৪৮ তারিখে প্রচার মাধ্যমে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল। বিবৃতির অন্যতম স্বাক্ষরদাতা ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৪৮ সালের ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ভাষা আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে এক সাধারণ ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে পূর্ববাংলা আইন পরিষদ ভবন অভিমুখে একটি মিছিল বের হয়। ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন সদ্য কারামুক্ত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে আইন পরিষদ ভবন ঘেরাও করতে গিয়ে মিছিল পুলিশের প্রতিরোধের মুখে পড়ে।

১৯৪৮ সালের ১৭ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের আহ্বানে নঈমুদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সে সভায় শেখ মুজিব অংশগ্রহণ করেন (দেখুন জাতীয় রাজনীতি: ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫, অলি আহাদ)। শেখ মুজিবুর রহমান আন্দোলনে জড়িত থাকার কারণে ১৯৪৯ সালে দু'বার গ্রেফতার হন। ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে বঙ্গবন্ধু নারায়ণগঞ্জের এক জনসভায় প্রদত্ত

ভাষণে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলেছিলেন। এ প্রসঙ্গে মুস্তাফা সরোয়ার বলেন, "বঙ্গবন্ধু সেদিন ছাত্রলীগের ১০ দফার অন্যতম দাবি পাকিস্তান নৌবাহিনীর সেনা দফতর করাচি থেকে চট্টগ্রাম স্থানান্তর ও বাঙালিদের মিলিটারি শিক্ষার দাবিসহ রাষ্ট্রভাষা বাংলার কথা বলেছিলেন" (সূত্র : ভালোবাসি মাতৃভাষা, পৃ. ১০৩)। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের বিস্ফোরণ পর্বে শেখ সাহেব জেলে ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে রাজনৈতিক ময়দানে অনুপস্থিত থাকলেও জেলে বসেই আন্দোলনকারীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করতেন (সূত্র : একুশে ফেব্রুয়ারি জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক ড. মোহাম্মদ হান্নান, পৃ. ৫৩)। এ প্রসঙ্গে ভাষাসৈনিক গাজীউল হক তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন–'১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে গ্রেফতার হওয়ার পর জনাব শেখ মুজিবুর রহমান ১৮৫২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিভিন্ন জেলে আটক ছিলেন। ফলে স্বাভাবিক কারণেই '৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবে জেলে তিনি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দেন সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিতেন (গাজীউল হক, আমার দেখা আমার লেখা, পৃ. ৪০)।

জাতীয় নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। তিনি উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে বিবৃতি দেন। সোহরাওয়ার্দী এই অবস্থানে দৃঢ় থাকলে ভাষা আন্দোলনে অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারত (সূত্র : একুশে ফেব্রয়ারি থেকে আন্তর্জাতিক–ড. মোহাম্মদ হান্নান, পৃ. ৫৩)। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান সোহরাওয়ার্দীর এই মত পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে তাঁর সমর্থন আদায় করেন। বঙ্গবন্ধুর বাংলা ভাষার প্রতি গভীর দরদ অসমী রাজনৈতিক প্রত্যয়ের ফলশ্রুতিতে শহীদ সোহরাওয়ার্দী শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের অন্যতম ভাষা হিসেবে বাংলাকে সমর্থন করে বিবৃতি দেন। বিবৃতিটি ১৯৫২ সালের ২৯ জুন সাপ্তাহিক ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ২৭ এপ্রিল ১৯৫২ তারিখে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের জেলা ও মহকুমা প্রতিনিধি সম্মেলনে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি হিসেবে বক্তব্য রাখেন দলের ভারপাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৫২ সালের পরও বঙ্গবন্ধু বাংলা ভাষাকে ছেড়ে যাননি। ১৯৫৩ সালে একুশের প্রথম বার্ষিকীতে আরমানিটোলা ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় তিনি সেদিন একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস হিসেবে ঘোষণা দেয়ার আহ্বান জানান এবং অবিলম্বে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান।

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের একজন মন্ত্রী হিসেবে শেখ সাহেব সমকালীন রাজনীতি এবং বাংলা ভাষার উন্নয়নে অবদান রাখেন। ১৯৪৭ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে বাংলাভাষায় ভাষণ দিয়ে যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন, তা ইতিহাসের পাতায় চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। জাতিসংঘে প্রথম বাংলায় ভাষণ দিয়ে বিশ্বসভায় বাংলা ভাষার পরিচিতির প্রথম বীজ বপন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বিশ্বসভায় বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার এটাই ছিল প্রথম সফল উদ্যোগ। ১৯৯৯ সালে মাতৃভাষাপ্রেমী তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনামলে ২১ ফেব্রুয়ারি





আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা লাভ এবং বর্তমান সরকার কর্তৃক জাতিসংঘে বাংলাকে দাফতরিক ভাষা করার উদ্যোগ গ্রহণ এ সবই বঙ্গবন্ধুর সুদূরপ্রসারী চিন্তার বাস্তব রূপায়ন। ১৯৫৬ সালের ১৭ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত আইন পরিষদের অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু সংসদের দৈনন্দিন কার্যসূচি বাংলা ভাষায় মুদ্রণ করার দাবি জানান। ১৬ ফেব্রুয়ারি আইনসভার অধিবেশনেও তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা কারার দাবি জানান (সূত্র : ভালবাসি মাতৃভাষা-ভাষা-আন্দোলনের ৫০ বছর পূর্তি স্মারকগ্রন্থ-বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, মার্চ ২০০২, পৃ. ১৮২-১৯১)।

১৯৭৫ সালের ১২মার্চ রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন বঙ্গন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অফিসের কাজে বাংলাভাষা প্রচলনের প্রথম সরকারি নির্দেশ জারি করেন (সূত্র : রাষ্ট্রপতির সচিবালয়, গণভবন, ঢাকা, পত্রসংখ্যা ৩০/১২/৭৫-সাধারণ-৭২৯/৯ (৪০০) তারিখ : ১২ মার্চ ১৯৭৫)। ১৯৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন আওয়ামী লীগ সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলা একাডেমিতে একটি সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে অফিস আদালতে বাংলা ভাষা ব্যবহারের কথা বলেন (সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১)। ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকাকালীন সরকারি পর্যায়ে বাংলা প্রচলন কমিটি গঠন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (সূত্র : দৈনিক বাংলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩)। ১৯৭২ সালের সংবিধানে তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করেন। এটাই ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম বাংলা ভাষার প্রণীত সংবিধান। ভাষা আন্দোলনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্থপতির ভূমিকা পালন করে আমাদের একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে পৃথিবীর বুকে আত্মপ্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছেন।

অবিভক্ত ভারত থেকে পাকিস্তান এবং পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৮ বছর তিনি আন্দোলন করেছেন শোষণ, বৈষ্যম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে। নীতি ও আদর্শের প্রশ্নে তিনি ছিলেন আপসহীন। যেখানেই শোষণ ও বৈষম্য সেখানেই অধিকারহীনদের পাশে দাঁড়িয়েছেন তিনি। এ কারণে নদীবেষ্টিত গোপালগঞ্জের প্রত্যন্ত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেও তিনি হয়ে উঠেছেন এ উপমহাদেশের শীর্ষ রাজনীতিবিদের একজন। শুধু তাই নয়, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মহাত্মা গান্ধী, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও শামসুল হকের মতো সর্বজনবিদিত নেতাদের সাহচর্য পাওয়া এ নেতার পরিচিতি ছিল বিশ্বব্যাপী।

বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে জানা যায়, সপ্তম শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় তিনি যোগ দিয়েছিলেন স্বদেশী আন্দোলনে। এরপর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মোকাবিলা, দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের খাদ্য ও বস্ত্র সংস্থান এবং গরিব ছাত্রদের লেখাপড়ার সুব্যবস্থা ও পৃথক পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তাঁর ছিল স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। রাজনীতি ছিল তার রক্তধারায় মজ্জাগত। তাই শৈশব থেকেই তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। স্কুল ছাত্র অবস্থায়ই তিনি অধিকারের লড়াইয়ে লিপ্ত ছিলেন। ১৯৩৯ সালে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সান্নিধ্যে এসে প্রত্যক্ষ রাজনীতি শুরু করেন বঙ্গবন্ধু। এ সময় গোপালগঞ্জে গঠন করেন মুসলিম ছাত্রলীগ এবং তিনি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। সেই সময়কার ছাত্র আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তিনি। প্রচণ্ড জনপ্রিয় এ নেতা একদিকে যেমন ভালো সংগঠক ছিলেন, অন্যদিকে ছিলেন এক

অসাধারণ বক্তা। অনলবর্ষী বক্তৃতা দিয়ে তিনি সভা সমাবেশে মানুষকে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করতে পারতেন গভীরভাবে। আন্দোলন ও সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান তাঁর সহজাত গুণ হলেও একজন নিবেদিত রাজনৈতিক কর্মী হিসেবেও তাঁর সুখ্যাতি ছিল। অক্লান্ত পরিশ্রম করতে পারতেন বঙ্গবন্ধু। দিনের বেলা সাংগঠনিক কাজ আর রাতের বেলা রাজনৈতিক পাঠ গ্রহণ করেছেন দিনের পর দিন। রাজনৈতিক কাজে তাঁর ক্লান্তি ছিল না।

পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর বাঙালির প্রতি পাকিস্তানি শাসকদের নিপীড়ন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, মাতৃভাষা রক্ষার জন্য ভাষা আন্দোলন, তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনসহ বাঙালির সামগ্রিক মুক্তির জন্য ছয় দফা ও অসহযোগ আন্দোলন এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনে প্রাদেশিক আইনসভায় আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রভৃতি অর্জনগুলোর বেশিরভাগই অর্জিত হয়েছিল তাঁর নেতৃত্বে। মাতৃভাষা বাংলার দাবিতে তার সভাপতিত্বে ১৯৪৮ সালের ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় সাধারণ ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। ভাষা আন্দোলন ও শোষিত বাঙালির পক্ষে কথা বলতে গিয়ে তাকে বাববার কারাবন্দি হতে হয়েছে। দিনের পর দিন বিনা বিচারে কারাবন্দি রাখা হলেও আন্দোলন থেকে একবিন্দুও সরে আসেননি তিনি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেলে বসেই অনশন করেছেন। সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খানের আমলে আন্দোলন ও সংগ্রাম থেকে সরে আসার শর্তে মুক্তি লাভের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন ঘৃণাভরে। ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার আসামি হিসেবে বন্দি শেখ মুজিব প্যারোলে মুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় পরবর্তী সময়ে জনগণ তাকে কারাগার থেকে ছিনিয়ে এনেছিল। জনগণের প্রতি তার আস্থা ছিল অত্যন্ত দৃঢ়। অগ্নিঝরা আন্দোলনের এক পর্যায়ে ১৯৬৯ সালে এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব বাংলার নামকরণ করেছিলেন 'বাংলাদেশ'।

বাঙালি জাতির চূড়ান্ত মুক্তির লক্ষ্যে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ডাক দিলে মিথ্যা আগরতলা যড়যন্ত্র মামলা দেয় পাকিস্তানি শাসকরা। ওই সময় তাকে দমিয়ে রাখতে পাকিস্তানের কারাগারে সেলের ভেতরেই খোঁড়া হয়েছিল কবর। তবু বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব থেকে বঙ্গবন্ধু পিছপা হননি। নীতিতে ছিলেন অটল। বাঙালির মুক্তির জন্য জীবন বাজি রেখেছিলেন তিনি। পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ যখন জমিদার, জোতদার, ব্যবসায়ী ও নবাবদের প্রতিষ্ঠান হয়ে পড়ে, যখন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি চরম বিমাতাসুলভ ও বৈষম্যমূলক আচরণ করতে থাকে মুসলিম লীগ, সে সময় বাধ্য হয়ে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ থেকে তিনি বেরিয়ে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠালগ্নেই যুক্ত হন দলের সঙ্গে। পরবর্তী সময়ে তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, সংগ্রাম ও আন্দোলনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে তিনি সাধারণ জনগণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কণ্ঠস্বরে পরিণত করেন আওয়ামী লীগকে। এক পর্যায়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে মহানায়কে পরিণত হন শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৭১ সালে স্বনামধন্য বিদেশি সংবাদ মাধ্যম নিউজউইক শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে যথার্থ মূল্যায়ন করেছে। ম্যাগাজিনটি শেখ মুজিবকে 'poet of politics' উপাধি দেয়। এছাড়া বিবিসি বাংলা জরিপে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি তালিকায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন মানুষের ভোটে। কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে





শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেছেন, 'আমি হিমালয় দেখিনি, কিন্তু শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্ব ও সাহসিকতায় তিনি হিমালয়ের মতো'।

## জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

পাকিস্তানের সুদীর্ঘ তেইশ বছরের শোষণের নাগপাশ ছিন্ন করে আমাদের স্বাধীনতার যে মহান কবি ডাক দিয়েছিলেন, তিনিই হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেই উত্তাল ডাকে আমাদের জাতির সমস্ত নাগশিশুরা উত্তাল হয়ে একাত্তরে একটা দুর্ধর্ষ হিংস্র বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয়ের মালা ছিনিয়ে এনেছিল, যা ছিল জগতের বুকে অভূতপূর্ব এক ঘটনা। ইসলামের ইতিহাসের প্রথম পর্বের যুদ্ধের মতো। স্বাধীনতার এই মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ (বর্তমান জেলা) মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শেখ লুৎফর রহমান, মাতা মোসাম্মাৎ সায়রা বেগম, ছেলে বেলায় বাবা-মা ছেলেকে খোকা বলেই ডাকতেন। খোকার শৈশবকাল কাটে ছবির মতো সাজানো সুন্দর একটি গ্রাম নাম টুঙ্গিপাড়া। মধুমতি নদী এই গ্রাম ঘেঁষে বয়ে গেছে। নদীর দু'পাশে তাল, তমাল, জারুল, হিজলের সবুজ সমারোহ। এই গ্রামেই ছিল খোকার পূর্ব পুরুষদের বসতি। ছেলে বেলায় খোকার শরীর ছিল বেশ রোগা ছিপছিপে পাতলা। এর জন্য দাদির আফসোসের অন্ত ছিল না। কিন্তু কে জানত যে এই রোগা ছিপছিপে ছেলেই একদা জাতির কর্ণধার হবে।

সাত বছর বয়সে খোকাকে গিমাডাঙ্গা টুঙ্গিপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। এরপর নয় বছর বয়সে গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন। এরপরে স্থানীয় মিশনারি স্কুলে লেখাপড়া করেন। বারো বছর বয়েসে চক্ষু রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত ৪ বছর তার শিক্ষা জীবনে সাময়িক বিরতি ঘটে। এসময় ১৯৩৮ সালে শেখ মুজিবের অভিভাবকেরা তার বিয়ের উদ্যোগ নেন। তখন তার বয়স ১১ বছর। সঙ্গিনী বেগম ফজিলাতুন্নেসার বয়স মাত্র ৩ বছর। এই দম্পতির ঘরে জন্ম হয় ২ কন্যা শেখ হাসিনা, শেখ রেহেনা ও তিন পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শেখ রাসেল। (তথ্য : শেখ মুজিব, আমার পিতা : শেখ হাসিনার স্মৃতিচারণ 'শেখ মুজিব একটি লাল গোলাপ'। স্মারকগ্রন্থ–পৃ. ৫২৮) বিয়ের পরে তিনি পুনরায় স্কুলে ভর্তি হয়ে ১৯৪২ সালে গোপালগঞ্জ মিশন হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯৪৭ সালে কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে বিএ ডিগ্রি লাভ করেন। অতঃপর ঢকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল তিনি আইন অধ্যয়ন করেন।

ছাত্রজীবন থেকেই শেখ মুজিব রাজনীতির প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে তার প্রবেশ ঘটে সোহরাওয়ার্দীর ভাব শিষ্য হিসেবে। কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র থাকাকালীন সোহরাওয়ার্দীর সাহচর্যে পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। কলিকাতা বিহারের দাঙ্গায় বিপন্ন মুসলমানদের রক্ষাকার্যে এবং ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে সোহরাওয়ার্দীর আত্মনিবেদিত কর্মী হিসেবে দেশ ও জতির সেবা করেন।

১৯৪৬ সালে তিনি কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি ১৯৪৭ সালে গঠিত পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক লীগ এবং পূর্ব পাকিস্তান

মুসলিম ছাত্রলীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বিভিন্ন সময়ে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এ জন্য তাকে বহুবার বিভিন্ন মেয়াদে কারাভোগ করতে হয়। ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনে ও ১৯৪৯ সালে হরতালে যোগদানের জন্য শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪৯ সালে দুর্ভিক্ষের সময় মওলানা ভাসানীর ভুখা মিছিলে নেতৃত্বদানের জন্য তাকে আবার কারারুদ্ধ করা হয়।

১৯৪৯ সালে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক, ১৯৫৩ সালে সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯৬৬ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলা সরকারের সমবায় ও কৃষি ঋণ বিষয়ক মন্ত্রী নিযুক্ত হন, ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয় এবং ১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানের বাণিজ্য-শ্রম, শিল্প ও দুর্নীতি দমন বিভাগে মন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৫২ সালে পিকিং ও স্টকহোম শান্তি সম্মেলনের ডেলিগেট এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে পাকিস্তানি চা বোর্ডে চেয়ারম্যান ছিলেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ আইয়ুব খানের আমলে তিনি কারারুদ্ধ হন। (১৯৫৮ হতে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত)। অতঃপর তিনি ১৯৬৩ হতে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ দলের পুনর্গঠনে নিয়োজিত থাকেন। এই সময়ে তিনি দেশবাসী ও ক্ষমতাসীন দলের বিবেচনার জন্য তৎকালীন পাকিস্তানের শাসন সংস্কারের ভিত্তিস্বরূপ 'ছয় দফা' দাবি পেশ করেন। এই ছয় দফা দাবি পরবর্তীকালে বিখ্যাত ঐতিহাসিক 'ছয় দফা' স্বরূপ লাভ করে। দফাগুলির সংক্ষিপ্ত রূপ :

১. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করে পাকিস্তানকে প্রকৃত ফেডারেল রাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে।

২. প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় বিষয় ছাড়া সমস্ত ক্ষমতা স্টেটসমূহের হাতে থাকবে।

৩. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি পৃথক মুদ্রার প্রচলন থাকার অথবা একটি মুদ্রার প্রচলন থাকবে, কিন্তু একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক ও দুটি আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংকের মাধ্যমে এক অঞ্চলে মুদ্রা অন্য অঞ্চলে স্থানান্তর বন্ধ করতে হবে।

৪. সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য করণ ও আদায় আঞ্চলিক সরকারের ওপর ন্যস্ত থাকবে, তবে সুনির্দিষ্ট আইনের মাধ্যমে এর একটি নিদিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিলে জমা দিতে হবে।

৫. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের হিসাব পৃথক পৃথক থাকবে এবং এই অঞ্চলের এখতিয়ারে থাকবে। দেশজাত পণ্যদ্রব্য বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানি রফতানি চলবে। বাণিজ্য মিশন স্থাপন ক্ষমতা আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকবে।

৬. পূর্ব পাকিস্তান মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিশিয়ারি বাহিনী গঠন করতে হবে।

১৯৬৬ সালে তিনি 'ছয় দফা' কর্মসূচি প্রচার করেন। এই 'ছয় দফা' ছিল বাঙালি জাতির মুক্তি সনদ। এ জন্য ১৯৬৬ সালের মে মাসে তিনি কারারুদ্ধ হন। ১৯৬৭ সালের ৭ জুন





মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর পরামর্শক্রমে ছাত্রলীগ আর মতিয়া গ্রুপের ছাত্র ইউনিয়ন জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য একটি ব্যাপক গণআন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এই সময়ে মোনেম সরকার বাংলার বিপ্লবী অগ্নিকন্যা বেগম মতিয়াসহ ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের বহু নেতা কর্মীকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। ১৯৬৮ সালের ১৭ মার্চ আইয়ুব মোনেম কুচক্র বাংলার বিপ্লবী নেতা জনগণের মধ্যমণি শেখ মুজিবুর রহমানকে কুখ্যাত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলায় গ্রেফতার করে। 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলা ছিল একটি মিথ্যা বানোয়াট রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার আওয়ামী লীগ নেতা ও পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানসহ ৩৫ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই মামলা দায়ের করেছিল।

১৯৬৮ সালের প্রথম ভাগে দায়ের করা এই মামলায় অভিযোগ করা হয় যে, শেখ মুজিব ও অন্যান্যরা ভারতের সাথে মিলে পাকিস্তানের অখণ্ডতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। এই মামলাটির পূর্ণ নাম ছিল রাষ্ট্রদ্রোহ বনাম শেখ মুজিবুর রহমান গং মামলা, তবে এটি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হিসেবেই সমাধিক পরিচিত।

৬ জানুয়ারি ১৯৬৮ সালে ২ জন সিএসপি সহ ২৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের নিচ্ছিলেন সম্পর্কে সরকারি প্রেসনোটে উল্লেখ করা হয় যে, গত মাসে (অর্থাৎ ডিসেম্বর ১৯৬৮) পূর্ব পাকিস্তানে উদঘটিত জাতীয় স্বার্থবিরোধী এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে এদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

১৭ জানুয়ারি ১৯৬৮ সালে বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও স্বাধীন বাংলা দেশের প্রতিষ্ঠাতা শেখ মুজিবুর রহমানকেও গ্রেফতার করা হয়। ৩৫ জনকে আসামি করে সরকার পক্ষ মামলা দায়ের করে। আসামিরা সবাই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। তারা হলেন শেখ মুজিবুর রহমান, আহম্মেদ ফজলুর রহমান, সিএসপি কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, স্টুয়ার্ট মুজিবুর রহমান, সাবেক এল এস সুলতান উদ্দিন আহম্মদ, এল এসডি আই নূর মোহাম্মদ, ফ্লাইট সার্জেন্ট মাহাফিজ উল্লাহ, কর্পোরাল আব্দুস সামাদ, সাবেক হাবিলদার দালিল উদ্দিন, রুহুল কুদ্দুস, সি,এস.পি মো. ফজলুল হক, বিভূতি ভূষণ চৌধুরী, বিধান কৃষ্ণ সেন, সুবেদার আব্দুর রাজ্জাক, সাবেক কেরানী মুজিবুর রহমান, সাবেক ফৰ্ব্বাইট সার্জেন্ট মো. আব্দুর রাজ্জাক, সার্জেন্ট জহুরুল হক, এবি খুরশীদ, খান মোহাম্মদ শামসুর রহমান, সিএসপি একেএম শামসুল হক, হাবিলদার আজিজুল হক, মাহফুজুল বারী, সার্জেন্ট শামসুল হক, শওকত আলী, শামসুল আলম, ক্যাপ্টেন মো. আব্দুল মোতালেব, ক্যাপ্টেন খন্দকার নাজমুল হুদা, ক্যাপ্টেন এএনএম নূরুজ্জামান, সার্জেন্ট আব্দুল জলিল, মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী, লে. এম রহমান, সাবেক সুবেদার তাজুল ইসলাম, আলী রেজা, ক্যাপ্টেন খুরশীদ উদ্দিন এবং ল্যা. আব্দুর রউফ। এই মামলার বিচারকগণ এবং সরকার পক্ষের কৌসুলি ছিলেন সবাই পশ্চিম পাকিস্তানি বেশ কিছুদিন মামলা চলে।

১৯৬৯ সালের ৫ জানুয়ারি ৬ দফাসহ ১২ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এই কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলন

গণআন্দোলনে পরিণত হয়। ২২ ফেব্রুয়ারি জনগণের অব্যাহত চাপের মুখে কেন্দ্রীয় সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য আসামিকে মুক্তিদানে বাধ্য হয়।

২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যেগে বঙ্গবন্ধুকে সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। প্রায় দশ লক্ষ ছাত্র জনতার সংবর্ধনা সমাবেশে শেখ মুজিবুর রহমানকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

১৯৭০ সালের ৬ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পুনরায় আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১ এপ্রিল আওয়ামী লীগ কার্যকরী পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৭ জুন রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় বঙ্গবন্ধু ৬ দফার প্রশ্নে আওয়ামী লীগকে নির্বাচিত করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। ১৭ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু তার দলের নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে 'নৌকা' প্রতীক পছন্দ করেন।

১৯৭০ সালে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে দানবীয় ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে, বেসরকারি হিসাব মতে প্রায় ৫০ লাখ মানুষের প্রাণহানি ঘটে। এ জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে দিয়ে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি ঘোষণা করে। ৭ ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচনের পর দেখা গেল আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আসনগুলোতেও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আওয়ামী লীগ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০টি আসনের মধ্যে ৩০৫টি আসন লাভ করে।

১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি রেসকোর্সের জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনপ্রনিধিদের শপথ গ্রহণ পরিচালনা করেন। আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যরা ৬ দফায় ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা এবং জনগণের প্রতি আনুগত্য থাকার শপথ গ্রহণ করেন।

৫ জানুয়ারি তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বাধিক আসন লাভকারী পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠনে তার সম্মতির কথা ঘোষণা করেন। ২৮ জানুয়ারি জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার জন্য ঢাকা আসেন। তিন দিন বৈঠকের পর আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যায়।

১৩ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন। ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক আহ্বান করেন। কয়েক দিন আলোচনার পর বৈঠক ব্যর্থ হয়। জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকায় এসে শেখ মুজিবুরের সাথে বাহ্যত রাজনৈতিক আলোচনা করলেও গোপনে সামরিক প্রস্তুতি চলতে থাকে।

৭ মার্চ ১৯৭১ রেসকোর্সে জনসমুখে বঙ্গবন্ধু তার বজ্রকণ্ঠ উদ্দীপনাময়ী ভাষণে বলেন

'ভাইয়েরা আমার, আজ দুঃখ ভরাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবাই জানেন আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি, কিন্তু ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর, যশোরের রাজপথ আমার ভাইয়ের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে।





নির্বাচনে আপনারা ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে জয়ী করেছিলেন শাসনতন্ত্র রচনার জন্য। আশা ছিল জাতীয় পরিষদ বসবে। আমরা শাসনতন্ত্র তৈরি করব এবং এই শাসনতন্ত্রে মানুষ তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আর সাংস্কৃতিক মুক্তিলাভ করবে। কিন্তু ২৩ বছরের ইতিহাসে বাংলার মানুষের মুমূর্ষু আর্তনাদের ইতিহাস, নির্যাতিত মানুষের কান্নার ইতিহাস, রক্তদানের সকরুণ ইতিহাস।

'৫২ সালে আমরা রক্ত দিয়েছি '৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও গদীতে বসতে পরিনি। ৫৮ সালে দেশে সামরিক শাসন জারি করে আইয়ুব খান দশ বছরে আমাদের গোলাম করে রাখলো, '৬৬ সালে 'ছয় দফা' রাখা হলো এবং এরপর এ অপরাধে আমার বহু ভাইকে হত্যা করা হলো। '৬৯ সালে গণআন্দোলনে আইয়ুবের পতনের পর ইয়াহিয়া খান এলেন। তিনি বললেন, তিনি জনগণের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে শাসনতন্ত্র দেবেন। আমরা মেনে নিলাম। তার পরের ঘটনা সকলেই জানেন। ইয়াইয়া খানের সঙ্গে আলোচনা হলো, আমরা তাকে ১৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার অনুরোধ করলাম। কিন্তু মেজরিটি পার্টির নেতা হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমার কথা শুনলেন না। শুনলেন ভুট্টো সাহেবের কথা।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে আমি আবার জানিয়ে দিতে চাই দেশকে একেবারে জাহান্নামে নিয়ে যাইবেন না। যদি আমরা শান্তিপূর্ণভাবে ফয়সালা করতে পারি, জানবেন যে, বাঁচার সম্ভাবনা আছে। এই জন্য অনুরোধ মিলিটারি শাসন চালাবার আর চেষ্টা করবেন না।

আমরা রক্ত দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো এদেশের মানুষকে মুক্ত করবো, ইনশা-আল্লাহ। এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।

১৯৭১, ১ মার্চ বেলা বারোটার খবরে ভেসে এলো ইয়াহিয়া খানের অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার কথা। শাসকগোষ্ঠীর এই চরম বিশ্বাসঘাতকতার সাথে সাথে ঢাকা ফেটে পড়ে বিক্ষোভে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনে উড্ডীন করা হয় স্বাধীন বাংলার পতাকা। ঘোষিত হয় দেশব্যাপী সর্বাত্মক হরতাল। শেখ সাহেবের নির্দেশে সর্বস্তরের বাঙালির অসহযোগিতার ডাকে, ঢাকা, কুমিল্লা, যশোর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি সেনানিবাসে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেল। এ সময় বাংলার মানুষ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অফিস, আদালত, ব্যাংক-বীমা, স্কুল, কলেজ, গাড়ি, শিল্প কারখানা সবই চলছে। ইয়াহিয়ার সব নির্দেশ অমান্য করে অসহযোগ আন্দোলনে বাংলার মানুষের সেই অভূতপূর্ব সারা ইতিহাসে বিরল ঘটনা। মূলত ৭ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হিসেবে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রশ্নে মুজিব ইয়াহিয়া বৈঠক শুরু হয়। আলোচনার জন্য জনাব ভুট্টো ও ঢাকা আসেন। ২৪ মার্চ পর্যন্ত ইয়াহিয়া-মুজিব ভুট্টো আলোচনা হয়। ২৫ মার্চ আলোচনা ব্যর্থ হবার পর সন্ধ্যায় ঢাকা ত্যাগ করেন।

২৫ মার্চ দিবাগত রাতে নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালির ওপর দুর্ধর্ষ পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে। আক্রমণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিলখানা তৎকালীন ইপিআর সদর দপ্তর ও রাজারবাগ পুলিশ হেড কোয়ার্টার। ২৫ মার্চ রাত ১২টা ২০ মিনিট বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং জাতির উদ্দেশে এই ঘোষণাবাণী পাঠান :

'পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিতভাবে পিলখানা ইপিআর ঘাঁটি, রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করেছে এবং শহরের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলেছে, আমি বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে আবেদন করেছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমি মুক্ত করার জন্য শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ–দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ইপিআর বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনসারদের সাহায্য চান। কোনো আপস নাই, জয় আমাদের হবেই। পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রুকে বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক প্রিয় লোকদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন। জয়বাংলা।'

হানাদার পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বাঙালি সামরিক ও বেসামরিক যোদ্ধা, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষকসহ সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর এই আহ্বান বেতার মারফত তাৎক্ষণিকভাবে বিশেষ ব্যবস্থায় সারা দেশে পাঠানো হয়। রাতেই এই বার্তা পেয়ে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও যশোর সেনানিবাসে বাঙালি জওয়ান ও অফিসাররা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা প্রচার করা হয় গভীর রাতে। স্বাধীনতার ঘোষণা দেবার অপরাধে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ১-১০ মিনিটে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যায় এবং ২৬ মার্চ তাকে বন্দি অবস্থায় পাকিস্তান নিয়ে যাওয়া হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এক ভাষণে আওয়ামী লীগ দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বঙ্গবন্ধুকে দেশদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করেন।

১০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে বিপ্লবী সরকার গঠিত হয়। ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় আম্রকাননে (মুজিবনগর) দেশি বিদেশি সাংবাদিকদের সামনে বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। এই প্রবাসী সরকার বাংলাদেশের মাটিতে পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করে।

নয় মাস যুদ্ধ শেষে ১৬ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়। বাংলাদেশ লাভ করে স্বাধীনতা। কিন্তু তার আগে ৭ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের লায়ালপুর সামরিক আদালত তাঁকে দেশদ্রোহী ঘোষণা করে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। বিভিন্ন দেশের শান্তিকামী জনগণ বঙ্গবন্ধুর জীবনের নিরাপত্তার দাবি জানায়। ২৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে জাতির জনক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি প্রদানের দাবি জানানো হয়। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, কাজেই পাকিস্তানের কোনো অধিকার নেই তাকে বন্দি করে রাখায়। বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই বিশ্বের বহু রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করেছে। ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার আন্তর্জাতিক চাপে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।





জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করে সেদিনই বঙ্গবন্ধুকে ঢাকার উদ্দেশ্যে লন্ডন পাঠানো হয়। ৯ জানুয়ারি লন্ডনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের সাথে সাক্ষাৎ হয়। লন্ডন থেকে ঢাকা আসার পথে বঙ্গবন্ধু দিল্লিতে যাত্রাবিরতি করেন। বিমানবন্দরে ভারতের রাষ্ট্রপ্রতি ভিভি গিরি ও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানান। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি ঢাকায় পৌঁছলে তাঁকে অবিস্মরণীয় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বঙ্গবন্ধু বিমানবন্দর থেকে সরাসরি রেসকোর্স ময়দানে গিয়ে লক্ষ জনতার সমাবেশে অশ্রুসিক্ত নয়নে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। ১২ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করার পর ভারত সরকারের আমন্ত্রণে তিনি ৬ ফেব্রুয়ারি ভারত সফরে যান। ২৮ ফেব্রুয়ারি তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরে যান। ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু সোভিয়েত পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত বিশ্ব শান্তি পরিষদের উদ্যোগে জুলিওকুরী শান্তি পদকে ভূষিত হন। তার শাসনামলেই বাংলাদেশ ইসলামি সম্মেলন সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। তার আমলের শেষ দিকে (২২ মার্চ, ১৯৭৫) ইসলামিক একাডেমী (জনাব আবুল হাসিম পরিচালিত) ও বায়তুল মোকাররম মসজিদ সোসাইটিকে একত্র করে একটি অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' গঠন করা হয়। এর মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে গবেষণার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে।

১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদের প্রথম নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ, সিপিবি ও ন্যাপের সমন্বয়ে ত্রিদলীয় ঐক্যজোট গঠন করেন। ৬ সেপ্টেম্বর তিনি জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য আলজেরিয়া যান। অতঃপর ১৭ অক্টোবর তিনি জাপান সফর করেন।

১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশকে পাকিস্তান স্বীকৃতি দান করে। ২৩ ফেব্রুয়ারি ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান গমন করেন। ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ দেন।

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন এবং তিনি রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বিশৃঙ্খলাকে নিয়ন্ত্রণে আনার প্রয়োজনে 'বাকশাল' (বাংলাদেশ) কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ গঠন করেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের ভোর সোয়া পাঁচটার মধ্যে ৩২ নম্বর বাড়ি আক্রমণ করে। সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্চাভিলাষী অফিসার বিশ্বাসঘাতক বাংলাদেশের স্থপতি বাঙালির জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে, স্টেনগানের গুলি তার বুকের ডান দিকে একটা বিরাট ছিদ্র করে বেরিয়ে গেল। বাঙালি জাতীয়তাবাদের মহান নেতার প্রাণহীন দেহ সিঁড়ির মাথায় পড়ে রইল। সময় তখন ৫টা ৪০ মিনিট। গুলির শব্দ শুনে বেগম মুজিব তার স্বামীর অনুসরণ করতে চাইলে তার বেডরুমের সামনেই তাঁকে আর এক দফায় ব্রাশফায়ার করে হত্যা করা হলো। তারপর হত্যাযজ্ঞে নিহত হলেন বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামাল, মেজপুত্র শেখ জামাল, কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল, দুই পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী কামাল, বঙ্গবন্ধুর ভাই শেখ নাসের, ভগ্নিপতি আব্দুর রব, সেরানিয়াবাত, দৌহিত্র সুকান্ত আব্দুল্লাহ বাবু, ভ্রাতুষ্পুত্র শহীদ সেরানিয়াবাত, বঙ্গবন্ধুর

ভাগ্নে যুবনেতা ও সাংবাদিক শেখ ফজলুল হক মনি ও তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মনি, বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তা অফিসার কর্নেল জামিল এবং ১৪ বছরের কিশোর রিন্টুসহ পরিবারের ১৬ জন সদস্য ও আত্মীয়স্বজনকে ঘাতকরা হত্যা করে।

## বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশ ও স্বাধীনতা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিয়ে আমার এ নিবন্ধ। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান কেন দ্বিখণ্ডিত হলো, বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য নয় মাস কেন যুদ্ধ করতে হলো–এ কারণগুলো পুনরাবিষ্কার এবং স্বচ্ছতর উপলব্ধির চেষ্টা আমাদের করতে হবে, অন্যথায় কিছুদিন পরপর হঠাৎ করে ব্যক্তিবিশেষ নতুন ধারণা দেয়ার চেষ্টা করবে। যে কেউ তার নিজস্ব মতামত ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থের জন্য জাহির করতেই পারে।

তথ্যপ্রবাহের অবাধ স্বাধীনতার যুগে কোনো ঘটনাই লুকিয়ে রাখা যায় না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাণপুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কোটি বাঙালির মনের মণিকোঠায় রয়েছেন। শেখ মুজিব, বাংলাদেশ এবং স্বাধীনতা–এ বিষয়গুলো ভাবনার নতুন দিক উন্মোচিত করেছে। কাজেই আমাদের জানতে যেমন হবে, ঠিক তেমনি জানাতেও হবে। শুধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে শেখ মুজিব মিশে আছেন–এমন কথাও সঠিক নয়, বরং প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে ধারাবাহিকভাবে তার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কাজেই শেখ মুজিব বাংলাদেশ ও স্বাধীনতা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।

শেখ মুজিব হচ্ছেন বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক নেতা, যিনি পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব এবং বাংলাদেশের জাতির জনক হিসেবে পরিচিত। সাধারণ মানুষের কাছে তিনি 'বঙ্গবন্ধু' হিসেবে পরিচিত হলেও সেটা তার উপাধি।

১৯৪৭-এ ভারত ভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির প্রাথমিক পর্যায়ে শেখ মুজিব ছিলেন ছাত্রনেতা। বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে ধীরে ধীরে তিনি সামনে আসতে থাকেন। তুখোড় বক্তৃতা প্রদানের এক অনন্যসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন শেখ মুজিব। মুসলমানরা ভাই-ভাই, এ কথার ওপর মুহম্মদ আলী জিন্নাহ যে প্রক্রিয়ায় ভারতকে ১৯৪৭ সালে দ্বিখণ্ডিত করে বাংলাদেশকে সাথে নিয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিল, সেটা ভুল ছিল কি না–তা এ নিবন্ধের উপজীব্য নয়। পৃথক দুটি ভূখণ্ড এবং আলাদা সংস্কৃতি ও ভাষার মানুষের একটি শাসনতন্ত্রের অধীনে নিয়ে আসাটা যে ভুল, তা প্রমাণ করার জন্য এক সাগর রক্তের মূল্য দিতে হয়েছিল বাঙালিদের। যদি ভুল না হবে তবে মুসলমানদের মধ্যে বাঙালি অংশ আবার নিজেদের স্বাধীনতার জন্য ১৯৭১ সালে কেন যুদ্ধ করল? স্বাধীনতার জন্য এত রক্তপাত আর কোনো জাতিকে দিতে হয়নি। বাংলাদেশের প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের মানুষদের মনস্তত্ত্বকে ১৯৭১ সালের ঘটনা তাপদগ্ধ ও অসাড় করে দিয়েছে।

ভারত থেকে যখন পাকিস্তান ভাগ হয় তখন হিন্দু-মুসলিম বিষয়টি বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দেয়। সেখানেই ছিল বিশাল একটি গলদ। কেননা শুধু ধর্মের ভিত্তিতে বিবেচনা করে দুটো





পৃথক ভূখণ্ডকে এক করা যায় না, যদি না তাদের মধ্যে ভাষা ও সংস্কৃতিগত মিল থাকে। 'মুসলিমরা একটি আলাদা জাতি'–এ রকম একটি অতি বিতর্কিত তত্ত্বই যদি পাকিস্তানকে সৃষ্টি করে থাকে, তাহলে কী করে সেই মুসলিম জাতির আরেকটি অংশ (বাংলাদেশ) আবার সেই জাতিকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে, ভয়ঙ্কর হিংসাত্মক অভিজ্ঞতা আর অগণিত মানুষের অবর্ণনীয় যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে পৃথক হয়ে গেল। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশকে কেন পৃথক হওয়ার জন্য রক্ত ঝরাতে হলো? আজ পরিবর্তিত বাস্তবতায় বিষয়টি নিয়ে আমাদের শুধু বিশদ চিন্তাভাবনা করলেই হবে না, বরং তা গবেষণারও দাবিদার।

জনগণের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শেখ মুজিব ছয় দফা স্বায়ত্তশাসন পরিকল্পনা প্রস্তাব করেন। এসব দাবির মধ্যে প্রধান ছিল বর্ধিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, যার কারণে তিনি আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের অন্যতম বিরোধী পক্ষে পরিণত হন। ১৯৬৮ সালের প্রথম দিকে পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিব এবং আরও ৩৪ জন বাঙালি সামরিক ও সিএসপি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে, যা ইতিহাসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হিসেবে পরিচিত। বিচার চলাকালে ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসের ৫ তারিখে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ পরিষদ তাদের ১১ দফা দাবি পেশ করে, যার মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা দাবির সব কটি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ছাত্রদের এ আন্দোলনটি এক সময় গণআন্দোলনের আকার ধারণ করে, যা ইতিহাসে '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত। অবশেষে পাকিস্তানিরা মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক জনসভায় মুজিব ঘোষণা করেন যে, এখন থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে 'বাংলাদেশ' নামে অভিহিত করা হবে। তার ভাষায়–"একটা সময় ছিল যখন এই মাটি আর মানচিত্র থেকে 'বাংলা' শব্দটি মুছে ফেলার সব ধরনের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। 'বাংলা' শব্দটির অস্তিত্ব শুধু বঙ্গোপসাগর ছাড়া আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যেত না। আমি আজ ঘোষণা করছি যে, এখন থেকে এই দেশকে 'পূর্ব পাকিস্তানের' বদলে 'বাংলাদেশ' ডাকা হবে।" শেখ মুজিবের এই ঘোষণার ফলে সারাদেশে গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদ এবং সামরিক কর্তারা তাকে একজন বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করেন। মুজিবের বাঙালি সংস্কৃতি ও জাতিগত আত্মপরিচয়ের বহিঃপ্রকাশ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করে। অনেক বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিত্বের মতে, বাঙালিদের আন্দোলন দ্বিজাতিতত্ত্বকে অস্বীকার করার নামান্তর। এই দ্বিজাতিতত্ত্বের মাধ্যমেই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি। বাঙালিদের জাতিগত ও সংস্কৃতিগত এই আত্মপরিচয় তাদের একটি আলাদা জাতিসত্তা প্রদান করে। শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক জনমত গড়ে তুলতে সমর্থ হন এবং কার্যত ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম প্রভাবশালী একজন বিশ্বনেতা হিসেবে আবির্ভূত হন।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক আইনসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পূর্ব পাকিস্তানের কোটার ২টি আসন ছাড়া বাকি সব ক'টিতে জয়ী হওয়ার জন্য জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাও অর্জন করে আওয়ামী লীগ।

নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে মেরুকরণ সৃষ্টি করে। পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো শেখ মুজিবের স্বায়ত্তশাসনের নীতির প্রবল বিরোধিতা করে। ভুট্টো অ্যাসেম্বলি বয়কট করার হুমকি দিয়ে ঘোষণা দেন যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবকে সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানালে তিনি সে সরকারকে মেনে নেবেন না।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ শেখ মুজিব স্বাধীনতার ডাক দেন এবং জনগণকে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করেন। ইয়াহিয়া খান সামরিক আইন জারি করে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং মুজিবসহ আওয়ামী লীগের অন্য নেতাদের গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেন। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী রাজনৈতিক ও জনসাধারণের অসন্তোষ দমনে ২৫ মার্চ অপারেশন সার্চলাইট শুরু করে। সামরিক বাহিনীর অভিযান শুরু হলে শেখ মুজিব ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদানের কারণে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। কলকাতায় তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে প্রবাসে বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়। ৯ মাস যুদ্ধ শেষে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনী যৌথ দলের কাছে আত্মসমর্পণ করে। আওয়ামী লীগ নেতারা ঢাকায় ফিরে সরকার গঠন করেন। পাকিস্তানি শাসকরা মুজিবকে ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি মুক্ত করে দেন। তিনি লন্ডন হয়ে নতুন দিল্লিতে এবং সেখান থেকে ১৯৭২ সালরে ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশে ফেরেন।

তারই অভিপ্রায়ক্রমে ১৭ মার্চ ১৯৭২ সালে ভারতীয় বাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের ভূখণ্ড ত্যাগ করে। শেখ মুজিব তার অন্তর্বর্তী সংসদকে একটি নতুন সংবিধান রচনার দায়িত্ব দেন এবং চারটি মূলনীতি হিসেবে 'জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র' ঘোষণা করেন, যা মুজিববাদ নামেও পরিচিত। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে নতুন সংবিধান কার্যকর হয়। ১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে শেখ মুজিব ও তার দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং তিনি বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচিত সরকার গঠন করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, খাদ্য, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি ঘটান।

বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন একটি বৈষম্যমুক্ত দেশ, যেখানে সকলেই সমান অধিকার নিয়ে বাঁচার সুযোগ পাবে। আমাদের নিজেদের দুর্বলতা ও নাজুক অবস্থাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়ার অবকাশ নেই। নতুন করে আর বিশেষ কিছু বলারও নেই কারো। শুধু একটি বিষয় প্রতিবার সামনে আসে–স্বাধীনতা আমাদের কী দিল? কোটি কোটি মানুষের নিরবচ্ছিন্ন কষ্ট আর যন্ত্রণা, একটি স্থায়ী অভিশাপ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তো এমন স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেননি। তবে মনে রাখতে হবে, এ যন্ত্রণা একান্তভাবেই আমাদের ব্যক্তিগত, আমাদেরই কাঁধে বহন করার ক্রুশ।

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ জন্মের মহিমা ও একটি অস্থিতিশীল পরিবেশকে ভারসাম্যপূর্ণ করার চেষ্টা করতে না করতেই নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তার জাতক দেশটি কিছুকাল অভিভাবকহীন ছিল এ কথা সত্য, কিন্তু বর্তমানে তারই কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে দ্রুতই সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। সেদিক বিচারে বলা যায়





বঙ্গবন্ধুর সংগ্রাম বৃথা যায়নি। বাংলাদেশের জন্য তিনি যে স্বাধীনতা নিয়ে এসেছেন, যে লাল-সবুজের পতাকা নিয়ে এসেছেন, তা থাকবেই।

অন্যদিকে পাকিস্তান প্রমাণ করেছে মুসলিমদের স্বতন্ত্র জাতীয়তার তত্ত্বটি দেউলিয়াপনা ছাড়া আর কিছু নয়। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তা সেখানে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের তত্ত্বকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। কাজেই শেখ মুজিব বাংলাদেশের জন্য যে স্বাধীনতা অর্জন করেছেন, সেই স্বাধীনতা ধীরে ধীরে অর্থবহ হয়ে উঠছে এবং বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে বিশ্বে দাঁড়াবেই।

## বাঙালির অভিসংবাদিত নেতা

বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে ইতিমধ্যে শত শত নিবন্ধ, প্রবন্ধ ও বই প্রকাশিত হয়েছে, এখনো হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে। মাত্র ৫৫ বছরের স্বল্পতম জীবনকালে একজন সাধারণ রাজনৈতিক কর্মী থেকে একেবারে রাষ্ট্রনায়কে উন্নীত হওয়ার ঘটনা সমসাময়িক ইতিহাসে বিরল। ইতিহাসে অনেক সফল রাজনৈতিক নেতা, সফল রাষ্ট্রপ্রধান ও রাষ্ট্রনায়কের উদাহরণ রয়েছে। তবে একজন রাষ্ট্রনায়কের যেসব বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি থাকে, তার সব দিকের পরিস্ফুটন ও বহিঃপ্রকাশ সাধারণত সবার ক্ষেত্রে দেখা যায় না এবং সে সুযোগ সবার জন্য আসেও না। বিশেষ করে সমর-দর্শনের দিকটা বেশির ভাগের ক্ষেত্রেই থেকে যায় প্রায় সুপ্ত। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আলেখ্য ছিল সাধারণের চেয়ে ভিন্ন। দীর্ঘ সংগ্রাম, তারপর সশস্ত্র যুদ্ধ ও যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ থেকে দেশকে গড়ে তোলার সব দর্শন ও প্রজ্ঞার পরিস্ফুটনই ঘটেছে বঙ্গবন্ধুর জীবনে। আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে এমন একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে যা কিছু সামরিক বা সমর ও যুদ্ধসম্পর্কীয় তার সব কিছু বুঝি শুধু সামরিক বা সেনানায়কদের কর্মক্ষেত্র (domain)। কিন্তু বাস্তবতা ও আধুনিক যুদ্ধের যে ইতিহাস তাতে দেখা যায়, একটি জাতির সমর দর্শন ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কতখানি সফল ও বিফল তা পূরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল সে দেশের রাষ্ট্রনায়কদের দূরদৃষ্টির ওপর। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে যুদ্ধ হচ্ছে, More of Art than profession। বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির জন্ম হয়েছে ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী গণযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। এই রাষ্ট্রের স্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রাম, তাঁর চিন্তাচেতনা, আদর্শ, দর্শন ও দিকনির্দেশনা একাত্তরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের জন্য সমগ্র জাতিকে প্রস্তুত করেছে, যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে এবং সেই যুদ্ধে অভাবনীয় বিজয় অর্জিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর সমগ্র কর্মজীবন ঘিরে আমরা যে সমর দর্শন ও প্রতিরক্ষা চিন্তার পরিচয় পাই তাকে প্রধানত তিনটি ধাপ বা স্তরে বিশ্লেষণ করা যায়। প্রথম ধাপটি একাত্তরপূর্ব, বিশেষ করে ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধোত্তর তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের ভূরাজনৈতিক নিরাপত্তা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাবনা। দ্বিতীয়ত, ৯ মাসের স্বাধীনতা যুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর সমর কৌশল, যেটির বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পাই তাঁর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের ভেতর। আর তৃতীয়টি, স্বাধীনতা-উত্তর সদ্য স্বাধীন একটি দেশের ভূরাজনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে

বঙ্গবন্ধুর প্রতিরক্ষাবিষয়ক চিন্তাচেতনা ও তার প্রতিফলন। তিনটি পর্বের পৃথক আলোচনা নিচে তুলে ধরছি।

**শেখ মুজিবুর রহমানই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক**

বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি হিসেবে বাঙালি জাতি যাকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে তিনি হলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্ব, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতার জন্যে তিনি জাতিকে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র উপহার দিতে পেরেছেন। আজ যারা ইতিহাসকে বিকৃত করছেন এবং সেই সাথে অপর একজনকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে দাঁড় করাতে চান তাঁরা ইতিহাসের আঁস্তাকুড়েই নিমজ্জিত হবেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা রাতারাতি আসেনি এবং কোনো এক সেপাই বাঁশিতে ফুঁ দিলেই স্বাধীনতা আসে না। একজন লোক মাইক্রোফোন হাতে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন। সাথে সাথে মানুষ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অবশেষে দেশ স্বাধীন হয়ে গেল। ইতিহাস তা বলে না। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পেছনে রয়েছে দীর্ঘ ২৩ বছরের এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ইতিহাস। ১৯৪৭ সাল হতে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘ সংগ্রাম, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সর্বোপরি বাংলার জনগণের সংগ্রামী প্রচেষ্টার ফলই হলো আমাদের এই স্বাধীনতা। ১৯৪৮ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কারাগারে থেকে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনে সমর্থন, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রদত্ত ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন ও তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সর্বোপরি ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ। এই পরিক্রম গুলিই এ দেশের স্বাধীনতার বিভিন্ন পর্যায়। বলাবাহুল্য, আমি ছাত্র জীবনে ছাত্রলীগের সাথে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছি বিভিন্ন আন্দোলনে। অধ্যাপনা জীবনেও ছাত্রলীগের নেতাদের সাথে যোগাযোগ রেখে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছি এবং ওকালতি জীবনে ১৯৭৪ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত কক্সবাজার জেলা আওয়ামী লীগের (রাজনৈতিক) শ্রম সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়ে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর দল আওয়ামী লীগও বঙ্গবন্ধুকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধুর অনেক জানি দুষমনও স্বীকার করেন যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবই বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি। তাই আজ এই প্রবন্ধে কিছু মহৎ লোকের উদ্ধৃত্তি দিতে চাই যারা বঙ্গবন্ধুকে পছন্দ করেন না নানা কারণে। প্রথম উদ্ধৃত্তি; প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাংবাদিক অ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাস এর দ্য রেইপ অফ বাংলাদেশ গ্রন্থ থেকে এই বইতে বিভিন্ন স্থানে বঙ্গবন্ধুর সমালোচনা করা হয়েছে। এই বইয়ের এক জায়গায় ম্যাসকারেনহাস লিখেছেন 'পাঞ্জাবি রাজনীতিবিদদের শঠতায় অতিষ্ঠ হয়ে আওয়ামী লীগ ফিরোজ খান নুনের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করেন এবং ভিন্নপথে চলার সিদ্ধান্ত নেন। শেখ মুজিব সেদিন অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বলেন আমাদের স্বাধীনতা পেতেই হবে। আমাদের নিজেদের সেনাবাহিনী নৌবাহিনীও থাকতে হবে। আমি অবশ্যই এই সব দেখবো।' বঙ্গবন্ধু যখন ম্যাসকারেনহাসের নিকট এই উক্তি করেন তখন সময় কাল ১৯৫৮ সাল। এতে দেখা যায় বঙ্গবন্ধু ১৯৫৮ সালে আয়ুব খানের সামরিক শাসনের সময় বাংলাদেশকে স্বাধীন করার





জন্য দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন শেখ সাহেব। এতে অন্য কাউকেও যুদ্ধে পাওয়া যায় না বঙ্গবন্ধু ছাড়া।

দ্বিতীয় উদ্ধৃতি : এটি হচ্ছে পাকিস্তানের সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মুহাম্মদ ইয়াহিয়া খাঁন থেকে। জনাব ইয়াহিয়া ২৬ মার্চ ১৯৭১ সালে রাত ৮.৩০ মি. এর সময় জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণ দেন। ঐ ভাষণে প্রেডিডেন্ট ইয়াহিয়া ঘোষণা করেন শেখ মুজিব ও তাঁর দল আওয়ামী লীগ, পাকিস্তানের শত্রু। তারা পূর্ব পাকিস্তানকে সার্বিকভাবে পাকিস্তান থেকে পৃথক করতে চায় এবং তাকে (শেখ মুজিবকে) এর শাস্তি পেতেই হবে। (মূল ভাষণের ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ পরে সংযুক্ত) ইয়াহিয়া খাঁনের ভাষণে বলা–সার্বিকভাবে পৃথক করা কি স্বাধীনতা নয়? কিন্তু কি বলেন বিরোধীরা?

তৃতীয় উদ্ধৃতি : ১৯৭১ সালের নর হত্যার জল্লাদ বেলুচিস্তানের কসাই বলে খ্যাত জেনারেল টিক্কা খাঁন থেকে। টিক্কা খাঁন প্রায় দু'দশক পর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন : (বঙ্গানুবাদ) মুজিব ২৩ মার্চ '৭১ ও ২৬ মার্চ '৭১ সকল বাঙালি সেনা অফিসারের কাছে বার্তা পাঠিয়েছিলেন বিদ্রোহ করার জন্য। তারা প্রথমে জয়দেবপুরে ও পরে চট্টগ্রামে বিদ্রোহ করেন।

ইংরেজি : Mujib had sent massage to all the Bengali army officers on 23rd March 71 and later on 26th March to revolt they revolted first at Joydebpur later in Chittagong.

টিক্কা খান এই কথাগুলো বলেছিলেন নিউজ ডে পত্রিকায় সম্পাদক এবিএম মূসাকে ঘটনার প্রায় দু'দশক পরে। জেনালের এমএজি ওসমানি প্রধান সেনাপতি ছিলেন, মুক্তিযুদ্ধ করেছেন। তারই কমান্ডে জিয়া যুদ্ধ করেছেন। ১৯৮০ সালে লন্ডনের সানরাইস পত্রিকায় নভেম্বর ডিসেম্বর সংখ্যায় এক সাক্ষাৎকারে ওসমানী বলেন ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। প্রসঙ্গত, জেনারেল ওসমানি যখন এই সাক্ষাৎকার দেন তখন বঙ্গবন্ধু জীবিত ছিলেন না এবং আওয়ামী লীগের সাথে তাঁর সকল সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন। বরং বঙ্গবন্ধু হত্যাকারী খোন্দকার মোশতাকের সামরিক উপদেষ্টা হিসেবে কিছুদিন দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

চতুর্থ উদ্ধৃতি : এই উদ্ধৃতি হচ্ছে বিএনপির একজন সাবেক মন্ত্রী ও উচ্চতরের নেতা জনাব মওদুদ আহমদের। পরবর্তীতে তিনি এরশাদের উপরাষ্ট্রপতির দায়িত্বও পালন করেছিলেন। ব্যারিস্টার মওদুদ সাহেব তাঁর রচিত *Era of Sheik Mujibur Rahaman* গ্রন্থে এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন বঙ্গানুবাদ : মুজিব আমাদের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ও তার মৃত্যুতেই তিনি নিঃশেষিত নন। বাংলাদেশের রাজনীতিতে তিনি বিরাজ করবেন কিংবদন্তির মতো। বাংলাদেশের ইতিহাসে আরও চতুর ও দক্ষ নেতা থাকতে পারেন কিন্তু তাদের অবদান শেখ মুজিবের মতো এতো বেশি নয়। তিনি ছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতীক যা আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌম পরিচিতির সূত্রপাত ঘটায়। বাংলাদেশ নামে যে একটি রাষ্ট্র রয়েছে তা মুজিবের জন্য আমাদের যুগে-যুগে কিংবদন্তির মর্যাদার সাক্ষ্য বহন করবে।

স্বাধীনতা একদিনে আসে না। তার জন্য দীর্ঘ প্রস্তুতির প্রয়োজন, সুদীর্ঘ সংগ্রাম সীমাহীন আত্মত্যাগের। বেতার ঘোষণা পাঠ সেটা ও আগে নয় এবং তাও একজন নেতার

নামে যৎ সামান্য লোকের মাঝে একটি অঞ্চল থেকে অর্থাৎ চট্টগ্রাম অঞ্চলে। ব্যাপারটা যদি এতই সহজ হতো তা হলো ১৯৮১ সালের ৩০ মে মেজর জেনারেল মঞ্জুর অভ্যুত্থান ব্যর্থ হতো না। জেনারেল মঞ্জুর ও চট্টগ্রাম বেতারে ঘোষণা দিয়েছিলেন, বিদ্রোহ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত পালিয়ে গিয়েও বাঁচতে পারেননি জেনারেল মঞ্জুর সাহেব, নিহত হয়েছিলেন তিনি।

অপরদিকে বিশ্বাসঘাতক খোন্দকার মোশতাক ৮৩ দিন ক্ষমতায় ছিলেন বঙ্গবন্ধুকে নৃশংসভাবে সপরিবারে হত্যা করে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। মাত্র ৮৩ দিনের মাথায় বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের পোটলা পুটলি নিয়ে প্রাণ নিয়ে বিদেশে পালাতে হতোনা। ঢাকা বেতার মোশতাকের দখলে ছিল। তারাও হরহামেশা ঘোষণা দিত। আরও যদি একটু পিছনের ইতিহাস পড়ি তাহলে দেখতে পারেন এবং প্রমাণ মিলবে। যেমন যদি একটি প্রতিরোধের ঘোষণাই যদি যথেষ্ট হতো তাহলে ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ন নন, সার্জেন্ট সুহার্তুই হতেন দেশের স্থপত্তি, জাতির জনক। চীনে মাও সেতুং নন মার্শালচুতেই হতেন গণচীনের প্রতিষ্ঠাতা। তা যদি হতো তাহলে ভারতবর্ষকে দুশ' বছর, ভিয়েতনামের জনগণকে কয়েকশত বছর লাগাতার সংগ্রাম করতে হতো না। স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন গণসচেতনতা, ব্যাপক জনগোষ্ঠীর ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস, রাজনৈতিক নেতৃত্ব এভাবে ধাপে ধাপে জনগণকে একটি দেশ ও জাতিকে স্বাধীনতার প্লাটফর্ম তৈরি করতে হয় এবং ধীরে ধীরে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে নিতে হয়। এই ভাবেই ভারতবর্ষকে স্বাধীন করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী। মালয়েশিয়ায় ছিলেন টুংকু আবদুর রহমান আর এভাবেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাঙালি জাতিকে ধাপে ধাপে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যান এবং বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাই তিনিই বাঙালির জাতির জনক।

স্বাধীনতার কথা মনে রেখে বঙ্গবন্ধু সকল আন্দোলনের এগিয়ে নিতে থাকেন। এই লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালে লাহোরে সর্বদলীয় বৈঠকে বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবিনামা পেশ করেন। এই ৬ দফায় ২টি দফা ছিল দেশকে পৃথক করার জন্য। যেমন দেশের দুই অঞ্চল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান দুই রকমের কারেন্সি, দুইটি প্যারা মিলিটারি বাহিনী। একই দেশে দুইটি কারেন্সি। আঁতকে উঠলেন পাকিস্তানি শাসকচক্র। এ তো পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা মেনে নেওয়ার শামিল। একদিন বঙ্গবন্ধু অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ (ন্যাপ নেতা) ও সিএসপি অফিসার রুহুল কুদ্দুস সাহেবকে বলেই ফেলছেন আসলে এটি ৬ দফা নয় এটি এক দফা স্বাধীনতা, একটু ঘুরিয়ে বললাম শুধু। অবশেষে ৬৯-এর গণআন্দোলনের মুখে আয়ুব খাঁন ক্ষমতা ত্যাগ করলেন। দৃশ্যে আসলেন জেনারেল আগামোহাম্মদ ইয়াহিয়া খাঁন। তিনি এসে কড়া সামরিক শাসন জারি করলেন এবং ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে নির্বাচন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। বঙ্গবন্ধু মেনে নিলেন। কারণ তার স্থির বিশ্বাস ছিল যে নির্বাচন হলে বাংলার জনগণ ৬ দফাকে ম্যান্ডেট হিসেবে ধরে নিয়ে ভোট প্রদান করবেন। ১৯৭০ সালের ৫ ডিসেম্বর তাঁর নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মাজার প্রাঙ্গণে ঘোষণা দিলেন আজ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের নাম হবে বাংলাদেশ। সেই যাই হোক ভালোয় ভালোয় জাতীয় নির্বাচন হয়ে গেল। যেমনটি বঙ্গবন্ধু আশা করেছিলেন তার চেয়েও বেশি আসনে বঙ্গবন্ধুর ৬ দফার পক্ষে ভোট প্রদান করলো বাংলার জনগণ।





জাতীয় পরিষদের ১৬৯ আসনের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ পেল ১৬৭টি আসন যাহা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। বঙ্গবন্ধু হলেন পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী, জেনারেল ইয়াহিয়া বলে গেলেন। ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বিরাট জনসভায় বঙ্গবন্ধু জাতীয় পরিষদের তাঁর দলের নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে তিনি ঘোষণা করলেন। ৬ দফা এখন তাঁর একা নয়, ৬ দফা এখন জনগণের সম্পদ।

পাকিস্তানি শাসকেরা শত পরতের ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করলো। বঙ্গবন্ধুকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার জন্য ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ১ মার্চ ১৯৭১ইং হঠাৎ করে ৩ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলো এক বেতার বার্তার মাধ্যমে। পূর্ব বাংলায় দাউ দাউ করে জনগণ জ্বলে উঠলো। তাহা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লো সারা দেশে। তিনি জনগণকে চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য তৈরি থাকতে বললেন। তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এগোতে লাগলেন। ৩ মার্চ ১৯৭১ পল্টনে ছাত্রলীগ আহূত এক বিরাট জনসভায় তিনি বললেন, আমাদের জনসাধারণ দীর্ঘস্থায়ী এক মুক্তি লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। তারা দেশের স্বাধীন মানুষ হতেও প্রস্তুত, তারা স্বাধীনতার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে উক্ত ছাত্র সভায় স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করা হয়। স্বাধীনতার পতাকাও আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তোলন করা হয।

অবশেষে ৭ মার্চ এল ১৯৭১-এ এই জনসভায় লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণের এক পর্যায়ে বললেন– এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণেই বঙ্গবন্ধু বাংলা দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। আর কোনো বা কেউ ঘোষণা না দিলেও ৭ মার্চের ভাষণে একটি দেশের স্বাধীনতার কথা পাওয়া যায় ওই ভাষণের প্রতিটি লাইনে। যেমন ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। যার যা কিছু আছে তাই দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে ইত্যাদি।

অতঃপর জেনারেল ইয়াহিয়া ঢাকায় আলোচনার জন্য আসলেন। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর দলীয় নেতাদের সাথে আলোচনার বাহানা করে সৈন্য সমাবেশ ঘটাতে লাগলেন। অবশেষে আলোচনা ভেঙে গেল। ইয়াহিয়া খাঁন বেশুমার বাঙালি হত্যার অর্ডার গিয়ে ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় বিশেষ বিমানে গোপনে ঢাকা ত্যাগ করলেন। পাক হানাদার বাহিনী বাঙালিদের হত্যার নীলনকশা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের জন্য যখন প্রস্তুতি চলছে তা বুঝতে পেরে তিনি ২৫ মার্চের শেষ এবং ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। এর পর পর বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে ক্যান্টনমেন্ট নিয়ে যায় পাক সেনারা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কীভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন তার একটি বিবরণ পাওয়া যায় হাজী গোলাম মুর্শেদ নামক এক ব্যক্তির জবানীতে। তিনি বঙ্গবন্ধুর একজন ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতারের মুহূর্ত পর্যন্ত তার সাথে ছিলেন। তাকেও গ্রেফতার করে হানাদার বাহিনী বঙ্গবন্ধুর সাথে সেনানিবাসে নিয়ে যায় এবং নির্যাতন চালায়। এই হাজী মুর্শেদ জানান, ২৫ মার্চ '৭১ সাল রাত বারটা পার হয়ে গেলে অর্থাৎ ২৬ মার্চ ৭১-এর প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুর সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফের এক বন্ধুর মাধ্যমে স্বাধীনতার

ঘোষণা ইথার তরঙ্গে ছেড়ে দেন। এর পরপর বঙ্গবন্ধুর টেলিফোন বেজে উঠে। মোর্শেদ সাহেব টেলিফোন ধরেন। অপরপ্রান্ত হতে বলা হয় বঙ্গবন্ধুর দেয়া স্বাধীনতার ঘোষণা বাণী যথারীতি ছেড়ে দেয়া হয়েছে তরঙ্গে। এখন বেতার সেট নিয়ে কি করবেন উক্ত বন্ধু তা বঙ্গবন্ধুর কাছে জানতে চান। মোর্শেদ সাহেব এই কথা বঙ্গবন্ধুকে জানালে তিনি টেলিফোনকারীকে বেতার সেট নষ্ট করে দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। এর কিছুক্ষণ পর বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হন। সে রাতেই বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার বাণী চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি জহুর আহমদ চৌধুরীর কাছে পৌঁছে। তিনি উক্ত বাণী সাইক্লোস্টাইল কপি করে বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করেন। বেতারে এই ঘোষণাই ২৬ মার্চে তিনবার পাঠ করেন আওয়ামী লীগের অপর নেতা এমএ হান্নান।

বঙ্গবন্ধুর প্রথম আনুষ্ঠানিক ঘোষণা যাহা ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বার্তাটি ইপিআরের ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে সারা দেশে প্রচারিত হয়। ঘোষণাটি ইংরেজিতে : This may be my last Message. From to day Bangladesh is Independent, I call upon the people of Bangladesh to resist the Army of ocutition until final victory is achieved. Joy Bangla.

বাংলা অনুবাদ : এটাই সম্ভবত আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। আপনাদের যা কিছু আছে তাই দিয়ে যে যেভাবে পারেন। শেষ পর্যন্ত দখলদার বাহিনীকে প্রতিহত করতে আমি বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর শেষ সৈন্যটি বাংলাদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত না হওয়া পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আপনাদের লড়াই অবশ্যই চলতে থাকবে। জয় আমাদের সু-নিশ্চিত, জয় বাংলা।

লন্ডন থেকে প্রকাশিত The time, the daily teligraph, the guardian এবং সর্বোপরি ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং সেন্টারের মাধ্যমে ২৬ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা সমগ্র পৃথিবীর মানুষের আছে অবহিত করা হলো। এভাবে চট্টগ্রাম থেকে ২৬ মার্চ বিকেলে ২৭ মার্চ '৭১ সকালে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ হান্নান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে পর পর তিনবার স্বাধীনতা ঘোষণাটি বেতারে পাঠ করেন। তিনি মাইক যোগেও শহর এলাকায় বার বার প্রচার করার ব্যবস্থা করেন।

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ : পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিতে পিলখানার ইপিআর ঘাঁটি, রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করেছে। শহরের লোকদের হত্যা করছে। ঢাকা চট্টগ্রামের রাস্তায়-রাস্তায় যুদ্ধ চলছে। আমি বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন করছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমি মুক্ত করার জন্য শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনসারদের কাছে সাহায্য চান। কোনো আপস নাই, জয় আমাদের হবেই। আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রুকে বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামী লীগ নেতা, কর্মী এবং অন্যান্য





দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতা প্রিয় লোকদের এই সংবাদ পৌঁছিয়ে দিন। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা।

শেখ মুজিবুর রহমান।

রেকর্ডপত্র বিশ্লেষণ করে আরো দেখা যায় বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা সম্বলিত যে মেসেজটি তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা ও পরে মন্ত্রী চট্টগ্রামের জহুর চৌধুরীকে পাঠিয়েছিলেন, তা-ই অপর আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান হুবহু চট্টগ্রাম বেতার থেকে ঘোষণা করেছিলেন। যে দিন অর্থাৎ ২৬ মার্চ এটি প্রচারিত হয় সেদিনও মেজর জিয়ার কোনো উল্লেখ নাই। ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ সাল মুজিব নগরে স্বাধীনতার সনদ ঘোষণাপত্র দেয়া হয়।

আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘোষণা হচ্ছে–বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই ঘোষণাপত্রে কোথাও মেজর জিয়ার কোনো উল্লেখ নাই। পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে মুজিবনগরের ভিত্তি হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর ২৬ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণা। এর ওপর ভিত্তি করেই প্রবাসী সরকার মুজিব নগরে স্বাধীনতা ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করে শপথ গ্রহণ করে। তথ্য প্রমাণাদি সহকারে আমরা দেখতে পাই বঙ্গবন্ধুই ২৬ মার্চ ৭১ সালে সর্বপ্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা করেন আর কেউই নয়, তৎকালীন মেজর জিয়া সম্পর্কিত বিতর্ক ইতিহাস বিকৃতি মাত্র। মেজর জিয়া জীবিতকালে কখনো নিজেকে স্বাধীনতার ঘোষক দাবি করেননি। তাঁর পক্ষেও তাঁর জীবিতকালে কেউ তাঁকে স্বাধীনতার প্রথম ঘোষক দাবি করেননি। কিন্তু তার মৃত্যুর পর তার অনুসারীরা তাকে স্বাধীনতার একক ঘোষক সাজিয়ে সুমহান মুক্তিযুদ্ধের পবিত্র ইতিহাস বিকৃতির লাগাতার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা বুঝতে পারছে না এতে জিয়ার মতো বীরোত্তম খেতাবপ্রাপ্ত নেতা তথা মুক্তিযোদ্ধারই অবমাননা হচ্ছে। তিনি এখন মৃত। কোনো মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে কটূক্তি বিতর্কই কোনো শাস্ত্রমতেই উচিত নহে। ইসলামে এ ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

## ২৫ মার্চ তৎকালীন মেজর জিয়ার ভূমিকা

বলতে গেলে স্বাধীনতা আন্দোলনে চট্টগ্রাম দেশের দ্বিতীয় সংগ্রামী নগরী। ২৫ মার্চ মধ্য রাতে জিয়া তাঁর কমান্ডিং অফিসার জানজুয়ার নির্দেশে চট্টগ্রাম বন্দরে এমভি সোয়াত জাহাজ হতে অস্ত্র খালাস করতে যাচ্ছিলেন। বস্তুত পাকিস্তানি অফিসার জানজুয়া এইখানে তার বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। কারণ সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাসের বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। কারণ কোনো বাঙালি শ্রমিক অস্ত্র খালাসে রাজি হননি, বরং প্রচণ্ড প্রতিরোধ সৃষ্টি এবং রাস্তায় ঘনঘন ব্যারিকেড দিয়ে যান চলাচলের বাধা সৃষ্টি করেন। এই জন্যই মেজর জিয়ার মতো একজন সিনিয়র বাঙালি অফিসারকে এ সময় অস্ত্র খালাস করতে নির্দেশ দেন। বাঙালিদের পথে পথে আশ্বস্থ করে মেজর জিয়া ব্যারিকেড সরাতে রাজিও করান। ঠিক ওই সময় ছাত্রলীগ নেতা এস এম ইউসুফ সেখানে উপস্থিত হয়ে মেজর জিয়াকে চট্টগ্রামের অবস্থা অবহিত করান। তখন তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান

তাকে বহনকারী ট্রাকটি চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে ফেরত নিতে নির্দেশ দেন। কারণ মেজর রফিকুল উল ইসলামের অধীন বাঙালি ইপিআর সদস্যরা ২৪ মার্চ '৭১ চট্টগ্রামে বিদ্রোহ করে জনগণের সহায়তায় প্রায় সমগ্র চট্টগ্রাম শহর তার দখলে নিয়ে নেন। মেজর রফিক ১৯৭২ সালে প্রকাশিত 'লক্ষপ্রাণের বিনিময়ে' তার গ্রন্থে অনেক অজানা কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে ২৫ মার্চ '৭১ সাল ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান আগ্রাবাদ রোডে পৌঁছে জিয়াকে পেয়ে যান এবং তাকে জানান চট্টগ্রামে মেজর রফিক এবং অন্যান্য বাঙালি সৈন্যরা অস্ত্রহাতে নিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। এতে মেজর জিয়াও রাজি হয়ে বলেন–We Revolt আমরা বিদ্রোহ করলাম। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটি বেতারে পাঠের প্রেক্ষাপট–

বঙ্গবন্ধুই স্বাধীনতা ঘোষণার প্রধান ব্যক্তি। জিয়া বিদ্রোহ করে তার দলবল নিয়ে পটিয়ার দিকে চলে যান। মেজর রফিক চট্টগ্রাম বেতার ভবন, রেলওয়ে অফিস ইত্যাদি দখল করে নেন। চট্টগ্রাম বেতারের দশজন কর্মী আওয়ামী লীগ দলীয় নেতৃবৃন্দ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের সহায়তায় স্বাধীনবাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন চট্টগ্রাম কালুর ঘাট এলাকায়। দিনটি ছিল ২৬ মার্চ ১৯৭১ সাল। প্রথম অধিবেশন বসে দুপুরের দিকে। এই অধিবেশন খুবই স্বল্প স্থায়ী। এই প্রথম অধিবেশনেই চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার বাণী বেতারে পাঠ করেন। ২৬ মার্চ দুপুর ২.১০ মিনিটে তিনি পুনরায় বঙ্গবন্ধুর শেষ স্বাধীনতার ঘোষণা বাণীটি দ্বিতীয়বার বেতারে পাঠ করেন। একই দিন সন্ধ্যা ৭.৪০ মিনিটে হান্নান সাহেব তৃতীয়বারের মতো স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে এম এ হান্নান সাহেব বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। অর্থাৎ মেজর জিয়াউর রহমানের পূর্বে আওয়ামী লীগের তৎকালীন নেতা এম এ হান্নান একবার নয় তিন-তিনবার বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন এটিই সঠিক ইতিহাস। আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার বাণীটি তিন তিনবার পাঠ করার পর স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ, গণ্যমান্য নাগরিকবৃন্দ পাকবাহিনীর প্রতিরোধকারীরা সলাপরামর্শ করে সাব্যস্ত করেন যে, সেনাবাহিনীর একজন বাঙালি অফিসারকে দিয়ে বেতারে স্বাধীনতা ও বিদ্রোহের কথা প্রচার করলে প্রতিরোধ প্রবলতর হবে জনগণ সাহসী হবেন এবং মুক্তিযুদ্ধ তীব্রতর হবে। এই চিন্তা করে ২৭ মার্চ তারা পটিয়াই অবস্থানরত মেজর জিয়াকে বেছে নিলেন সিনিয়র বাঙালি সেনা অফিসার হিসেবে এবং কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে নিয়ে আসেন। তারা জিয়ার বেতারে পাঠ করার জন্য একটি খসড়াও তৈরি করেন। তাহলো–I, Major Zia on behalf of our great leader Banghabandhu Sheik Mujibar Rahaman do hereby declare the independence of Bangladesh…. khuda Hafey, Joy Bangla.

অর্থাৎ আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে আমি মেজর জিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। খোদা হাফেজ, জয় বাংলা।

প্রিয় পাঠকগণ এটাই সঠিক ইতিহাস। মেজর জিয়া নিজেই তাঁর রচিত একটি প্রবন্ধ যার শিরোনাম একটি জাতির জন্ম যা সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন বিচিত্রায় ছাপানো হয় যেখানে জিয়া স্বীকার করেন–৭ মার্চ '৭১ সাল বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের যা রেসকোর্স ময়দানে





প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক ঘোষণা এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল, যার যা কিছু আছে তাই দিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। ইত্যাদি কে মেজর জিয়া গ্রিন সিগন্যাল বলে মনে করেছেন এবং আমাদের পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দিলাম বলেছেন।

সেনাবাহিনীর ডেপুটি চিফ অব স্টাফ পদে চাকরিরত অবস্থায় মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের একটি সাক্ষাৎকার নেন মুসা সাদিক ১৯৭৪ সালে। এতে তিনি বলেন–যা করেছি সব Father of the Nation বঙ্গবন্ধুর নামেই করেছি কেননা He has the mandate he was the symbol of our independence. এই হলো জেনারেল জিয়ার মন্তব্য। তার মৃত্যুর পর তার অনুসারীরা তাকে গ্লোরিফাই করতে গিয়ে এই বীরোত্তম জেনারেলকে অবমাননা করছেন এবং ইতিহাস বিকৃত করছেন।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু ও জাতির জনক হন আবার বিএনপি ক্ষমতায় গেলে বঙ্গবন্ধু, জাতির জনক শব্দ দুটি তো উচ্চারণ করেন না। এমনকি বেতার ও টেলিভিশনে পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমানের নাম উচ্চারণ অনেকটা নিষিদ্ধ করে রাখে। কি বিচিত্র এই দেশ সতিই সেলুকাস! প্রকৃতপক্ষে মেজর জিয়া ঘোষণা পাঠ করেন ২৭ মার্চ ১৯৭১ সাল। তার ঘোষণা ২৭, ২৮, ২৯ মার্চ পর্যন্ত পাঠ করা হয়। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে তার ঘোষণাটি ৩০ মার্চ আবার আরেকবার পাঠ করেন তৎকালীন লেফটেন্যান্ট শমশের মবিন। আর বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি হলো ২৬ মার্চ রাতের প্রথম প্রহরে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা বিতর্কটি অবশেষে দেশের সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত গড়াল। সম্প্রতি একটি রীট আবেদনের মিমাংসায় মাননীয় হাইকোর্টের ২ জন বিচারপতির সমন্বয়ে ঘটিত ডিভিশন বেঞ্চ-এ ঐতিহাসিক রায় দেন। মাননীয় বিচারপতিদ্বয় সিদ্ধান্ত দেন যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষক বলে তার অনুসারীরা যে দাবি করে আসছিল তা বাতিল করে দেন মাননীয় বিচারপতিদ্বয়। মহামান্য হাইকোর্ট এমন একটি যুগান্তকারী রায় দেওয়ার ফলে দেশের জনগণের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। উচ্চ আদালত একটি প্রকৃত সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রটি প্রথমে কালুরঘাট কেন্দ্রতে প্রচার শুরু করে। কিন্তু ৩০ মার্চ '৭১ পাকিস্তান বিমান বাহিনী বোমাবর্ষণ করে কালুরঘাট ট্রান্সমিটারটি ধ্বংস করে দিলে বেতার কর্মীরা একটি শর্টওয়েভ ট্রান্সমিটার ট্রাকে বসিয়ে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে চলে যায় এবং দুর্গম পার্বত্য চট্টগ্রামের রামগড় থেকে অনিয়মিত প্রচার বহাল রাখে। পরবর্তীতে ৫০ কিলোয়াডের একটি ট্রান্সমিটারের সাহায্যে মুজিবনগর থেকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হয়েছিল। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রথম পর্যায় যা কালুরঘাট, চট্টগ্রাম এবং ভ্রাম্যমাণ পর্যায়ে যেসব দুঃসাহসী কর্মীদের প্রচেষ্টায় এই কর্মকাণ্ড সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল, জনগণকে উৎসাহিত করে রেখেছিল তাদের বিশেষ কয়েকজনের নাম উল্লেখ না করলে তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে। তাঁরা হলেন আবদুল্লাহ আল ফারুক, মোস্তফা আনোয়ার, সৈয়দ আহমদ শাকের, রশিদুল হাসান, আমিনুর রহমান, রেজাউল করিম চৌধুরী, শরফুজ্জামান, কাজী হাবিব উদ্দিন আহমদ, সেকান্দর হারুন ও শুকুর মিয়া প্রমুখ। ২৬ মার্চ এই বেতার কেন্দ্র হতে মাহমুদ হাসান বিশ্ববাসীর কাছে আবেদন করেছিলেন বাঙালি জাতিকে সাহায্য করার জন্য। পার্বত্য

চট্টগ্রামে বৈরী মিজুদের হাতে এই মাহমুদ হাসান তার সঙ্গীসহ নিহত হন। বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে এই বেতার কর্মী প্রথম শহীদ শব্দসৈনিক।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক। একটি দেশকে তিনি ধাপে ধাপে স্বাধীনতার পথে নিয়ে যান। এর জন্য তাঁকে পোড়াতে হয়েছে অনেক কাঠখড়। করতে হয়েছে দীর্ঘ আন্দোলন, সংগ্রাম। হঠাৎ করে কোনো সংবাদ পাঠক কারও বাণী পাঠ করলেই ঘোষক হয়ে যান না বা সেটি নিজের বলে দাবি করাও হীন চেষ্টা। আমার শেষ প্রশ্ন? মেজর জিয়া যিনি সোয়াত জাহাজ থেকে বাঙালিদের দমনের জন্য অস্ত্র খালাস করতে গিয়ে সৌভাগ্যক্রমে পাদপ্রদীপের আলোয় আসেন, যার নাম ২৭ মার্চের পূর্বে কেউ জানতো না সেই মেজর জিয়া কথিত ঘোষণা না দিলে কি বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না। এই প্রশ্নের উত্তর কি?



# চতুর্থ অধ্যায়

## একাত্তর-পূর্ব বঙ্গবন্ধুর সমরচিন্তা

এখন এটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। ছয় দফার লক্ষ্য ও তা অর্জনের জন্য যে সংগ্রাম, সেটি বাঙালিকে ধাপে ধাপে নিয়ে যায় স্বাধীনতা যুদ্ধে। এই দফাগুলোর ষষ্ঠ দফায় পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারি গঠনসহ পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ নিরাপত্তাকল্পে অন্যান্য বিষয়কেও তিনি সন্নিবেশিত করেন। যেমন–১. আনসার বাহিনীকে ইউনিফর্মধারী সশস্ত্রবাহিনীতে রূপান্তর; ২. ইপিআর অর্থাৎ ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (বর্তমান বিজিবির পূর্বরূপ) বাহিনীকে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনস্থ করা; ৩. পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা স্থাপন করা এবং ৪. পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর তিনটি শাখার ভেতর নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে রাখা। এই দাবির প্রকাশ্য যুক্তি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা জোরদার করা। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত অন্য একটি দিক ছিল। কোনো এক সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করতে হলে বাঙালিদের দ্বারা গঠিত এসব প্যারামিলিটারি ফোর্স পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। যার প্রমাণ আমরা মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে দেখেছি। বাঙালি সেনা ইউনিটগুলো ইপিআর, আনসার, পুলিশ বাহিনীর বাঙালি সদস্যরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে তুলেছিলেন।

এর থেকে বোঝা যায়, গত শতকের ষাটের দশকের শুরু থেকে বঙ্গবন্ধু যা কিছু করেছেন এর অন্তর্নিহিত চিন্তা ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা। বাংলাদেশের ভূবিন্যাস হচ্ছে নদীবহুল, জলাশয়পূর্ণ ও নিচু জমির সংমিশ্রণ। ষাটের দশকে এটা ছিল বর্তমান সময়ের চেয়ে আরো প্রকট। সামরিক বাহিনীর ভারী যান চলাচলের জন্য সড়কপথ ছিল অনুপযুক্ত। যার কারণে যেকোনো আক্রমণকারী বা দখলদার বাহিনীর জন্য বাংলাদেশ হবে রীতিমতো বধ্যভূমি। ফলে ইউনিফর্মধারী আনসার ও ইপিআর বাহিনীকে যদি যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রচলিত ও অপ্রচলিত যুদ্ধকৌশলের সংমিশ্রণে একটি নাতিদীর্ঘ প্রতিরোধ যুদ্ধ পরিচালনার জন্য প্রস্তুত করা যায় তাহলে পর্যায়ক্রমে তারা বিপুল জনগোষ্ঠীকে তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারবে।

তখন প্রশিক্ষিত যোদ্ধাদের সঙ্গে বাঙালি যুবকদের সম্পৃক্ততায় যে সম্মিলিত প্রতিরোধ শক্তির উদ্ভব হবে তাতে আক্রমণকারী বা দখলদার বাহিনী শহরকেন্দ্রিক ও বাংকারকেন্দ্রিক হয়ে পড়বে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে এসে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এই অবস্থা হয়েছিল।

আর এই যুদ্ধ পরিচালনার জন্য যে অস্ত্র ও গোলাবারুদ দরকার হবে তা যেন পূর্ব পাকিস্তানেই তৈরি হয়, তার জন্য এ অঞ্চলে অস্ত্র কারখানা স্থাপনের দাবি ছিল ছয় দফার ভেতর।

**মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় সামরিক দিকনির্দেশনা**

বঙ্গবন্ধুর সর্বক্ষণিক বিশ্বস্ত ও নিবেদিত সহচর তাজউদ্দীন আহমদ অতি অল্প সময়ের মধ্যে যুদ্ধকে যেভাবে সুসংগঠিত করেছিলেন ও যুদ্ধে দ্রুত জয়লাভের জন্য বৃহৎ প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের যে সামরিক সহায়তা পেয়েছিলেন, তাতে এটা স্পষ্ট হয় যে এগুলো সবই ছিল বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত পূর্বপ্রস্তুতির ফল। তবে সেই নির্দেশনাগুলো কী, কখন ও কীভাবে ছিল, তা এখনো প্রকাশ্যে আসেনি। তাই আমার বিশ্লেষণটি সীমাবদ্ধ থাকবে শুধু ৭ মার্চের ভাষণের মধ্যে যে সামরিক নির্দেশনা ছিল তার ওপর। ৭ মার্চের ভাষণের প্রায় শেষাংশে তাৎপর্যপূর্ণ সামরিক নির্দেশনা ছিল। যেমন–

১. 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে;
২. জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু তোমরা বন্ধ করে দিবে;
৩. আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব;
৪. শত্রু পিছনে ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে এবং
৫. প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলুন। আমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন।'

বৃহৎ ও দীর্ঘমেয়াদি গেরিলা যুদ্ধের জন্য মাও জে দংয়ের খ্যাতনামা ম্যাক্সিম হলো, 'শত্রু যখন ক্লান্ত হয়ে পিছু হটবে ও নিজেদের সংকোচিত করবে তখন তাকে ধাওয়া কর এবং আঘাত কর। আর শত্রু যখন এগোবে তখন পথে অসংখ্য ছোট ছোট বাধা সৃষ্টি কর এবং নিজেরা চলে যাও নিরাপদ স্থানে।' ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলা ও যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার নির্দেশ ছিল মাও সেতুংয়ের উপরোক্ত সফল গেরিলা যুদ্ধের কৌশলের প্রতিফলন। আধুনিক কনভেনশনাল ও নন-কনভেনশনাল–উভয় ধরনের যুদ্ধেই Denial Plan কার্যকর করা যুদ্ধের একটি বড় গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই পরিকল্পনার মূল কথা হলো, নিজেদের কোনো সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা শত্রু যেন ব্যবহার করতে না পারে। রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু বন্ধ করা এবং ভাতে মারব ও পানিতে মারব নির্দেশনার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সমর কৌশল Denial Plan বাস্তবায়ন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। ওপরে উল্লিখিত চতুর্থ নির্দেশনামার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু মূলত সমগ্র বাঙালি জাতি ও বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে যাঁরা মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করবেন তাঁদের সবার জন্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। যুদ্ধ চলাকালীন দেশের অভ্যন্তরে রাজাকার, আলবদর ও তাদের সহযোগী রাজনৈতিক দলের অনুসারীদের দ্বারা পঞ্চম বাহিনী (Fifth columnist) সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং তারা মুক্তিযুদ্ধের সমর্থকদের বাড়িঘর, ধনসম্পদ লুটতরাজে লিপ্ত হয়েছিল। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের ভেতর যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ছিল তা-ও এখন সবারই জানা।





পঞ্চম নির্দেশনার তাৎপর্য ছিল দেশব্যাপী যাতে বাঙালিরা সঠিক নেতৃত্বের অধীনে সুসংগঠিত হয় ও সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ২৬ মার্চের পরপর বাঙালি সেনাসদস্যসহ অন্যান্য প্রশিক্ষিত বাহিনীর সদস্যরা একটা শক্ত প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস এসব প্রশিক্ষিত ইউনিটকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল বৃহত্তর গণবাহিনী বা মুক্তিফৌজ। একসময়ে সারা দেশের মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। আর সে কারণেই মাত্র ৯ মাসের মাথায় পাকিস্তানের ৯৩ হাজার সৈন্য বাংলাদেশের মাটিতে অবনত মস্তকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

**স্বাধীনতা-উত্তর প্রতিরক্ষা চিন্তা**

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি কারাগার থেকে দেশে ফেরত আসেন। তখন সম্পূর্ণ দেশটি ছিল একটি ভয়ানক ধ্বংসস্তূপ। সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৭২ সালের মার্চ মাসেই ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাবর্তিত হয়। এ রকম উদাহরণ পৃথিবীতে বিরল। ১৯৭২ সালের প্রথম ভাগে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার ও দেশের নিরাপত্তা ছিল পরস্পরবিরোধী দুটি সিদ্ধান্ত। এ রকম একটি বহুমুখী সংকটের মুখে বঙ্গবন্ধু তাঁর বিরল নেতৃত্বের গুণাবলি, ভুবনমোহিনী ব্যক্তিত্ব, হিসাবি সাহস, প্রবল আত্মবিশ্বাস, গভীর দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞাপারমিতাপ্রসূত একটি মাত্র আন্তর্জাতিক সম্পর্কজনিত রাজনৈতিক পদক্ষেপের মাধ্যমে ওই সময় দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করেছিলেন। ১৯৭২ সালের ১৯ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী স্বাক্ষর করেন ২৫ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী ও শান্তি চুক্তি। ওই চুক্তিতে মোট ১২টি অনুচ্ছেদ ছিল। তার মধ্যে নবম অনুচ্ছেদে ছিল, 'কোনো এক পক্ষের বিরুদ্ধে তৃতীয় পক্ষ সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হলে চুক্তিকারী প্রত্যেকে এতদুল্লিখিত তৃতীয় পক্ষকে যে কোনো ধরনের সাহায্যদানে বিরত থাকবে। তা ছাড়া যে কোনো পক্ষ আক্রান্ত হলে অথবা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে সেই আশঙ্কা নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে যথাযথ সক্রিয় ব্যবস্থা নিতে উভয় পক্ষ সঙ্গে সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হয়ে নিজেদের দেশের শক্তি এবং নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবে।' বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সে সময়ের বিরাজমান পরিস্থিতিতে ওই শান্তি চুক্তির উল্লিখিত অনুচ্ছেদই ওই দুর্বল মুহূর্তে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যূহ হিসেবে কাজ করেছে। তখন আমাদের নিরাপত্তার প্রশ্নে চুক্তিটি ছিল একটা শক্তিশালী নিবারণ (Deterence)। পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু দেশ পুনর্গঠন ও পুনর্নির্মাণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীকেও পুনর্গঠন করা শুরু করেছিলেন। সশস্ত্র বাহিনীকে বঙ্গবন্ধু যে একটি মর্যাদাবান বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, ওই সময়ের বিভিন্ন পদক্ষেপ থেকেই তা বোঝা যায়। ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসের ৪ তারিখে সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে দেশের সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী গঠন করে। সেনাবাহিনীর মর্যাদার প্রতীক বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি বঙ্গবন্ধু উদ্বোধন করেন ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসের ৩ তারিখে। প্রতিরক্ষা বাহিনীর মর্যাদা ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য সেনাবাহিনীর জন্য ট্যাংক ও বিমানবাহিনীর জন্য তখনকার সময়ের অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান মিগ-২১ ক্রয় করেছিলেন। রাষ্ট্রীয় প্রটোকলে তিনি সেনাবাহিনীকে

সব বাহিনীর ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলেন। ১৯৭২ সালের ৬ অক্টোবর চোরাচালান রোধে জাতীয় রক্ষীবাহিনীসহ সব বাহিনীকে সেনাবাহিনীর অধীনে ন্যস্ত করেছিলেন। আপৎকালীন বা যুদ্ধের সময়ে সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধিকল্পে প্যারামিলিটারি হিসেবে জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠন করেছিলেন। প্যারামিলিটারির উদাহরণ ভারত, পাকিস্তান, আমেরিকাসহ প্রায় সব দেশেই রয়েছে। শান্তিকালীন সময়ে যাদের কাজ থাকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা, আর যুদ্ধের সময় তারা সেনাবাহিনীর অধীনে সংযুক্ত হয়ে সামগ্রিক প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে বহুগুণে শক্তিশালী করে তোলে। সেনাবাহিনী দেশের নিরাপত্তা রক্ষায় যাতে অল্প সময়ে সক্ষমতা অর্জন করতে পারে সে জন্য বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান থেকে ফেরত আসা সব সেনাসদস্যকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সেনাসদস্যের সঙ্গে অঙ্গীভূত করে মাত্র দুই-আড়াই বছরের মাথায় সমগ্র সেনাবাহিনীকে ব্রিগেড গ্রুপ ফোর্সে বিন্যাস করে পুনর্গঠিত করেছিলেন। সব সেনানিবাসকে নতুন করে স্বাধীন দেশের চাহিদা মতো গড়ে তোলার কাজে হাত দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের মর্যাদাবান দেশের সঙ্গে মর্যাদাপূর্ণ দেশরক্ষা বাহিনী ছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

**বঙ্গবন্ধু : একটি নাম একটি অসমাপ্ত ইতিহাস**

জর্জ ওয়াশিংটন ছাড়া যেমন যুক্তরাষ্ট্র, কামাল আতাতুর্ক ছাড়া যেমন আধুনিক তুরস্ক, নেলসন ম্যান্ডেলা ছাড়া যেমন দক্ষিণ আফ্রিকা, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ছাড়া যেমন ভারতের ইতিহাস পূর্ণতা পায় না তেমনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়া বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস কল্পনা করা যায় না। বঙ্গবন্ধু একটি নাম একটি অসমাপ্ত ইতিহাস। বাংলাদেশের সাথে বঙ্গবন্ধু কিংবা বঙ্গবন্ধুর সাথে বাংলাদেশ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যেন একটি আরেকটির পরিপূরক। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার নামে ১৯৬৮ সালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী যে বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছিল সেই মানুষটিই পরবর্তীতে বাংলাদেশিদের প্রাণের পুরুষে পরিণত হয় এবং তাকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের স্বতন্ত্র পরিচয়ের কথা কল্পনাতীত হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৪৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার পর আমৃত্যু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশিদের মুক্তি ও অধিকার ফিরিয়ে আনতে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। '৫২ এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত তিনি এ জাতির পক্ষে ত্রাতার ভূমিকায় ছিলেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর শিষ্য হিসেবে তিনি কখনো ক্ষমতার মোহে অন্ধ হননি বরং সর্বদা চেষ্টায় ছিলেন কীভাবে এদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র এবং এ জাতিকে স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধের স্বাদ দিতে পারেন। পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর অপশাসনের বিরোধিতা করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের উল্লেখযোগ্য অংশ কারাগারে কেটেছে। ফাঁসির হুমকিতেও তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ কিংবা এ জাতির অধিকার আদায়ের পক্ষে অবস্থান থেকে এক চুলও পিছপা হননি। পাকিস্তানে বর্বর শাসকগোষ্ঠী যখন সর্বত্র থেকে বাংলা নামক শব্দটি উচ্ছেদে ব্যস্ত তখন তিনি বুক চিতিয়ে বাংলাকে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ়সংকল্প। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর স্মরণসভায় উপস্থিত হয়ে তিনি বলেছিলেন, 'এক সময় এ দেশের বুক হইতে, মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে বাংলা কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকু চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইয়াছে, একমাত্র বঙ্গোপসাগর ছাড়া আর কোনো কিছুর সঙ্গে বাংলা কথাটির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। আজ আমি





ঘোষণা করছি এটা পূর্ব পাকিস্তান নয় শুধু বাংলাদেশ।' আমেরিকার মতো বিশ্বের সুপার পাওয়ার বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করলেও শুধু বঙ্গবন্ধুর সীমাহীন আত্মবল, মানুষের প্রতি তার ভালোবাসা এবং তার প্রতি মানুষের বিশ্বাস বিশ্বমানচিত্রে নতুন করে '৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর স্থান করে নেয় আরেকটি রাষ্ট্রের নাম। আর সেটা আমাদের লাল-সবুজ পতাকাখচিত বাংলাদেশ। যে দেশের ইতিহাস পাঠ করতে গেলে বঙ্গবন্ধুর নাম অবশ্যই বারবার উচ্চারিত হবে। যে মানুষটি বাংলাদেশ ও বাংলাদেশিদের জন্য তার জীবন-যৌবন উৎসর্গ করলেন তাকে আমরা কতটুকু ভালোবাসতে পেরেছি? দীর্ঘ সংগ্রাম শেষে ত্রিশ লাখ শহীদের বুকের তাজা রক্ত ও দুই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রম-আব্রুর বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যখন তিনি দেশের গঠনমূলক কাজ শুরু করবেন তখনই দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র এবং একদল উচ্চভিলাষী বিপথগামী সৈন্য ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতের শেষ প্রহরে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারকে নৃশংসভাবে খুন করে। যেই ব্যক্তিটি আমাদেরকে নতুন ঠিকানা দিলেন তার খুনিদের বিচার করতে আমাদের দীর্ঘ প্রায় তিন যুগ লেগেছে। তবুও সব খুনির শাস্তি নিশ্চিত করা এখনো সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন দেশের ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায় কিছু কিছু দেশের বিখ্যাত ব্যক্তিরা আততায়ীদের হাতে খুন হয়েছেন। এর মধ্যে ভারতের ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধী, আমেরিকার আব্রাহাম লিংকন, জন এফ কেনেডি ও কিং মার্টিন লুথার এবং লেবাননের কামাল জুমলাত উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ঘটনা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। কেননা একটি পরিবারের সমস্ত সদস্য এমনকি চার বছরের শিশুপুত্র রাসেল কিংবা কারো গর্ভের সন্তানসহ একটি পরিবারের নিরাপত্তারক্ষী, কাজের মেয়েকে হত্যা করার ঘটনা ইতিহাস নজিরবিহীন অথচ আমাদেরকে সাক্ষী হতে হয়েছে তেমন দুঃসহ ইতিহাসের। শিল্প-সাহিত্যে যেমন অন্ধযুগ রয়েছে তেমনি বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশও রাজনীতির অন্ধগলিতে প্রবেশ করেছিল। আগস্ট এলেই মনের ভেতরটা হু হু করে ওঠে। কষ্টে যন্ত্রণায় যেন দুমড়ে-মুচড়ে যাই। আগস্ট মাস দেশ এমন কতিপয় মহীরুহকে হারিয়েছে যাদের শূন্যস্থান কোনোদিন পূরণ হওয়ার নয়। আগস্টে যাঁরা স্বাভাবিক কিংবা অস্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছে তাদের মধ্যে যেমন রাজনীতিক ব্যক্তিত্ব, কবি-সাহিত্যিক ও সাংবাদিক রয়েছেন তেমনি রয়েছেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষক। তাদের সবার মৃত্যুই দেশের বিভিন্ন অঙ্গনের বৃহৎ শূন্যতার সৃষ্টি করেছে। কাউকে না কাউকে নিভৃতে কাঁদিয়েছে কিংবা আজও কাঁদায়। অতীতের বিভিন্ন বছরের আগস্টে যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছে তাদের সকলের কথা উল্লেখ করা সম্ভব না হলেও অন্তত ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট বাঙালি জাতির আত্মছবি অঙ্কিত করার নিপুণ কারিগর তথা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু, ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট বাঙালিদের প্রাণের কবি তথা সাম্য, দ্রোহ ও প্রেমের কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যু, ২০০৬ সালের ১৭ আগস্ট আধুনিক বাংলা কবিতার বরপুত্র কবি শামসুর রাহমানের মৃত্যু, ২০০৪ সালের ১১ আগস্ট বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক কবি হুমায়ুন আজাদের মৃত্যু, ১৯০৮ সালের ১১ আগস্ট ফাঁসির রজ্জুতে দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর মৃত্যু কিংবা ২০১১ সালের ১৩ আগস্ট সড়ক দুর্ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক ও চলচ্চিত্রকার তারেক মাসুদের মৃত্যু স্মরণযোগ্য। তবে সকল মৃত্যুর দুঃখকে ছাপিয়ে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট দিনটি বাংলাদেশিদের কাছে এক বিভীষিকার দিন। প্রতি বছরের এ দিনটিতে বাংলাদেশিদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়। ১৫

আগস্টের বুকে চাপা কষ্টগুলো যখন জেগে ওঠে তখন প্রত্যেক বাংলাদেশিকে মৃত্যুসম যন্ত্রণা দেয়, জাতি হিসেবে আমাদের গান্ধারীর চিত্র সামনে এসে দাঁড়ায় এবং আমাদের অথর্বতা প্রমাণ করে। তবে আগস্ট মাসে যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছে তাদের গুরুত্ব এবং অর্জনভেদে দুঃখ কিংবা শোকের মাত্রা কমবেশি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশকে স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা যেমন কোনো অবস্থাতেই অস্বীকার করার উপায় নেই তেমনি ক্ষুদিরামের মতো বিপ্লবীরা যদি হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়ানোর সাহস না করত তবে ব্রিটিশ কলোনি থেকে পাকিস্তানের কিংবা পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের জন্ম পর্যন্ত হয়তো আমাদের ভাবনায় উঁকিই দিত না। সাহিত্যে সমৃদ্ধির জন্য যেমন নজরুল, রবীন্দ্রনাথদের প্রয়োজন ছিল তেমনি পাকিস্তানের শোষণ থেকে মুক্ত করে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা অস্বীকার করা বাংলাদেশের জাতীয়তাবোধকে উপেক্ষা করার নামান্তর। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় রণাঙ্গনে যুদ্ধ করার শক্তি-সামর্থ্য দেশের লাখো মানুষের ছিল কিন্তু সকল যোদ্ধাকে সমন্বয়-সংগঠিত করে প্রেরণা এবং কৌশল দেয়ার নেতৃত্বের গুণাবলি কেবল শেখ মুজিবুর রহমানেরই ছিল। সকল দল-মতের উর্ধ্বে অবস্থান করে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, নিশ্চয়ই বঙ্গবন্ধুর দৃঢ়তা এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কল্যানেই আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। তবে শাহাদাৎ-পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যে রাজনীতির মেরুকরণ হয়েছে তা আকাঙ্ক্ষিত নয়। সকল রাজনীতিক মতাদর্শের উর্ধ্বে যে মানুষটিকে স্থান দেয়ার কথা ছিল তাকে কেন্দ্র করেই আমরা রাজনীতির মাঠে পক্ষ-বিপক্ষ তৈরি করেছি। এতে বঙ্গবন্ধুর লাভ-ক্ষতি কতটুকু হয়েছে তা জানি না তবে আমরা যে হীনমন্যতা দেখিয়েছি তাতে সন্দেহ নাই। '৭৫-এর ১৫ আগস্ট কালরাতের শেষ প্রহরে কয়েকজন বিপথগামী সেনা সদস্য ও অফিসারের হাতে বঙ্গবন্ধুসহ তার পরিবারের অন্যান্য সদস্য নিহত হন। নিহতের তালিকায় যেমন ছিলেন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী, পুত্র-পুত্রবধূ তেমনি বঙ্গবন্ধুর ভাগিনা এবং তার গর্ভবতী স্ত্রীসহ ছিল আরও অনেক। দুর্বৃত্তদের নির্মম বুলেটে শেখ মুজিবুর রহমানের ৪ বছরের নিষ্পাপ শিশুপুত্র শেখ রাসেলকে যেমন রেহাই দেয়নি তেমনি আব্দুল্লাহ সেরানিয়াবাতের ৪ বছরের নাতি সুকান্ত আব্দুল্লাহ বাবুও রক্ষা পায়নি। কুলাঙ্গারেরা বঙ্গবন্ধুর পুরো পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্য থেকে ২৬ জনকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। রাসেলের মতো মায়ামাখা মুখচ্ছবির শিশুর বুকেও গুলি চালানোর সময় হায়েনাদের হাত একবারও কাঁপেনি। ভাগ্যগুণে পড়াশোনার জন্য জার্মানিতে অবস্থান করার কারণে বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার ছোট বোন শেখ রেহানা প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার অন্তরালে হায়েনাদেরকে কারা প্রলুব্ধ করেছিল তার সঠিক প্রমাণ আজও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তবে হত্যাকাণ্ডের প্রায় তিনযুগ পর নবম জাতীয় সংসদের সরকার বঙ্গবন্ধু এবং তার পরিবারের সদস্যদের হত্যাকারীদের মধ্য থেকে কয়েকজন দোষীকে শাস্তির মুখোমুখি করে জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করেছে এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতি ঋণের কিয়দাংশ পরিশোধ করার জাতি সুযোগ পেয়েছে। তবে এখনো অনেক আসামি ধরাছোঁয়ার অন্তরালে রয়ে গেছেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শের একজন ধারক হিসেবে সরকারের কাছে দাবি, যেন বঙ্গবন্ধুর বাকি হত্যাকারীদেরকেও অবিলম্বে দেশে ফিরিয়ে এনে শাস্তির মুখোমুখি করা হয় এবং কোন স্বার্থে তারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছিল তার সঠিক রহস্য উন্মোচন এবং এর পিছনে যদি কোনো দেশিয় কিংবা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র





থাকে তবে সে ষড়যন্ত্রে কারা জড়িত ছিল তাও যেন প্রকাশ করা হয়। বঙ্গবন্ধুর ৪০তম শাহাদাৎবার্ষিকীতে দাঁড়িয়ে সব রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে অনুরোধ, বঙ্গবন্ধুর মতো মহৎ মনের মানুষটিকে রাজনীতির গণ্ডিবদ্ধ করে তাকে সংকুচিত করা উচিত হবে না। জাতীয় নেতা হিসেবে তাকে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিন। ঘাতকরা ব্যক্তি বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করতে পেরেছে কিন্তু তার আদর্শ, দর্শন কিংবা শিক্ষাকে কি কোনো দিন দমিয়ে রাখতে পারবে? আমরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বাংলাদেশকে সোনার দেশে পরিণত করতে চাই। '৭১ সালের মার্কিন সাপ্তাহিকী *নিউজ উইক*-এ লোরেন জেঙ্কিসের প্রতিবেদনে বঙ্গবন্ধুকে রাজনীতির কবি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ২০০৪ সালের ১৪ এপ্রিল বিবিসি বাংলার জরিপে তাকে ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ বাঙালির মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে। তবে আমরা বঙ্গবন্ধুকে আরও অনেক উচ্চতায় দেখতে চাই। এ জন্য তাকে রাজনীতি মুক্ত রাখতে হবে। ভারতে যেমন করমদাস মোহনচাঁদ গান্ধীকে সকল দল-মতের কাছে গ্রহণযোগ্য করা হয়েছে তেমিন বঙ্গবন্ধুকেও অচিরেই সর্বজনীন করার ব্যবস্থা করা হোক। শুধু সাংবিধানিক জাতির পিতা নয় বরং তাকে সব মানুষের ভালোবাসায় জাতির পিতা করার উদ্যোগ নিতে হবে। সবশেষে বলতে চাই–

ভুলি নাই বাবা, ভুলি নাই তোমায়, ভুলি নাই তোমার নাম
বুকের রক্ত দিয়ে হলেও রেখে যাব তোমার মান ॥



এডোয়ার্ড কেনেডি ও বঙ্গবন্ধু

**জীবন্ত বঙ্গবন্ধু**

নন্দিত হয়েই কেউ জন্মগ্রহণ করে না। জন্মগ্রহণ করে নিজ কর্মের মাধ্যমেই নন্দিত হতে হয়। বঙ্গবন্ধুও কিন্তু শুরু থেকেই বঙ্গবন্ধু ছিলেন না। ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করা এই ব্যক্তি ধীরে ধীরে তার মেধা ও মননের বিকাশ ঘটিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন এক সাহসী সন্তান হিসেবে। খোকা নামের এই ছেলেটার পুরো নাম ছিল শেখ মুজিবুর রহমান। পিতা লুৎফর রহমান ও মাতা সায়রা খাতুন। বড় হয়েছিলেন অজপাড়াগাঁয়ে। তখন কেউ জানতেন না যে এই ছেলেটা একদিন বাঙালির মুক্তি সনদ রচনা করে ফেলবেন। বাঙালি জাতিকে নিয়ে যাবেন তাদের স্বাধীন বন্দরে। বাংলাদেশের মানুষের কাছে অবিস্মরণীয় নাম হয়ে থাকবেন চিরদিন। হয়তো সেদিন এ ছেলেটিও ভাবেনি তার স্মৃতিকে বুকে লালন করবে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির কোটি কোটি মানুষ এবং কেউ এও ভাবেনি সুচিন্তিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে জাতীয় অধিকার করা যে সম্ভব সেটা পৃথিবীর কাছে প্রমাণ করে দেবেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও রাজনীতি, বাঙালির ঐতিহাসিক বিবর্তন ধারায়, একটি ভৌগোলিক সীমারেখায় স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাঙালির হাজার বছরের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বেদনা-বিক্ষোভ ও আবহমান বাংলার ঐতিহ্যকে তিনি নিজের চেতনায় আত্মস্থ করেছেন। তার কণ্ঠে বাঙালি জাতির সার্বিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূর্ত প্রতীক। জাতির মুক্তি সংগ্রামের নিবেদিতপ্রাণ উৎসর্গীকৃত সন্তানদের একজন। তিনি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির প্রতিষ্ঠাতা। তিনি আমাদের বিস্মৃত জাতিসত্তাকে জাগ্রত করে দিয়েছেন। যুগ যুগ ধরে পরিচালিত মুক্তি-সংগ্রাম, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও বিভিন্ন নেতার দর্শন শেখ মুজিবুরের রাজনৈতিক জীবন ও চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করেছে। একজন মানুষ হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানের মহত্ত্ব এখানে যে, বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য তিনি লড়াই করেছেন। তিনি তার সমস্ত জীবন, চিন্তাভাবনা ও শ্রম উৎসর্গ করেছিলেন এই জন্য যে এদেশের মানুষ যেন খেয়ে-পরে সুখে-শান্তিতে বাঁচতে পারে, আত্মমর্যাদা নিয়ে বিশ্বের দরবারে নিজেদের ন্যায্য স্থান পেতে পারে। মাথা উঁচু করে কথা বলতে পারে তাদের অধিকার নিয়ে।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন আদর্শবাদী ও নীতিবান মানুষ হিসেবে এদেশের সাধারণ মানুষের একান্ত কাছাকাছি মিশে ছিলেন। এ জন্য তিনি নির্দ্বিধায় বলেছেন 'আমি তোমাদেরই লোক।' কোনো উচ্ছ্বাস বা অতিশয়োক্তির স্থান ছিল না এই উচ্চারণে। দেশবাসীর ওপর তার প্রভাব ছিল অমোচনীয়। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ একদিন তার কথায় অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছে, প্রাণ দিয়েছে। কারণ তারা জানত এই মানুষটি দেশের মানুষের ভালোবাসা ছাড়া কিছুই চান না। তিনি পাকিস্তানের মন্ত্রিত্ব চাননি, তিনি চেয়েছিলেন বাঙালিকে বিশ্বের দরবারে একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে পরিচয় করে দিতে। এ ছাড়া তার আর অন্য কোনো স্বপ্ন ছিল না। বিংশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে আমাদের বঙ্গবন্ধুর কথা মনে রাখতে হবে। তিনি একটি অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করেছেন। সামরিক জান্তার উস্কানি, হত্যা, রক্তপাত এবং





অবাঙালিদের দিয়ে বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি সত্ত্বেও তিনি শান্তিপূর্ণ আন্দোলন থেকে সরে আসেননি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বেই সামরিক বাহিনীর সশস্ত্র অবস্থানের মধ্যে বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনা করেছেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মাত্র তিন মাসের মধ্যে বাংলাদেশের ভূখণ্ড থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করা হয়েছিল বঙ্গবন্ধুরই ঐকান্তিক আগ্রহে। এ থেকে ও তার ব্যক্তিত্বেও অসাধারণত্ব প্রকাশ পায়। কারণ এখানে মনে রাখার মতো বিষয় হলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পঞ্চাশ বছর পরও জার্মানির মাটিতে মার্কিন, সোভিয়েত, ব্রিটিশ ও ফরাসি সেনাবাহিনীর অবস্থান ছিল। এক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু অনেকটাই দূরদর্শী-বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। কোরিয়ার যুদ্ধের পঞ্চাশ বছর পরও দক্ষিণ কোরিয়ায় মার্কিন সৈন্য অবস্থান করে। সুতরাং এই কৃতিত্বের মূল্য বঙ্গবন্ধুকে দিতেই হবে।

তার ক্যারিশমেটিক নেতৃত্বের কারণেই ১৯৬৭ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন ছাত্র সমাজের কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ তৎকালীন পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে একটি সংবর্ধনা প্রদান করে। লাখ লাখ মানুষের গগনবিদারী স্লোগান এবং করতালির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদের তৎকালীন সভাপতি তোফায়েল আহমেদ সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে সমগ্র বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন। যিনি দীর্ঘদিনের সাংগঠনিক কার্যক্রম ত্যাগ, আন্দোলন এবং চূড়ান্ত পর্বে মুক্তিসংগ্রামে সফল নেতৃত্ব দিয়ে একটা বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য একটা মুক্ত স্বাধীন স্বদেশ এনে দিতে পারেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠের শিরোপা তারই প্রাপ্য। বিশ্বের মানচিত্রে আরেকটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্রষ্টা হওয়ার কৃতিত্বের পাশে অন্য যে কোনো মহৎ মানুষের মহান কৃতিত্ব ম্লান হয়ে যায় বঙ্গবন্ধু তেমন কাজটিই করেছেন এবং এর মধ্য দিয়েই তিনি হয়ে উঠেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। তার অসামান্য ব্যক্তিত্ব দ্বারা তিনি ঊনসত্তর ও সত্তরের গণআন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। দুর্বার জাতীয় ঐক্য অর্জনের সংকল্পকে তুঙ্গে নিয়ে যান। বজ্রকঠোর করে তোলেন ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দুটি রাজনৈতিক পরিচয়। প্রথম পরিচয় মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক। তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উৎসাহ ও প্রেরণাদাতা এবং নেপথ্যে বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের প্রথম রাষ্ট্রপতি। এই পরিচয়ের আরেকটি অংশ হলো ১৯৬৬ থেকে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের ২৫ তারিখ পর্যন্ত পরিচালিত ছয় দফাভিত্তিক স্বাধিকার বা প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্মদাতা। তিনি বাঙালি জাতিকে প্রস্তুত করেছিলেন স্বাধীনতার লক্ষ্যে মুক্তি সংগ্রামের জন্য। যদি পাকিস্তানের ইয়াহিয়ার সামরিক সরকার তৎকালীন আওয়ামী লীগের ছয় দফা প্রস্তাব মেনে নিত অথবা ছয় দফার ভিত্তিতে পরিচালিত ১৯৭০-এর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিত তাহলে আজকের বাংলাদেশ স্বাধীন থাকত নাকি পাকিস্তান নামক প্রদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ থাকত নাকি বিশাল ক্ষমতাসীন একটি প্রদেশ থাকত সেটা আমাদের কারো পক্ষে বলা সম্ভবপর ছিল না। যা হোক চার-পাঁচ বছরের কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতিকে প্রস্তুত করেছিলেন যে কোনো অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির জন্য। বিশেষভাবে ৭ মার্চ ১৯৭১ সালের তৎকালীন রেসকোর্স

ময়দানে তার মূল্যবান ভাষণের মাধ্যমে তিনি বাঙালি জাতিকে প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। জাতি বলতে আমি মূলত জাতিগোষ্ঠীকে বা জনগোষ্ঠীকে বুঝাচ্ছি। তৎকালীন সামরিক বাহিনীর সদস্য বাঙালির গর্বিত বীর সেনা ও পুলিশ সদস্যগণকে বুঝায় এবং অবশ্যই এর মধ্যে তরুণ ও যুবকরাতো আছেই।

বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় পরিচয় ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসের ১০ তারিখের পর থেকে। তিনি প্রথমে এসে রাষ্ট্রপতি হন, মাঝখানে বছর দুয়েকের মতো তিনি প্রধানমন্ত্রী হন আবার কিছুদিন যেতে না যেতেই তিনি রাষ্ট্রপতি হয়ে যান। এটা ছিল ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সবে জন্ম নেয়া নতুন রাষ্ট্রটির নতুন রাজনৈতিক অঙ্গনে তার নতুন রাজনৈতিক পরিচয়কে স্থিতিশীল করার প্রাণান্তকর চেষ্টা। আমার বিনীত মূল্যায়ন, ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের ২৫ তারিখ পর্যন্ত যে বঙ্গবন্ধু ছিলেন সে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের জানুয়ারির পরের বঙ্গবন্ধু এক নন। দুই বঙ্গবন্ধুর মধ্যে একটি গুণগত পার্থক্য ও তাৎপর্যগত তফাৎ পরিলক্ষিত হয়েছে যেটা স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ স্বচক্ষে দেখতে পেরেছিল। কিন্তু আজকের এই মহান দিনে কোনো নেতিবাচক কথা বলে তাকে খাটো করা সমীচীন বলে আমি মনে করি না। আমি তার বিদেহী আত্মার রুহের মাগফেরাত কামনা করছি। আশা করি বাংলাদেশের ইতিহাসে ও গণমানুষের হৃদয়ে এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম স্বাধীনতার চিন্তা-চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে দেশের তরে নিবেদিত প্রাণ হয়ে নিজেদের উৎসর্গ করবে। যতদিন মুক্তিযোদ্ধাদের নাম লেখা থাকবে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা যত দিন বাংলার আকাশে উড়বে ততদিন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবন্ধু ও বাংলার বীর সন্তানদের নামও আমরা মনের অন্তঃস্থল থেকে স্মরণ করবো। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ সেদিন বঙ্গবন্ধুর ডাকেই পরিচালিত হয়েছিল।

**বাঙালির ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মহানায়ক**

যে জাতির ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ ও গৌরবান্বিত অর্জন বা অধ্যায় যদি হয় তাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, তাহলে বাঙালি জাতির জীবনে সেই অধ্যায়ের সৃজক, প্রাণপুরুষ, শক্তি, সংগঠক ও মহানায়ক হচ্ছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি বঙ্গবন্ধু, কারিগর এ দেশের বীর মুক্তিযোদ্ধারা আর এর মালিক সর্বস্তরের জনগণ। তিনি মুক্তি এনে দিয়েছিলেন একটি জাতির। মুক্তির প্রতিটি আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন তিনি। বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার বেড়াজাল ও শোষণ-নিপীড়ন থেকে মুক্ত করে বিশ্ব মানচিত্রে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্গবন্ধু নিজের জীবন বাজি রেখে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন। পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের অনুসারী এ দেশিয় ঘাতক-দালাল, রাজাকার, আলবদর ও আলশামস বাহিনী বাঙালি জাতির ওপর ইতিহাসের বর্বরতম হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন চালিয়েছে; যুদ্ধাপরাধ তথা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটিত করেছে। এসব কিছুর অবসান ঘটিয়ে দেশকে স্বাধীন করেন বঙ্গবন্ধু। অতঃপর তিনি যখন গোটা জাতিকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, সে মুহূর্তে স্বাধীনতার বিপক্ষের কুচক্রী মহল ও কতিপয় বিপথগামী সেনা কর্মকর্তার হাতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোর রাতে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নির্মমভাবে নিহত হন। এজন্য ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাঙালি জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে কলংকিত অধ্যায়। এদিন ইতিহাস হারিয়েছে





তার মূল রচনাকারীকে, দেশ হারিয়েছে তার প্রতিষ্ঠাতাকে আর জাতি হারিয়েছে তার প্রাণপ্রিয় পিতাকে।

ত্রিশ লাখ শহীদের রক্ত, লাখ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রম এবং লাঞ্ছনার বিনিময়ে অর্জিত সমগ্র বাঙালি জাতির গর্বের ধন মহান স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাকে ধূলিসাৎ করাই ছিল বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রধান উদ্দেশ্য, যা ছিল এক চরম ভ্রান্ত ধারণা। এ কারণে আহমেদ ছফা লিখেছেন, 'একজন বা একাধিক ব্যক্তির শারীরিক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে একটি রাজনৈতিক মিশনকে হত্যা করা যায় না। কারণ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটতে পারে কিন্তু আদর্শের মৃত্যু নাই।' অন্নদাশঙ্কর রায় কোনো এক সাক্ষাৎকারে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, 'বাঙালি বেঈমান, তারা জাতির পিতাকে হত্যা করেছে–পিতৃহত্যাকারী।' জাতির পিতার হত্যাকারীদের ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে সমগ্র বাঙালি জাতির মধ্যে যে এক গণজাগরণের সৃষ্টি হয়েছে, সে জাগরণকে ধরে রাখতে হবে। লাখো কোটি মানুষের রক্তের সঙ্গে মিশে থাকা বঙ্গবন্ধুর রক্তে ভেজা এ মাটিকে মানুষের কল্যাণে একটি সার্থক ও উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার শপথ নিতে হবে। আগস্টের শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে আজ আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হতে হবে।

বঙ্গবন্ধু শাহাদতবরণ করার এত বছর পরও এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, শুধু ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়নি। এর নেপথ্যে কাজ করেছে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের বাস্তবায়নকে বাধাগ্রস্ত করা এবং মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে চিরতরে মুছে ফেলা। চক্রান্তকারীদের ধারণা ছিল, সাধারণ মানুষ বঙ্গবন্ধুকে অনেক ভালোবাসে আর বঙ্গবন্ধুর ডাকে গোটা জাতি একতাবদ্ধ হলে তাদের মধ্যে আরও বেশি রাজনৈতিক সচেতনতা কাজ করবে। এ কারণে ঘাতকরা '৫৪ সালের বিজয়কে স্তব্ধ এবং '৫২, '৬২, '৬৬, '৬৯, '৭০-এর আন্দোলন-সংগ্রামের বিজয়কে ধূলিসাৎ করার চেষ্টা করেছিল। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যে গণজোয়ার, একতা এবং আত্মত্যাগের অভূতপূর্ব প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হয়েছিল, সে কারণে একাত্তরে ওই সাম্প্রদায়িক কুচক্রী মহল সফল হতে পারেনি। আর তাই কাপুরুষোচিত পথে সে প্রতিশোধ তারা নিয়েছিল পঁচাত্তরে।

১৫ আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর এর প্রধান সুবিধাভোগকারী জিয়াউর রহমান তার সাড়ে পাঁচ বছরের শাসনামলে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের ও যুদ্ধাপরাধীদের পুনর্বাসনে যে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাতেই বঙ্গবন্ধু হত্যা সম্পর্কে অনেক কিছু স্পষ্ট হয়। জিয়াউর রহমান এ দেশের সংবিধানের ভিত্তি পরিবর্তন করে ধর্মনিরপেক্ষতার স্থলে ধর্মকে রাজনীতিতে নিয়ে আসেন এবং পরবর্তী সময়ে তারই হুকুমে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল জন্মলাভ করে। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার থেকে রেহাই দিয়ে জারি করা হয় কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ। খুন, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত দুষ্কৃতকারীরা আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যায় এবং এসব খুনি-অপরাধীকে সরকারি উচ্চপদস্থ বিভিন্ন পদে আসীন করা হয়। দেশত্যাগী রাজাকাররা দেশে আবার পুনর্বাসিত হয়। বঙ্গবন্ধু আজীবন সংগ্রাম করে একটি জাতিকে মুক্তির আলোকবর্তিকা দেখিয়েছেন, আর তার মৃত্যুর পর পাকিস্তানের প্রেতাত্মাদের স্বাগত জানিয়ে স্বাধীনতার বিজয়কে মলিন করা হয়। এভাবে ১৫ আগস্টের পর বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস বিকৃত করার নানা

কৌশল প্রয়োগ করে সাধারণ মানুষের মনে এক ধরনের আতংকের সৃষ্টি করা হয়। বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির অপচেষ্টাও চালানো হয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তার কর্মের মধ্য দিয়েই এ দেশবাসীর হৃদয়ে চিরঞ্জীব, চির অম্লান হয়ে আছেন।

স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবিত থাকলে বিশ্বের বুকে আজ বাংলাদেশের অবস্থান কোথায় থাকত? বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ও রূপ আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়াত? ১৯৭২ থেকে '৭৫–এই সময়ে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে একটি তলাবিহীন ঝুড়ির দেশ যেভাবে প্রতিটি সেক্টরে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করেছিল, বঙ্গবন্ধু হত্যার পর তা আর ধরে রাখা যায়নি। বরং তৎপরবর্তী বঙ্গবন্ধুর খুনিদের এবং যুদ্ধাপরাধীদের পুনর্বাসন করে এ দেশকে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা চলেছে। তাই বাংলাদেশের ইতিহাসের পাতায় ১৫ আগস্ট এক নির্মম কালো অধ্যায় হয়ে আছে। বাংলাদেশ নামের একটি দেশ যতদিন বিশ্বের মানচিত্রে থাকবে, বাঙালি জাতির ইতিহাস ও পরিচয় যতদিন থাকবে, ততদিন ইতিহাসের পাতা থেকে ১৫ আগস্টের কলংক ও ক্রন্দন মুছে ফেলা যাবে না। বাঙালি জাতি কিছুটা সৌভাগ্যবান যে, ১৫ আগস্টের নির্মমতা থেকে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বেঁচে গেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বঙ্গবন্ধু থেকে পাওয়া প্রজ্ঞা, সাহস, নৈপুণ্য ও কার্যক্রমে মৃতপ্রায় জাতি পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদালাভের জন্য দেশ দ্রুত অগ্রসরমান। সমুদ্র বিজয় হয়েছে, দীর্ঘ সময়ের ছিটমহল সমস্যার সমাধান হয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মিত হচ্ছে। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে ২০২১ সালের আগেই মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৪১ সালে উন্নত দেশ হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে। তবে মনে রাখতে হবে, ষড়যন্ত্রকারীরা বসে নেই। এরই মধ্যে তারা অনেক চক্রান্ত করেছে, দেশি-বিদেশি দোসরদের দ্বারা নানা কূটকৌশলের জাল বুনেছে, জঘ্য কায়দায় মানুষ হত্যাসহ অনেক পৈশাচিক কর্মকাণ্ড চালিয়েছে, অনেক গোপন চক্রান্ত অব্যাহত রেখেছে। দেশকে অস্থিতিশীল করার নানা পদক্ষেপ নিয়ে তারা বারবার ব্যর্থ হচ্ছে। মনে রাখতে হবে, কুচক্রীরা সুযোগ পেলেই আবারও একটি ১৫ আগস্ট ঘটাতে পারে। তাই আমাদের বিবেককে সদা জাগ্রত রাখতে হবে।

পরিশেষে বলতে চাই, বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির অস্তিত্ব যতদিন থাকবে, ততদিন মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বেগম সুফিয়া কামাল তার 'ডাকিছে তোমারে' কবিতায় যথার্থই বলেছেন–'এই বাংলায় আকাশ-বাতাস, সাগর-গিরী ও নদী/ডাকিছে তোমারে বঙ্গবন্ধু? ফিরিয়া আসিতে যদি।' জানি বঙ্গবন্ধু আর সেভাবে ফিরে আসবেন না, তবে মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ, উন্নত বাংলাদেশ তথা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার মাঝেই আমরা বঙ্গবন্ধুর প্রতিচ্ছবি দেখতে পাব।

**মৃত্যুঞ্জয়ী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব**

দেখতে দেখতে কেটে গেছে ৪০টি বছর। মহাকালের কাছে ৪০ বছর তুচ্ছ মুহূর্ত মাত্র। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির ইতিহাসে যে কলঙ্কের কালিমা লেপন হয়েছে তা বইবে অনন্তকাল। সেই সঙ্গে বঙ্গবন্ধু তার ৫৫ বছরের আয়ুষ্কালের মধ্যে ৩৫ বছরের রাজনীতি এবং সংগ্রামী জীবনের যে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন





তা বাঙালি জাতির হৃদয়ে বহতা নদীর মতোই বইতে থাকবে দীর্ঘকাল। মহানায়ক বঙ্গবন্ধুর ৩৫ বছরের রাজনৈতিক জীবনের ২৩ বছর (১৯৪৮-৭১) কেটেছে পাকিস্তানি শাসন-শোষণ এবং সামরিক শাসনের নামে নব্য ঔপনিবেশিকতার হাত থেকে এ দেশের সাত কোটি বাঙালিকে মুক্তি দেওয়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে, আন্দোলন এবং সংগ্রামে। জাতির পিতা হিসেবে স্বীকৃতির মাধ্যমে ৩৫ বছরের সংগ্রামী জীবনের সমাপ্তি ঘটলেও বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে বেঁচে আছেন, বেঁচে থাকবেন, মহাকালের পথ ধরে।

১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দাবির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে আন্দোলনের নেতৃত্বে, পুলিশ বিদ্রোহ, ভাষা আন্দোলন, বিদ্রোহী পুলিশ বাহিনীর ওপর সেনাবাহিনীর নির্বিচারে গুলিবর্ষণের প্রতিবাদ, '৫৩ সালের শাসনতন্ত্রে বাংলার স্বায়ত্তশাসনের অন্তর্ভুক্তির আন্দোলন, '৫৪ সালের নির্বাচন এবং নির্বাচনের রায় বানচালবিরোধী আন্দোলন, '৫৮ সালের ৭ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে রাজনীতিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ১১ অক্টোবর শেখ মুজিবকে গ্রেফতার এবং দীর্ঘ ১৪ মাস কারাভোগ। ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে আইয়ুবের সামরিক সরকার দেশের উভয় অঞ্চলে কয়েকজন রাজনীতিবিদকে এবডো এবং প্রাডো আইনের মাধ্যমে ৬ বছরের জন্য রাজনীতিতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। বঙ্গবন্ধুকে সেই কালো আইনের মধ্যে ফেলা হলো। ১৯৬২ সালে হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে ছাত্র আন্দোলনের প্রতি সক্রিয় সমর্থন দান, '৬৩ সালে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন, '৬৪ সালে আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করে আন্দোলন পরিচালনা এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি, '৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার উদ্যোগ গ্রহণ, '৬৬ সালে বাঙালির মুক্তির অন্যতম সনদ ঐতিহাসিক ৬ দফা আন্দোলন, '৬৭ সালে রাজনৈতিক কারণে ৬টি মামলার মোকাবেলা, '৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রতিহতকরণ, '৬৯ সালে সামরিক শাসক আইয়ুব খাঁনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী সফল গণঅভ্যুত্থান পরিচালনা, '৭০ সালে নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনে জয়লাভ, '৭১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্বদান এবং ২৫ মার্চ গভীর রাতে গ্রেফতার হওয়ার আগে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা। সর্বোপরি তার জীবনে এই ২৩টি বছর আন্দোলন-সংগ্রামে কাটিয়েছেন।

১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে প্রথমে লন্ডন, পরে দিল্লি হয়ে ১০ জানুয়ারি দেশে ফেরেন। ১১ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে যুদ্ধে বিধ্বস্ত-যোগাযোগ, শিল্প-কারখানা, অবকাঠামোসহ ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি দেশকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য শুরু হয় আরেক সংগ্রামের ইতিহাস। শাসনামলে তার সততা, দেশপ্রেম, নেতৃত্ব, সাহসী পররাষ্ট্রনীতির জন্য যুগ যুগ ধরে দেশে-বিদেশে লাখো কোটি মানুষের হৃদয়ে স্মরণীয়-বরণীয় হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন।

বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে শিক্ষার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে ৪৪ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেন। ১১ হাজার নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন এবং

৫০ হাজারের অধিক নতুন শিক্ষক নিয়োগ করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কালাকানুন বাতিল এবং স্বায়ত্তশাসন প্রদান করেন। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে তিনি যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। কৃষিনির্ভর দেশ বাংলাদেশ সেই ধারণা মাথায় রেখে বঙ্গবন্ধু কৃষি খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে বেশ কিছু প্রকল্প হাতে নিয়েছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর গ্রামপর্যায়ে ২২ লাখ কৃষক পরিবারকে পুনর্বাসন, তাদের কৃষি যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ দিয়ে সহায়তা করেন। জাতীয় সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনীকে যথাযথ গুরুত্ব ও মর্যাদায় পুনর্গঠন এবং কুমিল্লার ময়নামতিতে দেশের প্রথম আধুনিক বিমান বহর গড়ে তোলা হয়। আর্টিলারি বাহিনীর জন্য সাঁজোয়া গাড়ি, ট্যাঙ্ক সংগ্রহ করা হয়। সমুদ্রসীমা পাহারার জন্য নৌবাহিনী গঠন করেন। বাংলাদেশ রাইফেলস, পুলিশ ও আনসার বাহিনী গড়ে তোলেন।

মিত্রবাহিনী হিসেবে বিদেশি সৈন্য একবার কোনো দেশে ঢুকে পড়লে সহজে যেতে চায় না। কিন্তু বাংলাদেশ ছিল এর ব্যতিক্রম। মাত্র তিন মাসের মধ্যে ভারতীয় সৈন্যের বাংলাদেশ থেকে চলে যাওয়া এক অনন্য ঘটনা। এটা সম্ভব হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের কারণে। পাকিস্তানের ২৪ বছরের শাসনামলে সংবিধানের ভিত্তিতে কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। বাংলাদেশ পৃথিবীর প্রথম এবং একমাত্র দেশ যেখানে মাত্র ৯ মাসের মধ্যে জাতিকে সংবিধান উপহার দেওয়া হয় এবং সেই সংবিধানের ভিত্তিতে '৭৩ সালে জাতীয় নির্বাচন সম্পন্ন করা বঙ্গবন্ধুর এক বিরাট সাফল্য।

জাতীয়-আন্তর্জাতিক চক্রান্ত প্রতিহত করে ১৪০টি দেশের স্বীকৃতি লাভ এবং ১৯৭৪ সালে সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ এবং একই সঙ্গে ইসলামিক সম্মেলন সংস্থার সদস্যপদ লাভ করতে বঙ্গবন্ধুর সরকার সমর্থ হয়। ১৯৭৩ সালে কমনওয়েলথ, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, বিশ্ব খাদ্য সংস্থা ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থাসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামের সদস্যপদ লাভ। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুই প্রথম বাঙালি যিনি জাতিসংঘে প্রথম বাংলায় ভাষণ দেন এবং বাংলাকে জাতিসংঘের স্বীকৃত ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ভারতের সঙ্গে ২৫ বছরের মৈত্রী ও শান্তিচুক্তি, ফারাক্কার পানিবণ্টন চুক্তিতে বাংলাদেশের জন্য ৪৪ হাজার কিউসেক পানির ব্যবস্থা বঙ্গবন্ধুর শাসনামলের বিরাট সাফল্য। মাত্র সাড়ে ৩ বছরের শাসনামলে একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে বিশ্বশান্তি পরিষদ কর্তৃক সংগ্রাম, স্বাধীনতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় তার অমূল্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রাপ্তি আজও বাঙালির জন্য গর্বের। তিনি মানুষের অন্তরে বেঁচে থাকবেন অনন্তকাল।

## বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রমূর্তি

বঙ্গবন্ধু জন্মগ্রহণ করেছিলেন বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ড 'বঙ্গ' জনপদে। 'বঙ্গ' এবং 'রাঢ়' ছিল বরাবর আলাদা জনপদ। ড. সৈয়দ আকরম হোসেন একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধে জানিয়েছেন 'রাঢ়' ও 'বঙ্গ' কখনো অভিন্ন ছিল না। ৭ম শতাব্দীতে রাজা শশাঙ্ক 'রাঢ়' ও 'গৌঢ়' রাষ্ট্র একত্র করে তার রাজ্যসীমা অনেকদূর বাড়িয়েছিলেন, তখনো বঙ্গরাষ্ট্র আলাদা ছিলো। তখন বঙ্গরাষ্ট্রের শাসনকর্তা ছিলেন বৈন্যগুপ্ত। বঙ্গরাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল ফরিদপুর,





বরিশাল ও ঢাকার কিছু অংশ নিয়ে বিশেষ করে ভাওয়াল অঞ্চল নিয়ে। এই নিরিখে শেরেবাংলা, বঙ্গবন্ধু এবং তাজউদ্দীন আহমদ একই প্রাচীন জনপদে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

জনপ্রিয় কলাম লেখক আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী এক জায়গায় বলেছেন, 'হক সাহেব ও শেখ সাহেব, দুই নেতার রাজনীতিরই শেকড় প্রোথিত ছিল অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তার গভীরে। ফজলুল হক বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের স্রষ্টা, শেখ মুজিব সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে একটি স্বাধীন ন্যাশন স্টেট উপহার দিয়েছেন।... ফজলুল হক তার রাজনৈতিক জীবনের শেষ দিকে কৃষক প্রজা পার্টির নাম বদল করে রেখেছিলেন কৃষক-শ্রমিক পার্টি। শেখ সাহেব তার মৃত্যুর আগে নতুন রাজনৈতিক জোটের নাম রেখেছিলেন কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ। তার এই জোটের কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল কালোনিয়াল আমলাতন্ত্র ও সেনাতন্ত্রের কাঠামো ভেঙে দেওয়া, বহুকালের আধিপত্য ও সুবিধাভোগী শ্রেণীগুলোর সুবিধা হ্রাস এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, সমাজের নিচের দিকের শ্রেণিগুলোকে ওপরে তুলে আনা এবং স্বার্থবিভক্ত সমাজের পুরনো কাঠামো বদলের জন্য শ্রেণী সমীকরণের ব্যবস্থা।" (সওগাত যুগ ও মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, পৃ. ৭২-৭৩)।

বঙ্গবন্ধুর মানস বিশ্লেষণে এই দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে যথার্থ। বঙ্গবন্ধুর পূর্বে শেরে বাংলাই ছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রমূর্তি। ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী 'দুই বাঙালির লাহোর যাত্রা' নামে একটি মূল্যবান বই লিখেছেন। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ শেরেবাংলা লাহোর প্রস্তাব করেছিলেন। উপমহাদেশের ইতিহাসে তার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু লাহোরের মাটিতে তার ঐতিহাসিক ৬ দফা পেশ করেছিলেন। লাহোর প্রস্তাবই পাকিস্তান প্রস্তাবে রূপ পেয়েছিল আর বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা ১ দফায় পরিণত হয়েছিল।

ড. চৌধুরীর কথাটুকু উদ্ধৃত করছি পাঠকদের স্বচ্ছ উপলব্ধির জন্য। তিনি বলেছেন, 'কিন্তু এটা সত্য যে, ১৯৪০ এর সেই প্রস্তাবটি বাংলার প্রধানমন্ত্রী একে ফজলুল হকই উত্থাপন করেছিলেন। প্রস্তাবটি তাঁর নয়, মুসলিম লীগের। স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের ওই প্রস্তাবের তখনো নামকরণ হয়নি, পরে সেটা নাম পেলো পাকিস্তান প্রস্তাবের এবং মোটামুটি তার ওপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠা ঘটলো পাকিস্তান রাষ্ট্রের। সাত বছর পরে ১৯৪৭ সালে।

ওই লাহোরেই আরেক প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন বাংলার আরেক নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। ২৬ বছর পরে ওই মার্চ মাসের কাছাকাছি সময়েই, ১৯৬৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোর বিরোধীদলীয় নেতাদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো; এবং সেখানে প্রস্তাব এলো সম্পূর্ণ উল্টো ধরনের; ছয় দফার, স্পষ্ট ভাষায় বলতে গেলে পাকিস্তান ভাঙার। এক বাঙালি প্রস্তাব করেছিলেন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার, আরেক বাঙালি প্রস্তাব করলেন পাকিস্তান ভাঙার।' (নির্বাচিত প্রবন্ধ, পৃ. ২২৬-২৭)।

বঙ্গবন্ধুর ৬ দফার প্রথম দফার প্রথম বাক্যেই আছে, 'ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানকে একটি সত্যিকারের ফেডারেশন রূপে গড়িতে হইবে। তাহাতে পার্লামেন্ট পদ্ধতিতে সরকার থাকিবে।'

আবুল মনসুর আহমদের কথাটি আমরা স্মরণ করতে পারি। তিনি বলেছেন, 'শেরে বাংলা যা সূচনা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু তা শেষ করেছেন।' (আমার দেখা রাজনীতির ৫০ বছর, আবুল মনসুর আহমদ)।

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই পাকিস্তানের মৃত্যু ঘটেছিল। তখন বাঙালিদের নেতা ছিলেন মুখ্যত শেরে বাংলা। বঙ্গবন্ধু তার ডানহাত-তরুণ সৈনিক। শেরে বাংলা পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে কলকাতা সফরে গিয়েছিলেন, সঙ্গে ছিলেন তরুণ মন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কলকাতায় শেরে বাংলাকে প্রাণঢালা সংবর্ধনা দেয়া হয়েছিল। তার জবাবে শেরে বাংলা যে দীর্ঘ আবেগময়, ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন, তার মধ্যে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের বীজ রোপণ করা হয়েছিল। বলেছিলেন, "দুই বাংলার মধ্যে যে ব্যবধান আছে তা একটা স্বপ্ন ও ধোঁকামাত্র। করুণাময় খোদাতালার দরবারে আমার একটি প্রার্থনা এই যে, তিনি যেন এই ব্যবধান দূর করতে পারেন। বাঙালিরা পূর্ব বা পশ্চিম যে যেখানেই থাকুক না কেনো তারা অখণ্ড এবং তাদের মধ্যে সদ্ভাব ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। বাংলাদেশ রাজনৈতিক দিক থেকে দু'ভাগে ভাগ হয়েছে সত্যি, কিন্তু ভাষা, সংস্কৃতি ঐতিহ্যে উভয় বঙ্গের কোনো ফারাক নেই। রাজনীতিকরা দেশটাকে দুভাগ করে এই সাংস্কৃতিক ঐক্যে ফাটল ধরাতে পারেননি। ভবিষ্যতেও কোনোদিন পারবেন না।"

তিনি আরো বলেছিলেন, "একটি দেশের রাজনৈতিক বিভাগে আমি বিশ্বাস করি না। প্রকৃত পক্ষে 'হিন্দুস্থান' ও 'পাকিস্তান'–এই দুটি বিভেদার্থক শব্দের সঙ্গে আমি এখনও হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান উভয় অংশকেই বুঝি। যারা আমাদের এই সোনার দেশকে দু'ভাগ করেছে তারা দেশের দুশমন। আমার মতে, পাকিস্তান বলতে কিছুই বোঝায় না,–এই শব্দটি বিভ্রান্ত সূচনা করাবার ও স্বার্থসিদ্ধির একটি পন্থামাত্র।" (কৃত্তিবাস ওঝা–আমি মুজিব বলছি, পৃ. ১১৬-১৭)।

এই ভাষণকে ভিত্তি করে পাকিস্তানি শাসকরা যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দিয়ে সামরিক শাসন জারি করে এবং শেরে বাংলাকে গৃহবন্দি করে, বঙ্গবন্ধুকেও গ্রেফতার করে।

ষাটের দশকে আমাদের মহান দুই নেতাই মৃত্যুবরণ করেন–শেরে বাংলা, সোহরাওয়ার্দী। মওলানা ভাসানী তখন বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নানা বিপরীত কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছেন। এই তিন মুরব্বি নেতার গুণাবলি আত্মস্থ করে বঙ্গবন্ধু এগিয়ে গেছেন দেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে। বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বলেছিলেন, 'শেরে বাংলা পা থেকে মাথা পর্যন্ত খাঁটি বাঙালি এবং খাঁটি মুসলমান।' কিন্তু বঙ্গবন্ধু তা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে খাঁটি বাঙালি হয়ে উঠেছিলেন এবং পূর্ব বাংলার বাঙালিদের জন্য একটি স্বাধীন সেক্যুলার স্টেট প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন তার রাজনীতির গোড়া থেকেই। তিনি বুঝেছিলেন পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে থেকে বাঙালির স্বার্থ আদায় করা যাবে না। গোড়া থেকেই তার যাত্রা ছিলো স্বাধীনতার যাত্রা। তার স্বপ্ন পূরণে তিনি দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে শেরে বাংলা, সোহরাওয়ার্দী ও ভাসানীর কৌশল অবলম্বন করেছেন, তার পর নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তার প্রতিটি সিদ্ধান্ত ছিল সঠিক।

দেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যেই তিনি দলকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেছিলেন কিন্তু দলের সাধারণ সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেননি। দলকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে তিনি সমগ্র দেশকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা তার প্রধান কৃতিত্ব। অবাক হবার মতো ব্যাপার যে, নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির ভেতরেই তিনি সশস্ত্র যুদ্ধের পরিকল্পনা করেছিলেন। এ কথা জেনে পণ্ডিত নেহেরু ভয়ে পিছিয়ে





গিয়েছিলেন। অন্নদা শঙ্কর রায় বলেন যে, 'এ কথা শুনে আমি তাজ্জব বনে যাই।' ষাটের দশকে যেসব ছাত্র নেতারা নিউক্লিয়াস বাহিনী গঠন করেছিলেন তারা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে তা করেছিলেন।

১৯৭০ সালে অনেকেই বলেছিলেন, 'ভোটের আগে ভাত চাই।' বঙ্গবন্ধু এই হঠকারী কথার মধ্যে ছিলেন না। তিনি ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের আবেগকে নির্বাচনের দিকে প্রবাহিত করে দেন। বঙ্গবন্ধুর চাপে ইয়াহিয়া খান নানা শর্তজুড়ে নির্বাচন দিতে বাধ্য হন। এই নির্বাচনই আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছিল।

১৯৭০ সালের নির্বাচনই বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতা আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতার আসন দিয়েছিল, স্বাধীনতা ঘোষণার ম্যান্ডেট দিয়েছিল। এ জন্যই তিনি জাতির পিতা, তিনি স্বাধীনতার ঘোষক, তিনিই স্বাধীনতার স্থপতি।

### শেখ মুজিব : আদর্শ ও দেশপ্রেমের প্রতিকৃতি

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবনের স্বপ্ন ছিল বাংলার স্বাধীনতা ও বাঙালির জাতিসত্তার প্রতিষ্ঠা। শৈশব কৈশোর থেকে তিনি এই আদর্শ নিয়েই বড় হয়ে ওঠেন। নিজেই নিজেকে প্রস্তুত করে তোলেন। তাঁর এই চারিত্রিক দৃঢ়তার পেছনে ছিল গভীর অধ্যয়ন, জানা-চেনা-শোনা ও দেখার গভীর অন্তর্দৃষ্টি। তিনি হৃদয়ের আবেগকে যথেষ্টভাবে ধারণ করতে সমর্থ হন। এর পেছনে ছিল মানুষকে ভালোবাসা ও সাহায্য করার জন্য তাঁর দরদী মন। এই শিক্ষাটা তিনি অর্জন করেন তাঁর পরিবারের মানুষদের দেখে, তাঁর গৃহশিক্ষকের কাছে এবং দারিদ্র্য অভাবগ্রস্ত গ্রামের মানুষকে দেখে। তাঁর হৃদয়ে যা কিছু ছাপ রেখেছে বা প্রভাব ফেলেছে সেটা তিনি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এই ক্ষমতা অল্প বয়স থেকেই তাঁর আয়ত্তে ছিল। তাঁকে চিন্তাচ্ছন্ন করে তুলতো, তাঁকে আবেগতাড়িত করতো। তাঁর জাতির পিতা বা বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠার পেছনে তাঁর গ্রাম টুঙ্গিপাড়ার মানুষের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। এই ছোট্ট অনুন্নত গ্রাম ও মানুষের মধ্যে তিনি লক্ষাধিক গ্রাম ও কয়েক কোটি মানুষকেও দেখেছেন। আর সেজন্যই বাঙালি জাতির ভাগ্যকে তিনি জয় করতে গিয়ে তিনি নিজের জীবনের প্রতি তাকিয়ে দেখার সুযোগ পাননি। জেল-জুলুম, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার–সবকিছু সহ্য করেছেন। কিন্তু বাংলার মানুষের সঙ্গে কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। তাঁর লক্ষ্য ছিল বাংলার মানুষের মুক্তি। বাঙালি উন্নত জীবনের অধিকারী হোক। বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াক। বাঙালি জাতিসত্তাকে প্রতিষ্ঠা করুক। একজন মহান নেতা হবার সবকটি গুণই আমরা তার মধ্যে খুঁজে পাই। স্কুল ছাত্রজীবনেই তাঁর চোখে বেরিবেরি রোগ হওয়ায় কলকাতায় গিয়ে ডা. টি. আহমদের কাছে অস্ত্রোপচার করতে হয়। দুই বছর লেখাপড়া বন্ধ ছিল।

এ সময়টায় তিনি ঘুরে বেড়াতেন, সভায় গিয়ে বক্তৃতা শুনতেন, গৃহশিক্ষকের কাছে অনেক কথা, কাহিনি ও খবরাখবর শুনতেন। সুস্থ হওয়ার পর তিনি আবার স্কুলে ভর্তি হন, খেলাধুলায়ও মনোযোগী হন। ফুটবল ছিল প্রিয়। স্কুলের দলের হয়ে খেলতেন। লেখাপড়া করতেন ঠিকমতো, কেননা তাঁর মা-বাবার প্রচণ্ড উৎসাহ ছিল এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল, শাসনও

ছিল। তাঁর গৃহশিক্ষক কাজী আবদুল হামিদ ছিলেন একজন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের কর্মী যিনি আত্মগোপন করতে তাদের বাসায় আশ্রয় নেন। সেই শিক্ষকই শেখ মুজিবের জীবনকে আলোকিত করার প্রথম প্রদীপটি জ্বালান। তিনি তাঁকে ইতিহাসের শাসকদের গল্প শোনান। বিপ্লব-বিদ্রোহের কাহিনি শোনান। বাংলার ইতিহাস কিশোর মুজিবের কাছে ছিল এক আদর্শময় পাঠ। বাঙালির কৃতিত্ব, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির জ্ঞানও তিনি ধীরে ধীরে গ্রহণ করেন। এই শিক্ষা গ্রহণ করার পাশাপাশি সেই সময়ের ব্রিটিশ শাসকদের শাসন ও শোষণ, গান্ধিজির আন্দোলন, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, রাজনৈতিক আন্দোলন, সামাজিক সমস্যাবলী, বন্যা-দুর্ভিক্ষ, খাদ্যাভাব–সবই তিনি তাঁর গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন।

স্কুল ছাত্র জীবনেই তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। যারা রাজনীতি করতেন তাদের খুব কাছাকাছি চলে যান। ঐ সময়ে বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক ও মন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জে রাজনৈতিক সফরে এলে তিনি তাঁদের সামনে গিয়ে স্কুলের ছাদ দিয়ে পানি পড়ার অভিযোগ তুলে ধরেন এবং মেরামতের দাবি জানান। তাঁর কথা বলার ভঙ্গি দেখে দুই নেতাই মুগ্ধ হন। সোহরাওয়ার্দী তাঁকে কাছে ডেকে কথা বলেন এবং এলাকার রাজনৈতিক খবরাখবর নেন। তিনি ঠিকানা দিয়ে চিঠি লিখতেও বলেন। শেখ মুজিবের সঙ্গে সেই প্রথম সম্পর্ক গড়ে ওঠে যা আজীবন ছিল। সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক আদর্শ শিষ্য হিসেবে শেখ মুজিব গড়ে উঠতে থাকেন। সেই সফরে সম্বর্ধনা জানাতে একটি কমিটি গঠিত হয়। পরবর্তীকালে সেই কমিটির একটি গোলমালের ঘটনায় শেখ মুজিবসহ চার পাঁচজনকে আসামি করে বিরোধীরা থানায় একটি মামলা করে। গোপালগঞ্জ থানা হাজতে সাতদিন বন্দি থেকে জামিনে মুক্তিলাভ করেন। পরবর্তীতে ১৫০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দিলে মামলা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। সেই তাঁর প্রথম কারাজীবন এবং এটাও তাঁর জীবনে গভীরভাবে প্রভাব ফেলে।

১৯৪২ সালে এন্ট্রান্স পাস করে শেখ মুজিব কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। ব্রিটিশ শাসিত দুই বাংলা একত্রে বাংলা বা বেঙ্গল হিসেবে পরিচিত ছিল। বাংলার মেধাবী, মননশীল ছাত্ররা ইসলামিয়া কলেজে লেখাপড়া করতো এবং বেকার হোস্টেলে থাকতো। ১৯২৬ সালে ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে এর নামকরণ হয় সেন্ট্রাল কলকাতা কলেজ। ১৯৬০ সালে উপমহাদেশের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ মাওলানা আবুল কালাম আজাদের নামে রাখা হয়। বর্তমানে মাওলানা আজাদ কলেজ নামে পরিচিত। শেখ মুজিব এখান থেকে ১৯৪৪ সালে আই.এ. এবং ১৯৪৭ সালে বি.এ. পাস করেন।

কলেজের পাসের রাস্তায় তালতলা থানার কাছেই বেকার হোস্টেল। তিনতলা বিরাট ভবন। শেখ মুজিব তিনতলার বাঁ দিকের সামনের সারির কোনায় ২৪নং কক্ষে থাকতেন। ছোট্ট কক্ষ, কোন ফ্যান ছিল না তখন। একটি ছোট্ট খাট। পাশেই কাঠের তৈরি পড়ার টেবিল ও চেয়ার। একটি ছোট্ট আলমারিও আছে। বর্তমানে এটি বঙ্গবন্ধু স্মৃতি কক্ষ নামে পরিচিত। তাঁর ছবি ও তাঁর সম্পর্কিত লেখা বইয়ের একটি আলমারিও আছে। পাশের ২৫ নম্বর কক্ষটিও এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর একটি ভাস্কর্য রাখা হয়েছে। দরোজার পাশে দেয়ালে বঙ্গবন্ধুর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনীও রাখা হয়েছে।





পাশাপাশি এই দুটি কক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও তাঁর সঙ্গীসাথীরাও থাকতেন। সারাদেশ থেকে তাঁর ছাত্র রাজনীতির কর্মী, ভক্ত ও অনুরাগীরা এসে দেখা করতো এখানেই। অনেক সভা করেছেন হোস্টেলে। হোস্টেল সুপার ছিলেন অধ্যাপক সাঈদুর রহমান। ছাত্র-কর্মীদের থাকার জন্য শেখ মুজিব খালি রুম বা বড় হলঘর চাইলেই তিনি কখনও না করতেন না। শেখ মুজিবের প্রতি তাঁর একটা আলাদা স্নেহ-ভালোবাসা ছিল। ইসলামিয়া কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন ড. এইচ. আর. জুবিরী। শেখ মুজিবের প্রতি তাঁর ছিল অপার স্নেহ। বিশেষ করে বি.এ. পরীক্ষায় বসার জন্য তিনি তাঁকে সবরকম সহযোগিতা করেছিলেন। কেননা দাঙ্গা-হাঙ্গামা, পুনর্বাসন ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে শেখ মুজিব তখন ব্যস্ত থাকতেন। মুসলিম লীগের রাজনীতির সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। একদিকে ছাত্রনেতা হিসেবে বলিষ্ঠ সংগঠক ছিলেন, অপরদিকে মুসলিম লীগের ড্রইংরুম রাজনীতিকে সাধারণের মাঝে নিয়ে আসার কাজে তিনি সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশেমের যোগ্য শিষ্য ছিলেন। বেকার হোস্টেলের ছাত্র সংসদের নেতৃত্বও তিনি নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং একবার সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন। শিক্ষক ও ছাত্র সকলের প্রিয় ছিলেন শেখ মুজিব। তাঁর আদর্শ, সাহস ও চিন্তা-ভাবনার প্রতি সকলের শ্রদ্ধা ছিল।

স্কুল ছাত্রজীবন থেকেই শেখ মুজিব দেশের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে মুসলিম লীগের ফরিদপুর জেলা প্রতিনিধি হিসেবে সিরাজগঞ্জে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্মেলনে যোগদান করে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এ সম্মেলনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহসহ ভারতের বড় বড় নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন। এছাড়াও দিল্লিতে ভারতীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্মেলনে তিনি দুইবার যোগদান করেন। সেখানেও নেতাদের ভাষণ শুনে তিনি অনুপ্রাণিত হন। কলকাতায় ছাত্রাবস্থায় তিনি দাঙ্গা দেখেছেন ও রুখেছেন। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনেও তাঁর ভূমিকা ছিল। ছাত্রজীবন থেকেই দেশপ্রেম ও দেশের জন্য কাজ করা তাঁর স্বভাবের অংশ হয়ে ওঠে। ছাত্রজীবনে তাঁর কর্মকাণ্ড, বিচক্ষণতা ও ভাষণ শুনে সবাই আকৃষ্ট হতো।

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে শেখ মুজিব ঢাকায় এসে ১৪০নং মোগলটুলীর 'কর্মী-ক্যাম্পে' ওঠেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন এবং সলিমুল্লাহ হলে মাঝে মাঝে থাকতেন। ঢাকায় এসে ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং মুসলিম ছাত্রলীগের স্বেচ্ছাচারিতা ও বাংলা বিরোধী ভূমিকার জন্য তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন। তিনি পূর্ব বাংলা মুসলিম ছাত্রলীগ গঠন করেন। যুবলীগেরও একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। খাজা নাজিমুদ্দিনের বাংলা ভাষাবিরোধী ভূমিকা এবং উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার হুমকির বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ যখন গর্জে ওঠে, তিনিও তাদের সঙ্গে নেতৃত্ব দেন। ১৯৪৮ সালে প্রথম প্রতিবাদ ও হরতাল পালিত হলে শেখ মুজিবও সবার সঙ্গে গ্রেফতার হন। পরে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ছাত্রদের দাবি মেনে নিয়ে সবাইকে মুক্তি দেন। এরপর শেখ মুজিব কৃষকদের দাবি নিয়ে আন্দোলন করেন। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করেন। এসময় উপাচার্যের বাড়ি ঘেরাওকালে তাঁকেও পুলিশ গ্রেফতার করে এবং অনেকগুলো মামলা দায়ের করে। কারাগারে থাকার সময় তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন। জেল থেকে বের হয়ে এক ছাত্রসভায় বক্তৃতা দিয়ে তিনি ছাত্র রাজনীতি

থেকে বিদায় নেন এবং জাতীয় রাজনীতিতে যোগদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। জেলে থাকাকালে সরকার তাঁকে জরিমানা ও মুচলেকার প্রস্তাব দেয় এবং জানায় তিনি যদি রাজনীতি না করেন, তাহলে ছাত্রত্ব ফিরিয়ে দেয়া হবে। তিনি সরকারি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে শেখ মুজিব টুঙ্গিপাড়ায় গ্রামের বাড়িতে কিছুদিন অবস্থান করেন। তাঁর পিতা শেখ লুৎফর রহমান তাঁকে লন্ডনে গিয়ে ব্যারিস্টারি পড়তে বলেন। কিন্তু শেখ মুজিব ততদিনে পাকিস্তানের শাসকদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকে অনুধাবন করে ফেলেন। তিনি তাঁর প্রিয় বাংলার জনগণকে পাকিস্তানের শোষণের মধ্যে ফেলে রেখে লন্ডনে গিয়ে আর পড়তে চাইলেন না। তিনি রাজনীতি করার সদিচ্ছা প্রকাশ করে বাংলার মানুষের দাবি আদায়ে আবার ঢাকা চলে এলেন। তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জীবনের ইতি ঘটে। কিন্তু ঘরে বসে বই পড়ার অভ্যাস থাকায় তিনি একটি লাইব্রেরি গড়ে তোলেন। স্বচ্ছ মনের মানুষ ছিলেন, রাজনৈতিক চিন্তার দিক থেকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, সাহসী, সৎ ও দৃঢ় চারিত্রিক আদর্শের অধিকারী ছিলেন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর আতঙ্ক ছিলেন একমাত্র শেখ মুজিব। মন্ত্রিত্বের লোভ, লাইসেন্সের টোপ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের নানা সুযোগ সুবিধা দিয়ে তখন অনেক নেতাকে ক্রয় করা যেত। কিন্তু শেখ মুজিব তাঁর লক্ষ্যে দৃঢ় ছিলেন। জেল-জুলুম মামলা-ফাঁসির ভয় তাঁর মাথা নত করতে দেয়নি। বাংলার মানুষের মুক্তির দাবিতে, অধিকার আদায়ে, শোষণের বিরুদ্ধে তিনিই ছিলেন সোচ্চার প্রতিবাদী। তাঁর বজ্রকণ্ঠ পাকিস্তানের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল।

দেশ ও মানুষকে তিনি তাঁর হৃদয়ের আধেয় করে একজন আত্মত্যাগী দেশপ্রেমিক নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। ছাত্রজীবন থেকে যে শিক্ষা ও দীক্ষা তাঁর জীবনকে আলোকিত করে তোলে, তার শিখা চিরন্তন করে রেখে গেছেন তিনি।

### বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধু

২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস। আর আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল নায়ক হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শুধু পাকিস্তান আমলের ২৩ বছর নয়, হাজার বছরের আন্দোলন-সংগ্রামের ফসল এই স্বাধীন বাংলাদেশ। শত বছর আগে মাস্টারদা সূর্যসেন, প্রীতিলতা, ক্ষুদিরামসহ বহু জানা-অজানা তরুণ, যুবক-যুবতী আত্মাহুতি দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ বপন করে গেছেন।

এটা ঠিক, বাঙালির জন্য একটি স্বাধীন ভূখণ্ড প্রতিষ্ঠার জন্য শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা ভাসানীসহ আরো অনেক নেতা শত বছরের মুক্তিসংগ্রামে বিভিন্নভাবে তাদের অবদান রেখেছেন। সর্বশেষ বাঙালির অমৃতের সন্তান শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে একাত্তরে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

বিশ্বখ্যাত সাময়িকী নিউজ উইক (৫ এপ্রিল, ১৯৭১) শেখ মুজিবকে 'Poet of Politics' অর্থাৎ 'রাজনীতির কবি' বলে আখ্যায়িত করেছে। কারো কারো মতে, শেখ মুজিব 'রাজনীতির জাদুকর' ছিলেন। জাদুকরের সঙ্গে তার পার্থক্য হলো, জাদুকর তার জাদু বা ম্যাজিকের মাধ্যমে অসাধ্যকে সাধন করে আর মুজিব বাস্তবে অসম্ভবকে সম্ভব করে





তুলেছেন। ইতিহাস সাক্ষী, একাত্তরে সাড়ে ৭ কোটি বাঙালি মুজিবের অঙ্গুলি হেলনে উঠবস করেছে। ৭ মার্চ প্রকাশ্য জনসভায় পাকিস্তানি বর্বরদের কামান-বন্দুক-মেশিনগানের হুমকির মুখে স্বাধীনতার মহানায়ক শেখ মুজিব বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন–'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ।... এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' অফিসের পিয়ন থেকে প্রধান বিচারপতি পর্যন্ত সে সময় মুজিবের ডাকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যান। দু-একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

৭ মার্চের ভাষণ সরাসরি সম্প্রচার করতে না দেওয়ায় বেতার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কাজ বন্ধ রেখে রাজপথে নেমে আসেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৫ মার্চ ঢাকা এলে বাবুর্চিরা রান্না করে খাওয়াতে অস্বীকার করেন। মুজিবের আহ্বানে পরে তারা সম্মত হন। গভর্নর টিক্কা খানকে প্রধান বিচারপতি বি এ সিদ্দিকী শপথবাক্য পাঠ করাননি। ১ থেকে ২৫ মার্চ রাত ১২টা পর্যন্ত এই বাংলায় মুজিবের শাসন কায়েম ছিল। ২৩ মার্চ ৩২ নম্বরের বাসভবনে মুজিব নিজে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকা এলে স্বাধীন দেশের সরকারপ্রধানের মতো শেখ মুজিব তাকে 'বাংলাদেশের অতিথি' হিসেবে উল্লেখ করেন। ২৫ মার্চ রাতে নিজের ও পরিবারের সদস্যদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করে সাহসের বরপুত্র মুজিব পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কাছে গ্রেফতারবরণ করেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, অসহযোগ আন্দোলনের ২৫ দিনেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যায়। আর ওই সময় শেখ মুজিব স্বাধীন দেশের সরকারপ্রধানের মতোই দেশ পরিচালনা করেন। আক্রান্ত হওয়ার পর বাংলার মানুষ ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু বা অন্য কোনো ছলিমদ্দি-আলিমুদ্দির ঘোষণার অপেক্ষা করেনি। রাজারবাগ পুলিশ লাইনস, পিলখানার ইপিআরসহ সারা বাংলায় মানুষ পাকিস্তানি দস্যুদের হামলার পাল্টা জবাব দেয়।

বাঙালি জাতির সৌভাগ্য শেখ মুজিবুর রহমানের মতো একজন অসাধারণ নেতা পেয়েছিল। সাহস, শৌর্য-বীর্য, দূরদর্শিতা, যোগ্যতা ও দেশপ্রেমে তার কোনো তুলনা হয় না। পাকিস্তানের ২৩ বছরে বহুবার তিনি জেলে গেছেন। আজকের দিনের রাজনীতিকদের মতো তিনি পালিয়ে বেড়ানোর রাজনীতি করতেন না। সত্যিকার অর্থেই দেশ ও দেশের মানুষের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন শেখ মুজিব। বাংলার মানুষ ভালোবেসে তাকে উপাধি দিয়েছে বঙ্গবন্ধু।

'৭০-এর ৭ ডিসেম্বর পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলার ১৬৯ আসনের মধ্যে ১৬৭টিতে জয়লাভ করে। আর পূর্ব বাংলায় অর্থাৎ প্রাদেশিক পরিষদে ৩০০ আসনের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ পায় ২৮৮ আসন। '৭০-এর নির্বাচনে মুজিব-ঝড়ে অন্যসব রাজনৈতিক দল ও নেতা কুপোকাত হয়ে যায়। নির্বাচনে প্রমাণ হলো, পূর্ব বাংলা বা বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলার একমাত্র অধিকার রয়েছে আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবের; অন্য কারো নয়।

নির্বাচনের পর '৭১-এর ৩ জানুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের শপথ পড়ান বঙ্গবন্ধু। শপথকালে বাংলার মানুষের কাছে ওয়াদা করে বঙ্গবন্ধু

বলেন, বাংলার দাবি-দাওয়ার সঙ্গে কোনো আপস করলে আপনারা আমাদের জ্যান্ত কবর দেবেন।

২ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় ছাত্রলীগের সভায় প্রথমবারের মতো স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা দেখা গেল। ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের সমাবেশে অনির্ধারিতভাবে হাজির হলেন বঙ্গবন্ধু। মঞ্চে ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেন। সভায় বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ঘোষণা এবং কবিগুরুর 'আমার সোনার বাংলা' গানটিকে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত নির্ধারণ করা হলো। বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে পল্টনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার দৃঢ়প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়। সভায় আবেগজড়িত কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমি যদি নাও থাকি তাহলেও সংগ্রাম চলবে।'

৩ মার্চ থেকে সারা দেশে ৬টা-২টা হরতাল শুরু হলো। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে লাখ লাখ মানুষের সামনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঘোষণা করেন, 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আর দেব, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ।... এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।' প্রকৃতপক্ষে ৭ মার্চের ভাষণই ছিল স্বাধীনতার ঘোষণা।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সারা বাংলাদেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হলো। ১ থেকে ২৫ মার্চ–এই ২৫ দিন পূর্ব বাংলায় সামরিক সরকারের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। সে সময় শেখ মুজিবের কথাই ছিল আইন।

পূর্ব পাকিস্তানের নতুন গভর্নর হিসেবে জেনারেল টিক্কা খান ৭ মার্চ ঢাকা এলেন। ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বি এ সিদ্দিকী গভর্নরকে শপথ পড়াতে অস্বীকার করলেন। এভাবে পিয়ন থেকে প্রধান বিচারপতি পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবের নির্দেশ মেনে চলতে লাগলেন? ১৫ মার্চ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ ৩৫টি নির্দেশ জারি করলেন। এ নির্দেশ মোতাবেক দেশ চলতে থাকে।

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করতে ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকা এলেন। ঢাকার রাস্তায়-রাস্তায় ব্যারিকেড দেয়া হলো, ইয়াহিয়াকে প্রেসিডেন্ট ভবনে আসতে দেয়া হবে না। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ব্যারিকেড তুলে নেয়া হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের অতিথি হিসেবে ঘোষণা করলেন।

সে সময় শেখ মুজিব হয়ে গেলেন পূর্ব বাংলার একমাত্র অধিপতি। জনগণনন্দিত নেতা। ৬ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া টেলিফোনে শেখ মুজিবকে অনুনয়-বিনয় করে বলেন, তিনি যেন ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্সে স্বাধীনতা ঘোষণা না করেন। ৭ মার্চ সকালে ঢাকাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করে রেসকোর্সের জনসভায় স্বাধীনতা ঘোষণা না করার অনুরোধ জানান। মার্কিন রাষ্ট্রদূত এটা বলতেও ভুল করেননি, পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা ঘোষণা করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহযোগিতা করবে না।

পূর্ব বাংলায় সামরিক শাসনের পরিবর্তে মুজিবের শাসন প্রবর্তিত হলো। ঢাকায় সে সময় কর্মরত পাকিস্তানি মেজর সিদ্দিক সালিক তার 'Witness to Surrender' গ্রন্থে





লিখেছেন, 'আওয়ামী লীগ তার শাসনকে সংহত করার জন্য একের পর এক নির্দেশ জারি করে চলল। এসব নির্দেশ সমাজের সর্বস্তরে তথা সরকারি অফিস-আদালত, কল-কারখানা, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সব ক্ষেত্রেই মেনে চলা হলো। এমনকি সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন রেডিও এবং টেলিভিশন মুজিবের আদেশ মেনে চলল। সারা প্রদেশকে গ্রাস করল মুজিবের শাসন। শুধু গ্রাস করতে পারল না প্রদেশের সাতটি সেনানিবাসকে।'

পাকিস্তান বিমান বাহিনীর সাবেক প্রধান আসগর খান '৭১-এর মার্চে ঢাকায় এসেছিলেন। তিনি বলেছেন, '২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে পূর্ব পাকিস্তানে সেনানিবাসগুলো ছাড়া সর্বত্র স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়তে দেখা গেছে।' বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্য দেখে পশ্চিম পাকিস্তানি নেতা ওয়ালি খান বলেছিলেন, 'মুজিবের অসহযোগ আন্দোলন, গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের চেয়ে বেশি সফল।'

একটি দেশে সরকার থাকা অবস্থায় বিরোধী দলের নেতার নির্দেশে সে দেশ চলার দ্বিতীয় কোনো উদাহরণ সম্ভবত বিশ্ব ইতিহাসে নেই। কিন্তু একাত্তরের মার্চের ২৫ দিন সামরিক সরকারের কোনো নির্দেশ পূর্ব বাংলার জনগণ শোনেনি বা মানেনি। শেখ মুজিব ৩২ নম্বর বাড়ি থেকে যে নির্দেশ দিয়েছেন বাংলার মানুষ বিনাবাক্যে তা মেনে নিয়েছে।

১৫ মার্চ, ১৯৭১। লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকায় বলা হয় সশস্ত্র পাহারায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঢাকার প্রেসিডেন্ট ভবনে পৌঁছানোর কথা। পূর্ব পাকিস্তানে তখন প্রকৃতপক্ষে শেখ মুজিবুরের শাসন চলছে, তার নির্দেশে সবকিছু হচ্ছে।

নিউইয়র্ক টাইমসের সাংবাদিক পেগি ডারডিন মার্চের সেই উন্মাতাল দিনগুলোর বর্ণনায় লিখেছেন, 'একজন রাজনৈতিক নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশাবলি জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে নিয়েছে। এ নির্দেশাবলি প্রয়োগের জন্য এই নেতার কোনো বাহিনী বা প্রশাসন ছিল না। এই স্বতঃস্ফূর্ত নির্দেশ মানার পেছনে ছিল পারস্পরিক বিশ্বাস এবং বাঙালি জাতির ও নেতার মধ্যে একটি অলিখিত অথচ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা অঙ্গিকার।' (সূত্র : সোহরাব হাসানের 'মুজিব-ভুট্টো-মুক্তিযুদ্ধ', পৃষ্ঠা ১৭৫)

৮ মার্চ লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফ লিখেছে, 'মনে হচ্ছে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন।' ১৫ মার্চ, ১৯৭১।

বিখ্যাত *টাইম* সাময়িকী লেখে, 'আসন্ন বিভক্তির অর্থাৎ পাকিস্তানকে দুটি পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত করার পশ্চাতে যে মানবটি রয়েছেন, তিনি হচ্ছেন শেখ মুজিব। গত সপ্তাহে ঢাকায় *টাইম*-এর সংবাদদাতা ডন কগিনকে মুজিব বলেন, 'পাকিস্তানের মৃত্যু হয়েছে, সমঝোতার আর কোনো আশা নেই।'

## বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা

বঙ্গবন্ধু ও বাঙালি অভিন্ন সত্তা। কিন্তু বঙ্গবন্ধু একদিনে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালিতে পরিণত হননি। এর পেছনে রয়েছে অনেক ত্যাগ, তিতিক্ষা, নির্যাতন, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা।

বাংলাদেশের ইতিহাসে অনেকে চর্চার বিষয়ে পরিণত হয়েছেন। এরা সবাই সমাজ আর অর্থনৈতিক বিকাশের কালের ফসল। সবাই স্বমহিমায় ভাস্বর। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পশ্চাদভূমি হলো '৫২-র ভাষা আন্দোলন, '৫৪-র যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন ও ২১ দফা, '৬২-র হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলের আন্দোলন, '৬৬-র বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা, '৭০-র নির্বাচন, নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়লাভ ও মার্চের অসহযোগ আন্দোলন, যা স্বাধীনতা যুদ্ধে রূপ নেয়। যুদ্ধ ও আন্দোলনে স্বনামখ্যাত ব্যক্তিত্বের সমাবেশ ঘটেছিল। এদের কেউই এতদঞ্চলের আপামর জনগোষ্ঠীর মূর্ত আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের প্রতীক হিসেবে আবির্ভূত হতে পারেননি। ত্রয়ী নেতৃত্ব থেকে বঙ্গবন্ধু একক নেতার আসনে ঠাঁই করে নেন।

বঙ্গবন্ধু তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের উপনিবেশ ছিল কি ছিল না অথবা জাতিগত দ্বন্দ্ব প্রধান কি অপ্রধান এসব বিষয়ের তর্ক রেখে তাঁর ৬ দফায় সমগ্র জাতির আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করেন। '৭০-র নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর দলের প্রতি জনসমর্থন, বাংলাদেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর অনুধাবন ও একে পরিবর্তনের দিক নির্দেশনার যথার্থ প্রয়োগের ফলেই ঘটনা পরম্পরায় ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের উদ্ভব ঘটে। বঙ্গবন্ধুর মেধা ও মনন সমগ্র জাতিকে একাট্টা করে যা সামাজিক পরিবর্তনের নিয়মটাকে খুব সহজেই সচল করেছে। পৃথিবীর যে কোনো দেশের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ সাধারণত স্বাধীনতা সপক্ষের শক্তিসমূহের যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। বাংলাদেশে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই স্বাধীনতার মূলধারা পরিচালিত হয়। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগারে থাকলেও মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা শক্তি হিসেবে পুরো জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর বিশাল প্রভাবের কারণেই সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামীলীগ জয়লাভ করে। শুধু তাই নয়, বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতি সত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয় তাঁরই গণভিত্তির জন্যে।

বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বিদেশি সাংবাদিক সিরিল ডান বলেছেন, বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে শেখ মুজিবই একমাত্র নেতা যিনি রক্তে, বর্ণে, ভাষায়, কৃষ্টিতে এবং জন্মসূত্রেও ছিলেন খাঁটি বাঙালি। তাঁর দীর্ঘ শালপ্রাংশু দেহ, বজ্রকণ্ঠ, মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করার বাগ্মিতা এবং জনগণকে নেতৃত্বদানের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও সাহস তাঁকে এ যুগের এক বিরল মহানায়কে রূপান্তর করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের 'নিউজ উইক' পত্রিকা বলেছে, শেখ মুজিব রাজনীতির কবি। যুক্তরাজ্যের মানবতাবাদী আন্দোলনের প্রয়াত নেতা লর্ড ফেনার ব্রকওয়ে বলেছেন, জর্জ ওয়াশিংটন, মহাত্মা গান্ধী, ডি ভ্যালেরার চেয়েও শেখ মুজিব এক অর্থে বড় নেতা। মিসরের বিখ্যাত সাংবাদিক হাসনাইন হাইকেল বলেছেন, নাসের কেবল মিসরের নন, সারা আরব জাতির মুক্তিদূত। তাঁর আরব জাতীয়তাবাদ আরব জনগণের শ্রেষ্ঠ মুক্তি-প্রেরণা। তেমনি শেখ মুজিবুর রহমান শুধু বাংলাদেশের নন, সারা বাঙালি জাতির মুক্তিদূত। তাঁর বাঙালি জাতীয়তাবাদ বাঙালির সভ্যতা ও সংস্কৃতির নব অভ্যুদয়মন্ত্র। মুজিব বাঙালির অতীত ও বর্তমানের শ্রেষ্ঠ মহানায়ক। ১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্সে জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে কিউবার অবিসংবাদিত নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো বলেছিলেন, আমি হিমালয় পর্বত দেখেনি। শেখ মুজিবকে দেখলাম। ব্যক্তিত্বে ও সাহসে এই মানুষটি হিমালয়। আমি হিমালয় দেখার অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট





একদল বিপথগামী সেনাসদস্য বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে বুলেটে ঝাঁঝরা করে দেয়। এর পেছনে ছিল দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র। সেই কালরাতে বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিনী বেগম ফজিলাতুন্নেছা, তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র মুক্তিযোদ্ধা লে. শেখ কামাল, পুত্র লেঃ শেখ জামাল, কনিষ্ঠপুত্র শেখ রাসেল, দুই পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, বঙ্গবন্ধুর ভাই শেখ নাসের, ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাত ও তাঁর কন্যা বেবী সেরনিয়াবাত, দৌহিত্র সুকান্ত আবদুল্লাহ বাবু, ভ্রাতুষ্পুত্র শহীদ সেরনিয়াবাত, বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মণি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মনি, বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তা অফিসার কর্নেল জামিল এবং ১৪ বছরের কিশোরপুত্র রিন্টুসহ পরিবারের ১৬ জন সদস্যকে ঘাতকরা হত্যা করে।

ইতিহাসের মহাসড়কের পথ ধরে বঙ্গবন্ধু নিজস্ব পথ তৈরি করে এগিয়ে গেছেন। তার বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা শুরু মুসলিম লীগের রাজনীতি দিয়ে। তা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে ওঠেন অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধারক বাহক। পাকিস্তান সৃষ্টির পর মুসলিম লীগের সামন্ত মানসিকতা ও শ্রেণি চরিত্র প্রত্যক্ষ করে অনেকের মতো তিনিও অনুধাবন করেন যে পাকিস্তান বাঙালি স্বপ্নপূরণে সমর্থ হবে না। আর যে মুসলিম লীগের পতাকাতলে তিনি নিজেও পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন, সেই মুসলিম লীগের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাই হয়তো বেশিদিন সম্ভবপর হবে না বলে তিনি মনে করেন।

এ স্বাধীনতা প্রকৃত স্বাধীনতা নয় তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। অধিকার, স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর লক্ষ্য ছিল এদেশের মানুষের কল্যাণ সাধন এবং স্বাধীন ও মুক্তির লক্ষ্যে তাদের চালিত করা। পর্যায়ক্রমে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির মনে সূর্যের আলোর প্রদীপ্ত শিখা প্রজ্বলিত করেছেন, জাতিকে করেছেন আত্মসচেতন, জাগিয়েছেন বাঙালি জাতীয়তাবাদের বোধশক্তি, দিয়েছেন গ্লোগান : 'জয়বাংলা'।

'জয় বাংলা' দিয়ে বাঙালি জাতিকে একসূত্রে গেঁথেছিলেন। সেই সাথে বাঙালি জাতিকে একটি চেতনায়, একটি ভাবধারায় ও একটি আকাঙ্ক্ষায় তিনি ঐক্যবদ্ধ করেছেন। পাকিস্তানি জান্তার সব রকমের ষড়যন্ত্র বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে বঙ্গবন্ধু এ দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষের প্রাণের মানুষে পরিণত হন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের রায় সেটাই প্রমাণ করে।

বাঙালি জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতা কেউ ঠেকাতে পারবে না এবং কোনো পশুশক্তি ও পরাশক্তির কাছে পরাজিত হবে না এ জাতি, তা বঙ্গবন্ধু একাত্তরের উত্তাল মার্চে বুঝতে পেরেছিলেন। এ জন্য মুক্তি ও স্বাধীনতার ডাক দিলেন সেই ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে : "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

তিনি বাঙালি জাতির শত বছরের বঞ্চনাকে মুছে দেবার জন্য স্বাধীনতার মর্মবাণী শুনিয়েছেন এবং স্বাধীনতা ঘোষণা দিলেন ২৬ মার্চ ১৯৭১ এর প্রথম প্রহরে। বাঙালি ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শত্রুমুক্ত করে স্বাধীনতার স্বপ্নপূরণে সক্ষম হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদের অগ্রনায়ক হিসেবে বাঙালিকে উপহার দিলেন 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'–এ জাতীয় সঙ্গীত।

ভাষাভিত্তিক ও জাতীয়তাবোধভিত্তিক রাষ্ট্র–বাংলাদেশকে একটি দেশের আত্মশক্তির প্রতীক করে তিনি বিশ্বের মানচিত্রে তুলে ধরেছিলেন। আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভাষা বাংলায় তিনি জাতিসংঘে ভাষণও দিয়েছেন। জাতিসংঘের সাধারণ সভায় মাতৃভাষা বাংলায় ভাষণ দিয়ে তিনি শুধু বাঙালি জাতিকে সম্মানিত করেননি, ভাষা শহীদদের প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শনের পরিব্যাপ্তি ছিল বাঙালি জাতিসত্তায়। বাঙালি জাতিসত্তায় বিশ্বাসী বাঙালির প্রাণপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু বাঙালিকে ভীষণ ভালোবাসতেন বলেই ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন দিনে দেশের মাটিতে পা রেখেই সেই ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে ছুটে যান লক্ষ লক্ষ অপেক্ষমাণ মানুষের সমাবেশে। ভাষণ দিতে গিয়ে উচ্চারণ করলেন : "আমি বাঙালি, আমি মানুষ, আমি মুসলমান, একবার মরে দুইবার মরে না। আমি বলেছিলাম, আমার মৃত্যু এসে থাকে যদি, আমি হাসতে হাসতে যাব। তোমাদের কাছে ক্ষমা চ্ইাব না এবং যাবার সময় বলে যাব, জয় বাংলা, স্বাধীন বাংলা, বাংলা আমার ভাষা, বাংলার মাটি আমার স্থান। আজ আমি বাংলাদেশে ফিরে এসেছি। আমার ভাইদের কাছে, আমার মা'দের কাছে। আমার বোনদের কাছে। বাংলা আমার স্বাধীন। বাংলার মানুষ আজ আমার স্বাধীন।"

১২ জানুয়ারি '৭২ বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করে শুরু করলেন নতুন অভিযাত্রা। পাশাপাশি তখন ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের এক জটিল প্রেক্ষাপট। এ অবস্থায় তিনি হাল ছাড়েননি। সে সময় তাঁকে ভাবতে হয়েছিল অনেক কথা–বাংলাদেশ থেকে ভারতে যাওয়া ১ কোটি শরণার্থীর পুনর্বাসন, ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহার, প্রশাসন গড়ে তোলা, আইনশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, মুক্তিযোদ্ধা নিয়ন্ত্রণ ও পুনর্বাসন, অন্যান্য বাহিনী নিয়ন্ত্রণ, জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তোলা, সড়ক-সেতু ও রেললাইন পুনঃস্থাপন, দালালদের বিচার করা, আন্ডারগ্রাউন্ড দলগুলোকে নিষ্ক্রিয় করা, পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙালি সরকারি-বেসরকারি জনগণকে ফিরিয়ে আনা, পরিত্যক্ত সম্পত্তির নিষ্পত্তি ইত্যাদি। দেশ পরিচালনার জন্য শাসনতন্ত্র দরকার, সেই নিরিখে চমৎকার একটি সংবিধান দিলেন মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে।

১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর বাংলাদেশ গণপরিষদে খসড়া শাসনতন্ত্র অনুমোদিত হয়। চারটি মূল স্তম্ভের ওপর এই সংবিধান রচিত হয়েছে। এই চার মূলনীতি হচ্ছে–জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। গণপরিষদে ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর শাসনতন্ত্র বা সংবিধান পাস করার দিনে প্রদত্ত ভাষণে এই চারনীতি সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু বলেন : "জাতীয়তাবোধের ভিত্তিতে বাঙালি জাতি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল চরম মরণ সংগ্রামে। জাতীয়তাবাদ না হলে কোনো জাতি এগিয়ে যেতে পারে না। এই মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে আমরা এগিয়ে গিয়েছি। আমরা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করি। ভাষাই বলুন, শিক্ষাই বলুন, সভ্যতাই বলুন, আর কৃষ্টিই বলুন, সকলের সাথে একটা জিনিস রয়েছে, সেটা হলো অনুভূতি। এই অনুভূতি যদি না থাকে, তাহলে কোনো জাতি বড় হতে পারে না। জাতীয়তাবাদ আসতে পারে না। জাতীয়তাবাদ নির্ভর করে অনুভূতির ওপর। আজ বাঙালি জাতি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে; এই সংগ্রাম





পরিচালিত হয়েছিল যার ওপর ভিত্তি করে, এই স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে যার ওপর ভিত্তি করে সেই অনুভূতি আছে বলেই আমি বাঙালি, আমার বাঙালি জাতীয়তাবাদ।" রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতিতে অসাম্প্রদায়িকতাই গণতন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপের সন্ধান দেয়, সেই পরম সত্যের সন্ধানটি বঙ্গবন্ধুই দিতে পেরেছিলেন এবং এই সত্যটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বাংলাদেশের সংবিধানে। অসাম্প্রদায়িকতার একজন সত্যদ্রষ্টা রাজনীতিবিদ হিসেবে দেশের জন্য কাজ করেছেন।

সেদিন গণপরিষদে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'বিপ্লবের পর ৯ মাসের মধ্যে শাসনতন্ত্র দেয়া, মানুষের মৌলিক অধিকার দেয়ার অর্থ হলো আমরা জনগণের ওপর বিশ্বাস রাখি।' তিনি শোষণ ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তার স্বপ্নের সোনার বাংলা। তাঁর রাজনৈতিক দর্শন ছিল শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। বঙ্গবন্ধু সব সময়ই ছিলেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার। তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন দেশপ্রেমিক জনশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার।

এক যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা দিলেন সোনার বাংলা গড়ার। রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকে আমৃত্যু পর্যন্ত মেহনতি মানুষের স্বার্থ রক্ষার বিষয়টিই তাঁর কাছে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু রাত-দিন পরিশ্রম করেছেন। তিনি পুঁজিবাদী শোষণের বাধা অতিক্রম করে জনসাধারণের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন করার লক্ষ্যে এদেশের জন্য কাঙ্ক্ষিত সমাজতন্ত্র কায়েম করতে চেয়েছেন। বঙ্গবন্ধু ভাবতেন এদেশে সাম্প্রদায়িকতা থাকবে না, রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনায় ধর্ম কোনো প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করবে না, ধর্ম হবে জনগণের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়।

কাজ করেছেন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের ভঙ্গুর অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য। সম্পদের সামাজিকীকরণের লক্ষ্যে জাতিকে উপদেশ দেন প্রথম পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনা। নিরন্তর চেষ্টা করেছেন দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন ঘিরে রয়েছে মেহনতি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার চিত্রপট। কৃষক-শ্রমিকদের কাজ-কর্মকে খুবই শ্রদ্ধার সাথে দেখতেন।

গণপরিষদে বঙ্গবন্ধু এক ভাষণে বলেন : "করাপশন আমার বাংলার কৃষকরা করে না। করাপশন আমার বাংলার মজদুররা করে না। করাপশন করি আমরা শিক্ষিত সমাজ।" বিভিন্ন স্থানে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ভাষণে প্রমাণ মেলে তিনি এদেশের কৃষক–শ্রমিকসহ মেহনতি মানুষকে, স্বদেশকে কতোটাই-না ভালোবাসতেন। বঙ্গবন্ধুর এই দেশপ্রেম, দেশের মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ, কথা ও কাজের মধ্যে মিল, সত্যনিষ্ঠা, আপসহীন মনোভাব তাঁকে করে তুলেছিল অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে এবং বিশ্বরাজনীতিতে একজন প্রজ্ঞাবান ও বিচক্ষণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে অর্জন করেছিলেন সম্মানজনক অবস্থান।

বাঙালি জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিস্মরণীয় অবদান স্বাধীন বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে নিয়ে ভেবেছেন। বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর কথা তাঁর রাজনৈতিক দর্শনে

ও কর্মে কৈশোর থেকেই স্থান করে নিয়েছিল, এ কারণেই তাঁকে প্রদত্ত 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি (১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি) এদেশের মানুষের ভালোবাসার প্রতিদান হিসেবে সার্থক হয়ে উঠেছে।

যখন বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের শাসন ভার গ্রহণ করেন তখন দেশের শতকরা ৮৫ ভাগ লোক কৃষির ওপর নির্ভরশীল ছিল। তাদের কথা চিন্তা করে বঙ্গবন্ধু একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু বলেন, "বাংলাদেশের এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি রাখা যাবে না।" কৃষিকাজে বাংলার কৃষকদের ব্যাপকভাবে মনোনিবেশ করার জন্য বঙ্গবন্ধুর অবদান কম নয়। তিনি জানতেন কৃষকরা যদি সঠিকভাবে উৎপাদন করে তাহলে দেশের খাদ্য সমস্যা দ্রুত নিরসন হবে, যা জাতীয় আয়কে আরও প্রশস্ত হবে। কৃষি উৎপাদনে উৎসাহ প্রদানে বঙ্গবন্ধু জাতীয় পুরস্কার দানের কথা ঘোষণা করেন। অন্যদিকে কৃষি গবেষণা ছাড়া যে কৃষি উন্নতি সম্ভব নয় তাও বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেন। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল ১৯৭৩ সালে গঠন করেন বঙ্গবন্ধু। বাংলার চাষীদের অধিকার আদায়ে বঙ্গবন্ধু বজ্রকণ্ঠ বারবার গর্জে উঠতো। সোনার বাংলা গড়ার কারিগর তো বাংলার কৃষক-সমাজ। বাংলাদেশের স্বাধীন হওয়ার পরে ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা দিবসে জাতীয়করণের নীতি ঘোষণা উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু বেতার-টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন।

সেখানেও তিনি কৃষকদের কথাই বলেন এভাবে : "আমাদের চাষীরা হলো সবচেয়ে দুঃখী ও নির্যাতিত শ্রেণী এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্যে আমাদের উদ্যোগের বিরাট অংশ অবশ্যই তাদের পিছনে নিয়োজিত করতে হবে। সম্পদের স্বল্পতা থাকা সত্ত্বেও আমরা চাষীদের স্বল্পমেয়াদি সাহায্য দানের জন্যে ইতিমধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। ২৫ বিঘার কম জমি যাদের আছে তাদের খাজনা চিরদিনের জন্যে মওকুফ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে সমস্ত বকেয়া খাজনা মাফ করা হয়েছে। তাকাবি ঋণ বাবদ ১০ কোটি টাকা বিতরণ করা হচ্ছে এবং ১৬ কোটি টাকা টেস্ট রিলিফ হিসাবে বিতরণ করা হয়েছে। লবণের ওপর থেকে কর তুলে দেয়া হয়েছে।"

১৯৭৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধান বাঙালির নেতা হিসেবে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দেন। সব মানুষের পৃথিবী গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার অর্জনের জন্য এবং একটি স্বাধীন দেশে মুক্তি নাগরিকের মর্যাদা নিয়ে বাঁচার জন্য বাঙালি জনগণ শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী সংগ্রাম করিয়াছেন, তাঁহারা বিশ্বের সকল জাতির সাথে শান্তি ও সৌহার্দ্য নিয়ে বাস করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন।' তিনি দেশিয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সমস্যায় আক্রান্ত তাঁর স্বদেশের কথা তুলে ধরেন। তিনি দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অশিক্ষা ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে তাঁর দেশের লড়াই করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

বঙ্গবন্ধু সকলকে মানসিকতা পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'প্রতিটি কাজই আমার, মাটি কাটা আমার কাজ, ফ্যাক্টরিও আমার কাজ, রাস্তা বানানোও আমার কাজ।'

তিনি দেশের উন্নয়নের সাথে জনগণের সম্পৃক্ততা ওপর জোর দেন। তিনি বলতেন, 'আমার মাটির সাথে, আমার মানুষের সাথে, আমার কালচারের সাথে, আমার ইতিহাসের





সাথে যুক্ত করেই আমার ইকোনোমিক সিস্টেম গড়তে হবে।' অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের মানুষের সাথে আবেগগতভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি সবসময় বলতেন, প্রধানমন্ত্রিত্বের জন্য তিনি রাজনীতি করেন না, কারণ ইচ্ছে করলে তিনি অনেক আগেই প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন। তাই তিনি বলেন, 'এ প্রধানমন্ত্রীত্বে যদি বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে না পারি, আমি যদি দেখি বাংলার মানুষ দুঃখী, আর যদি দেখি বাংলার মানুষ পেট ভরে খাই নাই, তাহলে আমি শান্তিতে মরতে পারবো না।'

আর বলতেন 'আমার যৌবন কারাগারের অন্তরালে দিয়েছি এ দেশের মানুষের জন্যে। আমি ওদের কাছে থাকতে চাই, ওদের সাথে মরতে চাই, এর বেশি আমি আর কিছুই চাই না।'

বঙ্গবন্ধুর জীবন সাধনাই ছিল বাঙালির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি। এজন্য জেল, জুলুম, হুলিয়া, ফাঁসির কাষ্ঠ পেরিয়ে প্রাণও দিলেন সপরিবারেই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে। বাঙালি জাতির ট্র্যাজেডির মহানায়কও তিনি। বীরের জাতির পিতা বীরের মতো মৃত্যুবরণ করেছেন। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে এমন আরেকজন মহান নেতার আর্বিভাব ঘটেনি। যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন দেশের বঙ্গবন্ধু যখন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক মুক্তির নবতর কর্মসূচি সফলভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন সেসময় পরাজিত ও ঘৃণ্য অপশক্তি তাঁর ওপর চরম আঘাত হানে, তাঁকে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধু সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ও ইতিহাসের মহানায়ক হিসেবে ঠাঁই পেয়েছে। এখন থেকে স্থানচ্যুত করার অপপ্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর। এ জন্য নতুন প্রজন্ম বিভ্রান্ত হয়েছিল। সময়ের ব্যাপ্তিতে বঙ্গবন্ধুর ঔজ্জ্বল্য স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে।

পাশাপাশি পরাজিত ও ঘৃণ্য অপশক্তি স্বাধীন দেশের ইতিহাস, দেশের অগ্রযাত্রা ও বঙ্গবন্ধুর অবিস্মরণীয় কীর্তিকে ব্যাহত করতে চেয়েছিল পরিকল্পিতভাবে। যতদিন যাচ্ছে নতুন প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধুর মহিমান্বিত কীর্তি ততই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এবং উঠছে। তাঁর জীবদ্দশায় প্রতিটি মুহূর্ত নিবেদন করে গেছেন আমাদের জন্য। স্বদেশকে তাঁর জীবনের চেয়ে বেশি মূল্যবান মনে করতেন বলেই তিনি হতে পেরেছেন বাঙালির প্রাণপুরুষ ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে ভালোবেসেছিলেন। তাই তো তিনি আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে আছেন।

বন্দুকের নল ধরেও ক্ষমতারোহণ করেননি। তিনি গড়েছিলেন এক রক্তাক্ত আদর্শের পতাকা। ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহে ১৯৭১ সালে বিশ্বের মানচিত্রে প্রথমবারের মতো অঙ্কিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ। দীর্ঘ স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। তাই ইতিহাসের পাতায় তার নাম ভাস্বর থাকবে চিরকাল। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের হত্যাকারীরা তাকে হত্যা করে তার নাম মুছে ফেলার যে চেষ্টা চালিয়েছিল তা কেবল অপচেষ্টায়ই পর্যবসিত হয়েছে। কোটি কোটি বাঙালির মনে তিনি চিরভাস্বর, বাঙালি জাতির প্রাণপুরুষ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালি জাতির জীবনের অংশ তিনি। বাংলাদেশ ছিল তাঁর স্বপ্নের দেশ,

ইচ্ছা পূরণের দেশ। বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বপ্ন ও ইচ্ছা পরিপূর্ণভাবে পূরণ করে যেতে পারেননি। দেখে যেতে পারেননি দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি।

বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করতে চায় আজকের প্রজন্ম। বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে সামনে রেখে নতুন প্রজন্ম অঙ্গিকারবদ্ধ হতে চায়, যা দিয়ে বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ করা যায়। স্বদেশি উন্নয়নধারায় বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে বঙ্গবন্ধুর গণহিতৈষী চেতনাকে আজকের প্রজন্ম ধারণ করে এগিয়ে নিয়ে যেতে যায় বহুদূর। আর প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের কামনা বঙ্গবন্ধুর চেতনা চিরকাল যেন জাগরূক থাকে।

তাই আজকের প্রজন্ম ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তাঁকে সঠিকভাবে তুলে ধরা আমাদের সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য। বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আত্মত্যাগের ইতিহাস থেকে আজকের প্রজন্ম নিজেকে দীক্ষিত করতে পারবে এবং দেশের উন্নয়নে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারবে। যেমনটি করেছিলেন বঙ্গবন্ধু মাতৃভাষা, মাতৃভূমি এবং জাতির স্বাধীনতার জন্য। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন পর্যালোচনা করে দেখা যায়, বাংলাদেশকে স্বাধীন করাই ছিল বঙ্গবন্ধুর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। নিহত হওয়ার পূর্বক্ষণটিতেও তিনি দেশ ও জাতির কল্যাণের কথা অন্তর দিয়ে ভেবেছেন।

বাঙালির শতবর্ষের ইতিহাসে গৌরবময় অর্জন হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। ভারত-পাকিস্তানের মতো আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়নি। এই স্বাধীনতার জন্য শত বছর আগে মাস্টারদা সূর্যসেন, প্রীতিলতা, ক্ষুদিরামসহ আরো অনেকে ফাঁসিতে জীবন দান করে গেছেন। অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েই ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ হয়েছিল। ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধে মীরজাফর গংদের বিশ্বাসঘাতকতায় নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হলে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়। পলাশীর পরাজয়ের ২১৪ বছর পর ১৯৭১ সালে বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমাদের স্বাধীন আবাসভূমি স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত ২৩ বছরের আন্দোলন সংগ্রামেও শত শত মানুষ মৃত্যুবরণ করেছেন। তবে ১৯৭১ সালে শুধু ৯ মাসের সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধে ৩০ লাখ মানুষ শহীদ হয়েছেন এবং ৪ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমহানি ঘটেছে। ওই সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় নিজামীচক্র হাজার হাজার বাড়িঘর জ্বালিয়ে ছাই করে দিয়েছে। তবে দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে চার দশকেও স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদদের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করা হয়নি।

স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস গৌরবের। '৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর বিশ্বের মধ্যে দুর্ধর্ষ সামরিক বাহিনী হিসেবে পরিচিত প্রবল পরাক্রমশালী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৯৩ হাজার সেনাসদস্য বাংলার দামাল মুক্তিবাহিনীর কাছে নাকে খত দিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। মুক্তিযোদ্ধারা জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু বলে সম্মুখ সমরে হাসতে হাসতে জীবন দিয়েছেন। একাত্তর বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে এক গৌরবময় হিরণ্ময় সময়। সে সময় সাড়ে সাত কোটি বাঙালি শেখ মুজিবের নেতৃত্বে যেভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন, এই ধরনের ঐক্যের কোনো দ্বিতীয় উদাহরণ হাজার বছরের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ২৭ বছরের যুবক শেখ মুজিব ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দেন। আর সেই মুজিব আমেরিকা, চীনসহ বহু রাষ্ট্রের বিরোধিতা সত্ত্বেও মাত্র ২৩ বছরের মাথায় পাকিস্তান





ভেঙে চুরমার করে দিলেন। মুজিবের অতিমানবীয় নেতৃত্ব বাঙালি জাতিকে শুধু ঐক্যবদ্ধ করেনি, বাঙালিকে বীরের জাতিতে পরিণত করে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে কথা বলার মতো দেশে কোনো বিরোধী দল ছিল না। এই পরিস্থিতিতে যুব নেতা শেখ মুজিব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ৪ মাস পর ১৯৪৮-এর ৪ জানুয়ারি ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে ছাত্রলীগের মাধ্যমে মুজিব বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনকে ধীরে ধীরে কীভাবে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে নিয়ে গেছেন। এই বাঙালি নেতা পূর্বপাকিস্তানকে সব সময় পূর্ববাংলা নামে উল্লেখ করেছেন। পাকিস্তান পার্লামেন্ট এমএনএ হিসেবে তিনি সবসময় পূর্ববাংলার বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। পূর্বপাকিস্তানকে (পূর্ব বাংলা) সময় মতো তিনি যে স্বাধীন করতে চান, তা আকারে ইঙ্গিতে সবসময় বুঝিয়ে দিয়েছেন।

'৭০-এর ডিসেম্বরে নির্বাচনের আগে ১২ নভেম্বর ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে দক্ষিণাঞ্চলে লাখ লাখ মানুষের প্রাণহানি ঘটে। সপ্তাহব্যাপী ঘূর্ণিদুর্গত অঞ্চল ঘুরে ২৬ নভেম্বর ঢাকায় এক জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে বিদ্রোহী বাংলার বিদ্রোহী মুজিব একপর্যায়ে স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'বাংলাদেশ আজ জেগেছে। বানচাল করা না হলে বাংলার মানুষ নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের রায় ঘোষণা করবে। আর যদি নির্বাচন বানচাল করা হয়, ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে নিহত দশ লাখ লোক আমাদের ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করে গেছে, তা সম্পাদনের জন্য স্বাধীন দেশের নাগরিকের মতো বাঁচার জন্য এবং আমরা যাতে নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্তা হতে পারি, এর জন্য প্রয়োজনবোধে আরো দশ লাখ বাঙালি প্রাণ বিসর্জন দেবে।' এ সময় একজন বিদেশি সাংবাদিক জানতে চান, এই উক্তির মাধ্যমে কি আপনি পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ সৃষ্টির কথা বলছেন? ত্বরিত উত্তরে সাহসের বরপুত্র জাতীয় নেতা মুজিব বলেন, 'Not yet' (এখনই নয়)। অর্থাৎ এই বক্তব্যের মাধ্যমে শেখ মুজিব বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিলেন, প্রয়োজনে তিনি স্বাধীনতার ডাক দেবেন। '৭১-এর ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিব '৬৯-এর ২৬ নভেম্বরের রেশ ধরেই আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে বলেছিলেন, 'বাংলার মানুষকে আর দাবায়া রাখতে পারবা না। রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, স্বাধীনতা সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করার জন্যই '৬৬ সালে শেখ মুজিব ৬ দফা দিয়েছিলেন। আইয়ুব-ভুট্টোসহ পশ্চিমা সামরিকচক্র ৬ দফার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বুঝেই মুজিবকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে আখ্যায়িত করেছিল। আর শেখ মুজিবও জানতেন, 'ওরা ৬ দফা মানবে না আর তখনই ৬ দফা এক দফায় পরিণত হবে।' একইভাবে সামরিক বিধির বেড়াজালে ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের অনেকেই নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিপক্ষে ছিলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, 'নির্বাচনে অংশ না নিলে বাংলার মানুষের পক্ষে কথা বলার অধিকার অর্জন করা যাবে না।' তিনি এও জানতেন, 'নির্বাচনে বাংলার মানুষ তাকে ও তার দলের পক্ষে রায় দেবেন। নির্বাচনী ফলাফল মেনে না নিলে বাঙালি জাতি ব্যালটের রায় রক্ষার জন্য বুলেট হাতে নেবে।' পরে মুজিবের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সঠিক প্রমাণিত হয়েছিল।

মার্কিন কূটনীতিক অ্যার্চার বব্লাড তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন–শেখ মুজিব ছিলেন পূর্বপাকিস্তানের 'মুকুটহীন সম্রাট।' মুজিব ১৯৬৯-এর জুনেই বব্লাডকে বলেছিলেন, 'সামরিক বাহিনী যদি আমাকে বাধা দেয় তাহলে আমি স্বাধীনতা ঘোষণা করে গেরিলা যুদ্ধের ডাক দেব।' ঐতিহাসিকদের মতে, সত্তরের নির্বাচনই হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল ভিত্তি। এ নির্বাচনে পূর্ববাংলার ১৬৯ আসনের মধ্যে ১৬৭টি পেয়ে মুজিবের দল পাকিস্তান পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। তাছাড়া প্রাদেশিক নির্বাচনে পূর্ববাংলায় ৩০০ আসনের মধ্যে তার দল ২৮৮ আসন পায়। এমনিভাবে ৭ ডিসেম্বর ও ১৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনে পূর্ববাংলার জনগণের শতকরা ৯৮ ভাগ মানুষের সমর্থন পেয়ে আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিব পূর্ববাংলার জনগণের একমাত্র মুখপাত্র হয়ে গেলেন।

'৭১-এর ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যখন ৩ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠেয় জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন স্থগিত করেন, পাকিস্তান সেদিনই ভেঙে যায়। এরপর ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ স্বাধীন বাংলাদেশ পরিচালনা করেন। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দেন। তিনি বলেন, 'আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা রাস্তাঘাট বন্ধ করে দিও।' 'আমরা ভাতে মারব, পানিতে মারব বলে তিনি গেরিলা যুদ্ধের দিকনির্দেশনা দেন। ১৫ মার্চ স্বাধীন দেশের সরকার প্রধানের মতো বঙ্গবন্ধু ৩৫টি নির্দেশ জারি করেন। ২৩ মার্চ ৩২ নম্বরের বাসভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু করলে ২৫ মার্চ রাতে গ্রেপ্তার হওয়ার আগে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি ৯ মাস অনুপস্থিত থাকলেও তার নামেই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। মনীষী আবুল ফজল বলেছেন, 'অনুপস্থিত সেনাপতির এমন সেনাপতিত্ব সত্যিই অভিনব, ইতিহাসে এমন নজির বিরল।'

স্বাধীনতাবিরোধীরা যাই বলুক, ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে, 'শেখ মুজিব ঘুমন্ত জাতির জাগরণের জন্য জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করেছেন। দেশ ও জাতিকে তিনি আত্মশক্তিতে বীর্যবান করে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। শেখ মুজিবের অপরিসীম আত্মত্যাগের ফসলই হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশ।

শেখ মুজিব ও বাংলাদেশ একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অংশ। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটিকে কল্পনা করা যায় না। বঙ্গবন্ধু ছিলেন স্বাধীনতার প্রতীক ও জাতীয় বীর। তিনি ছিলেন খাঁটি দেশপ্রেমিক। তিনি বাংলার মাটি ও মানুষের জন্য অকাতরে নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন। বাংলার জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। রাজনীতিতে আদর্শ ও মূল্যবোধের চর্চায় এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব বঙ্গবন্ধু। অন্য রাজনীতিবিদদের তিনি রোল মডেল। তাই ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু একটি হিরণ্ময় নাম।

**বঙ্গবন্ধুর অপর নাম বাংলাদেশ**

বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালি জাতির নবজাগরণের অগ্রদূত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম বাঙালির ইতিহাসে





ও প্রকৃত বাঙালির প্রতিটি মানুষের অন্তরে সোনার অক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। তিনি ছিলেন উদার, বলিষ্ঠ, আত্মপ্রত্যয়ী, নির্ভীক, দৃঢ়, বুদ্ধিদীপ্ত, প্রজ্ঞাবান, অসম সাহসী ও আত্মত্যাগী এক অভিভাবক ও নেতা।

বাংলাদেশের হৃদয় গভীর শ্যামল একটি গ্রাম টুঙ্গিপাড়া থেকে ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ উত্থিত হন তিনি, তারপর দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের ধারাবাহিকতায় নিজেকে স্থাপিত করেন ইতিহাসের পটভূমিতে, বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্নের অনন্য মুক্তিদাতা রূপে। স্থির পদবিক্ষেপে তিনি আমাদের প্রাণিত করেন মুক্তিযুদ্ধে। তাঁরই রণমন্ত্র জয় বাংলা কণ্ঠে ও বাহুতে ধারণ করে আমাদের বিজয় অর্জিত হয় ১৯৭১ এ। কোটি কণ্ঠের জয় বাংলা ধ্বনির প্লাবনে ভেসে যায় পৃথিবীর এ-প্রান্ত থেকে ও- প্রান্ত।

বিশ্ব অবাক হয়ে চেয়ে রয় বাঙালি ও বঙ্গবন্ধুর দিকে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বের ও নিপীড়িত শৃঙ্খলিত সকল স্তরের মানুষের কাছে হয়ে ওঠেন মুক্তির প্রতীক। তাঁকে ঘিরেই বাঙালি জাতি স্বপ্ন দেখেছে নিজের সত্তা নিয়ে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার। তিনি বাঙালি জাতিকে যার যা কিছু আছে তা নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন। ৭ মার্চের ভাষণে তিনি বলেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।' তাই তাঁরই ডাকে বাংলার সর্বস্তরের জনগণ দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধ করে এই সোনার বাংলাকে স্বাধীন করে।

তিনি তার সকল ভাষণে অনবরতই বলেছেন, গণমানুষের অধিকারের কথা। দেশবাসীর কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন মানুষ হিসেবে মর্যাদার সঙ্গে বাস করার মৌলিক সত্য। বিশ শতকের সেই চল্লিশ দশক থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত সময়টুকু যদি বিবেচনা করি, তাহলে দেখব শেখ মুজিবুর রহমান শেখ মুজিব বা বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেছিলেন কয়েকটি কারণে। সেগুলো হলো : লক্ষ্যবিচ্যুত না হওয়া, লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য একাগ্রতা, সাহস, সহৃদয়তা, মানবিকতা, আত্মত্যাগ, সত্যনিষ্ঠা এবং সহিষ্ণুতা। তাঁর চলাফেরা, পোশাকআশাক, কথাবার্তা, চালচলন সবকিছুর মধ্যেই ছিল বিশাল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বন্ধন অটুট রাখার ইচ্ছা। শৈশব থেকে দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন–সব সময় কাজ করে গেছেন সাধারণ মানুষের ভাগ্য বদলাতে।

ডেভিড ফ্রস্টের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, 'আমার একমাত্র যোগ্যতা মানুষকে ভালোবাসতে পারা। 'আবার সবচেয়ে বড় দুর্বলতার প্রশ্নেও তার একই উত্তর। বাংলাদেশের স্বপ্নের দাবিদার অনেকে। গত শতকের ষাটের দশকে মওলানা ভাসানীও বাঙালিদের জন্য স্বাধীন ভূখণ্ডের কথা বলেছেন, তবে তা ছিল তার ভাষায় স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান, বাংলাদেশ নয়।

সে যা-ই হোক, স্বাধীন ভূখণ্ডের স্বপ্নের রূপ বাস্তবে কেউ দিতে পারেনি। সেই স্বপ্ন ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাস্তবে রূপ পেয়েছিল একেবারে একজন খাঁটি বাঙালি শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে। তিনিই পেরেছিলেন বাঙালিদের জন্য নির্মাণ করে দিতে একটি ভৌগোলিক রাষ্ট্রের সীমানা। বঙ্গবন্ধু বলি, জাতির পিতা বা জাতির জনক বলি বা শেখ মুজিব বলি–যে নামেই তাকে সম্বোধন করি না কেন, বাংলাদেশের কথা বললেই

ভেসে ওঠে তার অবয়ব এবং এ কারণেই তার স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গেছে ইতিহাসের পাতায় এবং সে কারণেই আমরা তাকে বারবার স্মরণ করি।

ইতিহাসে তিনিই অমর যিনি সমগ্র জাতিকে স্বপ্ন দেখাতে পারেন–ইতিহাস তারই পক্ষে যিনি সময়ের বিচারে নিজেকে যোগ্য বলে প্রমাণ করতে পারেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও ইতিহাসের সেই মহামানব সময় যাঁকে সৃষ্টি করেনি, যিনি সময়কেই নিজের করতলে নিয়ে এসেছেন। যিনি কঠিন স্বরে নিজস্ব ভঙ্গিতে উচ্চারণ করেছিলেন সর্বকালের উপযোগী ও সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সব দেশের জন্য প্রযোজ্য একটি অমর পঙ্‌ক্তি 'আর দাবায়ে রাখবার পারবা না।' বঙ্গবন্ধু তার ৭ মার্চের ভাষণে এই কথাটি সমগ্র জাতির সামনে উচ্চারণ করেছিলেন।

বর্তমান বিশ্বের আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের সামনেও তার এই অমর পঙ্‌ক্তিটি একটি মৌলিক দর্শন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। পৃথিবীর কোনো দেশই কারো কাছে পদানত হয়ে থাকার ন্যূনতম শর্ত গ্রহণ করে না। বঙ্গবন্ধু জাতির সামনে এই অমোঘ পঙ্‌ক্তিটি উচ্চারণ করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে বাঙালির জীবনে এই ঘটনার আর কোনো দিন পুনরাবৃত্তি হবে না। তিনিই বিশ্বের বাংলাভাষী মানুষের মধ্যে সেই মানুষ যিনি ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘে নিজ মাতৃভাষা বাংলায় বক্তৃতা করেছিলেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরে তিনিই সেই মানুষ যিনি বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাঙালির এই অসাধারণ অর্জন বঙ্গবন্ধুর মেধা ও তার রাষ্ট্রীয় দর্শনের কারণেই সম্ভব হয়েছিল। ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভের পর ২৫ সেপ্টেম্বর তিনি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ দেন। ভাষণের শুরুতে তিনি বলেছিলেন, আজ এই মহিমান্বিত সমাবেশে দাঁড়াইয়া আপনাদের সাথে আমি এইজন্য পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির ভাগীদার যে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ এই পরিষদের প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে পূর্ণতা চিহ্নিত করিয়া বাঙালি জাতির জন্য ইহা একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত।

'তিনি আরো বলেছিলেন, 'যে মহান আদর্শ জাতিসংঘ সনদে রক্ষিত আছে, আমাদের লক্ষ লক্ষ মানুষ সে আদর্শের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন।' আর এভাবেই তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রের মর্যাদা, মানুষের মর্যাদা, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

মাত্র সাড়ে তিন বছর সময়ে তিনি যে বিপুল কাজ করতে চেয়েছিলেন সেটি ছিল পর্বত সমান। তার সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও তিনি সব চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করেই এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সংঘটিত হলো বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক বেদনাবিধূর ও কলঙ্কজনক অধ্যায়। দেশের স্বাধীনতাবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে ঘাতকচক্রের হাতে ধানমণ্ডির নিজ বাসভবনে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে শহীদ হন। দেশি-বিদেশি চক্রান্তের সামনেও বঙ্গবন্ধু





ছিলেন নির্ভীক। নিজের জীবনের জন্য তিনি কখনো ভীত ছিলেন না। বাঙালি জাতিকে অবিশ্বাস করার মতো মানসিক দীনতাও তাঁর মধ্যে কখনো ছিল না। 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ' কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই অমর বাণীটিকে তিনি ধ্রুবব সত্য বলে মেনেছিলেন। আর সেজন্যই তিনি নিরাপত্তার স্বার্থে নিজ বাসভবন ছেড়ে সরকারি বাসভবনে প্রহরীবেষ্টিত হয়ে থাকার কথা ভাবেননি। তাহলে তো তাঁর গণমানুষের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হবে। কিন্তু বাংলার মানুষকে ভালোবাসার মূল্য দিয়েছেন তিনি নিজের জীবন দিয়ে।

## রক্তঝরা ১৫ আগস্ট

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট প্রত্যুষে সেনাবাহিনীর একদল সদস্যের হাতে ধানমন্ডির ঐতিহাসিক ৩২ নম্বর সড়কে নিজ বাসভবনে হত্যার শিকার হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা ছাড়া তাঁর পরিবারের সব সদস্যকেই সেদিন হত্যা করা হয়। বঙ্গবন্ধুকন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা তখন বেলজিয়ামে অবস্থান করায় ভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে যান। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোররাতে ঘাতকের বুলেট বঙ্গবন্ধু ছাড়াও তাঁর স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল, শিশুপুত্র শেখ রাসেল, দুই পুত্রবধূ সুলতানা কামাল (খুকী) ও পারভীন জামাল (রোজী), বঙ্গবন্ধুর একমাত্র ছোট ভাই শেখ নাসের, ভগ্নিপতি তৎকালীন মন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাত, ভাগ্নে আওয়ামী যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলুল হক মণি, তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মনি এবং বঙ্গবন্ধুর জীবন বাঁচাতে ছুটে আসা কর্নেল জামিলের প্রাণও কেড়ে নেয়। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী ১৫ আগস্টকে জাতীয় শোকদিবস হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে পালন করা হচ্ছে। আজ দেশের সব সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশে বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশনে কালো পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে। সরকারের নির্দেশে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শোক দিবসের কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। দিনটিকে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। এ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক পৃথক বাণী দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হওয়ার পরবর্তী টানা ২১ বছর তার শাহাদাতবার্ষিকী রাষ্ট্রীয়ভাবে পালিত হয়নি। ১৯৯৬ সালে তাঁর কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর ৬ বছর দিবসটি উদযাপিত হয়েছে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে। সরকারিভাবে ওই সময় ১৫ আগস্ট ছুটিও কার্যকর করা হয়। তবে একতরফা সিদ্ধান্তের কারণে পরবর্তী সরকার তা আর কার্যকর রাখেনি। ২০০১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনের সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়। ফলে আবার সেই পুরনো ধারায় ফিরে যায় বঙ্গবন্ধুর শাহাদাতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান। এবার আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ক্ষমতাসীন থাকায় ব্যাপক আয়োজনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে দিবসটি পালন করা হচ্ছে।



ঘাতকের হাতে নিহত বঙ্গবন্ধু। সিঁড়িতে পড়ে আছে তাঁর নিথর দেহ

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচারকাজ দীর্ঘদিন রহিত ছিল। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর জাতীয় সংসদে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করে এই হত্যার বিচারের বাধা অপসারণ করে। আওয়ামী লীগ আমলেই হত্যার জন্য অভিযুক্তদের বিচার শুরু হয় এবং আদালত ১৫ জনকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেন। হাইকোর্ট ডেথ রেফারেন মামলায় প্রথমে বিভক্ত রায় দেন। পরে হাইকোর্টের তৃতীয় বিচারক ৩ জনকে খালাস দিয়ে ১২ জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন। এরপর সুপ্রিমকোর্টে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারপতি না থাকায় বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচারকার্য চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। পরবর্তী সময়ে ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসার পর মামলার নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেয়া হলেও তখনও বিচারপতি সংকটে তা হয়নি। এবার আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর নতুন করে এই মামলা নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেয়া হয়। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে গত ২৮ জানুয়ারি ২০১০ রাত ১২টা ১ মিনিটে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৫ খুনির ফাঁসি কার্যকর করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার স্বজনদের নির্মম হত্যাকাণ্ডের নায়কদের বিচার কার্যকর করতে জাতিকে প্রায় ৩৫ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। ২৮ জানুয়ারি মধ্য রাতে ৩ দফায় ৫ আসামির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। রাত ১২টা ১ মিনিটের প্রথমে মেজর (অব.) বজলুল হুদা ও মহিউদ্দিন আহমেদ আর্টিলারির ফাঁসি কার্যকর করা হয়। ২য় দফায় রাত ১২.৩০ মিনিটে সৈয়দ ফারুক রহমান ও ল্যানার একেএম মুহিউদ্দিনের ফাঁসি কার্যকর করা হয়। সর্বশেষ রাত ১টা ১ মিনিটে সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খানের ফাঁসি কার্যকর করা হয়।





১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের সেই নৃশংসতা বাকরুদ্ধ করে দিয়েছিল দেশবাসীকে। বিশ্ব বিবেক স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল সেদিন। ইতিহাসের জঘন্য এই হত্যাকাণ্ড, বর্বরতা জাতিকে পিছিয়ে দিল অন্তত একশ বছর। বাঙালি জাতি সেই ধাক্কা সামাল দিতে পারছে না আজও। দুই দশকেরও অধিক সময় অতিক্রান্ত। কিন্ত জাতির পিতার হত্যাকাণ্ডের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ বিচার হয়নি। অবশেষে (আংশিক হলেও) জাতির পিতার হত্যার বিচার হয়েছে বাংলার মাটিতেই। কিন্তু খুনিচক্রের ষড়যন্ত্র চলছে আজো।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথিকৃৎ বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির এক অবিসংবাদিত নেতা। তিনি বাঙালির অধিকার এবং স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদান রেখেছেন। শুধু স্বাধীনতা অর্জনই নয়, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে বিশেবর দরবারে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করতে তিনি নিরলস প্রচেষ্টা চালান। বাঙালি ও বাংলাদেশের ইতিহাসে জাতির জনকের অবদান তাই চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির মদতে কতিপয় বিপথগামী সেনাসদস্য সপরিবারে হত্যা করে এই মহান নেতাকে। ইতিহাসের বর্বরোচিত এই হত্যাকাণ্ডে দেশ ও জাতির যে ক্ষতি হয়েছে তা অপূরণীয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গতিশীল, সাহসী ও ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বে এই ভূখণ্ডের মানুষ হাজার বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিঁড়ে ছিনিয়ে এনেছিল স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য। আমরা পেয়েছিলাম নিজস্ব জাতিরাষ্ট্র, গর্বিত আত্মপরিচয়। ঘাতকচক্র বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলেও তার স্বপ্ন ও আদর্শের মৃত্যু ঘটাতে পারেনি। ১৬ কোটি বাঙালির অন্তরে লালিত হচ্ছে তার ত্যাগ ও তিতিক্ষার সংগ্রামী জীবনাদর্শ। এটাই আমাদের সব শক্তির উৎস। শেখ হাসিনা শোককে শক্তিতে পরিণত করে সংগ্রামের পথে দৃপ্ত পদক্ষেপে সবাইকে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ইতিহাসের বর্বরোচিত এই হত্যাকাণ্ডে দেশ ও জাতির যে ক্ষতি হয়েছে তা অপূরণীয়। এই ঘটনায় গোটা জাতি গভীরভাবে মর্মাহত এবং শোকে মুহ্যমান। জাতির জনক দেশকে সোনার বাংলায় পরিণত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর সেই স্বপ্ন সার্থক রূপায়ণে তাঁরই যোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'ভিশন-২০২১' ঘোষণা করেছেন। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। আজকের দিনে জাতির জনকসহ তাঁর পরিবারের সকল শহীদ সদস্যের আত্মার শান্তি কামনা করছি! পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন অনুযায়ী একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সরকারকে সহযোগিতা আমাদের দায়িত্ব। বঙ্গবন্ধু দেশকে সোনার বাংলায় পরিণত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। আজকের দিনে আমাদের অঙ্গিকার হোক তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নের, একটি সোনার বাংলার চিত্র বিশ্বের মানচিত্রে ফুটিয়ে তোলার।

**বঙ্গবন্ধুর সংগ্রাম**

মাত্র ১৬-১৭ বছর বয়স থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নানা শক্তিধর প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদী ভূমিকায় নেমেছিলেন–এ কথাটি আমার প্রজন্মের অনেকেরই জানা। আমার প্রজন্ম বলতে যে বয়স-শ্রেণির মানুষকে আমি চিহ্নিত করতে চাই, তাঁরা কবি সুকান্তের ভাষায়, 'দুঃসহ আঠারো' বয়সে পা দিয়েছেন গত শতকের ষাটের দশকে।

কেউ কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন, রাজনীতি করেছেন এবং একটি স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু দেশবাসীর সামনে ছয় দফার রূপরেখাটি তুলে ধরলে তাঁরা তাঁর হাতেই তাঁদের সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব তুলে দেন। এই নেতৃত্ব বঙ্গবন্ধু অর্জন করেছিলেন তাঁর দেশপ্রেম, নেতৃত্বের গুণাবলি এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতার জন্য।

১৯৬৬ থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তানের ইতিহাস ছিল শাসকদের শঠতা, নিষ্ঠুরতা এবং অবিমৃশ্যকারিতার। এই শাসকদের মোকাবিলা করে কোনো দাবি আদায় করা ছিল প্রায় অসম্ভব, যেহেতু শাসকদের প্রধান অংশটি ছিল সেনাবাহিনী। কিন্তু বঙ্গবন্ধু সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল পুরো বাংলাদেশ। আজকের রাজনৈতিকভাবে বিভাজিত, নিরন্তর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত আত্মঘাতী বাঙালি সমাজের দিকে তাকালে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, এই ৪৩-৪৫ বছর আগেও স্বাধীনতার প্রশ্নে দেশটি একটি পাহাড়ের মতো অবিচল ঐক্য নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই ঐক্য ভাঙার অনেক চেষ্টা পাকিস্তানিরা করেছে-তারা কিছু সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদ এবং ধর্মান্ধ একটি গোষ্ঠীকে নানা প্রলোভনে হাত করে নিয়েছিল। কিন্তু মানুষের ঐক্যের সামনে তাতে কোনো কাজ হয়নি। মানুষের ঐক্যে ফাটল ধরানোর অপপ্রয়াস বিষয়েও আমরা জানতাম এবং এ-ও জানতাম যে বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং দূরদর্শিতা দিয়ে অনৈক্যের সব চেষ্টাকেই নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে আমরা যেটুকু জানতাম, তা কোনো বইপত্র পড়ে নয়, বরং নানা মানুষের লোক থেকে শুনে। এদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর রাজনৈতিক সহচর ছিলেন, কেউ কেউ ছিলেন অনুসারী। পাকিস্তানের ডন পত্রিকায় বঙ্গবন্ধুর সাহস নিয়ে একটা লেখা লিখেছিলেন এক সাংবাদিক। তাঁকে নিয়ে আলতাফ গওহরের দু-একটি মন্তব্যও তখন মর্নিং নিউজ-এ পড়েছি। আর ১৯৬৬ সাল থেকে নিয়ে আগরতলা মামলা থেকে বঙ্গবন্ধুর অব্যাহতি পেয়ে ফিরে আসা পর্যন্ত তাঁর কয়েকটি জনসভায় আমি উপস্থিত থেকেছি। এসব জনসভায় তিনি যখন বক্তৃতা করতেন, মনে হতো, ভয়-ডর কাকে বলে, তিনি তা জানেন না। খুব পরিষ্কার উচ্চারণে তিনি পাকিস্তানি শাসকদের জানিয়ে দিতেন, তাদের অপচেষ্টা বাংলার মানুষ রুখে দেবেই। তাঁর প্রিয় একটি কথা ছিল, 'জেলের ভয় দেখাবেন না।' পাকিস্তানি শাসকেরা প্রায়শ বঙ্গবন্ধুকে জেলে নিয়ে যেত। বাংলাদেশের কোন জেলে তাঁকে নেওয়া হতো, তা-ও আমরা অনেক দিন পর্যন্ত জানতাম না। এক মেয়াদে জেল খেটে বেরোবার মুখে জেল গেটেই আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে–এ রকম ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু জেলে যাওয়াটা বঙ্গবন্ধুর কাছে স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। দেশের জন্য, মানুষের জন্য রাজনীতি করছেন, জেলে তো যেতেই হবে–এ রকম একটি যুক্তি তখন মাথায় নিয়েই বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহকর্মীরা রাজনীতি করতেন এবং শুধু রাজনীতিবিদ নন, সরদার ফজলুল করিম, মুনীর চৌধুরী অথবা অজিত গুহর মতো বরেণ্য শিক্ষাবিদদেরও জেলে যেতে হয়েছে মানুষের অধিকার নিয়ে কথা বলার জন্য। বঙ্গবন্ধুকে দু-তিন বার খুব কাছে থেকে দেখেছি–প্রথম সেই ১৯৬৬ সালে, তখন তিনি ছয় দফার পক্ষে জনমত সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং জনসভা করছেন, সে রকম এক সভা শেষে সিলেটে। তারপর দু-তিনবার ঢাকায়। তাঁর মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন





মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। কথা বলতে বলতে হাসতেন, রসিকতা করতেন, কিন্তু তাঁর কথাগুলো বলতেন একটা অটল বিশ্বাস থেকে। সেই বিশ্বাসের কেন্দ্রে ছিল মাটি ও মানুষ।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর এ দেশে আবার পাকিস্তানি ধারার শাসন ফিরে এলো, পাকিস্তানি প্রেতাত্মারা আবার শরীর ধরে বাংলাদেশে নামল। আমাকে এদের এক বছরের মতো দেখতে হলো, তারপর বিদেশে গিয়ে পাঁচ বছরের জন্য বিরতি পেলাম। বিদেশের লাইব্রেরিতে মাঝেমধ্যে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে কিছু লেখালেখি চোখে পড়েছে। সেগুলো পড়েছি। পুরো কাগজ ঘেঁটে একাত্তরে পশ্চিমা বিশ্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা কী অভিঘাত ফেলেছে, তা বোঝার চেষ্টা করেছি। স্পষ্ট মনে হয়েছে, সোভিয়েত রাশিয়া বাংলাদেশের পক্ষে নামায় পশ্চিম বাংলাদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। পশ্চিম যে মানবাধিকার নিয়ে সব সময় চেঁচায়, তার পেছনে তাদের স্বার্থটাই প্রধান। তার পরও ফিচার এবং বিশেষ নিবন্ধগুলোতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিটি এবং বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘ আন্দোলনের ইতিহাসটি স্থান পেত। দেশে ফিরে কিছুদিনের মধ্যেই সারা দেশের মানুষের সঙ্গে একটা স্বৈরশাসনের কবলে পড়ে আমার মনে হলো, প্রতিটি বছর যেন আমরা মুক্তিযুদ্ধ থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছি। এই অপসৃত ইতিহাসের মিছিলে বঙ্গবন্ধুকেও ফেলে দেওয়া হলো। ফেলে দিল তৎকালীন সরকার, পাকিস্তানপন্থি কিছু ইতিহাসবিদ ও বুদ্ধিজীবী। কিন্তু কয়েক দশকের অপচেষ্টা এবং অবহেলার পরও একসময় বঙ্গবন্ধুর ঢেকে রাখা আসনটি উদ্ধার করা গেল এবং সেটি করল দেশের মানুষই, বিশেষ করে তরুণ একটি প্রজন্ম, যারা স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে বঙ্গবন্ধুকে একটা পাদটীকার অবস্থানে দেখে দেখে বড় হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর অনেক জীবনী লেখা হয়েছে, তাঁকে নিয়ে অনেক স্মারক গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু কয়েকটি বাদে জীবনীগ্রন্থগুলোতে আছে শুধু স্তুতি আর প্রশংসা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মনগড়া কাহিনী অথবা ঘটনার বর্ণনা। এ জন্য তাঁর জীবন নিয়ে লেখা কয়েকটি বই ছাড়া অন্য বইগুলো পড়তে কোনো আগ্রহ পাইনি। কিন্তু সম্প্রতি প্রকাশিত বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীর খণ্ডাংশ অসমাপ্ত আত্মজীবনী পড়ে আক্ষেপ হলো, এ বইটি এত দিন পর কেন প্রকাশিত হলো। সেই ত্রিশের দশকের শেষ দিকে স্কুল ও কলেজের ছাত্র হিসেবে ছাত্ররাজনীতিতে বঙ্গবন্ধুর প্রবেশ থেকে নিয়ে ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন এবং নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে দিয়ে গভর্নরের শাসন জারি ও তাঁর আসন্ন গ্রেপ্তার পর্যন্ত সময়কালকে খণ্ড খণ্ড বর্ণনায় তিনি যে সারল্য ও নিপুণতার বর্ণনা করেছেন, তা থেকে তাঁর সংগ্রামের প্রেক্ষাপট, অনিবার্যতা এবং চালিকাশক্তি সম্পর্কে অত্যন্ত পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। ১৯৬৯ সালে জেলে বসে তিনি পেছনে ফিরে গেছেন এবং তাঁর পরিবারের ইতিহাস থেকে নিয়ে সমকালীন রাজনীতিবিদ, রাজনীতির কূটচাল ও তাঁর নিজের আদর্শের কথাগুলো লিখেছেন।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক গুরু, তাঁর প্রতি তাঁর ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে পুরো বইটিতে। কিন্তু সোহরাওয়ার্দী ভুল করলে তাঁর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রতিবাদ করেছেন। অগ্রজদের শ্রদ্ধা করেছেন। অনুজদের স্নেহ দিয়েছেন, সব বয়সীকে সমর্থন দিয়েছেন। আর বই জুড়ে আছে তাঁর সংগ্রামের নানা বর্ণনা। পাকিস্তানের

রাজনীতি ছিল ভূস্বামীদের হাতে এবং পরোক্ষে তা নিয়ন্ত্রণ করত সেনাপতিরা, যাদের বেশির ভাগও ওই ভূস্বামী পরিবারগুলো থেকে উঠে আসা। এই দুই শক্তির বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করেছেন, সংগ্রাম করেছেন লোভের রাজনীতি, হঠকারিতার রাজনীতির বিরুদ্ধেও। একসময় পাকিস্তান আন্দোলনের একনিষ্ঠ সমর্থক হলেও সেই ১৯৪৮ সালেই তাঁর মোহভঙ্গ হয়েছে এবং এরপর থেকে তাঁর সংগ্রাম ছিল সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে। সারা বইতে তাঁর আশাবাদ : তিনি বিজয়ী হবেন।

বিজয়ী তিনি হয়েছেন। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশেই যে পাকিস্তানের নষ্ট বীজ থেকে আবার গাছ জন্মাবে, সেসব গাছ পুষ্ট হবে, বাগান ঢেকে ফেলবে, তা তিনি ভাবতে পারেননি। কিন্তু সেই বিষবৃক্ষ আবার এ দেশের মানুষ উপড়ে ফেলেছে আর তাঁর সাধের বাগানে সূর্যের আলো পড়েছে। ওই ফিরিয়ে আনার সংগ্রামটা মানুষ করছে তাঁর জন্যই।

১০ জানুয়ারি, ১৯৭২। আমাদের স্বাধীনতাকে পূর্ণতা দিতে এদিন পাকিস্তানি কয়েদ থেকে দেশে ফিরলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেদিনই টইট্টুম্বুর রেসকোর্সে তার বন্দীদশার বিবরণ দিতে গিয়ে শিরোনামের কথাগুলো বলেছিলেন। সম্ভাব্য মৃত্যু নিয়ে তার সম্পূরক কথাগুলো ছিল–আমি হাসতে হাসতে যাবো, আমার বাঙালি জাতিকে অপমান করে যাবো না, তোমাদের কাছে ক্ষমা চাইবো না এবং যাবার সময় বলে যাবো–জয় বাংলা, স্বাধীন বাংলা, বাঙালি আমার জাতি, বাংলা আমার ভাষা, বাংলার মাটি আমার স্থান।

পাকিস্তানি ঘাতকেরা সেবার পারেনি। পেরেছে আরো বছর চারেক পর। ১৫ আগস্ট এক নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আমরা হারিয়েছি আমাদের জাতির পিতাকে। দু'মেয়ে ছাড়া ওই নির্মম মৃত্যুযজ্ঞে তার সঙ্গী হয়েছিল গোটা পরিবার। দীর্ঘ প্রশাসনিক কবচে খুনিরা সদম্ভে ঘুরে বেড়ালেও একসময় শেষ হয়েছে খেলা। ধরা পড়েছে অনেকেই, ফাঁসির দড়ির অপেক্ষায় সময় কাটছে তাদের। বাকিরা পাকিস্তানি পাসপোর্ট নিয়ে কেউ লিবিয়ায়, কানাডায় কিংবা পুনঃ নাগরিকত্বের স্বদেশে। হত্যা মামলার রায় নিয়ে নতুন কি আর বলবো। তার চেয়ে উদযাপন করি ঐতিহাসিক কিছু উপাত্ত দিয়ে। যেসব জারজ ও তাদের উত্তরসূরিরা তার মহানুভবতার সুযোগে বেঁচে গিয়ে এখন তাকেই গালি দেয়, তার নিন্দা করে তাদের জন্য একদলা থু থুর বেশি কিছু বেরোয় না আমার মুখ দিয়ে।



# মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশ

'মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশ' বলতে যা বুঝি সে বাংলাদেশ এক দীর্ঘ সংগ্রাম, ত্যাগ ও আদর্শের ইতিহাস। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে উদ্ভাসিত বাংলাদেশ তাই একটি প্রজাতন্ত্র। 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ' প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করা হবে। এই চেতনার উন্মেষ ঘটাতে যিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন আর এদেশের মানুষকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সৃষ্টির আহ্বান জানিয়েছিলেন, তিনি বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এদেশ, এদেশের মাটি ও মানুষ এবং তাদের ধারাবাহিক সংগ্রামের ইতিহাসের বিরাট ক্যানভাসেই ইতিহাসের মহানায়ক এ দেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ত্যাগ-তিতিক্ষা, নিষ্ঠা, সাধনা ও সাহসী নেতৃত্বের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব।

হিমালয়ের পাদদেশে বঙ্গোপসাগর থেকে উত্থিত নদী বিধৌত ব-দ্বীপ বাংলাদেশ। এদেশের জনগোষ্ঠী নদী সভ্যতা ও গ্রাম সভ্যতার হাজার বছরের ঐতিহ্য নিয়ে সংগ্রাম করেছে বিভিন্ন সময়ে। একদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঝড়, বন্যা, প্লাবন এবং অপরদিকে বিদেশি শোষণ ও শাসন, হানাদার-বর্গী, মোঘল ও ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন লড়াই সংগ্রামের ইতিহাস। বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে দ্রোহ এদেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের ঐতিহ্য। বিদেশি প্রভুত্ব, ভূস্বামীদের অত্যাচার-নিপীড়ন, মহাজনী শোষণ ও অধিকারহীনতায়, শোষণ ও বঞ্চনার ভাগ্যাহত এ জনগোষ্ঠী তাদের স্বাধীন সত্তা নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য এবং মানবিক মর্যাদা লাভের প্রত্যাশায় অব্যাহত সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছে। অকাতরে জীবন দিয়েছে তবু কখনো বশ্যতা, দাসত্ব বা পরাধীনতা স্বীকার করে নেয়নি। ভাষার অধিকার, সাংস্কৃতিক স্বকীয়তায় এবং মানবিক মর্যাদাসহ বাঁচার অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই-এর মধ্য দিয়ে এ জাতির স্বীয় সত্তা ও জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। দীর্ঘদিনের এই আত্মমর্যাদা সচেতন জনগোষ্ঠীর সংগ্রামী চেতনা থেকে জন্ম নেয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।

ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির পর ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের নামে বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী হওয়া সত্ত্বেও এক নতুন ঔপনিবেশিকতার শিকারে পরিণত হয়। কৌশলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে করা হয়েছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় (জনগণের) অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে তারা ছিল বঞ্চিত। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটলো; অথচ জনগণের অবাধ ভোটের মাধ্যমে কোনো নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বশীল সংসদ বা সরকার গঠিত হয়নি। ১৯৪৮ সালে বাঙালিদের ওপর এদেশের ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর আগ্রাসন ও সেই সাথে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে এ দেশকে পঙ্গু করার ষড়যন্ত্রে বিরুদ্ধে সোচ্চার হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। তিনি এ দেশের মানুষের মাঝে জাতীয় এবং সাংস্কৃতিক চেতনাকে সাংগঠনিক শক্তিতে রূপান্তরিত করেন। ফলে শুরু থেকেই শাসক গোষ্ঠীর কোপানলে পতিত হন। ১৯৪৮ সালেই তাকে কারাবন্দী করা হয়। কিন্তু জনগণের আন্দোলনকে তারা থামিয়ে রাখতে পারেনি।

১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় বাঙালি জাতিসত্তার উন্মেষ। এরই বিকাশ ঘটে ছয় দফা আন্দোলনে। ব্রিটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তি লাভের পর উর্দুকে

রাষ্ট্র ভাষা করার মাধ্যমে বাঙালি সমাজকে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে এ অঞ্চলকে পাকিস্তানি শাসকদের একটি বাজারে পরিণত করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেদিনের ছাত্রনেতা মুজিব ভাই একথা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই ভবিষ্যতের স্বপ্নদ্রষ্টা যিনি বাঙালির মনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বীজ রোপণ করেছিলেন তারই কণ্ঠে সেদিন উচ্চারিত হয়েছিল উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ। পরবর্তীতে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম, ভাষা আন্দোলনের পথ ধরে গণতন্ত্র ও বাঙালির অধিকার অর্জনের দাবিতে ৬ দফা ও ১১ দফার দাবিতে '৭০-এর নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ ও শাসক গোষ্ঠীর ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকৃতি, সামরিক আমলাতন্ত্রের একগুঁয়েমি একনায়কত্ব হত্যা, নির্যাতন ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়।

১৯৪৮ সাল যে বছর ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চাপিয়ে দেবার বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর স্বোচ্চার প্রতিবাদ, সেই একই বছরে সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রে স্বীকৃতি পায় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল ভাষা-ভাষী ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সকল জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করার অধিকার Covenant on civil and political rights এ স্বীকৃত জনগণের এ সকল সর্বজনীন অধিকারের বাস্তবায়ন ও ক্ষমতায়নের বিষয়টিও ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনার একটি মৌলিক দিক।

পঞ্চাশ দশকের শুরুতেই আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এদেশের জনগণের সংগ্রামকে সাংগঠনিক রূপ দিতে যার অবদান সবচেয়ে উল্লেখের দাবি রাখে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এদেশের ছাত্র-যুবক, মেহনতী মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিতে, জনগণকে সকল বিপদে সাহস জোগাতে, একটি ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে মূল ধারায় পরিণত করার সবচেয়ে কৃতিত্বের অবদান রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। একদিকে স্বৈরাচার-সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা; অপরদিকে গণতন্ত্র ও মানবিক মর্যাদা।। জনগণের মৌলিক অধিকার ও রুটি রুজির লড়াই। এই লড়াইয়ের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ এক ঐতিহাসিক সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এমনি একটি চিন্তা আদর্শের ভিত্তিতে জনগণের ঐক্যবদ্ধ সাংগঠনিক শক্তিতে বিশ্বাস করতেন। তাঁর সাহসী ও আপসহীন নেতৃত্বে ছাত্র-যুবক, মধ্যবিত্ত, কৃষক-শ্রমিক, মেহনতী ও সংগ্রামী মানুষ আওয়ামী লীগের পতাকাতলে সংঘবদ্ধ হয়। তিনি বাঙালি জাতিকে নিজ স্বকীয়তায় উজ্জীবিত হতে উদ্বুদ্ধ করেন। আন্দোলনকে ধাপে ধাপে জনগণের মুক্তি ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে নিয়ে যান।

১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক আইনসভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। হোসেন সহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা ফজলুল হক ও মওলানা ভাসানী এবং শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে যৌথ নেতৃত্বে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট। এই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট নিরঙ্কুশ বিজয়লাভ করে। যেমনটি বিজয় হয়েছিল ১৯৭০ এর নির্বাচনে। সামরিক ও আমলাতান্ত্রিক ছত্রছায়ায় গড়া পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী জনগণের এ বিজয়কে যেমন মেনে নেয়নি ১৯৫৪ সালে,





তেমনি মেনে নেয়নি ১৯৭১-এ। তৎকালীন পূর্ব পকিস্তানে ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কয়েক মাস যেতে না যেতেই কেন্দ্র থেকে গভর্নরের শাসন জারি করে প্রাদেশিক পরিষদ ভেঙে দেওয়া হয়। সেই সাথে ভেঙ্গে দেওয়া হয় মন্ত্রিসভা। হাজার হাজার রাজনৈতিক নেতা-কর্মীকে করা হয় বন্দী। নিরঙ্কুশ বিজয়লাভের পরও এদেশের জনগণ তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে দেশ শাসনের সুযোগ থেকে হয় বঞ্চিত। একচেটিয়া শোষণের মাধ্যমে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্প বিকাশ ঘটে; অথচ পূর্ব বাংলাকে করা হয় সম্পূর্ণ দেউলিয়া। এদেশের অর্থনীতির প্রতি দেখানো হয় চরম অবজ্ঞা। শিক্ষা, শিল্প-কলকারখানা, চাকরি, সামরিক বাহিনী, সর্বক্ষেত্রে বাঙালিদের প্রতি চরম বৈষম্য এদেশের জনগণকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করে। অধিকারহারা বাঙালি জনগোষ্ঠীর ওপর উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে এ জাতিকে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও স্থায়ীভাবে পঙ্গু রাখার ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। এভাবে বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর চরম আঘাত হানা হয়। একটি সামরিক আমলাতন্ত্রের কাছে জিম্মি হয়ে যায় জনগণের অধিকার। রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে আজ্ঞাবহ করার জন্য সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের অঙ্গুলী হেলনে পাকিস্তান গণপরিষদ ভেঙে দেওয়া হলো। সেই সাথে নাজিমউদ্দিন মন্ত্রিসভার পরিবর্তে গঠিত হয় পাকিস্তানের আমলা গোলাম মোহাম্মদের নেতৃত্বে একনায়কতন্ত্র। ফলে পাকিস্তানের সাংবিধানিক ধারাবাহিকতায় একটি গুরুতর সংকট সৃষ্টি হয়। এর ফলে গণতন্ত্র ও সাংবিধানিকতার ইতিহাসে একটি প্রচণ্ড বিপর্যয় নেমে আসে। বিভিন্ন প্রাদেশিক এ্যাসেম্বলি থেকে প্রতিনিধি নিয়ে পুনরায় যদিও নতুন গণরিষদ গঠিত হয়, কিন্তু সেই গণপরিষদে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানকে সমান ইউনিটে বিভক্ত করে পার্লামেন্টে সমানসংখ্যক আসনের ব্যবস্থা করা হয়। রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে অসম ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য এমনকি সামরিক বাহিনী, বেসামরিক প্রশাসনের সকল স্তরে ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরিতে একচেটিয়া পাঞ্জাবি আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে এদেশের জনগণকে স্থায়ীভাবে পদানত রাখবার ব্যবস্থা প্রায় পাকাপাকি হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত যদিও ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধান রচনা করা হলো, কিন্তু সেই সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠানের কাজ নানা অজুহাতে পিছিয়ে দেওয়া হয়। বহু টালবাহানার পর সর্বশেষে ১৯৫৯ সালের জানুয়ারি মাসে যদিও নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেওয়া হয় কিন্তু তার পূর্বেই ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতার পালাবদল শুরু হয়। সামরিক শাসন জারি করে প্রথমে ইস্কান্দার মির্জা এবং কয়েকদিন পর আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করেন। ১৯৬২ সালে আইয়ুব খান তার এনায়কত্বকে পাকাপোক্ত রাখার জন্য মর্জিমাফিক এক ফরমানের মাধ্যমে একটি সংবিধান জারি করেন। সামরিক শাসন প্রত্যাহার করে নিজেকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা করলেন। ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী সৃষ্টি হলো। শুধু ঐসব মৌলিক গণতন্ত্রীর ভোটে একটি পার্লামেন্ট তৈরি হয়। নিজের ক্ষমতা ভোগের মাপে তৈরি শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে সামরিক বাহিনীর সহায়তায় একটি প্রশাসন সৃষ্টি হলো। সরাসরি ভোটের মাধ্যমে সরকার বা সংসদ নির্বাচনের অধিকার থেকে জনগণ হলো বিতাড়িত। আইয়ুব-মোনেম শাসনামলের অত্যাচার-নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম অব্যাহত থাকে। জেল-জুলুম ও অত্যাচারের মাত্রা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। পূর্ব

বাংলার মানুষের বঞ্চনা বিড়ম্বনার সাথে ১৯৬৫ সালে ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধকালীন বিচ্ছিন্ন এ ভূখণ্ডে এক অবহেলাজনিত অসহায়ত্ব বোধটি আরও প্রকট আকার ধারন করে।

স্বাধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিতে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ৬ দফার ভিত্তিতে ১৯৬৬ সাল থেকে এ দেশের জনগণকে সংঘবদ্ধ করতে শুরু করলো। ৬ দফা ও ছাত্র-জনতার ১১ দফা দাবি এ দেশের স্বাধিকার আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করে। বাংলাদেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য প্রচার করা হলো যে, স্বাধিকার আন্দোলনে ভারতের উস্কানি আছে। ভারত বিরোধী জুজুর ভয় দেখিয়ে বাঙালিদের বিভ্রান্ত করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে ১নং আসামি করে শুরু হলো 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'। কিন্তু এর ফল হলো উল্টো। জনগণ ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করলো। পাকিস্তানের সামরিক আমলা চক্রের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে জনগণের জয় হলো। ঢাকা শহর গণঅভ্যুত্থানের শহরে পরিণত হলো। জনগণের দাবির মুখে শাসকগোষ্ঠী আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হলো। দীর্ঘ দশ বছর একনায়কের শাসনের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা অসন্তোষ ১৯৬৯ সালে আইয়ুববিরোধী গণআন্দোলনে রূপ নেয়। গণরোষের ফলে আইয়ুব খান সামরিক বাহিনীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করলেন। পরে ইয়াহিয়া খান নিজেকে প্রধান সামরিক শাসক হিসেবে ঘোষণা করে '৬২-র সংবিধান বাতিল করলেন। আর সেই সাথে সরাসরি নির্বাচন অর্থাৎ ৬ দফার প্রথম দফা : 'এক মানুষ এক ভোট' মেনে নিলেন। নির্বাচনের মাধ্যমে পাকিস্তানের নতুন সংবিধান রচনা ও সরকার গঠনের প্রতিশ্রুতি দিলেন। জারি হলো লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক অর্ডার।

সত্তরের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে সংবিধান রচনার মাধ্যমে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সরকার গঠনের ম্যান্ডেট লাভ করে। অবিভক্ত পাকিস্তানে জাতীয়ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত এই প্রথম এবং শেষ নির্বাচন। পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় হতচকিত সামরিক জান্তা জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসতে দিলো না। ১ মার্চে পূর্ব নির্ধারিত আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের বৈঠক বসলো পূর্বাণী হোটলে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এই পরিবর্তিত অবস্থায় সিদ্ধান্ত নেবার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেয়া হলো। বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন এবং তার নির্দেশে হাইকোর্ট থেকে শুরু করে সচিবালয়, পুলিশ প্রশাসন সকল প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য, স্থলবন্দর, নৌবন্দর, বিমানবন্দর, রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা, আমদানি রপ্তানি, বৈদেশিক বাণিজ্য টেলিভিশন রেডিও টেলিফোন টেলেক্স নিয়ন্ত্রিত হতে থাকল। অপরদিকে জণগণের ওপর সামরিক উৎপীড়ন বেড়ে চলল। নির্বিচারে গুলি চালানো হলো। মানুষ অকাতরে জীবন দিল কিন্তু মাথা নত করলো না। আন্দোলন বরং নতুন রূপ নিল। ৬ দফা, ১১ দফা অর্থাৎ স্বাধিকার আন্দোলন এখন এক দফা অর্থাৎ স্বাধীনতার দাবিতে পরিণত হলো। ১৯৭১-এর ৭ মার্চে ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক আহবানে স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে সমগ্র জাতি সংকল্পবদ্ধ হয়। অসহযোগ আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ হলো। ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাসা হয়ে উঠলো আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে গড়ে উঠল একটি ডিফেক্টো সরকার। তার নির্দেশে দেশের সার্বিক শাসন পরিচালিত হতে থাকল। অসহযোগ আন্দোলন এমন তীব্র ও





সার্বিকভাবে পালিত হতে থাকে যে ঢাকা হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি টিক্কা খানকে গভর্নর হিসেবে শপথ পাঠ করাতে অস্বীকার করেন। এমনকি তৎকালিন প্রেসিডেন্টের ঢাকার আবাসনে (এখন সুগন্ধা নামে পরিচিত) তার বাবুর্চি পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ ছাড়া চুলা জ্বালাতে রাজি হয়নি। যে কারণে ইয়াহিয়া খানের তৎকালীন মিলিটারি সেক্রেটারি ৩২ নম্বর থেকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ-অনুমতি নিতে বাধ্য হন। এমন একটি অসহযোগ আন্দোলন বঙ্গবন্ধুকে এদেশের defacto সরকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকাবাহী গাড়িতে করে বঙ্গবন্ধু ইয়াহিয়ার সাথে আলোচনার জন্য সুগন্ধায় যেতেন।

সামরিক জান্তা চাতুরির আশ্রয় নিলো। একদিকে লোক দেখানো আলোচনা, অপরদিকে বাঙালি নিধন ও গণহত্যার নীলনকশা। এমনি করে এ দেশের জনগণের ওপর হানাদার বাহিনী একটা বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। পাশাপাশি গড়ে ওঠে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ। ইয়াহিয়া খান যখন ২৫ মার্চের মধ্য রাতে নিরস্ত্র বাঙালি জাতির ওপর অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দিলো, বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তারের পূর্বেই ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শত্রুকে মোকাবিলা করার নির্দেশ দিয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন। এ ঘোষণা বিভিন্ন উপায়ে ও মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লো সারা দেশে। বি.ডি.আর Wirless-এও এ message-টি পৌঁছে যায়। সে ঘোষণাটি জিয়াউর রহমান সাহেবের শাসন আমলে তারই নির্দেশে স্বাধীনতার দলিল সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে হাছান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত স্বাধীনতার দলিলে সংরক্ষিত আছে। বি.ডি.আর কর্তৃক প্রকাশিত স্বাধীনতার ইতিহাস সম্বলিত বইয়েও এর উদ্ধৃতি ও উল্লেখ আছে। '৭৫-এর পরে এ বইটির সকল খণ্ড পুড়িয়ে দেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি করা হলো। ওরা ভাবল বঙ্গবন্ধুকে কারাবন্দী করলে বাঙালি নেতৃত্বহীন হয়ে পড়বে। তারপর হত্যা ও নির্যাতনের মাধ্যমে আন্দোলন স্তব্ধ করে দেওয়া যাবে। কিন্তু এবারেও ফল হলো উল্টো।

২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা অনুযায়ী তৈরি করা হয় ১০ এপ্রিলের ঘোষণাপত্র। আর তাঁর অনুপস্থিতিতেই তাঁকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও নির্দেশকে সামনে রেখে তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে মুজিবনগরে বাংলাদেশে প্রথম সরকার আত্মপ্রকাশ করে। স্বাধীনতার এই ঘোষণাপত্র পৃথিবীর সামনে প্রকাশিত হলো। সেই থেকে বৈদ্যনাথতলা ইতিহাসে মুজিবনগর নামে খ্যাত।

৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক আহবানে স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রাম সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে। ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা পরে ১০ এপ্রিলের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে প্রতিস্থাপিত হয়। স্বাধীনতার এই ঘোষণাপত্র পৃথিবীর সামনে প্রকাশিত হলো ১৭ এপ্রিলের মুজিবনগরে আম্রকাননে। এই সকল সাংবিধানিক দলিলের ভিত্তিতে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি চেয়ে মুজিবনগর সরকার পত্রালাপ শুরু করে এবং বিভিন্ন দেশে দূত পাঠায়। জনগণের এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগ ও তিতিক্ষার মাধ্যমে দেশ স্বাধীনতা লাভ করলো; বিভিন্ন রাষ্ট্র স্বীকৃতি দিল। এই মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণ তার স্বাধীন সত্তায় একটি জাতি,

একটি রাষ্ট্র, একটি প্রজাতন্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বাংলাদেশের এই অভ্যুদয় একটি দীর্ঘ সংগ্রামের ফসল। বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতার যে সংগ্রাম তা (আন্তর্জাতিক সর্বজনীন মানবাধিকারেরই অংশ) ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ সনদে এবং ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে মানব জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এরই ফলশ্রুতিতে রচিত হয় ১৯৬৬ সালের আন্তর্জাতিক দুটি অঙ্গিকারনামা। যার প্রথম অনুচ্ছেদেই জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে। তারই সাথে একাত্মতার ভিত্তিতে ঘোষিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। জাতিসংঘ সনদ ও সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণায় উল্লিখিত মানবিক মূল্যবোধ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণায় স্থান লাভ করে। বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা স্বাধীনতার মূল অঙ্গিকার। এই ঘোষণা বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় স্থান পেয়েছে–যা নিম্নরূপ :

'আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছে যে, আমরা যাহাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারি এবং মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারি, সেই জন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি স্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য'।

বঙ্গবন্ধুকে কারাগারে আটক রেখেও যখন বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত পথে মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রামকে স্তব্ধ করতে পারলো না, তখন জেলের মধ্যেই শুরু হলো বিচার নামক প্রহসন। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হলো। মৃত্যুদণ্ড দেবার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নিরাপত্তা বিধানের নিশ্চয়তা চেয়ে চাপ সৃষ্টি হলো ইয়াহিয়া সরকারের ওপর। ফলে মৃত্যুদণ্ড দেবার প্রস্তুতি স্থগিত রাখা হলো। ইতিমধ্যে মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য যখন নিশ্চিত হতে যাচ্ছে তখন শুরু হয় নতুন অপকৌশল আর ষড়যন্ত্র।

বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও এ দেশকে সর্বব্যাপী নেতৃত্বহীন, আদর্শচ্যুত ও বিভ্রান্ত করা ছিল এই ষড়যন্ত্রের মূল লক্ষ্য। মুক্তিযুদ্ধের বিজয় যখন সুনিশ্চিত তখন বুদ্ধিজীবী হত্যার মাধ্যমে এ দেশকে তারা করতে চেয়েছিল সকল ক্ষেত্রে মেধাশূন্য, পঙ্গু ও নেতৃত্বহীন। অধ্যাপক, প্রকৌশলী, ডাক্তার, আইনজীবী, সাংবাদিক, কবি-সাহিত্যিক ও শিল্পীদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এক দীর্ঘ হত্যা তালিকায়। বুদ্ধিজীবীদের এই হত্যাকাণ্ড হিটলারের ইহুদি নিধন ও গ্যাস চেম্বারে গণহত্যার কথা মনে করিয়ে দেয়। ঢাকার মোহাম্মদপুর, মিরপুরসহ প্রতিটি জেলা শহরে তৈরি হয়েছিল এক একটি বধ্যভূমি।

মুক্তিযুদ্ধের বিজয় যখন নিশ্চিত তখন বাঙালি ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মচারীদের নিধন করার জন্য সবাইকে ডাকা হয়েছিল তৎকালীন গভর্নর হাউসে। ইতিমধ্যে খবর পৌঁছে যায় যুদ্ধকালীন সরকারের কাছে। আকাশ যুদ্ধ শুরু হয়। তৎকালীন গভর্নর হাউসে স্ট্র্যাপিং করা হয়। গভর্নর হাউস থেকে গভর্নর মালিক বেরিয়ে তৎকালীন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। ফলে সে ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি।





মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে পাকিস্তান সামরিক শক্তি যখন বুঝতে পারলো যে তারা নিশ্চিতভাবে পরাজিত হতে যাচ্ছে, তখন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের নামে গুপ্তচরের অনুপ্রবেশ ঘটানো পাকিস্তানি সামরিক কৌশলেরই ছিল আরেকটি দিক। এমন একটি অনুপ্রবেশের মাধ্যমেই এই নতুন ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত। দেশ স্বাধীন হবার পরও পাকিস্তান সেনা বাহিনীর গুপ্তচর সংস্থা তাদের কাজ অব্যাহত রাখে। রাজনৈতিক নেতৃত্বকে সম্পূর্ণ পঙ্গু করে মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য, স্মৃতি ও ইতিহাসকে ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত করার এক হীন ষড়যন্ত্রের শিকার হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, তার পরিবারবর্গ ও জাতীয় নেতৃবৃন্দ।

যে মৃত্যুদণ্ড আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক চাপের কারণে ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান কারাগারে কার্যকর করতে পারেনি, তা তার সামরিক গোয়েন্দা বাহিনীর নেতৃত্বে কার্যকর হলো স্বাধীন বাংলাদেশে। বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করতে ক্লাইভের চক্রান্তে কোম্পানির গুপ্তচররা যেমন ব্যবহার করেছিল মীর জাফর, রায়দুর্লভ, জগৎ শেঠ, মীরন ও মোহাম্মদী বেগকে, তেমনি বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বাংলাদেশের জনক বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করানো হলো বাংলার মাটিতে বাংলার বেঈমানদের দ্বারা। ইতিহাসের কী করুণ পরিণতি, কী হৃদয় বিদারক পুনরাবৃত্তি।

১৯৭৫ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ও শিশু রাসেলসহ, ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের গৃহে যারা তখন বাস করছিলেন সপরিবারে তাদের সবাইকে হত্যা করা হলো। সেরনিয়াবাত ও শেখ ফজলুল হক মণি ও তার গর্ভবতী স্ত্রীকে নৃশংসভাবে হত্যা, বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে যারা মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, মনসুর আলী, কামরুজ্জামান, জাতীয় এই চার নেতাকে কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে হত্যা এসবই একই ষড়যন্ত্রের অংশ। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় আইনে এটা Genocide অর্থাৎ এক প্রকার গণহত্যা হিসেবে চিহ্নিত। সে গণহত্যা থেমে থাকেনি। এমনি অপরাধ ঘটেছে যশোরের উদীচী শিল্পীদের হত্যায়, নির্ভীক সাংবাদিকদের হত্যাকাণ্ডে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার জনসভায় উপস্থিত সকলের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রে কোটালীপাড়ায় বোমা পাতা, সাতক্ষীরার সার্কাসে, ময়মনসিংহ প্রেক্ষাগৃহে বোমা। ২১ আগস্ট ২০০৪-এ শেখ হাসিনার জনসমাবেশে গ্রেনেড হামলা। আইভী রহমানসহ ২২ জন নিহত। এস. এম. এস. কিবরিয়াকে হত্যা। শত শত নেতা কর্মীকে পঙ্গু, হত্যা, নির্যাতন। সেই সাথে উল্টো তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা এসব নির্যাতনের আরেক রূপ। এমনিভাবে এদেশকে নেতৃত্বহীন, অপরদিকে স্বাধীনতার পক্ষের সকল শক্তিকে বিভ্রান্ত, বিকল এবং অন্যদিকে ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করার ধারাবাহিক ষড়যন্ত্রের সাক্ষ্য বহন করে। এর পূর্বেও নওগাঁয় শেখ হাসিনার গাড়িতে আক্রমণ, সারা দেশে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীর ওপর অকথ্য অত্যাচার-নির্যাতন, হামলা, মামলা, হত্যা নীপিড়নের স্টিম রোলার এই গভীর ষড়যন্ত্রেরই দৃষ্টান্ত। এসব অপরাধের কোনো তদন্ত নেই, নেই কোনো বিচারপ্রক্রিয়া। ১ অক্টোবর ২০০১-এর নির্বাচনের পর থেকে হাজার হাজার আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ কর্মী হত্যা জখম ও মিথ্যা মামলা ও তাদের পরিবারে মা-শিশু, কিশোরীরা পর্যন্ত নির্যাতন, অশ্লীলতা ও আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি। নাটোরের জনপ্রিয় আওয়ামী লীগ নেতা মমতাজ উদ্দিন, খুলনা আওয়ামী লীগের সভাপতি মঞ্জুরে ইমামের হত্যা এবং পরে এসব হত্যার তদন্ত বা বিচার সঠিক পথে পরিচালিত হতে না দেওয়া, বিরোধীদল বা প্রতিপক্ষকে হত্যা,

পরিবারের ওপর নির্যাতন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, বাড়ি-অফিস ভাঙচুর, লুণ্ঠন, দোকান খামার লুট–এসবের কোনো সঠিক তদন্ত বা বিচার হয়নি। অপরদিকে ৭০,০০০ সন্ত্রাসীদের ওপর থেকে মামলা তুলে নেওয়া হয়েছে। শুরু হয়েছে দলীয়করণ। দলীয় ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে জনজীবন অসহনীয়। প্রশাসনের সকল পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত অথবা ছাত্রলীগ-আওয়ামী লীগের সাথে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ সম্পর্ক বা আত্মীয়তা থাকলে এই প্রজাতন্ত্রের অথবা প্রশাসনের কোনো চাকরিতে বহাল হওয়া বা বহাল থাকা যাবে না। ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে উচ্ছেদ অর্থাৎ পাকিস্তানিদের মতো স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পক্ষের সকলকে বৈষম্যের শিকার বানানো হয় সেই জোট সরকারের আমলে। বিনা বিচারে আটক ও ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার নির্যাতন পর্যবসিত হয় বিনা বিচারে নরহত্যা; ধর্মে, আইনে ও সংবিধানে যা নিষিদ্ধ। রাষ্ট্রীয় যন্ত্রকে এই অপরাধে জড়িত করার ফলে এটা একটি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে রূপ নিয়েছিল।

এসব বাঙালি জাতির ইতিহাসের এক জঘন্য ও কলঙ্কময় অধ্যায়। আরও কলঙ্কময় যে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের যাতে বিচার না হতে পারে, আইনকে অবরোধ করবার জন্য তৈরি হয়েছিল ইনডেমনিটি বা দায়মুক্তি অধ্যাদেশ '৭৫। বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এলে সংসদে দায়মুক্ত অধ্যাদেশ বাতিল করা হয়। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হলো। রায়ে ফাঁসির আদেশ হলো। হাইকোর্ট বিভাগ রায় অনুমোদন করে বেশির ভাগ সাজা বহাল রাখল। অথচ আপিল বিভাগে সে রায়ের আপিল শুনানি নানা কৌশল ও অজুহাতে ঝুলিয়ে রাখার ফলে আইনের শাসন ছিল ভূলুণ্ঠিত। সর্বোচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগে নির্বাহী প্রধানের মতামত প্রাধান্য পাবার ফলে এক ব্যক্তির ইচ্ছায় বিচারপতি নিয়োগ, স্থায়ীকরণ, ১৬ জন অস্থায়ী বিচারপতি অপসারণের মাধ্যমে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ধূলিস্যাৎ করা হয়েছিল। ২০০৮ সালের নির্বাচনে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রায়ে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর আপিল বিভাগে নতুন বিচারক নিয়োগ করে বহু বছর থেকে ঝুলে থাকা মামলার বিচার সম্পন্ন হওয়ায় জাতি কিছুটা কলঙ্কমুক্ত হয়েছে। খুব শীঘ্রই এই চূড়ান্ত রায় বাস্তবায়িত হবে এই প্রত্যাশা ও প্রতীক্ষায় রয়েছে বাংলার জনগণ।

জাতিসত্তার গোড়ার কথা হলো জাতিগতভাবে মৌলিক মূল্য বোধের সৃষ্টি এবং অবিচলভাবে নিষ্ঠার সাথে সে মূল্যবোধের লালন। এমনি মৌলিক মূল্যবোধের ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয় রাষ্ট্র ও তার সংবিধান আইনের শাসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। আইনের শাসন ও সকলের জন্য সুবিচার নিশ্চিত লাভের প্রত্যাশা বাস্তবায়ন হবে এমনটি আশা নিয়ে জনগণ বুক বেঁধে অপেক্ষারত।

কিন্তু জাতিসত্তার ঊষা লগ্নেই আমাদের মৌলিক এই আত্মচেতনা বোধে হানা হয়েছে চরম আঘাত। জাতির জনকের হত্যাকারীদের সাজা বাস্তবায়নের মাধ্যমে অতিসত্বর সংবিধান ও আইনের শাসন উত্তরণ ঘটবে। পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপটির এমন প্রত্যাশায় ১০ জানুয়ারিতে, ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিজয়ের বেশে প্রত্যাবর্তন দিবস জনগণকে অমানিসা অতিক্রম করে আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংকল্পে আরও দৃঢ় শপথ গ্রহণের সময়।





## আগরতলা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস

আগরতলা বাংলা ও বাঙালির অতীত এবং একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত সীমান্ত ঘেঁষা ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী, আমাদের রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম ভারতীয় ঠিকানা। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিধন্য ত্রিপুরার আগরতলা। ত্রিপুরার মহারাজাদের বাঙালি-প্রীতি ইতিহাসের সম্পদ। রবীন্দ্র সাহিত্যের একটি অংশ জুড়ে আছে ত্রিপুরার রাজা-মহারাজা আর তাদের অতীত জীবন। আগরতলা, এক অর্থে ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অলিখিত রাজধানী। চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী, সিলেটের বেশকিছু অংশ এবং রাজধানী ঢাকা থেকে দেশত্যাগী বাঙালিদের, বিদ্রোহী, ইপিআর, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের প্রথম আশ্রয়স্থল ছিল আগরতলা। একদিকে খুলনা যশোর হয়ে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত, অন্যদিকে চট্টগ্রাম-কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া হয়ে ত্রিপুরার সীমান্ত এই ছিল মুক্তিযোদ্ধা আর মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক-পরিচালকদের প্রাথমিক ঠিকানা। বাঙালির প্রধান জাতীয়তাবাদী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে তথাকথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'। আগরতলাকে ষড়যন্ত্রে জড়িয়েছিল পাকিস্তানি সেনাপতি শাসকরা। বাঙালির স্বাধীনতা স্পৃহাকে দমন করার লক্ষ্যে। এই আগরতলা মামলাকে কেন্দ্র করেই ফাঁসিতে ঝোলাবার চেষ্টা হয়েছিল বাঙালির স্বাধীনতার প্রাণপুরুষ শেখ মুজিবুর রহমানকে। বিস্ময়কর হলেও সত্য, সেই আগরতলাই মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের 'ডেটলাইন'। শ্রদ্ধেয় শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ, ১৯৭১-এ ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী। স্বাধিকারের জন্য চলমান আন্দোলন বেগবান হয়ে অপ্রতিরোধ্য রূপে যখন শহর-বন্দর গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তথাকথিত আগরতলা মামলার অন্যতম আসামি বিমান বাহিনীর সার্জেন্ট জহুরুল হককে রাতের অন্ধকারে তারা গুলি করে হত্যা করে। বাঙালি দেশপ্রেমিকের রক্তে রাঙিয়ে তোলা হয় ভোর রাতের ঢাকা সেনানিবাসে। মুজিবের ভাগ্য নিয়ে অপরিসীম দুশ্চিন্তায় পড়ে যায় দেশবাসী। কিন্তু এর বেশি আর আগানো সম্ভব হয়নি স্বৈরাচারের পক্ষে। আগরতলা ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান এস রহমানের বাড়ি যখন বিক্ষুব্ধ জনতা আক্রমণ করে বসে, গ্রামগঞ্জ-শহরে যখন 'গণশত্রু' নিধনের মহড়া চলতে থাকে, অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায়, শেখ মুজিবের মুক্তির দাবি যখন বাঙালি রক্ত নিংড়ানো আকাঙ্ক্ষার অলঙ্ঘনীয় দাবিতে পরিণত হয়, তখন উড়িয়ে দেয়া হয় সব অভিযোগ। মামলা তুলে নিয়ে সসম্মানে মুক্ত করে দেয়া হয় মুজিবকে। শেখ মুজিবুর হমান হয়ে ওঠেন 'বঙ্গবন্ধু।' পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগই উপাধি দেয় তাকে। বঙ্গভূমির বন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তখন কেবল শেখ মুজিবের জন্য নয়, সারা বাংলার স্বাধীনতাকামী মানুষের জন্য সবার অলক্ষ্যেই যেন 'আগরতলা' একটা আশ্রয়স্থল হিসেবে গড়ে ওঠে। ধর্মনগর থেকে সাব্রুম-ত্রিপুরার প্রতিটি মানুষের কাছে, কী জাতি, কী উপজাতি সেদিন 'জয়বাংলা' ছিল এক ভালোবাসার নাম। ছোট্ট একটি রাজ্য, ভারতের অন্যতম পিছিয়ে পড়া একটা রাজ্য বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না–সেই ত্রিপুরার ওপর দিয়ে গড়িয়ে গিয়েছিল ভৌগোলিক-ব্যবচ্ছেদে বিভক্ত আরেক ভূখণ্ডে বসবাসী বাঙালিদের স্বাধীনতার জন্য প্রায় এক বছরের প্রচণ্ড এক যুদ্ধ! ত্রিপুরার ভৌগোলিক অবস্থানটাও অদ্ভুতভাবে গাঁথা বাংলাদেশের সাথে। ভারত যেখানে তিন দিক থেকে বেঁধে রেখেছে

বাংলাদেশকে–বাংলাদেশ সেখানে তিন দিক থেকে আলিঙ্গন করে আছে ত্রিপুরাকে। ত্রিপুরার মোটামুটি ৯১৭ কিলোমিটার সীমান্তের ভেতর ৮৩৯ কিলোমিটার বাংলাদেশের সঙ্গে। বাদ থাকি ৫৭ কিলোমিটার আসাম আর মাত্র ২১ কিলোমিটার মিজোরামের সঙ্গে। রাজধানী ঢাকার সঙ্গে তার ভৌগোলিক নৈকট্যের কারণে। ঢাকা থেকে ট্রেনে চেপে কুমিল্লার আখাউড়া যাওয়া মানেই আগরতলার বুকের ভেতরে ঢুকে পড়া। সড়কপথে দু'ঘণ্টার যাত্রাতেই পৌঁছে যাওয়া যায় আগরতলা। বাংলাদেশের সাবেক অবিভক্ত জেলা সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম আর পার্বত্য-চট্টগ্রামের সীমান্ত ঘেঁষা বলে মুক্তিকামী বাঙালি সেনাবাহিনীর বিদ্রোহী সদস্য থেকে শুরু করে লাখ দেশত্যাগী মানুষ স্রোতের মতো প্রাণ বাঁচাতে সেদিন ঢুকে পড়েছিল ত্রিপুরায়। ১৯৭১ সালে সমগ্র ত্রিপুরায় বাঙালি ও উপজাতির সংখ্যা মিলে যেখানে ছিল সর্বমোট ১৫.৫৬ লক্ষ, সেখানে বাংলাদেশ ত্যাগী শরণার্থীর সংখ্যা ছিল ১৩.৪২ লাখ। এই সেই আগরতলা যেখানে আর্যদের পা পড়েনি, আসেনি কোনো বিদেশি। আসেনি মোগল, পাঠান এমন কি ইংরেজ। তাই তেমন অর্থে বিদেশির হাতে লুণ্ঠিত হয়নি এই নগরী আর সব ভারতীয় নগরীর মতো। আগরতলা জনকের নাম মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য। এই শহরেই একদিন তরুণ রবীন্দ্রনাথ এসে উঠেছিলেন। নেমেছিলেন মোগড়ার রেল স্টেশনে, আখাউড়া বা তার কাছাকাছি। কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির সাথে ত্রিপুরার মহারাজাদের যোগসূত্র অনেক কালের। সারা বাংলায় যখন বাংলা ভাষার সরকারি মর্যাদা ছিল না, পার্সি এবং ইংরেজ যখন সবকিছুর ওপরে পা রেখে দাঁড়িয়ে, ত্রিপুরার রাজভাষা তখনো বাংলা। বাংলার সমতল ভূমির বুক চিড়ে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়ি ত্রিপুরার যে হৃদ্যতা, সেই হৃদ্যতা ক্রমশ বাড়া বৈ কমেনি। মহারাজাদের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতার ঘটনা যেমন ইতিহাস, তেমনি ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পরবর্তী প্রজন্মের ত্রিপুরাবাসীর অবদানও আরেক ইতিহাস। মহারাজ বীরচন্দ্রের আমল থেকেই ত্রিপুরার আধুনিক ইতিহাসের সূচনা বলে অনেকে মনে করে থাকেন। স্বাধীনতাকামী মহারাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রিটিশবিরোধী বাঙালি যোদ্ধাদের আশ্রয়স্থলও ত্রিপুরা। 'উপমহাদেশের অনেক বাঙালি বিপ্লবী আশ্রয় পেয়েছিলেন বৃহত্তর ত্রিপুরার মাটিতে। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু বরীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধুজন। বিলেতে গিয়ে তিনি বিজ্ঞান গবেষণা করবেন। তার অর্থ চাই প্রচুর। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং অর্থ সংগ্রহে মাঠে নামলেন। কিন্তু মহারাজা রাধা কিশোর মাণিক্য রবীন্দ্রনাথ ভিক্ষার ঝুলি হাতে সেটা দেখতে চাইলেন না। তিনি কবিগুরুকে লিখলেন : 'এ বেশ আপনার সাজে না, আপনার বাঁশি বাজনাই কাজ, আমরা ভক্তবৃন্দ ভিক্ষার ঝুলি বহন করিব।' চিঠির পরের অংশটি সেকালের যে কোনো প্রভাবশালী মহারাজার পক্ষের আরো গুরুত্বপূর্ণ। রাধিকিশোর লিখেছেন : 'প্রজাবৃন্দের প্রদত্ত অর্থই আমাদের রাজভোগ জোগায় আমাদের অপেক্ষা জগতে কে আর বড়ো ভিক্ষুক? এই রাধাকিশোর মাণিক্যের সেকালে ৫০ হাজার টাকা জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনার কাজে দান করেছিলেন। সহায়তা করেছিলেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরের নানা কাজে। শুধু তাই নয়, অন্ধ কবি হেমনচন্দ্র এবং ড. দিনেশচন্দ্র সেন তাঁদের জীবনের অন্যতম সঙ্কটময় মুহূর্তে ত্রিপুরার মহারাজাদের কাছ থেকে আর্থিক মাসোহারা পেয়ে সঙ্কটমুক্ত হয়েছিলেন। এখানে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'হিস্ট্রি





অব ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া' গ্রন্থের একটা উদ্ধৃতি প্রণিধানযোগ্য। 'ত্রিপুরার রাজাদের অনুগত প্রজা বা সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্য পাহাড়ি এলাকা বিলোনিয়া ও উদয়পুরে দুটো খামার ছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়, রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট ভূমিকার ফলে, বাংলায় হিন্দু-মুসলমান রাখি বেঁধেছিলেন। ১৯০৬ সালে স্থানীয় উমাকান্ত একাডেমিতে 'রাখিবন্ধন উৎসব' হয়। ১৯০৯ সালে ব্রিটিশ কর্তৃক সমস্ত বিপ্লবী দলগুলোর প্রকাশ্য কাজকর্ম নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পর এই শহরটিকে (আগরতলা) তারা আশ্রয়স্থল হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।' আশি বছরের জীবনের ষাট বছরই রবীন্দ্রনাথ জড়িত ছিলেন ত্রিপুরার সঙ্গে। রবীন্দ্র সান্নিধ্যে এসেছিলেন চার মহারাজা। বোধ করি, এই অসামান্য বদান্যতার কথা স্মরণ রেখেই রবীন্দ্রনাথ তার সাহিত্য স্থান দিয়েছিলেন ত্রিপুরাকে। 'রাজর্ষি' এবং 'বিসর্জন' বাদেও অসংখ্য গান এবং কবিতা উপহার দিয়েছিলেন তিনি আগরতলাকে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে মুক্তহস্তে দান করেছিলেন ত্রিপুরার মহারাজারা। মহারাজা বীরচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে 'কবি'র সম্মানে ভূষিত করেছিলেন সর্বপ্রথম। তারই প্রাপ্যের বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য শেষ বয়সে কবিগুরুকে সম্মানিত করেন 'ভারত ভাস্কর' উপাধি দিয়ে আগরতলায় অনুষ্ঠিত এক বর্ণনাঢ্য ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। বাংলাদেশ এবং ত্রিপুরাকে প্রাত্যহিক বন্ধনে আজো আবদ্ধ রেখেছে গোমতী নদী। পাহাড়ের বুক চিরে বেরিয়ে আসা গোমতীর পরিপূর্ণ বিস্তার বাংলার সমতল ভূমিতে এসে। রাজনৈতিক কারণে বিভক্তির শিকার হলেও ইতিহাসে এই দুই ভূমির অনেকটুকুই এক ও অভিন্ন। প্রাচীন ফিরাত রাজ্য বাংলাদেশের অনেকাংশ জুড়ে বিস্তৃত ছিল বলে অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন। এই দেশের নাম উল্লেখ আছে গ্রিক বণিকদের রচনায়, যারা খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এ অঞ্চল ভ্রমণ করেছিলেন। শ্রীহট্ট ও চট্টলা ভূমি ছিল এই কথিত ফিরাত রাজ্যের অন্তর্গত। চৈনিক পরিব্রাজক হিউ এন সাঙ্গ, যিনি সপ্তম শতাব্দীতে ঘুরে গেছেন বাংলা, তিনিও এমনি একটা দেশের নামোল্লেখ করেছেন। ব্রিটিশ আমল পর্যন্তও ত্রিপুরা যুক্ত ছিলো ঘোর সঙ্গে। বৃহত্তর ত্রিপুরার সঙ্গে যুক্ত ছিল আজকের বাংলাদেশের অনেকগুলো জেলা। প্রাচীন বাংলা এককালে ছিলো বঙ্গ। আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থের রচয়িতা আবুল ফজল প্রদত্ত তথ্যেই এই আভাস থাকলেও 'বাংলা' বা বাঙ্গালা' নামে উৎপত্তি নিয়ে ইতিহাসবিদদের ভেতরে বিতর্ক আছে। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে 'বঙ্গ' ও 'বঙ্গল' নামে দুটি পৃথক দেশের অস্তিত্বের কথা শিলালিপিতে উল্লেখ আছে। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ইতিহাসবিদের মতে, 'বঙ্গাল' দেশের নাম থেকেই 'বাংলার' উপাত্ত। পাল ও সেন যুগের পরবর্তীকালে অর্থাৎ সুলতানী আমলে বঙ্গ 'গৌড়' নামে পরিচিত ছিলো। তবে মোগল যুগ থেকে 'বাংলা' নাম তার স্থায়িত্ব লাভ করে। কারণ সম্রাট আকবরের আমলেই 'সুবা বাংলা' প্রতিষ্ঠিত হয়। উপনিবেশবাদী ইংরেজ এসে সেই বাংলা নামকে 'বেঙ্গল' নামে অভিহিত করে তাদের নিজেদের ভাষায়। প্রাচীন 'বঙ্গ', 'বাঙালি', 'বঙ্গাল' বা 'বাংলার' সীমানা এককালে উত্তর হিমালয় থেকে নেপাল, সিকিম ও ভুটান রাজ্য, উত্তর-পূর্ব দিকে ব্রহ্মপুত্র নদ উপত্যক্য, উত্তর-পশ্চিম দিকে দ্বারবঙ্গ, পূর্বদিকে ভাগীরথীর উত্তর সমান্তরালবর্তী সমভূমি, গারো, খাসিয়া, জৈন্তিয়া, ত্রিপুরা ও চট্টলার শৈলশ্রেণী ধরে দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত, পশ্চিমে রাজমহল-সাঁওতাল পরগনা ও ছোট নাগপুরের মালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত

ছিল। অন্যদিকে ছিলো বলভূম-কেওঞ্চর-ময়ূর ভঞ্জের শৈল ও অরণ্যময় মালভূমি। বঙ্গের অধিবাসীদের কেউ কেউ নিষাদ জাতি আখ্যা দিয়েছেন। কেউ আবার বলছেন, বাঙালিরা আদি 'অস্ট্রিক' বা 'অস্ট্রো-আশিয়াটিক'। এদের পর দ্রাবিড় ভাষাভাষী 'আলপাইন' জাতির লোকও বসবাস করেছিলো এই বঙ্গে। বৈদিক যুগের শেষভাগে এ মাটিতে আর্য সভ্যতার বিস্তার হয়েছিলো। ঐতরেয় আরণ্যকে বাংলাদেশের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় সর্বপ্রথম। উত্তরবঙ্গ 'পণ্ড্র' নামেও পরিচিত ছিল। রামায়ণ ও মহাভারতেও বাংলা সম্পর্কে উল্লেখ আছে। এই দুই মহাকাব্যে পুণ্ড্র, বঙ্গ, সুহ্ম ও তাম্রলিপি ইত্যাদির নাম আছে। প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যের 'বঙ্গ' ও 'সুহ্ম' এই দুই অঞ্চলের উল্লেখ দেখা যায়। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৬-২৭ সালে আলেকজান্ডার আক্রমণ করেছিলেন উপমহাদেশ। প্রাচীন গ্রিক ও লাতিন লেখকরা ভারতবর্ষে 'গঙ্গরিডই' নামে একটি শক্তিশালী জাতি ছিল। বোঝা যায়, এই জাতি গঙ্গা অববাহিকার মানুষ। আলেকজান্ডার যখন বিপাশা নদীর তীরে পৌঁছান, তখন 'গঙ্গারিডই' ও 'প্রাসিয়র' জাতির এক বিশাল যৌথ বাহিনীর উপস্থিতিতে তিনি যুদ্ধ পরিত্যাগ করে চলে যান। ঢাকায় কুঠি স্থাপন করেছিল তারা। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন নবাব সিরাজদ্দৌলাকে হত্যার ভেতর দিয়ে বাংলার স্বাধীনতাকে হস্তগত করে নিয়েছিল ইংরেজরা। ফকির ও সন্ন্যাস বিদ্রোহ ইংরেজদের বিরুদ্ধে বাংলার সাধারণ মানুষের প্রথম সশস্ত্র বিদ্রোহ। ১৭৬০ থেকে ১৮০০ সাল অবধি দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে চলে এই বিদ্রোহ। ১৭৬৩ সালে একদল ফকির ঢাকার ইংরেজ কুঠি আক্রমণ করে এবং তা দখল করে নেয়। ১৭৬৯ সালে সন্ন্যাসীরা রংপুরে লেফটেন্যান্ট কিনের নেতৃত্বে পরিচালিত একদল ইংরেজ সেনাকে পরাস্ত করে। এই বিদ্রোহে লেপটেন্যান্ট কিন নিহত হন। যুগে যুগেই এই বাংলা স্বাধীনতাকামী সন্তানের জন্ম দিয়েছে। ১৮৩১ সালে তিতুমীরের নেতৃত্বে ওহাবি বিদ্রাহের শুরু। ওহাবিরা একাধিবার ইংরেজ সৈন্য বাহিনীকে পরাজিত করেছে। নারিকেলবাড়িয়ার বাঁশের কেল্লা স্থাপন করেছিলেন তিতুমীর, সৃষ্টি করেছিলেন প্রতিরক্ষাব্যূহ। বীর তিতুমীর যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হন। ফরিদপুরে গড়ে ওঠে 'ফারাজি' আন্দোলন। এই আন্দোলনের নেতা হাজি শরিয়তউল্লাহর মৃত্যুর পর তার ছেলে দুদু শাহ যোগ্য নেতৃত্ব দেন ফারাজিদের। ১৮৫৭ সালের ১৮ নভেম্বর চট্টগ্রামে হাবিলদার রজব আলীর নেতৃত্বে সিপাহীরা বিদ্রোহ করে। এই চট্টগ্রামেই ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল সূর্যসেন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করেন। ১৯০৫ সালের বাংলা বিভাগকে কেন্দ্র করে বঙ্গভঙ্গ রোধ ও স্বদেশী আন্দোলনের শুরু। সেদিন পূর্ব বাংলাকে অর্থাৎ ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে নতুন প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন লর্ড কার্জন। ১৮৮৫ সালে জন্ম হয় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের। ১৯২০ সালের মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন চরমে পৌঁছে–এর সঙ্গে যুক্ত হয় খেলাফত আন্দোলন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনদাশ ১৯২২ সালে গঠন করেন 'স্বরাজ্য' দল। ১৯২৩ সালের এপ্রিলে বাংলার হিন্দু-মুসলমান নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় ঐতিহাসিক 'বেঙ্গল প্যাক্ট' বা হিন্দু-মুসলিম মিলন চুক্তি। কিন্তু দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের সংগঠনগতভাবে, প্রথম ঐক্যবদ্ধ করে আবুল কাসেম ফজলুল হকের 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' বা 'কৃষক প্রজা পার্টি' যা আত্মপ্রকাশ করে ১৯৩৭ সালে। সেই বছরেই সাধারণ





নির্বাচনে প্রায় প্রতিটি মুসলিম আসনে ফজলুল হকের 'কৃষক প্রজা পার্টি' বিজয়ী হয়। তাঁর মন্ত্রিসভা 'বঙ্গীয় চাষী ঘাতক আইন' ও 'মহাজনী আইন' পাস এবং জমিদার ও জোতদারদের কবল থেকে বাংলার চাষিদের অনেকাংশে মুক্ত করে। ১৯৩৮ সালে 'ঋণ সালিশি বোর্ড' ও ১৯৩৯ সালে 'প্রজাস্বত্ব আইন' পাস করে ফজলুল হক দীর্ঘকালের শোষিত কৃষককুলকে মুক্তির আলোকবর্তিকা দেখান। ফজলুল হক এরই মধ্যে তার দুঃসাহসী কর্মকাণ্ডের জন্য শের-এ-বাংলা-তে পরিণত হন। ১৯৪০ সালের ২২ মার্চ লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এক অধিবেশনে লীগের যে ঐতিহাসিক প্রস্তাব পাস হয় তারও প্রস্তাবক ছিলেন তিনি। এই প্রস্তাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোকে নিয়ে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়। ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাবের উত্থাপক হলেও তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের সমর্থক। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে ১৯৪১ সালের ১২ আগস্ট বঙ্গীয় বিধান সভায় প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক যে শোক প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন তাতে তিনি বাংলা, বাঙালি, বাংলাভাষা ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে মন্তব্য রাখেন, তা সত্যিই প্রণিধানযোগ্য।

বাংলার তথা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আরেক অধ্যায় রচনা করেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। ১৯৪১ সালের ২৬ জানুয়ারি নজরবন্দি অবস্থা থেকে সন্ত্রাসীদের চোখ এড়িয়ে দেশত্যাগ করেন দুঃসাহসী বীর সুভাষ। নাজি জার্মানি ও তার দোসর জাপানের সহযোগিতায় বিদেশ-বিভূঁইয়ে গঠন করেন তিনি 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'। বাংলা, বিশেষত পূর্ব বাংলার রাজনীতি ইতিমধ্যেই দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। বাংলার সাধারণ মুসলমানের আকাঙ্ক্ষা একদিকে, অন্যদিকে প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাবশালী কায়েমী অভিজাত শ্রেণি-নবাব, জমিদার ও ব্যবসায়ী পরিবার। ১৯৪৪, ৯ এপ্রিল শামসুল হকের নেতৃত্বে ঢাকার মোগলটুলিতে এক বিরোধী দলের জন্ম হয় বা পরবর্তীকালে রূপান্তরিত হয় আওয়ামী মুসলিম লীগ'-এ। শেখ মুজিবুর রহমানও যুক্ত থাকেন এই দলটির গঠন প্রক্রিয়ার সঙ্গে। ১৯৪৫ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেন্ট এটলি ভারতের স্বাধীনতা ও ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে একটি 'বেকিনেট মিশন' পাঠান। কেবিনেট মিশন ভারতকে তিনটি আত্মনিয়ন্ত্রিত ভাগে ভাগ করার প্রস্তাব দিলে কংগ্রেস তা প্রত্যাখ্যান করে, অন্যদিকে মুসলিম লীগ তা গ্রহণ করে। মুসলিম লীগ ১৯৪১ সালের ১৯ জুলাই পাকিস্তানের দাবিতে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' উদযাপনের সিদ্ধান্ত নিলে স্মরণকালে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে কলকাতার বুকে। এ সময় ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা হস্তান্তর করতে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আসেন লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ বিজয়ী হয়েছিল এবং তিনিই ছিলেন অবিভক্ত বাংলার শেষ প্রধানমন্ত্রী। নবগঠিত পাকিস্তানে ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে বাংলাকে দাবি করেন। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ঢাকা শহরের ছাত্ররা সাধারণ ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বাংলা ভাষার দাবিতে দ্রুত সংগ্রাম গড়ে উঠতে থাকে। পুলিশ বেপরোয়া নির্যাতন চালায়। প্রায় হাজার খানেক ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। এদের মধ্যে অন্যতম শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ, শওকত আলী, কাজী গোলাম মাহবুব

প্রমুখ। দমননীতির ফলে ছাত্র বিক্ষোভ আরো বেড়ে যায়। ১৬ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ছাত্ররা পরিষদ ভবন ঘেরাও করে। ২১ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় দাঁড়িয়ে জিন্না সাহেব ঘোষণা করেন 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু অন্য কোনো ভাষা নয়। কিন্তু প্রতিবাদ ওঠে সভাস্থল থেকেই। নব্য পাকিস্তানের 'জাতির পিতা' জিন্নাহর বক্তব্য মেনে নেয়নি বাঙালি ছাত্র সমাজ। গড়ে ওঠে 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' যার অন্যতম নেতা হন শেখ মুজিবুর রহমান। ইতিহাস গড়াতে থাকে। ১৯৪৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি করে গঠিত হয় 'পূর্ব' পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ।' ১৯৫১ সালে গঠিত হয় সংগ্রামী যুব সংগঠন 'যুবলীগ'। '৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহণ করে। ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভাঙতে থাকলে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন একাধিক ছাত্র। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে ঢাকাসহ সারা বাংলা। ভাষা আন্দোলনের ফলে ছাত্র আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে থাকে। '৪৮-এর ভাষা আন্দোলনের পর গঠিত হয় 'মুসলিম ছাত্রলীগ' আর '৫২-এর ভাষা আন্দোলনের পর সৃষ্টি হয় 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন'। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে যুক্তফ্রন্ট। এই যুক্তফ্রন্টীয় আন্দোলনের ভিত্তি ছিল একুশ দফা, যার প্রধানতম শর্ত ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা। যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী হন আবুল কাশেম ফজলুল হক। ১৯৫৫ সালের এক কাউন্সিল অধিবেশনে দলের সাধারণ সম্পাদক হন উদীয়মান সাহসী নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৫৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ তার প্রথম মন্ত্রিসভা গঠন করে। লীগ সভাপতি মওলানা ভাসানী কাগমারী সম্মেলনে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি তার ঐতিহাসিক 'আস্‌সালামু আলাইকুম' উচ্চারণ করে পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতার কথা প্রায় প্রকাশ্যেই উচ্চারণ করেন। ১৯৫৮ সালের ২১ থেকে শক্ত ভিত গড়ে বসে পাকিস্তানের মাটিতে সামরিক শাসন। সাথে সাথেই গ্রেফতার করা হয় মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমানসহ অসংখ্য রাজনৈতিক নেতাকে। ১৯৬৬ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় এক জাতীয় সম্মেলনে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান পেশ করেন তার ঐতিহাসিক ৬ দফা। এই ৬ দফা পেশের পর থেকে নতুন উদ্যমে শুরু হয় আওয়ামী লীগের ওপর ভয়াবহ দমন-নির্যাতন মুজিব গ্রেফতার হন। শত শত আওয়ামী লীগ নেতা কারাবরণ করেন। বাঙালির জাতীয়তাবাদী স্পৃহা ৬ দফার ভেতর দিয়ে বিকশিত হতে থাকে। জেলে অবস্থান করেও মুজিব সাড়ে সাত কোটি বাঙালির একচ্ছত্র অধিপতির মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে শুরু করেন। ৭ জুন ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পুলিশের গুলিতে নিহত হন ১১ জন। ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া কারারুদ্ধ হন। টেলিভিশন ও রেডিও থেকে বাঙালির আহ্বানে সাহিত্যে-সংস্কৃতি আর আচার-অনুষ্ঠান সম্পৃক্ত প্রায় সব ধরনের অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়, এমন কি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত নিষিদ্ধ হয়ে যান। বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন বেসামাল আইয়ুব খান বাংলার নয়নমণি শেখ মুজিবসহ বেশ কিছু দেশপ্রেমিক বাঙালি সেনা এবং বেসামরিক অফিসারের বিরুদ্ধে রুজু করেন ঐতিহাসিক 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'। ১৯৬৬ সালের ৮ মে থেকে মুজিব জেলে আটক। প্রায় ১১ মাস তার পর তাকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে পুনর্বার বন্দি করে ১৯৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারি ঢাকা সেনানিবাসে বন্দি করে রাখা হয়। করা হয় মামলার এক নম্বর





আসামি। ফেটে পড়ে সারা বাংলা। ছাত্রসমাজ এগিয়ে আসে তাদের ঐতিহাসিক ১১ দফা নিয়ে, বেগবান হয় শেখ মুজিবের ৬ দফা। গড়ে উঠে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, এক প্রতিরোধ্য গণআন্দোলন, গণবিস্ফোরণ যা, শুধু আইয়ুব খানকে নিঃশর্তভাবে তথাকথিত ওই মামলা তুলে নিতেই বাধ্য করে না, সেই সঙ্গে সেই 'লৌহ মানবও' ঘটায় পতন। ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা দিয়ে কেটে পড়েন আইয়ুব খান। ইয়াহিয়া উপায়ান্তর না দেখে ১৯৭০-এর ৭ ডিসেম্বর পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ ও ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন ঘোষণা করেন। এই দুই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৬ দফার ওপর সারা বাংলার ম্যান্ডেট লাভ করে। এই নির্বাচনের প্রক্রিয়াতেই আওয়াজ ওঠে : 'কৃষক-শ্রমিক অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর', 'পদ্মা-মেঘনা-যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা'। শেখ মুজিব এই প্রক্রিয়াতেই 'বঙ্গবন্ধু'তে রূপান্তরিত হন। প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০টি আসনের ভেতরে আওয়ামী লীগ লাভ করে ২৮৯টি। এই নির্বাচনে প্রতিক্রিয়াশীল দল, যেমন মুসলিম ও জামায়াতে ইসলামী কোটি কোটি টাকা খরচ করেও নিশ্চিত ভরাডুবি বরণ করে। ঐতিহাসিক এই নির্বাচনই রক্তাক্ত মহান মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি রচনা করে। ৩ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ রমনা রেসকোর্স পালন করে 'শপথ দিবস'। আর এসব ঘটনার মুখে দিশেহারা পাকিস্তানি নেতা জেনারেল ইয়াহিয়া ও জুলফিকার আলী ভুট্টো বাঙালি নিধনের পরিকল্পনা আঁটতে থাকেন। সময়ের কাঁটা গড়িয়ে গড়িয়ে পেরিয়ে গেল ১৯৭০ সাল। এলো ১৯৭১-এর ১৩ ফেব্রুয়ারি। সারা পূর্ব বাংলা তখন স্বাধীনতার জন্য উন্মুখ। ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করলেন। জুলফিকার আলী ভুট্টো এই ঘোষণা মেনে নিতে অস্বীকার করে হুমকি দিলেন এই বলে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কোনো সংসদ সদস্য যেন ঢাকায় এসে বৈঠকে যোগ না দেন। চললো শেখ মুজিবের সাথে কথাবার্তা। মুজিব ৬ দফা থেকে এক বিন্দু পড়তে রাজি হলেন না। বাংলার একচ্ছত্র নেতা শেখ মুজিব তখন ধীর-স্থির। জাতীয় জীবনের এই ভয়াবহ সংকটকালেও মুজিব আদর্শচ্যুত হননি। ১৯৭১-এর ১ মার্চ তারিখে সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এক আকস্মিক বেতার ঘোষণা মারফত ৩ মার্চে ঢাকায় আহূত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। জ্বলে উঠে পূর্ব বাংলা। সে এক অভাবিত দৃশ্য! বলতে গেলে ঢাকা শহরের প্রতিটি মানুষ প্রতিটি পাড়া-মহল্লা, প্রতিটি কোণ থেকে মুহূর্তকালের ভেতরে নেমে আসে সোজা রাজপথে। ঢাকা স্টেডিয়ামের ক্রিকেট খেলা ছেড়ে বেরিয়ে আসে হাজার হাজার দর্শক। কল-কারখানা, দোকানপাট, স্কুল-কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। সশস্ত্র পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে গড়ে উঠতে থাকে প্রতিরোধ। পথে পথে ব্যারিকেড তৈরি হতে থাকে। ২ মার্চ হরতাল পালিত হয় সারা বাংলায়। সেনাবাহিনী নামে মুক্তিপাগল ছাত্র-জনতাকে দমন করতে। অগণিত মানুষ মৃত্যুবরণ করে তাদের গুলিবর্ষণে। শেখ মুজিব এক বিবৃতিতে এই আলোচনা প্রত্যাখ্যান করে বলেন : 'ঢাকা চট্টগ্রাম ও বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে যখন নিরস্ত্র জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে হত্যা করা হচ্ছে, শহীদের তাজা রক্ত যখন রাজপথে শুকিয়ে যায়নি, কতিপয় নিহত ব্যক্তির লাশ এখনো দাফন করা হয়নি, শত শত আহত ব্যক্তি যখন হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে সংগ্রাম করছে, ঠিক সেই সময় ঢাকায় ১০ মার্চ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের এক সম্মেলনে বসার জন্য বেতার ঘোষণা মারফতে আমন্ত্রণের প্রস্তাব একটি

নির্দয় তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়...।' ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে ওড়ে প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা, যে দৃশ্য স্মৃতিতে আজো উজ্জ্বল। পুড়িয়ে ফেলা হয় চব্বিশ বছরের দুঃশাসনের অন্যতম প্রতীক পাকিস্তানি পতাকা। ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে লাখো ছাত্র জনতার উপস্থিতিতে পাঠ করা হয় 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র'। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এদিন ঘোষণা দেয় রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি হবে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। শ্লোগান উঠলো, 'বীর বাঙালি অস্ত্রধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর', তোমার আমার নেতা শেখ মুজিব। 'জয় বাংলা'। এলো ৭ মার্চ। ঐতিহাসিক ৭ তারিখ। রমনার রেসকোর্স ময়দান পরিণত হলো জনসমুদ্রে। বিদ্রোহে ফেটে পড়া বাংলা তাকিয়ে আছে তাদের একচ্ছত্র নেতা শেখ মুজিবের দিকে। কী নির্দেশ দেন, কী করতে বলেন তিনি, তারই প্রতীক্ষায় এক সময় নেতা এলেন। বেলা তখন ৩টা ২০ মিনিট। মুজিবের কণ্ঠ থেকে ভেসে এলো ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ। এই ভাষণেই মুজিব দেশবাসীকে আহ্বান জানালেন স্বাধীনতার সর্বাত্মক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে। যে মন্ত্র বঙ্গবন্ধু সেদিন ছড়িয়ে দেন, সেই মন্ত্র বুকে আগলে রাখে সমগ্র বাংলাদেশ। যাবতীয় পাকিস্তানি প্রশাসন অচল হয়ে পড়ল। কোর্ট-কাচারি, অফিস-আদালত সব বন্ধ হয়ে গেল। বলতে গেলে সেদিন থেকেই আক্ষরিক অর্থে পূর্ব পাকিস্তানি স্বাধীন হয়ে গেলো শেখ মুজিবের নেতৃত্বে। পুরে প্রশাসন চলতে থাকলে শেখ মুজিবের নির্দেশে। হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সব এক হয়ে গেল। বাঙালিত্বের জয় হলো ঘোষিত। ২০ মার্চ মওলানা ভাসানী চট্টগ্রামে এক সংবাদ সম্মেলনে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করার জন্য ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানান। ২৪ মার্চ আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ ও ড. কামাল হোসেন ইয়াহিয়া খানের উপদেষ্টাদের সাথে দু'ঘণ্টা ধরে কথা বলেন। ওই দিনই ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরে বিক্ষুব্ধ জনতার ঢল নামে। ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় মুজিব এক বিবৃতি প্রচার করলেন এই মর্মে : 'আমি সৈয়দপুর রংপুর ও জয়দেবপুরে সামরিক অভিযানের সংবাদ জানতে পেরে মর্মাহত হয়েছি। চট্টগ্রাম থেকে প্রচণ্ড গুলিবর্ষণের সংবাদ আসছে। ওইসব কিছুই চলছে যখন প্রেসিডেন্ট ঢাকায়। আমি তাকে অবিলম্বে এরূপ সামরিক অভিযান বন্ধ করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।' এটা জেনে রাখা উচিত যে মার্চের মধ্য রাতেই সামগ্রিক শক্তি নিয়ে পাক সেনাবাহিনী ঢাকাসহ দেশের প্রতিটি নগরে নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সে রাতেই বন্দি করা হয় এবং পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। স্থল, বিমান, বাহিনীর সহযোগে চালানো হয় বাঙালি নিধন অভিযান দেশের প্রতিটি জেলা সদরে সেনানিবাসে। সে রাত থেকে উঠতে থাকে প্রতিরোধ। দেশের বিভিন্ন স্থানে সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্য, পুলিশ ও ইপিআর বাহিনী বিদ্রোহ করে। ২৭ মার্চ চট্টগ্রাম থেকে বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবের নামে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন সেই সময়কার মেজর জিয়াউর রহমান। শুরু হয়ে যায় সশস্ত্র প্রতিরোধ। স্বাধীনতার যুদ্ধ। একদিকে জীবন বাঁচাতে বাস্তুভিটা ত্যাগ করে ভারতের মাটিতে প্রবেশ করে লাখ লাখ শরণার্থী, অন্যদিকে সীমান্ত ও দেশের অভ্যন্তরে গড়ে উঠতে থাকে সশস্ত্র প্রতিরোধ। ঢাকায় ২৫ মার্চের বর্বরোচিত গণহত্যা শত শত ঘরবাড়ি সৈন্যরা মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল। মানুষের জন্যে ত্রিপুরা হয়ে উঠে মুখ্য আশ্রয় ঘাঁটি। ক্ষুদ্র ত্রিপুরা তার সীমিত ভূখণ্ড আর আর্থিক সামর্থ্যের ভেতরেও সাদরে গ্রহণ





করে লাখো লাখো বাঙালি দেশত্যাগীকে। রাজ্যে তখন ক্ষমতাসীন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রনাল সিংহের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসী সরকার। কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন ইন্দিরা গান্ধীর সরকার হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন প্রবেশ করছে সাংখু, ধর্মতলা, বিলোনিয়া, আগরতলা, কৈলাসশহর, কসবা ও সোনামুড়া দিয়ে। উন্মুক্ত সীমান্ত। এদের জন্য চাই খাদ্য, চাই বস্ত্র, চাই আশ্রয়। কোথায় থেকে আসবে এই রসদ! কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট এবং নোয়াখালী জেলা থেকেই অধিক সংখ্যক শরণার্থী এ-রাজ্যে এসেছে। যুবতী মেয়েদের লাঞ্ছিত করে, শত শত মেয়েকে ধরে নিয়ে ওদের বাঙ্কার ও আশ্রয়স্থলে বন্দি করে পাশবিক নির্যাতন চালায়। পাকবাহিনীর সেই তাণ্ডব বিশ্ব-ইতিহাসের নির্লজ্জতম নজির। এপ্রিলের শেষদিক থেকে ত্রিপুরা সীমান্ত বরাবর গড়ে ওঠে একের পর এক শরণার্থী শিবির। মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্র সিংহের সরকার সর্বাত্মক সাহায্যে এগিয়ে আসেন সেই সাথে এগিয়ে আসে রাজ্যের জনগণ। স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে যায়। ত্রিপুরার ছাত্র-শিক্ষক, রাজনৈতিক কর্মী, সমাজসেবী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ। পাশে এসে দাঁড়ান শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের। এই সাহসী রাজনীতিবিদের অবদান শুধু শরণার্থী পুনর্বাসনের ভেতরেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং আগরতলাকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অলিখিত রাজধানীতে পরিণত করতেও তার ভূমিকা অপরিসীম। ২১ মে লম্বুছড়াক এক শরণার্থী শিবির দেখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন : 'পূর্ব বাংলার আন্দোলন স্বাধীনতার আন্দোলন, গণতন্ত্রের আন্দোলন। পৃথিবীর কোনো স্বৈরশক্তি এই আন্দোলন দমন করতে পারবে না। এ আন্দোলন জয়যুক্ত হবেই। গোটা বাংলাদেশে স্বদেশপ্রেমী মুক্তিফৌজ এক অবিস্মরণীয় বীরত্বে হানাদার পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছেন। হানাদার বাহিনীর নির্বিচার গোলাবর্ষণের মুহুর্মুহু শব্দে এই শহরের ঘরবাড়ি কাঁপছে। তিতাসের দুই তীর জুড়ে সংঘর্ষ তীব্র। মুক্তিফৌজের উদ্যত কামানের বিরামহীন অগ্নি-উদগিরণের ফলে শত্রু বিমান ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আকাশ থেকে সরে যায়। বাংলাদেশ জুড়ে নরহত্যা, গৃহদাহ, লুণ্ঠন নারকীয় পৈশাচিকতা চলছে–বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী দুর্বার গতিতে শত্রু সৈন্যদের পরাভূত করে এগিয়ে চলেছে। ভারতীয় সীমান্ত রাজধানীগুলোর মধ্যে একমাত্র আগরতলাই বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন। আর এই ভৌগোলিক যোগসূত্রের কারণে আগরতলা বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে মুখ্য বন্ধুর ভূমিকা রাখে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার। সরকার গঠনের পর থেকেই মুক্তি সংগ্রামের কাঠামোগত বিন্যাস তৈরি হয়ে যায় এবং বিভিন্ন শরণার্থী শিবির, ইয়ুথ ক্যাম্প এমএনএ ও এমপিদের দায়িত্ব ভাগ করে দেয়া হয়। বাঁধভাঙা প্লাবনের মতো দেশত্যাগী মানুষ এখন ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য প্রবেশ করছে তখন একদিকে শরণার্থী পুনর্বাসনের কাজ অন্যদিকে অস্ত্র-গোলাবারুদ সংগ্রহ আর ট্রেনিং দিয়ে পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে মুক্তিকামী হাজার হাজার তরুণ-যুবকের সমন্বয়ে মুক্তিফৌজ গড়ে তোলার কাজ। মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে ভারতের সেই সময়কার প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের চিরস্মরণীয়। শরণার্থীদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য তিনি বেশ কয়েকবার এসেছিলেন আগরতলায়। 'নয়াদিল্লি থেকেই আমি সব খবর পাচ্ছি। আমি এসেছি এই অসহায় ও অত্যাচারিত মানুষদের সহানুভূতি জানাতে।' ১৬ জুলাই ত্রিপুরার উপমন্ত্রী মনসুর আলী বিভিন্ন শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন। জুলাই

মাসের ভেতরে সারা ভারতে ৫৭ লক্ষ ৬৩ হাজার শরণার্থী ঢুকে পড়ে। ত্রিপুরায় আগত শরণার্থীদের সমস্যা ও তার প্রতিকারের ব্যবস্থা ছিল নিম্নরূপ :

| | | |
|---|---|---|
| স্থায়ী লোকসংখ্যা | : | ১৫৫৯০০০ জন |
| আগত শরণার্থী | : | ১২২১০৭৫৪ জন। |
| শিবির সংখ্যা | : | ৩৬টি। |
| ইউনিট | : | ৩৮২টি। |
| শিবিরবাসী | : | ৬৯২১৫৫ জন। |
| ব্যক্তিগত ব্যবস্থা | : | ১৫০০০০ জন। |
| আত্মীয়ের সঙ্গে | : | ৩৮৯৬০০ জন। |
| রাজ্যের বাইরে প্রেরিত | : | ২৫৪৪০ জন। |
| সংরক্ষিত ব্যবস্থা | : | ৭৫০০০ জন। |
| এ পর্যন্ত ব্যয় | : | ৭২০০০০০০ জন। |
| সম্ভাব্য ব্যয় | : | ৪৫ কোটি টাকা। |
| চিকিৎসা | : | ৩৫০ জন ডাক্তার ও চিকিৎসাকর্মী। |

শরণার্থীদের এই রকম জোয়ারের মুখে ত্রিপুরার খাদ্যদ্রব্য আর ভোগ্যপণ্যের ঘাটতি দেখা দেয়। ডিমের হালি তিন টাকা থেকে ১২ টাকায়। শুধু আগরতলা নয় মহানগরী কলকাতাও এই সময় বিপর্যস্ত হয়েছিল বাংলাদেশের শরণার্থী সমস্যার ভারে। আগস্ট মাস নাগাদ পশ্চিম বাংলায় বাংলাদেশ থেকে শরণার্থী ঢুকেছিল ৫২ লক্ষ ৭২ হাজারের বেশি। আগস্ট মাস থেকে যুদ্ধের শেষদিন পর্যন্ত রাতের বেলায় কারফিউ জারি থাকতো আগরতলায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের কথা এলে ইন্দিরা গান্ধীর কথা তোলা কেবল স্বাভাবিক নয়, অত্যাবশ্যকীয়ও। ৯ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী এক জনসমাবেশে পরিষ্কার ভাষায় বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশের) শরণার্থীরা যারা এখানে এসেছে তারা এখানে নিমন্ত্রণ খেতে আসেনি। তারা আক্রান্ত, বিপন্ন। বিশ্বের কোনো বৃহৎ রাষ্ট্রই আজ পর্যন্ত এতো বিরাটসংখ্যক শরণার্থীর দায় নেয়নি। ভারতেরও সে ক্ষমতা নেই। কিন্তু ভারত তার মানবিক দায়িত্ব ও দায় থেকে চ্যুত হতে পারে না বা কারো ভয়ে ভীত হয়ে সে দায়িত্ব পালনে বিরত হবে না।' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যাকে মুক্ত পৃথিবীর মুখ্য প্রতিনিধি বলে চিহ্নিত করা হয়, সেই যুক্তরাষ্ট্রের সেদিনকার সরকার বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষের পাশে ছিল না। গণচীন, ছিল না বেশ কিছু আরব রাষ্ট্রও। বাংলাদেশ আর ভিয়েতনামে আমেরিকানদের যে ভূমিকা, সেই ভূমিকা তাকে একদিন ইতিহাসের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ আর স্বাধীন সংবাদপত্র তাদের ভূমিকা স্মরণীয় 'ওয়াশিংটন' পোস্ট', 'নিউইয়র্ক টাইমস', 'টাইম' ও নিউজিইউক' ইত্যাদি সংবাদপত্র; ব্রিটেনের 'গার্ডিয়ান', 'লন্ডন টাইমস' এবং টেলিগ্রাফ জোরালো ভূমিকা রেখেছিল পাকিস্তানি গণহত্যার বিরুদ্ধে। এসেছিলেন মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি কলকাতা ও আগরতলায়। ১২ আগস্ট কেনেডি ত্রিপুরা রাজ্যে। বিমানবন্দর থেকে রাজনিবাসের দু'ধারে বিপুল জনতা। সেদিনকার সেই অবিশ্বাস্য ভিড়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিলেন বাংলাদেশের শরণার্থী আর ত্রিপুরাবাসী। শ্লোগান উঠেছে–'এডওয়ার্ড কেনেডি জিন্দাবাদ'।





'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জিন্দাবাদ'। বিমানবন্দর থেকে জে.বি হাসপাতাল, সেখান থেকে সার্কিট হাউস। কেনেডি এসেছিলেন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে নয়, এসেছিলেন শরণার্থী সংক্রান্ত সিনেট সাব-কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক প্রতিনিধিরা যেদিন আগরতলায়, সেদিন অকস্মাৎ কামানের গোলা পড়তে থাকে ত্রিপুরার মাটিতে। মিস্টার জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্ব এবং অবৈজ্ঞানিক ভৌগোলিক বিভাজনে পাকিস্তানের সৃষ্টি বাস্তবের রূঢ় সংঘাতে আজ অসার বলেই প্রমাণিত। জনক্রিস এক সময় 'হাউস অব লর্ডস'-এর সদস্য ছিলেন। লর্ডশিপ ত্যাগ করে ঢুকেছিলেন তিনি সাংবাদিকতায়। অক্টোবরে মোহনপুর ও মধুপুর শরণার্থী শিবির পরিদর্শনকালে জনৈক কিশোর এবং গ্রামের একজন সহজ-সরল বধূ তাদের পরিবারের ওপর পাক সেনাবাহিনীর বর্বর অত্যাচারের কাহিনি তাকে যখন শোনাচ্ছিল, তখন সেই বিদেশির পক্ষেও তার চোখের পানি সংবরণ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। পশ্চিম বাংলার সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ও ভারতের এককালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের সরকারি ও শরণার্থীদের মনোবল দৃঢ় করার জন্য হাপানিয়া শিবিরে তিনি বলেন, স্বাধীনতা লাভের জন্য যে দুর্বার সংগ্রাম আজ বাংলাদেশে শুরু হয়েছে অদূর ভবিষ্যতে তার পূর্ণ সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল ত্রাণ কমিটি। সর্বজনশ্রদ্ধেয় জয়প্রকাশ নারায়ণপুর ঘুরে গেছেন আগরতলা ও ত্রিপুরার শিবিরগুলো। স্বচক্ষে দেখে গেছেন কতটুকু নির্যাতিত আর বর্বরোচিত হামলা হলে মানুষ নিজের ভিটেমাটি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ৫ অক্টোবর হাপানিয়া শরণার্থী 'শিবিরের দেশত্যাগীদের সাথে দেখা করে সেখানে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি বলেছিলেন, 'শিবিরের অবস্থানরত শরণার্থীদের জন্য ভারত সরকার যা করছে তা অপ্রতুল হলেও সারা ভারতের আন্তরিকতা এর সাথে যুক্ত হয়ে আছে। ভারত সরকারের হয়ে আমি কোনো কথা বলার অধিকার না থাকলেও ভারতবাসী হিসেবে আমি দৃঢ় প্রত্যয়ে এই কথা বলতে পারি, প্রত্যেক ভারতবাসীই আজ বাংলার মুক্তিযুদ্ধের সাথে মনেপ্রাণে যুক্ত হয়ে গেছে। আর এজন্য যতো বড়ো ঝুঁকিই নিতে হোক না কেন, তার জন্য সারা ভারতের মানুষ মানসিকতাভাবে প্রস্তুত।

পুরো বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার্থে। ভৌগোলিক কারণেই ১ থেকে ৪ নম্বর সেক্টরের সীমানা ক্ষুদ্র ভারতীয় রাজ্য ত্রিপুরার সাথে গাঁথা ছিল। সিলেটের সুনামগঞ্জ-ডাউকি-বাঁশতলা-জৈন্তাপুর ইত্যাদি নিয়ে যে ৫ নম্বর সেক্টর তাও এক অর্থে ত্রিপুরা সীমান্তঘেঁষা। অন্যদিকে ১০ নম্বর সেক্টর তৎপরতার দিকে থেকে যুক্ত ছিল ত্রিপুরার সাথে। ২৫ মার্চ। রাত তখন প্রায় একটা। ছাড়া-শ্যামলিয়া ঘেরা পাহাড়-পরিবৃত বন্দরনগরী চট্টগ্রাম ঘুমে নিমগ্ন। বীর প্রসবিনী চট্টলার ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টারের ছাউনিতেও ঘুম তখন তার আঁচল বিছিয়ে দিয়েছে। ২০নং বেলুচ রেজিমেন্টের সৈন্য বোঝাই ছয়টি ট্রাক এসে ধীরে ধীরে রেজিমেন্ট সেন্টারের অস্ত্রাগারের সামনে দাঁড়াল। অস্ত্র পদক্ষেপে অস্ত্রে সজ্জিত সৈনিকরা ট্রাক থেকে নেমে পড়ল। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা অস্ত্রাগারে আধিপত্য বিস্তার করল। অস্ত্রাগারে প্রহরারত রেজিমেন্টের বাঙালি সৈনিকরা আক্রমণে প্রাণ হারালো। প্রহরারত বাঙালি সৈনিকদের নির্মমভাবে খতম করে দিয়ে পশ্চিমা দস্যুরা সেন্টারের চতুর্দিকে পজিশন নিয়ে শুরু করল তাদের পৈশাকি হত্যাযজ্ঞ। চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারে মেজর জিয়ার নিজের তরফ থেকে এবং পরে শুদ্ধ করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে

স্বাধীনতার যে ঘোষণা তিনি দিয়েছিলেন, সেটা আজ আমাদের জানা ইতিহাসের বিশেষ অংশ। সেদিন ওই ঘোষণা বৈদ্যুৎ ধ্বনি হলেও ইতিহাসের শাশ্বত নিয়মেই সেই মেজরটি আর দশজন সাধারণ মেজর বা অন্যসব সেক্টর কমান্ডারের মতো থাকেননি। আসাম-মেঘালয় সীমান্ত বরাবর 'জেড ফোর্স' আর তেলঢালা ক্যাম্পে মেজর। তবে যে পরিস্থিতিতে যে পদ্ধতিতেই ভাষণটি প্রচারিত হোক না কেন, সেটা প্রায় সারাদেশের মানুষের কানে পৌঁছেছিল এবং জাতির গভীর হতাশার ভেতরে সঞ্চার করেছিল নতুন আশা ও উদ্দীপনার। স্বাধীনতার ঘোষণা সংক্রান্ত বিতর্কে, আমার মনে হয়, রাজনৈতিক জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন কেউ অংশগ্রহণ করবেন না। কারণ একটি দেশের বা জাতির মুক্তিযুদ্ধ কেবল একজন মেজরের বেতার ভাষণে পরিচালিত বা সম্পন্ন হয়নি। যারা এই বিতর্কে অংশগ্রহণ করছেন এখনো তারা পরোক্ষভাবে নিজেদের 'নব্য হিরো' বানাবার অপচেষ্টা করেছেন।

কেবল একটি ঘোষণার ভেতর দিয়েই বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ হয়নি, সুদীর্ঘ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন জাতির সংগ্রামী হৃদয়ে তৈরি হয়নি। ১ নম্বর সেক্টরের লাগোয়া ২ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক ছিলেন প্রথমে মেজর খালেদ মোশাররফ, পরবর্তীকালে মেজর দুর্ধর্ষ গেরিলা কমান্ডার এটিএম হায়দার (এদের দুজনই '৭৫ সালের সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত)। এই গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরটি গড়ে উঠেছিল কুমিল্লা, নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মানিকগঞ্জ ও শরীয়তপুরের কিছু অংশ এবং মুন্সীগঞ্জ এলাকা নিয়ে। রাজধানী ঢাকার 'অপারেশন' থেকে শুরু করে এর শহরতলিতে পর্যন্ত পাকিস্তানিদের জন্য ত্রাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই সেক্টরের দুঃসাহসী গেরিলারা। মেলাঘর, গঙ্গাসাগর, কসবা, শালদা নদী, বেলোলিয়া ও চৌদ্দগ্রাম ইত্যাদি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল ২ নম্বর সেক্টরের মুক্তিসেনারা। তারা আহত ও নিহত হয় এবং শত্রুসেনাদের পর্যুদস্ত করে। ৩ নম্বর সেক্টরের প্রাণকেন্দ্র ছিল কলাগাছিয়া, আখাউড়া, পরুলিয়া ও দরুইন ইত্যাদি জায়গা। এই সেক্টরের অধিনায়ক ছিলেন প্রথমে মেজর কে.এম শফিউল্লাহ ও পরে মেজর এএনএম নূরুজ্জামান। এই সেক্টরের অধীনে ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নরসিংদী, কিশোরগঞ্জ, গাজীপুরসহ টাঙ্গাইল ও মানিকগঞ্জের কিয়দংশ। ৪ নম্বর সেক্টরে অধিনায়ক ছিলেন মেজর সিআর দত্ত। মেজর মীর শওকত আলীর অধীনে ছিল ৫ নম্বর। মুক্তিবাহিনীতে ১ নম্বর এবং পরবর্তীকালে জেড ফোর্স' জিয়াউর রহমান ছাড়াও এ সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন ব্রিগেডিয়ার মহসিন উদ্দিন, যাকে জিয়া হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত করে পরবর্তীকালে ফাঁসি দেয়া হয়েছে। এছাড়াও ছিলেন কর্নেল শাফায়াত জামিল, কর্নেল আমিন আহমদ, অগণিত দুঃসাহসী যুবক, তরুণ, ছাত্র, শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার বা শ্রমজীবী মানুষের আত্মত্যাগ আর দেশপ্রেম আর দেশপ্রেমের কথা লিখে শেষ করা যাবে না। মেজর জিয়া, মেজর রফিক ও অসংখ্য বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি, মহালছড়ি হয়ে রামগড়ে এসে পৌঁছান। সেখান থেকে বিপদঙ্কুল পথ পেরিয়ে চলে আসেন সাব্রুম দিয়ে আগরতলায়।

এপ্রিলের ২ তারিখে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়ে নিজস্ব গাড়ি করে আগরতলায় প্রবেশ করেন আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল মালেক উকিল, মিজানুর রহমান চৌধুরী, চট্টগ্রামের জহুর আহমদ চৌধুরী, আব্দুল হান্নান, এম আর সিদ্দিকী, তাজউদ্দীন আহমদ,





সৈয়দ নজরুল ইসলাম, খন্দকার মোশতাক আহমদ, এএইচএম কামরুজ্জামান, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, আব্দুল মান্নান, অধ্যাপক ইউসুফ আলী প্রমুখ প্রথম কাতারের নেতা যার যার সুবিধাজনক গোপন পথে পশ্চিম বাংলায় প্রবেশ করেন। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের সাথে পর্যায়ক্রমে কথাবার্তা হয় নেতৃবৃন্দের। শচীন্দ্রলাল সিংহ, এমএনএ এডভোকেট সিরাজুল হক এবং এমএনএ এমআর সিদ্দিকীকে নিয়ে তিনি চলে গেলেন নয়াদিল্লি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে আলোচনার উদ্দেশ্যে। ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ড. ত্রিগুনা সেন এই পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ১ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক মেজর রফিকুল ইসলাম ঐতিহাসিক চট্টগ্রাম বিদ্রোহ থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধ করে গেছেন। তিনি রামগড় থেকে সাব্রুমে এসে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে প্রথম যোগাযোগ স্থাপন করেন। ১২ এপ্রিল আগরতলা সার্কিট হাউসে অত্যন্ত সংগোপনে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, খন্দকার মোশতাক আহমদ ও জহুর আহমদ চৌধুরীর নেতৃত্বে শীর্ষস্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের এক সভা বসে। এই সভাতেই গঠিত হয় স্বাধীন বাংলার বিপ্লবী সরকার। এই গোপন সভারই চারদিন পর অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল তারিখে কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সরকারের ঘোষণা দেয়া হয়। ভারতের মাটিতে না হয়ে বাংলাদেশের যে কোনো মুক্তাঞ্চলে ঘোষণাটি হওয়া ছিল বাঞ্ছনীয়। ১২ এপ্রিল আগরতলায় স্বাধীন বাংলার সরকার গঠনের কাজ সর্বসম্মতভাবে সমাধা করেও মেহেরপুরের মুক্তাঞ্চলে তা ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। আগরতলায় স্বাধীন বাংলা সরকার গঠনের খবরটি শুধু সারা ভারতের সংবাদপত্রের নয়, পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশেই প্রচারিত হয়। ত্রিপুরার দৈনিক সংবাদ-এ ১৩ এপ্রিলের ব্যানার হেডলাইনটি ছিল এ রকমের–'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের নেতৃত্বে রক্ত ও অগ্নিশুদ্ধ স্বাধীন বাংলা সরকার ঘোষিত' তাজউদ্দীন আহমদের প্রধানমন্ত্রীত্ব স্বাধীন বাংলার মন্ত্রিসভা। কুষ্টিয়ায় সদর দপ্তর স্থাপন : স্বাধীন বাংলার বেতারের ঘোষণা : বিশ্বে নজিরবিহীন ইতিহাস রচনা। শোণিত তর্পণে শুদ্ধ অগ্নিপুঞ্জ সরকার। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর স্বাধীন বাংলার রাষ্ট্রনায়ক। তাজউদ্দীন প্রধানমন্ত্রী। স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রের খসড়াও সম্পূর্ণ। ৮ থিয়েটার রোড, কলকাতা, এই ঠিকানায় অবশেষে স্থাপিত হয় মুজিবনগর সরকারের প্রধান দপ্তর।

আগরতলা ছিল এক অর্থে বাংলাদেশের ডেটলাইন। ভারতীয় সাংবাদিকদের ভিড় ছিল আগরতলায় সীমাহীন। অসংখ্য ভারতীয় সাংবাদিক মুক্তিযুদ্ধের রিপোর্ট করেছেন আগরতলায় এসে মৃত্যুবরণ করেন। এদের একজনের নাম সুরজিৎ ঘোষাল (আনন্দবাজার) ও অন্যজন দীপক ব্যানার্জি (অমৃত বাজার)। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে আগরতলা থেকে ঢাকা ও তার আশপাশের অঞ্চলগুলোর খবরাখবর সংগ্রহ যতো সহজ ছিল, অন্য কোনো ভারতীয় শহর থেকে ততোটা নয়। আগরতলা সে কারণেই মুক্তিযুদ্ধের ডেটলাইন হতে পেরেছিল। ঢাকাতে পাকিস্তানি বাহিনীর নিত্যদিনের গতিবিধি এবং কার্যকলাপ সেদিনই পেয়ে যেতেন আগরতলায় বসা সাংবাদিক বন্ধুরা। আব্দুল গাফফার চৌধুরী ও সন্তোষগুপ্ত অন্যতম। ১৯৭১-এর ৩১ মার্চ, ভারতীয় সংসদের উভয় সভায় সর্বসম্মতভাবে বাংলাদেশের ওপর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলিতে এই সংসদ গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। ভারতের মাটিতে, বিশেষ ত্রিপুরা সীমান্তে যখন পাকিস্তানিদের

অব্যাহত আক্রমণ চলছে, তখন ভারতীয় লোকসভায় ৩০ জুলাই ইন্দিরা সরকার বলেন, 'ভারত সীমান্তের যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত।' সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-নভেম্বর–এই তিনটি মাস বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা যেমনি বৃদ্ধি পায়, তেমনি ত্রিপুরাসহ বিভিন্ন সীমান্ত অঞ্চলে পাকিস্তানিদের তৎপরতাও জোরদার হয়। সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় যেদিন আগরতলা এলেন, অর্থাৎ ২০ অক্টোবর সেদিন, সংলগ্ন শহর অব্যাহত পাকিস্তানি হামলার ফলে বিরান হয়ে গেছে। বিলোনিয়ায় ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্তটি এমনভাবে জড়িত যে, এখানে বোঝাতে কষ্ট হয়, আসলে কোনটা বাংলাদেশের আর কোনটা ত্রিপুরার। ২৪ অক্টোবর সন্ধ্যা পৌনে আটটা নাগাদ পাকিস্তান বাহিনী আচমকা রাজধানী আগরতলার ওপর হালকা কামান থেকে পরপর ছ'টি গোলা নিক্ষেপ কর। ত্রিপুরার সীমান্ত এলাকায় তখন চলছে নিস্প্রদীপ মহড়া। যে কোনো মুহূর্তে শত্রুপক্ষের বিমান হামলা হতে পারে–এই রকম আশঙ্কায় থরোথরো। ৩ ডিসেম্বর সারা দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয় এবং সেদিন থেকেই শুরু হয় যৌথ ভারত-বাংলাদেশ বাহিনীর অভিযান। পূর্বাঞ্চলের সাথে সাথে পশ্চিম রণাঙ্গনেও যুদ্ধের দামামা বেজে উঠে। যুদ্ধের প্রথম ধাক্কাতেই অর্থাৎ ৩ ডিসেম্বরেই আগরতলার ওপর তিনবার বিমান হামলায় চালায় পাকবাহিনী।

স্যাবর জেটগুলো আগরতলা বিমানবন্দর এলাকায় রকেট বোমা নিক্ষেপ করে। অন্যদিকে অমৃতসর, শ্রীনগর ও পাঠানকোট যৌথ বাহিনীর কাছে [লে. জে. জগজিৎ সিং আরোরার নেতৃত্ব] পাকিস্তানি বাহিনী পূর্বাঞ্চলে যে আঘাতের সম্মুখীন হতে থাকে, সেটা সইবার সামর্থ্য তাদের ছিল না। ৪ ডিসেম্বরই আগরতলা সীমান্ত জোড়া হানাদার বাহিনীর শক্ত ঘাঁটিগুলো যৌথ বাহিনীর আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। ফলে পাকিস্তানি স্থলবাহিনীর আক্রমণ থেকে আগরতলা বিপদমুক্ত হয়। অন্যদিকে একদিন পর পাকবাহিনীর একটি দুর্গের পতন ঘটিয়ে মুক্তিবাহিনী এগিয়ে চলে বঙ্গোপসাগর, আখাউড়া, উজানিসার, লাডুমুড়া, ফকিরামুড়া, আজমগড় অভিমুখে। ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে চারদিকে থেকে ঘিরে ফেলে মুক্তি ও মিত্রবাহিনী। ৬ ডিসেম্বর ভারত সরকার বাংলাদেশের স্বতন্ত্র সত্তার প্রতি রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি জানায়। লোকসভার স্বল্পকালীন এক অধিবেশনে প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরা মুহুর্মুহু করতালির ভেতরে ঘোষণা করেন আসমুদ্র ভারতের কোটি প্রাণের সেই আকাঙ্ক্ষিত বার্তা : "বাংলাদেশ আজ এক স্বতন্ত্র নতুন রাষ্ট্র। পূর্ব বাংলার বাঙালি জাতি এক নতুন রাষ্ট্র। পূর্ব বাংলার বাঙালি জাতি আজ এক নতুন রাষ্ট্রের নাগরিক।" অন্যদিকে চীন-যুক্তরাষ্ট্রের ভারত ও বাংলার মুক্তিসংগ্রাম-বিরোধী উদ্যোগের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তৃতীয়বারের মতো 'ভেটো দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনলো। ওই সময় জাতিসংঘে ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন শ্রী সমর সেন। ভারতের স্বীকৃতি, সাফল্য পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের শরণার্থী শিবিরগুলোতে আনন্দে আত্মাহারা ছাত্র, শ্রমিক, কর্মজীবী, রাজনীতিবিদ। বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের সংসদের পবিত্র চত্বর হতে স্বীকৃত হলো কনিষ্ঠতম রাষ্ট্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। ইতিহাসের একটি পবিত্র লগ্নে ভারতের পঞ্চান্ন কোটি জনতার প্রতিভূ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে লাঞ্ছিত অপমানিত ও হৃতসর্বস্ব সাড়ে সাত কোটি মানুষকে পৌঁছে দিলেন মানব সভ্যতার বাঞ্ছিত লোকে।" ষড়যন্ত্রের সমস্ত জাল ছিন্ন করে আর শত সহস্র সন্দেহের আবরণ ভেদ





করে সবুজ ঘাসের দেশের লাল সূর্যের স্বীকৃতি ঘোষিত হলো রৌদ্রকরোজ্জ্বল দ্বিপ্রহরের এক পূতপবিত্র লগ্নে। ৭ মার্চের বিকেলে রমনার বিশাল উদ্যানে লাখো জনতার উত্তর তরঙ্গধ্বনি যে প্রত্যয় ঘোষণা করেছিল, যে শপথ নিয়েছিল বাঙালি জনতা শেখ মুজিবের নেতৃত্ব, তার পরিণতি আজ আট মাসের রক্তক্ষরা উষ্ণ অসমৃণ পথ বেয়ে পৌঁছুল তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে। ডিসেম্বরের ১/২ তারিখ থেকেই পরিস্থিতি দ্রুত বদলাতে শুরু করে। আগরতলার ওপর পাকিস্তানি জঙ্গি বিমানবহর তখনো ক্রমাগত আঘাত হেনে চলেছে। অন্যদিকে আখাউড়া রণাঙ্গনে মুক্তিবাহিনীর হাতে অবরুদ্ধ হয় হানাদার বাহিনী। হাসপাতালগুলোর মেঝে ভেসে যায় বিমান হামলায় হতাহতদের রক্তে। কিন্তু তাদের নাগরিক জীবন নিদারুণভাবে বিপর্যস্ত হলেও বিন্দুমাত্র মনোবল হারায়নি আগরতলার মানুষ, তথা ত্রিপুরাবাসী।

১৫ ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মানেকশ'র একটি বিবৃতি সারাদিন ধরে ভারতীয় বেতার থেকে প্রচার হতে থাকে। বিবৃতিটি ছিল এ রকমের : "১৬ ডিসেম্বর সকাল ৯টার মধ্যে পাকিস্তান বাহিনী যদি নিঃশর্তে নিকটস্থ ভারতীয় বাহিনী বা যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ ও পূর্ণ অস্ত্র সংবরণ না করে তাহলে তাদের আর কোনো সময় দেওয়া হবে না। যৌথ বাহিনী চারদিক থেকে পাকিস্তানিদের ঘিরে ফেলেছে। গভর্নর মালেক পদত্যাগ করে ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের রেডক্রসের আশ্রয়ে চলে যান। ১৬ ডিসেম্বর দুপুর আড়াইটায় (ভারতীয় সময়) বাংলাদেশে হানাদার বাহিনীর অধিনায়ক লে. জে. নিয়াজি মার্কিন দূতাবাসের মাধ্যমে যুদ্ধ বিরতির আবেদন জানালে জেনারেল মানেকশ ঢাকার ওপর ভারতীয় বিমান হামলা বন্ধের নির্দেশ দেন। পাকবাহিনী বুঝতে পারে তাদের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ছাড়া পথ নেই। যদিও সর্বাধুনিক আণবিক অস্ত্র নিয়ে মার্কিন ৭ম নৌবহর তখন বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করেছে প্রায় মৃত পাকবাহিনীকে সহায়তা করতে; কিন্তু ভারত মহাসাগরের দিকে দ্রুত ধাবমান হয় তখন রুশ 'বাল্টিক' নৌ-বহরের দুটি ক্ষেপণাস্ত্রবাহী জাহাজ। ওয়াশিংটনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত কে. এল. ঝা এক সাংবাদিক সম্মেলনে সেই মুহূর্তে মন্তব্য করেন, "বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থানরত আমেরিকান ও বিদেশি নাগরিকদের উদ্ধারের নামে যে কোনো বহিঃরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ভারত অমিত্রসুলভ আচরণ বলে বিবেচনা করবে এবং এই বদমতলব রবদাশত করা হবে না।"

পাকিস্তানি সেনাপতি লে. জে. নিয়াজিকে বলা হয়েছে নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করতে। তার কাছে খবর পৌঁছানোর জন্য বিশেষ বেতার কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং দেওয়া হয়েছে কোড নম্বরও। পাকিস্তানি সৈন্যরা যেভাবে পারছে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জীবন বাঁচিয়ে ঢাকার দিকে পালিয়ে আসছে। অবশেষে মুক্ত হলো রাজধানী ঢাকা। বাঙালির আজন্ম লালিত স্বাধীনতার পবিত্র মুখ হলো উদ্ভাসিত। বর্বর হানাদার বাহিনী হলো নতজানু। বাংলার শ্যামল প্রান্তর জুড়ে উড়তে থাকে বিজয় পতাকা। আবার সেই ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দান। ৭ মার্চ যে ময়দান থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে ৪টায় দীর্ষ ২৮২টি কালো রাতের অবসান ঘটিয়ে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বাহিনীর প্রধান লে. জে. জগজিৎ সিংহ অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করে পরাজিত বাহিনীর সেনাপতি লে. জে. নিয়াজি। ফৌজি রীতি অনুযায়ী বিজয়ী সেনাপতি বন্দি সেনানায়ক নিয়াজির সামরিক পোশাক থেকে

খুলে নেন জেনারেলের ব্যাজ। সেই সাথে যুদ্ধবন্দি হয় ৯২ হাজার হানাদার পাকিস্তানি সৈন্য। ১৯৭১ সালে ভারতের জনগণ এবং সরকারের মধ্যকার সাহায্য-সহযোগিতা পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসের এক প্রধান ও অত্যুজ্জ্বল অধ্যায়। ত্রিপারার সেই সময় লোকসংখ্যা ছিল ১৬ লাখ। ৪১১৬ বর্গমাইল এলাকার ভেতরে ওই পরিমাণ জনসংখ্যার পাশাপাশি বাংলাদেশের বাড়তি ১৫ লাখ শরণার্থী মানুষ। শুধু তাই নয়, তার তিনভাগ এলাকাই পরিণত হয়েছিল রণক্ষেত্রে। ১৯৭১ এর পুরো ন'মাস ত্রিপুরা হয়ে উঠেছিল মহামানবের মিলন বা তীর্থক্ষেত্রে। বিপদের দিনের সেই বন্ধুত্ব আজ ইতিহাস।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেদিন ইসলামাবাদের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বদেশের মাটিতে পা দেবার আগে দিল্লিতে নেমেছিলেন, সেদিন সাংবাদিকদের কাছে তিনি অকপটে বলেছিলেন, I am indebted to Tripura and it's chief Minister Mr. Singh."



যুদ্ধোত্তর পরবর্তী ভারত সফরে বঙ্গবন্ধু

ত্রিপুরাবাসীর বুক ভরে উঠেছিল গর্বে। এ রকম নির্ভীক আত্মপ্রত্যয়শীল উচ্চারণ করেছিলেন যিনি, সেই মহৎপ্রাণ মানুষটি শেষ পর্যন্ত নিহত হন মর্মান্তিকভাবে প্রায় গোটা পরিবারসহই। আগরতলার মাটি যাঁদের পদস্পর্শে একদিন ধন্য হয়েছিল, আরো ৪





শীর্ষস্থানীয় নেতা তাজউদ্দীন আহমদ, এম. মনসুর আলী, কামরুজ্জামান এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম। এসব স্মৃতি টগবগে স্মৃতি বুকে নিয়ে আমি আজো বেঁচে আছি। এখনো চোখে ভাসে বাংলাদেশের তরুণ মুক্তিসংগ্রামীদের স্বাধীনতা যুদ্ধে যাবার ছবি। আগরতলার রামনগর স্কুল, বড়দোয়ানী স্কুল, প্রগতি স্কুল ও আসাম রাইফেলসের মাঠে সন্ধ্যার পর ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর ভারি কামান ও মর্টারের ছবি। আখাউড়ায় শক্তিশালী বাঙ্কার করে পাকিস্তানি বাহিনী সন্ধ্যার পর থেকেই গোলা ছুড়তে শুরু করত। ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনী পাল্টা গোলা ছুড়ে জবাব দিত। আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠত। ৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১। পাকিস্তান বেতার-টেলিভিশনে পাক সামরিক জান্তা প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কণ্ঠস্বর–ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। কী উত্তেজনা! বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম শুরু। তখন জলে-স্থলে-শূন্যে সর্বত্র সব ফ্রন্টে লড়াই। প্রচণ্ড লড়াই ত্রিপুরা, আখাউড়া, সিলেট , কুমিল্লা, রামগড় ও ফেনী সেক্টর। লড়াই চলছে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয় সীমান্তে, পশ্চিমে লাহোর রণাঙ্গনে। বাংলাদেশের অসম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় সেনাদের যৌথ অভিযানে জেনারেল টিক্কা খান ও জেনারেল নিয়াজীর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পর্যুদস্ত। চট্টগ্রাম বন্দর অভিমুখে বিশাল সপ্তম নৌবহরকে পাঠালো মার্কিন সরকার। পাল্টা হুমকি দিলো সোভিয়েত ইউনিয়ন। ১৪-১৫ ডিসেম্বর রাতে পাকবাহিনী জঘন্যতম গণহত্যাভিযান চালিয়েছে ঢাকা মহানগরীতে। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী শহীদুল্লাহ কায়সারসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক প্রখ্যাত অধ্যাপককে পাক সামরিক গোয়েন্দা বাহিনী তুলে নিয়ে গণহত্যা করেছে। বুকভরা বেদনা নিয়েই বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতার চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করলেন। ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও বাংলাদেশ মুক্তিফৌজের অধিনায়কদের কাছে পাকিস্তানি সেনানায়করা আত্মসমর্পণ করল। আনন্দের জোয়ারে বাংলাদেশ-ভারতের জনগণ ভাসছে আমরা আগরতলায় বিজয় মিছিলে পা ফেলছি।

# পঞ্চম অধ্যায়

# দুর্দশা ও দুর্যোগ

## বৈষম্য

১৯৭০-এর শরতে বঙ্গোপসাগরের জলোচ্ছ্বাসে ভোলা-হাতিয়া-সন্দ্বীপসহ পূর্ব বাংলায় যে বিপর্যয় ঘটে তার চেয়েও মৃত্যু ও দুর্গতির ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে ১৯৭১-এ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, মানুষ যে মানুষের প্রতি কী রকম অমানসিক অত্যাচার চালাতে পারে তারই নিকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ও সমরনায়করা পাঞ্জাব নিয়ন্ত্রিত সামরিক বাহিনীকে লেলিয়ে দেয় নিরস্ত্র ৭৫ মিলিয়ন বাঙালির ওপর। বাঙালির চাহিদা মেটানোর প্রতি মনোযোগ না দিয়ে, তাদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে পূর্ব বাংলাকে শক্তির বলে দাবিয়ে রাখার প্রচেষ্টা চলে। ইয়াহিয়া সরকার পরিচালিত সামরিক-বর্বরতা সর্বকালের বিশ্ব-দৃষ্টান্তকে ম্লান করে দেয়। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, পূর্ব-বাংলার সর্বস্তরের মানুষের জীবনে ভীতিসঞ্চার করে, পাকিস্তান নামের রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, ইয়াহিয়ার এই আক্রমণ খুবই দুর্বল ও আত্মঘাতী। বিরামহীন-বিরতিহীন সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড ও আঘাত চালিয়ে মানুষের মন জয় করা যায় না, অসম্ভবই বটে।

জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পথে বাধা সৃষ্টি করতেই পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ও সমরনায়করা সুনির্দিষ্ট কলাকৌশলে সামরিক ও রাজনৈতিকভাবে আক্রমণ চালায়। তারা বুঝতে পারে বাঙালি জাতীয় ও সামাজিক মুক্তির ভালো যোদ্ধা; অন্যদের চেয়ে অধিক প্রগতিশীল, স্বদেশী ও বিপ্লবী। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ও সমরনায়করা ভুলে বসে যে, অন্ধ আবেগ দ্বারা চালিত না হয়ে সাধারণ মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করাই রাষ্ট্রের লক্ষ্য। 'জোর যার মুল্লুক তার'-এর নীতিতে রাষ্ট্র চলে না, এ হচ্ছে প্রাক-সামাজিক স্বার্থপর ও উচ্ছৃঙ্খল মানুষের নীতি। তারা ভুলে যায় যে, সমস্ত রাষ্ট্রকে সদ্ভাবে ও সৎপথে পরিচালনা করতে হলে যে শক্তির প্রয়োজন, তা কতটা শাসকের অধীনে, কতটা জনসাধারণের হাতে থাকা উচিত তা বিচার ও নির্ণয় করতে হয় দক্ষতার সঙ্গে। তারা ভুলে যায় যে, জনসাধারণই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের উৎস এবং গণতন্ত্রই রাষ্ট্র পরিচালনার সুষ্ঠু বাহন; আর নির্বাচন দ্বারা দক্ষ ও উপযুক্ত রাষ্ট্রপরিচালক শাসন কার্যে নিয়োগ করাই গণতন্ত্রের কাজ। জনগণের মঙ্গল প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে, রাষ্ট্রের আর কোনো অতিরিক্ত ভূমিকা থাকার কথা নয়। তারা ভুলে যায় যে, জনসাধারণের উন্নতি ও অগ্রগতির ব্যাপারে সহায়তা করাই রাষ্ট্রীয় সংবিধানের লক্ষ্য। নৈতিকতাই রাষ্ট্রনীতির ভিত্তি। নৈতিক বিধানকে অগ্রাহ্য বা অবমাননা করা হলে রাষ্ট্র নিষ্ফল হওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই। সামরিক বাহিনীর কাজই হচ্ছে দেশের প্রতিরক্ষার কাজে যন্তবান হওয়া, রাষ্ট্র পরিচালনার





দায়িত্ব তাদের নয়। তাই বাঙালির কাছে প্রতীয়মান হয় যে, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ও সমরনায়করা স্বৈরাচারী, অন্যায়, নিচ ও ভয়াবহ বলে। অন্যদিকে শাসক-সমরগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যই যেন বাঙালির উন্নতি ও মঙ্গলের পথ সঙ্কুচিত করে তাদের ওপর প্রভুত্ব খাটানো; ফলে ঘৃণা, ক্রোধ ও শঠতায় রাষ্ট্রশক্তির অপচয় ঘটতে থাকে এবং রাষ্ট্রকাঠামো খণ্ডিত, অসংবদ্ধ ও এলোমেলো হতে থাকে।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্টের মধ্যরাতে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান ঘটে রক্তপাত, পারস্পরিক ঘৃণা ও ধর্মীয় ছলনাময়ী তথাকথিত 'দ্বিজাতিতত্ত্ব'-এর ভিত্তিতে; সৃষ্টি হয় 'পাকিস্তান' ও 'ভারত' নামের দুটো রাষ্ট্র। ভারতবর্ষের বিভাজনের কোলাহলের মধ্য দিয়ে জন্ম নেওয়া, অযোগ্য রাজনীতিবিদ ও অপরিণামদর্শী সমরনায়কদের নেতৃত্বে খুঁড়িয়ে চলা, জিন্নাহের সৃষ্টি, অস্বাভাবিক ও মৃতপ্রায় রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান বিশ্ববাসীর কাছে আত্মপ্রকাশ করে।

ভারতবর্ষের বিভাজনে বাংলা ভূখণ্ডটি বিভক্ত হয়ে পড়ে পূর্ব ও পশ্চিম অংশে। পূর্ব বাংলায় থেকে যায় ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ, রাজশাহী বিভাগের রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী ও পাবনা জেলা, প্রেসিডেন্সি বিভাগের খুলনা জেলা, চারটি থানা ছাড়া সিলেট; আর নদীয়া, যশোর, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও মালদা অঞ্চলকে অঙ্গচ্ছেদ করা হয়। বাঙালি অনেক সম্ভব-অসম্ভবের বুক-বাঁধা আশা নিয়ে, জিন্নাহর উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলিম উৎপীরণের মিথ্যা অভিযোগ মেনে নিয়ে অস্বাভাবিক ও 'ধর্মভিত্তিক' পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হয়। ৪ কোটি ২০ লক্ষ বাঙালি ছাপান্ন হাজার বর্গমাইল এলাকা পেলেও হারায় তার জন্মভূমির বিশাল অঞ্চল-হিমালয় থেকে বঙ্গোপসাগরের আধিপত্যতা এবং বিচিত্র মাটি ঘেঁষা সংস্কৃতি ও গঙ্গা-পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র-বরাকের ঐতিহ্য। এমনকি পাকিস্তান নামটিও পূর্ব বাংলাকে বাদ দিয়ে সৃষ্টি করা হয়। 'প' অর্থ পাঞ্জাব, 'আ' অর্থ আফগান, 'ক' অর্থ কাশ্মির এবং 'স' অর্থ সিন্ধু, 'স্তান' অর্থ বেলুচিস্তান। যে পূর্ব বাংলাকে লর্ড কার্জনের বিখ্যাত বঙ্গভঙ্গের সময়ে আন্দোলন করে একত্রিত করা হয় তাকেই দেশ বিভাগের সময় ভারত থেকে বের করে দেওয়া হয়। অগণিত মানুষের আবাসভূমিও বদলে যায়। মানুষ হয় এক কোটি গৃহহারা, পঞ্চাশ লক্ষ নিহিত, বাইশ হাজার ধর্ষিত, দুই লাখ কুড়ি হাজার নিখোঁজ। একটি রাষ্ট্র ও একটি পতাকার প্রতি সার্বভৌমত্বের আনুগত্য প্রকাশে পূর্ব-বাংলার মানুষ প্রথম থেকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। স্বপ্ন দেখতে থাকে একটি স্বনির্ভর রাষ্ট্রের-যেখানে কৃষি ও কুটির শিল্পের পুনর্বিকাশ ঘটবে, সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রচালিত দেশটি শিল্পায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে, স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারবে যোগ্য মানুষ হিসেবে। কিন্তু সৃষ্টিলগ্ন থেকেই অস্বাভাবিক ও 'ধর্মভিত্তিক' পাকিস্তানের–পশ্চিম ও পূর্ব দুটো ভূখণ্ডের সমন্বয়ে ১,২০০ মাইল ভারত ভূখণ্ড দ্বারা ভৌগোলিকভাবে বিভক্ত ও ইসলামি ঐক্যে সংযুক্ত রাষ্ট্রের–পূর্ব ও পশ্চিম অংশের স্পর্শকাতর সম্পর্কে উন্নতির চেয়ে অবনতিই বেশি ঘটে।

পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে বাংলার ভূপ্রকৃতিগত অমিলও অনেক। বাংলার ভূপ্রকৃতিতে নদীর গুরুত্ব সুস্পষ্ট, এমনকি বাঙালির মনমেজাজ, চিন্তাচেতনার আকৃতি-প্রকৃতি নির্ণয় করে বাংলার নদীগুলো। বাঙালি নদী ছাড়া যেমন বাঁচার চিন্তা করতে পারে না তেমনি পশ্চিমাঞ্চলের জনগণ নদী ছাড়াই জীবন চালায়। গঙ্গা-পদ্মা-ভাগীরথী, মেঘনা-যমুনা-

মহানন্দা, সুরমা-বরাক-কুশিয়ারা, ব্রহ্মপুত্র-ধলেশ্বরী-শীতলক্ষ্যা, অজয়-দামোদর-কাঁসাই, সরস্বতী-দ্বারকেশ-রূপনারায়ণ, তিস্তা-তিতাস-খোয়াই, করতোয়া-পূর্ণভরা-কর্ণফুলী, মনু-গড়াই-মধুমতী ইত্যাদি নদীর স্রোতধারাই বাঙালিকে দিয়েছে নিজস্ব ভৌগোলিক সত্তা, নিজস্ব ঐতিহাসিক সত্তা, যা অবাঙালি জনগোষ্ঠী কোনোদিনই বুঝতে পারে না, বোঝা তাদের জন্য সম্ভবও নয়।

বাঙালিরা নিখিল পাকিস্তানের ১২ কোটি জনগোষ্ঠীর অর্ধেকের চেয়েও বেশি, কিন্তু তারা বাস করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ছয়-ভাগের এক-ভাগে। পূর্ব বাংলা সমৃদ্ধ কিন্তু অরক্ষিত ভূমি। ১৯৭০-এর বন্যাই এর জ্বলন্ত উদাহরণ। ১২ নভেম্বর ১৯৭০-এর ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে চর কুকরি-মুকরি, চর পাতিলা, চর কলমি, চর মানকা, চর শশীভূষণ, চর আইচা, চর নীলকমল, চর মায়া, চর মঙ্গল, চর ভাসান, চর স্টিফেন্স, চটর জাহাজমারা, চর কাজল, চর ফ্যাশন, চর মাদ্রাজ, চর লর্ডহার্ডিঞ্জ, চর তজুমুদ্দীন, চর চাচরা, চর চৌকিঘাট, চর দৌলতখান, চর চান্দনপুর, মলনাচর, চর সোনাপুর, চর বদরপুর, বলী গৌড়নগর, চর জামালপুর, চর ভুতা, চর কচ্ছপিয়া, চর মনপুরা, চর পটুয়া, চর লালমোহন, চর জাঙ্গালিয়া, চর জিন্নাহগড়, চর নাজিরপুর, চর উমেদ, চর হাজারিগঞ্জ, চর ওসমানগঞ্জ, চর বিজয়পুর, চর পেয়ারপুর, চর আমিনাবাদ, চর ফকির প্রভৃতি এলাকায় ১০ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটে। ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ব্রিটেন, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ সাহায্যের হাত প্রসারিত করলেও পাকিস্তান সরকার দুর্গতদের সাহায্য ও উদ্ধারের কাজে ক্ষমাহীন ঔদাসীন্যের পরিচয় দেয়। ভাসানীই প্রথম বিশ্ববাসীর কাছে ত্রাণের জন্য আবেদন জানান; আর বঙ্গবন্ধু নির্বাচনী প্রচারণা বাতিল করে দুর্গত এলাকায় এসে উপস্থিত হন এবং আর্ত-মানবতার প্রতি পাকিস্তানি শাসকদের ঔদাসীন্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।

এই দ্বিধাবিভক্ত, অস্বাভাবিক ও ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের দুই অঞ্চলের মধ্যে ঐতিহ্য-সভ্যতা-সংস্কৃতি-কৃষ্টি-ভাষাতেও হাজার মাইলের দূরত্ব ও ব্যবধান।

পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে বাংলার ঐতিহ্য-সভ্যতার অমিলের কারণ- বাঙালির ঐতিহ্য-সভ্যতার অংশ হচ্ছে পান্ডুরাজার ঢিবি, তমলুক, চন্দ্রকেতুগড়, জগজ্জীবনপুর, রাজবাড়ি-ডাঙ্গা, বানগড়, গঙ্গারিটি, পুন্ড্রবর্ধন, মহাস্থান, পাহাড়পুর, নোয়াপাড়া-ঈশানচন্দ্রনগর, ময়নামতী, লালমাই, মঙ্গলকোট, বরকান্তা প্রভৃতি। অঙ্গ-বঙ্গ-মগধ-কালিঙ্গ-সুক্ষ্ম-রাঢ়-পৌন্ড্র-সমতট-হরিকেলের জনগোষ্ঠী দ্বারা বৃহৎ বাংলাঞ্চলে বা পূর্ব-ভারতবর্ষে একটি সুসংহত ও ঋদ্ধ রাষ্ট্র সমাজ ব্যবস্থা, ঐতিহ্য-সভ্যতা গড়ে ওঠে। বলি, নন্দ, মৌর্য, গুপ্ত, পাল, সেন বাঙালিরই গৌরব, তাদের ধমনীতে প্রবাহিত হয় বাঙালির আদি রক্তই। বাঙালির প্রথম নির্বাচিত রাজা 'গোপাল' দেবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলার বা প্রাচ্যের মাটিতে প্রথম গণতান্ত্রিক চিন্তার বীজ। বঙ্গ-গৌড়ের প্রথম স্বাধীন সম্রাট শশাঙ্ক, তিনিই স্বাধীন বাঙালির শক্তির পরিচয়। হাজার হাজার বছর ধরে বাঙালির দেহমনে প্রবাহিত হতে থাকে যাত্রা, কবিগান, লোকগাথা, লোকগীতি, পল্লীগীতি, সাঁওতালি-মনিপুরী নৃত্য, হস্তশিল্প, মৃৎশিল্প, মসলিনশিল্প, শঙ্খশিল্প, বেতশিল্প, পাটশিল্প, রেশমশিল্প, বস্ত্রশিল্প,





দারুশিল্প, নৌকাদৌড়-নবান্ন-বৈশাখি-পৌষসংক্রান্তির উৎসব প্রভৃতি। এসব পশ্চিমাঞ্চলের ঐতিহ্য-সভ্যতার বহির্ভূত অংশ।

অস্বাভাবিক ও ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্রটি সংস্কৃতি-কৃষ্টির দিক থেকে দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার কারণ-পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীদের পাঞ্জাব-সিন্ধু-বেলুচিস্তান-সীমান্ত প্রদেশের জাতিসত্তা, গোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্য, জীবনপ্রণালি, ধ্যানধারণা, আচারাচরণ, ভাষা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য স্বাধীন থাকা সত্ত্বেও চৌদ্দ আনাই এক, অন্যদিকে পূর্ব-বাংলার সঙ্গে পনেরো-আনাই ভিন্ন, এক-আনা শুধু ধর্মীয় বিশ্বাসের সূত্রে বাঁধা। পশ্চিমাঞ্চলের সাহিত্য বাঙালি-হৃদয়ে কখনই ছাপ ফেলতে পারেনি, কারণ বাঙালির নিজস্ব সাহিত্য-ধারা হাজার হাজার বছর পুরনো, যা একান্তভাবেই বাঙালির। গবেষণার সন্ধানে পাওয়া যাবে যে, বাংলা-সাহিত্যের পথযাত্রা সেই পান্ডুরাজার ঢিবির সময় থেকেই শুরু। এছাড়া চর্যাপদ তো আছেই। কবি জয়দেব সুললিত সংস্কৃত ভাষায় কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করে 'গীতগোবিন্দ' রচনা করলেও তা শ্রুতি ও শব্দ ব্যবহারে বাংলারই ইঙ্গিত বহন করে; এছাড়াও বাংলা সাহিত্যের গভীরতা উপলব্ধির জন্য তো আছে বৈষ্ণব-বাউল-বৌদ্ধ-শৈব-শান্ত-সুফী সাহিত্য। মীননাথ, কানপা, তিলপা, শীলভদ্র, দীপঙ্কর, জীমূতবাহন, রঘুনাথ, রঘুনন্দন, রামনাথ, চৈতন্যদেব, সৈয়দ সুলতান, আলাউল, চন্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, কৃত্তিবাস, কাশীদাস, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনা, নজরুল প্রমুখের নির্মিত বাংলা সংস্কৃতি ও সাহিত্য হয়ে ওঠে বাঙালির গৌরব-মিনার। দুই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে, বাংলার শক্তিশালী সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও সাহিত্যের জন্যেই, নিখিল পাকিস্তানের সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ভাষা ও সাহিত্যে একাত্মবোধ কোনোদিন হওয়া সম্ভব নয়; পাকিস্তানের আপন বিশেষত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে, জনগণকে একসূত্রে বাঁধার জন্যে যে জাতীয় গাঁথা ও প্রতীকের একান্ত প্রয়োজন তা দুই অঞ্চলে মিলিতভাবে ছিল না, তা থাকা অসম্ভবই বটে।

বাঙালির জীবন অসহনীয় করে তুলে পাকিস্তানের, বিশেষ করে পশ্চিমাংশের, শাসক ও সমরনায়ক দ্বারা পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের কতগুলো নীতিরীতি, বিশেষ করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ পদ্ধতি।

পাকিস্তানের প্রভূত্বে পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছাকৃত এবং ষড়যন্ত্রমূলক রাজনৈতিক কার্যক্রমগুলো হচ্ছে–উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্র, বাংলার সংস্কৃতিকে গলা টিপে মারার দুরভিসন্ধি, শিল্পোন্নয়নে পূর্ব বাংলার প্রতি বিমাতাসুলভ মনোভাব, কেন্দ্রীয় চাকুরির ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের উপেক্ষা করা প্রভৃতি। বাঙালির অসন্তোষ যাতে বাঁধ-ভাঙা জলের মতো বেরিয়ে আসতে না পারে সেজন্য পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী শাসনযন্ত্রের ঢাকনাটি শক্তি করে স্ক্রুবদ্ধ করে দেয়, এ রকম অবস্থা চলতে থাকে বছরের পর বছর; তাই তারা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ধারণা পরিত্যাগ করে ঝুঁকে পড়ে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনের দিকে, ফলে বাঙালির জীবন সর্বক্ষেত্রে উপেক্ষিত, বঞ্চিত ও শোষিত হতে বাধ্য করে; তবে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থবাদী প্রবণতা পূর্ব বাংলার জনগণের চোখ খুলে দিতে সাহায্য করে, তারা বুঝতে পারে, পাকিস্তানের সংহতি ও ধর্মীয় বন্ধন শুধুই গালভরা বুলি ছাড়া অন্যকিছুই নয়, তাই তো শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসকের বিরুদ্ধে বিরূপ হয়ে ওঠে বাংলার মানুষ।

পূর্ব বাংলার বাঙালির পক্ষে সোহরাওয়ার্দী পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আশা করাই ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু বাস্তবে লিয়াকত আলী খানের যোগসাজশে তিনি প্রধানমন্ত্রী হতে পারেননি, হন নাজিমুদ্দীন। সীমিত সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ১৯৫৪-এর পূর্ব বাংলার নির্বাচনে জয়ী যুক্তফ্রন্টও পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ও সমরনায়কদের যোগসাজশে নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। প্রসঙ্গত, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের জন্ম বাংলায় হলেও বাঙালির উদারতায় দুটোই হাতছাড়া হয়ে যায়, এবং এগুলোর নেতৃত্ব পায় অবাঙালিরাই। এই দুটো দলের বিরোধিতার কারণে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শরৎচন্দ্র বসুর যুক্ত, স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' সৃষ্টির পরিকল্পনা বাস্তবরূপ নিতে পারেনি; এর সঙ্গে যুক্ত হয় ফজলুল হকের 'সুবিধাবাদী নীতি', যা বাঙালি রাজনৈতিক নেতাকর্মীকে 'আদর্শভ্রষ্ট' করে। পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে বাঙালির সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ পায় ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত প্রাদেশিক সাধারণ নির্বাচনে। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচন ছিল ভিন্ন ধরনের, নির্বাচনের পদ্ধতি ছিল সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। ৩১০ সদস্যবিশিষ্ট পরিষদে ২৩৭টি মুসলিম আসনে যুক্তফ্রন্ট মুসলিম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ৪ ডিসেম্বর ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয় আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম পার্টি, গণতন্ত্রী দল এবং খেলাফতে রব্বানী পার্টির সমন্বয়ে। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচিত নেতারা ছিলেন মওলানা ভাসানী, ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দী। ২১ দফার মাধ্যমে যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে অংশ নেয়, ২১ দফার প্রতিশ্রুতির মধ্যে ছিল- বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা, বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করে ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বণ্টন করা, খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করে দেশকে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের কবল থেকে রক্ষা করা, অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাপ্রবর্তন ও শিক্ষকের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার প্রবর্তন করা, 'ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়'-এ আইনসহ সকল কালাকানুন বিলোপ করা, প্রশাসনিক ব্যয় সর্বাধিকভাবে কমানো, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন 'বর্ধমান হাউস'কে প্রথমে একটি ছাত্রাবাসে এবং পরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষনা প্রতিষ্ঠান রূপে গঠন করা, ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'শহীদ দিবস' ও সাধারণ ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করা, ২১ ফেব্রুয়ারিতে যারা শহীদ হন তাদের স্মৃতি রক্ষার্থে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ ও তাদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দান করা, সকল নিরাপত্তা ও নিরোধমূলক আইন বাতিল করা ও বিনা বিচারে আটক বন্দিকে মুক্তি দেওয়া এবং সর্বোপরি লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন আদায় করা এবং প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক ও মুদ্রাব্যবস্থা কেন্দ্রের আইনে রেখে অন্যান্য সকল বিষয় ইউনিট সরকারের অধীনে আনা এবং সেনাবাহিনীর সদর দফতর পশ্চিম পাকিস্তানে ও নৌবাহিনীর সদর দফতর পূর্ব বাংলায় স্থাপনের ব্যবস্থা করা, আনসার বাহিনীকে একটি পূর্ণাঙ্গ মিলিশিয়াতে রূপান্তরিত করা এবং পূর্ব বাংলায় অস্ত্র নির্মাণ করার কারখানা প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি। ২১ দফা বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কারণ এই ইশতেহার জনগণের দাবিদাওয়া ও আবেগানুভূতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে সৃষ্টি করা হয়। অন্যদিকে মুসলিম লীগ কোনোরকম নির্বাচনী ওয়াদা ছাড়াই নির্বাচনে নামে, তারা ৩১০টি আসনের মধ্যে মাত্র ৯টিতে মুসলিম লীগ, ২২৩টিতে যুক্তফ্রন্ট, ৫টিতে অন্যান্য দল আর ৭৩টি





ঐক্যফ্রন্ট জয়লাভ করে। ঐক্যফ্রন্ট গঠিত হয় সংখ্যালঘুর জন্য সংরক্ষিত আসনের জন্য পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস, তফসিলী ফেডারেশন ইত্যাদি দলের সমন্বয়ে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বেসামরিক কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক গোপন বৈঠকে বসে যখন সমঝোতা গড়ে তুলতে সক্ষম হন তখন (২৮ নভেম্বর ১৯৬৯) এক বেতার ভাষণে ১৯৭০-এর ৫ অক্টোবর সর্বজনীন এবং প্রত্যক্ষ ভোটে জনসংখ্যার ভিত্তিতে আইন পরিষদ গঠন করার ঘোষণা দেন। ৩০ মার্চ ১৯৭০ ইয়াহিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন 'দি লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক ওভার অফ ১৯৭০', এতে বলা হয় যে, জাতীয় পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা হবে ৩১৩ জন (১৩ জন মহিলা), পশ্চিম পাকিস্তানের 'একক যুক্তাংশ' কাঠামো ভেঙে জনসংখ্যার ভিত্তিতে ১৪৪টি আসন নির্ধারণ করা হবে। পাঞ্জাব ৮৫টি (৩টি মহিলা), সিন্দু ২৮টি (১টি মহিলা), উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ ১৯টি (১টি মহিলা), বালুচিস্তান ৫টি (১টি মহিলা) ও পার্বত্যাঞ্চল ৭টি, আর পূর্ব বাংলার জন্য ১৬৯টি (৭টি মহিলা) আসন নির্ধারণ করা হবে। 'আইনগত কাঠামো আদেশ ১৯৭০-এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে ভাসানী বলেন, 'পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র অবশ্যই ইসলামী আদর্শভিত্তিক হবে এবং তাতে পাকিস্তানের স্বাধীনতা, ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও জাতীয় সংহতির বিধান থাকবে এবং পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র বলে অভিহিত হবে। ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ ও সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের ব্যবস্থা সংবলিত বিধান থাকবে। শাসনতন্ত্র অনুসারে পাকিস্তানে ফেডারেল পদ্ধতির সরকার এবং ফেডারেল সরকার ও প্রদেশসমূহের মধ্যে আইন, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতা বণ্টন করা হবে এবং প্রদেশসমূহ সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসন এবং আইন প্রণয়ন, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ক্ষমতা লাভ করবে। পূর্ব বাংলার বন্যার কারণে অক্টোবরের নির্ধারিত তারিখে নির্বাচিত অনুষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে, তাই সরকার ৭ ডিসেম্বর (১৯৭০) জাতীয় পরিষদের এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের নতুন তারিখ ধার্য করে।

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের শোষণপোষণ বন্ধ হওয়ার ফলে জনগণের আর্থিক অবস্থা বলিষ্ঠ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বাস্তবে এর ফল হয় উলটো। যে পাকিস্তানের পশ্চিমাংশ মরুভূমি আর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিল্পক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ ছিল সে পাকিস্তান ক্রমাগত ফুলেফেঁপে, ঐশ্বর্যে আর বৈভবে ভরে ওঠে। এর পাশাপাশি অগ্রসর পূর্ব বাংলা ক্রমাগত অর্থনৈতিক দিক থেকে অবহেলিত, বঞ্চিত, শোষিত হতে থাকে। এ রকম অর্থনৈতিক শীর্ণতা ও অর্থনৈতিক বঞ্চনার কারণে বিরূপ প্রতিক্রিয়া জন্ম নেয় বাঙালির অন্তরে, ফলে পূর্ব বাংলায় অসন্তোষ এবং নৈরাশ্য সৃষ্টি হয়।

১৯৫২-১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে খাদ্যের ঘাটতি দেখা দেয় পূর্ব বাংলায়, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে তা দেখা দেয়নি, বরং ১৯৪৮-৫৩ সময়সীমায় পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে পূর্ব বাংলা দ্রব্য আমদানি খাতে ৯০ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ঋণ করে। পশ্চিম পাকিস্তান ১৯৫৩-৫৪ (নয় মাস) সময়সীমায় পূর্ব বাংলার ওপর থেকে বাণিজ্য খাতে ১৬ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা আদায় করে। নিখিল পাকিস্তানে নানা রকম প্রকল্পের জন্য নানা সময়ে যে ব্যয় ধার্য

করা হয় তা থেকেও স্পষ্টই দেখা যায় দুই অঞ্চলের মধ্যে বিরাজমান আর্থিক ব্যবধান কী পরিমাণ ছিল। পূর্ব বাংলা থেকে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ও সমরনায়করা মোট রাজস্বের এক-চতুর্থাংশের চেয়ে কম, উন্নয়ন বাজেটের এক-তৃতীয়াংশের চেয়ে কম, সর্বপণ্যের এক-চতুর্থাংশ এবং বৈদেশিক সাহায্যের এক-পঞ্চমাংশ পেয়ে থাকে। তবে বৈদেশিক মুদ্রার প্রায় পুরোটাই আসে পূর্ব বাংলার পাট থেকে। অবশ্যই এক অপেক্ষাকৃত দরিদ্র অঞ্চল। সাধারণত দেয় অল্প তাই পায়ও কম, কিন্তু পূর্ব বাংলার ক্ষেত্রে তা উল্টো। পূর্ব বাংলার দ্রব্যমূল্য আকাশছোঁয়া, যেমন চালের দাম পশ্চিমাংশের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ, চাকরির ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার দখলে মাত্র ১৫ ভাগ এবং সেনাবাহিনীতে ১০ ভাগ। আর উদাহরণ উল্লেখ করা যায়–

১. ১৯৪৮-১৯৫০ পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ৮৮ কোটি রুপি ও পূর্ব বাংলার জন্য ২৫ কোটি রুপি।

২. ১৯৫০-৫৫ পশ্চিম পাকিস্তানের ১,১২৯ ও পূর্ব বাংলার জন্য ৫২৪ কোটি রুপি।

৩. ১৯৫৫-৬০ পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ১,৬৫৫ ও পূর্ব বাংলার জন্য ৫২৪ কোটি রুপি।

৪. ১৯৬০-৬৫ পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ৩৩৫৫ ও পূর্ব বাংলার জন্য ১,৪০৪ কোটি রুপি।

৫. ১৯৬৫-৭০ পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ৫১৯৫ ও পূর্ব বাংলার জন্য ২,১৪১ কোটি রুপি বরাদ্দ করা হয়।

উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে আইয়ুব শাসনামলের ব্যয়ধার্য করার চিত্রটি হচ্ছে–

১. বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা; পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ করা হয় ৮০% এবং পূর্ব বাংলার জন্য ২০%।

২. মার্কিন সাহায্য : পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হয় ৬৬% ও পূর্ব বাংলায় ৩৪%।

৩. শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন : পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হয় ৫৮% ও পূর্ব বাংলায় ৪২%।

৪. শিল্প ঋণ ও বিনিয়োগ : পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যয় করা হয় ৮০% ও পূর্ব বাংলায় ২০%।

৫. শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক : পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ করা হয় ৭৬% ও পূর্ব বাংলায় ২৪%।

৬. গৃহনির্মাণ : পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হয় ৮৮% ও পূর্ব বাংলায় ১২%।

৭. কৃষি বিকাশের ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানে বরাদ্দ করা হয় ২২ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা (সিন্ধু প্রদেশ ৬০ লক্ষ, সীমান্ত প্রদেশ ৪ কোটি ৫২ লক্ষ, বালুচিস্তান শূন্য ও বাদবাকি পাঞ্জাবের জন্য) আর পূর্ব বাংলার ভাগে পড়ে ১৯.৪ শতাংশ।

১৯৫০, ১৯৫১ ও ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কোরিয়ার যুদ্ধের ফলে পাটের দাম বেড়ে যায়। পাট ও চা রপ্তানির মাধ্যমে পূর্ব বাংলা যা উপার্জন করে তা ছিল নিখিল পাকিস্তানের





বাজেটের চাহিদা ও বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের শতকরা ৭৫ ভাগ। পাট শিল্পের ক্ষেত্রে পৃথিবীর মধ্যে পূর্ব বাংলার স্থান ছিল সবার উপরে। পূর্ব বাংলায় সুতিবস্ত্র প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বস্ত্রশিল্পের গুণ, বৈচিত্র্য ও মূল্যের বিচারে পূর্ব বাংলার সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো তুলনাই ছিল না। অতএব পাকিস্তানের পক্ষে পূর্ব বাংলার ওপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করাই হয়ে ওঠে একান্ত বাঞ্ছনীয়। পূর্বাঞ্চলের জনসংখ্যা যদিও বেশি তবুও সামরিক ও বেসামরিক খাতে পাঁচভাগের চারভাগই ব্যয় করা হয় পশ্চিমাঞ্চলে। আমলাতান্ত্রিক উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের অধিকাংশই ছিল পাঞ্জাবি। প্রাদেশিক অ্যাসেম্বলিতে আতাউর রহমান বলেন, ।...। মুসলিম লীগের নেতারা মনে করেন আমরা হলাম বিজিত এবং তারা হলেন বিজয়ী জাতি। চাকরি ও নিয়োগের ক্ষেত্রেও বৈষম্যতার চিত্র পাওয়া যায়–

১. কেন্দ্রীয় বেসামরিক চাকরির ক্ষেত্রে ৮৪% পাকিস্তানি ও ১৬% বাঙালি।

২. বৈদেশিক চাকরির ক্ষেত্রে ৮৫% পাকিস্তানি ও ১৫% বাঙালি।

৩. সশস্ত্র বাহিনীতে ৫ লক্ষ পাকিস্তানি ও ২০ হাজার বাঙালি।

৪. স্থলবাহিনীতে ৯৫% পাকিস্তানি ও ৫% বাঙালি।

৫. বিমান বাহিনীতে ৯১% পাকিস্তানি ও ৯% বাঙালি।

৬. নৌবাহিনীর কারিগরি চাকরির ক্ষেত্রে ৯১% পাকিস্তানি ও ৫% বাঙালি প্রভৃতি।

পাকিস্তানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের ১৯৭১-এ দেশটি সবচাইতে বিপজ্জনক ও কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। রাজনৈতিক বৈরিতা, অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও জাতীয় অসন্তোষ থেকেই ১৯৭১-এর সঙ্কট সৃষ্টি হয়। শোষণ ও জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জনতা। পাকিস্তানের শোষণ ও দুঃশাসনের কবল থেকে মুক্তির দুর্নিবার আকুলতা নিয়ে পূর্ব বাংলার শ্রমিক-কৃষক-শ্রমজীবী-ছাত্র-পুলিশ-ইপিআর-সৈনিক-শিক্ষিত-গর্বিত মানুষ জীবনবাজি রেখে বুকের রক্তে স্বদেশের মাটি রঞ্জিত করতে মুক্তিসংগ্রামে লিপ্ত হয়। ১৯৭১-এর সঙ্কট সম্বন্ধে জেড. এইচ. জাইদি বলেন- তোর পরিচয় কী?

দেশভাগের পর থেকে ভাষা-আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদের শক্তি বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৭ থেকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাঙালির ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইলে এর প্রতিরোধে বাঙালি জাতীয়তাবাদের নতুন শক্তি ও গতির সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় আসন দিতে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বাধ্য হয়। অবশ্য তা সহজে আসেনি, অর্জিত হয়েছে রক্তপাত-আত্মত্যাগ-আত্মদানের মাধ্যমে। বাংলা ভাষার অধিকার গ্লথগতিতে আদায় করলেও বাঙালির ক্ষোভ তাদের অন্তর থেকে মুছে ফেলতে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পারেনি। রাষ্ট্রভাষা বিতর্কের জের ধরে বাঙালির মধ্যে দ্রুতগতিতে ক্ষোভ প্রকাশিত হতে থাকে।

বাঙালিরা বুঝতে পারে, অতীতে তারা মাড়োয়াড়ি জোঁয়াল কাঁধে নিয়ে জীবনযাপন করছিল, আর ১৯৪৭-এর পর থেকে পাঞ্জাবির। ভারতবর্ষ বিভাগের সময় অবিভক্ত দেশে বেসামরিক প্রশাসনে একজন মাত্র পূর্ব বাংলার মুসলমান কর্মকর্তা ছিলেন।

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পাকিস্তানের বেসামরিক প্রশাসনে কোটাভিত্তিক পদ্ধতিতে পূর্ব বাংলা থেকে মাত্র তিনজন যুগ্মসচিব, দশজন উপসচিব এবং ৩৮ জন নিম্নপদের সচিব নেওয়া হয়; অন্যদিকে পাকিস্তানিদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৮ জন, ১২৩ জন ও ৫১০ জন।

ভারতবর্ষ বিভাগের পূর্বে সামরিক বাহিনীতে পাঞ্জাবি ও পাঠানদের প্রাধান্য ছিল, বিভাগ পরবর্তী সময়ে তাদের প্রাধান্য আরও বেড়ে যায়। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে এই পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি ঘটলেও বৈষম্য ঠিকই থেকে যায়। বেসামরিক, রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে পাঞ্জাবের (পাকিস্তানের অংশ) তিনটি শহর।

১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু, বেলুচিস্তান, সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাব মিলে একক যুক্তাংশ সৃষ্টি করার পর, ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে, আইয়ুব খানের একক সিদ্ধান্তে পাকিস্তানের রাজধানী করাচি থেকে ইসলামাবাদে স্থানান্তরিত করা হয়; আর পাঞ্জাবেরই আরেকটি শহর রাওয়ালপিণ্ডিকে করা হয় সশস্ত্র বাহিনীর হেডকোয়ার্টার। এসব সিদ্ধান্তের কারণে কেবল আন্তঃপ্রদেশের মধ্যে বিরোধই বৃদ্ধি পায়নি, বরং পূর্ব বাংলা ও পাঞ্জাবের মধ্যে শত্রুতার বৃদ্ধি পায়।

দেশভাগের পরপরই যে আইনসভা গঠিত হয় সেখানে ৬৯টি আসনের মধ্যে পূর্ব বাংলার ছিল ৪৪টি, যা নতুন পদ্ধতিতে পাঞ্জাব দ্বারা নির্ধারিত হতো। পরে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান একক যুক্তাংশ পদ্ধতি ভেঙে সংশোধন করার উদ্যোগ নেন। বেসামরিক সরকারের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের পদ্ধতি তৈরি হয়। এই পদ্ধতি অনুযায়ী প্রতিটি প্রদেশ জনসংখ্যার ভিত্তিতে আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে; এতে ৩১৩টি (১৩টি মহিলা) আসনের জাতীয় আইনসভায় পূর্ব বাংলার শতকরা ৫৬ ভাগ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়।

দুই অংশের মধ্যে বিরাজমান সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয় না। বিজ্ঞজনরা বলছেন, 'পূর্ব বাংলার একমাত্র বিকল্পই হচ্ছে পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করা বা পাকিস্তানের পশ্চিমাংশের সঙ্গে শিথিল ফেডারেশন সৃষ্টি করা।' তবে বাঙালিরা ব্যাকুলভাবে চায়, পূর্ব বাংলার জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন আদায় করতে।

স্বশাসন বা স্বরাজ যাই বলা হোক না কেন, তাই তারা চায়। যদি বাঙালিকে নিশ্চয়তা দেওয়া হয় যে, নিজগৃহে নিজেই প্রভু, তবে তারা পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার ক্ষেত্রে ফেডারেল সরকার ব্যবস্থা মেনে নেবে, তবে তা হতে হবে দুর্বল এবং পূর্ব বাংলার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। বিভক্ত ভূখণ্ডে গঠিত বহুজাতিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎই নির্ভর করছে উপযুক্ত শিথিল ফেডারেল কাঠামোর ওপর। আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক চেতনাকে মর্যাদা দিতে হবে। একে অন্যের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। দেশবিভাগ হয়েছিল মুসলমান-অধ্যুষিত প্রদেশগুলোর ওপর বাঙালির আধিপত্যের ভয় থেকে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে পূর্ব বাংলার দাবিগুলোর মিল ছিল, যেমন: ভাষাকে রক্ষা করা, আইনসভা ও চাকরিতে অবহেলিত জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষা করা, ফেডারেল কাঠামো স্থাপন করা, অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামরিক ক্ষেত্রে অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে ক্ষমতাশীল করা ইত্যাদি বিষয়।





বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম এই রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী ও সমরনায়কেরা দুটো অঞ্চলকে একত্রে ধরে রাখার যে আপসের নীতি অবলম্বন করে তা ব্যর্থ নীতি; কারণ দুটো অঞ্চলের মধ্যে কোনো রকম স্বার্থের মিলন নেই, পারস্পরিক নির্ভরতা তো নেই, বরং ভূপ্রকৃতি-ঐতিহ্য-সভ্যতা-সংস্কৃতি-কৃষ্টি-ভাষা-খাদ্যাভ্যাসে অমিল, ধর্মও একত্রে ধরে রাখতে অক্ষম, কারণ ইসলাম কোনো ঐক্যের শক্তি নয়, মধ্যপ্রাচ্যে তা প্রমাণিত হচ্ছে, পাকিস্তানেও। অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ভৌগোলিক কোনো ক্ষেত্রেই আধুনিক রাষ্ট্র বিচ্ছিন্ন থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে না। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ও সমরনায়করা ২৪ বছর ধরে একটি স্থিতিশীল ও স্থায়ী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু রাখতে অক্ষম হওয়ায় ১৯৭১-এর সঙ্কট সৃষ্টি হয়। পাকিস্তান সব সময়ই রোগগ্রস্ত ছিল; তবে তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে সাহায্য করে তার অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই।

এছাড়া পাকিস্তানের দুটো অংশের মধ্যে সব কিছুতেই বৈষম্য থাকায় ১৯৭১-এর সঙ্কট সমাধান করা অসম্ভব। একমাত্র সমাধানই হচ্ছে পাকিস্তানকে দুই ভাগে বিভক্ত করা। দীর্ঘদিনের সংঘাত জমতে জমতে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে তা আগ্নেয়গিরীর মতো বিস্ফোরিত হয়। অবশ্য এর জন্য পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ও সমরনায়করাই দায়ী।

# প্রাকৃতিক দুর্যোগ

বঙ্গোপসাগরের দিকে ধাবমান গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র সৃষ্ট বদ্বীপে ছোট ছোট দ্বীপ ও অসংখ্য খালবিল নিয়ে গঠিত বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল পূর্ব বাংলা। প্রতি বর্গমাইলে ১২০০ লোক বাস করা এই দেশটির বেশির ভাগ অংশ সমতল ও নিচু, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ১.৫ থেকে ২.০ ফুট উঁচু। বঙ্গোপসাগর সাধারণত গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র থেকে জল গ্রহণ করে, কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ সে বিদ্রোহী হয়ে বদ্বীপের উপরতল পর্যন্ত ভাসিয়ে নেয়। তখন জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা ২০ ফুটের মতো হয়, মাঝে মধ্যে ৫০ ফুটও। এক একটি জলোচ্ছ্বাস, তার আগমনের আগে যা কিছু বিনির্মাণ করা হয়, সব কিছু ধ্বংস করে দেয়। তবুও এই নদীমাতৃক দৃশ্যপটে কোটি কোটি পৃথিবীর সবচাইতে দরিদ্র মানুষ বন্যা-খাদ্য-দুর্ভিক্ষ এই তিনটি সমানভাবে খ্যাত সমস্যা নিয়ে বেঁচে থাকে। এসব দ্বীপ অঞ্চলে আধুনিক কোনো যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। স্বাভাবিক অবস্থাই এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যাতায়াতের একটি নৌকা পেতে এক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হয়। ভূগোল অবশ্য এই এলাকার একমাত্র সমস্যা নয়। ইতিহাস জুড়ে পূর্ব বাংলার দ্বীপ অঞ্চল হচ্ছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের সীমান্তভূমি। এই অঞ্চল সব সময় দূরবর্তী শাসনকর্তা দ্বারা শাসিত হয়েছে, এমন কি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষ বিভাজনের পর শাসনকর্তারা ইতিহাসের সবচেয়ে দূরবর্তী শাসনকর্তায় পরিগণিত হয়। কোনো শাসনকর্তাই বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। পূর্ব বাংলার পাটনির্ভর অর্থনীতিও এ ব্যাপারে ব্যবহার করা হয়নি। ব্রিটিশরা পাটশিল্প প্রবর্তন করে, কিন্তু দেশবিভাগে সেগুলো কলকাতায় থেকে যায়। পূর্ব বাংলায় কিছু জুট মিল স্থাপন করা হলেও সরকার প্রবর্তিত কৃষিজ-পণ্যের মূল্য নির্ধারণ নীতি ঢাকা ও চট্টগ্রামের উদ্যোক্তাদের হাত থেকে চাষীদের শোষিত হওয়ার প্রক্রিয়াটি বন্ধ করার ব্যাপারে কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। পূর্ব বাংলার পাটনির্ভর অর্থনীতির উদ্বৃত্ত অর্থ পাকিস্তানের পশ্চিমাংশের নগরাঞ্চলের শিল্পায়ন উন্নয়নে ব্যবহার করা হয়। পূর্ব থেকে পশ্চিমে সম্পদ স্থানান্তরের বার্ষিক পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫০ মিলিয়ন রুপিতে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ভারতবর্ষ বিভাজনের পর থেকে, বিশেষত ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে আইয়ুব খানের সামরিক স্বৈরশাসন চালু হওয়ার পর থেকে, পূর্ব বাংলার ক্রমবর্ধমান ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এই ক্ষতির সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত হয় পূর্ব বাংলায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের খাতে অর্থ বরাদ্দের ব্যাপারটিও। বন্যা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে গবেষণারত বিশ্বব্যাংক জানায় যে, আনুমানিক ৮০০ মিলিয়ন ডলার খরচে ২০টি বহুমুখী প্রকল্প পূর্ব বাংলার বন্যা সমস্যার বৃহত্তর সমাধান দিতে পারে। প্রধানত জাপানি এবং জার্মানি থেকে বিদেশি গাড়ি, রেফ্রিজারেটর, এয়ারকন্ডিশনার এবং অন্যান্য ভোগ্যপণ্য আমদানি করতে পাকিস্তান যা খরচ করে তার তুলনায় এই খরচ কিছুই না। এই আমদানির ক্ষেত্রে পাকিস্তান বৈদেশিক মুদ্রা যা অর্জন করে তার প্রায় ২০ ভাগ সুদে ব্যয় করে, ফলে পাঁচ বিলিয়ন ডলারের অধিক বিদেশি ঋণের জন্য চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। যদি ২০টি বহুমুখী প্রকল্প খাতে বিদেশি ঋণের জন্য চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তাহলে পাকিস্তানের যে কোনো দৃঢ়চেতা সরকার মুদ্রা সম্পদের সমস্যায় পড়বে না। এছাড়া স্থানীয়ভাবে বিশ্বব্যাংক প্রস্তাবিত কয়েকটি বাঁধ নির্মাণ করার ক্ষমতা পাকিস্তান সরকারের আছে। বিশ্বব্যাংক প্রস্তাবিত বাঁধ নির্মাণ না করা সরকারের ইচ্ছার ব্যর্থতা, অর্থের নয়। কিন্তু বিশ্বব্যাংক প্রয়োজনীয় ৮০০ মিলিয়ন ডলার দিতে চাইবে না; কারণ





সিন্ধুর পানি নিয়ে ভারত-পাকিস্তান বৈরিতা নিষ্পন্ন করার জন্য এরই মধ্যে বিশ্বব্যাংক এক বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে। অবশ্য জেনারেল ইয়াহিয়া খান বন্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসেবে উল্লেখ করে ঘোষণা করেন, 'আমার নির্দেশনা অনুযায়ী পরিকল্পনা কমিশন এই কর্মসূচিতে আর্থিকভাবে সাহায্য করার জন্য বন্ধুভাবাপন্ন সব দেশ থেকে সহায়তা সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছে। আমি নিশ্চিত যে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের ভবিষ্যতের জন্য জরুরি এই সমস্যা সমাধানের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিবে।' কিন্তু প্রেসিডেন্ট সমস্যার ভয়াবহতাকে জাতীয় পর্যায়ে স্থান দেননি। বন্যা নিয়ন্ত্রণে অভ্যন্তরীণ সম্পদের ব্যবহার এবং বন্যার ধ্বংসাত্মক আক্রমণকে প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা সরকারের এজেন্ডার মধ্যে আনা হয়নি। তিনি আরও বলেন, 'আমাদের বিশেষ তহবিল গঠনের ইচ্ছা আছে। পাকিস্তান নিজেই যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ প্রদান করবে।

২৩ অক্টোবর ১৯৭০। একটি সাইক্লোন আঘাত হানে। রেডিও সম্প্রচার বন্ধ রেখে বারবার উপকূলবর্তী অঞ্চলে সতর্কবাণী প্রচার করায় মানুষ নিরাপদ স্থানে সরে যায়, তবুও ৩০০ জন মারা যায়।

১২ ও ১৩ নভেম্বর ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে ২৫০ মাইল বেগে সাইক্লোন আঘাত হানার আগে কক্সবাজার, চট্টগ্রাম ও ঢাকার পর্যবেক্ষণ টাওয়ার ও রাডার স্টেশনগুলো সক্রিয়ভাবে প্রতি দিনের মতোই কাজ করে যায়। আবহাওয়াবিদরা 'হারিকেন ডেঞ্জার' এবং 'হারিকেন গ্রেট ডেঞ্জার' সম্বন্ধে সতর্কবার্তা প্রচার করলেও দুঃখের বিষয় যে, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী এ ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেনি।

১২ নভেম্বরে সতর্কবাণী প্রচার করলেও সরকারি কর্মকর্তা ও শাসকগোষ্ঠীর অসতর্কতা ও অবহেলা রয়ে যায় অপরিসীম। স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ২৫০ মাইল বেগে ঘূর্ণিঝড় ধেয়ে আসার চিত্রটি পাওয়ার পর সরকারি কর্মকর্তার অসতর্কতা ও অবহেলার দুটো উদাহরণ দেওয়া যায়–

১. সমুদ্র জাহাজের জন্য চালনা সমুদ্রবন্দরে সর্বোচ্চ ১০ নম্বর ও চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরে সর্বোচ্চ ৯ নম্বর বিপদ সংকেত দেখানো ছাড়া আর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

২. জাহাজসমূহ নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে গেছে অনুমান করে উপকূল থেকে দূরবর্তী দ্বীপসমূহের নিকট সাইক্লোন আসার পর বিপদ সংকেত প্রত্যাহার করে নেয়।

কর্মকর্তার অসতর্কতা ও অবহেলার কারণে পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষ ভাবতে পারেনি যে, সাইক্লোনটি এমন ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে। সাইক্লোনটি দিক পরিবর্তন ও শক্তিসঞ্চার করে যথাসময়ে পূর্ব বাংলার উপকূলে আঘাত হানে। সাইক্লোনের সঙ্গে ধেয়ে আসে জলোচ্ছ্বাসও। এই আঘাতের পর চট্টগ্রামের ভূমিকম্প পরিমাপ স্টেশনের কর্মকর্তারা জলোচ্ছ্বাসের উপরিভাগের পরিমাপ প্রকাশ করতে সমর্থ হলেও সরকারি কর্মকর্তারা বা শাসকগোষ্ঠী জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা ও গভীরতার পরিমাণ অনুমান করতে ব্যর্থ হওয়ার কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। জলোচ্ছ্বাসের পূর্বাভাস সঠিকভাবে প্রচার করলে বাস্তব কারণেই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অর্ধেকের চেয়েও কম হতো। জলোচ্ছ্বাসের আঘাতের ১২

ঘণ্টা পর প্লাবিত দ্বীপ হাতিয়া থেকে ওয়ারলেস বর্ণনায় জানা যায় যে, অনেক লোক মারা গেছে। এই খবরে প্রকাশিত ক্ষয়ক্ষতির তথ্য ভুল বলে চট্টগ্রামের আবহাওয়া অফিস ওয়ারলেস বর্ণনা বন্ধ করে দেয়; বরং তারা প্রচার করতে থাকে যে, ভোরবেলা দেখা যাবে এই স্বল্প উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসে কী রকম ক্ষয়ক্ষতি করেছে। বাস্তবে, পূর্ণিমার কারণে বঙ্গোপসাগরে বিশাল উচ্চতার জলোচ্ছ্বাস হয়। এই আঘাতের পর সরকারি কর্মকর্তারা সরকারের, সরকার স্থানীয় এজেন্সির, স্থানীয় এজেন্সি সরকারি কর্মকর্তার ঘাড়ে দোষ চাপাতে ব্যস্ত। দায়িত্বে থাকা অলস ব্যক্তিরা তাদের দোষ এড়িয়ে যাওয়ার জন্য বলেন, 'সাইক্লোন আঘাত আনার কয়েক ঘণ্টা আগে আমরা রোজা ভাঙার জন্য ইফতারি করতে গিয়েছিলাম। এজন্য আমরা কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলাম।' সাইক্লোন আঘাত হানার পর দুর্যোগের প্রকৃত মাত্রা বোঝা যায়নি। ঢাকার এক পত্রিকা লিখে, 'এ হচ্ছে শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়।'

১৩ নবেম্বর ১৯৭০। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, মৃতসংখ্যা ৫০ হাজার। সরকারি হিসাবে আস্তে ধীরে বাস্তবতার ছোঁয়া লাগবে, ফলে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৭৫ হাজার। ১৪ নভেম্বর ১৯৭০, মৃতসংখ্যা আনুমানিক ২০০ হাজারে পৌঁছে। সঠিক সংখ্যা পাওয়া অসম্ভব, তবে বিশ্বের সামনে আস্তে ধীরে পূর্ব বাংলার ধ্বংসলীলার বাস্তব চিত্রটি দৃষ্টিগোচর হতে শুরু করে।

ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রাথমিক সাহায্য আসে মাত্র ত্রিশ হাজার পাউন্ড, পরে এর পরিমাণ এক মিলিয়ন পাউন্ডে বৃদ্ধি করা হয়। এক মিলিয়ন অতিরিক্ত পাউন্ড দেওয়ার অঙ্গিকারে আবদ্ধ হয়। এ রকম পরিমাণের ত্রাণ উদ্যোগ ব্রিটেনের ইতিহাসে এই প্রথম। লীগ অফ রেডক্রস সোসাইটি ও জাতিসংঘের কাছ থেকে সাহায্যের জন্য পাকিস্তান আবেদন জানালে, বিশেষ করে, যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও ভারতের পক্ষ থেকে সাড়া পাওয়া যায়। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ বাণিজ্যিক ফ্লাইটগুলো বাতিল করে ঢাকা বিমানবন্দরে ত্রাণসামগ্রী বহনকারী বিমানগুলো অবতরণ করতে অনুমতি দেওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেরি হওয়ায় পূর্ব বাংলায় দ্রুত সাহায্য পাঠানো সম্ভব হয়নি। সরকারের অনুমতি আদায় করতেও বেশ বেগ পেতে হয়। সরকার যখন রাজি হয় তখন সাহায্যের বিরাট অংশ পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকায় এনে জমা হয়। সরকারের সঠিক নীতিমালা না থাকায় উপকূল অঞ্চলে সেসব ত্রাণসামগ্রী পৌঁছাতে আরেক সময় লাগে। অল্প পরিমাণের যে ত্রাণসামগ্রী রেডক্রসের মাধ্যমে উপকূল অঞ্চলে পৌঁছে তা বিতরণ করতে বিরাট ঝামেলা সৃষ্টি হয়; কারণ, একদিকে যেমন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া রাস্তাগুলো নরম পলির দখলে, তেমনি অন্যদিকে জলপথে সচল নৌকাগুলোর অভাব। এই ঝামেলা অতিক্রম করতে প্রয়োজন হেলিকপ্টার ও ইঞ্জিনচালিত নৌকার, কিন্তু পাকিস্তান সেনাবাহিনী বা বিমানবাহিনীর কাছে থেকে এসব উদ্ধার করা সম্ভব নয়। পাকিস্তানের সামরিক সরকারের কাছে এ ধরনের মহাদুর্যোগ সামাল দেওয়ার সুব্যবস্থা, দক্ষ জনবল ও দ্রুতগতির যানবান থাকা সত্ত্বেও পূর্ব বাংলার বেলায় শুধু পাঁচটি ইনফ্যান্টরি ডিভিশন আংশিকভাবে ব্যবহার করা হয়।





১৬ নভেম্বর ১৯৭০। সামরিক বাহিনী ত্রাণকার্গো বহন ও বিতরণের ব্যাপারে সক্রিয় থাকার আদেশ পায়। তারা পাঁচ হাজার জীবিত দুর্গতদের কলেরা ও টাইফয়েডের প্রতিষেধক ও মৃতদের কবর দেওয়া এবং রাস্তাঘাট পুনর্নির্মাণে নিয়োজিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে পাকিস্তান সেনাবাহিনী, বেসামরিক প্রশাসন এবং রেডক্রসের মধ্যে কর্ম ব্যবস্থায় সমন্বয় না থাকায় আবারও ঝামেলা সৃষ্টি হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়–

> ব্রিটিশ উদ্ধারকারী বিমানগুলো ঢাকায় আটকা পড়ার কারণ রেডক্রস না সেনাবাহিনী রিলিফ কাজ পরিচালনা করবে এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত না থাকা। সরকারের পক্ষ থেকে অবশ্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, রিলিফ কমিশনার হিসেবে একজন বেসামরিক ব্যক্তির পরিবর্তে একজন সেনা কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দেওয়া হবে।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পাকিস্তান বিমানবাহিনীর অধীনে ২৫টি হেলিকপ্টার থাকা সত্ত্বেও অল্প ওজন বহনকারী মাত্র একটি হেলিকপ্টার জীবিত দুর্গতদের কাছে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়। বেশি ওজন বহনকারী হেলিকপ্টারগুলো ব্যবহার করা উচিত ছিল। এ বিষয়ে রিলিফ কমিশনার জানান, 'পাকিস্তান থেকে বেশি ওজন বহনকারী হেলিকপ্টার আনা সম্ভব নয়, কারণ ভারত তার উপর দিয়ে এগুলো উড়ে আসতে অনুমতি দেয়নি।' অন্যদিকে ভারত বলে, 'আমাদের অনুমতির জন্য কখনই বলা হয়নি।' আসলে, পাকিস্তান বিমানবাহিনীর অধিকাংশ ঘাঁটিই পাকিস্তানের পশ্চিমাংশে, আর সেখান থেকে হেলিকপ্টারগুলো পূর্ব বাংলায় আনতে হলে অনেক ব্যয় হবে, আর শত্রুদেশ ভারতের ঘাঁটিতে অবতরণ করতে হবে। তাই পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ সেগুলোকে ত্রাণকাজে ব্যবহার করতে রাজি হয়নি। অন্যদিকে বঙ্গোপসাগরে নোঙ্গর ফেলা একটি জাহাজ থেকে ব্রিটিশ হেলিকপ্টার ও এ্যাসল্ট নৌকাগুলো ব্যবহার করা হয়। আমেরিকান হেলিকপ্টারগুলোও আসতে শুরু করে। আশা করা যায় যে, ত্রাণবিতরণ ঠিকমতো পরিচালিত হবে, এবং জীবিত দুর্গতদের কাছে ত্রাণসামগ্রী এক সময় পৌঁছবে।

১৮ নভেম্বর ১৯৭০। দুই সপ্তাহ পর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা মাথায় রেখে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ব-দ্বীপ অঞ্চল হেলিকপ্টারযোগে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ঢাকায় এসে পৌঁছেন। রাওয়ালপিন্ডি সরকার এই ভ্রমণকে পূর্ব বাংলার ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় সামাল দেওয়ার জন্য যথেষ্ট বলে মনে করে। সাইক্লোনের আগে, পূর্ব বাংলার প্রধান নির্বাচনী ইস্যু ছিল স্বায়ত্তশাসনের দাবি, কিন্তু সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসের পর পূর্ব বাংলার এগারোটি দলের নেতৃবৃন্দ ত্রাণবিতরণ ও মানব ইতিহাসের বৃহত্তম প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকারের ব্যর্থতার চিত্র তুলে ধরে নির্বাচন বাতিল করার দাবি তোলেন। অবশ্য নির্বাচনে সম্ভাব্য বিজয়ী দল আওয়ামী লীগ কোনো মন্তব্য করেনি। পিকিংপন্থি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি তার প্রার্থীদের নাম প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়। বিপজ্জনক পদক্ষেপ হওয়া সত্ত্বেও কোনো কোনো দল জাতীয় নির্বাচন স্থগিত রাখার ঘোষণা দেয়। পূর্ব বাংলার নেতারা সুস্পষ্ট ভাষায় দাবি করেন, 'ঘূর্ণিঝড়ে কত লোক মারা গেছে এর হিসাব সরকারকে দিতে হবে।' জবাবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলেন, 'দুই লাখ।' আর ঘটনাস্থলে উপস্থিত কর্মীরা বলে, 'দশ লাখ'। সঠিক সংখ্যা কী এ নিয়ে তর্কের তুফান তুলে লাভ নেই, কারণ

একজন সচেতন ব্যক্তি জানেন যে, ত্রাণবিতরণ এবং বন্যা উপদ্রুব ব-দ্বীপকে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে হলে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার প্রয়োজন। এই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যদি সামরিক সরকারের পক্ষে সম্ভব না হয় তাহলে অসহায়ত্বের চিহ্ন ধারণ করে বেঁচে থাকা দুর্গতদের বাঁচিয়ে রাখা পূর্ব বাংলার মানুষের পক্ষে একা সামাল দেওয়া অসম্ভবই বটে, বরং বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলো থেকে সাহায্য নেওয়া উচিত।

২২ নভেম্বর ১৯৭০। প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে 'বিরান ভূমি' বঙ্গোপসাগরীয় উপকূল অঞ্চল সফর শেষে পল্টন ময়দানের এক জনসভায় ভাসানী বলেন, 'বাঙালির জীবনে আজ মহাদুঃখের দিন। আমাদের জীবনে নেমে এসেছে মহাদুর্যোগ। বিধ্বস্ত বিরান ভূখণ্ডে, উন্মুক্ত আকাশের নিচে, আমাদের অগণিত মা বোন উলঙ্গ হয়ে পড়ে রয়েছে। বিরান জনপদের কোথাও কোনো ঠাঁই নেই। এই শীতের দিনে ধনী-গরিব কারও মাথা গোঁজার ঘর নেই। [....] পূর্ব বাংলার উপকূলের ১০ থেকে ১২ লক্ষ নরনারী ও শিশু এই দুর্যোগে প্রাণ হারিয়েছে, কিন্তু মহাধ্বংসযজ্ঞের ১০ দিন পরও প্রায় ৪ লক্ষ মানুষের লাশ পড়ে আছে। এদের দাফনের কোনো ব্যবস্থা নেই। সরকার ও সরকারি প্রচারযন্ত্রের কঠোর সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'আমাদের লক্ষ লক্ষ ভাইবোনদের মৃত্যুর সংবাদ রেডিও পাকিস্তান ও সরকার আমাদের জানায়নি। আট হাজার মাইল দূর থেকে বিবিসি মারফৎ আমরা এই দুঃসহ সংবাদ জানতে পারি। এছাড়া দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে সাংবাদিক ও আলোকচিত্র শিল্পীরা এগিয়ে এলেও আমাদের ইসলামাবাদের সরকার দুর্গত বাঙালির সাহায্যে এগিয়ে আসেনি।' ভাসানী সরকারের পদত্যাগ দাবি করে বলেন, 'বাঙালির দুঃখের দিনে সরকার সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসেনি, অথচ কথায় কথায় জাতীয় সংহতি ও ভ্রাতৃত্বের কথা বলা হচ্ছে। এইসব সংহতি ও ভ্রাতৃত্ব বোগাস।' কেন্দ্রীয় বাঙালি মন্ত্রীদের হৃদয়হীনতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'বাঙালি মন্ত্রীরা এমন হতে পারে তা আমি কোনোদিন কল্পনাও করেনি। বাঙালির দুঃখের দিনে তারা কেউই এসে আমাদের পাশে দাঁড়ায়নি।' ভাসানী নির্বাচন প্রসঙ্গে বলেন, 'আমাদের [ন্যাপের] কাছে নির্বাচনের চেয়ে মানুষ বড়ো তাই আমরা নির্বাচন করব না। দুর্গত মানুষের সেবায় আমরা সর্বশক্তি নিয়ে এগিয়ে যাব। এই অবস্থায় কেউ যদি নির্বাচন করতে চায় তাতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই।'

'দি টাইমস' পত্রিকার একজন প্রতিনিধি ফরাসী হেলিকপ্টারযোগে ১২ নভেম্বর ১৯৭০ জলোচ্ছ্বাসে আক্রান্ত বৃহত্তম দ্বীপ হাতিয়ায় যান। তার বিবৃতি–

> এই বিরান ভূখণ্ডে গবাদিপশু ও মানুষের মৃতদেহের স্তূপ দেখতে পেয়েছি। জীবিত মানুষ এখানে-সেখানে, গাছের নিচে, ভিড় জমিয়ে আছে। তাদের কেউ কেউ, বিশেষ করে শক্তসমর্থ পুরুষরা, পর্বত পরিমাণ ধাবমান জলের হাত থেকে বাঁচার জন্য গাছে উঠেছিল। সৌদি আরব থেকে আসা 'ওইতে' নামের হেলিকপ্টারটি ব্রিটেনসহ আটটি দেশের সমন্বিত ত্রাণবিতরণ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। বহির্বিশ্ব থেকে প্রায় প্রতি ঘণ্টায় বিমানযোগে পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকায় খাবার, কাপড়, জল পরিষেধক যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য জিনিস এসে জমা





> হচ্ছে। পাকিস্তানের সৈন্যরা এসব রক্ষার জন্য পাহারা দিচ্ছে। বিমানবন্দর থেকে ত্রাণসামগ্রী সাধারণত হেলিকপ্টারযোগে সরবরাহ ডিপোতে আনা হচ্ছে। তারপর উপকূল ও বন্যায় ভেসে যাওয়া দ্বীপগুলোতে নেওয়া হবে। ব্রিটিশ কমান্ডো হেলিকপ্টারগুলো পটুয়াখালী সাপ্লাই কেন্দ্র থেকে প্রায় ৪,৫০০ টন চাল, তেল, ময়দা, বিস্কুট, চিনি, আলু, গুঁড়ো দুধ এবং কাপড় চোপড় উপদ্রুপ অঞ্চলে পৌঁছে দিচ্ছে। ব্রিটিশের ত্রাণ সরবরাহের কাজে রেডক্রস ও অন্যান্য সংস্থা সন্তুষ্ট।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তার সরকারের 'ভুল ও বিলম্বে নেওয়া পদক্ষেপ' স্বীকার করে আন্তর্জাতিক সাড়াকে অভূতপূর্ব বলে বর্ণনা করেন, তবে তিনি বিদেশি সাহায্য কতদিন পর্যন্ত প্রয়োজন এ ব্যাপারে নীরব থাকেন। প্রকৃতপক্ষে এই সাহায্যের প্রয়োজন অন্তত দুই বছর লাগবে, কারণ একটি কানাডিয়ান সংস্থা দ্রুত জরিপের মাধ্যমে সরকারকে ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুব অঞ্চলকে 'স্বাভাবিক' করে তোলার জন্য দুই বছরের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করার পরামর্শ দেয়। অবশ্য পাকিস্তান বিশ্বব্যাংকের কাছে ৭৫ মিলিয়ন পাউন্ডের জরুরি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব পেশ করে। এ নিশ্চিত যে, সর্বগ্রাসী সমুদ্র অঞ্চলের ব-দ্বীপগুলোর কৃষিভূমি ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় আরও সময়ের প্রয়োজন, কারণ–

১. ত্রিশ মাইলব্যাপী উপদ্রুত এলাকায় কোনো বাড়িঘরই রক্ষা পায়নি।

২. ধ্বংসপ্রাপ্ত কৃষিজমি পূর্বের উৎপাদন ক্ষমতায় ফিরে আনতে তিন বছর সময় লাগবে।

৩. বিশুদ্ধ সরবরাহের ব্যবস্থা পুনরায় চালু করতে এবং কৃষিভূমিকে সমুদ্রের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নতুন বাঁধ নির্মাণ করতে হবে।

এই ধ্বংসযজ্ঞ পূর্ব বাংলায় একটি রাজনৈতিক বিতর্কের জন্ম দেয়। একদিকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নিজের দোষ ঢাকার জন্য বলেন, 'পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ভারত দ্বারা বিভক্ত পূর্ব বাংলার ধ্বংসলীলা মোকাবেলায় উদাসীনতা ও অবহেলার পরিচয় দিয়েছে।' অন্যদিকে বাঙালি বলে, 'পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ত্রাণসামগ্রী পূর্ব বাংলায় আসার আগেই বহির্বিশ্ব থেকে হেলিকপ্টার, খাদ্য ও অর্থ এসে পৌঁছে, এমনকি ত্রাণের জন্য বরাদ্দ ৪.৪ মিলিয়ন টাকা ঘোষণা করতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার দশ দিন সময় লেগেছে।' এছাড়াও প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে যে, মৃতদের সৎকারের জন্য পাকিস্তানি সৈন্যদের পরিবর্তে তিনি ব্রিটিশ নাবিকদের ব্যবহার করেন।

কিছুদিন পর সাংবিধানিক আইন পরিষদের জন্য পাকিস্তানে নির্বাচন (১৯৭০) অনুষ্ঠিত হবে। পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের আশি শতাংশ ভোট পাওয়ার কথা। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে ঘূর্ণিঝড় দুর্গতদের অবহেলা ও বঞ্চনা করার জন্য অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে পূর্ব বাংলার বাঙালি জনগণের জন্য স্বায়ত্তশাসনের দাবি করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ঘূর্ণিঝড় দুর্গতদের সমস্যা সমাধান করার ব্যর্থতা তাকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে সাহায্য ও বাধ্য করবে। প্রথমবারের মতো ঢাকার পোস্টারে দেখা যায়, 'সব নির্বাচিত সদস্যকে

অবশ্যই রাওয়ালপিন্ডি থেকে নয়, ঢাকা থেকে শাসনকার্য চালাতে হবে।' প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এই বিরোধিতার মোকাবেলায় সতর্ক করে দেন, 'যদি নব নির্বাচিত আইন পরিষদ এমন একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে যা মূলনীতির সঙ্গে অমিল থাকে, তাহলে সামরিক শাসন অব্যাহত থাকবে।' মূল নীতিগুলোর একটি হচ্ছে শুধু পূর্ব বাংলার ক্ষেত্রে সীমিত স্বায়ত্তশাসন স্থাপন করা হবে।



শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



# ১৯৭০-এর নির্বাচন

রাস্তাঘাটে লাউড স্পিকারের সাহায্যে ভ্যান থেকে দীর্ঘ বক্তৃতা প্রচার, সংবাদপত্রে রাজনৈতিক অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ তোলা, সব রকম সহিংসতা প্রতিরোধ করার জন্য সরকার সেনাবাহিনী মোতায়েন–এসব কথা লিখেন গ্যাভিন ইয়্যাং তার প্রতিবেদনে [দি অবজারভার, ৫ ডিসেম্বর ১৯৭০]।

৭ ডিসেম্বর ১৯৭০। পাকিস্তানের ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিন। ২৩ বছরের মধ্যে এই প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৫৬ মিলিয়ন ভোটারের এই নির্বাচন নির্ধারণ করবে সামরিক বাহিনী রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকবে কিনা। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন পূর্ব বাংলা কি নিখিল পাকিস্তান থেকে পৃথক হয়ে যাবে? অবশ্য এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে অনলবর্ষী নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর। তিনি যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে নিখিল পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান হন তাহলে পূর্ব বাংলা পৃথক হবেই, পূর্ব বাংলার বামপন্থি নেতারাও স্বাধীনতার পক্ষেই।

লাহোরের স্বর্ণোদ্যান শহরের এক প্রাসাদোপম বাড়ির ডাইনিং টেবিলে গ্যাভিন ইয়্যাংয়ের কথা হয় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতাকর্মী ও কোটিপতি পাঞ্জাবি তরুণ আর সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর পক্ষে সাধারণ নির্বাচনী প্রচারকর্মী ও উদীয়মান আইনজীবীর সঙ্গে। উভয়ই ক্যামব্রিজে ছিল। তারা তাদের বাড়ির কাজে সাহায্যকারীদের কাছে বামপন্থি প্রচারপত্র বিতরণে ব্যস্ত। তারা ক্লান্ত হাতে মুখে খাবার তুলে নিতে নিতে আলাপে লিপ্ত হয়। ভুট্টোর দলের সঙ্গে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পার্থক্য কী গ্যাভিন ইয়্যাং জানতে চাইলে, ক্লান্ত দৃষ্টিতে তরুণ পাঞ্জাবি বলে, 'অদ্ভুত, ভুট্টো বামপন্থিদের ভক্ত। আমাদের দল অবশ্য মাও সেতুং-এর অনুসারী।' সে শান্তভাবে অ্যাশট্রেতে সিগারেট নিভিয়ে বলে, 'ভুট্টো মুসলমানদের নিয়ে খেলায় মেতে উঠেছেন।' আইনজীবীর দিকে তাকিয়ে আরো বলে, 'শ্রমিকরা এখন যে কাঁচা পাকা দাড়িওয়ালা মৌলভীর দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে আছে তা হয়তো আপনি লক্ষ করেননি।'

আইনজীবী উত্তর দেয়, 'পাকিস্তান এখনও সনাতনপন্থি রাষ্ট্র। ধর্মই পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের মধ্যে সংযোগ সেতু সৃষ্টি করেছে। ইসলাম ও সমাজতন্ত্র ব্যবহার করা তাই যৌক্তিক কৌশল মাত্র। মূল স্রোতের বাইরে বামপন্থি ভোটাররা অনিশ্চিত সিদ্ধান্তে আছে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তারা বুঝতে পারবে যে, তারা কী তাদের মনমতো ফলাফল পেয়েছে।' পাকিস্তানে বামপন্থি রাজনীতি, এক অদ্ভূত ব্যাপার- অপ্রচলিত কিন্তু অনেক ধারায় বিভক্ত, মাওবাদ থেকে সুকর্ণবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত, তবে কখনো কখনো গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে ফিরে আসে। সক্রিয় বামপন্থি নেতারা অবশ্য অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল, কেউই শ্রমজীবী শ্রেণিভুক্ত নন, তবে ইসলামপন্থি দলের বিপক্ষে। আইনজীবী বলে চলে, 'দেখতেই পারছেন একদিকে পূর্ব বাংলার মুজিব বিজয়ের অপেক্ষায়, আর অন্যদিকে ভুট্টো একই সঙ্গে পাঁচটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বিজয়ের আশায়, নির্বাচনী আইন তাকে এ সুযোগ দিয়েছে। বিজয়ী হওয়ার জন্য মুজিব সুনিশ্চিত, কিন্তু চিন্তিত জয়ের পর কী হবে। 'ছয়দফা' প্রস্তাব তাকে পূর্ব বাংলার জন্য স্বায়ত্তশাসন স্পষ্ট করে দিয়েছে।'

'ছয়দফা' পরিকল্পনা হচ্ছে সুকৌশলে স্বাধীনতার সংগ্রামকেই অনিবার্য করে তোলা। 'ছয় দফা'র প্রস্তাবে বলা হয়–

১. দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হবে ফেডারেল শাসনভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘ এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হবে সার্বভৌম।

২. ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থা–এই রকম কয়েকটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকবে, অপরাপর সকল বিষয়ে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা হবে নিরঙ্কুশ।

৩. দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা ব্যবস্থা কেন্দ্রের হাতে থাকবে। কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রের এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকতে হবে যাতে পূর্ব বাংলার মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে না পারে। এ বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে, দুই অঞ্চলেই দুটো পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে এবং পূর্ব বাংলার জন্য পৃথক অর্থনীতি প্রবর্তন করতে হবে।

৪. সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য ও কর আদায়ের সকল ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের কোনো কর ধার্য করার ক্ষমতা থাকবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভেনিউর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে জমা হবে। এ মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের ওপর পরীক্ষামূলক বিধান শাসনতন্ত্রে থাকবে।

৫. ফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলোকে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রের নির্ধারিত হার অনুযায়ী প্রদান করতে হবে। দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর এখতিয়ারাধীন থাকবে। ফেডারেল সরকারের প্রয়োজনীয় বিদেশি মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে আমদানি-রপ্তানি করার অধিকার অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর হাতে ন্যস্ত করে শাসনতন্ত্রে বিধান করতে হবে।

৬. পূর্ব বাংলাকে মিলিশিয়া বা প্যারা-মিলিটারি রক্ষীবাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হবে। পূর্ব বাংলায় অস্ত্র কারখানা নির্মাণ ও নৌবাহিনীর সদর দফতর স্থাপন করতে হবে।'

বাঙালিরা পূর্ব বাংলার আত্মমর্যাদা রক্ষা ও উপনিবেশ ঠেকানোর জন্য আওয়ামী লীগের 'ছয়দফা' প্রস্তাবের ভিত্তিতে পুরোমাত্রায় স্বায়ত্তশাসন চায়। আওয়ামী লীগের জনৈক কর্মী বলেন, 'মনে রাখবেন এই ভোট হচ্ছে সত্যিকার অর্থে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার ভোট। শেখ মুজিব শুধু স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা আটকে রেখেছেন।' শেখ মুজিব অবশ্য 'ছয় দফা' প্রস্তাবের ক্ষেত্রে কোনো আপস করবেন না; বরং রাজস্ব ও বৈদেশিক বাণিজ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রদেশের অধীনে রাখার দাবি করেন। তিনি প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থা–এসব বিষয় কেন্দ্রীয় দুর্বল সরকারের অধীনে রাখার পক্ষে।





'ছয় দফা' প্রস্তাব ভুট্টোসহ বেশির ভাগ পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর মনে ভয়ের জন্ম দিয়েছে। ভুট্টো বলেন, '[...] 'ছয় দফা'র সবকিছু আমি গ্রহণ করতে পারি না।' জাঁদরেল কিন্তু সূক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন সমরনায়ক, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে 'ছয় দফা'র দাবিগুলো গ্রহণযোগ্য নয়; কারণ এতে পাকিস্তানের সংহতি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পাঞ্জাবি-প্রভুত্ব সেনাবাহিনীর কাছে 'ছয় দফা'র দাবিগুলো গৃহীত হয়নি; যদিও তারা পূর্ব বাংলায় গণতন্ত্র চায়, তবে 'ছয় দফা'র ভিত্তিতে নয়। এমন গণতন্ত্র তারা চায় না যে গণতন্ত্র তাদেরকে বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারের প্রতি চিরদিনের জন্য মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। 'ছয় দফা' প্রস্তাব স্বায়ত্তশাসনের কারণে রাজনৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য, যা পূর্ব বাংলার মতো পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশকে অনুপ্রাণিত করতে পারে এবং জাতীয় সংহতি আরও সঙ্কটের মুখে পড়তে পারে। তাই আইনসভার প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার আগেই পাঞ্জাবি সেনাবাহিনীর দাপট বজায় রাখার জন্য পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী অচলাবস্থার সৃষ্টি করে। পাকিস্তানের সমরনায়করা 'ছয় দফা'র প্রস্তাবে নারাজ থাকলেও রাজনৈতিকভাবে ভারতের বিরুদ্ধে একে রক্ষাকবচ হিসেবে অনুমোদন দিতে রাজনীতিবিদরা বাধ্য; কারণ পাকিস্তানের অর্থনীতি নিয়ে বাঙালিরা কিছু করুক তা শাসকগোষ্ঠী চায় না, পাঞ্জাবিরাও না; তবে নবনির্বাচিত আইন পরিষদ যখন নতুন সংবিধান প্রবর্তন করবে তখন বাঙালির সঙ্গে সেনাবাহিনীর সংঘাত ঘটবেই, তা ঘটা স্বাভাবিক। তবে এও সত্য যে, সংবিধান অনুমোদন না করা পর্যন্ত সেনাবাহিনী রাষ্ট্র ক্ষমতা হাতছাড়া করবে না।

গ্যাভিন ইয়্যাং যখন ঢাকার একটি সাদামাটা বাড়িতে শেখ মুজিবুরের সঙ্গে দেখা করতে যান তখন দেখতে পারেন যে, পূর্ব বাংলার উদীয়মান তারকা, অপ্রতিরোধ্য, তীব্রভাষী, অন্তপ্রাণ রাজনীতিবিদ পাইপ দিয়ে তামাক খাচ্ছেন। তার কণ্ঠ ভরাট, চোখ তীব্রভেদী। গ্যাভিন ইয়্যাংয়ের মতে, শেখ মুজিবুর রহমান খুবই গুরুত্বের সঙ্গে ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স, শিপিং জাতীয়করণ করা নিয়ে আলাপ করেন। মুজিব বলেন, 'এতদিন পরে পাকিস্তানের 'উপনিবেশ' হিসেবে পরিচিত পূর্ব বাংলা বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করবে পশ্চিম বাংলার (ভারত) সঙ্গে।' তবে গ্যাভিন ইয়্যাং জানেন না, শেখ মুজিব কী ধরনের প্রধানমন্ত্রী হবেন। অবশ্য তার অনেক সহকর্মীর মধ্যে কেউ কেউ বামপন্থি রাজনীতি থেকে অনেক দূর অবস্থান করেন এবং তাদের দক্ষতা নিয়ে অনেকেই অনিশ্চিত। প্রসঙ্গত 'বাংলার বাঘ' শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার এক মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারে ১৭ মার্চ ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শেখ লুৎফর রহমান ও সাহারা খাতুনের চার কন্যা ও দুই পুত্রের মধ্যে তৃতীয় সন্তান হচ্ছেন তিনি। শেখ মুজিবের শৈশবকাল কাটে টুঙ্গিপাড়ায়। তারপর সাত বছর বয়সে গিমাডাঙ্গা প্রাইমারি স্কুলে পড়াশোনা ও নয় বছর বয়সে গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৪ বছর বয়সে বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তার লেখাপড়ায় সাময়িক বিরতি ঘটে। চার বছর শিক্ষাজীবন ব্যাহত হওয়ার পর শেখ মুজিব পুনরায় স্কুলে ভর্তি হন। ১৮ বছর বয়সে বঙ্গবন্ধু ও বেগম ফজিলাতুন্নেছার বিয়ে সম্পন্ন হয়। তারা দুই কন্যা শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা ও তিন পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শেখ রাসেলের জনক-জননী। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে শেখ মুজিব নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগদান করেন এবং এক বছরের জন্য বেঙ্গল

মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে পদার্পণ করলে মুসলিম লীগের কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতাস্থ 'ফরিদপুর ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন'-এর সম্পাদক ও ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন। ১১ মার্চ ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাষার দাবিতে ধর্মঘট পালন করার সময় বঙ্গবন্ধু সহকর্মীদের সঙ্গে সচিবালয়ের সামনে বিক্ষোভরত অবস্থায় গ্রেফতার হন এবং ১৫ মার্চ মুক্তি পান। ১৮ এপ্রিল ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন জানিয়ে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে ধর্মঘট করার সময় তিনি গ্রেফতার হন এবং জুলাই মাসের শেষের দিকে মুক্তিলাভ করেন। সেপ্টেম্বরে ১৪৪ ধারা ভাঙার দায়ে গ্রেফতার হন এবং পরে মুক্তিলাভ করেন। ১৪ অক্টোবর ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের আগমন উপলক্ষে আওয়ামী মুসলিম লীগ ভুখা মিছিল বের করার সময় শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হন এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর জেল থেকে মুক্তিলাভ করেন। ডিসেম্বরে তিনি পিকিং-এ বিশ্বশান্তি সম্মেলনে যোগদান করেন। ৯ জুলাই ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে তিনি দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন। পাকিস্তান গণপরিষদের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগকে পরাজিত করার লক্ষ্যে মাওলানা ভাসানী, এ কে ফজলুল হক ও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে ঐকমত্য ঘটলে ১৪ নভেম্বর দলের বিশেষ কাউন্সিল ডেকে যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১০ মার্চ ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ২৩৭টি আসনের মধ্যে ২২৩টিতে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে (আওয়ামী লীগ-১৪৩টি)। বঙ্গবন্ধু গোপালগঞ্জের আসনে মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা ওয়াহিদুজ্জামানকে ১৩ হাজার ভোটে পরাজিত করে নির্বাচিত হন। ১৫ মে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গবন্ধু প্রাদেশিক সরকারের কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব লাভ করে। ৩০ মে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করে দিলে বঙ্গবন্ধু করাচি থেকে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার হন এবং ২৩ ডিসেম্বর ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিলাভ করেন। ৫ জুন ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গবন্ধু গণপরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ১৭ জুন ১৯৫৫ ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভায় বঙ্গবন্ধু আবারও পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানান এবং ২১ দফা ঘোষণা করা হয়। ২৩ জুন ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে আওয়ামী লীগের কার্যকরী পরিষদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন প্রদান না করা হলে দলীয় সদস্যরা আইনসভা থেকে পদত্যাগ করবেন। ২৫ আগস্ট ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'স্যার আপনি দেখবেন ওরা পূর্ব বাংলা নামের পরিবর্তে পূর্ব পাকিস্তান নাম রাখতে চায়। আমরা বহুবার দাবি জানিয়েছি যে, আপনারা এটাকে বাংলা নামে ডাকেন। বাংলা শব্দটার একটি নিজস্ব ইতিহাস আছে, এর একটা ঐতিহ্য আছে। আপনারা এই নাম আমাদের জনগণের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে পরিবর্তন করতে পারেন। আপনারা যদি এই নাম পরিবর্তন করতে চান তাহলে আমাদের বাংলায় আবার যেতে হবে এবং সেখানকার জনগণের কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে তারা নাম পরিবর্তন মেনে নেবে কিনা। এক ইউনিটের প্রশ্নটা গঠনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আপনারা এই প্রশ্ন এখনই কেন তুলতে চান? বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার





ব্যাপারে কি হবে? যুক্ত নির্বাচনী এলাকা গঠনের প্রশ্নেরই কি সমাধান? আমাদের স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধেই বা কি ভাবছেন? পূর্ব বাংলার জনগণ অন্যসব প্রশ্নের সমাধানের সঙ্গে এক ইউনিটের প্রশ্নটাকে বিবেচনা করতে প্রস্তুত। তাই আমি আমার এই অংশের বন্ধুদের কাছে আবেদন জানাবো তারা যেন আমাদের জনগণের 'রেফারেন্ডাম' অথবা গণভোটের মাধ্যমে দেওয়া রায়কে মেনে নেন।'

২১ অক্টোবর ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি প্রত্যাহার করা হয় এবং বঙ্গবন্ধু পুনরায় দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন। ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে খসড়া শাসনতন্ত্রে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তির দাবি জানান। ১৪ জুলাই আওয়ামী লীগের সভায় প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধিত্বের বিরোধিতা করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ৪ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে খাদ্যের দাবিতে ভুখামিছিল বের করা হয়। চকবাজার এলাকায় পুলিশ ভুখামিছিলের ওপর গুলিবর্ষণ করলে তিনজন নিহত হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু কোয়ালিশন সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ এইড দফতরের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন। ৩০ মে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে আওয়ামী লীগকে সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শেখ মুজিব মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। ৭ আগস্ট ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নে সরকারি সফরে যান। ৭ অক্টোবর ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক শাসন জারি হওয়ার পর রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। তারপর ১১ অক্টোবর বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার ও একের পর এক মিথ্যা মামলা দায়ের করে হয়রানি করা হয়। প্রায় চৌদ্দ মাস জেলে থাকার পর তাকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় জেলগেটেই গ্রেফতার করা হয়।

৭ ডিসেম্বর ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে তিনি হাইকোর্টে রিট আবেদন করে মুক্তিলাভ করেন। সামরিক শাসন ও আইয়ুববিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু গোপনে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যান। এই সময় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য বিশিষ্ট ছাত্র নেতৃবৃন্দের দ্বারা 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' নামে একটি গোপন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গবন্ধুকে জননিরাপত্তা আইনের আদলে গ্রেফতার করা হয় এবং ১৮ জুন চার বছরের সামরিক শাসন অবসান (২ জুন) হওয়ার পর তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। ২৫ জুন বঙ্গবন্ধুসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দ আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যৌথ বিবৃতি দেন। ৫ ও ২৪ জুলাই বঙ্গবন্ধু পল্টনের জনসভায় আইয়ুব সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন। ২৪ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু লাহোরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তারপর শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে বিরোধী দলীয় মোর্চা 'জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট' গঠিত হলে তিনি এর পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে পূর্ব বাংলায় গণসংযোগের কাজে লিপ্ত হন। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে সোহরাওয়ার্দী অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য লন্ডন আসেন। তখন বঙ্গবন্ধু তার সঙ্গে পরামর্শের জন্য এখানে আসেন। তারপর সোহরাওয়ার্দী বৈরুতে দেহত্যাগ করেন (৫ ডিসেম্বর)। ২৫ জানুয়ারি ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গবন্ধু তার বাসভবনে এক সভা ডেকে

আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করার আহ্বান জানান। এই সভায় দেশের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটের মাধ্যমে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবিসহ সাধারণ মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ের প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন। ১১ মার্চ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে 'সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ' গঠন হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়। দাঙ্গার পর, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ১৪ দিন পূর্বে, আইয়ুববিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও আপত্তিকর বক্তব্য প্রদানের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয় এবং পরে তাকে এক বছর কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে হাইকোর্টের নির্দেশে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে তিনি মুক্তিলাভ করেন। ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে লাহোরে বিরোধী দলসমূহের জাতীয় সম্মেলনের নির্বাচনী কমিটিতে বঙ্গবন্ধু 'ছয় দফা' প্রস্তাব পেশ করেন। ১ মার্চ বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন। পরে তিনি 'ছয়দফা' পরিকল্পনার পক্ষে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ব বাংলায় গণসংযোগ শুরু করেন। এই সময় তাকে সিলেট, ময়মনসিংহ ও ঢাকা কয়েকবার (বছরের প্রথম তিন মাসে আট বার) গ্রেফতার করা হয়। ৮ মে নারায়ণগঞ্জ পাটকলের শ্রমিকদের জনসভায় বক্তৃতা শেষে তাকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়। ৭ জুন বঙ্গবন্ধু ও আটক নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে পূর্ব বাংলায় ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘটের সময় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গীতে পুলিশের গুলিতে শ্রমিকসহ বেশ কয়েকজন নিহত হন। ৩ জানুয়ারি ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে এক নম্বর আসামি করে মোট ৩৫ জন বাঙালি সেনা ও সিএসপি অফিসারদের বিরুদ্ধে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' করে। ১৭ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেওয়া হলেও পুনরায় জেল গেটেই গ্রেফতার করা হয়। তারপর ঢাকা সেনানিবাসে আটকে রাখা হয়। বঙ্গবন্ধুসহ 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র অভিযুক্ত আসামিদের মুক্তির দাবিতে পূর্ব বাংলায় বিক্ষোভ শুরু হয়। ১৯ জুন ঢাকা সেনানিবাসে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র আসামিদের বিচারকার্য শুরু হয়। পরে তিনি মুক্তিলাভ করেন।

শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করার পর গ্যাভিন ইয়্যাং যান ভুট্টোর সঙ্গে দেখা করতে। তার কাছে রহস্যাবৃত একমাত্র ভোটপ্রার্থী ভুট্টোকে মনে হয় তিনি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন ব্যক্তি, তবে সৌজন্যপ্রিয় ও বর্ণিল। তার মধ্যে আভিজাত্যের প্রভাব প্রকট। তার অনুসারীদের হাস্যোজ্জ্বলভাবে দলীয় ক্যাপ ও পতাকা নিয়ে মিছিল করে, তবে তাদের কর্মকাণ্ড সিন্ধু প্রদেশেই সীমিত। ভুট্টো তার দলের পক্ষে সমর্থন বৃদ্ধি করার চেষ্টায় অঙ্গিকারবদ্ধ। পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কিছু অনুসারী অর্জন করেন। তিনি চাষীদের মধ্যে ভূমি বণ্টন ও ভূস্বামীদের প্রাধান্য খর্ব করতে চান। পাকিস্তানে পুঁজিতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র পরস্পর বিপরীত অবস্থানে থাকায় ভুট্টোর পদক্ষেপ দ্বিধাগ্রস্তভাবে চাষীদের ঐক্যবদ্ধ করবে।

জুলফিকার আলী ভুট্টো ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে লারকানার এক বিখ্যাত ও ঐতিহ্যবাহী সিন্ধি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা স্যার শাহ নেওয়াজ খান। শাহ নেওয়াজ খান বোম্বে





সরকারের একজন মন্ত্রী ছিলেন। তিনি ১৯৩০-এর দশকে বোম্বে প্রেসিডেন্সি থেকে সিন্ধুকে পৃথক করার আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। তিনি তার সন্তানকে উচ্চশিক্ষা প্রদান করার জন্য ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি ভর্তি করেন। সেখান থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে ভুট্টো অক্সফোর্ডের ক্রাইস্ট চার্চ থেকে জুরিসপ্রবডেন্সে এম এ সম্মান লাভ করেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে লিংকনস-ইন থেকে আইন পাস করেন। সাউথ হ্যাম্পটন ইউনিভার্সিটিতে প্রভাষক হিসেবে কিছুকাল কাটান। তারপর তিনি পাকিস্তানে আইন ব্যবসার মাধ্যমে জনজীবনে অনুপ্রবেশ করেন। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে আইয়ুব সরকারের বাণিজ্য বিষয়ক ও পরে কাশ্মির বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করার পর চীনের সঙ্গে সুসম্পর্ক নির্মাণ করে ভারতের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতের ওকালতি করেন। তিনি কট্টর আমেরিকানবিরোধী ছিলেন।

গ্যাভনি ইয়্যাং ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সঙ্গে দেখা করতে যান আধুনিক ও অসমাপ্ত রাজধানী ইসলামাবাদে। গ্যাভনি ইয়্যাং বলেন, 'অতীতের ব্যর্থতা, বর্তমানের নিঃসঙ্গতা ও ভবিষ্যতের পরিত্যাজ্য প্রতীক আইয়ুব তার বাসার বাগানে বসে রোদ মাখতে মাখতে চা পান করছিলেন। ভুট্টোসহ তার বন্ধুরা ও শুভার্থীরা তাকে পরিত্যাগ করেছে।' প্রসঙ্গত আইয়ুব খান ১৪ মে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের হরিপুর জেলার রেহানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতিতে পাঠান। তার শিক্ষাজীবন শুরু হয় সারাই সালেহ স্কুলে, তারপর হরিপুরে। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন, কিন্তু লেখাপড়া শেষ না করেই রয়েল মিলিটারি একাডেমিতে ভর্তি হন। তিনি ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কমান্ডার ইন চিফ হন। তারপর মির্জাকে ক্ষমতাচ্যুত করে তিনি পাকিস্তানের প্রথম সামরিক শাসক হন। তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে রাখেন ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে গণভোটের মাধ্যমে তিনি পাকিস্তানের ৯৫.৬ ভাগ ভোট পান। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে তিনি জন এফ কেনেডির স্ত্রীর সঙ্গে ভালোবাসার বাঁধনে বন্দি হন। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে আইয়ুব খানের পতন ঘটে পূর্ব বাংলার গণআন্দোলনের কারণে।

ভুট্টো এবং পাকিস্তানের বামপন্থি দলের জন্য ১৯৭০-এর নির্বাচনে ক্ষমতালাভের কোনো সম্ভাবনা নেই; কিন্তু পাশ্চাত্যবিরোধী মনোভাব এবং পিকিং প্রীতি বামপন্থিদের জন্য পাকিস্তান উর্বর ভূমিতে পরিণত হয়। অবশ্য নির্বাচন পরবর্তী সময় বামপন্থি নেতাদের জন্য বিপদের সম্ভাবনা আশঙ্কা করা যায়, জাতীয় রাজনীতি থেকে তাদের অনেক দূর সরে পড়তে হবে। যদি ইয়াহিয়া খানের শক্তিশালী ব্রিগেড আবার ক্ষমতা দখল করে নেয় তাহলে মুজিব, ভুট্টো এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বহুল প্রতীক্ষিত রাজনৈতিক স্বাধীনতা না পেয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং গৃহযুদ্ধ বেছে নিতে বাধ্য হবেন।

৭ ডিসেম্বর ১৯৭০। রাওয়ালপিন্ডি, করাচি, পেশওয়ার ও পাঞ্জাবের গ্রামাঞ্চলে বিচ্ছিন্ন সংঘাতের কিছু ঘটনা ছাড়া নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তানের প্রথম অবাধ নির্বাচনে একক নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং পূর্ব বাংলার বাঙালি জাতীয়তাবাদী নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও গরিব মানুষের কোটিপতি নেতা জুলফিকার

আলী ভুট্টো ইসলামিক সমাজতন্ত্রের ব্যানারে তার নির্বাচনী প্রচারাভিযান চালিয়ে ও ভারতের সঙ্গে এক হাজার বছর যুদ্ধ করার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়ে পাঞ্জাব ও সিন্ধু অঞ্চলে আসন লাভ করেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলেও তিনি সমর্থন অর্জন করেন।'

সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করায় পাকিস্তান সরকার যে ব্যক্তিকে বিশ্বাসঘাতক বলে উল্লেখ করেছিল, সেই ব্যক্তিই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম স্থান অধিকার করেন। শেখ মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলে দিল্লির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন এবং পাকিস্তানকে সিয়োটা ও সেন্টো চুক্তি থেকে প্রত্যাহার করবেন।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ভারতবর্ষ বিভাজনের পর থেকেই কার্যত পাকিস্তানের উপনিবেশ হিসেবে পূর্ব বাংলা বিবেচিত হয়ে আসে। কিন্তু এই প্রথমবার সরকার গঠনে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিরা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। তারা অযোগ্য রাজনীতিবিদ ও হাকারী জেনারেলদের বিরুদ্ধে জবাব দেয়। অবশ্য বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ তাদের ক্ষমতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও স্বায়ত্তশাসনের পক্ষের শক্তি হিসেবে দলটির জনপ্রিয়তা সৃষ্টি হওয়ার প্রধান কারণ। আওয়ামী লীগের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী পিকিংপন্থি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করায় শেখ মুজিবের রাজনৈতিক মাঠ শক্তিশালী হয়। অবশ্য পিকিংপন্থি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ঘূর্ণিঝড় দুর্গত এলাকায় বাতিল হওয়া নির্বাচনের নয়টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

তবে আশা করা হয়েছিল যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে কাউন্সিল মুসলিম লীগ, কিন্তু মিয়া মুমতাজ দৌলতানার এই দলটি ভরাডুবি যায়; ৫০টি আসনে প্রতিযোগিতা করলেও মাত্র ৭টিতে জয়লাভ করে। ডান-কট্টর-পন্থি দল জামায়াতে ইসলামীর শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়, আর ধর্মীয়-বামদল হাজারভি জামায়াতে-উলামা পাঁচটি আসনে বিজয়ী হয়।

নির্বাচনে অংশ নেওয়া অন্য ২৩টি দলের প্রার্থীরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন, এদের মধ্যে আছেন আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে সংঘটিত গণআন্দোলনের নেতা ও বিমান বাহিনীর সাবেক প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল আসগর খান। তিনি পিপলস পার্টির প্রার্থী হিসেবে রাওয়ালপিন্ডিতে পরাজিত হন। অন্যদিকে কিছু কিছু নেতা আবার নিজ যোগ্যতায় স্ব স্ব অঞ্চলে জয়ী হন; যেমন পাকিস্তান গণতন্ত্রী দলের নেতা নূরুল আমীন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মিয়া মুমতাজ দৌলতানা, আবদুল ওয়ারি খান প্রমুখ।

১৯৭০-এর জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, মোট ৩১৩টি (মহিলা ১৩টি) আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি (পূর্ব বাংলার ১৬৯টি আসনের মধ্যে মাত্র দুটো আসনের একটিতে পাকিস্তান গণতন্ত্রী দলের নেতা নূরুল আমীন ও অন্যটিতে রাজা ত্রিদিব রায় নির্বাচিত হন), পাকিস্তান পিপলস পার্টি (ভুট্টো) ৮৮টি, মুসলিম লীগ (কাইয়ুম )৯টি, মুসলিম লীগ (কাউন্সিল) ৭টি, মুসলিম লীগ (কনভেনশন) ২টি, ন্যাপ (ওয়ালী) ৭টি, জামায়াতে ইসলামী ৪টি, জামায়াতে-ওলেমা ৭টি, জামায়াতে-ওলেমা (থানভি) ৭টি, পিডিপি ১টি ও স্বতন্ত্র ৭টি আসন লাভ করে।





১৯৭০-এর পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফলে দেখা যায় আওয়ামী লীগ (মুজিব) ২৯৮টি (১০টি মহিলা), পিডিপি ২টি, ন্যাপ (ওয়ালি) ১টি, জামায়াতে ইসলামী ১টি ও স্বতন্ত্র ৭টি আসনে জয়লাভ করে। জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে। পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে ভুট্টোর দল, বেলুচিস্তানে ন্যাপ (ওয়ালি) এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে ন্যাপ (ওয়ারি) ও জামায়াতে-ওলেমা (থানভি) কোয়ালিশন সরকার গঠন করার মতো অবস্থান সৃষ্টি করতে পারেনি বলে জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় পাকিস্তানের জনগণের মনে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল তা কিছুটা হলেও স্থিতিশীল হয়, কিন্তু রাজনৈতিক জটিলতা বৃদ্ধি পায়। পাকিস্তানের নবনির্বাচিত সাংসদকে জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার ১২০ দিনের মধ্যে একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে, তবে নির্বাচনের ফলাফল ও সাংবিধানিক সংসদের চেহারা যেমন হয় এতে সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া বেশি দূর অগ্রসর হবে না। অবশ্য রাজনৈতিক নেতারা যদি নিজের স্বার্থে নতুন সংবিধান প্রণয়নে সম্মত হন তাহলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে রাজনৈতিক দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে নেওয়া সম্ভব। অবশ্য ভুট্টো ও মুজিব নির্বাচনের আগে সংবিধান প্রণয়নের বিষয়ে তাদের বিভক্তি ছিল অতি অল্প, উভয় নেতাই সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে আপস করতে আগ্রহী ছিলেন; কিন্তু নির্বাচনের দুই দল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি, বরং এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। তবে পূর্ব বাংলার নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আঞ্চলিক স্বাযত্তশাসন আদায়ের জন্য উপযুক্ত সংবিধানের জন্য লড়বেন। শেখ মুজিব অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থা–এই বিষয়গুলোতে সীমাবদ্ধ রেখে ও অন্যসব ক্ষমতা প্রাদেশিক পরিষদের অধীনে ছেড়ে দিয়ে একটি সংবিধান প্রণয়ন করতে চান। তিনি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার সুযোগ-সুবিধা শুনিশ্চিত করতে চান। এমনকি পাকিস্তানের শত্রুভাবাপন্ন রাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে সহজেই বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করতে চান। ভুট্টো অবশ্য ক্ষমতাসীন কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে। তিনি চান অর্থনৈতিক ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়গুলো কেন্দ্রের অধীনে রাখতে। ভুট্টো পূর্ব বাংলার অধিকার আদায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ায় শেখ মুজিবের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছানো অসম্ভব হবে। এই দুই নেতা যে দুই অংশের প্রতিনিধিত্ব করছেন সেই দুই অংশের ভৌগোলিক দূরত্বের চেয়ে তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ অনেক বেশি।

# সহিংসতা ও সঙ্কট

উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ :

- ৩ জানুয়ারি ১৯৭১। রেসকোর্সের জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জনপ্রতিনিধিদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যরা 'ছয় দফা'র ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা এবং জনগণের প্রতি আনুগত্য থাকার শপথ গ্রহণ করেন।

- ৫ জানুয়ারি ১৯৭১। পাকিস্তানের পশ্চিমাংশের সর্বাধিক আসন লাভকারী পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠনের তার সম্মতির কথা ঘোষণা করেন। জাতীয় পরিষদের এক বৈঠকে বঙ্গবন্ধু পার্লামেন্টারি দলের নেতা নির্বাচিত হন।

- ২৮ জানুয়ারি ১৯৭১। কাশ্মীরের দুজন মুক্তিযোদ্ধা একটি ভারতের অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী বিমানের গতি পরিবর্তন করে লাহোরে নিয়ে আসে। ২ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বোমা দিয়ে বিমানটি ধ্বংস করা হয়। বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনাকে ভুট্টোসহ পাকিস্তানের অনেক নেতা সমর্থন করলেও ভাসানী, মুজিবসহ পূর্ব বাংলার নেতারা নিন্দা জ্ঞাপন করেন। ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ভারতের আকাশসীমার ওপর দিয়ে পাকিস্তানের সামরিক ও বেসামরিক বিমান চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

- ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার আহ্বান জানান।

- ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১। ভুট্টো ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে অংশগ্রহণ না করার ঘোষণা দিয়ে দুই প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ দুই দলের প্রতি ক্ষমতা হস্তান্তর করার দাবি জানান।

- ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১। ভুট্টোর দাবির তীব্র সমালোচনা করে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'ভুট্টো সাহেবের দাবি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ক্ষমতা সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের কাছেই হস্তান্তর করতে হবে। ক্ষমতার মালিক এখন পূর্ব বাংলার জনগণ।'

১৯৭০-এর বন্যায় পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর অমনোযোগিতাই ডিসেম্বরের নির্বাচনে তাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত অভিমত প্রকাশ পায়। জাতীয় নির্বাচনে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পরাজিত হওয়ার পরও তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলে রাখতে বদ্ধপরিকর এবং নির্বাচন পরবর্তী আলোচনায় পূর্ব বাংলার ন্যায্য দাবি মেনে নিতে রাজি নয়। এ কারণেই বাঙালির মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব বৃদ্ধি পায়। আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ও পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টোর মধ্যে যে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয় এতে পাকিস্তানের দুই অংশ বিভক্ত হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এই বিভক্তি ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে ঠেকানোর জন্য পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তার সেনাবাহিনী দিয়ে পূর্ব বাংলা থেকে ১,২০০ মাইল দূরে অবস্থিত সেনা ঘাঁটি থেকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করে। কারণ পূর্ব বাংলা স্বাধীন হলে পাকিস্তানের পশ্চিমাংশের যে যে অঞ্চলে অর্থনৈতিক





অবস্থা অসচ্ছল সেসব স্থানে একইভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলন সৃষ্টি হতে কতক্ষণ। অন্যদিকে শেখ মুজিব জানেন যে–

'বাংলাদেশ' স্বাধীন হলে তার ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার করা কঠিন হবে।

পূর্ব বাংলার ঘটনাবলি ভারতের অঙ্গরাজ্য পশ্চিম বাংলায় গভীরভাবে প্রভাব ফেলায় মার্কসবাদী নেতা জ্যোতি বসু তার নিজস্ব 'ছয় দফা'র দাবি উত্থাপন করে দিল্লি থেকে পৃথক হওয়ার ঘোষণা করেন।

পূর্ব বাংলা যখন সঙ্কটের মুখে তখন পশ্চিম বাংলায় নির্বাচনের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক সরকার গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক। দুই বাংলার মধ্যে ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি দিল্লিকে চিন্তিত করে। চিন্তিত করে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার রাজনীতি নিয়েও। পূর্ব বাংলার আওয়ামী লীগ বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও আঞ্চলিকতাবাদে বিশ্বাসী; আর পূর্ব বাংলার আওয়ামী মুসলিম লীগ (নিষিদ্ধ পাকিস্তান কম্যুনিস্ট পার্টির বিকল্প ধারা) মাওবাদী সংগঠন; এর কর্মকাণ্ড ছাত্র, ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষকদের মধ্যে বিস্তৃত। পশ্চিম বাংলার 'কম্যুনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া' (মার্কসবাদী) নির্বাচনে বিজয়ী হবেই। উভয় বাংলায় একই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার লক্ষ্যই হচ্ছে তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে গিয়ে এক রকম হতাশা ও স্থবিরতা সৃষ্টি করা। মিসেস গান্ধী ভারতের আঞ্চলিকতাবাদ ও সমন্বয়হীনতার প্রবণতাকে পাল্টে দিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। এছাড়া চীন বর্তমান উভয় বাংলার পরিস্থিতিতে নিজেদের সুবিধা লুটে নিতে ব্যস্ত, যদিও পূর্ব বাংলার পরিস্থিতির দৃশ্যপট থেকে পিকিং দূরে অবস্থান নিতেই বাধ্য। পাকিস্তানেরর কোনো অংশ চীনের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখবে তাই মূল প্রশ্ন। বাঙালির ভাবভঙ্গি–'কিছুই মেনে নিতে চাই না'। বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়ন সমর্থিত ভারতের কাছ থেকে সাহায্য পেলে কাশ্মীর বিতর্ক থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করবে। আবার বিভক্ত পাকিস্তানের এক অংশ কাশ্মীর বিতর্ক নিয়ে চীনের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য অভিন্নমত প্রকাশ করে এবং অন্য অংশ পশ্চিম বাংলার সঙ্গে পৃথক থাকার জন্য চীনের সঙ্গে সহযোগিতা করার কথা বলে। ভারত ও ভারতবর্ষের সাগর অঞ্চলের জন্য রাশিয়া ও চীনের মধ্যকার প্রতিযোগিতা বাংলা সমস্যার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

সমগ্র বাঙালি জনগোষ্ঠীর পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীকে 'জাহান্নামে যাও' বলে বিদায় করতে বদ্ধপরিকর, কিন্তু তাকে যুক্ত পাকিস্তানের জন্য শেষ চেষ্টা চালাতে হবে।

পাকিস্তানের অবহেলিত উপনিবেশ বলে পরিচিত পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের সমরনায়কদের অধীন থেকে শোষণ মুক্ত করতে স্বায়ত্তশাসনই একমাত্র উপায়। তাই তাকে নিখিল পাকিস্তানের জন্য সংবিধান প্রণয়ন করতে পূর্ব বাংলার জন্য স্বায়ত্তশাসনের রূপরেখা দিতে হবে।

স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে মুজিব বলেন, 'ভারতবর্ষ বিভাজনের আগে যখন ভারতবর্ষীয় মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করা হচ্ছিল তখনই পূর্ব বাংলার জন্য স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে পূর্ব বাংলাকে 'প্রতারণা' করা হয়। তিনি আরও বলেন, 'মার্চ (১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে) মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাবে 'স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ'-এর কথা বলা হয়।

পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিমাংশের কাছে একটি গ্রহণযোগ্য সংবিধানের রূপরেখা প্রণয়নের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে বাঙালি জাতীয়তাবাদী নেতা শেখ মুজিবুর রহমান, সিন্ধি মুকুটহীন সম্রাট সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং নিখিল পাকিস্তানের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ওপর। ভুট্টো এবং মুজিব উভয়ই সংবিধান প্রণয়নের ব্যাপারে আপস-মিমাংসায় পৌঁছবেন বলে ১৩ কোটি পাকিস্তানির প্রত্যাশা, কারণ উভয় নেতাই জনগণকে নিশ্চয়তা প্রদান করেন, তবে তারা সংবিধানের মৌলিক কাঠামো নিয়ে পরস্পর বিপরীত অবস্থানে। মূলত উভয় নেতাই মনে করেন যে, নিজেদের অবস্থান থেকে সরে এলে তাদের নিজ নিজ জনগোষ্ঠীর প্রত্যাশা মতো সংবিধান প্রণয়ন করা সম্ভব হবে না। ১৩ কোটি পাকিস্তানির প্রত্যাশা অনুযায়ী সংবিধান প্রণয়ন করতে হলে বৈদেশিক বাণিজ্য ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে উভয় নেতার ঐকমত্যে পৌঁছানো আবশ্যক, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় না প্রাদেশিক সরকারের অধীনে এসব থাকবে। এই দুই বিষয়ের সঙ্গে অবশ্য জড়িত ইন্দো-পাকিস্তান সম্পর্ক ও কাশ্মীর প্রসঙ্গ, এখানেই তারা পরস্পর বিপরীত অবস্থানে আছেন। এছাড়াও উভয় নেতাই জানেন যে, রাজস্ব বা বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তারা যদি ছাড় দেন তবে তাদের নিজ নিজ রাজনৈতিক অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়বে।

রাজস্ব ক্ষেত্রে সমস্যার কারণ ৩১০ হাজার বর্গমাইল এলাকার ৫৭ মিলিয়ন মানুষের পাকিস্তানের পশ্চিমাংশে ৫০ ও ৬০ দশকে নাটকীয়ভাবে উন্নতি ঘটে আর ৫৫ হাজার বর্গমাইল এলাকা নিয়ে গঠিত জলাবদ্ধ, পৃথিবীর পশ্চাদপদ ঘনবসতি, পূর্ব বাংলা ৭৩ মিলিয়ন মানুষ নিয়ে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়ে। শুধুমাত্র পূর্ব বাংলার ওপর নির্ভর করে পাকিস্তানের উন্নয়ন ঘটে; আর কাশ্মীর প্রসঙ্গে ভারতের সঙ্গে সংঘাত ঘটিয়ে পাকিস্তানের অর্থ শুধুমাত্র পশ্চিমাংশে ব্যয় করা হয়। কাশ্মীরিরা নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করার অধিকার থাকলেও পূর্ব বাংলার অর্থ ব্যয় করার অধিকার তাদের নেই। পূর্ব বাংলা থেকে আদায়কৃত রাজস্বের ৭০ ভাগ সেনাবাহিনী, পররাষ্ট্র ও মুদ্রাবিনিময়ে ব্যবহার করা শাসকগোষ্ঠীর অন্যায়। একদিকে কাশ্মীর প্রসঙ্গে ভারতের বিরুদ্ধে সংঘাতে নিয়োজিত থাকা ৩০০ হাজার সৈন্যের সেনাবাহিনীকে পোষার জন্য কেন পূর্ব বাংলা থেকে সংগ্রহ করা রাজস্ব ব্যয় করা হবে–এই প্রশ্নটিই বাঙালির মনে জেগে ওঠে; আর অন্যদিকে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর মন্তব্য যে, কাশ্মীর প্রসঙ্গ পূর্ব বাংলা কখনই সংশ্লিষ্ট বোধ করেনি। কাশ্মীরে বিপুল পরিমাণের সেনা মোতায়েনে পাকিস্তানের মোট বাজেটের অর্ধেক, প্রতিরক্ষা বাজেটে শতকরা ৫০ ভাগ খরচ হয়। পাঞ্জাবিরা বলে, 'আমরা পাঞ্জাবিরা কাশ্মীর নিয়ে অনেক রক্ত দিয়েছি এবং ভুট্টো যদি কাশ্মীর নিয়ে ভারতের কাছে কোনো ছাড় দেন, তবে তাকে প্রাণ দিতে হবে।' ভুট্টো অবশ্য বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার তার অর্থনৈতিক সমর্থনের জন্য





প্রাদেশিক সরকারের ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে না।' পাঞ্জাবই 'ছয় দফা' প্রস্তাবের রাজস্ব ফর্মুলার বিরোধিতা করে আসে। কারণ পূর্ব বাংলা যদি প্রতিরক্ষা খাতে অবদান রাখতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে কাশ্মীর প্রসঙ্গে মুলতবি টানা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। 'ছয় দফা'র রাজস্ব ফর্মুলা কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ তহবিলে অর্থ জোগান দেবে না। 'ছয়দফা' প্রস্তাব অনুযায়ী ভবিষ্যতে সৈন্যবল বৃদ্ধির খাতে, প্রত্যেক প্রদেশের অর্থ নিজ প্রদেশেই খরচ করার কথা। শেখ মুজিব অবশ্য ইয়াহিয়ার সঙ্গে একমত যে, প্রাদেশিক রাজস্বের আনুপাতিক হারে একটি অংশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করা। একথা মেনে নিলে মুজিবকে পাঞ্জাবে বিপুল পরিমাণে সেনা মোতায়েন করতে হবে, এতে অবশ্য 'ছয়দফা' প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে বাধ্য।'

বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমস্যার কারণ ভারতের সঙ্গে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের যুদ্ধের পর থেকে বন্ধ হয়ে যাওয়া বাণিজ্য সম্পর্ক পুনঃস্থাপনে পূর্ব বাংলা খুবই আগ্রহী। কারণ ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চীন থেকে টনপ্রতি ১৭২ রুপি হারে পূর্ব বাংলাতে কয়লা কিনতে হয়। একই পরিমাণের কয়লা যদি ভারত থেকে ক্রয় করা হতো তাহলে ৫০ রুপি খরচ পড়ত। শেখ মুজিব জাতীয় পরিষদে অংশগ্রহণ করলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে সংবিধানকে পরিচালিত করতে সক্ষম হবেন। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তিনি আওয়ামী লীগের নির্বাচনী অঙ্গিকার প্রত্যাহার করতে পারেন না। সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভুট্টো বাণিজ্য প্রসঙ্গে আপস করতে চান না, বরং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, 'ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক ততদিনই অস্বাভাবিক থাকবে যতদিন পর্যন্ত ভারত অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করার আগে কাশ্মীর বিতর্কের সমাধান না করে।' তিনি আরও বলেন, 'ছয় দফা কাশ্মীর বিতর্ককে চিরকালের জন্য ভারতের পক্ষে নিয়ে যাবে।' তিনি ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী হবেন যদি ভারত কাশ্মীর বিতর্কের সমাধান 'পর্যায়ক্রমে' করতে রাজি হয় এবং মুজিবুর রহমান কাশ্মীর বিতর্ককে একটি জাতীয় ইস্যুতে পরিণত করেন। তবে পাঞ্জাবিরা মনে করে, 'কাশ্মীর বিতর্কের সমাধান না করেই ভারতের সঙ্গে পূর্ব বাংলা বাণিজ্য সম্পর্ক পুনরায় স্থাপন করবে এবং বৈদেশিক বাণিজ্য যদি প্রদেশের অধীনে থাকে তাহলে ভুট্টোকে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের নীতিই মেনে নিতে হবে।' অন্যদিকে ভারতের মানুষ পাকিস্তানের অস্তিত্ব নিয়েই উগ্র মন্তব্য করে, তবে তারা পাকিস্তানকে দুটো পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে আগ্রহী। তারা এও বিশ্বাস করে যে, পূর্ব বাংলা যদি স্বাধীন হয় তাহলে তার অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটবে। বাস্তবে স্বাধীন পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ম্লান হবে। পূর্ব বাংলার বৈদেশিক আয় পাকিস্তানের পশ্চিমাংশের তুলনায় বেশি হলেও স্বাধীন হওয়ার পর আর এ রকম থাকবে না। পূর্ব বাংলার চাইতে পাকিস্তানের পশ্চিমাংশে সার্থক শিল্পপায়ন ঘটানো হয়। 'উপনিবেশিক শোষণের ক্ষেত্রে' পূর্ব বাংলার শিল্প প্রায় পুরোপুরি পাটের ওপর নির্ভরশীল। এর সঙ্গে পূর্ব বাংলার জনসংখ্যা বিস্ফোরণ নির্মম আকার ধারণ করবে। ১৯৭১-এর হিসাব অনুযায়ী, প্রতি বর্গমাইলে ১,৩০০ জন মানুষ বসবাস করে। প্রতি বছর পূর্ব বাংলার এক-তৃতীয়াংশ ভূভাগ বন্যায় প্লাবিত হয়। অধিবাসীদের অন্যত্র বসতি স্থাপনেরও সুযোগ নেই। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, 'এসব কারণেই পূর্ব বাংলার পক্ষে এককভাবে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা সীমিত।' তবে ভারত

সরকারের পর্যবেক্ষণ দলের অভিমত–'যদি পাকিস্তানের নতুন জাতীয় পরিষদে মুজিব তার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর পক্ষে নেতৃত্ব দেন তাহলে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকবে না।'

সংবিধান এককবিশিষ্ট, না দ্বিপক্ষবিশিষ্ট সংসদ প্রণয়ন করবে। ১৯৭১-এ বৃহৎ জনগোষ্ঠীর পূর্ব বাংলা জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সুবাদে পূর্ব বাংলা জাতীয় সংসদে যে সুবিধা পাওয়ার কথা, এতে এককবিশিষ্ট সংসদ সংবিধান প্রণয়ন করতে সক্ষম। অন্যদিকে যদি পূর্ব বাংলার নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে অংশগ্রহণ না করেন তাহলে পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর পক্ষে সংবিধান প্রণয়ন করা অসম্ভব। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়া পর ১২০ দিনের মধ্যে ভুট্টো ও শেখ মুজিবকে, পরস্পরের সমর্থনে ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের অনুমোদনে, একটি সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে; যদিও 'ছয় দফা' প্রস্তাবের কারণে উভয় নেতা সমঝোতায় পৌঁছে সংবিধান প্রণয়নের সম্ভাবনা অতি অল্প। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, 'প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার দিন তারিখ ৩ মার্চের মধ্যেই ঘোষণা না করলে পাকিস্তানে ব্যাপক বিচ্ছিন্নবাদী আন্দোলন সৃষ্টি হবে।' ভুট্টো ঢাকায় উপস্থিত না হওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিলের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে প্রভাবিত করতে শুরু করেন। বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি পাকিস্তানের পশ্চিমাংশে ভারত বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করে প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে তার অবস্থান সুসংহত করেন। আওয়ামী লীগের শীর্ষনেতারা অবশ্য বলেন, 'ভুট্টো ও পিপলস পার্টিসহ বা ছাড়াই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে অধিবেশন আহ্বান করতে হবে। জাতীয় পরিষদে সংবিধান গৃহীত না করার জন্য পাঞ্জাবির নেতৃত্বাধীন সেনাবাহিনী প্রেসিডেন্টকে প্রভাবিত করে যুক্তি দেয় যে, অধিবেশন প্রত্যাহার করলে বাঙালি জনগোষ্ঠী সামরিক শক্তির কাছে নতজানু থাকবে। তবে প্রগতিশীল ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের মধ্যে একজন পূর্ব বাংলার গভর্নর ভাইস এডমিরাল এস এম আহসান, তার পদত্যাগ প্রমাণ করে যে, প্রেসিডেন্টের অধিবেশন স্থগিত করার সিদ্ধান্ত যুক্তিহীন। তার পদত্যাগ বাংলার পরিস্থিতির অবনতির সত্যতা প্রমাণ করে। এই পদত্যাগের কারণেই প্রেসিডেন্টকে অধিবেশনের একটি নতুন তারিখ ঘোষণা করতে হবে।

কট্টরপন্থি পাঞ্জাবি দ্বারা প্রভাবিত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যদি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার দিন-তারিখ ঘোষণা করেন তাহলে শেখ মুজিবুর রহমান নির্ধারিত তারিখে এতে অংশগ্রহণ করবেন। ভুট্টো সংসদে 'বিরোধীদলীয় নেতা' হিসেবে পাকিস্তানের পশ্চিমাংশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন। সংবিধান প্রণয়নের কাজে যুক্ত হতে আগ্রহী সামান্য কয়েকজন পাকিস্তানের পশ্চিমাংশের গণপ্রতিনিধি নিয়ে পূর্ব বাংলার ইচ্ছানুসারে সংবিধান প্রণীত করতে পারবেন। অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যদি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার দিন-তারিখ ঘোষণা না করেন তাহলে পাকিস্তানে মারাত্মক সঙ্কট সৃষ্টি হবে। ইয়াহিয়া খানের প্রশাসনের সামরিক পর্যবেক্ষকরাই স্বীকার করেন, 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ ঠেকানো অসম্ভব এবং অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া পূর্ব বাংলার ৭৫ মিলিয়ন জনগোষ্ঠীকে শক্তির দাপটে দমিয়ে রাখা চিন্তাতীত। কারণ শক্তিপ্রয়োগ করলে





যে সঙ্কট সৃষ্টি হবে তা হবে পাঞ্জাব প্রদেশের সঙ্গে পূর্ব বাংলাসহ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, বেলুচিস্তান ও সিন্ধুর।

অবশ্য শেখ মুজিব সকল প্রকার আপস প্রচেষ্টা বাতিল করে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডেকে, পাঞ্জাবের সম্মতি ছাড়া সংবিধান প্রণয়ন করতে ইচ্ছুক ছোট ছোট প্রদেশের গণপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে ও ভুট্টোকে বাদ দিয়ে সংবিধান রচনা করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় গৃহীত করিয়ে নিতে সক্ষম। যদি জাতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় তাহলে আওয়ামী লীগ স্বায়ত্তশাসনসহ সংবিধান চূড়ান্তভাবে গৃহীত করতে সক্ষম। বাঙালির ইচ্ছানুযায়ী ও সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে যদি সংবিধান গৃহীত হয় তাহলে ভুট্টো, পাঞ্জাবের শাসকগোষ্ঠী ও সেনাবাহিনীর কাছে তা অগ্রহণযোগ্য হবে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াও দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে পড়বেন। তিনি এমন কোনো সংবিধান অনুমোদন করতে রাজি হবেন না যা ভুট্টো, পাঞ্জাবের শাসকগোষ্ঠী ও সেনাবাহিনীর কাছে অগ্রহণযোগ্য হবে। পাঞ্জাবের শাসকগোষ্ঠী ও সমরনায়করা দুই দশক ধরে সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা তাদের অধীনে রাখলে তাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে পাকিস্তানকে অখণ্ড রাখতে হলে বাঙালির শাসনই মেনে নিতে হবে, কারণ বৃহৎ জনগোষ্ঠীর রায়ে জাতীয় পরিষদে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা তৈরি হয়। প্রগতিশীল ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরাও মনে করেন, 'বাঙালিকে রাষ্ট্রক্ষমতার প্রাপ্য ভাগ দিতে হবে।'

ভুট্টো সংবিধান প্রণয়নে অংশগ্রহণ করলেও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এমন কোনো সংবিধান অনুমোদন করবেন না যা প্রমাণিত হবে বাঙালি তাদের শক্তির বলে প্রণীত করেছে। ভুট্টোও এই আশঙ্কা ব্যক্ত করেন। তিনি 'পাকিস্তান রেডিও'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমি মূলত সংবিধান প্রণয়ন করতে ঢাকায় যাব না, বরং যাব বাঙালির কাছ থেকে তাদের চূড়ান্ত 'ছয় দফা' প্রস্তাবের স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে আপস করতে।' বাঙালির সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে যদি কোনো সংবিধান অনুমোদন করতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ব্যর্থ হন তাহলে পূর্ব বাংলার প্রতিক্রিয়া কী হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি দ্বারা প্রণীত কোনো সংবিধান পাকিস্তান প্রত্যাহার করলে তা হবে বে-আইনি। আর তখন শেখের পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষনা দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। এই ঘোষণার মাধ্যমে পাকিস্তানের পশ্চিমাংশ পুরোপুরি পূর্ব বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। চিরতরে পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়বে।

শেখ মুজিবুর রহমান স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে তার অবস্থান অপরিবর্তন রাখার ইঙ্গিত দেন। তার দলের ও বামপন্থি দলগুলোর অভ্যন্তরে পাকিস্তান থেকে পূর্ব বাংলাকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়ার দাবি তীব্রভাবে প্রকাশ করে। বাঙালির কাছে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী কেন্দ্রীয় শাসকের প্রতীক হিসেবে পরিণত হয়। তারা এই সেনাবাহিনীকে সমূলে তুলে ফেলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। পাকিস্তানের এক-তৃতীয়াংশ সেনাবাহিনীর ও পূর্ব বাংলার পুরো পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা বাঙালি, তাই করাচির পক্ষে বেশি দিন পূর্ব বাংলার ওপর ক্ষমতা অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়। ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য ভবিষ্যতে যাই করা হোক না কেন, পাকিস্তান অবশ্যই ভেঙে যাবে। পাকিস্তানকে অখণ্ড রাখার একটিই সম্ভাবনা, যদি শেখ মুজিবুর রহমান দুটো পৃথক আঞ্চলিক সংবিধান রচনা করার

আহ্বান জানান এবং উভয় অংশই কেন্দ্রীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আঞ্চলিক স্বার্থ পরিত্যাগ করে শাসনপ্রণালী ও শাসনাঞ্চল নিয়ে আলোচনার ভিত্তি তৈরি করা যায়। শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'পাকিস্তানকে যদি অখণ্ড দেশ হিসেবে রক্ষা করতে হয় তাহলে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ইচ্ছার ওপর ভিত্তি করেই সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে।' শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের 'ছয় দফা' প্রস্তাবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আর পাঞ্জাবি সমরনায়কেরা বলে, 'শেখ মুজিব যদি আপসের জন্য অপ্রস্তুত থাকেন, তাহলে পাকিস্তান পূর্ব বাংলার বাঙালিকে ছাড়াই এগিয়ে যাবে।' সেনাবাহিনী বলে, 'বাঙালি যদি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে তাহলে সামরিক বাহিনীর আকার ছোট করে দেবে এবং ক্ষমতা হ্রাস করা হবে।' কারণ সেনাবাহিনীর হাতে এক যুগ ধরে দমন-পীড়নের শিকার বাঙালি জাতি। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ও সমরনায়করা যদি পূর্ব বাংলার দাবি মেনে নিতে রাজি না হয় তাহলে পাকিস্তানের বৃহত্তর মতৈক্যের ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়ন করা অসম্ভবই বটে। উভয় অঞ্চলের মধ্যে সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটাই স্বাভাবিক।

নতুন কোনো নির্বাচনের মাধ্যমে হয়তো বা পাকিস্তানের সঙ্কটের সমাধান খোঁজা যায়, কিন্তু আওয়ামী লীগের এক কর্মী বলেন, 'আওয়ামী লীগ নতুন কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না, আমরা না করার পক্ষেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আরেকটি নির্বাচনের অর্থ কী? এই নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার জন্য বাঙালি গণরায় দিয়েছে। আমরা যদি আমাদের স্বায়ত্তশাসন পাই তাহলে শেখ সাহেব স্বাধীনতা নাও চাইতে পারেন। কিন্তু প্রেসিডেন্টে যদি সংবিধানে স্বাক্ষর না করেন তাহলে শেখ সাহেব ফিরতি বিমানে ঢাকায় এসে স্বাধীনতার ঘোষণা দিবেন।' বামপন্থি থেকে ডানপন্থি, কৃষক থেকে বুদ্ধিজীবী–সর্বজনীন মতামত তা-ই। এ অবস্থায় দক্ষিণ এশিয়ার স্থিতিশীল ভবিষ্যৎ নির্ভর করে সেনাবাহিনীর কর্মকাণ্ডের ওপর। সেনাবাহিনীকে ১৯৭১-এর পরিস্থিতি সামাল দিতে হলে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই; যার অর্থ ৭৫ মিলিয়ন বাঙালিকে বন্দি করা। পাকিস্তান সহিংসতায় ও সঙ্কটে নিমজ্জিত। বিশেষজ্ঞরা বলেন, 'আওয়ামী লীগের সম্পূর্ণ স্বাধীন 'বাংলাদেশ' রাষ্ট্রের দাবিকে এখন পর্যন্ত অবাস্তব বলে মনে করলেও পাকিস্তানের সঙ্গে বিরোধিতা করে বাঙালি যে সহিংসতা ও সঙ্কট অব্যাহত রাখবে তার পাল্টা জবাব দিতে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার হিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর আঘাত আনবেই।'



# নিধনযজ্ঞ ও গণহত্যা

## অপারেশন সার্চলাইট

১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ায় বাঙালি আশা করে রাষ্ট্রক্ষমতার পালাবদল হবে এবং আওয়ামী লীগ 'ছয় দফা' অনুসারে সরকার গঠন করবে। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ও সমরনায়করা কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতা আওয়ামী লীগের অধীনে হস্তান্তর করতে নারাজ। কারণ তারা চায় না যে, পিপিপির কর্তৃত্ব কমে যাক। তাই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও সমরনায়করা পিপিপিকে গোপনে সমর্থন জোগায়, আর এরই অংশ হিসেবে শুরু হয় বাঙালি জাতিকে হত্যা করার পরিকল্পনা।

২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১। পাকিস্তানর সশস্ত্র বাহিনীর এক বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৪তম ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল খাদিম হুসাইন রাজা এবং মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী বাঙালি জাতিকে হত্যা করার অভিযানের মূল পরিকল্পনা তৈরি করবে। এর সঙ্গে পাকিস্তানের কোয়েতা থেকে ১৬তম ইনফ্যান্টি ডিভিশন এবং খরিয়ান থেকে ১৯তম ডিভিশনকে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে পূর্ব বাংলায় আনানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। এদিকে পাকিস্তানের ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা পূর্ব বাংলার জিওসি লেফটেন্যান্ট জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খান এবং পূর্ব বাংলার গভর্নর ভাইস অ্যাডমিরাল এস এম আহসান বাঙালির ওপর সামরিক অভিযানের বিরোধিতা করায় অপারেশনের পূর্বেই তাদেরকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। লেফটেন্যান্ট জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খান ও এস এম আহসানের পরিবর্তে লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব বাংলার গভর্নর ও জিওসি করা হয়।

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১। পাকিস্তান পিপলস পার্টির জুলফিকার আলী ভুট্টোর প্ররোচনায় ও চাপে রাষ্ট্রপতি ও সেনাপ্রধান ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের কার্যাবলি মার্চ পর্যন্ত স্থগিত করেন। পাকিস্তান পিপলস পার্টির অভ্যন্তরে শেখ মুজিবুর রহমানের জনপ্রিয়তা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে তদবির চলতে থাকে। জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন যে, যে কোনো উপায়ে বাঙালিকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে দূরে রাখতে হবে।

৭ মার্চ ১৯৭১। জাতীয় পরিষদের কার্যাবলী স্থগিতকরণের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশ এতই সফল হয় যে, পাকিস্তান সরকার সেনাছাউনির ও পূর্ব বাংলার সরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি সীমিত করে দিতে বাধ্য হয়। সাধারণ জনগণ বনাম সেনাবাহিনী ও বাঙালি বনাম অবাঙালির মধ্যকার সংঘর্ষ হয়ে ওঠে প্রতিদিনের ব্যাপার। শেখ মুজিবের সঙ্গে বৈঠকের উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া মার্চের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা আসেন। এরপর ভুট্টোও যোগ দেন।

১৭ মার্চ ১৯৭১। পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সিওএস জেনারেল হামিদ টেলিফোন করে জেনারেল রাজাকে অপারেশনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব প্রদান করে।

১৮ মার্চ ১৯৭১। সকাল। ঢাকা সেনানিবাসের জিওসি কার্যালয়ে জেনারেল রাজা ও মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী অপারেশনের পরিকল্পনা তৈরি করে। পরিকল্পনাটি জেনারেল ফরমান নিজ হাতে হালকা নীল রঙের একটি অপিস প্যাডের পাঁচ পাতা জুড়ে

পেন্সিল দিয়ে লিখে নেয়। অপারেশনের সিদ্ধান্ত এবং সাফল্যের শর্তগুলো তৈরি করে জেনারেল ফরমান। জেনারেল খাদিম সেনাদলের স্থান বিতরণ, বিভিন্ন ব্রিগেড ও ইউনিটের ওপর সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব বণ্টনের কাজ তদারকি করে। ধারণা করা হয় যে, বাঙালি সেনারা অপারেশনের শুরু হতে না হতেই বিদ্রোহ করবে। তাই পরিকল্পনাকারীরা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে বাঙালি সৈন্যদের অপারেশনের পূর্বেই নিরস্ত্র করা এবং বাঙালি রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতার করার প্রস্তাব দেয়। তারপর অপারেশন বাস্তবায়ন করার পদক্ষেপ নির্ধারিত হয়।

২০ মার্চ ১৯৭১। হাতে লেখা পরিকল্পনাটি আবার জেনারেল হামিদ এবং লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান পর্যালোচনা করে। জেনারেল হামিদ তাৎক্ষণিকভাবে বাঙালি সেনা ইউনিটগুলোকে নিরস্ত্র করার সিদ্ধান্ত বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ইপিআর, সশস্ত্র পুলিশ ও প্যারামিলিটারি বাহিনীদের নিরস্ত্র করার অনুমতি দেয়। তারপর ইয়াহিয়া-টিক্কার গোপন বৈঠকে বাঙালি জাতিকে হত্যা করার নীলনকশাটি প্রণীত হয়, তবে ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেফতারের পরিকল্পনাটি প্রত্যাখ্যান করেন।

জেনারেল টিক্কা খানের অনুমতি পাওয়ার পর নীলনকশাটি বিভিন্ন সৈন্য ছাউনিতে পাকিস্তানি সেনাধিনায়কদের কাছে পাঠানো হয়, বিশেষ করে জেনারেল আবদুল হামিদ খান (চিফ অব আর্মি স্টাফ), লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ এ কে নিয়াজি (কোর-কমান্ডার), জেনারেল আকবর হোসেন (ডাইরেক্টর জেনারেল), মেজর জেনারেল ওমর (চেয়ারম্যান, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কমিশন), মেজর জেনারেল কমর আলী মীর্জা (ডাইরেক্টর সাপ্লাই অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট), মেজর জেনারেল মিটঠা খান (কোয়ার্টারস মাস্টার জেনারেল), মেজর জেনারেল খোদা দাদ (এডজুটেন্ট জেনারেল), মেজর জেনারেল গুল হাসান (চিফ অব দি জেনারেল স্টাফ), ব্রিগেডিয়ার আনসারী (স্টেশন মাস্টার, ঢাকা) প্রমুখের কাছে।

পাঁচ পৃষ্ঠার বাঙালি জাতিকে হত্যা করার নীলনকশাটি 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে পরিচিত। সিদ্দিক সালিক বলেন–

> The plan christened 'Operation SEARCHLIGHT', consisted pf sixteem paragraphs spread over five pages. It presumed that all Bengali troops, including regular East Bengal battalions would revolt in reaction to its execution. They should therefore, be disarmed. Secondly the `non-cooperation' movement launched by Mujib should be deprived of its leadership by amesting all the prominent Awami League leaders while they were in corference with the President. The plan also listed. as an arrexure sixteen prominent persons whose houses were to be visited for their arrest.
>
> The hand-writen plan was read out to General Hamid and Lieutenant-General Tikka Khan at Flagstaff House on the afternoon of 20th March. Both of them approved the main contents of the plan but General Hamid struck out the clause pertaining to





> disaming the Bengali troops asd it would destroy one of the finest armies in the world. He however, approved the disaming of paramilitary forces like the East Pakistan Rifles and the Police. He asked only one question, `After distribution of these troops for various tasks, are you left with any reserves?' `No Sir', was the prompt reply from the G.O.C.'

পাঁচ পৃষ্ঠার বাঙালি জাতিকে হত্যা করার 'অপারেশন সার্চলাইট'-এ বলা হয়–

**প্রাথমিক পরিকল্পনা**

১. আওয়ামী লীগের কর্মোদ্যোগ ও প্রতিক্রিয়ার ধারাগুলো ধরে নেওয়া উচিত দেশদ্রোহী আচরণ হিসেবে এবং যারা সামরিক কর্মকাণ্ডকে উপেক্ষা করে তাদেরকে বৈরীভাবে আঘাত করা একান্ত প্রয়োজন।

২. যেহেতু আওয়ামী লীগ সৈনিকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে স্বাধীন পূর্ব বাংলার আকাঙ্ক্ষা, তাই অপারেশনটি শুরু করতে হবে দক্ষতার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণভাবে, অতর্কিতভাবে, প্রবঞ্চনায় ও দ্রুতগতিতে–সব মিলে যা হবে নির্ঘাত কর্মোদ্যোগ।

**আবশ্যক প্রাথমিক কর্মোদ্যোগ**

৩. 'অপারেশন'টি সমস্ত পূর্ব বাংলায় একসঙ্গে শুরু করতে হবে।

৪. সকল রাজনীতিবিদ, প্রগতিশীল ছাত্র, কর্মচারী, সাংস্কৃতিক-কর্মী, শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীকে গ্রেফতার করতে হবে। প্রারম্ভিক পর্যায়ে উচ্চপদস্থ রাজনীতিবিদ ও ছাত্রদের গ্রেফতার করতেই হবে।

৫. 'অপারেশন'টি ঢাকায় ১০০% সার্থক করতেই হবে, এজন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দখল ও তল্লাশি করা একান্ত প্রয়োজন।

৬. সেনাছাউনিগুলোর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতেই হবে। যারা ঝুঁকি নিয়ে সেনাছাউনি আক্রমণ করবে তাদের ওপর উন্মুক্তভাবে অস্ত্র ব্যবহার করার নির্দেশ দিতে হবে।

৭. অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সকল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিশনসহ সকল সংবাদ সংস্থাগুলোকে বন্ধ করে দিতে হবে।

৮. পূর্ব বাংলার সৈন্যদের নিরপেক্ষ রাখতে হবে, প্রয়োজনে অস্ত্র ও গোলাবারুদের ভাণ্ডারগুলো পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা পাহারা দিবে। একই রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে পি.এ.এফ ও ইপিআর-এর বেলায়ও।

**বিস্ময় ও ভাঁওতা**

৯. উচ্চ পর্যায়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রাখতে হবে। প্রয়োজন হলে মুজিবের সঙ্গে প্রবঞ্চনা

করতে হবে, ভুট্টো না চাইলেও তিনি (ইয়াহিয়া) আওয়ামী লীগের দাবিগুলো মেনে নিবেন এবং তিনি এ মর্মে ২৫ মার্চ একটি ঘোষণা দেবেন।

**কৌশলগত পর্যায়**

১০.

(ক) যেহেতু প্রাথমিক পর্যায়ের 'নিধন পর্ব'টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাই রাজধানীর সৈন্যরা নিম্নোল্লেখিত কর্মকাণ্ড সতর্কতার সঙ্গে পালন করবে, যথা–

(এক) বলপূর্বক অভিযান চালিয়ে মুজিবের বাসভবন দখল করতে হবে এবং সেখানে যারা উপস্থিত থাকবে তাদের গ্রেফতার করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, বাড়িটি সতর্কতার সঙ্গে পাহারা দেওয়া এবং ভালোভাবে রক্ষা করা প্রয়োজন।

(দুই) ইকবাল ও লিয়াকত হলসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসকে ঘেরাও করে রাখতে হবে।

(তিন) টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

(চার) যেসব বাড়ি অস্ত্রভাণ্ডার হিসেবে ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে বিযুক্ত করতে হবে।

(খ) সেনাছাউনি অঞ্চলে কোনোরকম কাযর্মকাণ্ড চলবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা না হয়।

(গ) 'অপারেশন'-এর রাতে (দশটার পর) কেউই সেনাছাউনির বাইরে যেতে পারবে না।

(ঘ) কোনো অবস্থায়ই ঢাকার বাইরের সেনাবাহিনীকে প্রেসিডেন্ট হাউস, গভর্নর হাউস, এম. এন. এ্যা হল, রেডিও ও টেলিফোন সংযোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের এলাকায় প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে না।

(ঙ) মুজিবের বাসভবনের উদ্দেশ্যে অভিযানের সময় বেসামরিক যানবাহন ব্যবহার করতে হবে।

**কালানুক্রমে কর্মোদ্যোগ**

১১.

(ক) সময়. ০১.০০ ঘটিকা।

(খ) পর্যায়ক্রমে সৈন্যদের নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান নিতে হবে, যথা–

(এক) কমান্ডো (এক প্লাটুন) মুজিবের বাসভবন দখল করতে হবে ০১.০০ ঘটিকায়।





(দুই) টেলিফোন সংযোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের সব রকম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে ২৪.৫৫ ঘটিকায়।

(তিন) বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সৈন্যদের উপস্থিতি শুরু করতে হবে ০১.০৫ ঘটিকায়।

(চার) রাজধানীর সৈন্যরা রাজারবাগ পুলিশ হেডকোয়ার্টারস এবং অন্যান্য থানা দখল করতে হবে ০১.০৫ ঘটিকায়।

(পাঁচ) আমেনা বেগমের বাড়ি (রোড নং ২৯ ও বাড়ি নং ১৪৮) পরিবেষ্টন করতে হবে ০১.০৫ ঘটিকায়।

(ছয়) সাইরেন বা তীব্র ধ্বনিযন্ত্র দ্বারা কারফিউ জারি করতে হবে ০১.১০ ঘটিকায়, যার স্থিতিকাল হবে ৩০ ঘণ্টা, প্রাথমিক পর্বে কোনো রকম প্রবেশপত্র দেওয়া যাবে না। শুধু গুরুতর হৃৎ আক্রমণে আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রবেশপত্র প্রদান করা হবে, তবে অনুমতি দেওয়া হবে শুধুমাত্র আর্মির অনুরোধে; নতুন অধ্যাদেশ জারি না হওয়া পর্যন্ত কোনো সংবাদপত্র খবর প্রকাশ করতে পারবে না।

(সাত) সৈন্যরা তাদের ওপর সুনির্দিষ্ট প্রদত্ত দায়িত্ব পালন শুরু করতে হবে ০১.১০ ঘটিকায়, একই সময় ছাত্রাবাস দখল ও তল্লাশির কাজ শুরু করতে হবে।

(আট) বিশ্ববিদ্যালয়ে সৈন্যরা অবস্থান নিতে হবে ০৫.০০ ঘটিকায়।

(নয়) জল ও স্থল পথ রুদ্ধ করতে হবে ০২.০০ ঘটিকায়।

(গ) দিনের নিধন-পর্ব, যথা–

(এক) ধানমন্ডির বাড়ি বাড়ি তল্লাশি করতে হবে, পুরান ঢাকার হিন্দু বাড়িগুলোও।

(দুই) সকল ছাপাখানা বন্ধ রাখতে হবে এবং সব রকম বোমা তৈরির মেশিন বাজেয়াপ্ত করতে হবে।

(তিন) কারফিউ জারি করতে হবে।

(চার) সকল রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতার করতে হবে।

**সেনাবাহিনীর দায়িত্ব**

১২. সেনাবাহিনীর দায়িত্ব বিস্তারিতভাবে ন্যস্ত করতে হবে ব্রিগেড কমান্ডারের অধীনে, তবে নিম্নোল্লিখিত কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে হবে–

(ক) পূর্ব পাকিস্তানের সিগন্যাল ও সকল প্রশাসনিক ইউনিটগুলোর দখল নিতে হবে, বাঙালি সদস্যদের নিরস্ত্র করতে হবে এবং শুধুমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানি সদস্যদের কাছে অস্ত্র থাকবে।

[কৈফিয়ৎ : আমরা চাই না কোনো পূর্ব পাকিস্তানের সৈন্যকে অস্বস্তিকর অবস্থায় বা লজ্জায় ফেলা হোক এবং আমরা চাই না তাদের এমন কোনো কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করা হোক যা তাদের জন্য সুখকর হবে না]।

(খ) থানাকে নিরস্ত্র করতে হবে।

(গ) ইপিআর-এর ডাইরেক্ট জেনারেলকে নিশ্চিত করতে হবে যে, তার সদস্যরা নিরাপদ অবস্থানে আছে।

(ঘ) সকল আনসার রাইফেলের বাঙালি সদস্যদের ঠেকাতে হবে।

**তথ্য আবশ্যক**

১৩.

(ক) মুজিব, নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন, ওসমানি, সিরাজুল ইসলাম, মান্নান, প্রফেসর মুজাফফর, অলি আহাদ, মতিয়া চৌধুরী, ব্যারিস্টার মওদুদ, ফয়জুল হক, তোফায়েল, ন. আ. সিদ্দিক, রব, মাখন ও অন্যসব ছাত্রনেতারা কোথায় আছেন।

(খ) সকল থানা ও রাইফেলের অবস্থান।

(গ) অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের কারখানা বা ভাণ্ডারের অবস্থান।

(ঘ) প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবস্থান।

(ঙ) সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলোর অবস্থান, বিশেষ করে যেসব সংগঠন পাকিস্তানি সৈন্যদের ওপর চরম আক্রমণ চালায়।

(চ) সক্রিয়ভাবে গণঅভ্যুত্থানের জন্য দায়ী সাবেক সৈন্যদের নাম।

**তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ**

১৪. দুটো সদর দফতর স্থাপন করতে হবে, যথা–

(ক) শুধু ঢাকা অঞ্চল। কমান্ড : মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী। কর্মচারী : কমান্ড স্টাফ বা হেডকোয়ার্টারস এম.এল.। সেনাবাহিনী : ঢাকায় অবস্থানরত।

(খ) প্রদেশের অবিশিষ্টাংশ। কমান্ড : মেজর জেনারেল খাদিম রাজা। কর্মচারী : ১৪তম ডিভিশন। সেনাবাহিনী : ঢাকার বাইরে অবস্থানরত।

**সেনাছাউনির নিরাপত্তা**

১৫. সেনাছাউনির নিরাপত্তা–প্রাথমিক পর্যায়েই নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে, প্রয়োজনে পি.এ.এফ-সহ সকল বাঙালি সদস্যদের অস্ত্র ছিনিয়ে নিতে হবে।





**যোগাযোগ ব্যবস্থা**

১৬.

(ক) নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) স্থাপন-কালের নকশা আয়ত্তে আনতে হবে।

**সেনাবাহিনীর দায়িত্ব ও কর্মকাণ্ডের বিবরণ**

**ঢাকা**

**কমান্ড ও কন্ট্রোল :** মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী। জোন বি। সেনাবাহিনী : ৫৭ ব্রিগেড, ১৮ ও ৩২ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, ২২ বালুচ রেজিমেন্ট, ১৩ সীমান্তবাহিনী, ৩১ ফিল্ড রেজিমেন্ট, ১৩ লাইট আক-আক রেজিমেন্ট, কোম্পানি অফ থ্রি কমান্ডো (কুমিল্লা)।

**কর্মকাণ্ড :** (এক) ২য় ও ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, হেডকোয়ার্টারস ইপিআর (২৫০০) ও রাজারবাগের রিজার্ভ পুলিশ (২০০০-এর বাঙালি) সদস্যদের নিরস্ত্র করা। (দুই) টেলিফোন সংযোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র, রেডিও স্টেশন ও জাতীয় ব্যাংক অচল করা। (তিন) আওয়ামী লীগের নেতাদের গ্রেফতার করা। (চার) ইকবাল-জগন্নাথ-লিয়াকত ছাত্রাবাস দখল করা। (পাঁচ) জল ও স্থল চলাচল পথ বন্ধ করা। (ছয়) গাজীপুরের প্রজেক্ট কারখানা ও রাজেন্দ্রপুরের আম্মো-ডিপু অচল করা।

**যশোর**

**সেনাবাহিনী :** ১০৭ ব্রিগেড, ২৬ ও ২৭ বালুচ রেজিমেন্ট, ২৪ ও ৫৫ ফিল্ড রেজিমেন্ট।

**কর্মকাণ্ড :** (এক) ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, সেক্টর হেডকোয়ার্টারস ইপিআর ও রিজার্ভ পুলিশের বাঙালি সদস্যদের নিরস্ত্র করা। (দুই) শহরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দদের গ্রেফতার করা। (তিন) টেলিফোন সংযোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র অচল করা। (চার) সেনাছাউনি, এয়ার ফিল্ড ও যশোর-খুলনা সড়কপথের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। (পাঁচ) কুষ্টিয়ার টেলিফোন সংযোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রকে অচল করা। (ছয়) প্রয়োজনে খুলনায় সৈন্য প্রেরণ করা।

**খুলনা**

সেনাবাহিনী : ২২ সীমান্তবাহিনী।

**কর্মকাণ্ড :** (এক) শহরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। (দুই) টেলিফোন সংযোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র ও রেডিও স্টেশন অচল করা। (তিন) সেক্টর হেডকোয়ার্টারস

ইপিআর, রিজার্ভ পুলিশ ও রিজার্ভ কোম্পানির বাঙালি সদস্যদের নিরস্ত্র করা। (চার) আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ও ছাত্রনেতাদের গ্রেফতার করা।

**রংপুর-সৈয়দপুর**

**সেনাবাহিনী :** ২৩ ব্রিগেড, ২৯ ক্যাভলিয়ার, ২৬ সীমান্তবাহিনী, ২৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট।

**কর্মকাণ্ড :** (এক) রংপুর-সৈয়দপুরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। (দুই) সৈয়দপুরের ৩য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদস্যদের নিরস্ত্র করা। (তিন) দিনাজপুরের সেক্টর হেডকোয়ার্টারস ও রিজার্ভ কোম্পানির সদস্যদের নিরস্ত্র করা, প্রয়োজনে তাদের সীমান্তরক্ষার কাজে পাঠিয়ে দেওয়া। (চার) রংপুরের টেলিফোন সংযোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র ও রেডিও স্টেশন অচল করা। (পাঁচ) আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ও ছাত্রনেতাদের গ্রেফতার করা। (ছয়) বগুড়ার আম্মো-ড্যাম্প পাহারা দেওয়া।

**রাজশাহী**

**সেনাবাহিনী :** ২৫ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট।

**কর্মকাণ্ড :** (এক) সি.ও. দ্রুত প্রেরণ করা (শাফখাৎ বালুচ)। (দুই) টেলিফোন সংযোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র ও রেডিও স্টেশন অচল করা। (তিন) রিজার্ভ পুলিশ ও সেক্টর হেডকোয়ার্টারস ইপিআর-এর বাঙালি সদস্যদের নিরস্ত্র করা। (চার) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজ দখল করা (পাঁচ) আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ও ছাত্রনেতাদের গ্রেফতার করা।

**কুমিল্লা**

**সেনাবাহিনী :** ৫৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট, ১.৫ মর্টার গোন্দাজ বাহিনী, ৩ কমান্ডো ব্যাটালিয়ন।

**কর্মকাণ্ড :** (এক) ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, শাখা হেডকোয়ার্টারস ইপিআর ও রিজার্ভ ডিস্ট্রিক্ট পুলিশের বাঙালি সদস্যদের নিরস্ত্র করা। (দুই) শহরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ও ছাত্রনেতাদের গ্রেফতার করা। (তিন) টেলিফোন সংযোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র অচল করা।

**সিলেট**

**সেনাবাহিনী :** ৩১ পাঞ্জাব কোম্পানি।

**কর্মকাণ্ড :** (এক) রেডিও স্টেশন ও টেলিফোন সংযোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র অচল করা। (দুই) সুরমা নদীর 'কেন ব্রিজ' বন্ধ করা। (তিন) এয়ারফিল্ড নিজেদের আয়ত্তে আনা। (চার) আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ও ছাত্রনেতাদের গ্রেফতার





করা। (পাঁচ) সেক্টর হেডকোয়ার্টারস ইপিআর ও রিজার্ভ পুলিশের বাঙালি সদস্যদের নিরস্ত্র করা। (সিকান্দারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা আবশ্যক।)

**চট্টগ্রাম**

**সেনাবাহিনী :** ২০ বালুচ রেজিমেন্ট, ৩১ কোম্পানি, ২৪ সীমান্তবাহিনী।

**কর্মকাণ্ড :** (এক) ই.বি.আর.সি, ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, সেক্টর হেডকোয়ার্টারস ইপিআর ও রিজার্ভ পুলিশের বাঙালি সদস্যদের নিরস্ত্র করা। (দুই) সেন্ট্রাল পুলিশ অস্ত্রাগার দখল করা। (তিন) রেডিও স্টেশন ও টেলিফোন সংযোগ নিয়ন্ত্রণ করা। (চার) পাকিস্তান নৌবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা। (পাঁচ) চৌধুরীকে গ্রেফতার করা। (ছয়) আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ও ছাত্রনেতাদের গ্রেফতার করা।

পরিকল্পনায় পূর্ব নির্ধারিত আক্রমণাত্মক অপারেশন পরিচালনার জন্যে চিহ্নিত করা হয়- ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোর, রাজশাহী, রংপুর, সৈয়দপুর এবং সিলেট–সেসব স্থানে পাকিস্তানি সৈন্যদের সমাবেশ অধিক। পূর্ব বাংলার অন্যান্য স্থানে অবস্থিত সৈন্য দল এবং প্যারামিলিটারি বাহিনী তাদের নিজ নিজ এলাকা নিয়ন্ত্রণের জন্য অবস্থান করবে এবং প্রয়োজনে অন্যান্য স্থানে প্রাথমিক অপারেশনের সময় শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যোগ দেবে। ঢাকা সম্পূর্ণ নিরাপদ হলে পাকিস্তানের ৯ম এবং ১৬তম ডিভিশনের সৈন্যরা শক্তি বৃদ্ধির জন্য বিমানযোগে ঢাকা আসবে। যেসব শহরে বিমান ঘাঁটি আছে (যেমন চট্টগ্রাম, সিলেট, যশোর, রংপুর, কুমিল্লা) সেসব শহরে সরাসরি ঢাকা থেকে সি-১৩০ বিমান বা হেলিকপ্টার ট্রুপসে শক্তি বৃদ্ধি করা হবে। যদিও পরিকল্পনায় পূর্ব বাংলাকে দমন করার জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হয়নি, তবুও ধারণা করা হয় যে, রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতার এবং বাঙালি সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীকে নিরস্ত্র করার পর এক সপ্তাহের মধ্যে বাঙালি জাতিকে হত্যা করার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে পূর্ব বাংলাকে সামরিক শাসনের আওতাভুক্ত করা। লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা বলেন যে, ১০ এপ্রিলের পর আর কোনো বাধা-বিপত্তি থাকবে না।

# উত্তাল মার্চ

পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ও সমরনায়করা মনে করে যে, পূর্ব বাংলা জনসংখ্যার কারণে জাতীয় পরিষদে এমন ব্যবস্থা সৃষ্টি করবে যা ক্ষমতাসীন পাঞ্জাবি-প্রভুদের রাষ্ট্র শাসন থেকে বঞ্চিত করবে; এমনকি পাকিস্তানের পশ্চিমাংশের কোনো রাজনৈতিক দল সহজে ক্ষমতায় আসতেও পারবে না। তাই ১ মার্চ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মেজর জেনারেল খাদেম হোসেন রাজা ও মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর সহযোগিতায় রচিত ও ইয়াহিয়া-ভুট্টো দ্বারা অনুমোদিত বাঙালি জাতিকে হত্যা করার নীলনকশা অনুযায়ী সুকৌশলে পূর্ব বাংলার জি.ও.সি ও গভর্নরকে সরিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক মনোনীত টিক্কা খানকে পূর্ব বাংলার জি.ও.সি ও গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

১ মার্চ ১৯৭১। বেলা ১.০৫ মিনিট। ইয়াহিয়া খান গণতন্ত্রের অঙ্গিকার ভঙ্গ করে পাকিস্তান বেতারের মাধ্যমে 'অনির্দিষ্টকাল'-এর জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার ঘোষণা দেন। পাকিস্তানের সঙ্কটের সময় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের এ রকম অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার ঘোষণা পাকিস্তানের জন্য ভ্রান্ত পদক্ষেপই বটে। শেখ মুজিবের সঙ্গে কোনো রকম আলোচনা না করেই হঠাৎ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার এ রকম ঘোষণা দেওয়ায় যা হওয়ার তা-ই হয়। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিলের খবর প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাংলা জুড়ে বিক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ে, এ যেন স্বতঃস্ফূর্ত গণবিস্ফোরণ। বাংলাদেশের মানুষ বুঝতে পারে, ক্ষমতা হস্তান্তরের কোনো ইচ্ছাই ইয়াহিয়ার নেই, বরং তিনি জাতীয় পরিষদে রাজনীতির নামে তামাশায় লিপ্ত। শেখ মুজিব জনগণকে শান্ত থাকার এবং তার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল আচরণ না করার আবেদন জানালেও ইয়াহিয়ার স্বৈরাচারী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর বাঙালি রাস্তায় নেমে পড়ে। বাঙালি স্পষ্টই বুঝতে পারে, এক পাকিস্তানের কাঠামোতে বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ের কোনো সম্ভাবনা নেই। নিজেই আহ্বান করে যখন আবার নিজেই জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল করে দিলেন তখন বাঙালি এ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে যে, পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তাই শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর চাপ অব্যাহত থাকে। সরকার বিক্ষোভ আন্দোলন দমনের লক্ষ্যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে রাস্তায় নামিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করে না। আওয়ামী লীগের সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ বলেন, 'পূর্ব বাংলার নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে নগ্নভাবে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করা হচ্ছে।' পাকিস্তানের জনসাধারণের কাছে বাঙালির আন্দোলনকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়ে তাজউদ্দীন বলেন, 'অবিলম্বে পূর্ব বাংলায় সেনাভিযান বন্ধ করুন।' শেখ মুজিব সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অনুরোধ জানিয়ে বলেন, 'পূর্ব বাংলার ওপর উৎপীড়ন বন্ধ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে ইয়াহিয়ার ওপর প্রভাব প্রয়োগ করা প্রয়োজন। বর্তমানে পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানের সেনাদের দ্বারা অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও হত্যা চলছে।' পাকিস্তান সরকার নিহতের সংখ্যা ১৭১ জন বলে স্বীকার করে। বাস্তবে সেনাবাহিনীর মেশিনগানের গুলিতে দুই হাজার বাঙালি নিহত হয়। সেনাবাহিনীর কঠোর নিয়ন্ত্রণেও পূর্ব বাংলা জুড়ে বিক্ষুব্ধ জনতা আন্দোলন চালিয়ে যায়।





১ মার্চ ১৯৭১। বিকাল। জনগণের দাবির প্রেক্ষিতেই শেখ মুজিবুর রহমান হোটেল পূর্বাণীতে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে 'অহিংস ও অসহযোগ' আন্দোলনের ঘোষণা দেন। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলেন–

১. ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সমগ্র বাংলাদেশে পূর্ণ হরতাল পালিত হবে।
২. ৩ মার্চ 'জাতীয় শোক দিবস' হিসেবে পালিত হবে।
৩. পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের এক জনসভা অনুষ্ঠিত হবে।
৪. বেতার ও টেলিভিশনে 'অহিংস ও অসহযোগ' আন্দোলন সংক্রান্ত সঠিক সংবাদ ও বিবৃতি প্রচার না করা হলে সকল বাঙালি কর্মচারীদের কর্মবিরতি পালন করতে হবে।
৫. ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বেলা দুটোয় এক জনসভা অনুষ্ঠিত হবে।
৬. রেসকোর্স ময়দানেই পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

প্রসঙ্গত, বঙ্গবন্ধুর 'অহিংস ও অসহযোগ' আন্দোলন আর মহাত্মা গান্ধীর 'অসহযোগ আন্দোলন' এক নয়। বঙ্গবন্ধুর 'অহিংস ও অসহযোগ' আন্দোলন হচ্ছে সক্রিয়। এই আন্দোলনের আহ্বান জানাতে তিনি দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মোকাবেলা করার জন্য শান্তির অস্ত্রই বেছে নেন, 'ভাতে মারবো, পানিতে মারবো'। নৈরাজ্য, ধ্বংসাত্মক কাজ ও সাধারণ পাকিস্তানি নাগরিকদের ওপর সামান্যতম অত্যাচার ও জুলুম যাতে না হয় সেদিকে কড়া দৃষ্টি রাখার জন্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন, 'তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের ওপরে, আমাদের যেন বদনাম না হয়।' বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে তাজউদ্দীন আহমদ 'অহিংস ও অসহযোগ' আন্দোলনের নীতিমালা তৈরি করেন, যা এক মেধাবী ও মোক্ষম দলিল।

১ মার্চ ১৯৭১। বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগ কার্যকরী পরিষদের এক জরুরি বৈঠকে দেশব্যাপী হরতাল পালন করার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। নিপীড়নমূলক রাজনীতি অব্যাহত থাকায় শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলায় গণ-আন্দোলন সৃষ্টি হওয়ায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সামরিক সরকার সঙ্কটের মুখে পড়ে। শেখ মুজিব জানেন, এই সঙ্কটের সমাধান পূর্ব বাংলাকে রক্তপাতের মাধ্যমেই আদায় করতে হবে। পাঁচ কোটি পাকিস্তানি ও সাত কোটি শোষিত বাঙালির জন্য দুঃখজনক অতীতের চেয়ে বন্ধনমুক্ত ভবিষ্যৎই উত্তম। তাই শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দুটো কমিটি গঠনর করা হয় (এক) রাজনৈতিক কমিটি (হাই কমান্ড নামে পরবর্তীকালে খ্যাত)। এই কমিটির কর্ম-পরিষদের সদস্য হিসেবে মনোনীত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (রাষ্ট্রপতি ও সর্বাধিনায়ক), তাজউদ্দীন আহমদ (নির্বাহী প্রধান, প্রতিরক্ষা বিষয়ক), সৈয়দ নজরুল ইসলাম (আইন ও সংগ্রাম পরিষদ), মনসুর আলী (অর্থ বিষয়ক), এইচ এম কামরুজ্জামান (পররাষ্ট্র বিষয়ক) ও মোশতাক আহমেদ (কো-অর্ডিনেটর)। আর রাজনৈতিক কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে মনোনীত হন ড. কামাল হোসেন, প্রফেসর রেহমান সোবহান ও ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম। (দুই) সামরিক কমিটি। এই কমিটির কর্ম-পরিষদের সদস্য হিসেবে মনোনীত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (সর্বাধিনায়ক), তাজউদ্দীন আহমদ (প্রতিরক্ষা বিষয়ক), কর্নেল এম এ জি ওসমানী (প্রধান সেনাপতি), মেজর জেনারেল মজিদ (সৈনিক সংগঠক),

লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন (অস্ত্র সরবরাহ), লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম আর চৌধুরী (ফিল্ড কমান্ডার) ও মেজর খালেদ মোশাররফ (অপারেশন কমান্ডার)। সামরিক কমিটির প্রধান উদ্দেশ্যগুলোও নির্ধারণ করা হয়। যথা–

১. ভারত-জাপানসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ এবং তাদের কাছ থেকে সামরিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা।

২. দেশের যুবশক্তিকে গেরিলা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে প্রাক্তন সৈনিকদের সংগঠন করে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ শুরু করা।

৩. কর্মরত বাঙালি সৈনিক ও অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য তাদের সহযোগিতা আদায় করা।

৪. সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য অস্ত্রশস্ত্র জোগাড়ের উপায় সন্ধান ও তহবিল গঠন করা।

২ মার্চ ১৯৭১। মওলানা ভাসানী, আতাউর রহমান ও শাহ আজিজসহ প্রমুখ নেতা পল্টনের জনসভায় ঘোষণা দেন যে, আওয়ামী লীগ গণপরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করায় পাকিস্তানের শাসনক্ষমতা আইনগতভাবে শেখ মুজিবের অধীনেই।

২ মার্চ ১৯৭১। শেখ মুজিবুর রহমান জনসাধারণকে সংসদ স্থগিতের সিদ্ধান্ত অমান্য করে ৭ মার্চ রেসকোর্সের ময়দানের গণসমাবেশে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। অন্যদিকে সামরিক জান্তা সংবাদপত্রের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে নতুন আদেশ জারি করে। ঢাকা বিমানবন্দরে অনিয়মিত পি.আই.এ বিমানে পাকিস্তানি সৈন্যরা পাকিস্তান থেকে পূর্ব বাংলায় আসতে থাকে। ঢাকা বিমানবন্দরে সামরিক বাহিনীর প্রবেশকে বাধা দেওয়ার সময় সেনাবাহিনীর গুলিতে দুজন বাঙালি নিহত হয়।

২ মার্চ ১৯৭১। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসভা ও জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রসভায় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইশতেহার ঘোষিত হয়। এতে বলা হয়–

১. স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করে পৃথিবীর বুকে একটি বলিষ্ঠ বাঙালি জাতি সৃষ্টি এবং বাঙালির ভাষা-সাহিত্য-কৃষ্টি-সংস্কৃতি পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২. স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করে অঞ্চলে অঞ্চলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য নিরাসনকল্পে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করে কৃষক-শ্রমিকরাজ কায়েম করা।

৩. স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করে ব্যক্তি, বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ নির্ভেজাল গণতন্ত্র কায়েম করা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি আ স ম আবদুর রব এই সভায় মানচিত্র আঁকা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। সভা শেষে ছাত্ররা





বাংলাদেশের পতাকাটি বহন করে শোভাযাত্রা করে। বস্তুত, সর্বাত্মকভাবে শুরু হয় স্বাধীনতার আন্দোলন।

২ মার্চ ১৯৭১। সামরিক সরকার সকাল-সন্ধ্যা একটানা ১১ ঘণ্টার কারফিউ জারি করে। সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষুব্ধ জনতা সকল ভয়ভীতি উপেক্ষা করে সান্ধ্য আইন অমান্য করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। ঢাকা স্টেডিয়াম থেকে গুলিস্তান, গুলিস্তান থেকে সদরঘাট পর্যন্ত জনতার মিছিলে স্বাধীনতার আওয়াজ, ধ্বনি-প্রতিধ্বনি উঠতে থাকে, 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো।' এই শ্লোগানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় পূর্ণ স্বাধীনতার ঘোষণা, বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রাম। শুরু হয় ঢাকার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের সঙ্গে জনতার সংঘর্ষ, হতাহত অনেক। বঙ্গবন্ধু গুলিবর্ষণের তীব্র প্রতিবাদে ঘোষণা করেন যে, ৩ মার্চ থেকে ৬ মার্চ প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত হরতাল চলবে।

৩ মার্চ ১৯৭১। পল্টন ময়দান। সকালে, 'জয়বাংলা বাহিনী' আনুষ্ঠানিকভাবে 'বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা' উত্তোলন করে বিকালে ১০ লক্ষ জনতার সমাবেশে ঘোষিত হয়–

১. ৫৬ হাজার বর্গমাইল বিস্তৃত ভৌগোলিক এলাকার সাড়ে সাত কোটি মানুষের আবাসভূমি হিসেবে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাম হবে–'বাংলাদেশ'। জাতীয় সঙ্গীত হবে 'আমার সোনার বাংলা'; আর দেশের সর্বাধিনায়ক হবেন শেখ মুজিবুর রহমান।

২. 'জয়বাংলা' স্বাধীন বাংলার শ্লোগান হিসেবে ব্যবহার করা।

৩. ২৩ মার্চ সারা বাংলাদেশে 'জাতীয় পতাকা' আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তোলন করা।

৪. শত্রুর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য 'মুক্তিবাহিনী' ও 'স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি' গঠন করা।

৫. শেখ মুজিবুরের 'অহিংস ও অসহযোগ' আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া।

এর সঙ্গে যুক্ত হয় ২ মার্চের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত জনসভায় ঘোষিত স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইশতেহার এবং বঙ্গবন্ধুর অধীনে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ১০ মার্চ জাতীয় পরিষদের নেতাদের জন্য 'রাজনৈতিক নেতাদের সম্মেলন'-এর আহ্বান জানান। ইয়াহিয়ার আমন্ত্রণ শেখ মুজিব প্রত্যাখ্যান করেন।

৩ মার্চ ১৯৭১। সমগ্র বাংলাদেশে সর্বাত্মকতভাবে হরতাল পালিত হয়; যদিও ঢাকা ছাড়া সমস্ত বাংলাদেশে কারফিউ অব্যাহত থাকে। ঢাকার হরতালে অংশগ্রহণের জন্য সাধারণ বাঙালি রাজপথে নেমে পড়ে। তারা দল-মত নির্বিশেষে ঘোষণা দেয়, 'বাংলার স্বাধীনতা চাই'। পূর্ব বাংলায় প্রয়োজনীয় সেবাকর্ম হরতালের বাইরে রেখে সরকারি-বেসরকারি অফিস, স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়সহ আড়াইটা থেকে চারটা পর্যন্ত ব্যাংক খোলা রেখে দুই অংশের মধ্যে ব্যাংকিং লেনদেন বন্ধ ও রাজস্ব প্রদান স্থগিত রাখা হয়। শেখ মুজিব

'অহিংস ও অসহযোগ' আন্দোলনের মাধ্যমে যে অর্থনৈতিক যুদ্ধ শুরু করেন। এতে পাকিস্তানের বাণিজ্যে গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করে। পাকিস্তানিরা এর প্রভাব হাড়ে হাড়ে টের পেতে শুরু করায় বিভিন্ন স্থানে বাঙালি ও অবাঙালির মধ্যে দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়। সরকারি রিপোর্টে বলা হয়, 'ঢাকায় আটজন বিদ্রোহীকে হত্যা করেছে পাকিস্তানি সৈন্যরা এবং চট্টগ্রামে বাঙালি আর অবাঙালির মধ্যকার সংঘর্ষের কোনো পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। পাকিস্তানি সৈন্যরা টঙ্গীতে দুই ব্যক্তিকে হত্যা করেছে।' চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর গুলিতে অনেক বাঙালি নিহত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'দখলদারী সৈন্যদের মতো পাকিস্তানি সৈন্যরা বাঙালির প্রতি ব্যবহার করছে এবং তারা তাদের বন্দুকের সম্মুখে সাধারণ জনতাকে জিম্মি করছে।'

৩ মার্চ ১৯৭১। একদিকে রমনা রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীবৃন্দ 'ছয়দফা' প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য শপথ গ্রহণ করেন। অন্যদিকে শেখ মুজিবুর রহমান, কর্নেল এম এ জি ওসমানী, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর জেনারেল এম আই মজিদ প্রমুখ নেতার অংশগ্রহণে আওয়ামী লীগের সামরিক কমিটির এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে সামরিক কার্য ব্যবস্থার জন্য দু'মাস সময়ের জন্য এক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। অস্ত্র সংগ্রহ ও সামরিক প্রস্তুতির জন্য সময়ের প্রয়োজন, তাই ইয়াহিয়ার সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

৩ মার্চ ১৯৭১। সারা বাংলাদেশে হরতাল পালিত হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি দাবি ও পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে 'অহিংস ও অসহযোগ' আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

৫ মার্চ ১৯৭১। ভুট্টোর সঙ্গে ইয়াহিয়া আলোচনায় বসেন। পাকিস্তান রেডিও ঘোষণা করে যে, ৬ মার্চের মধ্যে সৈন্যকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। এ ঘোষণার পরও বাংলাদেশে হরতাল, সংগ্রাম, গুলি আর মানুষ হত্যার কর্মকাণ্ড অব্যাহত থাকে। ঢাকা ও টঙ্গীতে বিক্ষুব্ধ জনতার ওপর গুলিবর্ষণে শতাধিক লোক নিহত ও আহত হয়। পুলিশ ও পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসসহ জনপ্রশাসন বিভাগের কর্মচারীরা কাজে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানায়। সাধারণ জনগণ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। এমনকি সামরিক দফতরের বেসামরিক কর্মচারীরা তাদের অফিস বয়কট করে। কেবল কাজে যোগ দেওয়া থেকে বিরত থেকেই তারা ক্ষান্ত হননি; বেসামরিক প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগের কর্মচারীরা সক্রিয় সমর্থন ও নিজেদের আনুগত্য প্রকাশ করে আওয়ামী লীগের প্রতি। তারা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দেয় যে, আওয়ামী লীগ প্রধানের নির্দেশ ছাড়া তারা কারো নির্দেশ মানবে না। এ অবস্থায় আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতাসীন না হয়েও 'অহিংস ও অসহযোগ' আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য হয় আওয়ামী লীগ। ফলে শেখ মুজিব শুধু আপামর জনগণেরই নন, বাংলাদেশের প্রশাসন ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের দ্ব্যর্থহীন সমর্থন লাভ করেন। তারা আওয়ামী লীগের নির্দেশাবলী সর্বান্তকরণে মেনে নেন এবং পূর্ব বাংলার সঙ্কট সমাধানের জন্য আওয়ামী লীগকে একমাত্র কর্তৃপক্ষ বলেও গ্রহণ করেন। 'অহিংস ও অসহযোগ'





আন্দোলনের ফলে বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় যে ফাটল দেখা দেয় এবং নানাবিধ দুরূহ সমস্যার সৃষ্টি হয়, এসব সমস্যার মধ্যেও বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে দেশের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক দফতরের কাজ চলতে থাকে। বাংলাদেশের কোনো আইনানুগ না থাকা সত্ত্বেও পুলিশের সহযোগিতায় আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকগণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার যে আদর্শ স্থাপন করে তা স্বাভাবিক সময়েও অনুকরণীয় হওয়া উচিত।

ইয়াহিয়ার সব হুকুম অমান্য করে 'অহিংস ও অসহযোগ' আন্দোলনের উত্তাল জোয়ারে বাংলাদেশে চলে দুটো ধারা–(এক) মার্শাল ল রেগুলেশন, (দুই) আওয়ামী লীগ রেগুলেশন। যদিও পূর্ব বাংলার সবকিছু রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইয়াহিয়ার হুকুমে চলার কথা, কিন্তু বাস্তবে চলতে থাকে ধানমন্ডির ৩২নং থেকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে। দেশের অফিস-আদালত, ব্যাংক-বীমা, স্কুল-কলেজ, গাড়ি, শিল্প-কারখানা সবকিছুই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে চলে। ইয়াহিয়ার হুকুম অমান্য করে বাংলার মানুষের স্বাধীনতার আন্দোলন সারা বিশ্ব ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা। সত্যিকার অর্থে দেশ চলতে থাকে আওয়ামী লীগের নির্ধারিত আইন অনুযায়ী; কাজেই ইয়াহিয়ার উচিত শেখ মুজিবের সঙ্গে একটি আপস করে নেওয়া, অন্যথায় পূর্ব বাংলা চলে যাবে আপন পথে। কিন্তু পূর্ব বাংলার সমস্যা আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়, বরং পূর্ব পরিকল্পিত, সমরজান্তা চায় বাঙালিকে চূড়ান্তভাবে আঘাত করে, ধ্বংস করে একটি জাতিকে হত্যা করে দিতে। 'দি নিউ ইয়র্ক টাইমস' বলে–

> [...] the bits and pieces that have come to light make it clear that the power establishment in the West never intended to let Sheikh Mujib win a single measure of autonomy for East Pakistan.

১৯৭১-এর রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য নয়, বরং অবশিষ্ট আয়োজন সম্পন্ন করে বাঙালি জাতিকে হত্যার প্রয়োজনে ইয়াহিয়া আওয়ামী লীগের সঙ্গে শান্তি আলোচনার নাটকীয় মহড়া দিতে থাকেন, শান্তির আড়ালে অশান্তির জাল বিস্তার করাই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য।

৬ মার্চ ১৯৭১। পূর্ব বাংলার ৫০ বছর বয়সী রাজনৈতিক নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা দেন, '৭ মার্চ ঢাকার পল্টন ময়দানের গণসমাবেশে 'ঐতিহাসিক বক্তব্য' দেব, এই বক্তব্য পাকিস্তান থেকে পূর্ব বাংলাকে পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা হবে।' আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবের জনসভার আহ্বান ও 'অহিংস ও অসহযোগ' আন্দোলনের প্রতি জনগণের সর্বাত্মক সমর্থন দৃষ্টে জেনারেল ইয়াহিয়া তার কৌশল কিছুটা পরিবর্তন করেন। দুপুরে জাতীয় রেডিওর মাধ্যমে তিনি ঘোষণা করেন, 'আমি সেনাবাহিনীর প্রধান থাকা অবস্থায় পাকিস্তানের সংহতি, ঐক্য ও নিরাপত্তা নষ্ট হতে দেব না। পাকিস্তানের সম্পূর্ণ অখণ্ডতা রক্ষা করব; এ বিষয়ে যেন কেউ কোনো রকম সন্দেহ পোষণ না করেন। আমি সামান্য কয়েকজন মানুষকে কোটি মানুষের পাকিস্তান ভূমিকে ধ্বংস করার সুযোগ দিতে পারি না। [...] ডিসেম্বরে পাকিস্তানের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর আমি জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য যতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি সেগুলোর প্রত্যেকটি কয়েকজন নেতার কারণে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। [...] পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য আমি অধিবেশন স্থগিত করেছিলাম। আমার এই পদক্ষেপ জনসাধারণ সম্পূর্ণভাবে ভুল ব্যাখ্যা

করেছে। পূর্ব বাংলার বিশৃঙ্খলা ঠেকানোর জন্য আমি স্বল্প পরিমাণের সেনা ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছিলাম। পাকিস্তানিদের আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ও আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে একটি গণতান্ত্রিক জীবন পদ্ধতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। একই সঙ্গে তিনি ৭ মার্চে ঢাকায় চরম বিক্ষোভ প্রদর্শনীকে রোধ ও পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য আরও দুটো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন–

১. রাষ্ট্রক্ষমতা সেনাবাহিনীর কাছ থেকে জনগণের অধীনে হস্তান্তর করার উদ্দেশ্যে ২৫ মার্চ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘোষণা।

২. সঙ্কট নিয়ন্ত্রণ ও নিরসনের জন্য ঢাকায় আসার ঘোষণা।

সপ্তাহব্যাপী 'অহিংস ও অসহযোগ' আন্দোলন অব্যাহত থাকার পর ইয়াহিয়া ২৫ মার্চ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার নতুন তারিখ ঘোষণা করেন, কিন্তু তার বেতার ভাষণে যা প্রকাশ পায় তা বাঙালির মূল বাসনার সঙ্গে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না। জেনারেলের চাইতে সার্জেন্ট মেজরের মতো পদক্ষেপ নেওয়ায় ইয়াহিয়া পূর্ব বাংলার অধৈর্য জনতাকে আশ্বস্ত করতে পারেননি। এমনকি তিনি বাঙালিকে স্বাধীন 'বাংলাদেশ' সৃষ্টির ঘোষণা দেওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য প্রভাবিত করতে পারেননি; বরং ৭ মার্চ ১৯৭১ শেখ মুজিব পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর তড়িৎ ও কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সেনাবাহিনী পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার যে কোনো আন্দোলনকে রক্ত ঝরিয়ে প্রতিহত করব– স্বাধীন 'বাংলাদেশ' সৃষ্টি করার ঘোষণা দিতে পারেন।'

৬ মার্চ ১৯৭১। জুলফিকার আলী ভুট্টো কোনো রকম পূর্বশর্ত ছাড়াই ২৫ মার্চের অধিবেশনে বসতে রাজি হন। তিনি রাজি হওয়া আর না হওয়ায় মধ্যের কিছু যায় আসে না, কারণ সামরিক শাসকের পদক্ষেপ মুজিবকে একটি নতুন শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে যায়। তিনি আস্তে ধীরে তার গন্তব্যে পৌঁছতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ; তবে আওয়ামী লীগের চরমপন্থি নেতারা পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া অন্যকিছু মানবেন না। শেখ মুজিব অবশ্য ২৫ মার্চে অন্য রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আওয়ামী লীগকে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে 'চার দফা' প্রস্তাব মেনে নেওয়ার জন্য আহ্বান জানান। 'চারদফা' প্রস্তাবে বলা হয়–

১. পাকিস্তানি সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে।

২. সেনাবাহিনী কর্তৃক নিরীহ ও নিরস্ত্র মানুষকে হত্যার তদন্ত করতে হবে।

৩. সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে।

৪. জনগণের প্রতিনিধিদের অধীনে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

ইয়াহিয়ার পূর্ব বাংলায় আসার ঘোষণা একটি সাহসী পদক্ষেপ, কারণ পূর্ব বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন ইয়াহিয়ার পূর্বসূরি ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের পতন ঘটায়। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, তিনি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পূর্ব বাংলায় আসার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি যদি মনে করে থাকেন যে, পূর্ব





বাংলা পৃথক করার আন্দোলনে জড়িত মানুষের সংখ্যা অতি অল্প, তাহলে শীঘ্রই তার ভুল ভাঙবে। ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান বিমানে ভারত-ভূখণ্ডের উপর দিয়ে পাকিস্তানি বিমান চলাচলের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা থাকায় ভারত-সীমান্ত ঘুরে শিলং হয়ে ঢাকায় পৌঁছবেন। ১৯৭১-এর প্রথম পর্যায়ের সঙ্কট সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে এভাবেই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আড়াই ডিভিশন সৈন্য পূর্ব বাংলায় আনানো হয়, দিন দিন এর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

৬ মার্চ ১৯৭১। ইয়াহিয়া তার বাঙালি জাতিকে হত্যা করার পরিকল্পনাটি বাস্তবে রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানকে নিযুক্ত করেন পূর্ব বাংলার জি.ও.সি ও গভর্নর হিসেবে। মনে হয় ইয়াহিয়ার ধারণা যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিবেন। ইয়াহিয়া বাঙালি জাতির স্বাধীনতার স্পৃহাকে নির্মূল করার জন্য ঢাকায় অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে পূর্ণ সতর্কীকরণ করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান যে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে পাকিস্তানের রাজনৈতিক সঙ্কট নিরসনের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ইয়াহিয়া ও সমরনায়কদের নেই। তাদের একমাত্র লক্ষ্য বাংলাদেশে সামরিক শক্তি জোরদার করা এবং এর জন্য সময়ক্ষেপণ করা। প্রশাসনিক রদবদলও প্রমাণ করে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার ঘৃণ্য মনোভাব। 'বাংলার নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে' সপ্তাহব্যাপী নগ্নভাবে সেনাবাহিনী ব্যবহার করায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ২০০ জন এবং ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগার ভেঙে কয়েদিরা পালানোর সময় রক্ষীদের গুলিতে ৭ জন নিহত ও ৩০ জন আহত হয়। সেনাবাহিনীর হত্যাকাণ্ড যতই চলে ততই পূর্ব বাংলার মুক্তিপাগল মানুষ স্বাধীনতার জন্য উন্মাদ হয়ে ওঠে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে তাজউদ্দীন ঢাকাস্থ ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনার কে সি সেনগুপ্তের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ গোপন বৈঠকে বসেন। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ও সমরনায়কদের দ্বারা পূর্ব বাংলায় তাণ্ডবলীলা শুরু হলে বাংলার রাজনৈতিক কর্মীকে আশ্রয় ও প্রতিরোধ সংগ্রামে ভারতের সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের বিষয় নিয়েই আলোচনা হয়।

৭ মার্চ ১৯৭১। বিশেষ বিশেষ ঘটনাসমূহ :

১. সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ভবনে পূর্ব বাংলা ছাত্র ইউনিয়নের ছাত্রকর্মীদের সামরিক প্রশিক্ষণ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে 'ডামি' রাইফেল হাতে নিয়ে সামরিক কুচকাওয়াজের অনুষ্ঠান।

খ. পরিকল্পনা অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হবে ঢাকা নগর নিয়ন্ত্রণের প্রধান কেন্দ্র, যা সশস্ত্র ছাত্রদের সাহায্যে পূর্ব বালা রাইফেলস ও পুলিশ বাহিনী পরিচালনা করবে। এখান থেকেই ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট দখলের কর্মসূচি শুরু হবে।

২. বিশাল গণসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে এক অভ্রান্ত পথনির্দেশ, বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা।

৩. ন্যাপ (মুজাফফর)-এর সারা বাংলাদেশে গণমুক্তিবাহিনী গঠন করার আহ্বান।

৪. একটি নতুন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানসহ অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৫. দেশে শোকের ও বিদ্রোহের প্রতীক হিসেবে কালো পতাকার পাশাপাশি স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়ানো।

৬. কম্যুনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির গেরিলা যুদ্ধের আহ্বান।

৭ মার্চ ১৯৭১। বাঙালি জাতিকে হত্যা করার জন্যই ইয়াহিয়া ঢাকায় টিক্কা খানকে হাজির করেন। ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিক্কা খানের শপথ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। প্রসঙ্গত, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে বেলুচিস্তানে স্থানীয় একটি গোত্রের বিদ্রোহ দমন করতে নিষ্ঠুর টিক্কা খান পাকিস্তান বিমান ও গোলন্দাজ বাহিনীকে ব্যবহার করে, নির্বিচারে গুঁড়িয়ে দেয় বেলুচির বাড়িঘর, ধ্বংস করে তাদের জানমাল। টিক্কা খান জানিয়ে দেয় যে, বিদ্রোহের পরিণতি হচ্ছে পরিবার-পরিজনসহ নিশ্চিত মৃত্যুদণ্ড। সে থেকে বেলুচিরা বোমারু হিসেবে পরিচিত হয়। এই সে নিষ্ঠুর টিক্কা খান, যাকে পূর্ব বাংলায় এনে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাদের সামরিক শক্তি প্রয়োগের প্রস্তুতি ও ব্যবস্থার কর্মকাণ্ড এগিয়ে নিতে চান। একটি যুদ্ধের আহ্বান মানেই দেশের ধ্বংস ডেকে আনা, সহস্র সন্তানকে পিতৃহারা করা, স্ত্রীকে স্বামীহারা করা, পিতামাতাকে সন্তানহারা করা, সহস্র পরিবারের দীপ নিভিয়ে দেওয়া- এসব জেনেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পূর্ব বাংলায় আনেন টিক্কা খানকে। তবে বাঙালি জানে, ক্ষমতালোভী যুদ্ধোন্মাদ পাকিস্তানি পাষাণদের কাছে মানবিক মূল্যবোধের আশা করা বাতুলতা মাত্র; তাই পাকিস্তানি পাষাণদের পশুশক্তি পূর্ব বাংলা থেকে নিশ্চিহ্ন করতে হলে তাদেরকে অস্ত্রের ভাষায় জবাব দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তাই তো ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে দশ লক্ষাধিক বাঙালির কণ্ঠে প্রকাশিত 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা-যমুনা', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো', 'আপস না সংগ্রাম, সংগ্রাম সংগ্রাম', 'তোমার নেতা আমার নেতা, শেখ মুজিব, শেখ মুজিব', 'জয় বাংলা' ইত্যাদি হিরণ্ময় উচ্চারণে ভরপুর এবং বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা হাতে ও 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' কণ্ঠে ধারণ করা জনসমুদ্রের বিশালতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরাসরি মঞ্চে উঠে এসে ঘোষণা দেন 'একবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বাংলাদেশের স্বাধীনতার এই ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ভাষণের ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে–

১. **বাংলাদেশের ঘোষণা :** আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারি, আদালত-ফৌজদারি, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে।

২. **সার্বিক প্রস্তুতির নির্দেশ :** তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু–আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো।

৩. **সৈন্যদের প্রতি নির্দেশ :** তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের ওপর গুলি চালাবার চেষ্টা





করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবিয়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।

৪. **জাতির প্রতি নির্দেশ :** মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি নন বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই, তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের ওপরে, আমাদের যেন বদনাম না হয়।

৫. **যুদ্ধের চূড়ান্ত অঙ্গিকার :** বাঙালিরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক। মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো।

৬. **স্বাধীনতার ঘোষণা :** এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

এই ঘোষণার ফলেই মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার ২৪ বছর পর দ্বিখণ্ডিত হওয়ার পথ সূচনা হয়; যদিও ইয়াহিয়া কঠোরভাবে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, তিনি বা তার সেনাবাহিনী এ রকম ঘোষণা সহ্য করবে না। ইয়াহিয়ার এ রকম ঘোষণা প্রতিরোধ করতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের সমর্থন, বিক্রম ও লড়াকু মনোভাবকে মূল অস্ত্র করে গেরিলা যুদ্ধই বিকল্প পন্থা হিসেবে নির্ধারণ করেন; তিনি জানেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামোতে সমরবাহিনীর অংশ হিসেবে বাঙালি সদস্যদের মধ্যে দেশপ্রেম থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানি সেনাদের মোকাবেলা করার মতো সমরশক্তি নেই। তাই ৭ মার্চের ভাষণে তিনি রণনীতি ও রণকৌশল এভাবেই গ্রহণ করার উল্লেখ করেন; গেরিলা যুদ্ধের এক নিখুঁত কর্মপরিকল্পনাই বটে। এই ভাষণ একজন রাজনৈতিক কবির মাস্টার পিসই নয়, বরং বাস্তব, কৌশল ও দিক নির্দেশনার এক অমূল্য দলিল।

৮ মার্চ ১৯৭১। আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ব বাংলায় শুরু হয় 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। তাই তো শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণটি 'রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্র' থেকে পুনঃপ্রচার করা হয়। 'রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা কেন্দ্র' ও 'পাকিস্তান টেলিভিশন, ঢাকা কেন্দ্র' তাদের নাম পরিবর্তন করে 'ঢাকা বেতার' 'ঢাকা টেলিভিশন' নামে প্রচার শুরু করে।

৮ মার্চ ১৯৭১। দেশব্যাপী 'অহিংস ও অসহযোগ' আন্দোলন নতুন উদ্যমে শুরু হয়। স্থানে স্থানে কালো পতাকা উত্তোলন ও সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক ও অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পাকিস্তানের লেনদেন বন্ধ করে দেওয়া হয়। এমনকি ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতিরা টিক্কা খানের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনায় অস্বীকৃতি জানান।

৮ মার্চ ১৯৭১। দেশের বিভিন্ন শহরে অস্ত্রবিক্রির দোকান ও থানা সদর দফতর থেকে স্বাধীনতাকামী মানুষ অস্ত্র সংগ্রহ করতে শুরু করে। বঙ্গবন্ধু 'দশ দফা' দাবি পেশ করেন। গেরিলা যুদ্ধের নিয়ম সংক্রান্ত একটি প্রচারপত্রের বিতরণ কাজ শুরু হয়। পূর্ব বাংলার

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সংসদের সভায় '১৪ দফা' দাবির প্রস্তাব গৃহীত এবং 'স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠনের আহ্বান জানানো হয়।

৯ মার্চ ১৯৭১। যদিও পূর্ব বাংলার কোনো মিছিল বা বিক্ষোভ থেকে বিদেশির বিরুদ্ধে হুমকি প্রদর্শিত হয় না, তবুও বিদেশি নাগরিকরা তাদের স্বদেশে ফিরে যাওয়ার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। জার্মানি দূতাবাসের কর্মচারীরা তাদের পরিবার এবং বিভিন্ন স্থানে অবস্থানরত কর্মচারীরা ঢাকা ছাড়তে শুরু করে। একটি বোয়াক ডিসি-১০ বিমান ব্রিটিশ নাগরিকদের তাদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনার জন্য ঢাকায় অপেক্ষায় থাকে। এমনকি সামরিক বাহিনীর পাকিস্তানি অফিসারদের পরিবারবর্গকে পাকিস্তানের পশ্চিমাংশে পাঠাতে শুরু করে। বিদেশিরা পূর্ব বাংলা ত্যাগ করতে শুরু করলেও বাঙালির অভিমত খুবই স্পষ্ট, 'শেখ মুজিব ও তার দলকে রাষ্ট্রক্ষমতায় বসতে দিতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে নির্বাচনে বিজয়ী দল আওয়ামী লীগ। এখন শাসকগোষ্ঠী বাঙালির অধিকারকে কোনো রকম প্রহসনে পরিণত না করে নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেওয়া উচিত। শেখ মুজিব পূর্ব বাংলার একমাত্র কার্যকর শক্তি, তাই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি বলপ্রয়োগে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করলে তা ব্যর্থ হবেই।

৯ মার্চ ১৯৭১। পল্টন ময়দানে, সত্য-ন্যায়-শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সাত কোটি বাঙালির হয়ে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, বাংলাদেশের স্বাধীতার ঘোষণা মেনে নেওয়ার জন্য স্বৈরাচারী ইয়াহিয়াকে নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, 'পূর্ব বাংলা স্বাধীন হইবে পাকিস্তান অখণ্ড থাকিবে না, অখণ্ড রাখিব না। [...] ১৩ বছর আগে কাগমারী সম্মেলনে আমি 'আসসালামু আলাইকুম' বলেছিলাম। মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দী তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি হয়েও সেদিন আমার কথা অনুধাবন করতে পারেননি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, দুই অংশ যদি একত্রে থাকে তাহলে কালব্যাধি যক্ষ্মার জীবাণু যেমন দেহের হৃৎপিণ্ডের দুই অংশকে নিঃশেষ করে দেয়, তেমনি পাকিস্তানের দুই অংশই বিনষ্ট হবে। তাই বলেছিলাম যে, তোমরা তোমাদের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করো এবং আমরা আমাদের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করি। 'লাকুম দীনুকুম ওলিয়াদীন'। শেখ মুজিবুর রহমান আজ ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে।' তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, ২৫ মার্চের মধ্যে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বাঙালির দাবি মেনে না নিলে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে এক হয়ে তিনি বাঙালির স্বাধীনতার জন্য সর্বাত্মক সংগ্রাম শুরু করবেন। তিনি আরও বলেন, 'পূর্ব বাংলা স্বাধীন হইবে। এই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এখন হইতে প্রস্তুতি নিতে হইবে। এ ব্যাপারে বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হইবেই। চরিত্র গঠন করিতে হইবে। বাংলাদেশ হতে একটি কানাকড়িও যেন বাইরে পাচার না হয় তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। [...] সকল সম্পত্তি রক্ষা করিবার দায়িত্ব আমাদের।' জনসভায় ভাসানীর স্বাক্ষরিত একটি প্রচারপত্রও বিলি করা হয়। এতে বলা হয়, [...] আসুন আজ আমরা বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করি যে, পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জনগণের হাতে গণতান্ত্রিক পূর্ণ ক্ষমতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা আমরণ সংগ্রাম করিয়া যাইব। [...] পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। এর চেয়ে কম কিছু নাই। কারণ অন্য কোনো উপায়ে শোষিত কোটি কোটি





পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নতির স্বয়ং সম্পূর্ণতা আসিতে পারে না।' তিনি ১৪ দফা দাবির ভিত্তিতে আন্দোলনের ডাক দেন।

৯ মার্চ ১৯৭১। ছাত্রলীগের বর্ধিত সভায় শেখ মুজিবের স্বাধীনতার ঘোষণা অনুমোদিত হয়। টিক্কা খান পূর্ব বাংলার গভর্নর হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

১০ মার্চ ১৯৭১। পাকিস্তানের জামায়াতে-উল-উলেমা-ই-ইসলাম-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুফতি মাহমুদ যাই ঘোষণা করেন না কেন, পাকিস্তানের সচেতন মানুষরা ঠিকই বুঝতে পারে যে, পূর্ব বাংলা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ না করা পর্যন্ত বাঙালি এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্রাম নেবে না। পাকিস্তানের জননেতা এয়ার মার্শাল আসগর খান ঢাকা সফর শেষে করাচিতে ফিরে গিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের কোথাও তিনি পাকিস্তানের পতাকা উড়তে দেখেননি এবং পূর্ব বাংলার কার্যত সরকার হচ্ছে আওয়ামী লীগ।

১০ মার্চ ১৯৭১। পাকিস্তান সরকারবিরোধী পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার আন্দোলন আরেক দফা এগিয়ে যায়। বাঙালিদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাঙালি নিজ নিজ অবস্থান থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে থাকে। যেমন বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের পরিস্থিতি বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার জন্য বিদেশি সাংবাদিকদের এক প্রেস সম্মেলনে বলেন, 'বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছা অনিচ্ছাই শেষ কথা। যারা মনে করেন শক্তির দাপটে বাঙালির ওপর তাদের মতামত চাপিয়ে দেওয়া সহজ তাদের চেহারা আজ বিশ্বের দরবারে নগ্নরূপে ধরা পড়েছে।'

১১ মার্চ ১৯৭১। সাড়ে সাত কোটি মানুষের মানবিক অধিকার আদায়ের সপক্ষে সমর্থন দান করার জন্য শেখ মুজিব জাতিসংঘের মহাসচিব উথান্টের কাছে আহ্বান জানান।

১২ মার্চ ১৯৭১। পূর্ব বাংলার সঙ্কট সমাধানের জন্য শেষবারের মতো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি হন শেখ মুজিব। পূর্ব বাংলার সরকার হিসেবে কাজ চালিয়ে যাওয়া আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিব বলেন, 'আমি পূর্ব বাংলার সঙ্কট সমাধান করতে আলোচনায় বসতে রাজি আছি। আমি যা বলেছি, স্পষ্ট করেই বলেছি, আমার জনগণ স্বাধীন নাগরিক হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশে বাস করতে চায়।' প্রতিরক্ষা বাজেট সম্বন্ধে তিনি বলেন, 'দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার আর কোনো সুযোগ নেই, আমি আমার জনগণের রক্তের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না।' পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব বাংলার ভবিষ্যৎ সম্পর্ক তিনি বলেন, 'তারা যদি আমাদের পাকিস্তানের অংশ হিসেবে থাকতে বলে, তবে ভাইয়ের মতো একসঙ্গে থাকাই ভালো।' মুজিব বাঙালির ঐক্যের ওপর জোর দিয়ে যোগ করেন, 'যে ঐক্য কিছুদিন ধরে প্রদর্শিত হচ্ছে এতে দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক সমস্যা মোকাবেলা করতে সাহায্য করবে না, কারণ পূর্ব বাংলার সঙ্গে উপনিবেশের মতো ব্যবহার করা হচ্ছে। সৌদি আরব ও চেকোশ্লাভাকিয়া থেকে পাঠানো হেলিকপ্টার বাঙালি কখনো দেখেনি। বন্যা নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক সহায়তার সঙ্গে লাখ লাখ বাঙালি কোনো খাবার ছাড়াই রাতদিন কাজ করেছে। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, 'আমরা একটি নিয়মানুবর্তী জাতি। যদি রোববারের জনসভায় সেনাবাহিনী তাদের আক্রমণ করতো

তবে তা প্রতিহত করতে জনগণ প্রস্তুত ছিল। আমাদের জনগণ মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে। তারা প্রতিদিন ঘূর্ণিঝড়ে, বন্যায়, কলেরায়, অনাহারে মারা যাচ্ছে। আমরা আরেকবার মরবো এবং সবার জন্য মরব।' বাংলাদেশ যদি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে তাহলে পররাষ্ট্র নীতিতে পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে তিনি যেমন সচেতন তেমনি পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি সমাধানে বিশ্বমতের গুরুত্ব সম্পর্কেও সচেতন।

১২-১৩ মার্চ ১৯৭১। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সারা বাংলাদেশে স্বাধীনতার আন্দোলন অব্যাহত থাকায় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো যে চরম সঙ্কটের মুখে পতিত হয়–এসব বিষয়ে আলোকপাত করে 'দি গার্ডয়ান' ও 'নিউ স্টেটসম্যান' পত্রিকা প্রতিবেদন প্রকাশ করে। 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় মার্টিন এ্যাডন লিখেন–

> পূর্ব বাংলার অর্থনীতি চরম সঙ্কটের মুখে। আওয়ামী লীগের শেখ মুজিবুর রহমানই এখন সরকারের মতো কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তার নির্দেশে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বন্ধ হয়ে গেছে। অর্থ উত্তোলনের ক্ষেত্রে কঠোর বিধিনিষেধ দেওয়া হয়েছে। ব্যবসায়ীরা এক মাসে এক হাজার টাকা ও চাকরিজীবীরা দেড় হাজার টাকার বেশি তুলতে পারবে না। ব্যাংকগুলো অবশ্য এই চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। পাটকলগুলো পাট কিনতে ও মাসিক বেতন প্রদানে সমস্যায় পড়েছে। জাহাজের মালিকরা ধর্মঘটে যোগ না দেওয়ায় রপ্তানি বন্ধ হয়ে গেছে। প্রেসিডেন্টের পদক্ষেপে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এখন প্রেসিডেন্টের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে এর জন্য প্রতীক্ষায় আছে জাহাজের মালিকরা।

পাকিস্তানের অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য দ্রব্যমূল্যের দাম ঊর্ধ্বগতি। পূর্ব বাংলায় চালের দাম শতকরা ২০ ভাগ ও ভোজ্য তেলের দাম শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণ মানুষ ঢাকা ছেড়ে গ্রামে চলে যাচ্ছে। শ্রমিকের সংখ্যাও কমতির দিকে। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি অনির্দিষ্টকালের জন্য চলতে দেওয়া অনুচিত। পাকিস্তানপন্থিরা বলছে যে, আওয়ামী লীগ যা করছে তা ইয়াহিয়ার স্বার্থই পূরণ করছে; আর পাকিস্তান থেকে পৃথক হওয়া আওয়ামী লীগের জন্য বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

পাকিস্তান থেকে পূর্ব বাংলা নিজেকে কতোটুকু স্বাধীন মনে করছে তার সঠিক চিত্র পাওয়া মুশকিল। তবে পাকিস্তানের পশ্চিমাংশের সঙ্গে পূর্ব বাংলার কোনো রকম ডাক, টেলিফোন বা টেলিগ্রাম যোগাযোগ নেই। পাকিস্তানের পশ্চিমাংশে বসবাসকারী পাঁচ লক্ষ বাঙালির সঙ্গেও যোগাযোগ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

রিকশা করে আমি পানি-বিতরণের একটি গাড়ি পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলাম। পানি-বিতরণের গাড়ির পিছনে ছয়জন মানুষ ঝুলছিল। তারা বলছিল, 'জয় বাংলা'। আমার রিকশাচালক মাথা ঘুরিয়ে বলল, 'স্বাধীন বাংলা'। আমি জিজ্ঞেস





করলাম, 'এই দুটো শব্দের মধ্যে পার্থক্য কী?' রিকশাওয়ালা বলল, 'কোনো পার্থক্য নেই।'

নতুন গভর্নর টিক্কা খানের অধীনে কাজ করতে পূর্ব বাংলার বিচারপতিরা অস্বীকৃতি জানান, যা বাঙালি ঐক্যের আরেকটি সাক্ষ্য; মুজিবের আহ্বানে সৃষ্ট এই চেতনার স্রোত বাঙালিকে বহন করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। শেখকে কিছুটা ছাড় দিতেই ইয়াহিয়া ঢাকায় আসবেন, কিন্তু কতোটুকু পারবেন সেটাই দেখার বিষয়। তবে এ সুস্পষ্ট যে, মুজিব যদি তার অনুসারীদের সঙ্গে রাখতে চান তাহলে তাকে অন্তত আওয়ামী লীগের 'ছয় দফা' প্রস্তাব অনুযায়ী রাজস্ব ও বৈদেশিক বাণিজ্যের বিষয়গুলো পূর্ব বাংলার অধীনে রেখে একটি দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থা আদায় করতে হবে। তবে 'ছয় দফা' প্রস্তাব সেনাবাহিনী কোনোমতেই মেনে নেবে না; কারণ জাতীয় বাজেটের অর্ধেকের চেয়েও বেশি পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর ওপর খরচ করা হয়। শেখের আশাবাদী সমর্থকরা যদিও দাবি করেন যে, ইয়াহিয়াকে পূর্ব বাংলার ক্ষমতা আনুষ্ঠানিকভাবে মুজিবের অধীনে হস্তান্তর করতে হবে, তবুও মুজিবের স্বায়ত্তশাসনের দাবি ইয়াহিয়ার কাছে অস্পষ্ট রয়ে গেছে। ইয়াহিয়া বিশ্বাস করেন যে, পূর্ণ স্বাধীনতার চেয়ে একটু কম স্বায়ত্তশাসন পেলেই শেখ মুজিব থেমে যাবেন; এমনকি পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের জন্য পৃথক দুজন প্রধানমন্ত্রীর কনফেডারেশনকে শেখ মুজিব মেনে নিবেন।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকা বিমানবন্দর এলাকায় ঘাঁটি পেতে অপেক্ষায় আছে। তারা অপেক্ষা আছে ইয়াহিয়ার আদেশ পাওয়া মাত্র দ্রুতগতিতে বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পূর্ব বাংলাকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য, যদিও এই সিদ্ধান্ত রাজনৈতিকভাবে মারাত্মক হবে। এরই মধ্যে বাঙালিরা অবশ্য দূরবর্তী যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। পূর্ব বাংলায় দুই ডিভিশন সৈন্যের সঙ্গে রাইফেলের চেয়ে সামান্য শক্তিশালী অস্ত্রধারী ২০ হাজার পূর্ব বাংলা রাইফেলসের (স্থায়ী সীমান্তরক্ষী বাহিনীর) সদস্যরা আছে। বিমান ও নৌযোগে আরও সৈন্য পূর্ব বাংলায় আনানো হবে। কোনো ধরনের ঘটনা সেনাবাহিনী যাতে উস্কে না দেয় সে জন্য কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ঢাকা থেকে উত্তরবঙ্গে সৈন্য সরবরাহের চারটি গাড়ির একটি কনভয় যখন জনতার প্রতিরোধের মুখে পড়ে তখন সেনাবাহিনী গুলিবর্ষণ ছাড়াই সেনাছাউনিতে ফিরে আসছে। সেনাবাহিনী সাধারণ ঠিকাদারদের মতোই বিভিন্ন সরবরাহের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য চরমপন্থি নেতারা সঙ্কট প্রতিরোধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট যদি চরমপন্থি নেতাদের কথামতো কঠোর পদক্ষেপ নেন তবে পূর্ব বাংলায় কী হবে এ নিয়ে সচেতন নাগরিকরা চিন্তিত। মুজিবের দিক থেকে পাল্টা উদ্যোগ না এলে কট্টরপন্থি বাঙালির কাছ থেকে আসবেই। যেমন গেরিলারা গ্রামাঞ্চলের কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মীকে হত্যা করেছে। বাঙালি কট্টরপন্থিদের নিয়ে

একটিই ভয়, তারা পশ্চিম বাংলার মতো নকশাল। আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে চায়, বিশেষত তারা চায় মুজিবকে দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে নিতে।

বাঙালির সাহসিকতার কথা শোনা গেলেও বৃহত্তর আকারে সংঘটিত কোনো প্রতিরোধের নিদর্শন দেখা যায়নি। বাঙালি জাতীয়তাবাদকে ঠিকমতো পরিচালিত করতে পারলে এই পশ্চাদপদ ও হতাশাচ্ছন্ন পূর্ব বাংলার জন্য মূল্যবান পদক্ষেপই হবে। অবশ্য বাঙালিরা বলছে যে, তাদের এই পশ্চাদপদতার জন্য পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ও সমরনায়করাই দায়ী। পূর্ব বাংলার জনসংখ্যা সম্ভবত আট কোটি এবং কার্যকর জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু না করা গেলে এই সংখ্যা আগামী ২৩ বছরে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাবে। পূর্ব বাংলার চাষাবাদের জন্য নতুন কোনো ভূমি নেই; এমনকি গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলের কর্দমাক্ত ধানচাষ উপযোগী ভূমির দিকে ঢাকা শহর দ্রুত ধাবিত হচ্ছে। একমাত্র ভরসা- সেচ ব্যবস্থা চালু করে এবং উন্নত মানের বীজ ও সার সরবরাহ ও ব্যবহার করে চাষাবাদ করা। পূর্ব বাংলার প্রধান রপ্তানি পণ্য যদিও পাট, তবুও সিন্থেটিকস ফাইবারের আবির্ভাবে পাটশিল্প হুমকির মুখে পড়েছে। ব্যাপক প্রনোদনা সত্ত্বেও পাটশিল্প বিঘ্নিত, বিনিয়োগেও বিফল। কোনো কোনো বাঙালি বলতে পারে যে, পূর্ব বাংলাকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ও সমরনায়করা খুবই কৃপণ। কিন্তু পৃথিবীর সবচাইতে জনবহুল এই জনগোষ্ঠীর দুর্দশাগ্রস্ত ভাগ্যের উন্নতি ঘটাতে চাইলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিপূর্ণ ব্যবহার করা আবশ্যক।

আর 'নিউ স্টেটসম্যান' পত্রিকায় ফ্রান্সিস হোপ লিখেন–

> যখন একটি রাজনৈতিক বোমা বিস্ফোরিত হয় তখন বিশ্ব অবাক হয়ে ভাবে–শান্তি এত দীর্ঘ সময় ধরে বিরাজ করছিল? উত্তর আয়ারল্যান্ডের মতো পূর্ব বাংলায় অনেক বছর ধরে অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছে, যা ছিল শান্ত অস্থিতিশীলতা তা এখন বিস্ময়কর, অলৌকিকও বটে, কী করে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার দাবি দমিয়ে রেখেছিল।
>
> শেখ মুজিবুর রহমান ও ইয়াহিয়া খানের মধ্যে একটি আপসরফা হতে যাচ্ছে, যদিও জুলফিকার আলী ভুট্টো আশ্চর্যভাবে নিশ্চুপ। খুব সম্ভব- পূর্ব বাংলা তার জনগোষ্ঠীর জন্য সবচেয়ে বেশি দাবি আদায়ের চেষ্টা করছে; তবে পূর্ব বাংলা ক্ষতিগ্রস্ত হলে এক বা দু'বছরের মাথায় কুর্দিস্তান বা বায়াফ্রার মতো বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাবে। কুড়ি বছর ধরে দুই অংশের মধ্যকার বিরাজমান পার্থক্যের সমস্যাগুলো বিশ্ব এড়িয়ে গেলেও তা আর এড়ানো সম্ভব নয়।
>
> রাষ্ট্রের কাছ থেকে পূর্ব বাংলা মোট রাজস্বের এক-চতুর্থাংশের এবং উন্নয়ন বাজেটের এক-তৃতীয়াংশেরও কম আর সব পণ্যের এক-চতুর্থাংশ এবং বৈদেশিক সাহায্যের এক-পঞ্চমাংশ পেয়ে থাকে। শেষের দুই বরাদ্দ পরিহাসের বিষয়, কারণ বৈদেশিক মুদ্রার প্রায় পুরোটাই আসে পূর্ব বাংলার পাট থেকে।





> [...] পূর্ব বাংলায় দ্রব্যমূল্যের দাম বেশি। চালের দাম পশ্চিমের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ, আর চাকরির ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের মাত্র ১৫ ভাগ ও সেনাবাহিনীতে ১০ ভাগ মাত্র পূর্ব বাংলার দখলে।
>
> বাংলার মানুষ হচ্ছে শোষিত প্রলেতারিয়েত জনগোষ্ঠী, আর পাঞ্জাবের সামরিক লোকজন অনাবশ্যকভাবে বিলাসিতায় ডুবে আছে। চীনের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার জনগণের আপত্তি নেই, তবে কাশ্মীরকে পুনর্দখল করার জন্যে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে তারা পাকিস্তানিদের মতো এতটা আগ্রহী নয়। বাঙালির সমস্যা কাশ্মীর নয়, তাদের সমস্যা পূর্ব বাংলার অর্থ কেন কেন্দ্রে যাবে। এই ক্ষোভ বাঙালি জাতীয়তাবাদের পুনর্জন্ম দিয়েছে। ১৯৭০-এর নির্বাচন পূর্ব বাংলাকে ক্ষোভ প্রকাশের একটি সুযোগ করে দিলেও তা ছিল পাকিস্তানের পশ্চিমাংশের জন্য শুধুমাত্র মত প্রকাশের মাধ্যম। পাকিস্তান পিপলস পার্টির ভুট্টো নানা কারণে নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তার দলের একটি কর্মসূচি আছে। আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবও মোটামুটিভাবে একই অবস্থানে আছেন। তার সফলতা আদর্শগত কারণে অতিদ্রুত এসে গেছে, তবে তাকে বামপন্থি নেতারা পাশ কাটিয়ে অগ্রসর হতে চান।
>
> পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর কাছে 'ছয়দফা' পরিকল্পনা অশুভ ব্যাপার। ভুট্টো 'ছয়দফা'র বিষয়ে ঝুঁকি নিয়ে ঘোষণা দিয়েছেন যে, ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের ব্যাপারে আগাম নিশ্চয়তা না দিলে তিনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেবেন না। ভুট্টোকে নিশ্চয়তা দিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণা দেন এবং শেখ মুজিব এর প্রতিবাদে পূর্ব বাংলায় সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেন। মুজিবের গান্ধীবাদী অহিংস-কৌশল ইয়াহিয়া খানকে ভাবনায় ফেললে তিনি বাধ্য হয়ে ২৫ মার্চে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ ঘোষণা করেন। সঙ্গে সঙ্গে শেখ মুজিব 'চার দফা' দাবি তোলেন। ইয়াহিয়া 'চার দফা' দাবি মেনে না নিলে তিনি অধিবেশনে বসতে অস্বীকৃতি জানান।
>
> ইয়াহিয়া খানকে চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। তবে তার পক্ষে দেশের দুই নির্বাচিত নেতাকে (উভয় নেতাই জনগণের কাছ থেকে পাওয়া পৃথক পৃথক রায় পেয়েছেন।) একত্রে সংবদ্ধ করা কঠিন, কিন্তু নির্বাচিত নেতাদ্বয় পরিষ্কারভাবে একটা কিছু লাভের জন্য অবস্থান নিয়েছেন। শেখ মুজিবই হচ্ছেন পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রকৃত মালিক।
>
> পূর্ব বাংলার 'অহিংস ও অসহযোগ' আন্দোলনের সময়ে, মুজিবের নির্দেশ অনুসারে, ঢাকা একটি অচল শহরে পরিণত হয়েছে। আওয়ামী লীগের প্রতীক হচ্ছে নৌকা এবং প্রতিটি বাড়িতেই কাঠের নৌকা প্রদর্শিত হচ্ছে। পূর্ব বাংলার বাঙালি সৈন্য ও পুলিশ শেখ মুজিবের নির্দেশে চলছে। সামরিক গভর্নরের বাসার কর্মচারীরাও তাদের কাজে বিরতি টেনেছে। সামরিক গভর্নর এখন সামরিক রক্ষীদের হাতে তৈরি করা খাবার খেয়ে দিন কাটান।

গত সপ্তাহের দাঙ্গায় পাকিস্তানের সরকারি সৈন্যরা বেশ কিছু আন্দোলনকারীকে হত্যা করেছে। পশ্চিম পাকিস্তান নিহতের সংখ্যা ১৭১ জন স্বীকার করলেও পূর্ব বাংলা দাবি করছে ৫০০ জন মারা গিয়েছে। এছাড়া পাকিস্তান সরকার উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রের ওপর রাগান্বিত স্কুলশিক্ষকের মতো ক্রুবদ্ধ নীরবতা পালন করছে। অন্য কোনো পন্থায় না গিয়ে ইয়াহিয়া খানই শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনায় বসার জন্য পূর্ব বাংলায় আসতে চাচ্ছেন। কাশ্মীর থেকে লাহোরে একটি বিমান ছিনতাই করে নিয়ে গেলে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের বিবাদ আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ভারতের নিষেধাজ্ঞার কারণে পাকিস্তানের যে কোনো বিমানকে ভারত ঘুরে শিলং হয়ে পূর্ব বাংলায় প্রবেশ করতে হচ্ছে। পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াও এখন সমস্যাপর মুখোমুখি। তাই ইয়াহিয়া খানকে পূর্ব বাংলার শুধু 'ছয় দফা' দাবিই নয়, অনেক জটিল ব্যাপারেও বিবেচনা করতে হবে।

নতুন ফেডারেল সংবিধানের জন্য আওয়ামী লীগ ৪১-দফার একটি খসড়া প্রস্তাব তৈরি করেছে। এই খসড়া অনুসারে 'পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র' পাঁচটি এলাকায় বিভক্ত হবে- বাংলা, সিন্ধু, পাঞ্জাব, পাখতুনিস্তান ও বেলুচিস্তান। প্রতিটি রাষ্ট্র তার নিজস্ব কৃষি, শিল্প, ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স, স্টিল মিল ও যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ নিজেদের মিলিশিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করবে। উর্দু ও বাংলা সমভাবে সরকারি ভাষা হিসেবে বিবেচিত হবে। পৃথক মুদ্রা ব্যবস্থার পূর্বপ্রস্তাব বাদ দেওয়া হলেও প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্য নিজস্ব রিজার্ভ ব্যাংক ও পৃথক বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব রাখা হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে মুদ্রা ব্যবস্থা, পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ক্ষমতা থাকবে। নৌবাহিনীর সদর দফতর হবে বাংলায়, সেনাবাহিনীর সদর দফতর হবে পাঞ্জাবে এবং সিন্ধুতে থাকবে বিমানবাহিনীর সদর দফতর। প্রতিটি অঞ্চলের ক্ষেত্রে আবার নিজস্ব বাহিনী থাকবে। এই প্রস্তাব অনেকটা ব্রিটেনের অর্থনীতির মতো, যা পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের জন্য অনেক বেশি আর পূর্ব বাংলার জনগণের জন্য কিছুই না। কারণ বাঙালি অনেক দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশ অমান্য করে দিন দিন তারা নিজস্ব আস্থা অর্জন করছে। প্রতিদিনই তাদের প্রত্যাশা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শেখ মুজিব রক্তপাত এড়ানোর জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ইয়াহিয়া খানের বেসামরিক প্রশাসনের অধীনে অখণ্ড পাকিস্তান রক্ষার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা দেখে বলা যায় যে, শেখ মুজিব প্রশংসাযোগ্য কাজই করছেন। অনেকে হয়তো প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাহায্য নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পূর্ব বাংলাকে আত্মপ্রকাশ করাতে আগ্রহী। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করলে তার নতুন সরকার, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী যে বছরের পর বছর অবহেলা করছিল তার কারণগুলো অনুসন্ধান করে সমাধান করতে সক্ষম হবে। কিন্তু এখন যা দেখার সময় তা হচ্ছে- কীভাবে উভয় পক্ষ তাদের অনড়





অবস্থান থেকে সরে এসে অধিক পরিমাণের সহিংসতা এড়াতে পারে। যদি তা না করা যায় তবে পূর্ব বাংলার মৃতসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে।

১২ মার্চ ১৯৭১। পূর্ব বাংলা অর্থনৈতিক সঙ্কটে পতিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ বাণিজ্যিক বিনিময়ের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা শিথিল করে। যথা–

১. দীর্ঘ সময়ব্যাপী ব্যাংক খোলা রাখা।

২. অর্থ বিনিময় ও মাল খালাসের সময়সীমা বৃদ্ধি করা।

৩. পাকিস্তানের পশ্চিমাংশ থেকে পণ্য পরিবহন আসার অনুমতি দেওয়া।

৪. ব্যবসায়ীদের জন্য সপ্তাহে দশ হাজার রুপি পর্যন্ত অর্থগ্রহণের অনুমোদন দেওয়া।

৫. বন্দর কর্তৃপক্ষকে সবধরনের সহযোগিতা দেওয়া।

৬. শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশনের কারখানাগুলো চালু করা।

৭. কৃষি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখা।

১২ মার্চ ১৯৭১। মুজিবের সঙ্গে আলোচনার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যাত্রা গোপন রেখে ঢাকার পথে করাচি পৌঁছে। অন্যদিকে ঢাকার ১৭২ মাইল পশ্চিমে বরিশাল জেলে ২০০ জন বন্দি জেলরক্ষীদের ওপর হামলা চালায়। জেলরক্ষীর গুলিতে দু'জন বন্দি নিহত ও বাইশজন আহত হয়। লোহার রড ও অন্যান্য অস্ত্রের আঘাতে ত্রিশজন পুলিশ আহত হয়। পুলিশ বলে, 'বন্দিদের জেলখানার মূলগেট ভাঙার উদ্যোগ ব্যর্থ হয়, তবে বাইশজন জেলখানার উঁচু দেওয়াল অতিক্রম করে পালিয়ে গেছে। গণআন্দোলন চলাকালে ১৩ মার্চ পর্যন্ত পূর্ব বাংলার জেলখানা থেকে প্রায় ৩৮৫ জন বন্দি পালিয়ে গেছে।

১২ মার্চ ১৯৭১। ঢাকার মতোই অন্যান্য শহরে সামরিক সরকার কিছু পদক্ষেপ নেয়, তবে এক্ষেত্রে সেনাবাহিনীকে ধন্যবাদ দেওয়ার কিছুই নেই। তারা ঢাকা ও অন্যান্য শহর পরিচালনার দায়িত্ব এক রকম শেখ মুজিবের অধীনেই ছেড়ে দেয়। আওয়ামী লীগের কর্মীরা 'ছয় দফা'র প্রতীক ছয়টি রুপালি তকমাবিশিষ্ট সবুজ টুপি পরে 'শান্তিরক্ষা'র কাজ করে যায়, তারা পুলিশের চেয়েও সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করে। পাঁচ দিনের সর্বাত্মক ধর্মঘট মুজিবের জন্য বিরাট সাফল্য বয়ে আনে। মুজিব নতুন প্রতিরোধ-কর্মসূচি ঘোষণা করেন–

১. রাজস্ব প্রদান বন্ধ করা।

২. সরকারি অফিস-আদালত-স্কুল-বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখা।

৩. সকল ভবনে কালো পতাকা উত্তোলন করা।

৪. নতুন সর্বাত্মক ধর্মঘটের মাধ্যমে 'অহিংস ও অসহযোগ' আন্দোলনকে বিস্তার করা।

১২ মার্চ ১৯৭১। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সামরিক শাসনের ব্যবস্থা বজায় রাখতে যাত্রী পরিবাহী বিমানের মাধ্যমে ঢাকায় পাকিস্তানি সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকেন। তিনি রাজপথে লড়াই করার জন্য ট্যাঙ্কে চাকা লাগিয়ে প্রস্তুত করার নির্দেশ দেন; তবুও সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনে শেখ মুজিবের অহিংস নীতি বহাল থাকে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের উচিত, শেখ মুজিবের ৭ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণার পর বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া। তিনি যেহেতু তা করতে নারাজ তাই শেখ মুজিবের সঙ্গে আপস করে পরিস্থিতি যত দ্রুত সম্ভব সংবরণ করা আবশ্যক। এর সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে মেনে নেওয়া উচিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে শেখ মুজিবের বেঁধে দেওয়া চারটি শর্ত। যদিও দুটো সহজেই মেনে নেওয়া যায়–(এক) পাকিস্তানি সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া; (দুই) সেনাবাহিনী কর্তৃক নিরীহ ও নিরস্ত্র মানুষ হত্যার তদন্ত করা। সেনাবাহিনী যে কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে তা ব্যারাকে থেকেও করতে পারবে; এবং তদন্তের ফলাফল সেনাবাহিনীর জন্য মারাত্মক কিছু হবে না। অবশ্য বাকি দুটি মেনে নেওয়া অসম্ভব–(তিন) সামরিক শাসন পুরোপুরিভাবে প্রত্যাহার করা, (চার) জনগণের প্রতিনিধিদের অধীনে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তর করা। কারণ এর বিকল্প কোনো কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়নি, বেসামরিক সরকার সূক্ষ্মভাবে প্রশাসনের কাজ চালাতে একটি শক্তিশালী প্রশাসনিক কাঠামোর প্রয়োজন। এই কাজ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলেই কাজটি সমাধা করা সম্ভব। জাতীয় পরিষদ সার্বভৌম একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হলে নতুন সংবিধানে প্রেসিডেন্টের ভেটো প্রদানের ক্ষমতা বিলুপ্ত হবে; কিন্তু সেই ক্ষমতা অকার্যকর হয়ে পড়ে, কারণ শেখ মুজিব সহজেই সামরিক শাসন উপেক্ষা করে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিদের সহযোগিতায় 'ছয় দফা' প্রস্তাবকে নতুন সংবিধানে নিশ্চিতভাবে গৃহীত করিয়ে নিতে পারেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া অবশ্য মনে করেন যে, শিথিল ফেডারেশন ব্যবস্থা অখণ্ড পাকিস্তানের সমাপ্তি ঘটাবে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পূর্ব বাংলায় বলপূর্বক দমন প্রক্রিয়া চালালে সঙ্কট সমাধানের সম্ভাবনা অতি অল্পই থেকে যায়, কিন্তু তার জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে সেই পথে অগ্রসর হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি যদি এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তাহলে পাকিস্তানে যুদ্ধের সূচনা হবে এবং যুদ্ধের সূচনা ঘটলে ব্রিটেনের জন্য তা মহাসমস্যা হবে; কারণ পাকিস্তানের সঙ্গে তার অর্থনৈতিক সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। বায়াফ্রার যুদ্ধে নাইজেরিয়ার সরকারকে ব্রিটেন যে অস্ত্র সরবরাহ করেছিল যেগুলো বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নির্মূল করতে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু পাকিস্তানের ক্ষেত্রে তাকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্ব বাংলার সঙ্কটের সমাধান সন্ধান করা উচিত, কারণ–

১. পূর্ব বাংলা এমন এক অঞ্চল যার সীমান্ত ইতোমধ্যে নির্ধারণ করা হয়ে গেছে, তাই বায়াফ্রারের ক্ষেত্রে দাবিকৃত ভূখণ্ডে জেনারেল ওজুকুর যে সমর্থন ছিল তার চাইতে অনেক বেশি সমর্থন রয়েছে শেখ মুজিবের।

২. পূর্ব বাংলার ৭৫ মিলিয়ন বাঙালি শুধু পাকিস্তানের পশ্চিমাংশের জনগণ থেকে সাংস্কৃতিকভাবেই পৃথক নয়, তারা শুধু আত্মসচেতন ও দৃঢ়চেতা জাতি হিসেবেই বিকশিত হয়নি, বরং পাকিস্তানের সমগ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বাঙালিই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কোনো ব্রিটিশ সরকারের পক্ষেই বাঙালির বিরুদ্ধে পাকিস্তানের যুদ্ধে অংশগ্রহণ





করা সম্ভব নয়। এমনকি ব্রিটেনকে পাকিস্তানের মূল অস্ত্র সরবরাহকারী হিসেবে ভাবাও চিন্তাতীত।

১৩ মার্চ ১৯৭১। কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বাংলার বেসামরিক শ্রমিকদের ধর্মঘট পরিত্যাগ করে কাজে ফিরে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়। হুমকির সুরে বলে যে, অন্যথায় সামরিক আইন ভাঙার জন্য শ্রমিকদের দণ্ড দেওয়া হবে। তবে শেখ মুজিব কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ উপেক্ষা করার জন্য শ্রমিকদের পাল্টা আহ্বান জানান।

১৩ মার্চ ১৯৭১। মওলানা ভাসানী রাজবন্দিদের মুক্ত করার জন্য 'জেলভাঙা' আন্দোলনের ডাক দেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া লাহোরে সর্বদলীয় বৈঠক আহ্বান করেন, শুধু ঢাকায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হলে যোগ দেওয়ার সম্মতি প্রদান করেন শেখ মুজিব।

১৪ মার্চ ১৯৭১। একদিকে বঙ্গবন্ধু চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন সেনাছাউনিতে কর্মরত বাঙালি সৈন্যদের পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে মোকাবেলা করার জন্য প্রতিরোধ গড়ে তোলার নির্দেশ দেন। অন্যদিকে ভুট্টো সামরিক সরকারের প্রতি আহ্বান জানান যে, কেন্দ্রীয় ক্ষমতা ইয়াহিয়া সরকারের অধীনে রেখে পূর্ব বাংলা আওয়ামী লীগের ও পাকিস্তানের পশ্চিমাংশের কয়েকটি প্রদেশে পিপিপির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য।

১৪ মার্চ ১৯৭১। পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি উগ্র হওয়ার পূর্বলক্ষণ পরিদৃশ্যে, একদিকে একযোগে ঢাকার সকল সংবাদপত্র 'আর সময় নেই' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে বলে যে, অবিলম্বে শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা উচিত। আর অন্যদিকে প্রবাসী নাগরিকরা তাদের স্বদেশে ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ সরকারসহ বেশ কয়েকটি পশ্চিমা দেশের সরকার তাদের নাগরিকদের পূর্ব বাংলা ত্যাগ করার নির্দেশ দেয়।

১৫ মার্চ ১৯৭১। 'জিন্নাহ'র স্বপ্ন বিলীন' শীর্ষক প্রবন্ধে 'টাইম' ম্যাগাজিন লিখে–

If we begin to think of ourselves as Bengalis, Punjabis and Sindhis first, and Moslems and Pakistanis only incidentally, then pakistan is bound to disintagrate- Mohammed Ali Jinnah, 1948.

The blood was still flowing from the murderous communal clashes that followed the 1947 partition of the Indian subcontinent when Pakistan's founder gave voice to that fear. Last week blood flowed again as the world's fifth most populous nation (130 million), divided between a wheat-growing West with tall, light-skinned people and a nice growing East with short dark-skinned people, moved ominously toward a breakup-or a civil war.

The man behind the impending split is Sheik Mujibur (Mujib) Rahman, the unchallerged political leader of the more populous, poverty-stricken, eastem segment. Pakistan, as it stands today, is finished, "Mujib told TIME Correspondent Dan Coggin in Dacca last week. "There is no longer any hope of a settlement." He urged

that East and West Pakistan adopt separate constitutions and that his followers refuse to pay taxes to the central government, which is situated in the West. He seemed on the brink of an outright declaration of independence for what he calls Bangla Desh (Bengal State), which would become the world's eighth most populous nation. If Mujib should make such an announcement, open warfare might well erupt between the East Pakistanis and the estimated 60,000 army troops, mostly Westerners, in their midst.

Poles Apart. The crisis is an extension of the riofing over the central governments neglect of East Pakistan that helped torce President Mohammed Ayub Khan to resign two years ago. Ayub's successor authyoritarian but fair-minded General |Agha Mohammed Yahya Khan, held out hope that the long subservient East would have a greater voice in running the country.

Last December he held elections for a Constituent Assembly that would draft a new consitution- Pakistan's fourth since 1947. Yahya thought Sheik Mujib and his restive Awami League would win perhaps 60% of the Easts allotment of 169 seats in the 313 seat Constituent Assembly. The remaining East Pakistan delegates, Yahya figured, would align themselves with West Pakistani parties and prevent Mujib from winning majority control over the entire country. But in a situnning victory that amounted to a vote for wide-ranging autonomy, if not outright independence. Mujib's Awami League won 167 of the 169 seats and an overall majority in the Assembly.

Strengthened by the mandate. Mujib pressed a sixpoint program damanding that East Pakistan handle its own taxation, toreign trade and foreign aid, thereby bringing an end to the West's longtime dominance. Mujib accuses West Pakistan, with 58 million people, of taking 70% of the nation's foriegn aid and 70% of its imports and of monopolizing 85% of the central bureaucracy and 90% of the army. By contrast, the more populous East Pakistan, with 72 million people, remains one of the world's most densely populated regions (1,400 per sq. mi.) one of the poorest ($50 per capita income a year), and one of the most disaster-prone (last year's Ganges Delta cyclone killed as many as 500,000 East Pakistanis).





In West Pakistan, ex-Foreign Minister Zulfikar Ali Bhutto and his Pakistan People's Party emerged as the strongest force, capturing 83 of 144 seats. Bhutto 43, and Mujib 48, are poles apart. Son of a vealthy feudal landowing family, Bhutto is pro-Chinese and anti-India. Mujib product of amiddle-class village family. is pro-western and would like to make peace with India. More important, most of West Pakistan's capitalists, bureaucrats and army officers support Bhutto, who opposes Mujib's six points because they would destroy Pakistan's unity and his own ambitions.

Following the December elections, Mujib twice turned down Yayha's invitations to confer in Islamabad, the national capital located in the West. Yahya went to Dacca. the capital of East Pakistan and so did Bhutto. They got nowhere with Mujib, who warned stiffly that the minority would no longer rule the majority.

To Their kness, Two days before the Constituent Assembly was set to convence in Dacca last week, Yahya postponed is indefinitely to give the political leaders a chance to reach an understanding. The postponement infuriated the Bengtalis. "I am not imposing the six-point program on West5 Pakistan," declared Mujib, "but the people of Bangla Desh are intitled to it. and they will have it." In protest, Mujib called an all day general strike for the following day, and half-day strikes for the rest of the week, shuttering offices, shops and factories and halting trains, planes and even rickshas. Angry mobs carrying bamboo staves the weapon Mujib prescribes, roared "Joi Bangla" (Victory of Bengal) through |Dacca's seamy streets. At least 25 died in Dacca in clashes with soldiers; another 100 were killed at the port city of Chittagong. Mujib denounced the army shooting as an 'unforgivable sin' and warnd; "There will be civil war if they do not withdraw."

At week's end Yahya Khan announced in a radio broadcast that the Constituent Assembly would convence after all on March 25. "As long as I am in command of the armed forces. I will ensure the complete ant absolute integrity of Pakistan." Nevertheless, it seemed doubtful that Yahya's decision to convene the assembly would pacify Mujib. Two days earlier, the East P)akistani leader said of the West Pakistanis; "I will break then and bring them to

their knees. After such a statement, an outright declaration of independence could be little more than an anticlimax.

১৫ মার্চ ১৯৭১। বঙ্গবন্ধু ৩৫টি নির্দেশাবলী প্রকাশ করে বেসামরিক প্রশাসনকে আওয়ামী লীগের অধীনে এনে পূর্ব বাংলাকে 'বাংলাদেশ' হিসেবে নথিপত্রে ঘোষণা করেন। ফলে পূর্ব বাংলা ও পাকিস্তান দুটো পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে নথিপত্রে কাজ চালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পূর্ব বাংলার সঙ্কটময় পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান মেশিনগানসহ অর্ধ ডজন সামরিক ট্যাঙ্ক নিয়ে ঢাকায় এসে পৌঁছেন। প্রেসিডেন্টের মুখপাত্র জানান, "শেখ মুজিবের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আলোচনা করার জন্য ঢাকায় এসেছেন।' কয়েক প্লাটুন রাইফেলধারী সেনা প্রহরে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে, না দু'মাইল দূরে শেখ মুজিবের তিন তলা বাসভবনে উভয় নেতা মিলিত হবেন তা অস্পষ্ট, তবে মেরামত কাজ চলার অজুহাতে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের তিনটি ফ্লোর বন্ধ করে দেওয়া হয়। শেখ মুজিবের বাসভবনে সাদা পোশাক পরা আওয়ামী লীগের কর্মীরা প্রেসিডেন্ট সফর সংক্রান্ত জরুরি এক বৈঠকে বসে। প্রেসিডেন্ট এবং শেখ মুজিব পরস্পর মিলিত হওয়ার বিষয়টি সরকারিভাবে নিশ্চিত করা হয়নি। তবে ঢাকায় পৌঁছে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান স্বপ্রণোদিতভাবে বিমান থেকে নেমে একটি কালো আমেরিকান গাড়িতে চেপে বিমানবন্দর ত্যাগ করেন, অবশ্য যাওয়ার পথে রাস্তার পাশে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকা ব্রেনগানসহ প্রায় এক ব্যাটালিয়ন সৈন্যকে গাঢ় রঙের স্যুট পরা ও পেছনের সিটে বসা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান হাত নেড়ে অভিবাদন জানান। তারপর তিনি প্রেসিডেন্ট ভবনে পৌঁছে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। কিছুক্ষণ পর প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক প্রেসিডেন্ট ভবন ত্যাগ করেন। প্রেসিডেন্টের আগমনে সাংবিধানিক সঙ্কট সমাধান হবে কী না তা বাঙালির কাছে অস্পষ্ট থাকলেও শেষ পর্যন্ত তিনি যে ঢাকায় এসেছেন তাই অবাঙালির মনে এক ধরনের স্বস্তির প্রলেপ মেখে দেয়। কারণ বাংলার পরিস্থিতি জটিল করার পিছনে তার অনুমোদন অনেক।

১৫ মার্চ ১৯৭১। বেতার-ভাষণে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতির উদ্দেশে ২৩ মার্চ ভাষণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। বেতার ভাষণে ইয়াহিয়া যে প্রভুসুলভ মনোভাব প্রদর্শন করেন তা পূর্ব বাংলার সঙ্কটের সমাধানের সম্ভাবনা কঠিন। তাই তাকে যথেষ্ট উদার হয়ে রাজনৈতিক কৌশলের পরিচয় দিতে হবে। তিনি দিতে অক্ষম হলে এবং ইয়াহিয়া পূর্ব বাংলার সেনা মোতায়েনের বিপরীতে শেখ মুজিব যদি তার দলের চরমপন্থিদের শান্ত রাখতে অক্ষম হন তাহলে পূর্ব বাংলায় ঐতিহাসিক এক যুদ্ধ অনিবার্যভাবে দেখা দিবে; কারণ, বাঙালিরা বলে, '৭ মার্চের ভাষণে শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন।' অন্যদিকে আওয়ামী লীগ নতুন করে উপযোগী ও শিল্প সংক্রান্ত সংস্থাগুলো বিধি-নিষেধের বাইরে রেখে, স্কুল, আদালত ও সরকারি অফিস বন্ধ রাখার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে; তবে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে অর্থের সঙ্কট দেখা দেয়; কারণ ব্যাংকগুলো পাকিস্তানের পশ্চিমাংশ থেকে নগদ অর্থ সংগ্রহ করতে পারছে না। একই সঙ্গে পাকিস্তানিরা বিপুল অর্থ সঙ্গে নিয়ে পূর্ব বাংলা ত্যাগে ব্যস্ত, ফলে বাঙালি ও অবাঙালির মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ থেকে সম্পদ পাচার বন্ধ করার জন্য বাঙালি ছাত্ররা চেকপোস্ট বসায়। দুপুরে বিমানবন্দরের চেকপোস্টে একটি স্কুটারকে থামানো হয়। একজন আরোহী বন্দুক





বের করে গুলি করে। গুলিবর্ষণের ফলে একজন রিকশাচালক আহত হয়। আরোহী ও তার সহযোগী পালাতে উদ্যত হলে ছাত্ররা তাদের ধাওয়া করে। এক সময় তাদের ওপর গণপিটুনি শুরু হয়। লাঠিও ব্যবহার করা হয়। গণপিটুনি শেষ হলো আরোহী ও তার সহযোগীকে রক্তাক্ত ও মৃত অবস্থায় রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখা যায়। সরকারিভাবে জানানো হয়, 'দু'জন আহতকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে ঢাকার পরিস্থিতি কতটুকু উত্তপ্ত এ ঘটনাই এর বাস্তব প্রমাণ।' আওয়ামী লীগ এই সঙ্কট সমাধানের জন্য নির্দেশ দেয় যে, বাঙালি জনগণ যেন পাকিস্তানিদের সম্পত্তি ক্রয় না করে।

১৬ মার্চ ১৯৭১। প্রথম দফায় শেখ মুজিবের সঙ্গে ইয়াহিয়ার আড়াই ঘণ্টা বৈঠক হয়। ইয়াহিয়া ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর জন্য দুঃখ প্রকাশ করে একটি রাজনৈতিক সমাধানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। শেখ মুজিব জানেন যে, বাংলার মানুষ স্বাধীনতার জন্য আত্মহারা, তাই তিনি জাতীয় পরিষদে যোগদানের ব্যাপারে 'চারদফা' প্রস্তাবের ওপর জোর আরোপ করেন, এতে একদিকে যেমন প্রকাশিত হয় জনগণের ইচ্ছার কথা, তেমনি অন্যদিকে শান্তিপূর্ণভাবে একটি রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছানোর জন্য ইয়াহিয়াকে দেওয়া হয় শেষ সুযোগ। তাই বঙ্গবন্ধু ও ইয়াহিয়ার মধ্যে চুক্তি হয় যে, 'চারদফা' শর্ত পূরণের ভিত্তিতে উভয়পক্ষের উপদেষ্টারা একটি অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবেন। এমনকি 'ছয় দফা' পরিকল্পনার ভিত্তিতে অদূর ভবিষ্যতে যে শাসনতন্ত্র রচিত হবে তার আলোকেই কেন্দ্র ও পূর্ব বাংলার মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হবে, তবে ভুট্টোর সঙ্গে আলাপের প্রয়োজন আছে বলে ইয়াহিয়া উল্লেখ করেন। আড়াই ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক শেষে ইয়াহিয়া তারযোগে ভুট্টোকে ১৯ মার্চ ঢাকা আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান। অন্যদিকে চট্টগ্রাম বন্দরের শ্রমিক-কর্মচারীরা চীন থেকে আমদানি করা সমরাস্ত্রবাহী জাহাজের মাল খালাসে অস্বীকৃতি এবং 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' এক বিবৃতিতে পূর্ব বাংলা থেকে সেনা প্রত্যাহার দাবি জানায়।

১৭ মার্চ ১৯৭১। শেখ মুজিব ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনার কে সি সেনগুপ্তের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় করেন যে, যদি বাঙালির ওপর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আঘাত হানে তবে ভারত সম্ভাব্য সকল সহযোগিতা প্রদান করবে এবং ২৪ মার্চের বৈঠকে এ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

১৭ মার্চ ১৯৭১। প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে মুজিব ও ইয়াহিয়ার দ্বিতীয় দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে দু'পক্ষের পরামর্শদাতারাও যোগ দেন। এ বৈঠকে 'চারদফা' শর্তসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। বেসামরিক প্রশাসনকে সাহায্য করার জন্য কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে ২ মার্চ থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত সামরিক বাহিনী তলব করা হয়, সে সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য সামরিক কর্তৃপক্ষ একটি কমিশন নিয়োগ করবে। আবারও 'ছয় দফা' প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত সংবিধান প্রণয়নের যৌক্তিকতা উত্থাপন করা হয়। ইয়াহিয়া স্বাভাবিকভাবেই বঙ্গবন্ধুর 'ছয় দফা' প্রস্তাবের দাবি মেনে না নিয়ে এক ঘণ্টা স্থায়ী বৈঠকের মুলতবি ঘোষণা করেন। বৈঠক শেষে বঙ্গবন্ধু বলেন, আন্দোলন চলবেই। আর ইয়াহিয়া গোপন বৈঠকে বসেন টিক্কা খানের সঙ্গে। তারপর টিক্কা খান রাত দশটার দিকে টেলিফোনে জি.ও.সি. মেজর জেনারেল খাদেম হোসেন রাজাকে নির্দেশ দেন, 'বাঙালি

জাতিকে হত্যা করার নীলনকশাটি চূড়ান্তভাবে দাখিল করতে। অন্যদিকে টিক্কা খান ২ মার্চ থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগ দ্বারা ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। আর শেখ মুজিব তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন।

১৭ মার্চ ১৯৭১। একদিকে চট্টগ্রামের এক জনসভায় মওলানা ভাসানী বলেন, 'পূর্ব বাংলা এখন স্বাধীন। সাড়ে সাত কোটি বাঙালি এখন স্বাধীনতার জন্য ঐক্যবদ্ধ।' অন্যদিকে 'স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' ঢাকায় ২৩ মার্চ 'পাকিস্তান দিবস'কে 'প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে পালনের জন্য কর্মসূচি ঘোষণা করে। একই সঙ্গে আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্থানে রাইফেল ব্যবহারের প্রশিক্ষণ শুরু হয়। ঢাকার বাইরেও শিক্ষার্থীরা ও তরুণ-তরুণীরা বাঁশের লাঠি হাতে নিয়ে প্রকাশ্যে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে, তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় অবসরপ্রাপ্ত বাঙালি সৈনিক ও পুলিশ সদস্য দ্বারা।

১৮ মার্চ ১৯৭১। ভোর রাত। মেজর জেনারেল খাদেম হোসেন রাজা ও মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী মিলিতভাবে সুপরিকল্পিতভাবে বাঙালি জাতিকে হত্যা করার নীলনকশাটি ঢাকার ক্যান্টনমেন্ট জি.ও.সি অফিসে দাখিল করেন। ইয়াহিয়া-টিক্কার গোপন বৈঠকে বাঙালি জাতিকে হত্যা করার নীলনকশাটি প্রণীত হয়। জেনারেল টিক্কা খানের অনুমতি পাওয়ার পর নীলনকশাটি বিভিন্ন সেনাছাউনিতে পাকিস্তানি সেনাধিনায়কদের কাছে পাঠানো হয়, বিশেষ করে জেনারেল আবদুল হামিদ খান (চিফ অফ আর্মি স্টাফ), লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ এ কে নিয়াজি (কো-কমান্ডার), জেনারেল আকবর হোসেন (ডাইরেক্টর জেনারেল), মেজর জেনারেল ওমর (চেয়ারম্যান, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কমিশন), মেজর জেনারেল কমর আলী মীর্জা (ডাইরেক্টর সাপ্লাই এন্ড ট্রান্সপোর্ট), মেজর জেনারেল মিটঠা খান (কোয়ার্টারস মাস্টার জেনারেল), মেজর জেনারেল খোদা দাদ (এডজুটেন্ট জেনারেল), মেজর জেনারেল গুল হাসান (চিফ অব দি জেনারেল স্টাফ), ব্রিগেডিয়ার আনসারী (স্টেশন মাস্টার, ঢাকা) প্রমুখের কাছে।

১৮ মার্চ ১৯৭১। দেশব্যাপী সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি অব্যাহত থাকে। দেশ চলতে থাকে বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ও তার প্রত্যক্ষ নির্দেশে। তিনি যেভাবে আদেশ দেন সেভাবেই চলতে থাকে অফিস-আদালতসহ সবকিছু। সকল শ্রেণীপেশার মানুষ উন্মুখ হয়ে ওঠে স্বাধীনতা লাভের উদ্দীপনায়। এরই মধ্যে সামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকরা এগিয়ে আসেন স্বাধীনতার আন্দোলনকে সফল করতে, তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য। 'স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'-এর কর্মীরাও অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম প্রকাশ করে বিভিন্ন স্থানে মতবিনিময়ের সভা চালিয়ে যায়। দেশের বিভিন্ন স্থানে মুক্তিপাগল সাধারণ মানুষ সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। মহিলা পরিষদের মহিলারাও যুক্ত হন। অন্যদিকে পাকিস্তানি জান্তারা সামরিক ঘাঁটিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গোপনে গোলাবারুদ ও পাকিস্তানি সৈনিক পূর্ব বাংলায় এনে জড়ো করতে থাকে। পাকিস্তানি





শাসকগোষ্ঠী ও সমরনায়করা বাঙালির স্বাধীনতার আন্দোলনকে দমাতে একটু একটু করে অগ্রসর হতে থাকে।

১৮ মার্চ ১৯৭১। মুজিব ও ইয়াহিয়ার তৃতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অন্তর্বর্তী সমস্যা মীমাংসা করার জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করতে প্রেসিডেন্টের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এম এম আহমদ বিমানযোগে ঢাকায় এসে পৌঁছেন। আওয়ামী লীগের উপদেষ্টাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'রাজনৈতিক মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর 'ছয় দফা' প্রস্তাব কার্যকরী করার প্রশ্নে দুর্লভ কোনো সমস্যা দেখা দেবে না। এমনকি অন্তর্বর্তী পর্যায়েও না।' অন্যদিকে 'স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' দাবি করে যে, ইয়াহিয়া যেন অতিসত্বর পাকিস্তানি সৈন্যকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেন। প্রেসিডেন্ট তা করতে নারাজ।

১৮ মার্চ ১৯৭১। রাত। করাচি। পিপলস পার্টির নেতা জেড এইচ ভুট্টো বলেন, 'যদি ঢাকায় পাকিস্তানের স্বার্থ নিয়ে আপস করা হয় তবে আমার দল পূর্ব বাংলার বেসামরিক অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্বের মতোই পাকিস্তানের পশ্চিমাংশ অচল করে দেবে। এর আগে আমি ঢাকায় প্রেসিডেন্ট ও শেখের সঙ্গে আলোচনায় বসতে অস্বীকৃতি জানাই। তিনি সাংবাদিকদের আরও বলেন, 'আমার দল নিখিল পাকিস্তানের জনগণের ইচ্ছাকাঙ্ক্ষার রক্ষাকর্তা। পাকিস্তানের পশ্চিমাংশের জনগণের স্বার্থ ধূলিসাৎ করে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে আমি মেনে নেব না। যদি পূর্ব বাংলার জনগণের সামর্থ্য পরীক্ষা করে নেওয়া হয়ে থাকে, তবে এবার পাকিস্তানের পশ্চিমাংশের শক্তি প্রদর্শনের পালা।'

১৯ মার্চ ১৯৭১। জয়দেবপুরের রাজবাড়িতে অবস্থানরত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সদস্যদের পাকিস্তান সামরিক কর্তৃপক্ষ অস্ত্র সমর্পণের নির্দেশ দিলে তারা তা অমান্য করেন। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি ব্যাটালিয়নকে নিরস্ত্র করার পাকিস্তানি প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দেয় বাঙালি সৈন্যরা। এ ঘটনায় জড়িত বিদ্রোহী সৈন্যদের পক্ষে বাঙালি জনসাধারণ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম মোকাবেলা করে, রাস্তাঘাটে হাজারও বাঙালির সমাবেশ ঘটে। তারা ব্যারিকেড দিয়ে পাকিস্তানি সৈন্যদের গাড়ি চলাচল প্রতিরোধ করে। জয়দেবপুর থেকে চৌরাস্তা পর্যন্ত ব্যারিকেড থাকায় হানাদার বাহিনী পায়ে হেঁটে চৌরাস্তায় পৌঁছলে স্থানীয় জনতার সশস্ত্র প্রতিরোধ সামাল দিতে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করে। জনতার পক্ষে প্রচুর হতাহত হলেও জনতা ও সৈন্যের মধ্যে গুলি বিনিময় বন্ধ করা যায়নি, চলতে থাকে সশস্ত্র লড়াই। টঙ্গী ও জয়দেবপুরের পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে বিক্ষুব্ধ জনতার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে ৫০ জন নিহত ও ২০০ জন আহত হয়। বঙ্গবন্ধু টঙ্গী ও জয়দেবপুরে হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন, 'তারা যদি মনে করেন যে, বুলেট ও শক্তির বলে জনগণের শক্তিকে দাবিয়ে রাখা যাবে তাহলে আহম্মকের স্বর্গে তারা বাস করছেন।' ট্রেনিংপ্রাপ্ত একদল এস.জি. কমান্ডো গ্রুপের দ্বারা সৈয়দপুরেও ধ্বংসাত্মক ও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। ইয়াহিয়া বাধ্য হয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসেন। অবশ্য এর আগে এম. এ. জি. ওসমানীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে বৈঠকে বসেন, ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনায় বিফল হলে আওয়ামী

লীগের কী করা উচিত এ বিষয়ে আলোচনা করেন। এ সভায় স্বাধীনতা-সংগ্রামের পরিকল্পনার ওপর ব্যাপক পর্যালোচনা করা হয়।

**১৯ মার্চ ১৯৭১**। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এবং আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় কয়েক দফায় আলোচনায় বসেন। দেশের সাংবিধানিক সঙ্কট সমাধানে তারা অতীতে কট্টর অবস্থান নিলেও বর্তমানে কিছুটা নমনীয় হন। ঘোষণা দেওয়া হয় যে, শেখ মুজিবের তিনজন উপদেষ্টা ড. কামাল হোসেন, তাজউদ্দীন আহমদ ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রেসিডেন্টের সহযোগীদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন। শেখ বলেন, 'আগামীকাল যখন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আবার আলোচনায় বসবো তখন আমার সঙ্গে আওয়ামী লীগের ছয়জন সহযোগী থাকবেন।' অন্যদিকে প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ সূত্র জানায় যে, প্রেসিডেন্ট তিনটি প্রস্তাবের ভিত্তিতে শেখ মুজিবুরের সঙ্গে আলোচনায় বসেন–(এক) উভয় অংশে প্রাদেশিক সরকারের অধীনে ক্ষমতা থাকবে। (দুই) সেনাবাহিনী সংবিধান গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্র শাসন চালিয়ে যাবে; (তিন) দ্বিতীয় প্রস্তাবের বিকল্প হিসেবে উভয় অংশের নেতাদের সমন্বয়ে কেন্দ্রে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও সংবিধান গঠন করা হবে। শেখ কোনো অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান গ্রহণ করবেন না, সেখানে তার চূড়ান্ত স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা থাকবে না। স্বায়ত্তশাসনের বিতর্ক এড়ানোর জন্য প্রেসিডেন্ট বলেন, 'সংবিধান গঠন না হওয়া পর্যন্ত কোনো প্রাদেশিক সরকার গঠিত হতে পারবে না।' প্রেসিডেন্ট অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের ওপর জোর দিয়ে বলেন, 'যদি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও সংবিধান গঠন করা হয় তাহলে জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে শীঘ্রই ক্ষমতা হস্তান্তর করা সম্ভব।' এই মুখরক্ষা ফর্মুলায় অবতীর্ণ হলে পূর্ব বাংলার সঙ্কটের সমাধান করা সম্ভব হবে না, বরং এই ফর্মুলাকে ভিন্নভাবে জনগণ ব্যাখ্যা করবে। শেখ অবশ্য বলেন, 'অন্যান্য শর্ত মেনে নেওয়া হলে প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে অসুবিধা হবে না।' কারণ, শেখ মুজিব পাকিস্তানের পশ্চিমাংশের ছোট দলগুলোর মধ্যে যারা তার দলের নীতিতে একমত তাদের নিয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করতে পারেন। তিনি অবশ্য উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, বেলুচিস্তান ও সিন্ধুর আঞ্চলিক দলগুলোকে নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করতে সক্ষম। এই ধরনের জোট গঠন অবশ্য ভুট্টো ও পাঞ্জাবকে একা করে ফেলবে; কারণ শেখ মুজিবের এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন প্রেসিডেন্ট মেনে নিলে ভুট্টো ও তার দলের প্রতিনিধিরা কোনো স্থান পাবেন না; বরং ভুট্টো বিরোধী দলের নেতা হবেন। ভুট্টো অবশ্য এই প্রস্তাব মেনে নিবেন না, কারণ তিনি চাইবেন উভয় অংশের দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল নিয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা।

**২০ মার্চ ১৯৭১**। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান চতুর্থবারের মতো আলোচনায় বসেন। দু'ঘণ্টা দশ মিনিট স্থায়ী এই বৈঠকে উভয়পক্ষের উপদেষ্টারাও অংশ নেন। আলোচনায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে সহায়তা করেন সাবেক প্রধান বিচারপতি এ আর কর্নেলিয়াস, প্রেসিডেন্টের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল এস. জি. এম. এম পীরজাদা এবং কর্নেল হাসান। অন্যদিকে শেখ মুজিবের সঙ্গে আসেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, খন্দকার মোশতাক আহমাদ, মনসুর আলী, কামরুজ্জামান ও ড. কামাল হোসেন। বৈঠকে বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত





গুলিবর্ষণের প্রতিবাদ ও সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের দাবি জানালে আলোচনা ভেঙে যায়। চুক্তি আলোচনার আড়ালেও বিভিন্ন ঘটনা ঘটে–

১. বাঙালির স্বাধীনতার আন্দোলনকে চিরতরে স্তব্ধ করার কৌশল নির্ধারণে ব্যস্ত হয়ে ওঠে স্বৈরাচারী পাকিস্তানি সেনাবাহিনী।

২. ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রাক্তন নৌ সেনাদের এক সমাবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সংহতি প্রকাশ করা হয়।

৩. মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী চট্টগ্রামের এক সংবাদ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের নেতৃত্বে সরকার গঠন করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের প্রতি আহ্বান জানান।

৪. ছাত্র ইউনিয়নের গণবাহিনী টানা দশ দিনের প্রশিক্ষণ শেষে ডামি রাইফেল নিয়ে ঢাকার রাজপথে শোভাযাত্রা করে।

৫. জুলফিকার আলী ভুট্টো পনেরো সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে করাচি ত্যাগ করেন।

৬. পাকিস্তান সরকার ঘোষিত 'পাকিস্তান দিবস' (২৩ মার্চ)-এর পরিবর্তে 'প্রতিরোধ দিবস' পালন করার ঘোষণা দেয় 'স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'। এর সঙ্গে পাকিস্তানের 'কবর রচিত' হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২৩ মার্চ 'পাকিস্তান দিবস' হিসেবে পালিত হয়ে আসে।

**২১ মার্চ ১৯৭১**। পি.আই.এ বিমানযোগে পাকিস্তানি সৈন্যরা ঢাকায় পৌঁছতে থাকে। পাকিস্তানি সৈন্য ও পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর আগমনে বাংলার মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বাঙালি হয়ে ওঠে প্রতিবাদ-প্রতিরোধে উত্তাল। মিছিলে মিছিলে মুখরিত হয়ে ওঠে ঢাকার রাজপথ। রাজনৈতিক নেতা হলেও ভুট্টোকে স্বাগত জানাতে কয়েকজন সরকারি আমলা ছাড়া আর কেউই এগিয়ে আসেনি। ভুট্টো প্রেসিডেন্ট ভবনে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মিলিত হন। অন্যদিকে মেজর জেনারেল মজিদের নেতৃত্বে প্রাক্তন বাঙালি সৈন্যরা পল্টন ময়দানে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করে, প্যারেড অনুষ্ঠানে অংশ নেন এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

**২২ মার্চ ১৯৭১**। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও সমরনায়করা বাঙালির দাবি মেনে না নেওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধু দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মী ও সর্বস্তরের মানুষ বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুক্তি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত স্বাধীনতার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হন। নিখিল পাকিস্তান ইঞ্জিনিয়ারিং সুপারভাইজার এসোসিয়েশনও বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানায়। পূর্ব বাংলার টিএন্ডটি'র কর্মীরা যে কোনো মূল্যে পূর্ব বাংলার টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানের প্রতি সমর্থন জানাতে হাজার হাজার বাঙালি মিছিল করে, ধানমন্ডির ৩২ নং বাড়ির দিকে এগিয়ে আসে, ফলে ধানমন্ডি এলাকা পরিণত হয় বিশাল জনসমুদ্র। বঙ্গবন্ধু

সমবেত জনতার উদ্দেশে বলেন, '২৪ বছর ধরে আমরা শোষণের শিকার হয়ে আসছি, আর একটি দিনের জন্যও পাকিস্তানি শোষণ সহ্য করা হবে না।' ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদের ২৫ মার্চের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখার ঘোষণা দেন। ঢাকায় অবস্থানরত ৫৭ ব্রিগেডের ব্রিগেড মেজর খালেদ মোশাররফকে বদলি করে কুমিল্লায়, ৪র্থ ইবিআর-এর দ্বিতীয় আইসি হিসেবে পাঠানো হয়। আর ২৩ মার্চ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ২য় ইবিআরের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নের মাসুদুল হাসানকে তার পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে তার পরিবর্তে নিয়োগ দেওয়া হয় লেফটেন্যান্ট কর্নেল রকিবউদ্দিনকে।

২৩ মার্চ ১৯৭১। সারা বাংলায় 'প্রতিরোধ দিবস' পালিত হয়। পল্টন ময়দানে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তোলন করে 'স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'। পতাকা উত্তোলন শেষে 'জয় বাংলা' বাহিনীর কনটিনজেন্টের সদস্যরা 'ডামি' রাইফেল নিয়ে কুচকাওয়াজ করে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার প্রতি সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানায়। মাইকযোগে জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা' প্রচারও করা হয়। 'জয় বাংলা' বাহিনীর সদস্যরা রাজপথে সামরিক কায়দায় কুচকাওয়াজ করতে করতে ধানমন্ডির ৩২নং বাড়িতে পৌঁছে আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গবন্ধুর হাতে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা তুলে দেয়। পরে বঙ্গবন্ধু পতাকাটি নিজ বাসভবনে উত্তোলন করেন। দেশের বিভিন্ন ভবন, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালতসহ অনেক ভবনে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উড়তে থাকে। এমনকি ঢাকাস্থ চীন, ইরান, ইন্দোনেশিয়া ও নেপালে দূতাবাসে ছাত্রনেতা ও জনতার সহযোগিতায় বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়, তবে আমেরিকার দূতাবাস কোনো পতাকা উত্তোলন করেনি। একইদিন মুজিবুর-ইয়াহিয়া-ভুট্টোর ত্রিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববাসী একটি আপস-ফর্মুলার অপেক্ষায় থাকে।

> [...] it is clear now that the West Pakistanis never meant the talks to succeed that they dragged them out only to buy the time to get enough troops reinforcements over from West Pakistan to launch the attack.

যখন ইয়াহিয়া চুক্তি আলোচনায় মুজিবের সঙ্গে সময় ব্যয় করতে থাকেন তখন তার নীলনকশা প্রণয়নে মত্ত থাকা সমরনায়করা বিশ্ববাসীর চোখে ধূম্রজাল সৃষ্টি করে বাঙালি জাতিকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করার জন্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধিতে তৎপর হয়ে ওঠে। সিংহলের পথে পি.আই.এ'র কমার্শিয়াল ফ্লাইটে, সাদা পোশাকের ছদ্মবেশে, সশস্ত্রবাহিনীর লোকজন বাংলাদেশে আসতে থাকে। সি-১৩০ পরিবহন বিমানের সাহায্যে অস্ত্র ও রসদও আসে। প্রয়োজনীয় সরঞ্জামসহ অতিরিক্ত এক ডিভিশন সৈন্য বাংলাদেশে পৌঁছে।

> [...] troops were flowing in daily from West P_akistan and many Bengali began to believe that the negotiations were being





> deliberately prolonged to give the Government in West Pakistan time to get heavy rainforcements to the East.

টিক্কা খান প্রেসিডন্টকে প্ররোচিত করতে থাকেন যে, বাঙালিকে সুপরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করতে হলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পূর্ব বাংলায় সামরিক সমাবেশ প্রয়োজন। সামরিক জান্তার ক্ষমতালোভী উন্মাদরা পাকিস্তান থেকে পূর্ব বাংলায় সৈন্য ও অস্ত্র আনার কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে। কিন্তু প্রয়োজন অনুযায়ী সৈন্য ও অস্ত্রের সমাবেশের জন্য সময়ের একান্ত দরকার, এর জন্যই একের পর এক তথাকথিত 'শান্তির আলোচনায় বসেন ইয়াহিয়া। সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পাকিস্তানি কোটিপতি ব্যবসায়ী পরিবারসমূহের সঙ্গে সেনাবাহিনীর সদস্যদের পরিবার-পরিজনকে পাকিস্তানের পশ্চিমাংশে পাঠানোর কাজ অব্যাহত রাখা হয়। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ও সমরনায়কদের নীলনকশাটি বাস্তবায়ন করার জন্য ঢাকা বিমানবন্দর পাকিস্তান বিমানবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে এনে সমগ্র অঞ্চল জুড়ে আর্টিলারি ও মেশিনগানের জাল বিস্তার করা হয়। সাধারণ যাত্রীদের আগমন-নির্গমনের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু রেখে বাঙালির ওপর ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড ও হত্যাকাণ্ড চালানোর জন্যে ট্রেনিংপ্রাপ্ত এস.জি. কমান্ডো গ্রুপের সদস্যদের বাংলাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

২৩ মার্চ ১৯৭১। সকাল। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করার জন্য তৃতীয় কমান্ডো ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল জহির আলম খানকে বিশেষ মিশনের দায়িত্ব দেওয়ার জন্য কুমিল্লা থেকে সি-১৩০ বিমানযোগে ঢাকায় আনানো হয়। কারণ সেনাবাহিনীর সার্বিক প্রস্তুতির অংশ হিসেবে 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিমানবন্দর থেকে লেফটেন্যান্ট কর্নেল জহির সরাসরি মার্শাল ল হেডকোয়ার্টারসে কর্নেল এস ডি আহমেদের সঙ্গে দেখা করে। কর্নেল আহমেদ ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধুকে কীভাবে গ্রেফতার করা হবে এর পরিকল্পনা জহিরকে বাতিয়ে দেয়। লেফটেন্যান্ট কর্নেল জহির এ কাজে কমান্ডো ব্যাটালিয়নের জাংজু কোম্পানিকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেয়। তারপর সে কোম্পানি কমান্ডার মেজর বেলাল ও কোম্পানির দুই প্লাটুন কমান্ডার ক্যাপ্টেন হুমায়ুন ও ক্যাপ্টেন সাঈদকে সঙ্গে নিয়ে বেসামরিক গাড়িতে করে শেখ মুজিবের বাড়ির নিরাপত্তা যাচাই করার জন্য ধানমণ্ডি এলাকায় এসে পৌঁছায়। তারা দেখতে পায়, একদল বাঙালি পুলিশ ৩২ নং বাড়ির নিরাপত্তার দায়িত্বে পাহারারত, প্রচুর বাঙালি বিক্ষিপ্তভাবে বাড়ির সামনে অবস্থানরত।

২৪ মার্চ ১৯৭১। চট্টগ্রামের ব্রিগেডিয়ার মজুমদার নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর গুলিবর্ষণে অস্বীকৃতি জানিয়ে 'এমভি সোয়াত'-এর মালামাল খালাসের কাজে বাধা সৃষ্টি করেন, ফলে তাকে তার পদ থেকে অব্যাহতি দেয় জেনারেল খাদিম, কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় যে, তাকে জয়দেবপুর গিয়ে ২য় ইবিআর-এর কাছে রিপোর্ট করতে হবে। তার পরিবর্তে ব্রিগেডিয়ার এম এইচ আনসারিকে চট্টগ্রাম এলাকার দায়িত্ব পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

২৪ মার্চ ১৯৭১। সকাল। লেফটেন্যান্ট কর্নেল জহির বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের আশপাশের বাড়িঘর ও রাস্তাঘাট পরিদর্শন করে। এরপর বেলা এগোরাটার দিকে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর কাছে উপস্থিত হয়। এই সময় মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী তাকে ২৫ মার্চ রাতে একজন সামরিক কর্মকর্তাসহ বেসামরিক গাড়ি করে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেয়।

২৪ মার্চ ১৯৭১। একদিকে রাজনৈতিক আপসের জন্য আবারও মুজিব-ইয়াহিয়া-ভুট্টোর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের শেখ মুজিব, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ড. কামাল হোসেন প্রমুখ নেতার সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যান। এম এম আহমদ তার সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেন এবং এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য জেনারেল পীরজাদার আহ্বানে একটি চূড়ান্ত বৈঠক ধার্য করা হয়। পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের কাছে মাথানত না করার জন্য আওয়ামী লীগ নেতারা দৃঢ় অঙ্গিকারবদ্ধ। বাঙালি নেতারা নানা রকম যুক্তি তুলে ধরলেও ইয়াহিয়া কোনো যুক্তি শুনতে নারাজ। বাঙালি নেতারা ইয়াহিয়ার ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে বৈঠক থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের কাছে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাজউদ্দীন আহমদ বলেন, 'ইয়াহিয়া আমাদের দাবি মানার ব্যাপারে একটুও আন্তরিক নন। ইয়াহিয়ার কাছে আমাদের দাবি জানালেও কোনো কাজ হবে বলে মনে হয় না।' তিনি আরও বলেন, 'বলো এখন প্রেসিডেন্টের কোর্টে।' এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ইয়াহিয়ার সঙ্গে বাঙালি নেতাদের আলোচনা নিষ্ফল হয়। অন্যদিকে ইয়াহিয়া বাঙালি নেতাদের সঙ্গে পূর্ব বাংলার সঙ্কট সমাধানের জন্য আলোচনা অব্যাহত রাখলেও তিনি পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে অস্ত্র ও অতিরিক্ত সৈন্য আনানোর কাজ বন্ধ করেননি। অন্যদিকে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সাহায্যে ইপিআর হেডকোয়ার্টারস (পিলখানা)-এর বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্র করা হয়। ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে নিরস্ত্র করতে বাঙালি সদস্যদের কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়। ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে কুমিল্লা সেনাছাউনি থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়।

২৪ মার্চ ১৯৭১। সমস্ত দিন। দেশের অবস্থা থমথমে। বাঙালি যেন স্বাধীনতা-সংগ্রামের অপেক্ষায়। সারা দেশেই আসন্ন মুক্তি সংগ্রামের জন্য সশস্ত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি অব্যাহত থাকে। সিলেট, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোর, সাতক্ষীরা, খুলনা, দিনাজপুর, বরিশাল প্রভৃতি এলাকায় মানুষ অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। পাকিস্তানি সামরিক শাসক ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে আবারও ক্ষোভ প্রতিবাদ প্রকাশ করে। সারা বাংলাদেশে অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজসহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক অফিস বন্ধ থাকে। দেশের সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন ভবনে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উড়তে থাকে; যশোরের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসেও। সেনাছাউনি ছাড়া বাংলাদেশের কোনো স্থানেই পাকিস্তানের পতাকা উড়েনি। তবে গুলি ঠিকই চলতে থাকে; 'দৈনিক আজাদ' লিখে যে, পোর্ট ট্রাস্টে গুলিতে ৩ জন বাঙালি নিহত, ৪ জন আহত; আর 'পিপলস ভিউ' লিখে ৩/৪ জন নিহত।





২৪ মার্চ ১৯৭১। একদিকে চট্টগ্রাম প্যারেড গ্রাউন্ডে গণজমায়েত। গণসঙ্গীত ও অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিনের নাটক 'এবারের সংগ্রাম' মঞ্চায়িত হয়। সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. এ আর মল্লিক। প্রধান অতিথি হন আওয়ামী লীগ নেতা জহুর আহমদ চৌধুরী। অন্যদিকে ইয়াহিয়া খানের আমন্ত্রণে পাকিস্তান থেকে খান আবদুল কাইয়ুম খান ঢাকায় এসে ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর সঙ্গে এক গোপন বৈঠকে বসেন। বৈঠক শেষে ভুট্টো সাংবাদিকদের জানান যে, পূর্ব বাংলার বিষয়ে তিনি সর্বদা নমনীয় ও আন্তরিক মনোভাব পোষণ করে আসছেন এবং পূর্ব বাংলা বাস্তবিকই শোষণ ও বঞ্চনার শিকার। সাংবাদিকদের সঙ্গে এ ধরনের মনোভাব প্রকাশ করলেও এরই মধ্যে ২৫ মার্চের ভয়াল রাতের সমস্ত পরিকল্পনায় তিনি অংশ নিতে দ্বিধাবোধ করেননি। মেজর জেনারেল মিঠা খান (কোয়ার্টারস মাস্টার জেনারেল) চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় পৌঁছে ইস্টার্ন কমান্ড হেডকোয়ার্টারসে লেফটেন্যান্ট কর্নেল জহিরের সঙ্গে একান্ত বৈঠক মিলিত হয়। আর রাতে চট্টগ্রাম বন্দরে অবস্থিত পাকিস্তানি নৌবাহিনীর জাহাজ থেকে চট্টগ্রাম শহরের দিকে গোলা ছোড়া হয়। গোলার শব্দে ও আলোয় চট্টগ্রাম শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ আলোকিত হয়ে ওঠে।



পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে লন্ডন পৌঁছালে বঙ্গবন্ধুকে শুভেচ্ছা জানান ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ

২৪ ও ২৫ মার্চ ১৯৭১। পাকিস্তানি জেনারেলদের একটি দল হেলিকপ্টারে করে ঢাকার প্রধান গ্যারিসনগুলো পরিদর্শন করে গ্যারিসন কমান্ডার ও অপারেশনের অন্যান্য

সিনিয়র পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের বিভিন্ন নির্দেশনা দেয়। এই দলে অংশ নেয় জেনারেল ফরমান, জেনারেল খাদিম, ব্রিগেডিয়ার আল ইদ্রিস, জেনারেল হামিদ, জেনারেল মিটঠা খান, কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল এবং প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার কর্নেল সাদউল্লাহ। জেনারেল ফরমান যশোর যায়। জেনারেল খাদিম কুমিল্লা ও চট্টগ্রামের গ্যারিসন কমান্ডারদের ব্রিফ করেন। ব্রিগেডিয়ার আল ইদ্রিস ও কর্নেল সাদউল্লাহ রংপুর যান। সকল ক্ষেত্রে পূর্ণ গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়। কিছু ক্ষেত্রে গুটিকয়েক লেফটেন্যান্ট কর্নেলকে বিস্তারিতভাবে পরিকল্পনার কথা জানানো হয়।

> The fact that the Central Pakistan Authority began to implement what they had threatened to do, l.e. to reimpose military rule, because of the faliure of political parties to agree on the wording of the constitution, which would organise political life in Pakistan, indicates that Pakistan military authorities were not serioun about giving up their rule.

২৫ মার্চ (১৯৭১) ও পূর্বের কিছু ঘটনা–

১. 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর পরিকল্পনাকারীরা সেনাভিযান শুরু করার আগেই সংশ্লিষ্ট সব পাকিস্তানি ইউনিট কমান্ডারদের সম্পূর্ণ গোপনীয়তা বজায় রেখে, দায়িত্ব নিশ্চিত করে। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের জড়ো নিশ্চিত, অস্ত্রশস্ত্রের জোগান নিশ্চিত, পাকিস্তান থেকে অতিরিক্ত সৈন্য পূর্ব বাংলায় আনানো নিশ্চিত, আঞ্চলিক সেনানায়কদের কার্যবিবরণী প্রদান নিশ্চিত- সবকিছুই সন্দেহের উদ্রেক না ঘটিয়ে করা হয়।

২. জেনারেল হামিদ 'অপারেশন সার্চলাইট' শুরু করার আগে সবগুলো নিয়মিত বাঙালি ইউনিটকে একসঙ্গে নিরস্ত্র করার অনুমতি না দেওয়ায় পাকিস্তানি সমরনায়করা অন্যান্য উপায়ে বাঙালি ইউনিটগুলোর সম্ভাব্য হুমকি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেয়। সফলতা নিশ্চিত করার জন্য সামরিক বাহিনী বাঙালি কর্মকর্তাদের স্পর্শকাতর স্থানগুলো থেকে বদলি এবং সেখানে পাকিস্তানি বাহিনী মোতায়েন করে। একই সঙ্গে পূর্ব বাংলায় অবস্থানরত ২৫তম পাঞ্জাব ও ২০তম বেলুচ পাকিস্তানি ইউনিটগুলোর প্রত্যাবর্তন পিছিয়ে দেওয়া হয়।

৩. পাকিস্তান থেকে ঢাকায় পৌঁছে ১৩তম ফ্রন্টিয়ার ফোর্স ও ২২তম বেলুচ রেজিমেন্ট। নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা বজায় রাখতে পাকিস্তানির সমরনায়করা গণহারে বাঙালি কর্মকর্তাদের বদলি করা থেকে বিরত থাকে এবং পূর্ব বাংলার কোনো গ্যারিসনে অতিরিক্ত বাঙালি সৈন্য পাঠানো বন্ধ থাকে; বরং যেসব বাঙালি অফিসারের ফেব্রুয়ারিতে ছুটির দরখাস্ত বাতিল করা হয় মার্চে তাদের ছুটি নিতে উদ্বুদ্ধ করা হয়। অন্যদিকে পাকিস্তানি কর্মকর্তাদেরকে কোনো ছুটি না দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। এমনকি পাকিস্তানি কর্মকর্তা ও সৈন্যদের পরিবার পূর্ব বাংলা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়।





৪. বাঙালি ইউনিটগুলোকে, এক অংশ থেকে আরেক অংশকে বিচ্ছিন্ন করে ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করে, সেনানিবাসের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সব অংশকেই রেডিও এবং তারহীন যোগাযোগের গ্রিড থেকে যতটা সম্ভব দূরে রাখা হয়। সন্দেহের উদ্রেক না ঘটিয়ে বাঙালি কর্মকর্তাদের ছুটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। নিরস্ত্র করা হয় অথবা নেতৃত্বের কেন্দ্র বা সরাসরি 'অপারেশন সার্চলাইট-এ নিয়োজিত ইউনিটগুলো থেকে যথাসম্ভব দূরে রাখা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পাকিস্তানি কর্মকর্তারা বাঙালি ইউনিট পরিচালনার দায়িত্ব নেয়। এর ফলে ১ম ইবিআর-এর শক্তি অর্ধেক হয়ে পড়ে। ১ম ইবিআর-এর সদস্যদের শীতকালীন প্রশিক্ষণের জন্য সীমান্তবর্তী চৌগাছায় পাঠানো হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অকেজো রেখে ২য় ইবিআর-এর সব কোম্পানিকে ঢাকার আশপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। ৩য় ইবিআর-এর কোম্পানিগুলোকে সৈয়দপুর সেনানিবাসের বাইরে, গোড়াঘাট ও পার্বতীপুর এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ৪র্থ ইবিআর অবস্থান নেয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও শমসেরনগরের মাঝামাঝি এলাকায়। একমাত্র চট্টগ্রামেই নিয়মিত বাঙালি ইউনিটগুলোকে তাদের স্বাভাবিক এলাকায় অবস্থান নিতে অনুমতি দেয়। পাকিস্তানের ইপিআর বাহিনীর কোম্পানিগুলোকে বিভিন্ন শহরে মোতায়েন করা হয়। বাঙালি ইপিআর বাহিনীকে পাঠানো হয় সীমান্তবর্তী এলাকায়। অধিকাংশ ইপিআর ইউনিটকে তাদের মূল অ্যাকশনের অঞ্চল থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখা হয়। ২৫ মার্চ রাতে ইপিআর-এর বেতার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়।

৫. পাকিস্তান থেকে পুরো একটি ব্রিগেড পূর্ব বাংলায় আনানো হয়। আস্তে ধীরে সৈন্য ও রসদপত্র পাঠানো হয় মহাপরিকল্পনারই অংশ হিসেবে। পূর্ব বাংলায় আসা নতুন সৈনিকদের থাকা খাওয়ার জন্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড অনেক নতুন নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

৬. 'অহিংস ও অসহযোগ' আন্দোলনের কারণে সেনানিবাসে খাদ্য সরবরাহ বাধাগ্রস্ত হওয়ায় মেজর জেনারেল কামার আলী মির্জা এবং ব্রিগেডিয়ার হ্যারিসন পাকিস্তান থেকে পূর্ব বাংলায় আসে রসদপত্র ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে করার জন্য। ব্রিগেডিয়ার হ্যারিসন নতুন সৈনিকদের জন্য রসদপত্র ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করার জন্য ঢাকায় থেকে যায়, তবে পাকিস্তানে ফিরে যায় জেনারেল মির্জা।

৭. ১৩ এফএফ এবং ২২তম বালুচ ঢাকায় পৌঁছে। পাকিস্তান থেকে পিআইএ ফ্লাইট-এ করে বিশেষ যাত্রীরা ঢাকায় আসতে থাকে।

২৫ মার্চ ১৯৭১। সকাল। ভুট্টো দুই পরামর্শদাতাকে সঙ্গে নিয়ে ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনায় বসেন। স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগ যে ধরনের

স্বায়ত্তশাসন চাইছে, একে স্বায়ত্তশাসন বলে না। বাঙালির দাবি স্বায়ত্তশাসনের চেয়ে বেশি সার্বভৌমত্বের কাছাকাছি।'

২৫ মার্চ ১৯৭১। ইস্টার্ন কমান্ড হেডকোয়ার্টারসে কর্নেল আকবরের দফতরে জেনারেল রাওয়ের সঙ্গে লেফটেন্যান্ট কর্নেল জহিরের দেখা হয়। তারপর মিটঠা-হামিদ-জহিরের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিষয়বস্তু-বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতারে যাতে কোনো রকম কূটনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি না হয় সেদিকে নজর রাখা। কারণ বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের পিছনেই জাপান কাউন্সিল অবস্থিত। পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল জহির তিনটি পাঁচ টনের ট্রাক ও বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের নকশা জেনারেল রাওয়ের কাছ থেকে সমঝে নেয়।

২৫ মার্চ ১৯৭১। সকাল। ২২তম বালুচ রেজিমেন্ট পিলখানার নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয়। বাঙালি ইপিআর অফিসারদের পাকিস্তানি অফিসাররা পিলখানায় ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করে। আর বাঙালি সৈন্যদের প্রায় সবাইকে বিশ্রামে পাঠানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

২৫ মার্চ ১৯৭১। দুপুর। লেফটেন্যান্ট কর্নেল জহির বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের ও তার আশপাশের মডেল তৈরি করে কোম্পানি ও প্লাটুন কমান্ডারদের অপারেশনের বিভিন্ন দিক বুঝিয়ে দেয়। ক্যাপ্টেন সাঈদকে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের আশপাশের সকল রাস্তা বন্ধ করার, ক্যাপ্টেন হুমায়ুনকে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি ঘিরে ফেলার এবং ১২ জনের একটি দলসহ মেজর বেলালকে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি তল্লাশি ও বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

২৫ মার্চ ১৯৭১। বিকাল। শেখ ফজলুল হক মণিসহ বিভিন্ন নেতার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর বৈঠক হয়। বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সামনে জনতার ঢল নামে। জনতার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা দেন, 'বিশ্বের কোনো শক্তিই পূর্ব বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ন্যায়সঙ্গত ও আইনসঙ্গত দাবিকে নস্যাৎ করতে পারবে না।' অন্যদিকে জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া এক ভাষণে ইয়াহিয়া বলেন, 'মুজিব দেশের অখণ্ডতা ও নিরাপত্তার ওপর আঘাত এনেছেন। এই অপরাধের জন্য তাকে শাস্তি পেতেই হবে। দেশের এই ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য আমি দেশব্যাপী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' ইয়াহিয়ার উস্কানিমূলক ঘোষণার পরও বঙ্গবন্ধু শান্ত ও শৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এরপরও ইয়াহিয়া ঠাণ্ডা মাথায় গণহত্যা শুরু করার জন্য টিক্কা খানকে নির্দেশ দেন।

২৫ মার্চ ১৯৭১। রাজেন্দ্রপুরে পাকিস্তানের সমরবাহিনীর মূল অস্ত্রভাণ্ডার থাকা সত্ত্বেও বন্দরনগরী করাচি থেকে ছেড়ে আসা 'এম ভি সোয়াত' জাহাজটি পাঁচ হাজার সৈন্য ও নয় হাজার অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে চট্টগ্রামে এসে পৌঁছে। 'সামরিক পরিষদ' চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর ফেলা 'এম ভি সোয়াত' জাহাজ থেকে অস্ত্র কেড়ে নেওয়ার আদেশ দিলেও লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম আর চৌধুরী ও মেজর জিয়াউর রহমান সময়মতো ও সঠিকভাবে সেই কাজটি করেননি। এমনকি সামরিক বাহিনী, ইপিসি'র ও ট্রানজিট ক্যাম্পের বাঙালি সৈনিকরা এগিয়ে আসেননি। তবে 'এম ভি সোয়াত' থেকে অস্ত্রশস্ত্র খালাস করতে বাঙালি ছাত্র, কর্মচারী ও শ্রমিকরা প্রতিরোধ গড়ে তুলে। তারা বাঙালি সেনা সদস্যদের অস্ত্র





নামাতে বাধা দেয়। তারা জাহাজটি অবরোধ করে রাখে। ক্ষিপ্ত পাকিস্তানি সৈন্যরা সাধারণ বাঙালি ছাত্র, কর্মচারী ও শ্রমিকদের ওপর গুলি চালায়। ঘটনাস্থলে অনেক হতাহত হয়।

২৫ মার্চ ১৯৭১। ছয়টি জাহাজ ভর্তি দশ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য চট্টগ্রাম ও খুলনা বন্দরে এসে পৌঁছে। ইয়াহিয়ার নির্দেশে বাংলাদেশে মোট পাকিস্তানি সৈন্য সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ষাট হাজারে উন্নীত হয়। তারপর মুজিবের সঙ্গে বৈকালিক বৈঠক বাতিল করেন ইয়াহিয়া। বাঙালি জানে জাতি এক মহাসঙ্কটে নিপতিত হয়। এক বিরাট সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ছাড়া বাঙালির আর কোনো উপায় নেই।

২৫ মার্চ ১৯৭১। বিকাল। বঙ্গবন্ধু তার হাইকমান্ড নামে খ্যাত 'রাজনৈতিক পরিষদ' ও 'সামরিক পরিষদ'-এর নির্বাচিত সদস্যদের ঢাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। ভবিষ্যতে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড দেশের পশ্চিমাঞ্চল ও সর্ব রকম সামরিক কর্মকাণ্ড দেশের পূর্বাঞ্চল থেকে পরিচালনা করারও আদেশ দেওয়া হয়। ফলে পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের ও আসাম-ত্রিপুরার মানুষ সর্বশক্তি নিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে জয়যুক্ত করতে এগিয়ে আসে।

২৫ মার্চ ১৯৭১। সন্ধ্যা। একদিকে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এইচ এম কামরুজ্জামান ও ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও বাঙালি ছাত্রনেতাদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু দেখা করেন; এবং বলেন যে, তিনি না পালিয়ে বরং গ্রেফতার হতে প্রস্তুত। আর অন্যদিকে শান্তিপূর্ণ আলোচনার পথ এড়িয়ে ইয়াহিয়া খান বাঙালি হত্যাযজ্ঞের নীলনকশাটি বাস্তবায়ন করার পথে অগ্রসর হন।

২৫ মার্চ ১৯৭১। সন্ধ্যা। বঙ্গবন্ধু হানাদার পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বাঙালি সামরিক ও বেসামরিক সেনা, কর্মচারী, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষকসহ সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আবারও আহ্বান জানান। এই আহ্বানে সারা দিতে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকরা রাস্তায় রাস্তায় হালকা প্রতিবন্ধক বসানো শুরু করে।

২৫ মার্চ ১৯৭১। সন্ধ্যা। বেসামরিক পোশাকে দুজন কমান্ডোসহ ক্যাপ্টেন হুমায়ুন বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের আশেপাশে অবস্থান নেয়। চারটার দিকে পাকিস্তান থেকে আসা বোয়িং বিমানটি সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় তেজগাঁও বিমানবন্দর ছেড়ে যাওয়ার জন্য তৈরি থাকে। রাত আটটার দিকে গণহত্যার নির্দেশ দিয়ে ইয়াহিয়া খান এই বিমানে চেপে পাকিস্তানের পথে যাত্রা করেন।

২৫ মার্চ ১৯৭১। সন্ধ্যা। চট্টগ্রামের বীর জনগণ চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট ও চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরকে পুরোপুরিভাবে বিচ্ছিন্ন ও অবরোধ করে রাখে।

২৫ মার্চ ১৯৭১। রাত। বঙ্গবন্ধু জনৈক পাকিস্তানিকে বলেন, 'পাকিস্তানের দুই অংশকে একত্রে রাখার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। কিন্তু ইয়াহিয়া খান সমস্যা সমাধানের জন্য সামরিক ব্যবস্থা বেছে নিলেন এবং এখানেই পাকিস্তানের সমাপ্তি ঘটল। তিনি আরও বলেন যে, তার মন বলছে, তাকে হয়তো হত্যা করা হবে, কিন্তু তার কবরের ওপর সৃষ্টি হবে স্বাধীন বাংলাদেশ। শেখ মুজিবকে টেলিফোনে সতর্ক করে আসন্ন বিপদ

সম্পর্কে অবহিত করা হয়। তিনি তার বাড়ি ছেড়ে আত্মগোপন করতে অস্বীকার করেন, বলেন, 'আমি যদি পালিয়ে যাই তাহলে তারা (পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী) আমাকে খুঁজে বের করার জন্য সমগ্র ঢাকা নগরীকে পুড়িয়ে দেবে।' আর শেখ মুজিবুর রহমান যদি নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতেন, তাহলে ভারতের বিরুদ্ধে প্রচারে পাকিস্তানের পদক্ষেপই শক্তিশালী হতো। লোকে বলত, লক্ষ লক্ষ লোককে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়ে মুজিব পালিয়ে গেছেন। স্ট্রাটেজির দিক থেকে মুজিবের আত্মগোপন যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, ভবিষ্যৎ আন্দোলনের পক্ষে সেটা কোনো মহৎ উদাহরণ হতো না।

২৫ মার্চ ১৯৭১। রাত। লেফটেন্যান্ট কর্নেল জহিরকে ক্যাপ্টেন হুমায়ুন জানায় যে, মিরপুরে বাঙালির দ্বারা সড়ক অবরোধ হতে পারে। এ সংবাদ পেয়ে পাকিস্তানের সমরনায়কদের দ্বারা প্রণীত ঢাকা আক্রমণের পরিকল্পনায় কিছুটা পরিবর্তন করে লেফটেন্যান্ট কর্নেল জহির। যেমন–

১. বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের যাত্রা শুরু করার সময় রাত ১২টার (২৬ মার্চের '০' ঘটিকার) পরিবর্তনে ১১টা।

২. ক্যাপ্টেন সাঈদের প্লাটুনে সকল রকেট লঞ্চার জমা দেওয়া।

৩. পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী দ্বারা ১০ম বাঙালি রেজিমেন্টকে সেনানিবাসে নিরস্ত্র ও নিশ্চিহ্ন করা।

২৫ মার্চ ১৯৭১। রাত। আক্রমণ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিগেডিয়ার আর্বারের ব্রিগেডকে যেসব কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার জন্য টিক্কা খান নির্দেশ দেয় সেগুলো হচ্ছে–

১. ১৩তম সীমান্তবর্তী সৈন্যদল সেনানিবাসে সংরক্ষিত শক্তি হিসেবে থাকা এবং নিরাপত্তা প্রদান করা।

২. ৪৩তম হালকা বিমানবিধ্বংসী বাহিনী তেজগাঁও বিমানবন্দরের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা।

৩. ২২তম বালুচ রেজিমেন্ট ইপিআর বাহিনীর পাঁচ হাজার সদ্যকে নিরস্ত্র করবে এবং ইপিআর সদর ফতরের ওয়্যারলেস ব্যবস্থা দখলে নেওয়া।

৪. ৩২তম পাঞ্জাব রেজিমেন্ট রাজারবাগ পুলিশ লাইন ও এক হাজার সশস্ত্র পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করা।

৫. ১৮তম পাঞ্জাব রেজিমেন্টের দায়িত্বে থাকবে পুরান ঢাকা এবঙ নবাবপুরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৬. ৩১তম ফিল্ড রেজিমেন্টকে ঢাকার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিহারী এলাকা মোহাম্মদপুর এবং মিরপুরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্বে থাকা।





৭. ৩-এস.এস.জি-এর একটি প্লাটুন মুজিবকে বন্দি করার কাজে নিয়োজিত থাকা।

৮. ৩২তম পাঞ্জাব রেজিমেন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্রোহীদের নিষ্ক্রিয় করার দায়িত্বে থাকা।

৯. ২২তম বালুচ রেজিমেন্ট পিলখানার শক্তি বৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত থাকা।

২৫ মার্চ ১৯৭১। ফোনের মাধ্যমে অন্যান্য গ্যারিসনকে সময় মতো তাদের কার্যক্রম শুরু করার জন্য সতর্ক করে দেওয়া হয়। ঢাকার সৈন্যদের কমান্ডে থাকে রাও ফরমান আলী এবং বাকি সব স্থানের সৈন্যদের কমান্ডে থাকে জেনারেল খাদেম। জেনারেল টিক্কা এবং তার কর্মকর্তারা ৩১তম কমান্ড সেন্টারে অবস্থান নিয়ে কাজ করতে থাকে; একই সঙ্গে ১৪তম ডিভিশনের কর্মকর্তাদের সহযোগিতা করে।

২৫ মার্চ ১৯৭১। রাত ১১.৩০ টা। 'উইটনেস টু স্যারেন্ডার' গ্রন্থ থেকে জানা যায়–

> The wireless set fifted in the jeep groaned for the first time at about 11.30 p.m. The local commander (Dacca) asket permission to advance the H-hour because the other side was hectically preparing for resistance. Everybody looked at his watch. The President was still halfway between Colombo (Sri Lanka) and Karachi. General Tikka gave the decision. [...] The troops were to be in their target areas before 1 am but some of them, anticipating delay on the way, had started moving from the cantonment at about 11.30 pm. Those who were already in the city to guard the radio and television stations, telephone exchange, power house and State Bank etc. had also taken their posts much before the H-hour.

২৫ মার্চ ১৯৭১। রাত ১১.৩০টা। অপারেশন রাত ১১টায় শুরু হওয়ার কথা থাকলেও পাকিস্তানি সৈন্যরা সাড়ে এগারটায় ঢাকা সেনানিবাস থেকে বের হতে শুরু করে; কারণ পাকিস্তানি ফিল্ড কমান্ডাররা চায় যে, বাঙালি সৈন্যরা যাতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার কোনো সুযোগ না পায়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য ছয় ঘণ্টার জন্য সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী আক্রমণ শুরু করার আগেই দ্রুততার সঙ্গে ঢাকা শহরের সকল যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করা হয়। ঢাকা সেনানিবাস থেকে পাকিস্তানি বাহিনীর বিভিন্ন দল পদাতিক বাহিনী, সাঁজোয়া বাহিনী, গোলন্দাজ বাহিনী–ঢাকার বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নিতে থাকে।

৭ মার্চের ভাষণ এবং ২৩ মার্চে ৩২নং ধানমণ্ডির বাড়িতে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সব আয়োজন সম্পন্ন করা হলেও ২৫ মার্চের রাতে, ১১টা ৪৫ মিনিটে, সুবেদার মেজর শওকত আলী দুঃসাহসিকভাবে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে রেকর্ড করা 'Declaration of Independence' প্রচার করেন। একই সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে রেকর্ড করা 'Declaration of Independence' টি ঢাকার ইপিআর সিগন্যালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। 'Declaration of Independence'-এ বলা হয়–

This may be my last message, from today Bangladwsh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh. Final victory is ours.

২৫ মার্চ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেওয়া স্বাধীনতা ঘোষণা সম্বন্ধে 'উইটনেস টু সারেন্ডার' গ্রন্থ থেকে জানা যায়–

When the first shot had been fired, the voice of Sheikh Mujibur Rahman came faintly through on a wavelength close to that of the official Pakistan radio. In what must have been, and sounded like, a prerecorded message, the Sheikh Proclaimed East Pakistan to be the Peoples Republic of Bangladesh.

'Declaration of Independence'টি বাংলাদেশের সর্বত্র ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে পাঠানো হয়। এই প্রচারটি বাংলাদেশের স্থলভাগ ছাড়াও চট্টগ্রাম বন্দরে অবস্থানরত বিদেশি জাহাজের শক্তিশালী ট্রানজিস্টারেও শোনা যায়। এই ঘোষণা সম্বন্ধে ডেভিড লোশাক বলেন, 'অন্ধকার নেমে আসার কিছুক্ষণ পর, সরকারি মালিকানাধীন পাকিস্তান রেডিওর তরঙ্গের কাছাকাছি একটি তরঙ্গের মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। শেখ মুজিবুর পূর্ব বাংলাকে গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ বলে ঘোষণা করেছেন। তার বাণী নিশ্চয়ই ইতোপূর্বে রেকর্ড করা হয়েছিল এবং তার কণ্ঠস্বর শুনে তাই মনে হয়েছে। আর জেনারেল টিক্কা খান বলে, 'আমার কো-অর্ডিনেশন অফিসার একটি ফ্রি ব্যান্ড রেডিও এনে বলল স্যার শুনুন, শেখ সাহেব স্বাধীনতার ঘোষণা করছেন। আমি নিজে রেডিওতে শেখ সাহেবকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে শুনলাম। কারণ শেখ সাহেবের কণ্ঠ আমি ভালো করেই চিনতাম। সে ঘোষণা তখন দেশদ্রোহিতার শামিল ছিল। সেজন্যই শেখ সাহেবকে গ্রেফতার করা ছাড়া আমার আর কোনো বিকল্প ছিল না। বিশ্বের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা সম্বন্ধে রিপোর্টও প্রকাশ করা হয়। যেমন–

1. Sheikh Mujbur Rahman acknowledged leader of Bengali intionalism responded heroically to the Pakistan Army's intervention with a call for resistance and declaration of Independence. There is a good evidence that most members of the Bengali regiments will accept his orders. Shortly before his arrest mujib had issued a proclamation to his people, which informed them. You are citizens of a free counrty. Today the West Pakistan's military is engaged in genocide in Bangladesh. Our struggle is most rewarding certain is our victory. Allah is wiht us.





The world public opinion is with us. Joy Bangla (victory of Bengal).

2. Shotly before his arrest. Mujib had issued a proclamation to his people, which informed them; you are citizens of a free country.
3. Sheikh Mujbur Rahman tonight proclaimed East Pakistan the Sovereighindependent People's Republic of Bangladesh, accorfding to a clandestine radio report monitored near the East Pakistan.
4. The Pakistan radio announced today that Sheikh Mujbur Rahman, the nationalist Leader of East Pakistan, had been arrested only hours after he had proclaimed his region independent and after open rebelion was reported in several cities in the East. [...] The 51 year old leader of the Awami League, the dominant party in the East, was arrested as the West Pakistan dominated army sought to reassert control in the East.
5. The Rebel Leader 'Arrested/ Radio Pakistan announced that Sheikh Mujbur Rahman was arrested only hours after he proclaimed independence for East Pakistan.

'Declaration of Independence' এর সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধু বাংলায় আরেকটি ঘোষণা দেন। এতে বলা হয়–

পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিতভাবে পিলখানা ইপিআর ঘাঁটি, রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করেছে এবং শহরের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলছে, আমি বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন করছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমি মুক্ত করার জন্য শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গ রেজিমেন্ট ও আনসারদের সাহায্য চান। কোনো আপস নাই। জয় আমাদের হবেই। পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রুকে বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক প্রিয় লোকদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহর আপনাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা।

বঙ্গবন্ধুর এই আহ্বান বেতারযন্ত্র মারফত তাৎক্ষণিকভাবে বিশেষ ব্যবস্থায় সারা দেশে পাঠানো হয়। রাতে এই বার্তা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও যশোর সেনানিবাসের

বাঙালি জওয়ান ও অফিসাররা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা প্রচার করা হয় গভীর রাতে।

অন্যদিকে বাঙালি নিধন পর্বটি চূড়ান্তভাবে শুরু করার জন্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়–

১. মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর অধীনে ঢাকা। মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর নেতৃত্বে ঢাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর লক্ষ্যের মধ্যে পড়ে (ক) রাত ১১টায় কারফিউ জারি এবং টেলিফোন-রেডিও স্টেশনসহ সকল প্রকার প্রচার মাধ্যম বন্ধ করা; (খ) ঢাকা শহরের সড়ক, রেল ও নৌপথের দখল নিয়ে সারা শহর বিচ্ছিন্ন এবং নদীতে টহল স্থাপন করা; (গ) অপারেশন চলাকালীন শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের ১৫ জন নেতাকে গ্রেফতার করা; (ঘ) ধানমণ্ডি এবং হিন্দু এলাকার বাড়িগুলো অনুসন্ধান করা; (ঙ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইপিআর সদর দফতর, রাজারবাগ পুলিশ লাইন ধ্বংস ও পরাভূত করা; (চ) ২য় ও ১০তম ইবিআরকে নিরস্ত্র করা; (ছ) গাজীপুরের অস্ত্রকারখানা এবং রাজেন্দ্রপুরের অস্ত্র গুদাম দখল ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

২. মেজর জেনারেল খাদিম রাজার অধীনে প্রদেশের অবশিষ্টাংশ।

এছাড়া বাঙালি নিধন পর্বটি সঠিকমতো চালানোর জন্য বিশেষ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়। যেমন–

১. পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড সদর দফতরের সঙ্গে সংযুক্ত হতে ১৪তম ডিভিশন এবং ৫৭তম ব্রিগেড ঢাকা সেনানিবাসে প্রস্তুত থাকে। এছাড়াও ৪৩তম হালকা বিমানবিধ্বংসী রেজিমেন্ট (সি.ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাফফাত আলী, পাকিস্তানি), ৩য় কমান্ডো ব্যাটালিয়নের উপকরণ (সি.ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল জেড এ খান, পাকিস্তানি), ১৯তম সংকেত প্রদানকারী রেজিমেন্ট (সি.ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল ইফতেখার হুসাইন, পাকিস্তানি) এবং ১৪৯তম পদাতিক বাহিনী প্রস্তুত থাকে।

২. নিয়মিত সেনা ইউনিটগুলো-৫৭তম ব্রিগেড, ১৮তম এবং ৩২তম পাঞ্জাব (সি.ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল তাজ) রেজিমেন্ট, ১৩তম সীমান্তবর্তী রেজিমেন্ট, ২২তম বালুচ রেজিমেন্ট, ৬০৪তম ইন্টেলিজেন্স (গোয়েন্দা/গুপ্ত) ইউনিট এবং ৩১তম ভূ-গোলন্দাজ বাহিনী (সি.ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাহিদ হাসান) প্রস্তুত থাকে।

৩. পাকিস্তানি বিমান বাহিনীর সবকিছু তেজগাঁও বিমানবন্দরে এবং ২৯তম অশ্বারোহী রেজিমেন্ট থেকে এক স্কোয়াড্রনের কমপক্ষে ১৪টি এম-২৪ শ্যাফি ট্যাঙ্ক ঢাকায় জড়ো করা হয়। এই সকল ইউনিটের সংযুক্তি হিসেবে ৫৭তম ব্রিগেড, ১৪তম ডিভিশন এবং পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড সদর দফতর থেকে অন্যান্য সাহায্যকারী (ইঞ্জিনিয়ারিং, সরবরাহকারী এবং চিকিৎসা ইউনিট) দল ঢাকায় আনানো হয়।





৩১ নম্বর নিয়ন্ত্রণ সেন্টারে টিক্কা খান উপস্থিত থেকে বাঙালি নিধন পর্বটি পরিচালনা করে।

President Yahya Khan's tanks have been ordered into destructive action, no holds barred against the pople of East Pakistan; and in grim logic the enemy must be the whole people because they had declared this with rare unanimity for demands of self-rule.

২৫ মার্চে শেখ মুজিবের স্বাধীনতার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই সুপরিকল্পিতভাবে বাংলার ওপর আক্রমণ শুরু হয়। যখন 'সর্বপ্রকার প্রস্তুতি সম্পন্ন'–টিক্কা খানের এই সঙ্কেতে ইয়াহিয়া খান আশ্বস্ত হয়ে, আপস আলোচনায় ছদ্মাবরণ খুলে গোপনে পিআইএ বিমানযোগে ঢাকা ত্যাগ করে পিণ্ডিতে পলায়ন করার পূর্বমুহূর্তে তার বর্বর সৈন্যকে নির্দেশ দিয়ে যান–বাঙালিকে নির্মম অমানুষিকভাবে হত্যা এবং সুপরিকল্পিতভাবে পূর্ব বাংলাকে ধ্বংস করার জন্য, ঠিক তখনই রাতের অন্ধকারে আক্রমণ চূড়ান্তভাবে শুরু হয়। ভয়ভীতি সৃষ্টি করে, পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের কলোনি হিসেবে ধরে রাখতে, 'পাকিস্তান' নামক রাষ্ট্রের প্রতি আরও ৩০ বছরের জন্য সর্বস্তরের বাঙালির আনুগত্য প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে এ রকম নির্দেশের প্রধান কারণ।

In the name of 'God and a united Pakistan' Dacca is crushed and frightened city.l The first target of Army tanks that rolled into Dacca. Thursday 25th March night [...] by 11pm firing had broken out and the people who had started to hastily errect makeshift barricades- overtemed cars, tree stumps, furniture, concrete piping- became early casuities as the troops rolled into Dacca city. [...] people asleep in the Bazaar were shot. In the morning the victims were still lying there rugs on them as if they were still sleeping.

২৫ মার্চ ১৯৭১। কালোরাত। ১১.৪৫ টার পর। পাকিস্তানি সৈন্যরা ওয়্যারলেস বসানো জিপ ও ট্যাঙ্ক নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে। একদিকে একটি জিপ ও তিনটি পাঁচ টনের ট্রাকসহ লেফটেন্যান্ট কর্নেল জহির তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। অন্যদিকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্তিশালী পাঁচ ডিভিশন আধুনিক অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত সৈনিকরা বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

২৫ মার্চ ১৯৭১। কালরাত। একদিকে লেফটেন্যান্ট কর্নেল জহির ও কমান্ডো দল মিরপুর সড়কে পৌঁছতেই প্রথম সড়ক অবরোধের মুখোমুখি হয়। রাস্তায় প্রতিবন্ধক স্থাপন করা আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকরা পাকিস্তানি সৈন্যদের দ্বারা প্রথমে আক্রান্ত হয়। রকেট লঞ্চার দিয়ে ফায়ার ও পাঁচ টনি ট্রাকের উইঞ্চ দিয়ে সড়কের প্রতিবন্ধকতা পরিষ্কার করে। কমান্ডো দল ২০০ গজ অগ্রসর হওয়ার পর আবারও সড়ক অবরোধের মুখোমুখি হয়। একইভাবে সড়কের প্রতিবন্ধকতা পরিষ্কার করে কমান্ডো দল অগ্রসর হতে থাকে। আবারও ২০০ গজ এগিয়ে আসার পর কমান্ডো দল তৃতীয় সড়ক অবরোধের (তিন ফুট উঁচু ও চার

ফুট প্রস্থ ইটের দেওয়ালের) মুখোমুখি হয়। ক্যাপ্টেন সাঈদের প্লাটুনের সদস্যদের লেফটেন্যান্ট কর্নেল জহির নির্দেশ দেয় যে, ইট সরিয়ে গাড়িগুলো নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের দিকে অগ্রসর হতে। তারপর সে বাকিসহ কমান্ডোদের নিয়ে হেঁটে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দিকে অগ্রসর হয়। রাত সোয়া বারোটায় পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বঙ্গবন্ধুর বাড়িকে তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলে। তারপর কয়েক রাউন্ড গুলিবর্ষণ করা হয়। মেজর বেলাল তার দলবল নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে প্রবেশ করে তল্লাশি শুরু করে। মেজর বেলাল এবং লেফটেন্যান্ট কর্নেল জেড এ খানের সঙ্গে নিযুক্ত কমান্ডো বাহিনী, স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার অপরাধে, ২৫ মার্চের রাত একটার মধ্যে বঙ্গবন্ধুকে ধানমন্ডির ৩২ নং বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে। তারপর তাকে ঢাকা সেনানিবাসে আটক রাখে। অন্যদিকে একটি সাঁজো বহর ঢাকার সেনাছাউনি থেকে বেরিয়ে ফার্মগেট এলাকায় পৌঁছলে বাঙালি জনতার সড়ক অবরোধের মুখে পড়ে, যা তৈরি করা হয় অকেজো পুরনো গাড়ি, অচল স্টিমরোলা ও গাছের গুঁড়ি দিয়ে। শুরু হয় নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালির ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণ। হানাদার বাহিনীর অবাধ চলাচলের সম্মুখে যা পায় তাই ধ্বংস করে চলে, এমনকি রাস্তার দু'পাশে ব্রাশফায়ার করে হত্যা করতে থাকে অসংখ্য নিরীহ, গরিব, ঘুমন্ত, পরিশ্রান্ত মানুষকে।

> In few incidents witnessed by newsmen, soldiers fired heavy machineguns at empty-handede civilians without warnig, Death or other casualties could not be counted.

পাকিস্তানি সৈন্যদের ট্যাঙ্ক বাছবিচার ছাড়াই সরকারি-বেসরকারি ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত করে। আবাসিক এলাকায় ও পত্রিকা অফিসে কামানের গোলাবর্ষণে শুরু হয় অগ্নিকাণ্ড। এমনকি পাকিস্তানি সৈন্যরা অগ্নিসংযোগে হিন্দু অধ্যুষিত শাঁখারী ও তাঁতী বাজারের ঘনবসতি আর 'ইত্তেফাক' পত্রিকার অফিস জ্বালিয়ে ভস্মে পরিণত করে।

> ... they [Pakistan Army] went about systematically destroying the entire old city of Dacca. The Army shot persor in the old city and burnt inside their homes. the biggest massacre was in Hindu locality. The Army then rushed to its next target, the Centre of Sheikh Mujib's supporters. The camage contiued till the night.

২৫ মার্চ ১৯৭১। মানব ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাযজ্ঞের ভয়াল কালোরাত। স্বাধীনতাকামী বাঙালির ওপর হিংস্রবর্বর পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ চলতে থাকে। 'অপারেশন সার্চলাইট' নামের অভিযানে উন্মত্ত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বর্বরোচিত হামলায় বিশ্ববাসী হতবাক হয়। সমগ্র বিশ্ববাসীকে শিহরিত করে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী জনগণের নিরাপত্তাকে তুচ্ছ করে যথেচ্ছভাবে কামান এবং সাঁজো যান ব্যবহার করে। নিরীহ নিরস্ত্র মানুষকে নির্বিচারে পাখির মতো গুলিবর্ষণে হত্যা করে, মুক্তিকামী বাঙালির কণ্ঠ স্তব্ধ করার জন্য। মধ্যযুগীয় কায়দায় হানাদাররা রাজারবাগ পুলিশ লাইন, পিলখানার ইপিআর সদর দফতর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ গোটা ঢাকা শহরে চালায় হত্যাযজ্ঞ এবং অগ্নিসংযোগ।





> ... the Army seized control of Dacca on Thursday night and gunfire including heavy artillery was heard till late on Friday morning. Huge fires burnt in the direction of Dacca University.

২৫ মার্চ ১৯৭১। কালরাত। আমেরিকার দেওয়া এম-২৪ ট্যাঙ্কসহ ১৮তম ও ৩২তম পাঞ্জাব রেজিমেন্টের অনিয়মিত বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আক্রমণ চালায়। শিক্ষকদের ওপরও হামলা ও নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায়। ড. গোবিন্দ্র চন্দ্র দে, ড. জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্য, ড. মনিরুজ্জামানসহ বিভিন্ন বিভাগের নয়জন শিক্ষককে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে।

> Caught by suprise some 200 Students were killed in Iqbal Hall when their rooms were sprayed with Machinegun fire [...[ the military removed many of the bodies but the 30 bodies still there never acconted for all the blood in the corridors of Iqbal Hall.

দস্যুরা ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরিকে দখল করে। লাইব্রেরিকে প্রধান ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে। এখান থেকেই ছাত্রাবাসগুলোতে গোলাবর্ষণ শুরু করে। পাকিস্তানি সৈন্যরা অবিরাম গুলি নিক্ষেপ করে ইকবাল হলের ২০০ জন ছাত্রকে হত্যা করে। এই আক্রমণ থেকে জগন্নাথ হল ও রোকেয়া হল বাদ পড়ে না। পাকিস্তানি বাহিনী কামান, ট্যাঙ্ক, মর্টার, মেশিনগান প্রভৃতি উন্নত ধরনের মারাত্মক মারণাস্ত্র সঙ্গে নিয়ে যে আক্রমণ চালায় এতে শত শত ছাত্র, যুবক, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নিহত হন।

১৩তম সীমান্তবর্তী সৈন্যদলের পাকিস্তানি সৈন্যরা সেনানিবাসে অতর্কিতভাবে আক্রমণ চালিয়ে বাঙালি সেনা সদস্যদের ওপর হামলা চালায়। রাজারবাগে অবস্থানরত পুলিশ সদস্যরা, আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় ও তাদের সামান্য অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলেন, কিন্তু ৩২তম পাঞ্জাব রেজিমেন্টের অনিয়মিত বাহিনীর ট্যাঙ্ক ও ভারী মেশিনগানের মুখে এ প্রতিরোধ বেশিক্ষণ টিকতে পারেনি। পাকিস্তানি সৈনরা গ্যাসোলিন ছিটিয়ে জ্বালিয়ে দেয় পুরো সদর দফতরটি। বাঙালি সৈন্যরা পরাজিত হন।

২২তম বালুচ রেজিমেন্ট পিলখানাস্থ ইপিআর সদর দফতরের নিরস্ত্র সৈন্যদের আক্রমণ করে। পাকিস্তানিরা সারা রাত যুদ্ধ চালিয়ে তাদেরকে পরাজিত ও পরাভূত করে। পাকিস্তানিরা খিলগাঁওয়ের আনসার সদর দফতরেও সশস্ত্র হামলা চালায়। অনেক হতাহতের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি বাহিনী মিরপুরে অবস্থানরত ইপিআর বাহিনীকে গ্রেফতার করে। এমনকি রাষ্ট্রপতি ভবন ও গভর্নর হাউস দখল করে। তাদের হাতে বন্দি হয় অনেক ইপিআর-এর বাঙালি অফিসার ও জওয়ানরা। বেঁচে যাওয়া পুলিশ এবং ইপিআর সেনারা শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়, কেউ কেউ বুড়িগঙ্গা নদী পার হয়ে জিঞ্জিরায় জমায়িত হয়। আর অনেকে ধরা পড়ে। ধরা পড়া বাঙালি সৈন্য, ইপিআর সদস্য ও পুলিশ কর্মকর্তাদের হয় মেরে ফেলে নতুবা কোনো বিচার ছাড়া কয়েদে নিক্ষেপ করে। প্রসঙ্গত, ১০তম ইবিআর (সি.ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল মহিউদ্দিন, বাঙালি) ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থান করে। ২,৫০০ ইপিআর সৈন্যদল (১৩তম, ১৫তম এবং ১৬তম উইং, সঙ্গে ইপিআর সদর দফতর উইং

এবং সংকেত প্রদানকারী উইং) পিলখানায় ইপিআর সদর দফতরে অবস্থান করে। সাধারণত প্রতিটি ইপিআর উইংয়ে তিনটি করে কোম্পানি থাকে। যদিও বেশির ভাগ ইপিআর সৈন্যরা পিলখানায় অবস্থান করে, তবুও এর মধ্যে দুটো কোম্পানি মিরপুরে, দুটো কোম্পানি রাষ্ট্রপতি ভবনে এবং একটি কোম্পানি গভর্নর হাউসে নিয়োজিত থাকে। পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার নিসার আহমেদ খান পুরো ইপিআর বাহিনীর প্রধান এবং পাকিস্তানি লেফটেন্যান্ট কর্নেল আনোয়ার হোসাইন শাহ ইপিআর-এর ঢাকা সেক্টরের সৈন্যদের কমান্ডার। রাজারবাগ পুলিশ লাইনে অবস্থানরত বাঙালি সশস্ত্র পুলিশের সংখ্যা কমপক্ষে দু'হাজার। ২য় ইপিআর বাহিনী (সি.ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাকিব, বাঙালি) ঢাকার উত্তরে জয়দেবপুরে, একটি কোম্পানি টাঙ্গাইলে, একটি কোম্পানি ময়মনসিংহে এবং ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন একটি অংশ গাজীপুরে অবস্থানরত। ইপিআর-এর দ্বিতীয় উইংয়ের সদর দফতর (সি.ও ক্যাপ্টেন কামার আব্বাস, পাকিস্তানি) ময়মনসিংহে, যেখানে কোনো বাঙালি অফিসার নেই।

বাঙালির ওপর যখন হত্যাযজ্ঞ চলতে থাকে তখন কড়া প্রহরায় ভুট্টো হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে ১২ তলায় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সেনাবাহিনী হোটেলটি ঘিরে ফেরে এবং সবাইকে জানিয়ে দেয় যে, তারা বেরুলেই গুলি চালাবে। আর টিকিহীন টিক্কার হুকুম তামিল করতে পাষাণ সৈন্যরা উত্তপ্ত জিঘাংসার সঙ্গে আকস্মিক বর্বরোচিত আক্রমণের তাণ্ডবলীলা চালাতে থাকে।

আক্রমণ সম্বন্ধে পিটার হ্যাজেলহাস্ট বলেন–

বাঙালিদের দাবিয়ে রাখার জন্য একটি সুপরিকল্পিতিভাবে ভীতি-প্রদর্শনের জন্যই যে ২৫ মার্চের কারোরাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকায় অপারেশন চালায় এ ব্যাপারে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। বাঙালিকে দমন করতেই এই অপারেশন চালানো হয়। 'বাঙালিরা সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলে'- পাকিস্তান সরকারের এই দাবিও বাতিল হয়ে যায়; এর একটি প্রমাণ হচ্ছে আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে সেনা ইউনিটসমূহের মধ্যে যে বেতার বার্তা বিনিময় হয় এর মুদ্রিত কপি। কপিটি বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের হাতে এসে পৌঁছে। তারা তা জাতিসংঘের মহাসচিব ও অনেক সরকার প্রধানের কাছে পাঠান। জেনারেল টিক্কা খানের কন্ট্রোল, সেনা সরকার ও আর্মি ইউনিটসমূহের মধ্যে যে বার্তা বিনিময় হয় এর কয়েকটি নমুনা তুলে দেওয়া হলো-

(ক) কন্ট্রোল : ওয়েল ডান। বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃতের সংখ্যা কত হবে বলে তুমি মনে করো?

৮৮ : দাঁড়ান। আনুমানিক ৩০০ জন। ওভার।

কন্ট্রোল : ওয়েল ডান। তিনশ মারা গেছে? কেউ আহত হয়েছে বা ধরা পড়েছে? সিটরেপ (সিচুয়েশন রিপোর্ট)। ওভার।





৮৮ : আমি কেবল একটি জিনিসেই বিশ্বাস করি, ৩০০ জন মারা গেছে। ওভার।

কন্ট্রোল : হ্যাঁ, আমি তোমার সঙ্গে একমত। সেটাই হিসেব করা সহজ। কিছুই জিজ্ঞেস করা হয়নি, কিছুই করা হয়নি। তোমাকে কোনো কিছুর ব্যাখ্যা দিতে হবে না। আবার বলছি, ওয়েল ডান। আমি আবার সব জওয়ানের উদ্দেশ্যে তোমাকে বলছি, সাব্বাশ।

(খ) ৭৭ : ৮৮ থেকে সর্বশেষ খবর। তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু সামনে আরও অনেক ভবন আছে যেগুলোকে একে একে ধ্বংস করতে হবে। তার কোনো ক্ষতি হয়নি, তবে তার দিকে গুলি ছোঁড়া হচ্ছে। তার কাছে যা যা আছে তিনি তা ব্যবহার করছেন। ওভার।

কন্ট্রোল : তাকে বলো যে, তার বড় ভাইরা (আর্টিলারি সহায়তা) তাকে সমর্থন করার জন্য দ্রুতই এগিয়ে আসছে। এসব ভবন ধ্বংস করার জন্য তাদের ব্যবহার করা যাবে। এখন অন্য খবর বলো। আমার মনে হয় লিয়াকত ও ইকবাল (ছাত্রাবাস) এখন শান্ত...।

কন্ট্রোল : বাংলাদেশের পতাকা বা কালো পতাকা প্রসঙ্গে ইমামের (কমান্ডিং অফিসার) কাছ থেকে জানা গেছে। ভবনের মালিকদের এখনই সেসব পতাকা সরিয়ে ফেলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, না সরালে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে। কোনো কোনো স্থানে রাস্তা-অবরোধের অপরাধের জন্য শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। ঘটনাস্থলেই গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে। বাড়ি ও ভবন ধ্বংস করা হচ্ছে।

(গ) ৮৮ : উইলকো। আর কিছু। ওভার।

কন্ট্রোল : ইমাম এখন ২৬-এর সঙ্গে আছে। যদি তোমার কোনো ব্যাপারে সাহায্যের প্রয়োজন হয় তাহলে তুমি তাকে জানাতে পারো। বাক্সার (ধ্বংস করার স্কোয়াড) সম্পর্কে তারা তাদের ঘাঁটি থেকে রওয়ানা হয়েছে এবং প্রথম সূর্যালো প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে কোনো অবরোধ সামাল দিতে তোমাকে সাহায্য করবে। ওভার।

(ঘ) কন্ট্রোল : পিপলস ডেইলির (ডেইলি পিপলস সংবাদপত্র) খবর কী? ওভার।

২৬ : বোমা নিক্ষেপে ধ্বংস করা হয়েছে। আবার বলছি, ধ্বংস করা হয়েছে। আমাদের দুজন সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে। তাদেরকে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

কন্ট্রোল : মৃতের আনুমানিক সংখ্যা কত? ওভার।

২৬ : এই মুহূর্তে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। স্থানে স্থানে আগুন জ্বলছে। সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা হয়েছে।

কন্ট্রোল : পুলিশ লাইনে আক্রমণ করেছ? ওভার।

২৬ : পুলিশ লাইনে আক্রমণ করা হয়েছে। ওভার।

কন্ট্রোল : গুড শো। আউট।

২৫ মার্চের রাতে যখন পাকিস্তানিস সেনাবাহিনী ঢাকা আক্রমণ করে তখন পুলিশ বাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করে, ফলে ১৮ ঘণ্টাব্যাপী যুদ্ধ সংগঠিত হয়। পাকিস্তানি বর্বর দল ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা, যশোর, টাঙ্গাইল, বগুড়া, খুলনা, দিনাজপুর, বরিশালসহ নির্বিচারে চালিয়ে যায় তাদের অত্যাচার; আর নিরাপরাধী, নিরস্ত্র ও অসহায় বাঙালিকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা। পঞ্চাশটি শহর ও দু'হাজার গ্রামগঞ্জে মার্শাল ল জারি করা হয়। ছাত্রাবাস, প্রফেসর কোয়ার্টারস, পুলিশ ফাঁড়ি বাজার, মসজিদ-মন্দির, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, শ্রমিক-বস্তিসহ অসংখ্য আবাসিক এলাকায় বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ করে পাইকারিভাবে বাঙালিকে হত্যা করে। পাষাণরা চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, যশোর, রংপুর, পাবনা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, বগুড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, সিলেটসহ বিভিন্ন অঞ্চলে নির্বিচারে বিমান থেকে বোমা ফেলে অসংখ্য বাড়িঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে উজাড় করে দেয়। এমনকি পাকিস্তান বিমান বাহিনীর আক্রমণে কর্নেল রবের গ্রামও ধ্বংস হয়। জঙ্গি বিমান কয়েকবার হবিগঞ্জের হলদারপুরের আকাশে চক্কর দিয়ে অবিরাম বোমা ফেলে কয়েক মিনিটে একাত্তরের একটি হিরোসিমায় পরিণত করে। দেওয়ানগঞ্জ থানা শহরেও অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণ চলে। চিনিকলের বেশ কিছু হিন্দু ও মুসলমান কর্মচারী নিহত হয়। অগণিত ঘরবাড়ি আগুনে পুড়ে ছাই হয়। বর্বর বাহিনীর একমাত্র উদ্দেশ্য যে কোনো ভাবেই হোক বাঙালির স্বাধীনতার স্পৃহাকে স্তব্ধ করা চাই। সমস্ত পূর্ব বাংলা জুড়ে সাঁজো বহর ট্যাঙ্কগুলো ধ্বংস করে চলে সামনে পিছে যা কিছু পায় সবকিছু। অনুষ্ণশোণিত হিংস্রতায় পাঞ্জাবি সৈন্যরা মেশিনগান থেকে গুলি ছুঁড়ে হত্যা করে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকল; কেউই নিস্তার পায়নি, একের পর এক লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। অগ্নিসংযোগে বাঙালির ঘরবাড়ি, দালান বা বস্তির খুপরিই হোক–কোনো ভেদাভেদ নেই। সবকিছুই ধ্বংস করা হয়। শহর-গঞ্জ-বন্দর সবকিছু পরিণত হয় রাবনের লঙ্কাপুরীতে। বাংলাদেশ পরিণত হয় একটি নিথর গোরস্তানে।

While no exact account of what is going on is available, it is said more than 10,000 persons have been killed.

২৫ মার্চের রাতে ও ২৬ মার্চের গণহত্যায় দশ হাজার বাঙালি নিহত হয়। ঢাকা শহরেই পাঁচ থেকে সাত হাজার বাঙালি নিহত হয়। 'বাঙালি নিধন পর্ব'টি চলাকালীন দশ থেকে একশ হাজার বাঙালি নিহত হয়। ঢাকা অঞ্চলে পঁয়ত্রিশ হাজার বাঙালি নিহত হয়।

The Pakistani Army is using artillery and heavy machineguns against unarmed East Pakistani civilians to crush the movement for autonomy in this province of 75 million people. Some fires were





still burning and sporadic shooting was continuing early this morning when the 35 foreign newsmen were expelled from Dacca.

২৬ মার্চ ১৯৭১। কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা–

১. রাতের শুরুতেই পাকিস্তান সমরবাহিনীর পরিকল্পিতভাবে বাঙালির ওপর সামরিক আক্রমণ (অপারেশন সার্চলাইট)।

২. ১৮তম পাঞ্জাব রেজিমেন্টের অনিয়মিত বাহিনী হিন্দু এলাকা এবং পুরান ঢাকা আক্রমণ করে। ভোরের মধ্যেই শহরটি তাদের দখলে চলে যায়। শহরব্যাপী কারফিউ জারি করা হয়।

১. বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আবেদন।

২. ছাত্র, শ্রমিক, পুলিশ, ইপিআর ও রাজনৈতিক কর্মীদের পাকিস্তান সমরবাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

৩. পাকিস্তান সমরবাহিনীর আক্রমণে হাজার হাজার বাঙালি নিহত।

৪. বাঙালি ও বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান সমরবাহিনীর হাতে বন্দি।

৫. বঙ্গবন্ধুর হাইকমান্ড নামে খ্যাত 'রাজনৈতিক পরিষদ'-এর পাঁচজন নেতা তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মোশতাক আহমেদ, মনসুর আলী ও কামরুজ্জামান এবং সামরিক উপদেষ্টা কর্নেল এম এ জি ওসমানী, রাজনৈতিক ও আইন উপদেষ্টা ড. কামাল হোসেন শত্রুবাহিনীর দৃষ্টির অগোচরে আত্মগোপন।

৬. বাংলাদেশে অবস্থিত বাঙালি সেনাদের ও সমর ইউনিটগুলো নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ এবং পাকিস্তান সমরবাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিতে ব্যর্থ।

৭. সারা দেশে ইপিআর ও পুলিশের সাধারণ সিপাহীরা পাকিস্তান সমরবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার পদক্ষেপ।

৮. বিমান ও নৌবাহিনীর অফিসার ও সেনারা পাকিস্তান সমরবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে না তুলে দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন।

৯. পাকিস্তানের সমরাভিযানের মুখে সাধারণ বাঙালির শহর ছেড়ে গ্রামে পলায়ন।

১০. রাজনৈতিক ও ছাত্র নেতৃবৃন্দের আত্মগোপন।

১১. পাকিস্তান সমরবাহিনীর পরিকল্পনা অনুযায়ী বাঙালি অফিসার ও বুদ্ধিজীবীদের হত্যা।

১২. জামায়াত, মুসলিম লীগসহ মৌলবাদীদের পাকিস্তান সমরবাহিনীর প্রতি সমর্থন।

১৩. পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সকল প্রকার কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ।

১৪. কমলাপুর স্টেশন, রেললাইন, মতিঝিল, গোপীবাগ, মানিকনগরে বিক্ষিপ্ত পাকিস্তান সমরবাহিনীর গোলাবর্ষণ।

২৬ মার্চ ১৯৭১। সামরিক প্রশাসন বিদেশি সাংবাদিকদের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে এবং ৩৫ জন বিদেশি সাংবাদিককে নির্দেশ দেয় পূর্ব বাংলা ত্যাগ করার জন্য। এমনকি সাংবাদিকদের তল্লাশি করে তাদের ক্যামেরা ও ফিল্ম ছিনিয়ে নেয়। ভুট্টো করাচি পৌঁছে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'আমি ইয়াহিয়া খানকে সমর্থন করি। পূর্ব বাংলার আন্দোলন সশস্ত্র বাহিনী দ্বারা ধ্বংস করাই বাঞ্ছনীয়।'

২৬ মার্চ ১৯৭১। একদিকে জেনারেল ইয়াহিয়া এক ভাষণে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বঙ্গবন্ধুকে দ্রেশদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করেন। অন্যদিকে 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের নামে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেন চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান।

২৭ মার্চ ১৯৭১। দু'ঘণ্টার জন্য পাকিস্তানি সেনারা কারফিউ তুলে নেয়, তখন আবারও হাজার হাজার শহরবাসী গ্রামের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করতে থাকে। পাকিস্তানি সৈন্যরা অন্যান্য শহরের দিকে অগ্রসর হয়। পূর্বে ডেমরা, উত্তরে টঙ্গী ও দক্ষিণে নারায়ণগঞ্জের দিকে অবস্থান নিয়ে শহরে প্রবেশ পথ বন্ধ করে দিয়ে বাঙালির ওপর শত্রুবাহিনীর আক্রমণ ও হত্যাযজ্ঞ চলতে থাকে। একই দিন চট্টগ্রামের 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' থেকে মেজর জিয়া বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন।

মেজর জিয়ার স্বকণ্ঠে প্রকাশিত বাণীতে বলা হয়–

The Government of the sovereign state of Bangladesh on behalf of our Great Leader, the Supreme Commander of Bangladash Sheikh Mujibur Rahman. We hereby proclaim the independence of Bangladesh, and that the government headed by Sheikh Mujibur Rahman has already been formed. It is further proclaimed that Sheikh Mujibur Rahman is the sole leader of the dlected representatives of seventy five million people of Bangladesh and the government headede by him is the only legitimate government of the people of the independent sovereign state of Bangladesh which is legallyu and constitutionally formed and is worthy of being recognised by all the governments of the world. I therefore, appeal on behalf of our Great Leader Sheikh Mujibur Rahman to the governments of all the democratic countries of the world, specially the big powers and the neighbouring countries to recognise the legal government of Bangladesh and take effective steps to stop immediately the awful genocide that has been carried on by the army of occupation from Pakistan. To dub out the legally elected representative of the majority of the peoples as secessionist is a crude joke and contradiction to truth which should be fool none 'The guiding





principle of a new state will be first neutrality, second peace and third friendship to all and emmity to none. May Allah help us. 'Joy Bangla.'

২৭ মার্চ ১৯৭১। 'দি গার্ডিয়ান' লিখে–

Sheikh Mujibur Rahman the acknowledged leader of Bengali nationalism responded heroically to the Pakistan Armys intervention with a call for resistance and Declaration of Independence. There is a good evidence that most members of the Bengali regiments will accept his orders. Shortly before his arrest mujib had issued a proclamation to his people which informed them. 'You are citizens of a free country. Today the West Pakistan's military is engaged in genocide in Bangladesh. Our struggle is most rewarding certain is our victory. Alla is with us. The World public opinion is wiht us. Joy Bangla (victory of Bengal).

২৮ মার্চ ১৯৭১। দালাল বাহিনীর সহযোগিতায় শত্রুবাহিনীর ঢাকাসহ পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জায়গায় চিহ্নিত আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও হিন্দু বাঙালির বাড়িতে আক্রমণ ও তাদের ওপর হত্যাযজ্ঞ অব্যাহত রাখে।

২৮ মার্চ ১৯৭১। খরিয়ান ও মুলতান থেকে করাচিতে আসা, দুই ডিভিশন সৈন্য ৪৮ ঘণ্টার নোটিশে, হালকা বেডরোল ও সামরিক রণাস্ত্রসহ জাতীয় এয়ারলাইন পিআইএ বিমানযোগে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। আর তাদের অস্ত্রশস্ত্র সমুদ্রপথে পাঠানো হয়।

২৯ মার্চ ১৯৭১। পূর্ব বাংলার গণহত্যা বন্ধ করার জন্য জাতিসংঘকে অনুরোধ করে ভারত। ভারতের সংসদ পূর্ব বাংলার মানুষের জন্য সাহায্য ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করে। ভারতকে দোষারূপ করে পাকিস্তান বলে যে, পূর্ব বাংলা দখল করার ফন্দি করছে ভারত। একই সঙ্গে চীন প্রকাশ্যে পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে ভারতকে অভিযুক্ত করে বলে যে, পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারত অনাহূত হস্তক্ষেপ করছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ করেন যে, পূর্ব বাংলার গণহত্যা বন্ধ করার জন্য। একই সঙ্গে তিনি আহ্বান জানান রাজনৈতিক সমাধান অনুসন্ধান করতে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টের পত্রোত্তরে ইয়াহিয়া (৬ এপ্রিল) বলেন যে, পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়নের মাথা ঘামানো উচিত না, তার উচিত ভারতকে অনুরোধ করা যে, পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সে যেন অনধিকার চর্চা না করে।

৩০ মার্চ ১৯৭১। পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশের গণহত্যা রোধে এগিয়ে আসার জন্য জাতিসংঘ ও বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতি মেজর জিয়াউর রহমান আহ্বান জানান। ৩১ মার্চ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে কুষ্টিয়ায় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়।

একাত্তরে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ও সমরনায়কদের সশস্ত্র হামলা বাঙালির আকাঙ্ক্ষা অবদমিত করতে পারেনি, বরং তাদের হৃদয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঘৃণা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। বাঙালি যেভাবে পারে সেভাবেই পাল্টা আক্রমণ করে। বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআরের বাঙালি সদস্যসহ শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী আর অসংখ্য তরুণ-তরুণী পাকিস্তানি বর্বরদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নির্মম ও সর্বাত্মক আক্রমণের ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই শুরু হয় সশস্ত্র বাহিনীর সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি সদস্যদের বিদ্রোহ। উদ্ভূত খণ্ডযুদ্ধ ও ইপিআরের প্রতিরোধে পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। সূচিত হয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির পরাজয়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যেভাবে অত্যাধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে নিরস্ত্র নিরীহ শান্তিপ্রিয় সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তা সভ্য পৃথিবীতে আর ঘটেছে বলে মনে হয় না। নরনারী, শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সমগ্র সাড়ে সাত কোটি মানুষ দস্যুর নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়। বাংলাদেশের এমন কোনো শহর বা গ্রাম বাকি থাকে না যেখানে পাকিস্তানি বর্বর নির্বিচারী শত্রু গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, সম্পদ লুটপাট ও নারী নির্যাতন না করে থাকতে পারে। পূর্ব বাংলার জনগণ নির্মম অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে এ জ্ঞান লাভ করে যে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে আপসের পথে পূর্ব বাংলার মুক্তি কখনই সম্ভব নয়, পূর্ব বাংলাকে তথা বাংলাকে বাঁচাতে হলে দস্যুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই একমাত্র উপায়।

দীর্ঘ চব্বিশ বছর পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ও সমরনায়ক দ্বারা অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে বাঙালি জাতি যেভাবে চরম নিপীড়িত হয়, এর উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য এই প্রথম জাতীয় মুক্তির আশায় বাংলার শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-সৈনিক-বুদ্ধিজীবী, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা- সাধারণ বাঙালি রক্তঝরানো সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ইয়াহিয়ার অবর্ণনীয় আক্রমণের ভয়াবহতার আতঙ্কে বাঙালির চোখে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও আদর্শগত অস্তিত্বের অবশিষ্ট যুক্তি যা ছিল তা সবই নদী ভাঙা জলের মতো তলিয়ে যায়। সারা বাংলায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। স্বাধীনতার জন্য বাঙালি একাতবদ্ধ হয়। গঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার, মুক্তিবাহিনী, মিত্রবাহিনী। শুরু হয় তীব্র গণযুদ্ধ এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মাধ্যমে পৃথিবীর বুকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌমত্ব দেশ রচনার কাজ।



# গণহত্যা

কলেরা ও দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত পাঁচ মিলিয়ন বাঙালি বাস্তুভিটা ছেড়ে কেন পালিয়ে যাচ্ছে; মার্চের শেষ থেকে পাকিস্তানি সেনারা কেন পরিকল্পিতভাবে হাজার হাজার বাঙালি হত্যা করে চলেছে; আর এই হত্যাযজ্ঞকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ধামাচাপা দেওয়ার পেছনের ঘটনাবলি কী; সেনাবাহিনী স্বাধীন বাংলাদেশের বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান সমর্থকদের স্বেচ্ছাকৃতভাবে খুন করছে কেন; হিন্দুদের গুলি করে বা পিটিয়ে কেন মারছে–শুধু কী তারা হিন্দু বলেই; হিন্দুদের গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছে কেন–এসব মর্মান্তিক ও করুণ কাহিনি নিয়ে পাকিস্তান থেকে ফিরে এসেছেন 'সানডে টাইমস'-এর পাকিস্তান প্রতিনিধি অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস। বিশ্ববাসীকে তিনি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কীর্তিকলাপ জানানোর জন্য এই প্রথম নীরবতার পর্দা উন্মোচন করেছেন।

## পূর্বাভাস

মার্চের শেষের দিকে পূর্ব বাংলায় দুই ডিভিশন পাকিস্তানি সেনা গোপনে পাঠানো হয় বাঙালি বিদ্রোহীদের খুঁজে বের করার জন্য। এই দু'সপ্তাহ পর পাকিস্তান সামরিক সরকার আটজন পাকিস্তানি সাংবাদিককে আমন্ত্রণ জানায় পূর্ব বাংলায় আসার জন্য। উদ্দেশ্য, সরকারি কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সাংবাদিকদের প্রভাবিত করে পাকিস্তানের পশ্চিমাংশের জনগণকে এই ধারণা দেওয়া যে, দেশের পূর্বাংশের 'সবকিছু স্বাভাবিক' হয়ে এসেছে। সাতজন সাংবাদিক তাদের কথামতো কাজ করেন। কিন্তু করাচির মর্নিং নিউজ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ও সানডে টাইমসের পাকিস্তান প্রতিনিধি অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস তা করেননি।

১৮ মে ১৯৭১। মঙ্গলবার। তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে এসে হাজির হন লন্ডনস্থ 'দি সানডে টাইমস' পত্রিকার কার্যালয়ে। তিনি পূর্ব বাংলা ছেড়ে ৫০ লক্ষ বাঙালি কেন ভারতে চলে যাচ্ছে তার পেছনের কাহিনীগুলো সহজভাবে জানালেন। এই কাহিনি লেখার পর তার পক্ষে আর করাচি ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। তিনি পাকিস্তানে ফিরে না যাওয়ার ব্যাপারেও দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাকে অবশ্য তার বাড়িঘর, সহায়সম্পত্তি এবং পাকিস্তানের সবচেয়ে দক্ষ একজন সাংবাদিকের মর্যাদার মায়া ত্যাগ করতে হয়। তবে 'সানডে টাইমস'-এর প্রতি তার মাত্র একটিই শর্ত- পাকিস্তান থেকে তার স্ত্রী ও পাঁচ সন্তানকে ব্রিটেনে ফিরে না আনা পর্যন্ত তার রিপোর্টটি যেন প্রকাশিত না হয়। অবশ্য 'সানডে টাইমস' এই শর্তে রাজি হয়।

তিনি পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার দশ দিন পর 'সানডে টাইমস'-এর এক নির্বাহী কর্মকর্তার ব্যক্তিগত ঠিকানায় এক তারবার্তা এসে পৌঁছে, 'আসার প্রস্তুতি সম্পন্ন, সোমবার জাহাজ ছাড়বে।' পাকিস্তান ত্যাগের ব্যাপারে তিনি তার স্ত্রী ও সন্তানদের অনুমতি আদায় করতে সক্ষম হন। তার পাকিস্তান ত্যাগের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও তিনি একটি পথের খোঁজ পান। পাকিস্তানের অভ্যন্তরে যাত্রার শেষ পর্যায়ে তিনি প্লেনে একজন তথ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাকে দেখতে পান, যার সঙ্গে তার ভালোমতোই পরিচয় ছিল। এই

কর্মকর্তার একটি ফোনকল তাকে গ্রেফতার করার জন্য যথেষ্ট ছিল, তবে সে কোনো ফোনকল করেনি। তিনি মঙ্গলবার লন্ডনে এসে পৌঁছেন।

পূর্ব বাংলায় অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস বিশেষ কর্তৃত্ব ও নিরপেক্ষতা সহকারে যা দেখেছেন তা লিখেন। তিনি গোঁয়ার একজন ভদ্র খ্রিস্টান। হিন্দু বা মুসলমান কোনোটাই তিনি নন। জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন পাকিস্তানে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের উদ্ভবের পর থেকেই তিনি পাকিস্তানের পাসপোর্টধারী। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি পাকিস্তানের বহু নেতার আস্থা অর্জন করেন এবং এই রিপোর্টটি তিনি লিখেছেন ব্যক্তিগত দুঃখবোধ থেকে। তিনি বলেছেন, 'তথ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা আমাদের বলে যে, সেনাবাহিনী যে রকম দেশপ্রেমের কাজ করছে সে ব্যাপারটা উপস্থাপন করতে।' কিন্তু অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস তার 'সানডে টাইমস'-এর অনুমতি দেওয়া প্রতিবেদনে যা দেখেছিলেন তাই লিখেন (প্রকাশ : 'সানডে টাইমস', ২ মে ১৯৭১)। অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস তার এই প্রতিবেদনে শুধু ২৫ ও ২৬ মার্চের ঘটনাবলির বিবরণ দেন, তখন বাঙালি সৈন্যরা বিদ্রোহ করে এবং অবাঙালিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে। এমনকি দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতার চিত্রও তুলে ধরেন। কিন্তু তার প্রতিবেদনটি তথ্য মন্ত্রণালয় সেন্সর করে। এ ব্যাপারটিই তাকে নীতিগতভাবে পীড়া দেয়। কিছুদিন পর তার ভাষায়, তিনি স্থির করেন, 'হয় যা দেখেছি তার পুঙ্খনাপুঙ্খ বিবরণ লিখব, নয়তো লেখাই বন্ধ করে দেব; না হলে সততার সঙ্গে আর লেখা যাবে না।' তাই তিনি প্লেনে করে লন্ডন চলে আসেন।

পূর্ব বাংলা থেকে আসা শরণার্থী ও নিরপেক্ষ কূটনীতিবিদ দ্বারা (যাদের এসব ঘটনা সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা আছে) অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাসের এই প্রতিবেদন 'সানডে টাইমস' বিস্তৃতভাবে যাচাই করাতে সক্ষম হয়।

## বাঙালি হিন্দু নিধন পর্ব

১৮ এপ্রিল ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে 'রেডিও পাকিস্তান' থেকে প্রচারিত পূর্ব বাংলার মিলিটারি গভর্নর লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানের বক্তব্য আমি শুনেছি। সে বলল, 'পূর্ব বাংলার মুসলমানরা পাকিস্তানের অভ্যুদয়ের নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেছিল, এখনও তারা পাকিস্তানকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু হিংস্র ও আগ্রাসী সংখ্যালঘুরা জীবন ও ধনসম্পদ ধ্বংস করার হুমকি দিয়ে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠদের দমন করছে, আওয়ামী লীগকে বাধ্য করেছে হিংসাত্মক নীতি গ্রহণ করতে।' অন্যরা অবশ্য হিন্দুদের হত্যালীলার যৌক্তিকতা খোঁজার ব্যাপারে আরও বোধহীন, বুদ্ধিহীন। কুমিল্লার অফিসার্স মেসে ৯ম ডিভিশনের কর্নেল নাঈম বলল, 'টাকার জোরে হিন্দুরা মুসলমান জনগণকে খাটো করে দেখে। পুরো শহরকে ওরা শুষে রক্তশূন্য করে ফেলেছে। অর্থ ও পণ্য সবকিছু তারা ভারতে চালান দেয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্কুল-কলেজে অর্ধেকেরও বেশি নিজেদের লোক ঢুকিয়ে নিজের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য পাঠিয়ে দেয় কলকাতায়। অবস্থা এমন পর্যায় পৌঁছেছে যে, বাঙালি সংস্কৃতি আসলে হিন্দু সংস্কৃতি এবং পূর্ব বাংলা





প্রকৃতপক্ষে পরিচালনা করছে কলকাতার মাড়োয়াড়ি ব্যবসায়ীরা। বাঙালির কাছে তাদের পূর্ব বাংলাকে ফিরিয়ে দিতে হলে এবং ইসলামের কাছে তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে হলে আমাদের হিন্দুদের খুঁজে বের করতেই হবে।' কুমিল্লার ৯ম ডিভিশনের মেজর বশির বলল, 'এটা হলো শুদ্ধ আর অশুদ্ধের মধ্যে যুদ্ধ।' এক কাপ চা খেতে খেতে সে যোগ করল, 'এখানকার লোকদের নাম হয়তো মুসলমানের, পরিচয়ও দেয় হয়তো মুসলমান বলে, কিন্তু মানসিকতায় তারা হিন্দু। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, গত শুক্রবার ক্যান্টনমেন্ট মসজিদের মৌলবি ফতোয়া দিচ্ছিল যে, পাকিস্তানিদের হত্যা করলে বেহেশতে যাওয়া যাবে। এই মৌলবি জারজটাকে আমরা খুঁজে বের করেছি, হিন্দুদেরও খুঁজে বের করবো। যারা পাকিস্তানিদের হত্যা করতে অংশ নেয়নি তারা হচ্ছে খাঁটি পাকিস্তানি ও মুসলমান। আমরা এখন তাদের উর্দু শেখাব।'

প্রত্যেক জায়গায় দেখেছি, পাকিস্তানি কর্মকর্তারা বাঙালি হিন্দুদের হত্যালীলার পেছনে প্রচুর কাল্পনিক যুক্তি তৈরি করতে। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর কৃতকার্যের বৈধতা নিরূপণের জন্য অনেক কিছুই বলা যায়, তাদের মানসিক সন্তুষ্টির জন্য তো অবশ্যই করা প্রয়োজন; তবে পূর্ব বাংলায় মর্মান্তিক ঘটে যাওয়া ঘটনাসমূহের জন্য দায়ী হচ্ছে রাজনৈতিক পরিস্থিতি; অর্থাৎ বাঙালিরা ১৯৭০-এর নির্বাচনে জয়যুক্ত হয়ে ক্ষমতায় বসতে চাওয়াটাই এর মূল কারণ। কিন্তু ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে পাঞ্জাবি শোষক ও শাসকগোষ্ঠীর আকাঙ্ক্ষা এবং নিজেদের পক্ষে স্বার্থ নির্ধারণে সরকারি নীতি-কৌশল প্রাধান্য পেয়ে আসায়, ১৯৭১-এ তাদের পক্ষে রাষ্ট্রক্ষমতা হারানোর ব্যাপারটি সহ্য করা সম্ভব হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই সামরিক বাহিনী এতে ইন্ধন জোগায়। পাকিস্তানি কর্মকর্তারা ব্যক্তিগতভাবে এই বলে সাফাই গাইছে যে, সামরিক বাহিনী পূর্ব বাংলায় গণহত্যা শুরু করার আগে, যেভাবে অবাঙালিদের হত্যা করা হয়েছিল তারই পাল্টা জবাব দিতে বর্তমান পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু চলমান এই গণহত্যা তাৎক্ষণিক ও বিশৃঙ্খল প্রতিক্রিয়া হিসেবে শুরু হয়নি, পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর কর্মকাণ্ড অবশ্যই তা প্রমাণ করে না, বরং বাস্তবে এ হচ্ছে পূর্ব পরিকল্পিত।

ভদ্র ও আত্মবিশ্বাসী অ্যাডমিরাল আহসানের কাছ থেকে পূর্ব বাংলার গভর্নর পদ এবং পাণ্ডিত্যমনা সাহেবজাদা খানের কাছ থেকে সামরিক ক্ষমতা লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান ছিনিয়ে নেওয়ার পরই 'অনুসন্ধান'-এর পরিকল্পনা শুরু হয়। মার্চ মাসের শুরুর দিকে বাঙালির প্রত্যাশিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত হওয়ার পর, শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে 'অহিংস ও অসহযোগ' আন্দোলন পূর্ব বাংলাকে উত্তাল করে তুলে। তখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান রাষ্ট্র ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান করে পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানি সৈন্য দ্বারা দমন-পীড়ন নীতি চালানোর নির্দেশ দিলে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিমালা নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে ঢাকাস্থ পাঞ্জাবি ইস্টার্ন কমান্ড।

২৫ মার্চের রাতে, পাকিস্তানি সেনারা পূর্ব পরিকল্পিত বাঙালি জাতিকে হত্যার অভিযানে নামে। ২৬ মার্চের সকালে ঢাকা শহর জনশূন্য হয়ে পড়ে। পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে ছিল বাঙালি নিধনের জন্য নাম লিপিবদ্ধ করা তালিকা। এই তালিকায় ছিল হিন্দু-

মুসলমান-খ্রিস্টান ছাত্র ও কর্মকর্তা, আওয়ামী লীগের কর্মী ও সমর্থক, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও সাধারণ শিক্ষক, সাংবাদিক এবং মুজিবের সহযোগীদের নাম। সৈন্যদের আক্রমণের নির্দেশ দেওয়া হয় জগন্নাথ হলসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু ছাত্রাবাসগুলো, রমনা রেসকোর্সের মন্দির অঞ্চলের হিন্দু কলোনিগুলো আর পুরানো ঢাকার শাঁখারিপট্টির দোকানপাট ও বাড়িঘর। ২৬ ও ২৭ মার্চের দিন ও রাতব্যাপী, কারফিউয়ের সময়, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের শিল্প এলাকার হিন্দুদের হত্যা করা হয় তবে তাদের কেন খুন করা হয়েছে এর কোনো ব্যাখ্যা সরকারিভাবে দেওয়া হয়নি। কারফিউয়ের সময় রাস্তায় চলাচলকারী মুসলিমদেরও কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। এই লোকগুলোকে খতম করা হয় পরিকল্পিত অভিযানের মাধ্যমে। হিন্দু নিধনের বানোয়াট অভিযোগের ফল হয় আরও বিস্তৃত, অন্যরকম।

১৫ এপ্রিল ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলের ছাদে চারজন ছাত্রের গলিত মাথা পড়ে থাকতে দেখেছি। তত্ত্বাবধায়ক জানান যে, পাকিস্তানি সেনারা তাদের হত্যা করেছে ২৫ মার্চের রাতে। দুটো সিঁড়ি এবং চারটি ঘরে প্রচুর রক্তপাতের চিহ্নও দেখেছি। ইকবাল হলের পেছনে একটি বিশাল আবাসিক ভবন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিশেষ মনোযোগ পেয়েছে বলে মনে হয়। আবাসিক ভবনের বিশাল বিশাল দেওয়াল গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। সিঁড়িতে দুর্গন্ধের রেশ আছে। প্রচুর ডিডিটির গুঁড়ো এখানে সেখানে ছড়ানো হয়েছে। একজন প্রতিবেশি জানান যে, গাড়িতে করে ২৫ মার্চের রাতে পাকিস্তানি সেনা দ্বারা খুন হওয়া ২৩ জন নারী ও শিশুর পচা মৃতদেহ আগেই সরিয়ে নেওয়া হয়। এই ভবনে আশ্রয় নেওয়া হতভাগ্যরা ছিল হিন্দু বাঙালি। এই গণহত্যা সাধন করা হয় নিতান্ত নির্বিকারভাবে।



## গোপন চক্রান্ত

মার্চের হত্যাযজ্ঞের দায়ভার প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও ভুট্টোর ওপরই পড়ে একথা স্বীকার করে পিটার হ্যাজেলহার্স্ট লিখেন–

মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা হঠাৎ করেই আন্তর্জাতিক সমস্যাযুক্ত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। যুদ্ধের কারণে লাখ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত, হাজার হাজার মানুষ নিহত এবং দুর্ভিক্ষ ও রোগের শ্মশানে পরিণত হয়েছে পূর্ব বাংলা। একই সঙ্গে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। তবে সবচেয়ে বিরক্তিকর ব্যাপার হচ্ছে যে, পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি কেবলই অবনতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বনেতারা অবশ্যই আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা করছেন, কীভাবে বাঙালিরা এবং পাকিস্তানিরা একটি রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছতে পারে, কিন্তু একজন উদাসীন ছাত্রও জানে যে, রাজনৈতিক সমঝোতার ব্যাপারটি এখন প্রশ্নাতীত।

আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বিশ্বের রাজধানীগুলোতে পাকিস্তানের তৈরি এই ধ্বংসলীলার বিরুদ্ধে কী কী আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া যায় সেসব নিয়ে উত্তপ্ত বিতর্ক চলছে। কিন্তু এই যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টির জন্য যেসব ইস্যু রয়েছে সেগুলো 'বিচ্ছিন্নতাবাদ' ও 'গণহত্যা' এবং অন্যান্য অভিযোগ পাল্টা অভিযোগের কারণে আরও ঘোলাটে হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য পাকিস্তানি কোনো নেতার দিকে যদি কেউ অভিযোগের অঙ্গুলি তোলেন তবে বলা যায়, তিনি সঠিক কাজই করছেন।

কেননা, জানুয়ারি ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ, যখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জনগণের মাধ্যমে নির্বাচিত একটি সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি দেন এবং একটি নির্বাচিত সাংবিধানিক সংসদের লোভ দেখিয়ে তিনি পূর্ব বাংলা ও পাকিস্তানের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। সংবিধান প্রস্তুতের প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করার জন্য এবং পাকিস্তানিদের, বিশেষ করে যারা বিশ্বাস করে অখণ্ডিত পাকিস্তানে ও পূর্ব বংলায় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কারণে বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তাদের মন থেকে ভয় কমাতে, এর আগে প্রেসিডেন্ট একটি লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার (এলএফও) জারি করে সংবিধান অনুমোদন বা বাতিল করার ক্ষমতা আদায় করেন।

এ নিশ্চিত যে, পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভুট্টো পাকিস্তানের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন এবং অগ্নিগর্ভ পূর্ব বাংলার শেখ মুজিবুর রহমান তার ক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড যখন তুমুলভাবে চলছে তখন রাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করায় উভয় নেতাই নিজ নিজ প্রদেশে তাদের রাজনৈতিক প্রভাব খাটাতে শুরু করেন এবং পাকিস্তানিরা গণতন্ত্রের প্রথম স্বাদ পাওয়ার অপেক্ষায় থাকে। কিন্তু দুই নেতা যখন তাদের নির্বাচনী প্রচারাভিযান শুরু করেন, তখন দ্রুত পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তারা কঠোর ও বিপরীত অবস্থান

থেকে কথা বলছেন; আর সংসদে একই অবস্থান থেকে কিছুই করবেন না। ভুট্টোর রাজনৈতিক শক্তি হচ্ছে কাশ্মীর বিতর্ক নিয়ে জঙ্গি পাঞ্জাবিদের মোহের ওপর। তিনি পশ্চিমের প্রদেশগুলোতে এই বিষয়টিকেই কাজে লাগিয়ে, শক্তিশালী সেনাবাহিনী তৈরি করে ভারতের সঙ্গে হাজার বছরের যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে, কাশ্মীরকে স্বাধীন করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের অঙ্গিকার ব্যক্ত করে ভোট আদায় করেন।

১৯৭০-এ দেশের প্রথম অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় নির্বাচনের ফলাফল কী হয় তা নিয়ে ইয়াহিয়া খান ও তার অনুসারীরা বেশ উৎকণ্ঠিত ছিলেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার হয়তো জনগণের প্রতিনিধির অধীনে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তরের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তিনি আশা করেছিলেন নির্বাচনের ফলাফল পূর্ব বাংলার ও পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলের নেতাদেরকে একটি জোট সরকার গঠন করতে বাধ্য করবে এবং এভাবেই পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করবেন; কিন্তু সমরনায়ক ও জেনারেলরা দুটো বিষয় বিবেচনায় আনতে ভুল করে–(এক) আওয়ামী লীগের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বামপন্থি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নির্বাচন বয়কট করবে এবং এই কারণে আওয়ামী লীগের জন্য পুরো রাজনৈতিক মাঠ ফাঁকা হয়ে যাবে; (দুই) সাইক্লোনে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য পাকিস্তান প্রশাসন সময়মতো ত্রাণ সরবরাহ করতে পারেনি বলে সব ভোট আওয়ামী লীগের পক্ষেই যাবে এবং পাকিস্তানের অখণ্ডতার প্রশ্নে নির্বাচনের ফলাফল হবে বিপর্যয়মূলক।

প্রায় প্রত্যেক বাঙালিই শেখ মুজিবের 'ছয় দফা' প্রস্তাবকে গ্রহণ করেছে, যা নির্বাচনের ক্ষেত্রে মূল প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। আওয়ামী লীগ বাঙালির ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টিতে জয়লাভ করে এবং পশ্চিমা প্রদেশের পাঞ্জাব-বিরোধী আঞ্চলিক দলসমূহের সমর্থন নিয়ে ৩১৩টি আসনের দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি আসন নিয়ে সরকার গঠনের ব্যাপারে শেখ মুজিব আস্থা অর্জন করতে সক্ষম। পশ্চিমাংশে ভুট্টোর পিপলস পার্টি ১৩৮টি আসনের মধ্যে ৮২টি আসন লাভ করে। পাঞ্জাবিরা এই ভেবে শঙ্কিত হয়ে উঠে যে, সংসদ বসলে বাঙালিরা তাদের ইচ্ছে মতো সংবিধান রচনা করতে পারবে। কিন্তু ভুট্টো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না বুঝতে পেরে নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তিনি হঠাৎ আবিষ্কার করলেন যে, প্রেসিডেন্টের লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডারের (এলএফও) মধ্যে তার স্বার্থ লুকিয়ে রয়েছে। সংসদকে ভেটো দেওয়ার বা বাতিল করার যে ধারাটি রয়েছে, তা এক অর্থে পাঞ্জাবেরই ভেটো। নির্বাচনের পরের রাতে ভুট্টো তার পরিকল্পনা প্রকাশ করেন, 'আমি কী করব তা নিয়ে আপনি কী ভাবছেন? শেখ তার সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে পূর্ব বাংলার পক্ষে সংবিধান রচনা করবে আর সব দায়-দায়িত্ব গিয়ে পড়বে প্রেসিডেন্টের ঘাড়ে। পাকিস্তানের পশ্চিমাংশের কাছে অগ্রহণযোগ্য কোনো কিছু তিনি স্বীকার করবেন কিনা তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে।' অন্য কথায়, এলএফও-কে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ভুট্টোর স্বার্থ রয়েছে। কিন্তু তিনি গোপন খবর পেয়েছেন যে শেখ মুজিব ঘোষণা করেছেন সাংবিধানিক সংসদ





অধিবেশনে বসার সঙ্গে সঙ্গে একটি সার্বভৌম সংস্থাতে পরিণত হবে। অন্য কথায় এলএফও এবং পাঞ্জাবি ভেটো তখন থেকে অকার্যকর হয়ে পড়বে।

বাঙালির মধ্যে উৎসবের আমেজ শুরু হয়ে গেছে এবং তাদের দিক থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদের কোনো কর্মকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে না। ২৪ ডিসেম্বর ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে, শেখ মুজিবকে 'আমাদের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী' হিসেবে ইয়াহিয়া খান বর্ণনা করেন এবং সংসদ ঢাকায় বসার ব্যাপারে সম্মত হন। বাঙালিরা সংসদ ভবন ও শহরকে সুসজ্জিত করতে ব্যস্ত। ঢাকার মেজাজ বিশ্রামমুখর হয়ে ওঠে। 'বাংলাদেশ'-এর শ্লোগান আর দেওয়া হয় না এবং কেউই স্বাধীনতার কথা বলে না। কিন্তু ভুট্টো অন্য ফন্দি আঁটতে ব্যস্ত, যেমন তিনি শীঘ্রই সংসদে বসার বিরোধিতা করেন। ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা দেন যে, ৩ মার্চ সংসদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু ১৫ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো ঘোষণা দেন যে, তার দল সংসদে যাবে না এবং একই সঙ্গে পাকিস্তানের রাজনীতিবিদদের ঢাকায় যাওয়ার ব্যাপারে হুমকি দেন। সংক্ষেপে বলা চলে যে, ভুট্টো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে চাপ প্রয়োগ করেন এবং জেনারেল টিক্কা খানসহ কট্টরপন্থি জেনারেলদের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করেন।

অনেক নির্বাচিত পশ্চিম পাকিস্তানি সাংসদ ভুট্টোর হুমকি উপেক্ষা করে সংবিধান রচনায় অংশ নিতে ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে ঢাকায় এসে উপস্থিত হন। গাণিতিক হিসেব অনুযায়ী দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য ঢাকার সংসদে উপস্থিত হওয়ার জন্য পূর্ব বাংলায় আসেন; কিন্তু ২৮ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো রাওয়ালপিন্ডি উড়ে গিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, পাঞ্জাবি সেনাবাহিনীর কাছে অগ্রহণযোগ্য কোনো সংবিধান তিনি অনুমোদন করলে ভবিষ্যতে তাকে আরও কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। ১ মার্চ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে, প্রেসিডেন্ট পাঞ্জাবি চাপে নতিস্বীকার করেন এবং বৃহত্তর দলের নেতা শেখ মুজিবের সঙ্গে কোনো রকম পরামর্শ না করেই ৩ মার্চ সংসদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘোষণা বাতিল করে দেন।

বাঙালি ঠিকই বুঝতে পারে পুরো ব্যাপারটাই ষড়যন্ত্র। তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বিশৃঙ্খলা দমন করতে সেনাবাহিনী তলব করা হয়। বাঙালিরা প্রেসিডেন্টের ওপরে আস্থা হারায় এবং ঢাকার রাজপথে বাংলাদেশের জন্য প্রথম চিৎকার শোনা যায়। আওয়ামী লীগের উত্তেজিত সমর্থকরা স্বাধীনতার ডাক শুরু করে। ৬ মার্চ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে, একদিকে শেখ মুজিব ৭ মার্চের গণবিক্ষোভের দিনে নাটকীয় ঘোষণার অঙ্গিকার ব্যক্ত করেন, আর অন্যদিকে ইয়াহিয়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ঘোষণা দেন ২৫ মার্চ সংসদ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে; কিন্তু ততক্ষণে জল অনেক দূর পর্যন্ত গড়িয়ে যায়। ৬ মার্চ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে শেখ মুজিব স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনের ডাক দেন এবং ভবিষ্যতে যে কোনো আলোচনায় বসতে হলে চারটি পূর্বশর্তের কথা উল্লেখ করেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পূর্বশর্ত হচ্ছে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করা।

অনেক চাপ সত্ত্বেও শেখ মুজিব ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের পক্ষে, আর ভুট্টো কাশ্মীর ইস্যুতে আপস না করে, পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবি অগ্রাহ্য করেন, কারণ এর মাধ্যমে কেন্দ্রের কার্যকর ক্ষমতা বাতিল হয়ে যাবে। পাঞ্জাব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কারণেই বাঙালিরা সংসদে বেশি আসন পায়, কিন্তু পাঞ্জাবিরা বিশ্বাস করে যে, শেখের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মতো একজন উপযুক্ত নেতা তারা পেয়েছে। কিন্তু ভারতের ওপারে বঞ্চিত পূর্বাংশে বিক্ষুব্ধ বাঙালি নেতা এবং তার আওয়ামী লীগের সৈনিকেরা স্বায়ত্তশাসনসহ 'ছয় দফা' প্রস্তাবের এক ইঞ্চিও ছেড়ে না দেওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। শেখ মুজিব সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দেন যে, যখন তিনি স্বায়ত্তশাসনের কথা বলেন তখন বিচ্ছিন্নতার কথা ভাবেননি। 'আমি এই অর্থনৈতিক শোষণ যাতে চিরতরে শেষ হয়ে যায় তার সাংবিধানিক নিশ্চয়তা চাই। আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী সংখ্যালঘিষ্ঠদের সঙ্গে কীভাবে পৃথক হয়ে যেতে পারে।' সামরিক শাসনের দ্রুত প্রত্যাহারের দাবিতে তিনি ব্যাপকভাবে বেসামরিক 'অহিংস ও অসহযোগ' আন্দোলন শুরু করেন। ফলে সারা প্রদেশের সার্বিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। বাংলাদেশের দাবি ব্যাপকভাবে উচ্চারিত হতে থাকলে প্রেসিডেন্ট ১৬ মার্চ বিকল্প প্রস্তাব নিয়ে ঢাকায় এসে হাজির হন- (এক) শেখ যদি উভয় প্রদেশের প্রাদেশিক পর্যায়ে প্রাদেশিক জাতীয় সরকার গঠন করেন এবং কেন্দ্রীয় কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন তাহলে প্রেসিডেন্ট জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে শীঘ্রই ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন; আর (দুই) প্রেসিডেন্ট স্বয়ং সরকার প্রধান থেকে কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করবেন এবং এই সরকার একটি সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকবে।

দুই নেতার প্রস্তাবগুলো শুনে জনসম্মুখে ভুট্টো ঘোষণা করেন যে, যদি কোয়ালিশন সরকারে পিপলস পার্টিকে অন্তর্ভুক্ত না করা হয় তাহলে পাকিস্তানে আগুন জ্বলবে। তারপর তিনি পাঞ্জাবে ব্যাপক সহিংস বিক্ষোভ করেন। তবে ২১ মার্চ অন্যান্য পাকিস্তানি নেতার সঙ্গে আলাপ করার জন্য ঢাকায় আসেন। প্রেসিডেন্ট যখন জানতে চান যে, কেন্দ্রীয় কোয়ালিশন সরকার গঠনে পাকিস্তানের নেতা ভুট্টোকে নিতে শেখ মুজিব প্রস্তুত আছেন কিনা; তখন শেখ মুজিব বলেন যে, গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা তিনি কাকে নেবেন বা না নেবেন এর অধিকার আছে তার। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর হুমকির কাছে নতিস্বীকার করেন এবং কোয়ালিশন সরকারের প্রস্তাব বাতিল করে দেন। তারপর শেখ এবং ইয়াহিয়া দ্বিতীয় আপস ফর্মুলায় রাজি হন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে সামরিক শাসন তুলে নিয়ে পূর্ব বাংলায় ও পাকিস্তানের পশ্চিমাংশের চারটি প্রদেশে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য অনুরোধ করেন। সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের প্রস্তাব মেনে নেন শেখ মুজিব। কিন্তু পাকিস্তানের ভাগ্য ভুট্টো ও সেনাবাহিনীর কট্টরপন্থি জেনারেলদের দ্বারা নির্ধারিত হতে থাকলে পূর্ব বাংলার রাজপথের আন্দোলন মুজিবের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।





হতাশ ও বিক্ষুব্ধ বাঙালিরা ঢাকায় বাংলাদেশের পতাকা ওড়াতে থাকে। প্রেসিডেন্টকে পূর্ব বাংলার আগুন জ্বালানোর সিদ্ধান্ত নিতে ভুট্টোই বাধ্য করেন। ভুট্টো প্রেসিডেন্টকে বোঝাতে থাকেন যে, সামরিক শাসন তুলে নিলে এবং প্রদেশগুলোকে ক্ষমতা প্রদান করলে পাকিস্তান পাঁচটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়বে। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, মুজিবুর রহমান কেন্দ্রীয় সরকারকে অচল করে দিতে চান। সামরিক শাসন তুলে নিলে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে থাকতে তার আর কোনো অবস্থান থাকবে না। অর্ধ প্রভাবিত হয়ে প্রেসিডেন্ট আবার মুজিবের কাছে উপস্থিত হন। তিনি মুজিবের কাছে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হন যে, জাতীয় সংসদ বসলে ও কেন্দ্রীয় সরকারকে এক ধরনের মূল্য দেওয়া হলে তিনি সামরিক শাসন তুলে নেবেন। শেখ মুজিব দ্রুত সামরিক শাসন তুলে নেওয়ার জন্য পুনরায় দাবি করেন। সমরনায়কদের দলে দলে যাওয়ায় মার্চের হত্যাযজ্ঞের দায়-দায়িত্ব প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ওপরই পড়ে। কারণ তিনি বাঙালিদের সঙ্গে কোনো রকম আলোচনা ছাড়াই সংসদ বাতিল করে দেন। আর ৩ মার্চে ভুট্টো সংসদ বয়কটের ঘোষণা দেওয়ায় তার ঘাড়েও হত্যাযজ্ঞের দায়-দায়িত্ব গিয়ে পড়ে।

১২ এপ্রিল ১৯৭১। 'পাকিস্তান; পশ্চিম বিশ্বের প্রতি প্রথম রাউন্ড' শীর্ষক শিরোনামে 'টাইম' ম্যাগাজিন লিখে–

There is no doubt, said a foreign diplomat in East Pakistan last week. 'that the word massacre applies to the situation.' Said another Western official. 'its a veritable bloodbath. The troops have been utterly merciless.'

As Round of Pakistans bitter civil war ended last week, the winner-predictably- was the tough West Pakistan army, which has a powerful force of 80,000 Punjabi and Pathan soldiers on duty in rebellious East Pakistan. Reports coming out of the East (via diplomats, frightened refugees and clandestine broadcasts) varied widly. Estimates of the total dead ran as high as 30,000. A fiogure of 10,000 to 15,000 is accepted by several Western governments, but no one can be sure of anything except that untold thousands perished.

Mass Graves. Opposed only by bands of Bengali peasants armed with stores and bamboo sticks, tanks rolled through Dacca, the East's capital, blowing houses to bits. At the university, soldiers slaughtered students inside the British Counci9l building "It was like Genghis Khan" said a shocked Western official who withessed the scene. Near Dacca's marketplace, Urdu-speaking government soldiers ordered Bengali-speaking townspeople to surrender, then gunned them down

when they failed to comply. Bodies lay in mass graves at the university, in the Old City and near the municipal dump.

During rebel attacks on Chittagong, Pakistani naval vessels shelled the port, setting fire to harbor installations. At Jessore, in the southwest, angry Bengalis were said to have hacked alleged government spies to death with staves and spears. Journalists at the Petrapole checkpoint of the Indian border fount five bodies and a human head near the frontier post- the remains, apparentlyu, of a group of West Pakistanis who had tried to escape. At week's end there were reports that East bengali rebels were maintaining a precarious hold on Jessore and perhaps Chittagong. But in Dacca and most other cities, the rebels had been routed.

The army's quick victory, however did not mean that the 58 million West Pakistanis could go on dominating the 78 million Bengalis of East Pakistan indefinitely. The second round may will be a different story. It could be thought out in paddies and jungles and along river banks for months or even years.

Completing the Rupture. The civil war erupted as a result of a victory that was too sweeping a mandate that was too strong. Four months ago, Pakistan's President Agha Mohammed Yahya Khan, held elections for a constituent assembly to end twelve years of martial Law. Thouth he is a Pathan from the West, Yahya was determined to be fair to the Bengalis. He assigned a majority of the assembly seats to Pakistan's more populous eastem wing, which has been separated from the West by 1,000 miles of India since the partitioning of the subcontinent in 1947.

To everyone's astorishment, Sheik Mujibur Rahman and his Awami League won 167 seats assigned to the Bengalis, a clear majority in the 313 seat assembly. "I do not want to break Pakistan," Mujib told TIME shortly before the final rupture two weeks ago. "But we Bengalis must have sutonomy and a withdrawal of troops. Mujib responded by insisting on a immediate and to martial law. Soon the break was complets. Reportedly seized in his Dacca residence at the outset of fighting and flownj to West Pakistan, Mujib will probably be tried for treason.

All Normal, West Pakistais have been told little about the fighting. All NORMAL IN EAST was a typical newspaper headline in Karachi last week. Still, they seemed solidly behind Yahya's tough stand. "We





can't have our flag defiled, our soldiers spat at, our nationality brought into disrepute," said Pakistan Government information Chief Khalid Ali, "Mujib in the end had no love of Pakistan."

Aware that many foreigners were sympathetic to the Bengalis, Yahya permited the official news agency to indulge in an orgy of paranoia. "Western press reports prove that a deep conspiracy has been hatched by the Indo-Israeli axis against the integrity of Pakistan and the Islamic basis of her ideology," said the agency.

The Indian government did in fact contribute to the Pakistanis anxiety. Although New Delhi denied that India was supplying arms to the Bengali rebels, the Indian Parliament passed a unanimous resolution denouncing the 'camage' in East Pakistan. India's enthusiasm is hardly surprising, in view of its longstanding feud with the West Pakistanis and the briek but bloody war of 1965 over Kashmir. But Western governments urged New Delhi to restrain itself so as not to provoke West Pakistan into making an impulsive response.

Hit and Run. For the time being, West Pakistan's army can probably maintain its hold on Dacca and the other cities of the East. But it can hardly hope to control 55,000 sq miles of countryside and a hostile population indefinitely. The kind of Bengali terrorism that forced the British raj to move the capital from Calcutta to Delhi in 1911 may well manifest itself again in a growing war of hit and run sabtage and arson. In modern times, the East Bengalis have been best known to foreigners as mild-mannered peasants, clerks and shopkeepers, perhaps the least martial people on the subcontinent. But in their support of an independent Bangla Desh (Bengal State) they have displayed a fighting spirit that could spell lasting turmoil for those who want Pakistan to remain united. As Mujib often asked his followers metorically 'Can bullets suppress 78 people?'

৩ মে ১৯৭১। 'ঢাকা : মৃতদের শহর' শীর্ষক শিরোনামে 'টাইম' ম্যাগাজিন লিখে–

Wighin hours after launching a tank-led offensive in Dacca and other East Pakistani cities on the night of March 25 the Pakistan army impossed a virtuly blackout on the brutal civil war in Bangla Desh (Bengal State) by expelling foreign newsmen. TIME Correspondent Dan Coggin, who was among them recently trekked back from India by Honda truck, bus and bicycle to become the first American journalist to visit Dacca since the fighting started, His report.

Dacca was always a fairly dreary city, offering slim pleasures beyond the Hoten Intercontinental and a dozen Chiness restaurants that few of its 1,500,000 people could afford. Now IP in many ways, it has become a city of the dead. A month after the army struck, unieashing tank guns and automatic weapons against largely unamed civilians in 34 hours of wanton slaughter, Dacca is still shoked and shuttered, its remaining inhabitants living in terror under the grip of army control. The exact toll will never be known but probably more than 10,000 were killed in Dacca alone.

Perhaps half the city's population has fled to outlying villages. With the lifting of army bolckades at road and river ferry exits, the exodus is resuming. Those who remain venture outdooors only for urgent food shopping. Rice prices have risen 50% since the army reportedly started buming grain silos in some areas. In any case, 14 of the city's 18 food bazaars were destroyed. The usually jammed streets ar practically empty and no civil government is functioning.

"Kill the Bastards!" On every rooftop, Pakistan's green-and-white flags hang limply in the steamy stillness. "We all know that Pakistan is finished." said one Bengali, "but we hope the flags will keep the soldiers away." As another form of insurance, portraits of Pakistan's late founder Mohammed Ali Jinnah, and even the current President Agha Mohammed Yahya Khan, were displayed prominently. But there was no mistaking the fact that the East Pakistan's viewed the army's occupation of Dacca as a setbak and not a surrender. "We will neither forgive now forget." said one Bengali. On learning that I was a sangbadik (journalist), various townspeople led me to mass graves, to a stainwell where two professor were shot to death, and to scenes of other atrocities.

The most savage killing occured in the Old City, where several sections were burned to the ground. Soldiers poured gasoline anound entire blocks, igniting them with flamethrower, then mowed down people trying to escape the cordors of fire. "They're coming out!" a Westerner heard soldiers cry. "Kill the bastards!"

One Bengali businessman told of losing his son, daughter-in-law and four grandchildren in the fire. Few apparently survived in the destroyed sections-25square blocks- of the Old city. If they escaped the flames, they ran into gunfire. To frighten survivors soldiers refused to allow the removal of decomposing bodies for three days, despite the





Moslem belief in prompt burial, preferably within 24 hours, to free the soul.

The dead of Dacca included some of East Pakistan's most prominent educators and businessmen, as well as some 500 students. Among at least seven University of Dacca professors who were exacuted without apparent, Govida Chandra Dev, 65, a gentle Hindu who believed in unity in diversity. Another victim was Jo-gesh Chandra Ghosh, 86, the invaild millionaire chemist. Ghosh, who did not believe in banks, was dragged from his bed and shot to death by soldiers who looted more than $1 million in rupees from his home.

Lotting was also the motive for the slaying of Ranada Prasad Saha, 80. One of East Pakistan's leading jute exporters and one of its few philanhropists; he had built a modern hospital offering free medical care at Mirzapur, 40 miles north of Dacca. Dev, Ghosh and Saha were all Hindus.

"Where are the maloun [cursed ones]?" rqampaging soldiers often asked as they searched for Hindus. But the Hindus were by no means the only victims. Many soldiers arriving in East Pakistan were reportedly told the absundity that it was all right to kill Bengali Moslems because they were Hidus in dishuise. "We can kill anyone for anything," a Punjabi captain told a relative, "We are accountable to no one."

Next Prime Minister. The tales of brutality are seemingly endless. A young man whose house was being searched begged the soldiers to do anything, but to leave his 17 year old sister alone; they spared him so he could watch them murder her with a bayonet. Colonel Abudi Hai, a Bengali physician attached to the East Bengal Regiment, was allowed to make a last phone call to his family. an hour later his body was delivered to his home. An old man who decided that Friday prayers were more important than the curfew was shot to death as he walked into a mosque.

About 1:30 on the morning of the attack, two armored personnel carriers arrived at the Dhanmandi home of Sheik Mujibur (Mujib) Rahman, 51, the political leader behind the campaign for Bengali independence. Mujib first look refuge beneath a bed when the Special Security Group commandos began to spary his house with samll arms fire. Then during a lull he went to the downstairs veranda, raised his

hands in surrender and shouted, "There is no need for shooting, Here I am, Take me."

Mujib was flown to West Pakistan, where he is reported held in Attock Fort near Peshawar. As an activist who had already sperit nine years and eight months in jail, he may have reasoned at the time of his arrest that his political goals would be served by the martyrdom of further imprisonment. But he obviously did not expect to face a treason charge and possible execution. Only two months earlier, after all, President Yahya had referred to him as "the next Prime Minister of Pakistan."

No Choice. In Mujib's absence, the resistance movement is sorely lacking leadership, as well as arms, ammunition and communications gear. In late March, the mukti fauj, (liberation forces) overwhelmed several company-size elemets, as at Kushtia and Pabna, but bolt-action rifiles cannot stop Sabre jets, artillery and army troops operating in battalion strengh.

Still, everywhere I visited on the journey to Dacca, I found astonishing unanimity on the Bengali desire for independence and a determination to resist the Pakistan army with whatever means available. "We will not be slaves," said one resistance officer, "so there is no choice but to fight until we win." The oncoming monsoon rains and the Islamabad government financial problems will also work in favor of Bangla Desh. As the months pass and such handships increase, Islamabad may have to face the fact that unity by force of arms is not exactly the Pakistan that Jinnah had in mind."



# ষষ্ঠ অধ্যায়

# জয় বাংলা ও বাংলাদেশ

# স্বাধীন বাংলা, স্বাধীন দেশ

জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ হবে বিশ্বের অষ্টম বৃহৎ রাষ্ট্র। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হবে ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীর সৃষ্ট ভস্ম ও ধ্বংসস্তূপের ওপর একটি নতুন দেশ গড়ে তোলা। এ একটি দুরূহ ও বিরাট দায়িত্ব। কেননা আগে থেকেই আমরা বিশ্বের দরিদ্রতম জাতিসমূহের অন্যতম। এছাড়া একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য মানুষ এক ঐতিহাসিক সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। তারা প্রাণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। তারা প্রাণ দিচ্ছে অকাতরে। সুতরাং তাদের আশা আর আমরা ব্যর্থ করতে পারি না। তাদের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করতেই হবে।

আমার বিশ্বাস, যে জাতি এত ত্যাগ স্বীকার করতে পারে, নিজে রক্ত ও প্রাণ দিতে পারে সে জাতি তার দায়িত্ব সম্পাদনে বিফল হবে না। এ জাতির অটুট ঐক্য স্থাপনের ব্যাপারে কোনো বাধা-বিপত্তি টিকতে পারে না।

আমাদের অস্তিত্ব এই রক্ষার সংগ্রামে আমরা কামনা করি বিশ্বের ছোট বড় প্রতিটি জাতির বন্ধুত্ব। আমরা কোনো শক্তি, বৱক বা সামরিক জোটভুক্ত হতে চাই না–আমরা আশা করি, শুধুমাত্র শুভেচ্ছার মনোভাব নিয়ে সবাই নিঃসংকোচে আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন। কারো তাঁবেদারে পরিণত হওয়ার জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণের দীর্ঘ সংগ্রামে আমাদের মানুষ এত রক্ত দেয়নি, এত ত্যাগ স্বীকার করছে না।

আমাদের এই জাতীয় সংগ্রামে, তাই আমরা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং বৈষয়িক ও নৈতিক সমর্থনের জন্য বিশ্বের জাতিসমূহের প্রতি আকুল আবেদন জানাচ্ছি। এ ব্যাপারে প্রতিটি দিনের বিলম্ব ডেকে আনছে সহস্র মানুষের অকালমৃত্যু এবং বাংলাদেশের মূল সম্পদের বিরাট ধ্বংস। তাই বিশ্ববাসীর প্রতি আমাদের আবেদন, আর কালবিলম্ব করবেন না। এই মুহূর্তে এগিয়ে আসুন এবং এতদ্বারা বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের চিরন্তন বন্ধুত্ব অর্জন করুন।

বিশ্ববাসীর কাছে আমরা আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করলাম। বিশ্বের আর কোনো জাতি আমাদের চেয়ে স্বীকৃতির বেশি দাবিদার হতে পারে না। কেননা আর কোনো জাতি আমাদের চেয়ে কঠোরতর সংগ্রাম করেনি, অধিকতর ত্যাগ স্বীকার করেনি।

জয় বাংলা

সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলে নবগঠিত বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিসহ মন্ত্রিপরিষদের সকল সদস্য মঞ্চ থেকে নিচে নেমে এলে দেশি-বিদেশি সাংবাদিকরা

তাদের ঘিরে ধরেন। তারপর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি দৃঢ়তার সঙ্গে সাংবাদিকদের সকল প্রশ্নের উত্তর দেন। দ্বি-প্রহরের স্বল্প পরেই নেতৃবৃন্দ কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। স্বাধীন বাংলাদেশের সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা হয়ে যায় বাংলাদেশের স্বাধীন রাজধানী 'মুজিবনগর'। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান সম্বন্ধে 'দি অবজারভার' লিখে–

BAIDYANATHTALA, 17th April. Formal proclamation of the independence of Bangla Desh was made today in a mango grove at this village a mile inside East Pakistan.

Indian and foreign newspaper reporters were invited here from Calcutta for the event and members of the secessionist government, headed by the Awami League leader, Tajuddin Ahmed, as Prime Minister were introduced to them.

About 5,000 East Bengalis had gathered under the trees for the ceremony and were guarded by riflemen of Mukti Fouj-the Liveration Army.

But reports reaching India earlier in the day suggested that the secessionist forces had just been obliged to abandon Chuadanga, the small town near the Indian frontier only recently proclaimed the provisional capital of free Bangla Desh. The Pakistan Army is said to have attacked the town after bombing raids by the Pakistan Air Force.

A Diplomatic Correspondent writes: China has been instrumental in helping Pakistan to checkmate a move by Indian and Russia to win international recognition for Bangla Desh.

Pakistan sources disclose that China was ready to recognise the Azad (free) Kashmir Government, located in Muzzaffarabad, Pakistan as the government for the whole of the disputed of Kasmir.

Faced with the rapidly escalating confrontation between India and Pakistan and anxious to avoid a new explosion in Kasmir, Delhi and Moscow apparently had second thought about recognising the provisional Bangla Desh government.

'আর দৈনিক সংবাদ' (আগরতলা) লিখে–

১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকুঞ্জে মীর জাফরদের বিশ্বাসঘাতকতায় বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্ত গিয়েছিল, আর আজ কুষ্টিয়ার এক আম্রকুঞ্জে বাংলার





স্বাধীনতার রক্ত সূর্য আকাশে তার ভাস্মরদীপ্তি ছড়িয়ে দিয়ে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিল- বাংলাদেশ স্বাধীন। রক্তের সাগর স্নান করে বাংলার এই নব প্রজন্ম স্বাধীনতার জয়টীকা কপালে পরেছে। বাংলার আকাশে এখনো কালো মেঘের ঘনঘটা। দীপ্ত নবীন সূর্যকে গ্রাস করার জন্য রাহু তার মুখ ব্যাদান করেছে।

রাহু-কবলিত বাংলায় এখন কান্নার রোল, মৃত্যুর উৎস উচ্ছ্বাস। কিন্তু বাংলার কোটি কোটি প্রাণে একই সুর। আমরা স্বাধীন। বিশ্বের দরবারে বাংলার এই প্রাণের কথা, নতুন অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করেছেন বাংলার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম।

১৭ এপ্রিল দেশ-বিদেশের সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি একথা বলেন, যে জাতি মুক্তিলাভের জন্য দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সংগ্রাম করে, পৃথিবীর এমন কোনো শক্তি নেই তাকে দাবিয়ে রাখতে পারে। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষ থেকে আমি বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিতে চাই যে, বাংলা সরকার এবং তার মুক্তিবাহিনী দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বাংলাদেশের বুক থেকে হানাদারদের হটিয়ে দিতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদীদের সমস্ত ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিয়ে আমরা জয়ী হবই–আজ কুষ্টিয়ার মুজিবনগরের আম্রকুঞ্জে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে স্বাধীন বাংলার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি জনাব নজরুল ইসলাম এই কথা বলেন।

জনাব ইসলাম স্বাধীন সার্বভৌম জনগণতান্ত্রিক বাংলা সরকারের জন্মলগ্ন আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে বলেন যে, নিয়মতান্ত্রিক পথে নির্বাচনের রায় মেনে নিয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সাড়ে সাত কোটি বাঙালির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে তারা এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি কায়েমী স্বার্থবাজরা ও তাদের তাঁবেদার সামরিক সরকার জনতার সেই ইচ্ছা স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল।

জনাব ইসলাম বলেন, 'ইয়াহিয়া ভেবেছিলেন, বাঙালি যুদ্ধ করতে জানে না। কিন্তু গত কয়েকদিন রণাঙ্গনের পরিস্থিতি ইয়াহিয়াকে বুঝিয়ে দিয়েছে বাঙালি মুক্তির জন্য, অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়তে জানে। আমরা পরাজিত হবো না জেনেই সংগ্রাম শুরু করেছি। আজকের এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম পৃথিবীর ইতিহাসে একটি নতুন জাতির জন্ম দেবে।' স্বাধীন বাংলা সরকারের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুরের সংগ্রামী জীবনের ত্যাগ-তিতিক্ষারের কথা স্মরণ করে সমাগত জনতাকে উদ্দেশ্য করে আরও বলেন, 'আপনারা অধীর হবেন না। আপনাদের সময় হলেই তিনি আপনাদের মাঝে আত্মপ্রকাশ করবেন।'

প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ 'আইনগত বৈধ' স্বাধীন বাংলা সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর কাছে আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন যে, বাংলাদেশের শতকরা নব্বই ভাগ মানুষের আনুগত্য আমরা পেয়েছি। ইয়াহিয়ার বাহিনীর বন্দুকের নল আজ উল্টো মুখো হয়ে গেছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ তার আত্মনিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। [...]

'বাংলাদেশের জনগণ বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করে তাদের বিপ্লবী কার্যক্রমের কার্যকরী প্রতিষ্ঠা করেছে। নির্বাচনে দেওয়া জনতার ম্যান্ডেট মোতাবেক আমরা নির্বাচিত গণপরিষদ সরাসরি আলোচনা করে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পবিত্র দায়িত্ব গ্রহণ করছি এবং বাংলাদেশের স্বাধীন সার্বভৌম জনগণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক বাংলা সরকার প্রতিষ্ঠার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করছি। একই সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গত ২৬ মার্চে ঘোষিত 'স্বাধীনতা' অনুমোদন করছি।'

আজ কুষ্টিয়ার আম্রকুঞ্জে স্বাধীন বাংলা সরকার প্রতিষ্ঠার এই আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপত্র পাঠ করেন জাতীয় পরিষদের সদস্য অধ্যাপক ইউসুফ আলী।

আজকের এই ভাবগম্ভীর অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা' গাওয়া হয়। অনুষ্ঠান শেষে সমবেত জনতা 'স্বাধীন বাংলার মহান নেতা শেখ মুজিব, মহান জাতীয় নেতা শেখ মুজিব, বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, হানাদারদের খতম কর ইত্যাদি ধ্বনি দেন।



বাংলাদেশের পক্ষে জনমত তৈরিতে বিশ্ব সফরে বেরিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী





১৮ এপ্রিল ১৯৭১। সকাল ১০টা। এম.এল.এ হোস্টেলের খাবারঘরে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ আবার মিলিত হন। একইদিন মেহেরপুর অঞ্চল হানাদার বাহিনীর দখলে যায়।

১৯ এপ্রিল ১৯৭১। আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন শরণার্থী কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

সুপরিকল্পিতভাবে একটি জাতিকে হত্যা করাই ছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য। যে কোনো জাতিকে স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট ধাপ অতিক্রম করে অগ্রসর হতে হয়, বাঙালি জাতির বেলায়ও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সঙ্গে সুসম্পন্ন করতেই মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়। ২৪ বছরের পাকিস্তানি শাসনামলে শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির সঠিক সময়ের প্রতিবাদ, '৭০-এর নির্বাচনে জনগণের নিয়মতান্ত্রিক ম্যান্ডেট অর্জন, ৭ মার্চ ১৯৭১-এর দিক নির্দেশনা দেওয়া, ২৬ মার্চ সময়মতো স্বাধীনতার ঘোষণা, ১০ এপ্রিল সরকার গঠন এবং ১৭ এপ্রিল শপথ গ্রহণ–সবই বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের মৌলিক ধাপ। এসব ধাপ সঠিকমতো অতিক্রম করতে সম্ভব না হলে বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রাম সত্যিকারের স্বাধীনতার যুদ্ধ হিসেবে বিশ্ববাসীর কাছে পরিগণিত হতো না। বিশেষ করে, ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মেহেরপুরের আম্রকাননে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে অধ্যাপক ইউসুফ আলী দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ না করলে মুক্তিযুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে আইনানুগ স্বীকৃতি পেত না, হয়তো বা তা অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসবাদ কিংবা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনরূপে পরিগণিত হতো, যা এদেশীয় কিছু স্বাধীনতাবিরোধীর দ্বারা আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রচারিত হতে থাকে, তাই বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননের শপথ অনুষ্ঠান (১৭ এপ্রিল ১৯৭১) বাঙালি জাতির স্বাধীনতা অর্জনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, মুক্তিসংগ্রামের উজ্জ্বল প্রতীক; তাই তো 'মুজিবনগর'-এর নামেই মুক্তিযুদ্ধ ও সরকারের সমস্ত কার্যক্রম চলতে থাকে।

# স্বাধীন বাংলা, স্বাধীন সরকার

**স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও মন্ত্রণালয়**

১. রাষ্ট্রপতি : শেখ মুজিবুর রহমান (অনুপস্থিত ও পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর হাতে বন্দি)।

২. উপ-রাষ্ট্রপতি (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি) : সৈয়দ নজরুল ইসলাম। এছাড়া উপ-রাষ্ট্রপতির দপ্তরের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা হচ্ছে–মোহাম্মদ উল্লাহ (উপদেষ্টা, এমএনএ); সৈয়দ আবদুস সুলতান (উপদেষ্টা, এমএনএ); কোরবান আলী (উপদেষ্টা, এমএনএ); কাজী লুৎফুল হক (একান্ত সচিব); আজিজুর রহমান (সহকারী সচিব); সৈয়দ এম করিম (প্রধান নিরাপত্তা অফিসার)।

৩. প্রধানমন্ত্রী : তাজউদ্দীন আহমদ। দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়গুলো হচ্ছে–(ক) প্রধানমন্ত্রী; (খ) প্রতিরক্ষা; (গ) তথ্য, বেতার এবং টেলিযোগাযোগ; (ঘ) অর্থনৈতিক বিষয়, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন; (ঙ) শিক্ষা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সরকার, স্বাস্থ্য, শ্রম ও সমাজকল্যাণ; (চ) সংস্থাপন ও প্রশাসন এবং (ছ) যেসব বিষয়ের দায়িত্ব মন্ত্রিপরিষদের অন্য কোনো সদস্যকে প্রদান করা হয়নি। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা হচ্ছেন মেজর নুরুল ইসলাম শিশু (এডিসি); ডা. ফারুক আজিজ (একান্ত সচিব) এবং আলী তারেক (তথ্য অফিসার)।

৪. পররাষ্ট্রমন্ত্রী : খন্দকার মোশতাক আহমদ। দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়-গুলো হচ্ছে (ক) পররাষ্ট্র বিষয় ও (খ) আইন ও সংসদ বিষয়।

৫. স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী : এ এইচ এম কামরুজ্জামান। দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়গুলো হচ্ছে (ক) স্বরাষ্ট্র বিষয়ক; (খ) সরবরাহ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন ও (গ) কৃষি।

৬. অর্থ ও পরিকল্পনাকারী : এম মনসুর আলী। দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়গুলো হচ্ছে (ক) অর্থ ও জাতীয় রাজস্ব; (খ) বাণিজ্য ও শিল্প ও (গ) পরিবহন।

স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রণালয়গুলো হচ্ছে–

১. **প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় :** কর্নেল এম এ জি ওসমানী (প্রধান সেনাপতি), কর্নেল এম এ রব (চিফ অব স্টাফ), গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খোন্দকার (বিমান বাহিনী প্রধান), লেফটেন্যান্ট নূর (প্রধান সেনাপতির এডিসি), আবদুস সামাদ (প্রতিরক্ষা সচিব), আকবর আলী খান (উপ-সচিব), এস এ ইমাম (উপ-সচিব), নূরুল ইসলাম চৌধুরী (সহকারী সচিব) ও এম এইচ সিদ্দিকী (সহকারী সচিব)।

২. **পররাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রণালয় :** মাহবুবুল আলম চাষী (সচিব)। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মিশনসমূহ : (ক) কলকাতা : এম হোসেন আলী (বাংলাদেশ হাইকমিশনার), আর আই চৌধুরী (প্রথম সচিব), আনোয়ারুল চৌধুরী (তৃতীয় সচিব), কাজী নজরুল ইসলাম (তৃতীয় সচিব), এম মোকছুদ আলী (সহকারী প্রেস এ্যাটাচী), জায়েদুর রহমান (অফিসার)। (খ) নয়াদিল্লি : হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী (কাউন্সিলর), কে এম





শাহাবুদ্দিন (দ্বিতীয় সচিব), আমজাদুল হক (সহকারী প্রেস এ্যাটাচী)। (গ) হংকং : মহিউদ্দিন আহমদ (কমিশনার)। (ঘ) ফিলিপাইন : কে কে পন্নী (রাষ্ট্রদূত)। (ঙ) নিউইয়র্ক : এ এইচ মাহমুদ আলী (উপ-কনসাল), এম এ করিম (উপ-স্থায়ী প্রতিনিধি, জাতিসংঘ)। (চ) ওয়াশিংটন : এনায়েত করিম (মিনিস্টার), এস এ এম এস কিবরিয়া (রাজনৈতিক কাউন্সিলর), আবুল মাল আব্দুল মুহিত (অর্থনৈতিক কাউন্সিলর), এ আর মতিন উদ্দিন (শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক কাউন্সিলর), সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী (তৃতীয় সচিব), এম আর চৌধুরী (এ্যাকাউন্টস অফিসার), শেখ রুস্তম আলী (সহকারী অর্থ অফিসার), এ এম এস আলম (সহকারী প্রশাসনিক অফিসার)। (ছ) যুক্তরাজ্য : মহিউদ্দিন আহমদ (দ্বিতীয় সচিব), এ লুৎফুল মতিন (পরিচালক, অর্থ), রেজাউল করিম (কাউন্সিলর), আবদুল রউফ (ডেপুটি ডাইরেক্টর), ফজলুল হক চৌধুরী (লেবার এ্যাটাচী)। (জ) সুইজারল্যান্ড : ওয়ালিউর রহমান (দ্বিতীয় সচিব)। (ঝ) ইরাক : এ এফ এম আবুল ফাতাহ (রাষ্ট্রদূত)। (ঞ) জাপান : এ রহিম (তৃতীয় সচিব), এম মাসুদ (প্রেস এ্যাটাচি)। (ট) নেপাল : এম এ জায়গীরদার (তৃতীয় সচিব)।

৩. **অর্থ, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় :** সাফাত হোসেন (মন্ত্রীর একান্ত সচিব), খোন্দকার আসাদুজ্জামান (সচিব, অর্থ), মাখন চন্দ্র মাঝি (সহকারী সচিব, অর্থ), শামসুদ্দিন হায়দার (সহকারী সচিব, অর্থ), ক্ষিতিশ চন্দ্র কুণ্ডু (সহকারী সচিব, অর্থ), এ কে এম হেফারত উল্লাহ (সহকারী সচিব, অর্থ), অলি করি (সহকারী সচিব, অর্থ), মো. ইদ্রিস আলী (সহকারী সচিব, শিল্প ও বাণিজ্য), জগন্নাথ দে (সহকারী সচিব, শিল্প ও বাণিজ্য) ও এ কে আনোয়ার হক (সহকারী সচিব, শিল্প ও বাণিজ্য)।

৪. **মন্ত্রিপরিষদ ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয় :** রুহুল কুদ্দুস (প্রধান সচিব), নূরুল কাদের খান (সংস্থাপন সচিব), এইচ টি ইমাম (মন্ত্রিপরিষদ সচিব), কামাল উদ্দিন আহম্মদ (উপসচিব), তৌফিক এলাহী চৌধুরী (উপ-সচিব), দীপক কুমার চৌধুরী (উপ-সচিব), ওলিউল ইসলাম (উপ-সচিব), বজলুর রহমান (সহকারী সচিব), নরেশ চন্দ্র রায় (সহকারী সচিব), মতিউর রহমান (সহকারী সচিব), মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লা (সহকারী সচিব), কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী (সহকারী সচিব) ও শাহ মতিউর রহমান (সহকারী সচিব)।

৫. **শিক্ষা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সরকার, স্বাস্থ্য, শ্রম ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় :** আবদুল মান্নান (এমএনএ ইনচার্জ), আবদুস সামাদ (প্রথম সচিব, ৩ সেপ্টেম্বর থেকে ১৩ অক্টোবর), আনোয়ারুল হক খান (দ্বিতীয় সচিব, ১৪ অক্টোবর থেকে ১৬ ডিসেম্বর), কামরুল হাসান (ডাইরেক্টর আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন), আব্দুল জব্বার খান (ডাইরেক্টর অফ ফিল্ম), এম আর আখতার মুকুল (ডাইরেক্টর অব প্রেস অ্যান্ড পাবলিসিটি)।

৭. **স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় :** এম এ খালেক (সচিব), খসরুজ্জামান চৌধুরী (উপ-সচিব), সৈয়দ মাহবুবুর রশিদ (সহকারী সচিব), জ্ঞানরঞ্জন সাহা (সহকারী সচিব), গোলাম আকবর (সহকারী সচিব), এম এ গাফফার (স্টাফ অফিসার),

করীফুল হক (জেলা আনসার অফিসার), রশদি বখত মজুমদার (জেলা আনসার অফিসার), সৈয়দ হাবিবুল বারী (মহকুমা আনসার অফিসার), শামসুর রহমান (আনসার অফিসার), আকরাম হোসেন (আনসার অফিসার), তবিবুর রহমান (আনসার অফিসার), এ কে হুমায়ুন (আনসার অফিসার), কে জি কাদের (আনসার অফিসার), আবুল বাশার (আনসার অফিসার), আবদুল মান্নান (আনসার অফিসার), আলী আকবর (আনসার অফিসার) ও মো. জহির উদ্দিন (আনসার অফিসার)।

৮. **কৃষি মন্ত্রণালয় :** নূরউদ্দিন আহমদ (সচিব), শহিদুল ইসলাম (উপ-সচিব), এন এম সরকার (বিভাগীয় বন কর্মকর্তা) ও মোজাম্মেল হোসেন (বিভাগীয় বন কর্মকর্তা)।

মন্ত্রণালয়ের বাইরে আরও কিছু সংস্থা থাকে যেসব সরাসরি মন্ত্রিপরিষদের কর্তৃত্বাধীনে কাজ করে। যেমন–

১. পরিকল্পনা কমিশন : ড. মুজাফফর আহমদ চৌধুরী (চেয়ারম্যান), স্বদেশ বসু (সদস্য), ড. মোশাররফ হোসেন (সদস্য), ড. আনিসুজ্জামান (সদস্য), ড. খান সরওয়ার মোর্শেদ (সদস্য), এ এ মাসুদ মিঞা (ডেপুটি চীফ), কে এস ডি সরমান (ডেপুটি চীফ), এ এস এম হোসেন (ডেপুটি চীফ), এম খালেকুজ্জান (ডেপুটি চীফ), এ কে রায় (ডেপুটি চীফ), ড. ওয়াজিউর রহমান (ডেপুটি চীফ), ড. এম নুরুল ইসলাম (ডেপুটি চীফ), ডি কে কলিননো (রিসার্চ অফিসার), তপন কুমার বোস (রিস্যার্চ অফিসার), এম এ নওজেশ আলী (রিসার্চ অফিসার) ও ডি কে নাথ (রিসার্স অফিসার)।

২. শিল্প ও বাণিজ্য বোর্ড।

৩. নিয়ন্ত্রণ বোর্ড, যুব ও অভ্যর্থনা শিবির।

৪. ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিটি।

৫. শরণার্থী কল্যাণ বোর্ড, ইত্যাদি।



## স্বাধীন বাংলা, স্বাধীন কার্যক্রম

মুক্তিযুদ্ধকে গতিময় রাখতে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার বিভিন্নমুখী কার্যক্রম ও পরিকল্পনা গ্রহণ করে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়–

**১. আঞ্চলিক প্রশাসনিক পরিষদ**

সীমান্ত শিবিরগুলোতে শরণার্থীদের মনোবল অক্ষুণ্ন রাখার ও দেশের অভ্যন্তরে যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয় সাধনে কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশকে রাজনৈতিকভাবে ৭টি 'জোন'-এ ভাগ করে আঞ্চলিক প্রশাসনিক পরিষদ গঠন করা হয়, যা মূলত ১৪ মে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ থেকে কার্যকরি করা হয়। এসব আঞ্চলিক প্রশাসনিক পরিষদের অধীনে আবার সাব অঞ্চলও সৃষ্টি করা হয়। সংশ্লিষ্ট এলাকার জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের আঞ্চলিক প্রশাসনিক পরিষদের সদস্য করে 'জোন প্রধান' হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। সরকার থেকে 'জোন প্রধান'-এর অধীনে একজন করে সচিব নিযুক্ত করে 'জোন প্রশাসক' হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। একই সঙ্গে প্রতিটি জোনে সরকার থেকে ৭ জন করে কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়, বিভাগীয় কাজ সম্পাদন করার জন্য; তাদের পদমর্যাদা দেওয়া হয়- (এক) আঞ্চলিক স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, (দুই) শিক্ষা কর্মকর্তা, (তিন) ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, (চার) প্রকৌশল কর্মকর্তা, (পাঁচ) পুলিশ কর্মকর্তা, (ছয়) তথ্য বিভাগীয় কর্মকর্তা, (সাত) হিসাব বিভাগীয় কর্মকর্তা। আঞ্চলিক প্রশাসনিক পরিষদের নিয়ন্ত্রণে থাকে প্রধানত রিলিফ ক্যাম্প, যুব শিবির, সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা সংক্রান্ত কর্মকাজ। আবার প্রতিটি আঞ্চলিক জোনে ৫টি করে উপ-পরিষদও গঠন করা হয়- (এক) অর্থ উপ-পরিষদ, (দুই) ত্রাণ উপ-পরিষদ, (তিন) স্বাস্থ্য উপ-পরিষদ, (চার) প্রচার উপ-পরিষদ, (পাঁচ) শিক্ষা উপ-পরিষদ। প্রয়োজনে আরও উপ-পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা রাখা হয়। প্রতিটি উপ-পরিষদ গঠনের বিধান রাখা হয় যে, আঞ্চলিক পরিষদ থেকে ন্যূনতম তিনজন ও ঊর্ধ্বে সাতজন সদস্য নিয়ে গঠন করতে হবে। প্রতিটি জোনে সংসদ সদস্যদের নিয়ে একটি আঞ্চলিক উপদেষ্টা কমিটিও গঠন করা হয়।

নিম্নলিখিত প্রশাসনিক পরিষদগুলো হচ্ছে–

১. পশ্চিম জোন : (ক) দিনাজপুর ও বগুড়া। প্রধান কার্যালয়-বালুরঘাট। জোন প্রধান-আজিজুর রহমান। জোন প্রশাসক- এম এ কাশেম। (খ) রাজশাহী। প্রধান কার্যালয়-মালদহ। জোন প্রধান-আশরাফুল ইসলাম। জোন-প্রশাসক-জহুরুল ইসলাম ভুঞা।

২. দক্ষিণ-পশ্চিম জোন : (ক) পাবনা ও কুষ্টিয়া। প্রধান কার্যালয়-কৃষ্ণনগর। জোন-প্রধান-আবদুর রউফ চৌধুরী। জোন-প্রশাসক- মো. শামসুল হক। (খ) যশোর ও ফরিদপুর। প্রধান কার্যালয়-বনগাঁও। জোন-প্রধান-ফণিভূষণ মজুমদার। জোন-প্রশাসক-বি.বি. বিশ্বাস।

৩. দক্ষিণ-পূর্ব জোন : (ক) চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ফেনী। প্রধান কার্যালয়-সাবরোম। জোন-প্রধান-নূরুল ইসলাম চৌধুরী। জোন-প্রশাসক-ড. সৈয়দ

আবদুস সামাদ। (খ) ঢাকা, কুমিল্লা ও নোয়াখালী। প্রধান কার্যালয়-আগরতলা। জোন-প্রধান-রুহুল আহমদ চৌধুরী। জোন-প্রশাসক-কাজী রকিব উদ্দিন আহমদ।

৪. পূর্ব জোন : হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার : প্রধান কার্যালয়-ধর্মনগর। জোন-প্রধান-এম এ রব। জোন-প্রশাসক-ডা. কে এ হাসান।

৫. উত্তর-পূর্ব জোন : (ক) সিলেট সদর ও সুনামগঞ্জ। প্রধান কার্যালয়-ডাউকি। জোন-প্রধান-দেওয়ান ফরিদ গাজী। জোন-প্রশাসক-এস এইচ চৌধুরী। (খ) ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল। প্রধান কার্যালয়-তোরা। জোন-প্রধান-শামসুর রহমান খান ও জোন-প্রশাসক-লুৎফুর রহমান।

৬. উত্তর জোন : রংপুর। প্রধান কার্যালয়-কুচবিহার। জোন-প্রধান-মতিউর রহমান। জোন-প্রশাসক-ফয়েজ উদ্দিন আহমদ।

৭. দক্ষিণ জোন : খুলনা, বরিশাল ও পটুয়াখালী। প্রধান কার্যালয়-বারাসাত। জোন-প্রধান-আবদুর রব। জোন-প্রশাসক–এ মোমেন।

**২. প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়**

মুক্তিযুদ্ধকে সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে কর্নেল এম এ জি ওসমানীকে সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান (commander-in-chief), লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবদুর রবকে চিফ-অফ-স্টাফ এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকারকে ডেপুটি চিফ-অব-স্টাফরূপে নিযুক্ত করে সমগ্র বাংলাদেশকে একাধিক সেক্টরে বিভক্ত করা হয়।

১০ এপ্রিল ১৯৭১। ১ম-৪র্থ ও ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধীনে যশোর, সিলেট, রংপুর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম অঞ্চলে সেক্টর বাহিনী গড়ে তোলা হয়। ইপিআর, পুলিশ, আনসার, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর সদস্যদের জন্য ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধীনে সামরিক অস্ত্র ব্যবহারের জন্য স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করাও হয়। পাশাপাশি ছাত্র, শ্রমিক ও যুবকদের সামরিক অস্ত্র ব্যবহারের জন্য স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধীনে নিয়মিত সমরাভিযান চালিয়ে যাওয়া হয়।

১৪ এপ্রিল ১৯৭১। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার সমস্ত বাংলাদেশকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে–

**পূর্বাঞ্চল :**

১. সিলেট ও কুমিল্লা অঞ্চলে বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর খালেদ মোশাররফকে সমর পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। মেজর খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী অসীম সাহস ও কৃতিত্বের সঙ্গে শত্রুর সঙ্গে মোকাবেলা করে এবং শত্রু সেনাদের সিলেট ও কুমিল্লার ক্যান্টনমেন্টের ছাউনিতে ফিরে যেতে বাধ্য করে। মুক্তিবাহিনী শত্রুকে নিঃশেষ করে দেওয়ার সংকল্প গ্রহণ করেছে।





২. চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী অঞ্চলের সমর পরিচালনার ভার পড়ে মেজর জিয়াউর রহমানের ওপর। নৌ, স্থল ও বিমান বাহিনীর আক্রমণের মুখে চট্টগ্রাম শহরে যে প্রতিরোধব্যূহ গড়ে ওঠে এবং মুক্তিবাহিনী যে সাহসিকতার সঙ্গে শত্রুর মোকাবেলা করে তা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এই প্রতিরোধ স্ট্যালিনগ্রাডের সমস্থান পাওয়ার যোগ্য। এই সাহসিকতাপূর্ণ প্রতিরোধের জন্য চট্টগ্রাম শত্রুর কবলমুক্ত থাকে। চট্টগ্রাম শহরের কিছু অংশ ছাড়া চট্টগ্রাম ও সম্পূর্ণ নোয়াখালী জেলাকে 'মুক্ত এলাকা' বলে ঘোষণা করা হয়।

৩. ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল অঞ্চলের সমর পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় মেজর শফিউল্লাহর ওপর। ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল এলাকা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে মুক্তিবাহিনী ঢাকার দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রস্তুতি নেয়।

**দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল :**

১. ইপিআর-এর বীর সেনানী মেজর ওসমানের ওপর কুষ্টিয়া ও যশোহর জেলার সমর পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। কুষ্টিয়ার ঐতিহাসিক বিজয়ের পর মুক্তিবাহিনী সমস্ত এলাকা থেকে শত্রুবাহিনীকে বিতাড়িত করে এবং শত্রুসেনা যশোহর ক্যান্টনমেন্টে ও খুলনা শহরের একাংশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

২. মেজর জলিলের ওপর ভার দেওয়া হয়েছে ফরিদপুর-খুলনা-বরিশাল-পটুয়াখালী।

**উত্তরবঙ্গ :**

মুক্তিবাহিনী মেজর আহমদের নেতৃত্বে রাজশাহীকে শত্রুর কবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে। মেজর নজরুল হক সৈয়দপুরে ও মেজর নোয়াজেশ রংপুরে শত্রুবাহিনীকে সম্পূর্ণ অবরোধ করে বিব্রত করে তুলেন। দিনাজপুর, পাবনা ও বগুড়া জেলাকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা হয়। রংপুর ও সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট এলাকা ছাড়া জেলার বাকি অংশগুলো মুক্ত থাকে।

জুলাই ১৯৭১। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব আঞ্চলিক প্রশাসকের ওপর অর্পণ করে নানাবিধ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠন করা হয়। ১-৪, ৮ ও ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের জনবল বৃদ্ধি আর ৯ ও ১১ দুটো নতুন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ১ম মুজিব ব্যাটারি, ১ম ফিল্ড রেজিমেন্ট, তিনটি ব্রিগেড ('জেড' ফোর্স, 'এস' ফোর্স ও 'কে' ফোর্স) এবং ৬টি সেক্টরকে ১১টি সেক্টরে বর্ধিত করতে পাঁচটি নতুন সেক্টর (৩, ৫, ৭, ১০ ও ১১) গঠন করে। ১১টি সেক্টরে বাংলাদেশকে বিভক্ত করে এগারোটি প্রধান কার্যালয় স্থাপনসহ এগারোজন সেক্টর কমান্ডারকে নিয়োগ দেওয়া হয়।

**সেক্টর নং-১ (এপ্রিল-ডিসেম্বর) :** চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলার মুহুরী নদীর পূর্ব অঞ্চল পর্যন্ত। প্রধান কার্যালয়-হরিণা/সাবরুস, আগরতলা। অধিনায়ক-মেজর

জিয়াউর রহমান (এপ্রিল-মে) ও মেজর মো. রফিকুল ইসলাম (জুন-ডিসেম্বর)। পাঁচটি উপভাগ : ঋষিমুখ (ক্যাপ্টেন শামসুল ইসলাম), শ্রীনগর (ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান, পরবর্তীতে ক্যাপ্টেন মাহফিজুর রহমান), মনুঘাট (ক্যাপ্টেন মাহফিজুর রহমান), তাবালছড়ি (সুবেদার আলী হোসেন) ও দিমাগিরি (অজানা)। সদস্য সংখ্যা ২১,০০০ (নিয়মিত বাহিনী) ও ২০,০০০ (অনিয়মিত বাহিনী)।

**সেক্টর নং-২ (এপ্রিল-ডিসেম্বর ১৯৭৮১) :** নোয়াখালী ও কুমিল্লা জেলা (কুমিল্লা) জেলার আখাউড়া-ভৈরব রেললাইন পর্যন্ত) এবং ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ। প্রধান কার্যালয়-আগরতলা সদর, আগরতলা। অধিনায়ক-মেজর খালেদ মোশাররফ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) ও এ টি এম হায়দার (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর)। ছয়টি উপভাগ : গৌগাসাগর, আখাউড়া ও কসবা (মাহবুব, পরবর্তীতে লেফটেন্যান্ট ফারুক ও লেফটেন্যান্ট হুমায়ুন কবির), মন্দাভাব (ক্যাপ্টেন গাফফার), শলদা নদী (আবদুস সালেক চৌধুরী), মতিনগর (লে. দিদারুল আলম), নির্ভয়পুর (ক্যাপ্টেন আকবর, পরবর্তীতে লেফটেন্যান্ট মাহবুব) ও রাজনগর (ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম ও লেফটেন্যান্ট শহিদ)। সদস্য সংখ্যা ৪,০০০ (নিয়মিত বাহিনী) ও ৩৫,০০০ (অনিয়মিত বাহিনী)।

**সেক্টর নং-৩ (জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৭১) :** ঢাকা, হবিগঞ্জ (মহকুমা), কিশোরগঞ্জ (মহকুমা) ও কুমিল্লা জেলা (আখাউড়া-ভৈরব রেললাইন থেকে পূর্বদিক)। প্রধান কার্যালয়-ধর্মনগর, আগরতলা। অধিনায়ক-মেজর কে এম শফিউল্লাহ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) ও মেজর এ এন এম নুরুজ্জামান (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর)। দশটি উপভাগ : আশ্রমবাড়ি (ক্যাপ্টেন আজিজ, পরবর্তীতে ক্যাপ্টেন এজাজ), বাঘাইবাড়ি (ক্যাপ্টেন আজিজ, পরবর্তীতে ক্যাপ্টেন এজাজ), হাতকাটা (ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান), সীমলা (ক্যাপ্টেন মতিন), পঞ্চবাটি (ক্যাপ্টেন নাসিম), মনতলা (ক্যাপ্টেন ম স এ ভুইয়া), বিজয়নগর (ক্যাপ্টেন ম স এ ভুইয়া), কালাছড়া (লে. মুজমদার), কালকালিয়া (লে. গোলাম হেলাল মোর্শেদ) ও বমুতিয়া (লে. সায়েদ)। সদস্য সংখ্যা ১,১০০ (নিয়মিত বাহিনী) ও ৩০,০০০ (অনিয়তি বাহিনী)।

**সেক্টর নং-৪ (এপ্রিল-ডিসেম্বর ১৯৭১) :** সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল (হবিগঞ্জের খোয়াই নদী ও শ্যায়েস্তাগঞ্জ রেল লাইনের পূর্ব ও উত্তর) ও সুনামগঞ্জ (মহকুমা)। প্রধান কার্যালয়-করিমগঞ্জ, আসাম (পরবর্তীতে মাসিমপুর)। অধিনায়ক-মেজর সি. আর দত্ত (পরবর্তীতে ক্যাপ্টেন এ রব)। ছয়টি উপভাগ : জালালপুর (মাসুদুর রব সাদী), বড়পুঞ্জী (ক্যাপ্টেন এ রব), অম্লাসিদ (লে. জাহির), কুকিতল (ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট কাদের, পরবর্তীতে ক্যাপ্টেন শরিফুল হক), কৌলাস শহর (লে. ওয়াকিউজ্জামান) ও কামালপুর (ক্যাপ্টেন ইনাম)। সদস্য সংখ্যা ৪,০০০ (নিয়মিত বাহিনী) ও ৯,০০০ (অনিয়মিত বাহিনী)।

**সেক্টর নং-৫ (জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৭১) :** সিলেট জেলার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল। প্রধান কার্যালয়-তুরা, মেঘালয়। অধিনায়ক-মেজর মীর শওকত আলী। ছয়টি উপভাগ : মুক্তাপুর (সুবেদার নাজির হোসেন), ডাউকি (সুবেদার বি আর চৌধুরী), শীলা (ক্যাপ্টেন হেলাল), বালাগঞ্জ (লেফটেন্যান্ট তাহেরুদ্দিন আখঞ্জী), বালাত





(সুবেদার গণি, পরবর্তীতে ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন ও মুক্তিযোদ্ধা এনামুল হক চৌধুরী ও বড়ছড়া (ক্যাপ্টেন মুসলিম উদ্দিন)। সদস্য সংখ্যা ৮০০ (নিয়মিত বাহিনী) ও ৭,০০০ (অনিয়মিত বাহিনী)।

**সেক্টর নং-৬ (এপ্রিল-ডিসেম্বর ১৯৭১) :** রংপুর ও ঠাকুরগাঁও (মহকুমা)। প্রধান কার্যালয়-বুড়িমারী, পশ্চিম দিনাজপুর। অধিনায়ক-উইং কমান্ডার এম কে বাশার। পাঁচটি উপভাগ : ভাজনপুর (ক্যাপ্টেন নজরুল, পরবর্তীতে স্কোয়াড্রন লিডার সদরুদ্দিন ও ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার), পাটগ্রাম (ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান), সাহেবগঞ্জ (ক্যাপ্টেন নয়াজেশ উদ্দিন), মহলহাট (ক্যাপ্টেন দেলওয়ার) ও চিলহাটি (ৎফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ইকবাল)। সদস্য সংখ্যা ১,২০০ (নিয়মিত বাহিনী) ও ৬,০০০ (অনিয়মিত বাহিনী)।

**সেক্টর নং-৭ (জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৭১) :** দিনাজপুর জেলার দক্ষিণাঞ্চল, বগুড়া, রাজশাহী ও পাবনা জেলা। প্রধান কার্যালয়-কালিগঞ্জ, দিনাজপুর। অধিনায়ক-মেজর কাজী নুরুজ্জামান (পরবর্তীতে সুবেদার এ রব ও কাজী নুরুজ্জামান)। আটটি উপভাগ : মলন (ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর), তপন (মেজর নজমুল হক), মেহেদীপুর (সুবেদার ইলিয়াস, পরবর্তীতে ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর), হামজাপুর (ক্যাপ্টেন ইদ্রিস), অঞ্জিনাবাদ (একজন মুক্তিযোদ্ধা), শেখপাড়া (ক্যাপ্টেন রশিদ), থকরাবাড়ি (সুবেদার মৌজ্জাম) ও লালগুলা (ক্যাপ্টেন গিয়াসুদ্দিন চৌধুরী)। সদস্য সংখ্যা ৪,০০০ (নিয়মিত বাহিনী) ও ৮,০০০ (অনিয়মিত বাহিনী)।

**সেক্টর নং-৮ (আগস্ট-ডিসেম্বর ১৯৭১) :** সমগ্র কুষ্টিয়া, যশোর ও ফরিদপুরের অধিকাংশ এবং দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়ক থেকে খুলনার উত্তরাংশ। প্রধান কার্যালয়-মালদহ সদর, মালদহ। অধিনায়ক-মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (এপ্রিল-আগস্ট) ও মেজর এম এ মঞ্জুর (আগস্ট-ডিসেম্বর)। সাতটি উপভাগ : বয়রা (ক্যাপ্টেন খন্দকার নজমুল হুদা), হাকিমপুর (ক্যাপ্টেন শাফিক উল্লা), ভোমরা (ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন), পরবর্তীতে ক্যাপ্টেন সাহাবুদ্দিন), লালবাজার (ক্যাপ্টেন এ আর আজম চৌধুরী), বনপুর (ক্যাপ্টেন মোস্তাফিজুর রহমান), বেনাপোল (ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম, পরবর্তীতে ক্যাপ্টেন তৌফিক-এ-এলাহী চৌধুরী) ও শিকারপুর (ক্যাপ্টেন তৌফিক-এ-এলাহী চৌধুরী, পরবর্তীতে লেফটেন্যান্ট জাহাঙ্গীর)। সদস্য সংখ্যা ২,০০০ (নিয়মিত বাহিনী) ও ১২,০০০ (অনিয়মিত বাহিনী)।

**সেক্টর নং-৯ (জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৭১) :** দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়কের দক্ষিণাঞ্চল, সমগ্র বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা। প্রধান কার্যালয়-কৃষ্ণনগর, নদিয়া। অধিনায়ক-মেজর এম এ জলিল (ডিসেম্বরের প্রথমার্ধ), মেজর জয়নুল আবেদীন (ডিসেম্বরের শেষাংশ) ও মেজর এম এ মঞ্জুর (অতিরিক্ত দায়িত্ব, ডিসেম্বরের শেষাংশ)। তিনটি উপভাগ : তাকি, হিঙ্গালগঞ্জ ও শমশের নগর। সদস্য সংখ্যা ৮০০ (নিয়মিত বাহিনী) ও ১০,০০০ (অনিয়মিত বাহিনী)।

**সেক্টর নং-১০ (জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৭১) :** চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরসহ সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল ও অভ্যন্তরীণ নৌপথ। প্রধান কার্যালয়-বনগাঁও, চব্বিশ পরগনা। অধিনায়ক-আটজন

মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিংপাপ্ত নৌ কমান্ডার। তারা হচ্ছেন গাজী মোহাম্মদ রহমতুল্লা, সৈয়দ মুশাররফ হোসেন, আমিন উল্লাহ শেখ, আসান উল্লাহ, এ ডাব্লিউ চৌধুরী, বদিউল আলম, এ র মিয়া ও আবেদুর রহমান। তাদের যৌথভাবে সেক্টর কমান্ডারের নির্দেশ মোতাবেক কাজ করা।

**সেক্টর নং-১১ (আগস্ট-ডিসেম্বর ১৯৭১) :** বরিশাল, পটুয়াখালী ও খুলনা অঞ্চল। প্রধান কার্যালয়-বারাসাত, চব্বিশ পরগনা। অধিনায়ক-মেজর আবু তাহের (আগস্ট-নভেম্বর) ও স্কোয়াড্রন লিডার এম হামিদুল্লাহ (নভেম্বর-ডিসেম্বর)। আটটি উপভাগ : মহেন্দ্রগঞ্জ (লে. মান্নান), পোড়াকাশিয়া (লে. হাশেম), ধালু (লে. তাহের, পরবর্তীতে লেফটেন্যান্ট কামাল), রঙ্গরা (মতিউর রহমান), শিববাড়ি (ইপিআর অফিসার), বগমারা (ইপিআর অফিসার) ও মহেশখোলা (ইপিআর অফিসার)। সদস্য সংখ্যা ১৮,৬০০ (নিয়মিত বাহিনী) ও ১,১২,০০০ (অনিয়মিত বাহিনী)।

স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার অধিনায়কদের নামের অদ্যাংশ দিয়ে তিনটি ব্রিগেড আকারের ফোর্স গঠনও করা হয়–

**'জেড ফোর্স' (৭ জুলাই ১৯৭১) :** প্রধান কার্যালয়-মানকার চর, তেলদহ। অধিনায়ক-মেজর জিয়াউর রহমান (জুলাই-ডিসেম্বর)। এই ফোর্সের অংশ : ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (অধিনায়ক-মেজর মইনুল হোসেন চৌধুরী ও ক্যাপ্টেন বজলুল গণি পাটোয়ারী), ৩য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (অধিনায়ক- মেজর শাফায়াত জামিল, উপ-অধিনায়ক-ক্যাপ্টেন মহসিন) ও ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (অধিনায়ক-মেজর এ টি এম হায়দার, উপ-অধিনায়ক ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান চৌধুরী)।

**'কে-ফোর্স (৭ অক্টোবর ১৯৭১) :** প্রধান কার্যালয়-মেঘালয়। অধিনায়ক-মেজর খালেদ মোশাররফ (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর), তবে মেজর খালেদ মোশাররফ আহত হলে মেজর আবু সালেক চৌধুরী অস্থায়ী অধিনায়ক হন। এই ফোর্সের অংশ : ১ম মুজিব ব্যাটারী (আর্টিলারি), ১ম ফিল্ড রেজিমেন্ট (আর্টিলারি), ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (অধিনায়ক-ক্যাপ্টেন আবদুল গাফফার), ৯ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (অধিনায়ক-মেজর আইন উদ্দিন), ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (অধিনায়ক-মেজর মালেক)।

**'এস-ফোর্স' (১ অক্টোবর ১৯৭১) :** প্রধান কার্যালয়-মনতলা, ফটিকছড়ি। অধিনায়ক-মেজর কে এম শফিউল্লাহ (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর)। এই ফোর্সের অংশ : ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (অধিনায়ক-মেজর মইনুল হোসেন চৌধুরী) ও ১১তম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (অধিনায়ক-মেজর এ এস এম নাসিম)।

### ৩. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রধান কাজ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়–বহির্বিশ্বে জনমত গড়ে তোলা এবং বন্ধু রাষ্ট্রদের থেকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা চালানো। যদিও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নামে আলাদা একটি মন্ত্রণালয় ও তার কর্মী বরাদ্দ করা হয় তবুও পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রায় সব কাজকর্ম প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।





### ৪. অর্থ, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ব্যয়, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত সম্পদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা সব বন্ধুপ্রতিম দেশসমূহ থেকে প্রাপ্ত অর্থ সাহায্যের সুষ্ঠু ব্যবহার সুশৃঙ্খলার সঙ্গে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে গঠিত হয় অর্থ, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের কাজ শুরু হওয়ার পর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে এবং এই ব্যবস্থা সরকারি চালিকাশক্তি হিসেবে পরিগণিত হয়। সেগুলো হচ্ছে–

১. বাজেট প্রণয়ন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব।
২. বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ও অন্যান্য উৎস থেকে সংগৃহীত সম্পদের হিসাব প্রস্তুত।
৩. বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গকে অর্থ প্রদানের দায়িত্ব পালন ও বিধিমালা প্রণয়ন।
৪. আর্থিক শৃঙ্খলা প্রবর্তন।
৫. রাজস্ব ও শুল্ক আদায়।
৬. আর্থিক অনিয়ম তদন্তের জন্য কমিটি গঠন।

বাংলাদেশ সরকারের অর্থ সংস্থানের জন্য বাংলাদেশ ফান্ড নামে একটি তহবিল খোলা হয়। এই ফান্ডে ভারত, পৃথিবীর অন্যান্য দেশ এবং বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত অর্থ জমা হয়। সরকার স্বাধীন বাংলাদেশের যে স্মারক ডাকটিকিট বের করে তার বিক্রয়লব্ধ অর্থও সরকারি কোষাগারে জমা হয়। 'স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল' ভারতে বিভিন্ন শহরে প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচের টিকিট থেকে প্রাপ্ত পাঁচ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করে।

### ৫. তথ্য, বেতার এবং টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়

তথ্য, বেতার এবং টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমও সাফল্যে বহুমুখী। একদিকে 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'-এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষদের অবিরাম উৎসাহ জোগানো; অন্যদিকে পত্র-পত্রিকা, ছোট ছোট পুস্তিকা, লিফলেট ইত্যাদি দ্বারা রণাঙ্গনের বিবরণ, মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসিকতা, শরণার্থী শিবিরের অবস্থা ও মানুষের মানবেতর জীবন-যাপন, বাংলাদেশের স্বীকৃতির জন্য বিশ্ববাসীর কাছে আহ্বান, পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার খবর ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়মিত প্রকাশ এবং পরিকল্পনা করাই এই মন্ত্রণালয়ের মূল কাজ।

### ৬. স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়

পাকিস্তানি বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ ও লুটপাটের কারণে সাধারণ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়ে এবং ভারত সীমান্তে আশ্রয় নিতে থাকে। এই সময় ত্রাণ সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দেয়। সীমান্ত

অঞ্চলে শরণার্থী শিবিরে এবং দেশের অভ্যন্তরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কারণে এই মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা বৃদ্ধি পায়। এসব কারণে পুলিশ প্রশাসন গঠন ও একে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের কাজকর্ম সম্পন্ন করা হয়। একজন রিলিফ কমিশনারের অধীনে এই বিভাগ সংগঠিত করা হয়। তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কাজ করেন।

### ৭. শিক্ষা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সরকার, স্বাস্থ্য, শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

মুক্তিযুদ্ধের প্রথমদিকেই যুদ্ধের প্রয়োজনেই সীমান্তের কাছাকাছি অনেক জায়গায় সামরিক হাসপাতাল গড়ে ওঠে। স্থানীয়ভাবে বিশেষ করে ত্রিপুরা-কুমিল্লা সীমান্ত বরাবর ফিল্ড হাসপাতাল স্থাপন করেন স্বেচ্ছাসেবক ডাক্তার ও আওয়ামী লীগ কর্মীবৃন্দ। ২ মে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ড. টি হোসেনকে স্বাস্থ্যসচিব হিসেবে নিয়োগ দিয়ে এই মন্ত্রণালয়ের কর্মতৎপরতা শুরু হয়। শত্রুর আক্রমণে যারা আহত হন তাদের সেবাপ্রদানই এর মুখ্য কাজ। এছাড়া বেচসরকারি খাতে বাংলাদেশের সকল শ্রেণির নাগরিকদের চিকিৎসা সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং তা বাস্তবায়ন করা হয়।



# স্বাধীন বাংলা, স্বাধীন সেনানী

### স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য স্বীকার

৬ এপ্রিল ১৯৭১। দিল্লি। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন পাকিস্তানি হাইকমিশনের দ্বিতীয় সচিব কে এম শিহাবউদ্দিন ও সহকারী প্রেস সচিব আমজাদুল হক।

১৮ এপ্রিল ১৯৭১। কলকাতা। পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনার মোহাম্মদ হোসেন আলী ও তার মিশনের ৭০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা একযোগে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেন। মিশন প্রধান হিসেবে হোসেন আলীর অবদান অপরিসীম। তার সঙ্গে ছিলেন প্রথম সচিব রফিকুল ইসলাম, তৃতীয় সচিবদ্বয় আনোয়ারুল করিম চৌধুরী ও কাজী নজরুল ইসলাম ও প্রেস এটাচি মাকসুদ আলী।

লন্ডনে প্রথম আনুগত্য প্রকাশ করেন তৃতীয় সচিব মহিউদ্দিন আহমদ। তারপর বিভিন্ন পেশার বিভিন্ন ব্যক্তি যোগ দেন; যেমন হাবিবুর রহমান, লুৎফুর মতীন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ফজলুল হক প্রমুখ। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ মিশন গড়ে ওঠে। পরে কাউন্সিলর রেজাউল করিম এই মিশনে যোগ দেন।

রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োজিতদের মধ্যে প্রথম যোগ দেন বাগদাদে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত আবুল ফাতেহ, ম্যানিলার রাষ্ট্রদূত খুররম খান পন্নী ও বুয়েনস আইরেসের রাষ্ট্রদূত আবদুল মোমিন। একে একে দিল্লির কাউন্সেলার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী, কাঠমান্ডুর প্রথম সচিব মুস্তাফিজুর রহমান, কায়রোর তৃতীয় সচিব ফজলুল করিম, লাগোসের তৃতীয় সচিব মহিউদ্দিন আহমেদ জায়গীরদার, জেনেভার দ্বিতীয় সচিব ওয়ালিউর রহমান ও তিউনিসের তৃতীয় সচিব সৈয়দ আমিরুল ইসলাম যোগ দেন কূটনীতিক মুক্তিযুদ্ধে। আরও যোগ দেন টোকিওর তথ্য সচিব এস এম মাসুদ, তৃতীয় সচিব কিউ এম এ রহীম, হংকংয়ের অস্থায়ী ট্রেড কমিশনার মহিউদ্দিন আহমেদ। বাংলাদেশের মিশন গড়ে ওঠে নেপাল, জাপান, সুইজারল্যান্ড ও হংকং-এ।

ভারতের বাইরে সবচেয়ে বড় কূটনৈতিক উদ্যোগ আসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। একসঙ্গে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন ওয়াশিংটনের দূতাবাসের ৬ জন বাঙালি কূটনীতিক, ৩ জন স্থানীয় নিয়োগকৃত কর্মকর্তা ও সকল কর্মচারী। এ দলে ছিলেন মিনিস্টার এনায়েত করীম, কাউন্সিলর শাহ এ এম শামসুল কিবরিয়া, অর্থনৈতিক কাউন্সিলর আবুল মাল আবদুল মুহিত, শিক্ষা কাউন্সিলর আবু রাশেদ মতিন উদ্দিন, দ্বিতীয় সচিব (অর্থ) আতাউর রহমান চৌধুরী ও তৃতীয় সচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী। বাংলাদেশ সরকার সংসদ সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান সিদ্দিকীকে মিশন প্রধান হিসেবে পাঠানো হয়। ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ মিশন গড়ে ওঠে। নিক্সন প্রশাসন পাকিস্তানকে সমর্থন করলেও মার্কিন জনসাধারণ, সিনেট, কংগ্রেস, সাংবাদিক ও প্রচার মাধ্যম, শিক্ষাবিদ, সঙ্গীত শিল্পী সবাই বাংলাদেশকে ব্যাপক সমর্থন দেন। ফলে নিক্সন প্রশাসন ইসলামাবাদকে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ করতে বাধ্য হয়। নিউইয়র্কের জাতিসংঘের উপস্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োজিত সৈয়দ আনোয়ারুল করীম ওয়াশিংটনের দলের সঙ্গে যোগ দেন।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মার্কিন অঞ্চলে সর্বপ্রথম আনুগত্য প্রকাশ করেন ভাইস কনসাল আবুল হাসান মাহমুদ আলী।

কূটনৈতিক অঙ্গনে যুদ্ধের ফলে পাকিস্তান ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক পরিসরে একঘরে হয়ে পড়ে, সাহায্য ও সমর্থন কমতে থাকে। বাংলাদেশের বন্ধুরাষ্ট্র ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন বাঙালির পক্ষে দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়।

### স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল

পৃথিবীর ইতিহাসে যুদ্ধকালীন প্রথম ফুটবল দল 'স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল' মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত অর্জন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় অংশ নেয়।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত চিঠিতে 'স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল'-এ কয়েকজনকে মুজিবনগর এসে যোগ দিতে বলা হয়। এই আহ্বানে সাড়া দিতে মুজিবনগরে আসেন প্রতাপ শঙ্কর হাজরা, সাইদুর রহমান প্যাটেল, শেখ আকরাফ আলী, আলী ইমাম এবং অন্যরা। তারপর আকাশবাণীর (কলকাতা রেডিও) ঘোষণায় বলা হয় যে, বিভিন্ন ক্যাম্পে অবস্থানরত খেলোয়াড়দের মুজিবনগরে রিপোর্ট করার জন্য। ঘোষণার পরে ৪০ জন খেলোয়াড় মুজিবনগর ক্যাম্পে যোগ দেন। সেখান থেকে ৩০ জন বাছাই খেলোয়াড় দিয়ে 'স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল' গঠন করা হয় জুন ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে। পরে আরও একজনকে অন্তর্ভুক্ত করা হলে সদস্য সংখ্যা ৩১ জন হয়। এই দল ২৩ জুলাই মুজিবনগর থেকে নদিয়া পৌঁছে। নদিয়ার ডিসি দীপক কান্ত ঘোষ এবং স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদকসহ অন্য কর্মকর্তারা তাদের অভ্যর্থনা জানান। পরদিন কৃষ্ণনগর স্টেডিয়ামে 'নদীয়া একাদশ'-এর বিপক্ষে 'স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল' প্রথমে খেলতে নামে। এই দিন মেহেরপুর সীমান্ত এলাকা দিয়ে বিপুলসংখ্যক বাঙালি ম্যাচ উপভোগ করতে স্টেডিয়ামে আসে। খেলা শুরুর আগে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা নিয়ে মাঠ প্রদক্ষিণ করেন দলের সদস্যরা। এ সময় জাতীয় সঙ্গীতও পরিবেশিত হয়। ম্যাচটি ২-২ গোলে ড্র হয়। 'স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল'-এর হয়ে প্রথম গোল করেন শাহজাহান। স্বীকৃতি ছাড়া বাংলাদেশের পতাকা ওড়ানোর দায়ে পরদিন নদীয়ার ডিসিকে চাকরিচ্যুত করা হয়।

সর্বমোট ৩৬ জন নিয়ে গড়া ফুটবল দলের চিত্রটি হচ্ছে এ রকম-তানভীর মাজহার তহান্না (ম্যানেজার), ননী বসাক (কোচ), খেলোয়াড় : জাকারিয়া পিন্টু (অধিনায়ক), প্রতাপ শঙ্কর হাজরা, আলী ইমাম, মোহাম্মদ কায়কোবাদ, অমলেশ সেন, আইনুল হক, শেখ আকরাফ আলী, বিমন কর, শাহজাহান আলম, মনসুর আলী লালু, কাজী সালাউদ্দিন, এনায়েতুর রহমান, কে এন নওকেরুজ্জামান, সুভাষ সাহা, ফজলে হোসাইন খোকন, আবুল হাকিম, তসলিম উদ্দিন শেখ, আমিনুল ইসলাম, আবদুল মমিন জোয়ারদার, মনিরুজ্জামান পেয়ারা, সাত্তার, প্রাণগোবিন্দ কুণ্ডু, মুজিবর রহমান, মেজর জেনারেল খন্দকার নুরুন্নবী (অব.) লুৎফর রহমান, অনিরুদ্ধ চ্যাটার্জি, সানজিত কুমার দে, মাহমুদুর রশিদ, সাইদুর রহমান প্যাটেল, দেওয়ান মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন ও নিহার কান্তি দাস প্রমুখ।





৮ আগস্ট ১৯৭১। কলকাতার অন্যতম ফুটবল পরাশক্তি মোহনবাগানের ফুটবলার গোস্টপালের নামে গড়া একাদশের বিপক্ষে পরবর্তী ম্যাচে খেলে 'স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল'। মূলত মোহনবাগানের খেলোয়াড়রাই এই দলের হয়ে মাঠে নামেন। এভাবে বিভিন্ন এলাকায় মোট ১৬টি ম্যাচ খেলে স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার পাশাপাশি অর্থ সংগ্রহ করে এই দলটি। ম্যাচগুলো থেকে আয়কৃত পাঁচ লাখ টাকা স্বাধীন বাংলাদেশের কোষাগারে জমা দেওয়া হয়।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। চূড়ান্ত বিজয়ের পর দেশে ফেরেন 'স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল'-এর সদস্যরা। যুদ্ধপরবর্তী বাংলাদেশের ফুটবলকে চাঙ্গা করতে স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল কাজ করে। এই দলটি ভারতের বিভিন্ন স্থানে মোট ১২টি খেলায় জয়লাভ করে এবং ৩.৫ লাখ রুপি (পাঁচ লাখ টাকা) অর্থ জোগাড়ে সমর্থ হয়। সর্বশেষ খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় মুম্বাইতে যেখানে মহারাষ্ট্র ফুটবল দলের নেতৃত্ব দেন ভারতের খ্যাতনামা সাবেক ক্রিকেট অধিনায়ক নবাব মনসুর আলী খান পতৌদি।

### মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ প্রকাশ

**স্বাধীন বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকা :** 'জয় বাংলা', 'নতুন বাংলা', 'মুক্তিযুদ্ধ', 'বাংলার বাণী', 'দি পিপল', 'দি নেশন', 'দেশ বাংলা', 'দাবানল', 'রণাঙ্গন', 'বাংলার মুখ', 'সাপ্তাহিক বাংলা', 'মায়ের ডাক', 'জন্মভূমি', 'স্বাধীন বাংলা', 'বিপ্লবী বাংলাদেশ', 'অভিযান' প্রভৃতি। মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবলকে অক্ষুণ্ন রাখতে এসব পত্র-পত্রিকা গৌরবময় অবদান রাখে। 'জয় বাংলা' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন জিল্লুর রহমান (এমএনএ) আর সম্পাদক মণ্ডলীর অংশ হিসেবে দায়িত্ব পান আবদুর রাজ্জাক চৌধুরী, আইনুল ইসলাম, সলিমুল্লাহ, আসাদ চৌধুরী এবং আবুল মনজুর।

**বহির্বিশ্বের পত্র-পত্রিকা :** বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সমর্থনে গুরুত্ব সহকারে সংবাদ প্রকাশ করে 'দি নিউ স্টেটসম্যান', 'দি ইভনিং স্টার' (ওয়াশিংটন), 'ওয়াশিংটন পোস্ট', 'দি নিউ ইয়র্ক টাইমস', 'নিউ টাইমস', (মস্কো), 'দি কম্যুনিস্ট' (যুগোস্লাভিয়া), 'পিপলস নিউজ' (লন্ডন), 'দি টাইমস' (ইংল্যান্ড), 'দি গার্ডিয়ান (ইংল্যান্ড), 'দি অবজারভার' (ইংল্যান্ড), 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' (লন্ডন), 'উতুসান' (মালয়েশিয়া), 'নিউ নেশন' (সিঙ্গাপুর), 'দি জাপান টাইমস', 'আনন্দবাজার' (ভারত), 'যুগান্তর' (ভারত), 'দৈনিক বসুমতি' (ভারত), 'অমৃত বাজার' (ভারত), 'মুসলমান' (ভারত), 'দৈনিক সত্যযুগ' (ভারত), 'রাইজিং নেপাল' (নেপাল), 'সাপ্তাহিক পণবার্জ', 'সাপ্তাহিক গৌরব', 'সাপ্তাহিক পয়গাম', 'দি গুনাইদিন' (তুরস্ক), 'দি আফগান মিলাত', 'ডেউলি টাইমস' (কানাডা), 'আল সাহাফা' (সুদান), 'থাই সেরি', 'দি টাইম' (ম্যাগাজিন) ইত্যাদি।

### স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশ্বের গণমাধ্যমগুলো যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' অন্যতম এক অবিস্মরণীয় ঘটনার জন্ম দেয়। 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'-কে চার পর্বে ভাগ করা যায়–

১. চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র, কালুরঘাট (২৬ মার্চ ১৯৭১)।

২. স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র, আগরতলা (২৭ মার্চ-২৪ মে ১৯৭১)। শিল্পী বেলাল মোহাম্মদসহ দশজ শব্দসৈনিক কালুরঘাট ট্রান্সমিটার ভবনে রক্ষিত এক কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ট্রান্সমিটার বহন করে সীমান্তের ওপারে আগরতলায় নিয়ে আসেন। আগরতলায় স্থানীয় প্রশাসন, বিএসএফ ও আওয়ামী লীগের কর্মীদের সহযোগিতায় বিক্ষিপ্তভাবে অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হয়।

৩. স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র, কসবা-আখাউড়া (১১ এপ্রিল ১৯৭১)। এখান থেকে ১১ এপ্রিল ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের একটি রেকর্ডকৃত ভাষণ বারবার প্রচার করা হয়।

৪. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, কলকাতা (২৫ মে থেকে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত)।

'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' (কলকাতা), মিডিয়াম ওয়েভ ৩৬১.৪৪ মিটারে ব্যান্ডে প্রতি সেকেন্ড ৮৩০ কিলো-সাইকেলে, একমাত্র স্টুডিও থেকে, দৈনিক সকাল ৭টা ও সন্ধ্যা ৭টা মাত্র দুটো অধিবেশন দিয়ে শুরু করে যাত্রা। পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠান সূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয় বাংলা ও ইংরেজি সংবাদ, 'অগ্নিশিখা' (সংগ্রামী মুক্তিযোদ্ধার জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান), 'চরমপত্র' (বিশেষ কথিকা), 'জাগরণী' (দেশাত্মকবোধক গানের অনুষ্ঠান) প্রভৃতি।



# সপ্তম অধ্যায়

## শরণার্থী ও দেশত্যাগ

### বাঙালির ভোগান্তি

৫ জুন ১৯৭১। 'বাঙালির ভোগান্তি'-শীর্ষক শিরোনামে 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় এ বি ইউ লিখেন–

> রাতের বেলা। ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলার সার্কিট হাউসে আমি যখন ছিলাম তখন আমার বেডরুমের জানালা কেঁপে উঠত। কারণ প্রতি রাতে সীমান্ত বরাবর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শেল এসে পড়ত। বিস্ফোরিত হতো। পূর্ব বাংলার পাঁচটি জেলার সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তরেখা। দিনের বেলাতেও শেল বিস্ফোরণ হতো, যদিও তার সংখ্যা কম ছিল। সীমান্তে অবস্থানরত গেরিলাদের উদ্দেশ্যেই এই বোমা নিক্ষেপ করা হতো, কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই, ভয়-ভীতি গ্রামবাসীদের মধ্যে সৃষ্টি রে তাদেরকে এসব অঞ্চলে ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করার জন্যই শেল ফাটানো হতো।
>
> সীমান্ত জুড়ে পাকিস্তানি সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতের অঙ্গরাজ্য ত্রিপুরা, পশ্চিম বাংলা ও আসামে উদ্বাস্তুর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। পূর্ব বাংলা থেকে প্রায় ৩০ লক্ষ শরণার্থী ভারতে অবস্থান করছে। দু'মাস আগে ত্রিপুরার জনসংখ্যা ১৫ লক্ষ ছিল, বর্তমানে প্রায় আরও ৮ লক্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে।
>
> ত্রিপুরায় পাঁচ-শত হাজারেরও বেশি নিবন্ধনকৃত উদ্বাস্তু রয়েছে, এছাড়া অনিবন্ধনকৃত প্রায় এক শত হাজার শরণার্থী আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে অবস্থান করছে। এ পরিস্থিতিতে সাংঘাতিক খাদ্য সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের গতি মন্থর হয়ে গেছে। এক হিসাবে অর্ধেক শরণার্থীকে অস্থায়ী আশ্রয় শিবির প্রদান করা হয়েছে। অনেক স্কুল ও মন্দিরকে আশ্রয় শিবিরে রূপান্তরিত করা হয়েছে, কিন্তু হাজার হাজার লোককে চাটাই ও খড়-নির্মিত কুঁড়েঘরে থাকতে হচ্ছে। ঘরগুলোকে দেখে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন মনে হয়, কিন্তু ঝড়ে তা সহজেই উড়ে যেতে পারে। জুনের মাঝামাঝি সময়ে প্রবল বৃষ্টি হলে সেগুলো রক্ষা করা সম্ভব হবে না। বর্তমানে হাজার হাজার পরিবার গাছহতলায় ও খোলা জায়গায় অবস্থান করছে এবং আগামী কয়েক সপ্তাহে অনেক শিশু মারা যাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

আগরতলা থেকে ৭০ মাইল দক্ষিণে, সাবরামে, ত্রিপুরার বৃহত্তম আশ্রয়-শিবিরটি অবস্থিত। দু'হাজার জনসংখ্যার এই শহরটিতে এখন অধিবাসীর সংখ্যা পূর্বের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। গত মাসে অতিরিক্ত প্রায় আশি হাজার লোক পূর্ব বাংলা থেকে এখানে এসেছে। আশ্রয়-শিবির থেকে কয়েক হাজার গজ দূরে ফেনী নদী, যা পূর্ব বাংলার সঙ্গে সীমানা নির্দেশ করে। ভারতের অংশে একটি ছইওয়ারা ছোট নৌকা বাঁধা। একদল বাচ্চাকাচ্চা নদীর অপর পাশটা দেখছে। 'ঐ যে!' একজন চিৎকার করে উঠল, 'ঐ যে ওরা যায়।' দুজন পাকিস্তানি অফিসার সেনাবাহিনীর ক্যাম্প (এক সময়ের ডাকঘর)-এর চত্বর পরিদর্শন করছে। ডাকঘরের পেছনে বিস্তৃত খালি জায়গা। এরপর আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলভবন ও অর্ধেক বিধ্বস্ত মসজিদ। কাছেই অল্পকিছু ঘরবাড়ি দেখা যায়। এ হচ্ছে রামগড় শহর। সেনাদের পায়ে শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

কলকাতা থেকে ৬০ মাইল দূরে এবং ভারতের সীমানার দু'মাইল ভেতরে এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখা যায়, এখানে হাজার হাজার মা শিশু কোলে নিয়ে রাস্তার ধারে খোলা আকাশের নিচে বসে আছে, রান্না-বান্না করছে বা ছায়ার নিচে বিশ্রাম নিচ্ছে। দুর্ভাগ্য তাদের মুখমণ্ডলেই লেখা রয়েছে। বিভিন্ন স্থানে লোকজন লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে প্রতিদিনের ৪০০ গ্রাম চালের রেশনের জন্য। শরণার্থীদের বৃহৎ অংশই শিশু। অনাহারে শীর্ণ, নিরন্ন মনমরা বাচ্চাদের এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য। এমন এক দুর্ভাগা দেশে জন্ম নিয়েছে যার জন্য তারা দায়ী নয়।

কিন্তু বাচ্চাদের করুণ চিত্র আহত করলেও মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা সবাইকে উজ্জীবিত করে রেখেছে। সীমান্ত এলাকায় আগরতলা থেকে কয়েক মাইল দূরে, আমি এক বনের প্রান্তে মুক্তিবাহিনীর একটি ট্রেনিং ক্যাম্পে এক ঘণ্টা কাটিয়েছি। লুঙ্গি ও শার্ট পরা মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা। তারা সশস্ত্র পাহারা পেরিয়ে আমাকে একটি কাঠের পুরনো ভবনের সামনে আনে, যেখানে একজন তরুণের সঙ্গে দেখা হয়, বয়স বড়জোড় ১৮ বৎসর হবে। সে নিজেকে কমান্ডার হিসেবে পরিচয় দেয়। সে ঢাকার মিলিটারির একাডেমির একজন সাবেক ক্যাডেট। তার নেতৃত্বাধীন কিছু যোদ্ধার সঙ্গে পরিচয় হয়। সবাই ছাত্র, পরনে শার্ট ও লুঙ্গি। তাদের একজন রাইফেলের স্তূপ পাহারা দিচ্ছে। কমান্ডার যোদ্ধাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের বর্ণনা করে, পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে প্রতিদিনের যুদ্ধের কথা বলে। সে বিজয়ের ব্যাপারে আত্মপ্রত্যয়ী। কমান্ডার বলল, 'মুক্তিযোদ্ধাদের মানসিক জোর প্রচণ্ড।' আমি যখন একজন মুক্তিযোদ্ধার ড্রয়িং শেষ করলাম, (এই রিপোর্টের সঙ্গে একটি স্কেচ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়), তখন কমান্ডার আমার কাছে এসে বলল, 'তাকে সন্ত্রস্ত দেখাবেন না। তার চোখে আপনি অবশ্যই সাহসের চিহ্ন দেখাবেন। আমাদের মনের জোর খুবই বেশি।' ছেলেটাকে যেমন দেখাচ্ছিল, আমি তেমনই এঁকেছি। মনের হয় সে তার মায়ের কথা ভাবছিল।





৫ জুন ১৯৭১। 'ইয়াহিয়ার শিকার'–শীর্ষক শিরোনামে 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকা লিখে–

পূর্ব বাংলার হতভাগ্য লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রতি আন্তর্জাতিক সমর্থন খুব দেরিতে এসে পৌঁছে। রাজনীতি, আমলাতন্ত্র ও দমননীতি ভারতের হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সৃষ্টি করে–যেন ভারতের এই ধরনের সমস্যা নেই- তাকে এককভাবেই চল্লিশ লক্ষ উদ্বাস্তুর দেখাশোনা করতে হচ্ছে। উদ্বাস্তুদের দুর্যোগগুলো হচ্ছে (এক) ১৯৭০-এর নভেম্বরের সাইক্লোন, (দুই) ইয়াহিয়া খানের সামরিক হত্যাভিযান; (তিন) সরকার দ্বারা জনগণকে উদ্বাস্তুতে রূপান্তরিত করা; (চার) কলেরা মহামারী হিসেবে দেখা দেওয়া; (পাঁচ) পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব বাংলার জন্য সাহায্য প্রদান নিশ্চিত না করা।

পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পৃথক। পূর্ব বাংলার মতো পশ্চিম বাংলার মানুষের অন্য কোথাও চলে যাওয়ার সমস্যা নেই, তবে ভারতকে দ্রুত দেখাতে হবে যে, তার একার পক্ষে উদ্বাস্তুদের দেখাশোনা করা সম্ভব নয়। ভারত অন্যান্য দেশের সহায়তাকে স্বাগত জানিয়েছে। সাহায্য যা আসবে তা দিয়ে হয়তো পুরো প্রয়োজন মিটানো সম্ভব নয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, ভারত সরকার জাতিসংঘের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেনি। আমলাতান্ত্রিক অসুবিধার কারণে পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুরা অনেক সহায়তাই পাচ্ছে না।

পূর্ব বাংলায় যাদের পাকিস্তানিরা হত্যা করেনি, তবে তারা ক্ষুধার্ত, তাদের জন্য জরুরি ভিত্তিতে খাদ্যের প্রয়োজন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ইয়াহিয়া খানকে সরাসরি সাহায্য প্রদান না করে কীভাবে ক্ষুধার্ত বাঙালিকে সাহায্য প্রদান নিশ্চিত করা যায়? নাইজেরিয়ার বায়াফ্রার জন্য যখন আন্তর্জাতিক সাহায্য দেওয়া হয় তখন জেনারেল গাওন অযৌক্তিকভাবে মন্তব্য করে যে, সাহায্যদানকারীরা তার শাসন পদ্ধতিতে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করেছে। ইয়াহিয়া খান এরই ইঙ্গিত দিয়ে বলেন, 'পাকিস্তানের নিজস্ব সংস্থাসমূহ সরাসরি সাহায্যের অর্থ পরিচালনা করছে।' কিন্তু তিনি এবং সাহায্যদাতারা জানেন, এভাবে সাহায্য দেওয়ার অর্থই হচ্ছে দুর্গতদের হত্যাকারী সেনাবাহিনীর অধীনে সাহায্যের অর্থ চলে যাবে। অবশ্য সাহায্যদাতারা ইয়াহিয়াকে এড়িয়ে চলতে পারেন, যদি বিশ্বের অর্থ সংস্থাসমূহ তাকে শর্তহীনভাবে নাকচ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পাকিস্তানের অর্থনীতি এখন খুব খারাপ অবস্থায় রয়েছে এবং অবমূল্যায়ন প্রকট হয়ে উঠেছে। আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক ও অর্থসংস্থাসমূহের কাছে সাহায্য চাওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যকে এখানে নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে নিশ্চিত করতে হবে যে, ইয়াহিয়া খান যেন বাড়তি কোনো সাহায্য না পান, যা তিনি চাচ্ছেন। ইয়াহিয়া খানকে এটা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, তিনি পূর্ব বাংলায় যে দমননীতি চালিয়ে যাচ্ছেন, তাতে সাহায্য প্রদান করা সম্ভব নয়। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে যে, যখন এই রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগ করা হবে, তখন আরও উদ্বাস্তু দেশ ছাড়বে এবং খেতে না পেয়ে মানুষ মারা যাবে।

৬ জুন ১৯৭১। 'বাংলার মহামারী' শীর্ষক শিরোনামে 'দি টাইমস' পত্রিকা লিখে–

দিনাজপুর সীমান্তে একটি উদ্বাস্তু শিশু কলেরায় মারা গেছে। সীমান্ত শিবিরগুলোতে এর সংখ্যা এরই মধ্যে পাঁচ হাজারে উন্নীত হয়েছে। মানচিত্রে প্রদর্শিত উদ্বাস্তুর সংখ্যা থেকে বোঝা যায় যে, আক্রান্তের সংখ্যা মহামারী আকারে অচিন্তনীয় পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। কলকাতার লাখ লাখ উদ্বাস্তুকে আঘাত করার জন্য কলেরা খুব দূরে অবস্থান করত না।

এক সপ্তাহ আগে বাংলায় নিযুক্ত অক্সফ্যামের মহাপরিচালক ফরাসি-কানাডিয়ান রেমন্ড করোনাইয়ার একটি বার্তা পেয়ে খুব হতোদ্যম হয়ে পড়েন। বার্তাটি আসে ভারতের ন্যান মাদার টেরিজার কাছ থেকে, কলকাতার গরিবদের নিয়ে যার সেবামূলক কর্মকাণ্ড ইতোমধ্যে কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে। মাদার টেরিজার পূর্ব-বাংলার উদ্বাস্তুদের জন্য কলকাতা থেকে ৭০ মাইল উত্তরে ও বাংলার সীমান্ত শহর কৃষ্ণনগরে একটি মেডিকেল টিম পাঠিয়েছেন।

মাদার টেরিজার বার্তায় বলা হয়, 'প্লিজ, স্যালাইন পাঠান, শিবিরে কলেরার প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়াছে।' বাংলায় এক শতাব্দী জুড়ে কলেরার রাজত্ব চলছে। কলকাতায় প্রতি বছর কলেরায় দু'হাজার মানুষ মারা যায়। কিন্তু স্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞরা পুরোপুরি বুঝতে পারছেন না, স্বাভাবিক সময়ে এ কেন ঘাপটি মেরে বসল। মাদার তেরেসার বার্তার অর্থ হলো–সবচেয়ে বিপজ্জনক সময়ে এ আবির্ভূত হয়েছে। শিবিরগুলোতে জড়ো হওয়া মানুষগুলোর অনেকেই অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় রয়েছে, দূষিত জল ব্যবহার করায় এবং চিকিৎসা সুবিধা না থাকায়। স্বদেশ ছেড়ে আসা উদ্বাস্তুদের বেশিরভাগেরই জলবাহিত ব্যাক্টেরিয়ার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নেই। গত সপ্তাহের শেষে, কলেরা মহামারী আকারে রূপ নেয়।

কলেরায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের ভয়াবহ পাতলা পায়খানা ও বমি হয়, ফলে তাদের দেহে মারাত্মক জলশূন্যতা দেখা দেয়। বমির ফলে তরল খাবারও খাওয়া সম্ভব নয়, তাই স্যালাইন জলই দেহে ঢোকানোর মাধ্যমে জলশূন্যতা রোধ করা যায়। যদি এই পদ্ধতি দ্রুত প্রয়োগ করা যায়, এমনকি এন্টিবায়োটিক ছাড়াই, একজন সবল দেহের ব্যক্তির বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক।

মাদার টেরিজার বার্তা পেয়ে এক ঘণ্টার মধ্যেই করোনাইয়ার ও তার সহকারীরা কলকাতা থেকে সাড়ে তিনশ' বোতল স্যালাইন সংগ্রহ করে কৃষ্ণনগরে পাঠিয়ে দেন। পরের দিন, পশ্চিম বাংলার স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. আবেদিন জানান, 'প্রতিদিন এক হাজার বোতল স্যালাইন দরকার কিন্তু সংগ্রহ হয়েছে মাত্র আটশ বোতল।' এই পরিসংখ্যা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, প্রয়োজনের তুলনায় সরবরাহ অতি অল্প হচ্ছে।





সোমবার : পশ্চিম বাংলার স্বাস্থ্য বিষয়ক পরিচালক ডা. সাহার বলেন, 'নদীয়া ও কৃষ্ণনগর জেলায় ব্যাপক মহামারী দেখা দিয়েছে।' কলেরায় সাড়ে তিনশ লোক মারা গেছে বলে সরকারি হিসাবে প্রকাশ করে। মঙ্গলবার : নয়শ লোক মারা যায়। আর বুধবার : তেরোশ'। এসব সংখ্যা শুধুই শরণার্থী কেন্দ্রসমূহের হিসাব। অর্ধেক শরণার্থী শিবিরের বাইরে আছে। শিবিরগুলোতে যখন কলেরা দেখা দেয় তখন শিবিরগুলো ও আশেপাশে থেকে হাজার হাজার মানুষ ভয়ে পালিয়ে যায়, তবে সঙ্গে করে নিয়ে যায় কলেরার জীবাণু।

ভৌগোলিকভাবে রোগজীবাণু যে রকম ছড়াচ্ছে, এতে ভারত সরকার বলছে যে, পূর্ব বাংলার ভেতর থেকে এই জীবাণু বাইরে ছড়িয়ে পড়ছে। বুধবার : ইউনিসেফ জানায়, ভারতের অঙ্গরাজ্য আসাম ও ত্রিপুরায় কলেরাও মহামারীরূপে দেখা দিয়েছে। অঙ্গরাজ্য দুটো নদীয়া থেকে দূরে হলেও পূর্ব বাংলা ভূখণ্ড দ্বারা প্রায় বিচ্ছিন্ন। বৃহস্পতিবার : পশ্চিম বাংলা সরকার অক্সফ্যামের কাছে জানতে চায় যে, চল্লিশ লাখ কলেরা প্রতিষেধক দিয়ে কত ভাগ রোগীর চিকিৎসা করা সম্ভব। শুক্রবার : ভারত সরকার জেনেভায় অবস্থিত ক্যাথোলিক রিলিফ সার্ভিসের কাছে আশি টন বিভিন্ন ধরনের ওষুধের আবেদন জানায়। আর কলকাতার অক্সফ্যাম অফিস অক্সফোর্ডে টেলেক্স করে প্লেনভর্তি স্যালাইন পাঠানোর জন্য।

স্যালাইন ইনজেকশন ও এন্টিবায়োটিক দিয়ে শুধুমাত্র কলেরা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব যদি সময়মতো ধরা পড়ে ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ন্যূনতমভাবে রক্ষা করা হয়। প্রতিষেধক দিয়েও নিয়ন্ত্রণ করা যায় অবশ্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করলে শতকরা ষাট ভাগ ক্ষেত্রে ভালো ফল পাওয়া যায়। ইন্টারন্যাশনাল নতুন জেট ইনজেকশন যন্ত্র দিয়ে গণহারে প্রতিষেধক প্রয়োগ করা সম্ভব। একজন চিকিৎসক এই যন্ত্রের দ্বারা প্রতি ঘণ্টায় ৪০০ জন রোগীকে চিকিৎসা করা যায়। এই যন্ত্রটি ছাড়া একজন ডাক্তারের পক্ষে সমান পরিমাণের রোগীকে চিকিৎসা করা সম্ভব নয়।

বাংলায় এখন বিপুল পরিমাণ চিকিৎসা করার জন্য যন্ত্রপাতি পাঠানো হচ্ছে। অবশ্য ত্রাণকর্মীরা জানেন, দেরিতে পাঠালেও যাই পাঠানো হচ্ছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ৩০টি জেট ইনজেকশন যন্ত্র এসে পৌঁছলেও একটি যন্ত্র দিয়ে দশটি শিবিরের কাজ সারতে হচ্ছে। ৯০৩ হাজার কলেরা প্রতিষেধক ভ্যাকসিন ব্রিটেন পাঠালেও চারজন উদ্বাস্তুর জন্য একটি মাত্র ভ্যাকসিন বরাদ্দ করা সম্ভব। উদ্বাস্তুরাই যে শুধু কলেরায় আক্রান্ত হয়েছে এমনটাও নয়।

ভারত কর্তৃপক্ষ সব উদ্বাস্তুর জন্য ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য রেশনের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু এর পরিমাণ অতি অল্প, প্রতি ব্যক্তির জন্য প্রতিদিন এক কপির

কম বরাদ্দ করা হয়। প্রায় ৫৫ পয়সা চাল-ডালের জন্য এবং বাকিটা রান্নার তেল ও জ্বালানি কেনার জন্য। সীমান্ত পার হওয়ার সময় অনেক উদ্বাস্তুই পাঁচ বা ছয়দিন অনাহারে থাকে, উপোসী ব্যক্তিদের জন্য এই রেশন ন্যূনতম। অবশ্য ভারতের জনগণ অভিযোগ করছে যে, সরকার দেশবাসীর চেয়ে উদ্বাস্তুদের বেশি সাহায্য করছে।

উদ্বাস্তুদের রেশন গ্রহণের পূর্বেই তালিকাভুক্ত হতে হয়, তাই ভারত সরকার জানে, উদ্বাস্তুর সংখ্যা কত এবং তারা কোথায় আছে। ত্রাণকার্য বিঘ্নিত হওয়ার পেছনে একটিই বাধা–উদ্বাস্তুরা সীমান্ত এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কলকাতার গঙ্গীয় সমতল এলাকা থেকে শুরু করে এক হাজার মাইল উত্তরে, হিমালয়ের পাদদেশের বর্ষণ এলাকা আসাম পাহাড় অঞ্চল হয়ে বার্মা সীমান্ত অঞ্চল হয়ে বঙ্গোপসাগরের সীমানা পর্যন্ত উদ্বাস্তুদের বিচরণ। উদ্বাস্তুরা এই সীমান্ত এলাকা জুড়ে সমানভাবে বসবাস করছে। অঙ্গরাজ্যসমূহ থেকে যে রকম হিসাব পাওয়া যায় তা হচ্ছে–চব্বিশ পরগনা জেলায় ৪২০ হাজার; নদীয়া জেলায় ৪৫০ হাজার; মুর্শিদাবাদে ১,২০০ হাজার; মালদহে ৩০০ হাজার; পশ্চিম-দিনাজপুরে ১,২০০ হাজার; কুচবিহারে ৭০০ হাজার; আসামে ৩০০ হাজার; মেঘালয়ে ৪৫০ হাজার এবং ত্রিপুরায় ৭০০ হাজার। উদ্বাস্তুদের মোট সংখ্যা : ৪,৬০০ হাজার। অবশ্য কিছু সচ্ছল লোক কলকাতা বা অন্যান্য ছোট শহরে প্রবেশ করতে শুরু করেছে, যারা রেশনের জন্য তালিকাভুক্ত হয়নি। উদ্বাস্তুর সংখ্যা প্রতিদিন একশ' হাজার করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বিশাল সংখ্যা পুরো সমস্যার অর্ধেকের নির্দেশ করে না। অনেক পশ্চিম বিশ্ব ত্রাণ কর্মকর্তা মনে করেন, 'পূর্ব বাংলায় একজন হিন্দু অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত এই দেশত্যাগের প্রক্রিয়া চলবে।' এই প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পূর্বে, পূর্ব বাংলায় মোট হিন্দুর সংখ্যা ছিল এক কোটি।

পূর্ব বাংলায় সঙ্কট শুরু হওয়ার পর থেকে তিনটি পর্বে উদ্বাস্তুরা সীমান্তে এসে পৌঁছে–(এক) ২৫ মার্চে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী আক্রমণের পরপর; (দুই) মে মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষে এবং (তিন) জুন মাসের প্রথম থেকে। সবক্ষেত্রেই উদ্বাস্তুদের বেশির ভাগই হচ্ছে হিন্দু বাঙালি। উদ্বাস্তুদের চোখে মুখে ভয়-ভীতির সব রকম চিহ্নই প্রকাশ পাচ্ছে।

'দি সানডে টাইমস', 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকার বাংলাভাষী রিপোর্টারদের সহযোগিতায় অনেক উদ্বাস্তুর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। সংবাদপত্রের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক অভীক সরকার বললেন, 'উদ্বাস্তুরা ব্যর্থ বিপ্লবের নিষ্ঠুর স্মৃতি' নিয়ে এসেছে। যে বিপ্লব ছিল স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হিংস্রতার বিরুদ্ধে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, গণহত্যা ইচ্ছাকৃতভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে।' সরকার লিখেন, 'একটি ভারতবিরোধী পরিকল্পিত প্রচারণা এখানে চালানো হচ্ছে এবং সীমান্ত অতিক্রম





করে পালিয়ে যাওয়ার সব পথ সেনাবাহিনী বন্ধ করে দিয়েছে। নিষ্ঠুরতার একটি বড় অংশ হচ্ছে বাঙালি হিন্দুকে উদ্বাস্তুতে পরিণত করা।'

ভয়ের কারণে স্বদেশ ত্যাগ করার দুটো উদাহরণ– (এক) আশি বছর বয়সের শরৎ দাস বলেন, 'একদিন আমার চল্লিশ বছর বয়সী ছেলে কাজ থেকে বাড়ি ফিরে আসেনি। আমার সন্তানকে গুলি করে হত্যা করা হয়।' (দুই) সুধারানী ঘোষ বলেন, 'আমার স্বামীকে মুসলিম লীগের কর্মীরা বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে রাস্তায় হত্যা করে।' (তিন) একজন উদ্বাস্তুকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, 'কেন দেশে ফিরে যাবে না', তখন সে বলে, 'আমি তখনই ফিরে যাব যখন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটবে।' কোনো সন্দেহ নেই সে সংখ্যাগরিষ্ঠ উদ্বাস্তুর কথাই বলছে।

এসব কাহিনি এই প্রমাণ করে যে, তারা ভয় পেয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন, আর যতদিন পর্যন্ত পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পূর্ব বাংলায় অবস্থান নেবে ততদিন তারা দেশে ফিরে যাবেন না।

ভারত সরকার সরকারিভাবে তাদেরকে 'উদ্বাস্তু' বলার পরিবর্তে 'স্থানান্তরকারী' বললেও বর্তমান সঙ্কট ও সমস্যাকে এড়ানো সম্ভব না। পাঁচ মিলিয়ন উদ্বাস্তুর কারণেই ভারতে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। আরও পাঁচ মিলিয়ন উদ্বাস্তু সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আশ্রয় নেবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ভারত সরকারের মনোভাব বাস্তবানুগ না হলেও তা সহজেই বোধগম্য যে, দলে দলে ভারতে এসে আশ্রয় নেওয়া উদ্বাস্তুদের অপরাধ নয়; বরং পূর্ব বাংলায় যা ঘটছে তার কারণেই তারা স্বদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে এবং হচ্ছে। বিশেষ করে পাকিস্তান সরকার এবং পাকিস্তানের সেনাবাহিনীই এর জন্য দায়ী। কিন্তু ভারত সরকারের ওপর উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে নানা ধরনের চাপ সৃষ্টি হচ্ছে, তবে ভারত সরকারকে এই সমস্যা থেকে মুক্ত হতে হবে। ভারতের স্থানীয় জনগণ অভিযোগ করছে যে, উদ্বাস্তুরা তাদের কাজকর্মে ভাগ বসাতে শুরু করেছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিবিদরা সতর্ক হতে বলছেন এবং বলছেন যে, উদ্বাস্তু কেন্দ্রগুলো নকশালপন্থিদের আখড়া হয়ে যাচ্ছে। নকশালপন্থিদের কর্মকাণ্ডের নিদর্শন দেখা যাচ্ছে। কেন্দ্রগুলোতে রাজনৈতিক খুনোখুনিও ঘটছে।

অঙ্গরাজ্য সরকার এই জনবিস্ফোরণকে মোকাবেলা করার জন্য সীমিত সম্পদ নিয়ে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন ত্রিপুরা সরকার : সুষ্ঠুভাবে খাদ্য বিতরণের জন্য ২৬টি স্থায়ী শিবির বেসরকারি ঠিকাদার নিয়োগ করেছে। এছাড়া বেশ কিছু বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন নিজ নিজ পদ্ধতিতে কাজ করে চলেছে। যেমন– অক্সফ্যাম, পশ্চিম বাংলা রেডক্রস, ইউনিসেফ, ওয়ার অন ওয়ান্ট, সেভ দ্য চিলড্রেন ফান্ড, ক্যাথেলিক রিলিফ সার্ভিসেস, দি ক্রিশ্চিয়ান

এজেন্সি ফর সোশ্যাল এইড, ক্রিশ্চিয়ান এইড, কেয়ার এবং চার্চসমূহ। তবে বেশির ভাগ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যা করছে, তা হচ্ছে মরুভূমিতে এক ফোঁটা জল মাত্র। সংস্থাগুলোর অবদানকে এভাবে হিসাবে করা যায় যে, যখন শত শত ডাক্তারের প্রয়োজন তখন তিনজন এখানে, চারজন ওখানে কাজ করছে। আর যেখানে লাখ লাখ মানুষ ক্ষুধার্ত, সেখানে হাজার মানুষ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দুর্ভাগ্যবশত, বিশ্বের সরকারগুলো সময়মতো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি। তিন সপ্তাহ আগেই উ. থান্ট জাতিসংঘের উদ্বাস্তু কমিটিতে জরুরি ভিত্তিতে বিশেষ সাহায্য প্রদানের জন্য আবেদন জানান। জাতিসংঘের দেওয়া তথ্যানুসারে মাত্র চারটি দেশ সাহায্য বা প্রতিশ্রুতি প্রদানে এগিয়ে এসেছে। উ. থান্টের আবেদনের পরপরই প্রাথমিক সাহায্য হিসেবে ব্রিটেন এক মিলিয়ন পাউন্ড, যুক্তরাষ্ট্র ২.৫ মিলিয়ন ডলার (পাঁচ শত হাজার ডলার এরই মাঝে জাতিসংঘ কমিটিকে দেওয়া হয়); খাদ্য ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সাহায্য হিসেবে কানাডা দুই মিলিয়ন ডলার এবং পশ্চিম জার্মানি এক মিলিয়ন ডয়েস মার্ক প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। রেড ক্রিসেন্টের মাধ্যমে সুইডেন সাহায্য প্রদান করেছে। জাতিসংঘের অন্য ১৪৯টি দেশের কেউই সাড়া দেয়নি।

রেমন্ড করোনাইয়ার বলেন, 'বর্ষা যখন শুরু হবে তখন আপনি আশা করতে পারেন না যে, লোকজন খোলা আকাশের নিচে দু-চারদিন জলে ভিজে থাকতে পারবে।' এখন তো লাখ লাখ মানুষ খোলা আকাশের নিচে ঘুমাচ্ছে। উদ্বাস্তুদের মধ্যে মাত্র অর্ধেক আশ্রয় কেন্দ্রের মধ্যে থাকতে পারে। ভরা বর্ষা শুরু হওয়ার আগে আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করা কেবল ভারতের সেনাবাহিনীরই পক্ষে সম্ভব; কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ থাকার কারণে ভারতের সেনাবাহিনী সীমান্ত পাহারা দিতে ব্যস্ত। বর্ষা আসার আগে যদি কলেরা নিয়ন্ত্রণ করা না যায়, মহামারী শুরু হবেই। বন্যা এলে বা জলভাগের উচ্চতা বেড়ে গেলে ব্যাক্টেরিয়া দ্রুত বিস্তার লাভ করবে। বর্ষা নতুনভাবে টাইফয়েড ডেকে আনবে। অতি অল্প টাইফয়েড-বিরোধী সিরাম আছে। বাংলার দুর্ভোগ কেবল বর্ষাতেই থেমে থাকবে না। পূর্ব বাংলায় বর্ষার পূর্বেই ধানের বীজ রোপণ করা হয়ে থাকে, কিন্তু যুদ্ধ ও দেশত্যাগের কারণে লাখ লাখ কৃষক এই বসন্তে কোনো ধানচাষ করতে পারেনি। আক্রমণ, নিপীড়ন এবং মৃত্যুর পর চতুর্থ যে অশুভ শক্তি পূর্ব বাংলা দখল করে নেবে তা হচ্ছে দুর্ভিক্ষ।

কেউই জানে না কলকাতার জনসংখ্যা কত হবে- সম্ভবত আট মিলিয়ন, তবে ৭০ দশকের শেষে বারো মিলিয়নে পৌঁছবে। তবুও ত্রাণকর্মীরা অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী সঙ্কট মোকাবেলায় ব্যস্ত। কলকাতায় কলেরার মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে, কলকাতার তিন-চতুর্থাংশই স্যুয়ারেজ বা চলমান জলব্যবস্থার





ঘাটতি আছে। প্রতি বর্ষায় এখানে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। কলকাতায় কলেরার অনুপ্রবেশের আশঙ্কায় ভারত সরকার খুবই উদ্বিগ্ন। দমদম এয়ারপোর্টের একেবারে শেষ প্রান্তে ত্রিশ হাজার ও শান্তি শহরের উদ্বাস্তু কলোনিতে কয়েক হাজার উদ্বাস্তু বাস স্থাপন করেছে।

শহর থেকে খুব সম্প্রতি ঘুরে আসা অক্সফ্যামের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার মাইকেল বর‍্যাকম্যান বলেন, 'আমি মনে করি কলকাতায় যদি কলেরার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়, তবে খোদা না করুক, এটা লন্ডনের মহাপ্লেগের মতো বিরাট আকারে দেখা দিবে।' রেমন্ড করোনাইয়ার বলেন, 'এটা হবে দাবানলের মতো। এই মহামারী কতটা ভয়ঙ্কর হবে তা বলার মতো যথার্থ ভাষা আমার জানা নেই। কলকাতা ঘিরে যদি এটা একবার ছড়িয়ে পড়ে, উভয় বাংলার গোটা জনগোষ্ঠীই ধ্বংসের মুখে পড়বে।' উভয় বাংলায় ১১০ মিলিয়ন মানুষ রয়েছে, যা গোটা মানবগোষ্ঠীর শতকরা তিন ভাগের সমান।

# বাঙালির দেশত্যাগ

৭ জুন ১৯৭১। লন্ডনের ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকা 'তারা চায়নি এমন হোক' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে, বিখ্যাত সাংবাদিক জেমস ক্যামেরুনের ফটোসহ। জেমস ক্যামেরুনের উক্তি, 'আমার বিশ্বাস শরণার্থীর সংখ্যা পাঁচ মিলিয়নের ঊর্ধ্বে, শীঘ্রই দশ মিলিয়নে পৌঁছাবে। অনুপাতে শবের সংখ্যাও কম হবে না।' সাংবাদিক জেমস ক্যামেরুন ভারত ও পূর্ব বাংলা সীমান্তে এক মারাত্মক জিপ দুর্ঘটনায় আহত হয়ে লন্ডনের ফোলহ্যাম হাসপাতালের কার্ডিয়াক ওয়ার্ডে হাত-পা-বুক ইলেকট্রোড সংযুক্ত অবস্থায় রিপোর্টটি লেখেন। তিনি লিখেন–

আজ যে মহাবিপদে বাঙালি নিপতিত, বহু বছর পূর্বেই তা অবশ্যম্ভাবী বলে বিবেচিত হওয়া উচিত ছিল। এই মহাবিপদ মেঘের আড়ালে এতদিন উঁকিবুঁকি দিচ্ছিল, এখন সশরীরে উপস্থিত। সজীবতা প্রদানকারী বর্ষা প্রথমে আনে বন্যা, তারপর মৃত্যু। কিন্তু এখন পূর্ব বাংলার কয়েক কোটি মানুষের ওপর যা নিপতিত হচ্ছে তা যে যমদূতের চেয়েও ভয়াল, একথা অস্বীকার করা অসম্ভব। এই মহাবিপদের জন্যে বাঙালি মুসলমানদের পরস্পর বিরোধী মতবাদ অনেকাংশেই দায়ী–'মুসলমান মাত্রই ভাই ভাই'–তবে আজ থাকো না কেন এক ঠাঁই? 'আল্লাহর হুকুম ছাড়া মৃত্যু নেই'–তবে হত্যাকারী পাঞ্জাবির দোষ কী! এ ধরনের পরস্পরবিরোধী চিন্তাচেতনার সমষ্টি বাঙালি মুলমানের জীবন। ইসলাম ও অখণ্ড পাকিস্তান রক্ষার নামে পূর্ব বাংলায় আজ ধ্বংসযজ্ঞ চলছে। তবে তারা চায়নি এমন হোক। তাকদির বিশ্বাসী মানুষও মেনে নিতে পারছে না যে, পাকিস্তানের শাসক সমরগোষ্ঠীর সামরিক অভিযানে পূর্ব বাংলায় এমন ভয়াবহ পরিণতি ঘটবে। বাঙালির এই হচ্ছে নিষ্ঠুর পরিহাস। পাকিস্তানি সৈন্যদের হত্যাযজ্ঞে আজ হাজার হাজার বাঙালি নিহত। হাজার বাঙালি দেশত্যাগ করছে। তাদের বাড়িঘর, হাট-বাজার, দোকান-পাটে আগুন জ্বলছে। শত শত কর্মচারী পালিয়ে গেছে শহর ছেড়ে গ্রামে, গঞ্জে। কিন্তু সেখানেও শান্তি নেই। গ্রাম-গঞ্জ-জঙ্গল নির্বিচারে পাকবাহিনী গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। ফলে কেউ গাড়িতে, কেউ রিকশায়, কেউ হেঁটে পালাচ্ছে ভারতের দিকে। ... ইন্দিরা গান্ধীর প্রত্যেকটি কথাই আমি বিশ্বাস করি যখন তিনি বলেছিলেন, 'পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হিজরত এটি এবং নিষ্ঠুরতম অত্যাচারের শিকার এই কয়েক মিলিয়ন শরণার্থী।' পঁচিশ বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের শরণার্থী সমস্যা আমি অবলোকন করেছি। কিন্তু এমন ধারা দেখিনি কোথাও। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ভারতবর্ষের বিভাজনের ফলে যে হত্যাকাণ্ড ঘটে তার চেয়েও শতগুণ বেশি একাত্তরের হত্যাযজ্ঞ। তখন উভয়মুখী প্রবহমান শরণার্থীর পরিমাণের চেয়ে এবার অনেক বেশি। যদিও ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের নির্মমতাই ছিল অবর্ণনীয়, তবুও একাত্তরের নির্মমতা বাঙালিরা এ রকম আশা করেননি। ... রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিণতি এমন মর্মান্তিক হতে পারে তা বাঙালির ধারণায় ছিল না। আকস্মিক বজ্রপাতে তারা যেন আজ





দিশেহারা, স্বজনহারা ও বাস্তুহারা। লাখ লাখ মানুষের হিজরতের এমন হিড়িক আর কখনো কেউ দেখেনি। এ যে অভূতপূর্ব মানুষ তৈরির এক প্রলয়, ছোট কিয়ামত বলা চলে।

সকল ভীরুতা দুর্বলতা, কাপুরুষতা বিসর্জন দিয়ে ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে নয়, বরং ন্যায়ের অধিকারের দাবিতেই বাঙালিকে দুঃখ সয়ে, হাসিমুখে আঘাত বরণ করে স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করতে হচ্ছে। মনে রাখতে হবে, শুধু নির্যাতন করেই রাক্ষসী পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলার স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন রাখতে পারবে না। তাই আজ বাংলার জনগণ স্বাধীনতার জন্য আত্মবলি দিচ্ছে। অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। দৈন্য, দারিদ্র্য, অভাব ও লাঞ্ছনাকে বিসর্জন দিয়ে অর্জন করতে যাচ্ছে বাংলার স্বাধীনতা। ক্যামেরুন আরও লিখেন–

কয়েকদিন আগে আমি সীমান্ত এলাকা থেকে ফিরে এসেছি। দুর্ভাগ্যবশত জিপ দুর্ঘটনায় আহত হয়ে আমি আজ এখানে। গত তিন মাস ইংল্যান্ডের বাইরে ছিলাম। ব্রিটিশ সংবাদের দৃশ্যাবলি থেকে দূরে। পূর্ব বাংলায় যে ধ্বংসলীলা চলছে, যে বিস্ফোরণ ঘটছে যার ফলে সুদূরপ্রসারী পাকিস্তানের মৃত্যুতে সম্ভাব্য বাংলাদেশ জন্ম নেবে–তবু পাশ্চাত্য জগতের কাছে যেন তার তেমন মূল্যই নেই। এত বড় ধ্বংসাত্মক ও বিপজ্জনক ঘটনায়ও পশ্চিমা সরকার, প্রেস, জাতিসংঘ– কারো যেন কোনো মাথাব্যথা নেই। যে সরকার একটি জাতিকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, এই বর্বরতার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণের ইচ্ছাশক্তি হারিয়ে বসেছে সভ্য সমাজ–এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

১২ জুন ১৯৭১। একজন সিনিয়র পাকিস্তানি কূটনীতিক স্বীকার করেন, 'আমাদের জনসংযোগের যন্ত্র প্রস্তুত ছিল না। আমাদের সেনাবাহিনীর জনসংযোগ কর্মকর্তারা ২৫ ও ২৬ মার্চে ঢাকায় ছিলেন না, এবং আমরা অবশ্যই বিদেশি প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটা ভুল ব্যবহার করেছিলাম। পাকিস্তান সরকার যেভাবে পূর্ব বাংলাকে ২৫ ও ২৬ মার্চ মোকাবেলা করে তা সঠিক ছিল না। কিন্তু 'দেশত্যাগ' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে 'দি ইকোনমিস্ট' পত্রিকা জানতে চায় যে, পূর্ব বাংলায় কী এমন ঘটেছে যার কারণে পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল এবং দারিদ্র্যপীড়িত জনগোষ্ঠীর ৫০ লাখ মানুষ সীমান্ত অতিক্রম করে উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়, শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সৈন্যরা ২৫ মার্চের রাত থেকে অভিযান চালিয়ে, গুলিবর্ষণ ও আক্রমণ করে, ঢাকাকে ধ্বংস করে, তিন মাস পরও পূর্ব বাংলাকে তাদের নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম না হয়ে লাখ লাখ মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ (শিক্ষিত ও অশিক্ষিত) বাঙালিকে উদ্বাস্তু হিসেবে সীমান্তবর্তী ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলোতে আশ্রয় নিতে বাধ্য করে। নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের জন্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর এ রকম পদক্ষেপের প্রয়োজন ছিল না। অবশ্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনী অন্য মতপোষণ করে, তাদের মতে, 'মার্চে আওয়ামী লীগের চরমপন্থিরা একটি অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করছিল এবং এর ফলে বাঙালিদের দ্বারা পূর্ব বাংলায় বসবাসরত হাজার হাজার শাসকগোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত পাকিস্তানি ও বিহারিরা

নিগৃহীত হয়, আর এদের রক্ষা করতেই সেনাবাহিনী দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ায় দুষ্কৃতকারীরা ভারতে পালিয়ে গেছে। অবশ্য ভারতে আশ্রয় নেওয়া আওয়ামী লীগের নেতারা স্বীকার করেন, 'কিছুসংখ্যক পাঞ্জাবি ও বিহারি নিহত হয়েছে। কিন্তু তা কোনো পরিকল্পিত ঘটনা ছিল না।'

বাস্তবে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কিছু সদস্য, পুলিশ ও আধা সামরিক সীমান্তরক্ষীরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেন। ফলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদস্য, সীমান্তরক্ষী সৈন্য ও পুলিশকে বন্দি করে, অস্ত্র কেড়ে নিয়ে হত্যা করে। শেখ মুজিবকে তার বাসভবন থেকে ও তার দলের কোনো কোনো নেতাকে বন্দি করা হয়। অবশ্য কেউ কেউ অল্পের জন্য রক্ষাও পান। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিটি অভিযানের পর দেখা যায়, গ্রামের পর গ্রাম পুড়ে ছাই হয়ে গেছে এবং শত শত মানুষ লাশ হয়ে পড়ে আছে। মাত্র ৭০ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য দিয়ে পাকিস্তান সরকার সমস্ত পূর্ব বাংলাকে নিয়ন্ত্রণ করতে আগ্রহী বলেই এ রকম সহিংসতার পথ বেছে নিয়েছে, তবে ভবিষ্যতে রাজনৈতিক সমাধানের জন্য এ রকম নীতি ভীষণভাবে ক্ষতিকর। কারণ রাজনৈতিক সমাধান অস্ত্রের ভাষার ওপর নির্ভর করে না, তাই তো বাঙালি গণহারে দেশত্যাগ করেছে এবং করবে। একজন শিক্ষিত উদ্বাস্তু বলেন, 'পাকিস্তানি সৈন্যদের গুলি করে বাঙালিকে হত্যা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে সেনাবাহিনীর অফিসাররা বলে যে, এ হচ্ছে ধর্মযুদ্ধ; কারণ বাঙালি হিন্দু, আওয়ামী লীগের নেতা বুদ্ধিজীবীদের কারণেই ইসলামি রাষ্ট্র পাকিস্তান এখন হুমকির মুখে।

মৃত, ধৃত বা দেশত্যাগী অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী ও আওয়ামী নেতাদের হিন্দু বলে পরিচয় দিতে পারলে সেনাবাহিনী খুশি হয়। পূর্ব বাংলার সাড়ে সাত কোটি জনগোষ্ঠীর এক কোটি হিন্দু গণহারে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। বাস্তবে সেনাবাহিনী শুধুমাত্র বাঙালি হিন্দুদের তাড়িয়ে দিয়ে ক্ষান্ত হয়নি; বরং তারা বিহারি ও ডানপন্থি মুসলিম লীগের কর্মীদের নিয়ে গ্রাম-গঞ্জে গঠিত তথাকথিত 'শান্তি কমিটি'র সদস্যদের সাহায্যে হিন্দু বাঙালির সম্পত্তি দখল করে নেয়, লুটও করে, এমনকি সম্পত্তি যখন দখল করতে পারে না তখন তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়।

যেসব অঞ্চল থেকে বাঙালি জনগণের সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আশ্রয় নেওয়ার প্রবণতা বেশি সেসব অঞ্চলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্তি ও অভিযান প্রবলভাবে অব্যাহত আছে। পাকিস্তান সরকারের অভিযানের প্রথম দিকে ভারতে বাঙালির আশ্রয় নেওয়ার হার ছিল মোটামুটি অর্ধেক মুসলমান আর অর্ধেক হিন্দুর। কিন্তু মে মাসের প্রথম দিকে যখন পাকিস্তানি সৈন্যরা সীমান্তের কাছাকাছি এসে পৌঁছে তখন বাঙালি হিন্দুর ভারতে আশ্রয় নেওয়ার হার অনেক গুণ বৃদ্ধি পায়। ভারতের যেসব অঙ্গরাজ্যে বাঙালি হিন্দুর জন্য সংখ্যায় বেশি আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে পশ্চিম বাংলা, আসাম ও ত্রিপুরায়। এসব অঙ্গরাজ্যের মানুষের মনে আশঙ্কা জন্মেছে যে, সীমান্তের ওপারে একজন হিন্দু থাকা পর্যন্ত এই প্রবাহ অব্যাহত থাকবে। জুনের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত ভারতের পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী উদ্বাস্তুদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৮ লক্ষে।





আশ্রয় কেন্দ্রে মাত্র ২৭ লক্ষ, বাকিরা বন্ধু বা আত্মীয়-স্বজনের আশ্রয়ে বা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নিয়েছে।



ভারতে আশ্রিত শরণার্থীদের যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন

ভারতের প্রাথমিক নীতি ছিল উদ্বাস্তুদের সীমান্তের নিকটবর্তী এলাকায় সীমাবদ্ধ করে রাখা; কিন্তু তা আর সম্ভব হয়নি। উদ্বাস্তুদের কারণে ত্রিপুরার জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামও বৃদ্ধি পেয়েছে। উদ্বাস্তুরা আশ্রয় কেন্দ্রে না থেকে বাইরে অবস্থান করায় শ্রমের মজুরিও কমে গেছে। ভারতের সীমান্ত অঞ্চলে কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার জন্য বাড়তি দায়িত্ব পাওয়া ম্যাজিস্ট্রেটরা আশ্রয় কেন্দ্রের প্রশাসনিক কাজ সফলভাবেই চালিয়ে যাচ্ছেন। কলেরার মহামারী বিশ্বকে হতবাক করে দিলেও বৈদেশিক সংস্থাগুলো এর প্রতিরোধের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ভারত সরকারের মে মাসের কেনাকাটার তালিকায় ২৫০ হাজার তাঁবু ও ত্রিপল থাকলেও তা আরও বৃদ্ধি করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

উদ্বাস্তুদের নিয়ে ভারতের পরিস্থিতি অবনতির দিকে এগোতে থাকলেও পাকিস্তানের অবস্থা এর চেয়েও চরম। পূর্ব বাংলার প্রধান সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রাম থেকে সারা দেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। শহর ও গ্রামে জনগণের অসম চলাচল অব্যাহত রয়েছে। ১৯৭০-এর নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষতি এখনও পাকিস্তান সরকারের পক্ষে সামাল দেওয়া সম্ভব হয়নি। যানবাহনগুলো খাদ্য পরিবহনের পরিবর্তে সৈন্য পরিবহনের কাজ করছে। পূর্ব বাংলার অনেক ক্ষেতে বর্ষা পরবর্তী ধানের বীজ বপন করা হয়নি।

# বাঙালি শূন্যের অভিযান

১৩ জুন ১৯৭১। 'মানুষ শূন্যের অভিযান' শীর্ষক শিরোনামে 'দি অবজারভার' পত্রিকা লিখে–

> প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সৈন্যরা যেভাবে পূর্ব বাংলাকে জনমানুষ শূন্য করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে তা দেখে যে কেউ হতাশ হতে বাধ্য। দেশবিভাগের পর থেকে এই মুসলিম দেশে এক কোটি বাঙালি হিন্দু অবিচার ও নিবর্তন ভোগ করেও আশা নিয়ে বেঁচে ছিল; কিন্তু ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের পাকিস্তানি শাসক-সমরগোষ্ঠীর তাণ্ডবলীলা দেখে তারা বুঝতে পারছে যে, তাদের একমাত্র আশ্রয়স্থলই হচ্ছে ভারত, পাকিস্তান নয়। আগস্ট ১৯৪৭ থেকে মে ১৯৭১-এর গণহারে দেশত্যাগ শুরু হওয়া পর্যন্ত ষাট লাখেরও বেশি বাঙালি ভারতে আশ্রয় নিয়েছে, কারণ- (এক) সাম্প্রদায়িক প্রভাব, বিশেষ করে নারী-রক্ষার পরিপ্রেক্ষিত; (দুই) চাকরিচ্যুত ও সম্পত্তি হারানো; (তিন) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা; (চার) জীবনের অনিশ্চয়তা।
>
> ১৯৭০-এর নির্বাচনের সময়ে পূর্ব বাংলার বাঙালি হিন্দুরা আওয়ামী লীগের শেখ মুজিবের দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুসারে সকল মানুষের সমান জীবনের অধিকার আদায়ের দাবিতে মিছিল করে। ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করার ফলে শেখ মুজিব জেলবন্দি। আর ইয়াহিয়া তার সৈন্যকে নির্দেশ দেন শেখ মুজিবকে শেষ করে দিতে এবং বাঙালি হিন্দুদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা নিতে।
>
> কলকাতায় নিযুক্ত বাংলাদেশ মিশনের প্রধান হোসেন আলী বলেন, 'সামরিক শাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান তার অফিসারদের ডেকে নির্দেশ দেন যে, বাঙালি হিন্দুকে হত্যা, তাদের মেয়েদের ধর্ষণ ও তাদের সম্পত্তি বিনা মূল্যে ভোগ করার জন্য।' এ রকম নির্দেশ দেওয়া হোক বা না হোক সৈন্যদের কর্মকাণ্ড পরিদর্শনে মনে হয় যে, এমনই কিছু বলা হয়েছে। কিন্তু যে দেশে হিন্দু ও মুসলমানরা একই পোশাক পরিধান করে, একই খাবার খায়, একই ভাষায় কথা বলে, সে দেশে রাজাকারদের সহযোগিতা ছাড়া এ রকম নির্দেশ পালন করা সেনাবাহিনীর পক্ষে সম্ভব নয়। পূর্ব বাংলায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য 'শান্তি কমিটি'র সদস্যরা এসব কাজ করছে। তারা লিফলেট বিতরণ করে, লাউড স্পিকারের মাধ্যমে মুসলমানদের আহ্বান করে বলে বেড়াচ্ছে যে, ১৯৭০-এর ডিসেম্বরের নির্বাচনে যেসব হিন্দু আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছিল তাদের তাড়িয়ে দিয়ে তাদের সম্পত্তি দখল করার জন্যে। ২৫ মার্চ ১৯৭১-এর পর থেকে চল্লিশ লাখ বাঙালি হিন্দু সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। পাকিস্তানি সৈন্যরা পূর্ব বাংলা ছেড়ে চলে না যাওয়া পর্যন্ত তারা দেশে ফিরতে চায় না। অন্যদিকে পূর্ব বাংলায় জীবিত অবস্থায় থাকা বাকি ষাট লাখ হিন্দুকে আশ্রয় দিতে ভারত প্রস্তুত আছে।





পূর্ব বাংলায় দুই সম্প্রদায়ের বাঙালি হিন্দু আছে– (এক) উচ্চবর্ণের হিন্দু; (দুই) নিম্নবর্ণের হিন্দু। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা হচ্ছে আইনজীবী, ডাক্তার, শিক্ষক প্রভৃতি। তাদের জীবন সম্বন্ধে বাস্তব পরিকল্পনা থাকায়, পূর্ব থেকেই তাদের ছেলেমেয়ে ও অর্থ ভারতে পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং অল্প সময়ের নোটিশে দেশত্যাগ করতে প্রস্তুত। আর নিম্নবর্ণের হিন্দুরা হচ্ছেন কৃষক, কামার, জেলে, তাঁতি প্রভৃতি। তারা বাধ্য হয়ে দেশত্যাগ করছেন।

কলকাতায় অবস্থানরত একজন ফেরারি মধ্যবিত্ত চিত্রশিল্পী ও পূর্ব-বাংলার রাজধানী ঢাকার ডিজাইন সেন্টারের প্রধান কামরুল হাসান বলেন, 'ইয়াহিয়া খানের উদ্দেশ্য হচ্ছে দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের আন্দোলনকে শেষ করে দেওয়া এবং পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দাবিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে ভারতের জনগোষ্ঠীর ওপর পাল্টা আক্রমণের জন্য পরিস্থিতি তৈরি করা। এ রকম পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হবে এবং তখন পাকিস্তানের সামরিক শাসনের প্রকৃত নিপীড়নমূলক ভূমিকা থেকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি সরাতে পাকিস্তান সক্ষম হবে।'

এই পরিকল্পনা হয়তো সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হতো, যদি বাঙালি হিন্দু উদ্বাস্তুরা শারীরিক ও মানসিকভাবে তীব্র সমস্যার মুখে না পড়ত। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভারতের সীমান্তবর্তী শহর বারাসাত ও বসিরহাটে তীব্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ভারতের হিন্দুরা বর্শা, ছুরি, লাঠি সঙ্গে নিয়ে মুর্শিদাবাদ থেকে বারাসাত ও বসিরহাটে এসে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ চালায়। একজন বলে, 'শান্তিকমিটির লোকজন হিন্দুদের বলেছে যে, তারা যেন ভারতে চলে আসে, কারণ এখানে খাদ্য ও জমি বরাদ্দ আছে। এখন আমরা ভারতের মুসলমানদের পাকিস্তানে চলে যেতে বলব।' পাকিস্তান সরকারের সহযোগিতায় শক্তিশালী একদল রাজাকার বাঙালি হিন্দুদের দেশত্যাগ করাতে লিপ্ত আছে।

পূর্ব বাংলার উত্তর-পূর্ব সিলেট শহরের হিন্দু পরিত্যক্ত ঘরবাড়ি স্থানীয় রাজাকার মুসলমানরা ন্যূনতম মূল্যে নিলামে ডেকে নিচ্ছে। এমনকি ঢাকারও পরিত্যক্ত ঘরবাড়ি বণ্টনের জন্য আনুষ্ঠানিকতাও সম্পন্ন হয়েছে। ইয়াহিয়া খানের সরকারের প্রতি আনুগত্যের পুরস্কার হিসেবে বাঙালি হিন্দুদের জমিজমা বণ্টন করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে নিরাপদে, দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য ইয়াহিয়ার প্রস্তাব বাঙালি হিন্দু উদ্বাস্তুদের পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব।

কামরুল হাসান আরও বলেন, 'পূর্ব বাংলার মুসলমান দালালরা বাঙালি নয়। তারা পূর্ব বাংলার সাবেক প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিন ও পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর অনুসারী।' কিন্তু সাবেক প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিনও সামরিক শাসকদের অধীনে পুতুল সরকারের প্রধান হতে অস্বীকৃতি জানান। তার এই প্রত্যাখ্যান একটি ভুয়া গণতান্ত্রিক সরকারের সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয়। ইয়াহিয়া খানের শাসনের প্রতি শুধু দেশের ১৯

শতাংশেরও কম মুসলিম লীগ, কট্টরপন্থি জামায়াতে ইসলামী ও নিজামী ই ইসলাম-এর লোকজনের আনুগত্য রয়েছে। তাদের মধ্যে মাত্র শতকরা পাঁচজন বাঙালি, তবে অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়ের জন্য দেশভাগের সময় পূর্ব বাংলায় আসা বিহারি ও পাঞ্জাবি মুসলমানরা মূলসংখ্যা।

বাঙালি মুসলমান জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাঙালি হিন্দুদের আশ্রয় দেওয়ার উদাহরণ পাওয়া যায়। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন ঘটনা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে ফিরে যাওয়ার জন্য সহায়ক নয়, তবে শেখ মুজিব সাড়ে ছয় কোটি মুসলমান ও এক কোটি হিন্দুদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস স্থাপনে সক্ষম হয়েছিলেন। তার ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব ও উদারনীতির কারণে বাঙালি হিন্দুরা ব্যাপকভাবে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে। সামরিক শাসক দ্বারা বাস্তবায়িত না হওয়া প্রাদেশিক পরিষদের জন্য আওয়ামী লীগের অধীনে এগারোজন বাঙালি হিন্দু নির্বাচিত হন।

পূর্ব বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের জেলা পাবনার জেলা প্রশাসক, কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের অর্থনীতির গ্র্যাজুয়েট, নূরুল কাদের বলেন, 'বাঙালি হিন্দুদের জন্য এর চেয়েও আশাপ্রদ ব্যাপার ছিল। ডিসেম্বরের নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বে একজন বাঙালি হিন্দু পূর্ব বাংলা ছেড়ে ভারতে যাওয়ার জন্য তার জমিজমা বিক্রি করার ব্যাপারে প্রস্তুত হন, কিন্তু শেখ মুজিব যখন তার ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করেন তখন লোকটি দেশে থেকে যান।' নূরুল কাদের এখন স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের এক সচিবালয় সংগঠিত করার কাজে ব্যস্ত। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন যে, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে পুনরায় মতৈক্যের কোনো সম্ভাবনা নেই। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ও সমরনায়কদের দ্বারা আক্রমণ, হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ বাঙালি মনে গভীরভাবে বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছে। এসব অপরাধের সঙ্গে ব্যাপকমাত্রায় যুক্ত হয়েছে যৌন হয়রানিও। নূরুল কাদের জানান, 'এমনকি উচ্চ-মধ্যবিত্তের মেয়েদের ক্যান্টনমেন্টে বন্দি করে রাখা হচ্ছে।'

স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা একজন দাড়িওয়ালা ট্রাভেল এজেন্ট যুবক জানায়, 'সেনাবাহিনীর আক্রমণের পূর্বে মাত্র ১৫ ভাগ মানুষ স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিল, এখন মাত্র ১৫ ভাগ মানুষ পাকিস্তানের সঙ্গে কোনোপ্রকার সম্পর্ক রাখার পক্ষে।' যদি অখণ্ডিত পাকিস্তানের আর কোনো সম্ভাবনা না থাকে তাহলে পূর্ব বাংলার ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য প্রচুর সময় লাগবে।

স্বতঃস্ফূর্ত, বিচ্ছিন্ন, অতিমাত্রায় আশাবাদী এবং আবেগপ্রবণ তাড়না থেকে ও 'অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন'-এর মাধ্যমে পরিচালিত হয় বাঙালির প্রথম প্রতিবাদ–স্বাধিকার আন্দোলন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও সমরনায়কদের ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করে শক্তি দ্বারা পূর্ব বাংলার সঙ্কটকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। তারা ভেবেছিল যে, ব্রিটিশের নিষ্ঠুর দমন নীতি অবলম্বন করে পাঞ্জাব ও





উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের জঙ্গি সৈন্য ও অফিসারদের ব্যবহার করে বাঙালির 'বাংলাদেশ আন্দোলন'কে মোকাবেলা করবে, কিন্তু বাস্তবে তা ব্যর্থ হয়। তাই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও সমরনায়করা দ্বিতীয় পর্বের অভিযান শুরু করলে একে প্রতিরোধ করতে বাঙালি মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস ও পুলিশ বাহিনীর ২০ হাজার সৈনিক মুক্তিবাহিনীর একক নেতৃত্বের অধীনে কাজ করছে। আট হাজার কিশোর ও তরুণ মুক্তিযুদ্ধের জন্য ট্রেনিং নিচ্ছে। মুক্তিবাহিনী ঘাতক ও দালালদের খতম করার জন্য 'কিলার স্কোয়াড' গঠন করেছে। একজন বাঙালি নেতা বলেন, 'সাফল্যের জন্য আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, আমরা আমাদের কাজ করে যাচ্ছি।' তিনি পূর্ব বাংলার জন্য কোনো বিদেশি অর্থ সাহায্য চাইতে নারাজ, কারণ পাকিস্তান থেকে ২,৫০০ মাইল পাড়ি দিয়ে পূর্ব বাংলায় অবস্থানরত চার ডিভিশন পাকিস্তানি সৈন্যদের জন্য প্রতিদিন এক কোটি রুপি ব্যয় করে ৩০০ টন সরবরাহ আনানো হচ্ছে, পাকিস্তানের জন্য বিদেশি অর্থ সাহায্য না চাইলে পাকিস্তানের ওপর অর্থনৈতিক চাপ নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পাবে এবং এতে পাকিস্তানি সৈন্যদের শক্তি কমে যাবে।

মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছে, কারণ প্রতিবাদ-প্রতিরোধ শুধুমাত্র পূর্ব বাংলায় আর সীমাবদ্ধ নেই, পাকিস্তানেও ছড়িয়ে পড়েছে, বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বিশিষ্ট পাঠান নেতা ওয়ালি খানের কথা উল্লেখ করা যায়। অন্যদিকে ভুট্টো বলেন, 'রাজনৈতিক সমস্যা রাজনীতিবিদদেরই সন্ধান করতে হবে।' তিনি শীঘ্রই রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলেন। আর পাকিস্তানের কুখ্যাত একুশটি ধনী পরিবারের লোকজন ঠিকই বুঝতে পারছে যে, পূর্ব বাংলার বাজার হারিয়ে ফেলার পরিণতি কী রকম ভয়াবহ হবে। ইয়াহিয়া খানও বুঝতে সক্ষম যে, পাকিস্তানের প্রভাবশালী শাসকগোষ্ঠী ও সমরনায়করা পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় সঙ্কট আরও কঠোর হয়েছে। রাষ্ট্রপতি হয়তো দমননীতির চূড়ান্ত পর্যায় পেরিয়ে এসেছেন। বাঙালি উদীয়মান রাজনৈতিক শক্তি এক সময় যে সমাধানের কথা বলেছিল, ইয়াহিয়ার কার্যকলাপ দেখে মনে হচ্ছে তিনি সেদিকেই অগ্রসর হচ্ছেন। কিন্তু বাস্তব হচ্ছে অন্যরকম। বাঙালি এখন আর সেকথা মানতে নারাজ, কারণ তারা চায় পূর্ণ স্বাধীনতা।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে এবং বাঙালি হিন্দুদের ব্যাপকভাবে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করে বাংলাদেশকে একটি মুসলমান রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে। আর দুঃখজনক হলেও সত্য যে, যেসব হিন্দু কয়েক বছর আগে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল তারা বাংলাদেশের জন্য কোনোরকম সহযোগিতা করতে রাজি নয়, বরং সাহায্য প্রদানে নারাজই।

২ আগস্ট ১৯৭১। 'বাঙালির অশ্রু' শীর্ষক শিরোনামে 'টাইম' ম্যাগাজিন লিখে–

নদী, সড়ক, জঙ্গলের পর জঙ্গল ভেঙে অফুরন্ত অসংগঠিত পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠী মাথায় টিনের কেতলি, কাগজের বাক্স ও ছেঁড়া কাপড়ের স্তূপ নিয়ে অসুস্থ বাচ্চা ও বৃদ্ধকে বহন করতে করতে, রক্তক্ষরণের মতো ভারতে প্রবেশ করার জন্য ছুটছে। তারা ছুটছে খালি পায়ে, তবে তাদের পা জল ও কাদার দখলে। থেমে থেমে বাচ্চার কান্না শোনা গেলেও ছুটে চলা মানুষগুলো নিশ্চুপ, কিন্তু তাদের আঘাতের চিহ্ন বহনকারী চেহারা গল্প বলে যাচ্ছে। অনেকেই অসুস্থ। অনেকে আবার কলেরায় আক্রান্ত। কেউ কেউ রাস্তায় মারা যাচ্ছে, তবে তাদের কবর দেওয়ার জন্য কাউকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। হিন্দুরা সম্ভব হলে এক টুকরো জ্বলন্ত কয়লা মৃত-ব্যক্তির মুখে চাপিয়ে দাহকর্মটি সম্পন্ন করার চেষ্টা করে। কুকুর, চিল, শকুন ও কাক বাকি কাজটা সেরে নেয়। শরণার্থীরা যখন মৃতদেহগুলো অতিক্রম করে ছুটে চলে তখন এক টুকরো কাপড় তাদের নাকে জড়িয়ে নেয়।

শরণার্থীদের জন্য ছুটে চলা পথ যেন শেষ হয় না। তারা দিনরাত ছুটে চলেছে, তবুও ভারত যেন তাদের নাগালের বাইরে। চার মাস ধরে পূর্ব বাংলা ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ চলছে। শরণার্থীরা স্রোতের মতো প্রবাহিত হচ্ছে ভারতের উদ্দেশ্যে। তাদের সংখ্যা গোনা অসম্ভব। শরণার্থী কেন্দ্রগুলোর নিবন্ধন অভিক্ষিপ্ত করে ভারতের কর্মকর্তারা বলেন, 'প্রতিদিন ৫০ হাজার করে শরণার্থীরা ভারতে প্রবেশ করছে। বেসরকারি হিসাব অনুযায়ী ৭.৫ লক্ষ। পূর্ব বাংলায় যদি দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, যার সম্ভাবনা আছে তাহলে শরণার্থীর সংখ্যা ১৪ লক্ষে পৌঁছবে।

হাজার হাজার বাঙালি এখনও খাদ্য ও আশ্রয় ছাড়া উদ্দেশ্যহীনভাবে গ্রাম-বাংলার আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সীমান্ত এলাকায় কেউ কেউ ঘুমানোর জন্য স্কুলে আশ্রয় নিচ্ছে, অন্যরা উন্মুক্ত আকাশের নিচে, গাছের তলায় বা গ্রামবাসীদের ঘরে মাথা পেতে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করে। আর যারা শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে তাদের বেশির ভাগই কৃষক। তাদের দেওয়া হয়েছে রেশন কার্ড। যেনতেনভাবে তৈরি করা ছনের বা প্লাস্টিক ছাউনিওয়ালা বাঁশের ছাপটায় তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদিও কেউ উপোসী নয়, তবুও খাদ্যের অভাব অনেক, বিশেষ করে দুধ ও বাচ্চাদের খাবারের জন্য।

বর্ষার বর্ষণে শরণার্থীদের জীবন আরও দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। শরণার্থী শিবিরগুলো যেন কাদার উপ্রহ্রদ। ডা. ম্যাথিস ব্রোম্বারগার কলকাতার এক শরণার্থী শিবিরের চিকিৎসক বলেন, 'হাজার হাজার শরণার্থী উন্মুক্ত আকাশের নিচে জলে ভিজে রাত কাটায়। কোলে বাচ্চা নিয়ে নারীরা মাদুলে শরীর এলিয়ে দিতে চাইলেও পারছে না; কারণ জল তাদের হাঁটু পর্যন্ত, রাতযাপন করার জন্য মাথা গোঁজার স্থানের অভাব। সকালে দেখা যায় অনেকেই অসুস্থ, আবার কেউ কেউ ফুসফুসপ্রদাহে মৃত্যুবরণ করছে। গুরুতর কলেরায় আক্রান্ত রোগীদের জন্য হাসপাতালে নেওয়া সম্ভব নয়। মৃতদেহগুলো সরানোও অসম্ভব। সেগুলো এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, অথবা জলে ভিজছে।' প্রচণ্ড কর্মশক্তিওয়ালা সিরিঞ্জগুলো টিকা দেওয়ার গতি বৃদ্ধি করে এবং কলেরার হুমকি





থেকে প্রাণ রক্ষা করতে সাহায্য করে, কিন্তু শিবিরের চিকিৎসকদের হিসাব অনুযায়ী পাঁচ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। প্রায় ৩৫ হাজার মানুষ কলেরায় আক্রান্ত। দুর্বল শরীরের শরণার্থীরা ফুসফুস প্রদাহে, ডিফথিরিয়ায় ও যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হওয়ার অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। ডা. ম্যাথিস ব্রোম্বারগার আরও বলেন, 'মানুষগুলো আর অশ্রু ফেলতে সাহস পায় না।'

হয়তো বা তারা যে স্থান থেকে পালিয়ে এসেছে তা আরও ভয়ঙ্কর। প্রত্যেকেরই বলা অনেক কাহিনি আছে; নিজেদের বিভীষিকাময় জীবনের পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দ্বারা সংগঠিত ধর্ষণের, হত্যার, অত্যাচারের গল্প। একজন দম্পতি বলেন, 'পাকিস্তানি সেনারা তাদের দুই ছেলেকে বাড়ির বাইরে নিয়ে গিয়ে বেয়নেট দিয়ে পাকস্থলি ছিন্নভিন্ন করে দেয়। কেউ ছেলেদের কাছে যেতে চাইলে তাদের হুমকি দেয় হত্যা করার। কয়েক ঘণ্টা পর, বিনা চিকিৎসায় ছেলে দুটো মারা যায়।' আরেকজন বলেন, 'পাকিস্তানি সেনাদের আগমনের ইঙ্গিতে আমি আমার সন্তানদের নিজের বিছানার নিচে লুকিয়ে রাখি। কিন্তু সেনারা ঘরে প্রবেশ করে গুলি ছুঁড়তে থাকে। এতে আমার দুই সন্তান নিহত ও একজন আহত হয়।

২১ জুন ১৯৭১। 'বাঙালি শরণার্থী : মাত্রাছাড়া দুর্দশা' শীর্ষক শিরোনামে 'টাইম ম্যাগাজিন' লিখে–

A CYCLONE that killed as many as 500,000 people. A civil war that claimed perhaps 200,000 morfe. An exodus that already totals 5,00,000 and is still growing. A cholera epidemic that has barely begun, yet has already taken some 5,000 lives. It is an almost biblical catalogue of woe., rivaling if not surpassing the plagues visited upon the Egyptians of Mosaic days. And yet it is virtually certain that the list will grow even longer for the bedeviled people of East Pakistan. Last week, as fresh waves of refugees poured across the Indian border at the rate f 100,000 a day, they brought tales of pogrom against Hindus by the predominantly Moslem Pakistanis. And over the stinking, teeming refugee camps that scar the border areas of live Indian states hovered the growing threat of famine and pestilence.

The first onrush of refugees followed the outburst of civil war in March, when West Pakistan decided to crush East Pakistan's drive for Bangla Desh (an independent Bengal State). Immediately after fighting broke out between the fierce Pathans and Punjabis of the Pakistani army and the Bengali liberation forces, 1,500,000 terrified East Pakistanis- Moslems and Hindus alike- crossed into the Indian states of West Bengal, Tripura, Assam, Meghalaya and Bihar. Now thje escapees are mostly Hindu and they bring tales of

torture, rape and massacre. According to the new arrivals, the Pakistani government is blaming the 10 million Hindus of East Pakistan (population 78 million) for being the principal supporters of the now-outlawed Awami League of Sheik Mujibur Rahman. The Hindus did in fact overwhelmingly support 'Mujib', who at last word was under house arrest in Karachi, the principal city of West Pakistan. But so did the Moslems, for the Awami League won 167 of the 169 seats at stake in East Pakistan during last Decembers elections. But the Hindus, because they are a minority, are an easier target.

Battered to Death. A Hindu building contractor told of how Pakistani troops at a tea estate asked people whom they voted for in the election. 'They shot 200 who admitted voting for the Awami League'. In a hospital in Agartala, Indian doctors reported that a number of the refugees came in badly burned. The doctors explained that the refugees were showed into huts by Pak army men, who9 then set the huts on fire. The hospital has also treated 370 men, women and children for bullet wounds, 27 of whom died.

In the refugee camp at Patrapole on the West Bengal-East Pakistan border, a 17 years old Bengali girl racalled how she and her parents were in bed 'when we heard the tread of feet outside. The door burst open and several soldiers entered. They pointed their bayonets at the three of us and before my eyes killed myh mother and father- battering them to death with the butts of their rifles. They flung me on the floor and three of them raped me.' Another teen-age girl in a Tripura camp told how she was raped by 13 West Pakistani soldiers before escping. Other girls have reportedly been taken from fleeing families to be sold as prostitutes to the soldiers, Particularly if their fathers could not pay a ransom for them.

According to an official who has toured the border. Pakistani troops and their anti-Hindu supporters are demanding $140 a person before letting family members leave East Pakistan. Lacking only $25 of the ransom for his wife, one man pleaded 'Beat me for the rest.' They let his wife go after he was beaten on the temple with a bamboo stick until he lost an eye.

Those who manage to escape could be models for Goya's Disasters of War. The lucky ones get into already overfilled tent camps that reek of caustic soda disinfectant and human excrement





and are ankle deep in fifthy water from the first monsoons. Most huddle under trees or bushes trying to avoid the heavy rains. Some find cramped quarters on the verandas of now closed schoolhouses. Others near Calcutta have found large open drainpipes to live in. Around them is always the stench of garbage, polluted water, sickness and death.

Token Cremation. The polluted drinking weater, the lack of sanitation and the officials inability to inoculate the millions of refugees have contributed to the spread of cholera, particularly i8n West Bengal. A bacterial disease common to India and Pakistan, cholera causes severe vfomitin and diarihea, which bring dehydration and death. Those afficted can usually be saved by replenishing the bodily fluids through intgravenous injections or drinking large doses of a solu8tion of saits, baking soda and glucose. But the flood of refugees is just too great to be handled by beleaguered medical teams.

The roads the refugees travel are littered not only with clothes and discarded household goods, but with bodies of cholera victims left by those too frightened of the disease to bury their own dead. Although Hidus practice cremation, many of the bodies are merely singed with two burning swticks and then left for the hovering vultures or wild dogs to pick apart. Even when the corpses are buried, they ar often dug up by camon eaters. Police have their hands full trying to prevent refugees from tossing corpses into the fivers. In the overcrowded hospitals, the sick and dying are jammed together on the floor and the dead continue to lie among the living for hours before the overworked hospital staffs can cart the bodies off.

At one of West Bengal's overflowing health centers, a 45 year old rice farmer watched his infant son continue to suckle after his mother had died of cholera. 'My wife is dead.' the man said numbly. 'three of my children are dead. What else can happen?' With the refugges spreading through the Indian states, carrying the disease wiht them, the epidemic could rapidly afflict hundreds of thousands of Indians. For this reason, Indian authorities are trying to prevent the East Pakistanis from entering Calcutta, where uncounted millions already live on the streets in squalid conditions that guarantee an annual cholera epidemic there.

Unbalanced Exchange. While India has temporarily accepted the refugees and is doing its best to help them, the government of India Candhi sees only economic and political disaster in the massive influx of impoverished peoples. The refugee problem has chronically troubled India since theAugust 1947 partition of the subcontinent into India and Pakistan. In northern India there was a fairly blanced exchange, with 6,000,000 Moslems fleeing to Pakistan and 6,500,000 Hindus and Sikhs entering India. But since partition, 4,300,000 Hindus from East Pakistan have fled to India, for the most part into West Bengal. There has been no comparable flight of Moslems. This imbalance has created the social, political and ecoomic problems that have plagued the state and turned its capital, Calcutta, into a sinkhole of human misery.

The cost of feeding and attempting to house the refugees is currently $1,330,00 a day- an expense that Mrs. Gandhi's government can ill afford if it is going to fulfill the campaign promise of garibi hatao (eradicate poverty) made last March. The food required by the refugees is rapidly depleting existing food stockpiles and threatens to create a famine for the Indians themselves. The refugees are also taking work away from the Indians, in West Bengal, refugee peasants are hiring out as agricultural labor for a quarter of the wages local labor is paid.

No Room. Faced with these problems, the Indian government calls the refugees 'evacuees' of 'escapees' and hopes for their return to their homeland. 'Being a poor country ourselves,' Mrs. Gandhi told refugees at a camp in eastern India, 'we cannot afford to keep youhere forever. even if we wished to do so.' Their return to their homeland is not likely in the foreseeably future, with the pogrom under way in East Pakistan and the probability of a protracted guerrilla war there. Moreover, because of the war and the exodus, the planting of crops in East Pakistan was at a disastrously low level before the rains began. Famine is almost certain to strike and when it does millions more will pack their modest belongings and seek refugee in a country that has no room for them.



অষ্টম অধ্যায়

# বাঙালি পিতা

গোবিন্দ চন্দ্র মণ্ডল ভুলে গেছেন কে তাকে প্রথম সংবাদ দিয়েছিল যে, দেশে ফিরে আসার জন্যে, সরকারি আহ্বানই হয়তো হবে, অবশ্য সরকারি আহ্বানের কথার প্রমাণ পাওয়া যায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে লেখা ইয়াহিয়া খানের একটি পত্রে। এর ওপর তখন ভিটেমাটির আকর্ষণ গোবিন্দ চন্দ্র মণ্ডলের অন্তরে এত প্রবল ছিল যে, আগপিছ কিছু না ভেবেই জীবনের একমাত্র সম্বল তার কিশোরী মেয়েটির হাত ধরে সীমান্ত অতিক্রম করে পা দেন বাংলাদেশে। এ সময়ের মানসিক অবস্থায় তিনি আর কিই-বা করতে পারেন। কামুক পাঞ্জাবি পাঠানের যৌন আক্রমণের শিকার তার স্ত্রী সাবিত্রীকে রক্ষার জন্যে পালিয়ে আসেন ভারতে। কিন্তু শেষ আর রক্ষা হলো কই। হঠাৎ করে 'লাখ লাখ মানুষ' যদি পার্শ্ববর্তী দেশে বাঁচার জন্যে চলে আসে তাহলে সে দেশের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলো হয়ে ওঠে–খাদ্য, বাসস্থান, স্যানিটেশন আর স্বাস্থ্য। তখন এসব মোকাবেলা করা সে দেশের পক্ষে একা সম্ভব হয় না। এসব সামাল দিতে ভারত সরকার ইউনাইটেড ন্যাশনের কাছে আবেদন জানায়। স্বদেশে কালান্তক ইয়াহিয়া বাহিনী ও তাদের দেমড়া রাজাকার থেকে অব্যাহিত পেলেও ভারতের শরণার্থী শিবিরের সমস্যা থেকে রক্ষা পাওয়া সহজ নয়। এর সঙ্গে তো আছে অনাহার ক্লিষ্ট মানুষের ভিড়।

পাকিস্তানের যুদ্ধের ভয়াবহতার দুঃস্বপ্ন থেকে কেউ কী রক্ষা পেয়েছে! মিলিয়ন বাঙালিকে হত্যা করেছে পাক হানাদার বাহিনী, পশুতুল্য তাচ্ছিল্যভরে, বিজাতীয় বিতৃষ্ণায়। পরিকল্পিতভাবে একটি জাতিকে হত্যা করার ঘটনা প্রবাহ অনুমানে বলা যায় যে, এ যেন জার্মানির রাজধানী বনকে মানচিত্র থেকে মুছে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা বা লন্ডন শহরবাসীকে হঠাৎ গৃহহীন করে বিতাড়িত করার ব্যবস্থা। যুদ্ধ-বিগ্রহ-বিধ্বস্ত পৃথিবীতে হত্যা-অত্যাচার নিত্য অবলোকন করেও বাঙালি হত্যাযজ্ঞের মতো ব্যাপক মর্মান্তিক ঘটনা অন্তরকে ব্যথাতুর করে তুলে সহ্যাতীতরূপে। নাজি নৃশংসতার চেয়ে নিষ্ঠুরভাবে দানবীয় কর্মকাণ্ডে একটি জাতিকে ভীত বিহ্বল করে তোলার এমন ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালি জনসাধারণকে নির্বিচারে হত্যা করার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আদিম অসভ্য যুগেও বিরল ছিল। ইয়াহিয়া সরকার স্বাধীনতাকামী জনগণকে বাংলাদেশ থেকে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে তার সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দেয়, বিশেষ করে হিন্দু এবং আওয়ামী লীগের সমর্থকদের ওপর; আর সেই নির্মম অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দলে দলে সীমান্ত অতিক্রম করে আশ্রয় নিতে থাকে। হাজার হাজার নৃশংস হত্যায় কোশ-সন্তপ্ত আত্মীয়স্বজন, ধর্ষিতার ভীত মর্মাহত পরিবার পরিজন, নির্দোষ গ্রামবাসী তাদের শিশু সন্তান, বৃদ্ধ পিতামাতাকে নিয়ে প্রাণের ভয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, বন থেকে জঙ্গলে

আত্মগোপন করা যখন সম্ভব নয় তখন অনিদ্রায় অনাহারে কালাজরের রোগীর মতো দেহকে টেনে টেনে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে পৌঁছে ভারতে। গোবিন্দ চন্দ্র মণ্ডলও এদের সঙ্গী হন। শরণার্থী কেন্দ্রে পৌঁছে তিনি দেখেন, একটি কিশোরী তিন চার বছরের তার শিশু পুত্রকে কোলে নিয়ে বসে আছে বৃষ্টিভেজা ঘাসে। ছেলেটির পেট বেরিয়ে গেছে বিসদৃশ্যভাবে। পাটকাঠির মতো পা দুটো যেন ফুলে পিলার। পুরুষের আঙুলের চেয়ে পুরু নয় তার বাহুকে চোলে খেয়েছে রাহু। শুঁটকি মাছ মাখা ভাত দুটো মুখে দেওয়ার জন্য মা তার পুত্রকে সাধাসাধি করছে, অনেকক্ষণ ধরে। অবশেষে খাবার মুখে নেয় শিশুটি। বার কয়েকবার তারপর ক্ষীণ অষ্ঠাধারে নড়াচড়া করে, তারপর উগলে ফেলে দেয় খাবার, যা খেয়েছিল সবটুকু, আর সেই সঙ্গে বেড়িয়ে আসে শিশুটির শেষ নিঃশ্বাস। এক সময় এহেন অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ভারতের শরণার্থী শিবিরে কলেরা মহামারী আকারে আঘাত হানে।

বাংলাদেশে পাকিস্তানি জল্লাদের শাসনে মৃত্যু আসে রুদ্র বেশে, কালাপাহাড় আকৃতিতে; আর সীমান্ত পেরিয়ে শরণার্থী শিবিরে আসে বন্ধু বেশে 'শ্যামসম' ফেরেশতার আকৃতিতে, এই যা পার্থক্য। গোবিন্দ চন্দ্রের স্ত্রী, তার সন্তানের জননী, সাবিত্রীকে শত চেষ্টা করেও তিনি রক্ষা করতে পারেননি। সাবিত্রীকে হয়তো বাঁচানো যেত যদি পূর্ব বাংলার কোনো এক অংশকে মুক্ত করে এবং স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে সার্বভৌমত্বের মর্যাদাসহ প্রতিষ্ঠিত করে শরণার্থীদের সেখানে স্থানান্তরিত করা হতো।

গোবিন্দ চন্দ্র মণ্ডল তার স্ত্রীর গঙ্গা প্রাপ্তির পর কিশোরী কন্যাকে নিয়ে স্বদেশে ফিরে এলেন। বর্ষা ডোবা রাস্তা। শস্যহীন মাঠ। পাক হানাদার বাহিনীর নির্যাতনের নিদর্শন। ধ্বংস স্তূপে পরিণত গ্রামের পর গ্রাম অতিক্রম করে অবশেষে পৌঁছেন তিনি নিজ গ্রামে। গ্রামে ঢোকার পথে শ্মশান সদৃশ্য, নীরবতা তাকে ঘাবরিয়ে দেয়।

দিবসের কর্মকাণ্ডে মুক্তিযোদ্ধাদের একাধিক সফলতার সাক্ষী সূর্যদেব স্মিত মুখে পশ্চিমাংশে হেলান পড়েছেন। 'কালাচাঁদ' গাছটিকে প্রণাম করে পশ্চিম মুখো হয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই চমকে উঠলেন, গোবিন্দ চন্দ্র মণ্ডল। রাস্তার বাঁকে সশস্ত্র পাঞ্জাবি সৈন্য চারজন দাঁড়িয়ে আছে। শ্রীকৃষ্ণপুরের অপারেশন থেকে সবেমাত্র ফিরেছে তারা। তাদের আঁখিভরা রক্তের পিপাসা। গোবিন্দ চন্দ্র মন্ডলের পথ রুখে দাঁড়িয়ে তারা। ভীত মেয়েটি বাবার একপাশে। বাহুলগ্ন হয়ে সে যতই চেষ্টা করছে নিজের দেহকে আড়াল করতে ততই তার বন্ধনকে লালিমা লিপ্ত করে চলেছে অস্তগামী রবি-রশ্মি। এতে চার বন্দুকধারী সৈন্যরা হাঁভাতের মতো গিলতে লাগল পথ-ক্লান্ত কিশোরীর ঘর্মাক্ত কলেবরে সৌন্দর্য সির্কা। পশুপ্রবৃত্তিতে তাড়িত রাক্ষস সেনারা বাবার আশ্রয় থেকে মেয়েটিকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল 'কালাচাঁদ' গাছের পিছনে। দুহাতে মুখ ঢেকে চিৎকার করে উঠলেন হতভাগ্য পিতা। তার আর্তনাদে নির্লিপ্ত বিধাতার অন্তঃকরণে করুণার উদ্রেক হলো কিনা তা বোঝার আগেই তার কর্ণবিদীর্ণ করে চলল মেয়েটির বুকফাটা ক্রন্দন। ক্ষোভে-দুঃখে আত্মগ্লানিতে দিশেহারা পিতা দৌড়ে গেলেন ধর্ষণ উদ্যত সিপাইয়ের পায়ের কাছে। তার পা জড়িয়ে ধরলেন তিনি দু'হাতে। কণ্ঠে তার বাষ্পরুদ্ধ মিনতি। কিন্তু হারামী সৈন্যটি পদাঘাতে পিতাকে ছুড়ে ফেলে দিল নর্দমায়। অসহায় বাঙালি পিতা। আত্মাধিক্কার তাড়িয়ে, মৃত্যুর ভয়কে তিরস্কারে





ঝাটা মেরে তার ধূতির খুঁটে রাখা ছোট একটি চাকু হাতের মুঠোয় নিয়ে ক্ষেপা পিতা এক নিমিষে দৌড়ে গিয়ে কামমত্ত ষাঁড়ের লিঙ্গটি একটানে কেটে দিয়ে ছুটলেন। তার কণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগল অট্টহাসি। কেঁপে উঠল বাংলার বিষণ্ন বাতাস। প্রতিধ্বনিত প্রকৃতি রোষাবিষ্টা হলো। প্রতিশোধ স্পৃহা জাগিয়ে দিল শতাব্দীর সুপ্ত ভীতু বাঙালি পিতার চরিত্রে।

**মথিপত্র**

৯১ জুলাই ১৯৭১। পাকিস্তানি বর্বর সৈন্যদের ভয়ে ১৫০ হাজার বাঙালি বাড়িঘর ছেড়ে পাড়ি জমায় ত্রিপুরায়। ২২ জুলাই ১৯৭১। কুড়ি হাজার বাঙালি মুসলমান ভারতের আগরতলা থেকে ১৯ মাইল দূরে অবস্থিত কুনতলা ক্যাম্পে এসে উপস্থিত হয়।

১ আগস্ট ১৯৭১। 'বিটলস'-এর জর্জ হ্যারিসন ও বিশ্ববিখ্যাত বাঙালি সেতারবাদক পণ্ডিত রবি শংকর বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্যে নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসিন স্কোয়ার গার্ডেনে 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'-এর আয়োজন করে। ৪০ হাজার শ্রোতা দর্শক এই অনুষ্ঠানে সমবেত হন। অনুষ্ঠানটি শুরু হয় পন্ডিত রবি শংকরের একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিয়ে। এই অনুষ্ঠানের জন্য তিনি সৃষ্টি করেন একটি নতুন ধুন- 'বাংলাদেশ ধুন'। তার সঙ্গে তবলায় সঙ্গীত করেন ওস্তাদ আলী আকবর খান। তারপর ছয়টি গান নিয়ে হাজির হন বব ডিলান। শেষ গানটি পরিবেশন করেন জর্জ হ্যারিসন। সরচিত গানটি হচ্ছে- 'দু'চোখে দুঃখ নিয়ে বন্ধু এলো কাছে, সাহায্য চাই, দেশ বুঝি যায় ভেসে/যদিও অনুভব করতে পারিনি তার দুঃখ/ তবু জানতাম আমার আছে প্রয়াসের প্রয়োজন।' 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' অনুষ্ঠানটি থেকে উদ্যোক্তারা ২,৪৩,৪১৮,৫০ ডলার সংগ্রহ করে ইউনিসেফের 'বাংলাদেশ শিশু সাহায্য তহবিল'-এ প্রদান করেন। পরে এই অনুষ্ঠানের গান ও কথাসহ ৪০টি মাইক্রোফোন দ্বারা রেকর্ড করা তিনটি লংপ্লে এর একটি বড় এ্যালবাম প্রকাশ করা হয়। একইদিন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বিলেতের ট্রাফালগার স্কোয়ারে সর্ববৃহৎ জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

২৪ নভেম্বর ১৯৭১। শরণার্থীদের সাহায্যার্থে বোম্বের বিখ্যাত ব্রাবোর্ণ স্টেডিয়ামে 'ফিল্ম স্টার নাইট' অনুষ্ঠিত হয়। এতে মহানায়ক দিলীপ কুমার (ইউসুফ খান) ও তার স্ত্রী নায়িকা সায়রা বানু বিশেষ ভূমিকা রাখেন।

# জিন্দাবাদ ও পাকিস্তান

**পাক-শক্তি**

১৯৭১-এর যুদ্ধ শুরু করার অনেক আগেই পাকিস্তান তার আগ্রাসনমূলক রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নের জন্য পরিস্থিতি ও পরিবেশ গড়ে তুলে। পাকিস্তানের শাসক সমরগোষ্ঠী জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল করার অজুহাতে নিজের স্বার্থে মানববিদ্বেষী ভাবাদর্শের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলায় 'স্বাভাবিক অবস্থা' ফিরিয়ে এনে 'নতুন ব্যবস্থা' গড়ার জন্য প্রয়াসী হয়ে ওঠে। বাঙালি জাতির প্রতি বিদ্বেষ প্রচার করে, নির্বাচিত বাঙালি গণপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে কঠোর নির্যাতন চালিয়ে, নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য 'বিচ্ছিন্নবাদী আন্দোলন' দমনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ও সমরনায়করা। মার্চ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের শাসক সমরগোষ্ঠী ও পাকিস্তানপন্থিরা বাঙালির ওপর অত্যাচার, সর্ব রকম গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা ধ্বংস করে পাকিস্তানের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে পাগলের মতো সশস্ত্রীকরণ ও আক্রমণাভিযানের আয়োজন করে; তবে এর আগেই বাঙালিরা পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী ও সমরনায়কদের কাছে পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানায়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও সমরনায়করা সর্বশক্তি দিয়ে পাকিস্তানের আধিপত্য রক্ষার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি নেয়। সমরবাদী পাকিস্তান তার সক্রিয় শক্তি ও সহায়ক শক্তিকে সংগঠন এবং অস্ত্রসজ্জিতকরণের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করে তার আগ্রাসনমূলক পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়িত করতে থাকে। পূর্ব বাংলাকে দখলের লক্ষ্যে তারা কেবল সামরিকই নয়, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ওপরও জোর আরোপ করে। ফলে আমেরিকা, চীন, শ্রীলঙ্কা, আলবেনিয়া, আলজেরিয়া, জর্দান, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, কুয়েত, সুদান, তুরস্ক প্রভৃতি বিদেশি শক্তির সহযোগিতা পাওয়ার স্বীকৃতি আদায় করে।

প্রথমে পাকিস্তানের (এক) সক্রিয় শক্তি ও (দুই) সহায়ক শক্তি নিয়ে আলোকপাত করা বাঞ্ছনীয়।

**এক. সক্রিয় শক্তি**

পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ও সমরনায়করা বাঙালি জাতিবিরোধী নীতি অনুসরণ করে, বাঙালির বিপ্লবের ভয়ে পূর্ব বাংলাকে ধ্বংস করার চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সমরনায়করা আধুনিক যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য পাকিস্তানের সক্রিয় শক্তিকে তিন ভাগে ভাগ করে (ক) সমরবাহিনী, (খ) 'মালিক'-মন্ত্রিসভা ও (গ) আধা সামরিক বাহিনী।

**(ক) পাকিস্তান সমরবাহিনী**

যুদ্ধের প্রাথমিক পর্বের আগেই সমরবাহিনীর সতর্কতা ও যুদ্ধ প্রস্তুতির মাত্রা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম চালানো হয়। স্থল-জল-বিমানপথে আধিপত্য লাভ করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান সমরবাহিনী সর্বাধিক শক্তি ও সঙ্গতি নিয়োগ করে। গঠিত হয় সেনাবাহিনীর ৬৯,০৮২, নৌবাহিনী ১,৪১৩ ও বিমানবাহিনীর ১,১৪১ সদস্য নিয়ে পাকিস্তান সমরবাহিনী। যুদ্ধের প্রাথমিক পর্বে, সামরিক ক্রিয়াকলাপের জন্য সমরবাহিনীর উপযুক্ত





প্রস্তুতি, অনুসন্ধানী কর্মকাণ্ড এবং ফৌজকে দ্রুত সমাবেশকরণ ও প্রসারণের সুব্যবস্থা গ্রহণ করে।

সমরবাহিনীর অংশ হিসেবে মার্চ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্ব বাংলার একমাত্র ঘাঁটিতে, পাকিস্তানি সেনাদের প্রাধান্য বজায় রেখে চারটি পদাতিক ব্রিগেড, ৫টি ফিল্ড আর্টিলারী রেজিমেন্ট, একটি হালকা এন্টি এয়ার ক্রাফট রেজিমেন্ট, একটি কমান্ডো ব্যাটালিয়ন (৩য়) নিয়ে গঠিত ১৪তম পদাতিক ডিভিশন অবস্থান নেয়। চারটি পদাতিক ব্রিগেডগুলো হচ্ছে–

১. পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার জাহানবাজ আরবাবের অধীনস্থ ঢাকার ৫৭তম ব্রিগেড।
২. পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফির অধীনস্থ কুমিল্লার ৫৩তম ব্রিগেড।
৩. পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার আবদুল্লাহ খান মালিকের অধীনস্থ রংপুরের ২৩তম বিগ্রেড।
৪. পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার এ আর দুররানির অধীনস্থ যশোরের ১০৭তম ব্রিগেড।

প্রতি ব্রিগেডে ৪টি পদাতিক ব্যাটালিয়ন, একটি ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্ট এবং সাহায্যকারী অংশ রাখা হয়। প্রতি রেজিমেন্টে পাঞ্জাব, বালুচ, পাঠান এবং সিন্ধি পাকিস্তানি ৯১৫ জন সৈন্য রাখা হয়। পূর্ব বাংলার রংপুরে অবস্থানরত ২৯তম অশ্বারোহী রেজিমেন্ট অবশ্য বাঙালি সৈন্যদের নিয়ে গঠিত একমাত্র মিশ্র জাতীয় রেজিমেন্ট। ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর)-এর প্রায় ২০ ভাগ সৈন্য হচ্ছে পাকিস্তানি; অবশ্য এর বিভিন্ন ইউনিট এবং সেনানিবাসের সাহায্যকারী সৈন্যরা মিশ্র জাতীয়, তবে বেশির ভাগ ইউনিটের ইউনিট কমান্ডার এবং উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তারা হচ্ছে পাকিস্তানি।

সমরবাহিনীর অংশ হিসেবে মার্চ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে, পাকিস্তান বিমানবাহিনীর ঢাকার বিমানঘাঁটিতে ২০টি এফ-৮৬ সাবের জেট এবং ৩টি টি-৩৩ প্রশিক্ষণ বিমান অবস্থান নেয়। বিমানবাহিনীর একটি স্কোয়াড্রনে ৪টি এমআই-৮ এবং ৪টি এলট-৩ হেলিকপ্টার রাখা হয়। সি-১৩০ হ্যারকিউলিস বিমানকে পাকিস্তান থেকে অপারেশনের জন্য ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রংপুর (লালমনিরহাট), সিলেট (সালুটি), যশোর এবং ঠাকুরগাঁওয়ের কাছে বিমানঘাঁটি স্থাপন করা হয়।

সমরবাহিনীর অংশ হিসেবে মার্চ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব বাংলায় পাকিস্তান নৌবাহিনীর চারটি গানবোট (রাজশাহী, যশোর, কুমিল্লা এবং সিলেট), একটি পেট্রোল বোট (বালাঘাট) এবং পিএনএস জাহাঙ্গীর নামের একটি ডেস্ট্রয়ার রাখা হয়। অবশ্য পিএনএস জাহাঙ্গীর নামের পতাকাবাহী জাহাজটি ২৬ মার্চের পর পূর্ব বাংলায় এসে পৌঁছে। বেশির ভাগ নৌঘাঁটি ঢাকা, চট্টগ্রাম ও মংলায় অবস্থিত।

**(খ) 'মালিক'-মন্ত্রিসভা (০৩-০৯-১৯৭১ থেকে ১৪-১২-১৯৭১ পর্যন্ত)**

গভর্নর ডা. এ এম মালিক। মন্ত্রীবর্গ-আবুল কাশেম (অর্থ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ), নওয়াজেশ আহমদ (মৎস্য ও কৃষি, কাউন্সিল মুসলিম লীগ), আব্বাস আলী খান (শিক্ষা,

জামায়াতে ইসলামী), মাওলানা এ কে এম ইউসুফ (রাজস্ব, জামায়াতে ইসলামী), এ এস এম সোলায়মান (শ্রম, কল্যাণ ও পরিবার পরিকল্পনা, জামায়াতে ইসলামী), মোহাম্মদ ইসহাক (মৌলিক গণতন্ত্র ও স্থানীয় সরকার, নেজামে ইসলাম), আখতারুদ্দিন আহমদ (বাণিজ্য, শিল্প ও আইন, কনভেনশন মুসলিম লীগ), ওবায়েদুল্লাহ মজুমদার (স্বাস্থ্য ও তথ্য, এমএনএ, আওয়ামী লীগ দলত্যাগ), অধ্যাপক শামসুল হক (সাহায্য ও পুনর্বাসন, এমপিএ, আওয়ামী লীগ দলত্যাগ), আংশু প্রু চৌধুরী (বন, সমবায়, সংখ্যালঘু), মুজিবর রহমান, জসিমুদ্দিন আহমেদ ও এ কে মোশাররফ হোসেন।

### (গ) আধা সামরিক বাহিনী

যুদ্ধের প্রাথমিক পর্বের সামরিক অসুবিধাগুলো অতিক্রমের জন্য এবং বাঙালির বিরুদ্ধে বিজয় লাভের লক্ষ্যে শক্তি বৃদ্ধিকরণের উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের সমরনায়করা আধা সামরিক বাহিনী হিসেবে একটি দৃঢ় ভিত্তি গড়ে তুলে। রাজাকার বাহিনী (সদস্য সংখ্যা ৫০ হাজার), আল বদর বাহিনী (সদস্য সংখ্যা ১০ হাজার), আল শামস বাহিনী (সদস্য সংখ্যা আড়াই হাজার), পুলিশ বাহিনী (সদস্য সংখ্যা আট হাজার), ইপিআর (সদস্য সংখ্যা ১২ হাজার) ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স (সদস্য সংখ্যা ২৪ হাজার) এর সমন্বয়ে আধা সামরিক বাহিনী গঠিত হয়।

#### রাজাকার বাহিনী

পাকিস্তান সামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদানকল্পে মে মাসে (১৯৭১) খুলনার খান জাহান আলী রোডের একটি আনসার ক্যাম্পে জামায়াতে ইসলামীর কর্মীদের নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের সহকারী আমীর মাওলানা এ কে এম ইউসুফ প্রথম 'রাজাকার বাহিনী' সৃষ্টি করে। তারা সকল প্রকার সভ্যতার পরাজয় ঘটিয়ে নারকীয় ঘটনার জন্ম দেয়। সারা বাংলাদেশে মুক্তিবাহিনীর সদস্য, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী নির্বিশেষে হত্যা করতে তারা উঠেপড়ে লেগে যায়। পরবর্তীতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 'রাজাকার বাহিনী' গঠন করা হয়। ইসলামী ছাত্র সংঘের জেলা প্রধানরা স্ব স্ব জেলায় 'রাজাকার বাহিনী'র প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হয়।

প্রথম পর্যায়ে 'রাজাকার বাহিনী' ছিল শান্তিকমিটির নেতৃত্বাধীন। তারপর জেনারেল টিক্কা খান 'রাজাকারস অর্ডিন্যান্স-১৯৭১' জারি করে আনসার বাহিনীকে 'রাজাকার বাহিনী'তে রূপান্তরিত করে, তবে এর নেতৃত্বে ছিল পাকিস্তানপন্থি স্থানীয় নেতারা। এক সময় পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত এক অধ্যাদেশে বলা হয় যে, 'রাজাকার বাহিনী'র সদস্যদের সেনাবাহিনীর সদস্যরূপে স্বীকৃতি দিতে হবে। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান সমরবাহিনীর আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে রাজাকার বাহিনী স্বাভাবিক বিলুপ্তি ঘটে। 'রাজাকার বাহিনী' সম্বন্ধে বিদেশি পত্রিকাগুলো বলে–

1. The Razakars [...] should be specialy helpful as members of rural communities, who can klentily guerrilas [freedom fighters), an





army officer (Pakistan) said. The government says, 'It has already recruted more than 22,000 Razakars of a planned force of 35,000.'

2. To help control of Bengali population, the army has been setting up a netawork of peace committees superimposed upon the normal civil administration, which the army cannot fully rely upon. Peace committee members are drawn from [...] Beharis and from the Muslim Leagues and Jamat-e-Islami. The peace committee sarve as the agent of army, informing on civil administration as well as on general populate. They are also in change of conficsatin and redistribution of shops and lands from Hindu and pro-independence Bengalis. The peace committee also recruits Razakars [...] many of them are common criminals who have thrown their lots with the (Pakistan) army.

#### আল-বদর বাহিনী

জামালপুরে জামায়াতে ইসলামী ও তাদের ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্রসংঘের উদ্যোগে 'আল-বদর বাহিনী' ২২ এপ্রিল ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয়। 'আল-বদর বাহিনী'কে মাঠ পর্যায়ে নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্বে থাকে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর। এই আধা সামারিক বাহিনীর প্রধান লক্ষ্যগুলো হচ্ছে (এক) সন্ত্রাস ও রাজনীতিক হত্যার মাধ্যমে নিরীহ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করা; (দুই) পাকিস্তান বিরোধী বুদ্ধিজীবীদের নিশ্চিহ্ন করা; (তিন) পাকিস্তান রাষ্ট্র অক্ষুণ্ন রাখার পক্ষে জনমত গড়ে তোলা; (চার) পূর্ব বাংলায় অবস্থানরত পাকিস্তান সমরবাহিনীকে সহায়তা দান করা প্রভৃতি।

এই 'আল-বদর বাহিনী' ঢাকার রায়েরবাজারে বুদ্ধিজীবীদের একত্রিত করে হত্যার সঙ্গে জড়িত হয়। ময়মনসিংহ জেলা ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি মুহাম্মদ আশরাফ হোসেইন প্রথমে এর আঞ্চলিক প্রধান পদে নিযুক্ত হয়। পরে আল-বদর বাহিনী কেন্দ্রীয়ভাবে সংগঠিত হয়। ১৬ ডিসেম্বর ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান সমরবাহিনীর আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে 'আল-বদর বাহিনী'র বিলুপ্তি ঘটে।

#### আল-শামস বাহিনী

পাকিস্তান সমরবাহিনীকে সহায়তা দানের লক্ষ্যে অতি দক্ষিণপন্থি রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী বিহারি ও অন্যান্য অবাঙালিকে নিয়ে আধা সামরিক 'আল-শামস' বাহিনী গঠিত হয়। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান সমরবাহিনীর আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে 'আল-শামস বাহিনী'র বিলুপ্তি ঘটে।

### দুই. সহায়ক-শক্তি

পূর্ব বাংলায় পাকিস্তান সক্রিয় শক্তির প্রতিকুল গতি লক্ষ্য করে পাকিস্তানি সেনাপতিমণ্ডলীরা পাকিস্তান রক্ষায় লিপ্ত হয় সহায়ক-শক্তি বৃদ্ধির কাজে। সেনাপতিমণ্ডলীরা 'রাজনৈতিক দল',

'প্রচার মাধ্যম' ও 'অবাঙালি জনগোষ্ঠী'র সহযোগিতায় গঠন করে 'শান্তি কমিটি' (সদস্য সংখ্যাপক এক লক্ষ) ও 'শান্তি ও কল্যাণ কাউন্সিল'।

**শান্তি কমিটি**

৯ এপ্রিল ১৯৭১, শুক্রবার, ঢাকায় পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখার জন্যে ১৪০ সদস্যবিশিষ্ট 'শান্তিকমিটি' গঠন করা হয়। [দৈনিক পাকিস্তান, ১১ এপ্রিল ১৯৭১]। সদর দফতর : ১১৬ বড় মগবাজার, ঢাকা-২। 'শান্তিকমিটি'কে আবার ছয়ভাগে বিভক্ত করা হয় (ক) কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটি, (খ) জেলা শান্তিকমিটি, (গ) মহকুমা শান্তিকমিটি', (ঘ) থানা শান্তিকমিটি, (ঙ) ইউনিয়ন শান্তিকমিটি ও (চ) গ্রাম শান্তিকমিটি।

১২ এপ্রিল ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে 'শান্তিকমিটি' গঠনের পর ঢাকায় ব্যাপক ঢাকঢোল বাজিয়ে এর প্রথম মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এই শোভাযাত্রার পুরোভাগে নেতৃত্ব দেয় গোলাম আযম, খান এ সবুর, পীর মহসেন উদ্দিন ও মতিউর রহমান নিজামী। মো. আলী জিন্নাহ, লিয়াকত আলী খান ও ইয়াহিয়া খানের 'বৃহৎ আকারের' ছবি মিছিলে শোভা পায়। মিছিলের শেষে গোলাম আযমের নেতৃত্বে একটি মোনাজাত পরিচালিত হয়।

কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির আহ্বায়ক হিসেবে নিযুক্ত করা হয় ঢাকার উর্দুভাষী সন্তান খাজা খয়েরুদ্দিনকে। কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির বিশিষ্ট সদস্যবৃন্দ-খাজা খয়েরুদ্দিন (পাকিস্তান মুসলিম লীগ নেতা), এ কিউ এম শফিকুল ইসলাম (এডভোকেট, লাহোর হাইকোর্ট), গোলাম আযম (জামায়াতে ইসলামীর আমীর), মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মাসুম (কেন্দ্রীয় মজলিশের সদস্য), আবদুল জব্বার খন্দর, মাহমুদ আলী (প্রতিমন্ত্রী, পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ বিষয়ক), এম এ কে রফিকুল ইসলাম, ইউসুফ আলী চৌধুরী, আবুল কাশেম, গোলাম সারওয়ার (দাওয়াতুল ইসলামের নেতা), সৈয়দ আজিজুল হক, এ এস এম সোলায়মান, পীর মোহসেন উদ্দিন, শফিকুর রহমান, মেজর (অব.) আফসার উদ্দিন, সৈয়দ মোহসেন আলী, ফজলুল হক চৌধুরী, মো. সিরাজুদ্দিন, এডভোকেট এ টি সাদী, এডভোকেট আতাউল হক খান, মকবুলুর রহমান, প্রিন্সিপাল রুহুল কুদ্দুস, নুরুজ্জামান, মাওলানা মিয়া মফিজুল হক, এডভোকেট আবু সালেক, এডভোকেট আবদুন নাঈম, মওলানা সিদ্দিক আহমদ, আবদুল মতিন, ব্যারিস্টার আখতার উদ্দিন, তোহায়া বিন হাবিব, হাকিম ইরতিজায়ুর রহমান আখুনজাদা, রাজা ত্রিদিব রায় ও ফয়েজ বক্স।

কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির লিয়াজোঁ অফিসারবৃন্দ–(১) কোতোয়ালী থানা : আই আহমদ (আহসান মঞ্জিল, ঢাকা), সাকী সুলতান (কসাইটোলা, ঢাকা), (২) লালবাগ থানা : আলহাজ নাজির হোসেন (জগন্নাথ সাহা রোড, ঢাকা, এস এম হাবিবুল হক (ধানমন্ডি, ঢাকা), নোয়াব আলী (সেন্ট্রাল রোড, ঢাকা)। (৩) সূত্রাপুর থানা : আলহাজ সিরাজ উদ্দিন (ঋষিকেশ দাস রোড, ঢাকা), মাহতাবুদ্দিন খান (মিশন রোড, ঢাকা), ফয়জুল হক (ফরাশগঞ্জ, ঢাকা), তামিজুদ্দিন (জারিয়াতলী রোড, ঢাকা), আবদুল রশিদ (রথখোলা রোড, ঢাকা), (৪) তেজগাঁও থানা : ইকবাল ইদ্রিস (ইন্দিরা রোড, ঢাকা), মাহবুবুর রহমান (তেজগাঁও, ঢাকা), এম এস এম হাবিবুল হক (ধানমন্ডি, ঢাকা), মো. নোয়াব আলী (মহাখালী, ঢাকা)। (৫) মিরপুর থানা : লায়েক আহমদ সিদ্দিকী (মিরপুর, ঢাকা), (৬) মোহাম্মদপুর থানা : এম এ বারেক (মোহাম্মদপু, ঢাকা), ড. ওসমান (মোহাম্মদপুর,





ঢাকা), সৈয়দ মোহাম্মদ ফারুক (মোহাম্মদপুর, ঢাকা), শফিকুল রহমান (ঝিগাতলা, ঢাকা), শফিকুর রহমান (ঝিগাতলা, ঢাকা), আবদুর রহমান চৌধুরী (ধানমন্ডি, ঢাকা)। (৭) রমনা থানা : আতাউল হক খান (মগবাজার, ঢাকা), জি এ খান (ইস্কাটন, ঢাকা), অধ্যাপক এ হাশেম, জুলমত আলী খান (পুরানা পল্টন, ঢাকা), ডা. মো. আইয়ুব আলী (খিলগাঁও, ঢাকা), এ ওয়াদুধ মিয়া (শান্তিনগর, ঢাকা)।

গোলাম আযমের নেতৃত্বে 'শান্তিকমিটি'র সদস্যরা প্রচার করতে থাকে যে, মুক্তিযুদ্ধ বলে কোনো কিছু বাংলাদেশে ঘটেনি; বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়নি। তারা বলতে থাকে যে, মুক্তিযোদ্ধারা হচ্ছেন ভারতের হিন্দু অনুপ্রবেশকারী ও দুষ্কৃতকারী। তারা জেনারেল টিক্কা খানের দ্বারা পূর্ব বাংলায় হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হওয়াতে খুশি হয় এবং আল্লাহর কাছে লাখো শুকরিয়া জ্ঞাপন করে এই বলে যে, আল্লাহর দান পাকিস্তান শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। পাকিস্তানপ্রেমিক 'শান্তিকমিটি'র সদস্যরা ঘোষণা দেয়, কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি ও তাদের শাখা সংস্থাগুলো মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। এমনকি তারা মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়ি বাড়ি তল্লাশি চালিয়ে খুঁজে বের করে শাস্তি দেওয়ার অঙ্গিকারে আবদ্ধ হয়। তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, মুক্ত স্বাধীন বাঙালির মূল উৎস ও কার্যকারণের উৎখাত এবং নির্মূল করার নীলনকশা অনুযায়ী কাজ করতে। তারা বাংলাদেশের প্রথম হাইকমিশনার জনাব হোসেন আরীকে 'অবাঞ্ছিত ব্যক্তি' ও 'দুষ্কৃতকারী' বলে আখ্যায়িত করে। তারা প্রচার করতে থাকে যে, যেসব বাঙালি স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখে, 'আমার সোনার বাংলা'কে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে মনে নেয় এবং মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন করে তারা 'পাকিস্তানি' হওয়ার অযোগ্য। কিন্তু বাঙালির শত্রুরা ভুলে যায় যে, সত্যিকার বাঙালি কোনোদিনই পাকিস্তানি হতে চায়নি; শুধু যারা বাংলার জারজ সন্তান তারাই চায় পাকিস্তানি হতে।

ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে সাক্ষাৎকারী 'পূর্ব পাক শান্তিকমিটি'র প্রতিনিধি দলের সদস্যরা হচ্ছে হামিদুল হক চৌধুরী, মাহমুদ আলী, ড. সাজ্জাদ হোসেন, বিচারপতি নূরুল ইসলাম ও ড. কাজী দীন মুহম্মদ। আর জাতিসংঘের 'পাকিস্তান শান্তিকমিটি'র প্রতিনিধি দলের বাঙালির সদস্যরা হচ্ছে শাহ আজিজুর রহমান, জুলমত আলী খান, রাজিয়া ফয়েজ, ড. ফাতিমা সাদিক ও এ টি সাদী।

**শান্তি ও কল্যাণ কাউন্সিল**

কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ–মৌলভী ফরিদ আহমদ (সভাপতি), নুরুজ্জামান (সাধারণ সম্পাদক), মাওলানা আবদুল মান্নান, জুলমত আলী খান, এ কে এম মুজিবুল হক, ফিরোজ আহমদ। আর শান্তি ও কল্যাণ কাউন্সিলের তথ্য অফিসারবৃন্দ : মৌলবী ইদ্রিস আহমদ (মালিবাগ), মো. আলী সরকার (ঢাকা স্টেডিয়াম), মাওলানা শাহ ইসলাম উল্লাহ চিশতি (আর্মানিটোলা), মৌলবী তাসওয়ার হোসেন খান (ইংলিশ রোড), মাওলানা আবদুল মজিদ (পাতলাখান লেন) ও হাজী মো. ইসহাক (উর্দু রোড)।

# অগ্নিঝরা উত্তাল মার্চের দিনগুলো

**১ মার্চ, ১৯৭১**

মুক্তিসংগ্রামের শেষ ধাপের প্রতিরোধটিই শুরু হয়েছিল ১৯৭১ সালের ১ মার্চ। পাকিস্তানের সামরিক একনায়ক জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার চক্রান্তমূলক ঘোষণা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপামর বাঙালি সবকিছু বন্ধ করে দিয়ে রাস্তায় নেমে আসে সেদিন। সেই শুরু, স্বাধিকারের দাবিতে গণজোয়ার ওঠে বঙ্গোপসাগর বিধৌত বাংলায়। 'পতাকা শোভিত শ্লোগানমুখর ঝাঁঝালো মিছিল'–এ উত্তাল বাংলাদেশ। স্বাধীনতার মহাকাব্যের একেকটি অধ্যায় রচিত হচ্ছে প্রতিদিন। সেই মহাকাব্যের নায়ক এ দেশের আপামর জনসাধারণ।

দুপুরে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত গর্জে ওঠে বাংলাদেশ। স্বতঃস্ফূর্তভাবে শুরু হয় পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সর্বাত্মক অসহযোগ। কিন্তু জনতা নেতৃত্বশূন্য ছিল না। নির্বাচিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে দেশ চলছিল ২৫ মার্চ অসহযোগ আন্দোলনের শেষ দিনটি পর্যন্ত। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে তৎকালীন পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ অর্থাৎ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৬ দফার পক্ষে আওয়ামী লীগকে নিরঙ্কুশ বিজয় এনে দিয়েছিল। তিনি গোটা পাকিস্তানেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন। পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে তখন চলছিল প্রাসাদ ষড়যন্ত্র। ৩ মার্চ প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের পরপরই পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো অধিবেশন বয়কটের ঘোষণা দেন। বাঙালির হাতে পাকিস্তানের শাসনভার ছেড়ে দেয়া যাবে–মনোভাব থেকে ভুট্টো পাকিস্তানের দুই অংশের জন্য দু'জন প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন।

আকস্মিক এক বেতার ঘোষণায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠেয় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। প্রেসিডেন্ট বেতার ঘোষণায় বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান দল পিপলস পার্টিসহ কয়েকটি দল ৩ মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান না করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। পশ্চিম পাকিস্তানের জনপ্রতিনিধিদের ছাড়া ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠান করতে গেলে গোটা পরিষদটাই ভেঙে পড়তে পারে।

বেতারে প্রেসিডেন্টের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণার বিবৃতি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। দল-মত-নির্বিশেষে সব শ্রেণির ক্ষুব্ধ মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে শহরের সব দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। সরকারি-বেসরকারি অফিস ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষক, কলকারখানার শ্রমিক ও আদালতের আইনজীবীরা রাস্তায় নেমে আসেন। মিছিলকারীদের ইয়াহিয়া ও ভুট্টোবিরোধী শ্লোগানে ঢাকার আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। ঢাকা স্টেডিয়ামে বিসিসিপি ও আন্তর্জাতিক একাদশের মধ্যে অনুষ্ঠানরত ক্রিকেট ম্যাচ ভণ্ডুল হয়ে যায়। দর্শকরা স্টেডিয়াম থেকে বের হয়ে মিছিলে





শরিক হন। মিছিলগুলো বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে নির্দেশ লাভের উদ্দেশ্যে মতিঝিলের হোটেল পূর্বাণীর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। বেলা ৩টার দিকে হোটেল পূর্বাণীর সামনে লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। বিকেলে হোটেল পূর্বাণীতে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির বৈঠক শুরু হয়। সেখানে হাজার হাজার মানুষ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ লাভের আশায় প্রতীক্ষা করতে থাকেন। বঙ্গবন্ধু বৈঠক থেকে উঠে এসে জনতাকে ধৈর্য না হারিয়ে পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান।

এরই মধ্যে পল্টন ময়দান জনসমুদ্রে পরিণত হয়। রাজধানীর বিভিন্ন মহল্লা ও শহরতলী থেকে একের পর এক মিছিল পল্টনের দিকে আসতে থাকে। পল্টনের অনির্ধারিত স্বতঃস্ফূর্ত জনসমাবেশে ছাত্র ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ভাষণ দেন।

এদিকে শহরের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা খণ্ড খণ্ড মিছিল করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমবেত হতে থাকে। এসব মিছিল শহীদ মিনারে ক্ষণিক অবস্থানের পর প্রথমে হোটেল পূর্বাণীর সামনে সমবেত হয়ে পরে পল্টন ময়দানে গিয়ে জমায়েত হয়। সেখানে ছাত্র নেতৃবৃন্দ পরদিন ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন।

অধিবেশন স্থগিতের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর ঢাকায় বিমান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ঢাকা বিমানবন্দর ও পিআইএর (পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স) মতিঝিল অফিসের কর্মীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অফিস ছেড়ে চলে যান। গভীর রাত পর্যন্ত মিছিলের পর মিছিল শহরের রাজপথ-অলিগলি প্রদক্ষিণ করতে থাকে। সন্ধ্যায় ঢাকার সংবাদপত্রগুলো বিশেষ বুলেটিন সংখ্যা বের করে।

প্রদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সংবাদপত্রে পাঠানো বিবৃতিতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে প্রেসিডেন্টের ঘোষণাকে জনগণের সার্বভৌম পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর নস্যাৎ করার উদ্যোগ বলে অভিহিত করে।

আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির বৈঠক শেষে হোটেল পূর্বাণীতে এক জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট কর্তৃক জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার কঠোর প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, বাংলার জনগণ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার এ সিদ্ধান্ত কে প্রত্যাখ্যান করেছে। তিনি এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সর্বাত্মক আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে ২ মার্চ ঢাকা শহরে ও ৩ মার্চ সারা বাংলায় হরতাল পালন এবং ৭ মার্চ রেসকোর্সে (সোহরাওয়ার্দী) জনসভা অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেন। ৭ মার্চের জনসভায় বঙ্গবন্ধু সর্বাত্মক আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ কর্মপন্থা ঘোষণা করবেন বলে জানান।

বঙ্গবন্ধু জনগণকে যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, পরিষদ অধিবেশন স্থগিত করার আগে তাকে জানানো হয়নি। তার সঙ্গে কোনো আলোচনা হয়নি। তিনি উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে মওলানা ভাসানী, নূরুল আমীন, আতাউর রহমান খান ও অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের সঙ্গে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নেন। বঙ্গবন্ধু বলেন, আমরা যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে প্রস্তুত। জনগণ আমাদের সঙ্গে আছে। আমরা ভালোই আশা করি এবং চরম অবস্থার জন্য প্রস্তুত আছি। তিনি বলেন, ৭

মার্চ পর্যন্ত কর্মসূচি ঘোষণা করেছি। আমার দল আমাকে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা দিয়েছে।

রাতে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল এএম ইয়াহিয়া খান 'খ' অঞ্চলের (পূর্ব পাকিস্তান) সামরিক শাসনকর্তা লে. জেনারেল সাহেবজাদা এম ইয়াকুব খানকে প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি গভর্নর ভাইস এডমিরাল এমএম আহসানের স্থলাভিষিক্ত হন। গভীর রাতে 'খ' অঞ্চলের সামরিক প্রশাসক এক নতুন আদেশ জারি করে সংবাদপত্রে দেশের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে কোনো খবর বা ছবি প্রকাশ না করার নির্দেশ দেন।

রাতে বঙ্গবন্ধু তার ৩২ নম্বর ধানমণ্ডির বাসভবনে পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে আলোচনা বৈঠকে মিলিত হন। সন্ধ্যার পর তিনি সন্তোষে মওলানা ভাসানীর সঙ্গে আলোচনার জন্য তার প্রতিনিধি পাঠান।

## ২ মার্চ, ১৯৭১

পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের আকস্মিক ঘোষণা দানের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে ১ মার্চ থেকে শুরু হয় বাঙালি জাতির অসহযোগ আন্দোলন। সেই আন্দোলন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগোষ্ঠীকে দেখিয়েছিল মুক্তি ও স্বাধীনতার পথ। সেদিন পাকিস্তানি শাসকদের রক্তচক্ষু কিংবা মৃত্যুভয় কোনোকিছুই মুক্তিপাগল বাঙালির সংগ্রামী মনোভাবকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। মার্চের দ্বিতীয় দিন রাতে ঢাকায় কারফিউ ভঙ্গকারী জনতার ওপর মেশিনগান দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকিস্তানি সেনারা। রক্তাক্ত হয় রাজপথ। স্বাধীনতার সোপানে প্রথম আত্মাহুতি। সকাল থেকেই সারা ঢাকায় দল-মত নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ সর্বাত্মক হরতালে অংশ নিয়ে রাজধানীতে চূড়ান্ত অচলাবস্থা সৃষ্টি করে। হাজার হাজার মানুষ বাঁশের লাঠি ও লোহার রড হাতে রাজপথে নেমে আসে। সারাদেশে মানুষ এক ও অভিন্ন হয়ে স্বাধিকারের দাবিতে উত্তাল হয়ে ওঠে। সভা-সমাবেশ থেকে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা দেয়া হয়, 'স্বাধিকারের প্রশ্নে কোনো আপস নেই।'

বেলা ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের ডাকে এক বিশাল ছাত্র জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ডাকসুর সভাপতি আ স ম আবদুর রব সংগ্রামী ছাত্রসমাজের পক্ষে প্রথম বাংলাদেশের মানচিত্র অংকিত 'স্বাধীন বাংলার পতাকা' উত্তোলন করেন। সবুজ জমিনের মাঝখানে লাল বৃত্তের মধ্যে সোনালি মানচিত্র। ছাত্ররা জীবন দিয়ে স্বাধীনতা আনার শপথ নেন।

বিকেলে বায়তুল মোকাররম ও পল্টন ময়দানে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যার পর সামরিক কর্তৃপক্ষ আকস্মিক পুরো শহরে রাত ৯টা থেকে পরদিন ৩ মার্চ সকাল ৭টা পর্যন্ত কারফিউ জারি করে। রাতে এক ঘোষণায় অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত ঢাকায় কারফিউ জারির ঘোষণা দেয়া হয়। বেতারে কারফিউ জারির ঘোষণা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে শহরের বিভিন্ন এলাকায় স্বতঃস্ফূর্ত জনতা রাস্তায় নেমে ব্যারিকেড দেয়। গভীর রাত পর্যন্ত কারফিউ ভঙ্গ করে মিছিল হয়। 'জয় বাংলা', জয়





বঙ্গবন্ধু' শ্লোগানে রাতের ঢাকার নিস্তব্ধতা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। রাতে নগরীর বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি সেনারা বিক্ষোভকারীদের ওপর মেশিনগান থেকে গুলিবর্ষণ করে। ঘটনাস্থলে ২৩ জন নিহত ও ৩ শতাধিক আহত হন। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নগরীর হাসপাতালগুলোতে বুলেটবিদ্ধ লোকের ভিড় বাড়তে থাকে।

গভীর রাতে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান এক বিবৃতিতে ঢাকায় নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলিবর্ষণের কঠোর নিন্দা করে দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চারণ করেন, 'বাংলাদেশে আগুন জ্বালাবেন না। যদি জ্বালান, সে দাবানল থেকে আপনারাও রেহাই পাবেন না।' বঙ্গবন্ধু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উদ্দেশে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, 'সাবধান, শক্তি দিয়ে জনগণের মোকাবেলা করবেন না।' বিবৃতিতে তিনি উল্লেখ করেন, 'নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলিবর্ষণ গণহত্যারই শামিল এবং তা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। তিনি বলেন, যেসব বিমান পশ্চিমাঞ্চল থেকে গণপ্রতিনিধি বহন করে আনতে পারতো, সেসব বিমানে করে এখন সামরিক বাহিনীর লোকজন ও সামরিক সরঞ্জাম আনা হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু জনতার ওপর গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত সারাদেশে হরতাল পালনের আহ্বান জানান। ৩ মার্চ জাতীয় 'শোক দিবস' পালনের ডাক দেন। তিনি জাতির উদ্দেশে আহ্বান জানান, 'সুশৃঙ্খল ও শান্তি পূর্ণভাবে হরতাল পালন করুন। লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগের অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে তার প্রতি কড়া নজর রাখুন।

ওদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের করাচিতে এক সংবাদ সম্মেলনে পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়নি। সত্যিকার ফেডারেশনে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পরিষদ গঠিত হওয়া উচিত। লাহোরে এক সংবাদ সম্মেলনে কাউন্সিল লীগ নেতা এয়ার মার্শাল (অব.) নূর খান মার্চ মাসের মধ্যে জাতীয় অধিবেশন ডাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, অবিলম্বে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান না করলে দেশ এক ভয়াবহ ক্ষতির মুখোমুখি হবে।

## ৩ মার্চ, ১৯৭১

সারা দেশ অচল। সর্বত্র অসহযোগ; অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় সব বন্ধ। বন্ধ বিমানবন্দর, নৌবন্দর ও রেল চলাচল। ঢাকায় দ্বিতীয় দিনও দেশব্যাপী প্রথম দিনের মতো পালিত হয় সর্বাত্মক হরতাল। হরতাল পালনকালে চট্টগ্রাম, রংপুর ও সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মিছিলে পাকিস্তানি সেনাদের গুলিবর্ষণে শতাধিক ব্যক্তি নিহত হন। চট্টগ্রাম, রংপুর ও সিলেটে সেনাবাহিনীর সঙ্গে ক্ষুব্ধ জনতার সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনায় দুপুরে রংপুরে ও সন্ধ্যায় সিলেটে কারফিউ জারি করা হয়। চট্টগ্রামে অগ্নিকাণ্ড, হামলা, প্রতিহামলা, সংঘর্ষ ও সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণের ঘটনায় নিহত হন ৭৫ জন, আহত কয়েকশ'। ঢাকায় বুলেট, বেয়নেট ও বোমায় আহত ১২০ জনকে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মালিবাগে জাতীয় পরিষদ সদস্য ও আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির হুইপ আবদুল মান্নান সেনাবাহিনীর অবাঙালি জওয়ানদের হাতে প্রহৃত হন। ঢাকায় হরতালের সময় জনতা আগের রাতে সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহতদের লাশ নিয়ে শোক মিছিল করে।

ছাত্র-শ্রমিক-যুবক সারাদিন রাস্তার রাস্তায় লাঠিসোঁটা নিয়ে মিছিলে অংশ নেন। বিকেলে ছাত্রলীগের উদ্যোগে পল্টন ময়দানে ছাত্র-জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশাল সমাবেশ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'স্বাধীন বাংলার রাষ্ট্রপতি ও সর্বাধিনায়ক' হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে এ সমাবেশে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ 'স্বাধীনতার ইশতেহার' পাঠ করেন। ছাত্রলীগের পক্ষে ঘোষিত ইশতেহারে জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত, ভৌগোলিক সীমারেখা ও রাষ্ট্রীয় মূলনীতি নির্দিষ্ট করে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় রূপরেখা বর্ণনা করা হয়।

পল্টন ময়দানে ছাত্র-জনসভায় বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, 'বাংলার গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা সমর্পণ করে সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত সরকারের সঙ্গে স্বাধিকারকামী বাংলার মানুষ আর সহযোগিতা করবে না। কোনো কর-খাজনাও দেবে না। বাংলার মানুষ খাজনা দেয়, ট্যাক্স দেয় রাষ্ট্র চালানোর জন্য; গুলি খাওয়ার জন্য নয়। অবিলম্বে সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিন। বাংলার শাসনভার বাংলার নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে তুলে দিন।'

বঙ্গবন্ধু সমাবেশ থেকে সরকারি-বেসরকারি চাকরিজীবীদের প্রতি নির্দেশ দেন, 'পুনরায় আদেশ না দেয়া পর্যন্ত আপনারা অফিস-আদালতে যাওয়া বন্ধ রাখুন।' তিনি প্রচার মাধ্যমের প্রতি নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'যদি আমাদের বক্তব্য-বিবৃতি আমাদের আন্দোলনের খবর প্রকাশ-প্রচারের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়, সে আদেশ আপনারা মানবেন না।' পাকিস্তান পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টোর উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক নিয়মে প্রণীত 'এক সংবিধান' যদি না চান তাহলে আপনাদের সংবিধান আপনারা রচনা করুন। বাংলাদেশের সংবিধান আমরাই রচনা করবো। পল্টনের উত্তাল জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু আরো ঘোষণা করেন, 'দানবের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য আমরা প্রস্তুত। দেশের মেজরিটি জনগণ আমার পেছনে। ৭ মার্চ রেসকোর্সে আমার বক্তৃতা করার কথা। কিন্তু সে সুযোগ আমাকে নাও দেওয়া হতে পারে। আমি যদি নাও থাকি, আন্দোলন যেন না থামে। আমি থাকি আর না থাকি, আমার সহকর্মীরা আছেন। তারাই নেতৃত্ব দেবেন, যে কোনো মূল্যে বাংলার স্বাধিকার ছিনিয়ে আনতে হবে।'

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১০ মার্চ ঢাকায় পাকিস্তানের উভয় অংশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধু প্রেসিডেন্ট আহূত ঢাকা সম্মেলনে যোগদানের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে এক বিবৃতিতে বলেন, 'যখন বহু শহীদের নশ্বর দেহ দাফনের প্রতীক্ষায় পড়ে আছে, শত শত বুলেটবিদ্ধ মানুষ হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে চলেছে, সে মুহূর্তে এ সম্মেলনের আমন্ত্রণ নিষ্ঠুর তামাশা।' সন্ধ্যায় করাচিতে পিপলস পার্টি ঘোষণা করে, পার্টি প্রধান জেডএ ভুট্টো ১০ মার্চ ঢাকায় সম্মেলনে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

### ৪ মার্চ, ১৯৭১

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বস্তুত কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে চলে ব্যাংক, রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যম, সরকারি





অফিস, সংস্থা, সবকিছু–যা ইতিহাসে নজিরবিহীন। কোনো সরকারি প্রজ্ঞাপন নয়, বঙ্গবন্ধু যা নির্দেশ দেন বেতার-টিভি ও খবরের কাগজে সেসব প্রচার করা হতো। অসহযোগ আন্দোলনের মুখে মার্চের প্রথম সপ্তাহেই প্রদেশের বেসরকারি শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। আজকের দিনে ঢাকার রাজারবাগ পুলিশলাইন ও পিলখানা ইপিআর ব্যারাকে বাঙালি পুলিশ এবং সীমান্তরক্ষীরা 'জয় বাংলা' শ্লোগান কণ্ঠে ধারণ করে জনগণের আন্দোলনের একাত্মতা ঘোষণা করে।

সারাদেশে ছাত্র-জনসভা, মিছিল ও শহীদদের জন্য গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকায় সর্বাত্মক হরতাল পালনকালে জনজীবন অচল হয়ে পড়ে। আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সদস্যরা শান্তিরক্ষায় শহরে টহল দেয়। ঢাকার সঙ্গে বাইরের জল, স্থল ও বিমান যোগাযোগ বন্ধ থাকে। টেলিফোন বিভাগের কর্মীরা পশ্চিম পাকিস্তানে ট্রাঙ্কল টেলিগ্রাম পাঠানোয় বিরত থাকেন। ওইদিন ঢাকার কারফিউ তুলে নেয়া হলেও খুলনা ও রংপুরে কারফিউ ছিল। খুলনায় হরতাল চলাকালে সেনাবাহিনীর গুলিতে ছয়জন নিহত হন। চট্টগ্রামেও গুলিবর্ষিত হয়। পাকিস্তানি সেনাদের গুলিতে আহত বীর সংগ্রামীদের প্রাণ রক্ষার্থে শত শত নারী-পুরুষ ও ছাত্রছাত্রী ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বব্লাড ব্যাংকে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

সেনাবাহিনী যানবাহন প্রতিরোধের জন্য পথে পথে রেলবগি স্থাপন করে বাস-ট্রাক উল্টে দিয়ে, গাছ ফেলে, ইটের দেয়াল তুলে ব্যারিকেড তৈরির কাজে নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ ছাত্রদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। বেতার ও টেলিভিশনে উদ্দীপক দেশাত্মবোধক গান প্রচারিত হতে থাকে। রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রে 'ঢাকা বেতার কেন্দ্র' এবং রেডিও পাকিস্তান টেলিভিশন 'ঢাকা টেলিভিশন' নাম নিয়ে বাংলার মানুষের কাছে উপস্থিত হয়। বেতার, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র শিল্পীরা 'যতদিন পর্যন্ত দেশের জনগণ ও ছাত্রসমাজ সংগ্রামে লিপ্ত থাকবেন ততদিন পর্যন্ত' বেতার ও টেলিভিশন অনুষ্ঠানে অংশ না নেয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। সাংবাদিক সমাজ জনগণের মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে সিদ্ধান্ত নেন, সরকার বা মালিকপক্ষ আন্দোলনের বিপক্ষে যায় এমন কোনো নির্দেশ দিলে তা তারা মানবেন না। 'ঢাকা বেতার কেন্দ্র' এদিন থেকে 'স্থানীয়ভাবে তৈরি করা বাংলা সংবাদ' প্রচারের সিদ্ধান্ত নেয়।

অব্যাহতিপ্রাপ্ত প্রাদেশিক গভর্নর ভাইস এডমিরাল এসএম আহসান রাতে বিমানে করাচি রওনার আগে সাংবাদিকদের মাধ্যমে 'বাংলাদেশের জনগণকে শুভেচ্ছা' জানান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক বিবৃতিতে যে কোন মূল্যে স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য জনগণকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বিশ্ববাসী দেখুক, বাংলাদেশের নিরস্ত্র ছাত্র-শ্রমিক-জনতা বুলেটের মুখেও কী দুর্দান্ত সাহস ও দৃঢ়তা নিয়ে নিজেদের অধিকার হরণের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ৫ ও ৬ মার্চ সকাল ৬টা থেকে বেলা ২ পর্যন্ত হরতাল পালনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করে বলেন, যেসব সরকারি ও বেসরকারি অফিসে এখনও বেতন হয়নি, শুধু বেতন দেয়ার জন্য সেগুলো আড়াইটা থেকে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। শুধু বাংলাদেশের মধ্যে ১৫০০ টাকা পর্যন্ত বেতনের চেক ভাঙানোর

জন্য ওই সময় ব্যাংক চালু থাকবে। স্টেট ব্যাংকের মাধ্যমে বা অন্য কোনোভাবে বাংলাদেশের বাইরে টাকা পাঠানো যাবে না। রেশনের দোকান ও খাদ্য সরবরাহকারী সংস্থাগুলো দুপুরের পর সব খোলা থাকবে। হাসপাতাল, ওষুধের দোকান, অ্যাম্বুলেন্স, ডাক্তার ও সাংবাদিকদের গাড়ি, পানি-বিদ্যুৎ-গ্যাস সাপ্লাই, স্থানীয় টেলিফোন ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার মধ্যে টেলিফোন যোগাযোগ, দমকল ও আবর্জনার গাড়ি হরতালের আওতামুক্ত থাকবে।

সন্ধ্যায় পাকিস্তানে করাচি প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে এয়ার মার্শাল (অব.) আসগর খান বলেন, ঘটনা অনেক দূর চলে গেছে। তিনি দেশকে বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের কাছে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান।

পিডিপি প্রধান নুরুল আমীন ঢাকায় এক বিবৃতিতে ১০ মার্চ ঢাকায় রাজনৈতিক নেতাদের সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে প্রেসিডেন্টের প্রতি অবিলম্বে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার আহ্বান জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৫ জন শিক্ষক পৃথক বিবৃতিতে ঢাকার 'পাকিস্তান অবজারভার' পত্রিকার গণবিরোধী ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

কাইয়ুমপন্থি মুসলিম লীগের পদত্যাগী সাধারণ সম্পাদক আবদুস সবুর খান বিকালে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তার ধানমণ্ডির বাসভবনে সাক্ষাৎ করেন। ন্যাপপ্রধান মওলানা ভাসানী সন্তোষ থেকে ঢাকায় এসে পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগপ্রধান আতাউর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক শাহ আজিজুর রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেন।

পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো করাচিতে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, দেশের সংহতির জন্য তার দল যতটুকু সম্ভব ছয় দফার কাছাকাছি হওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ছয় দফা মেনে নেয়া ও উভয় অঞ্চলের আলাদা হওয়া–এ দুটির মধ্যে যে কোনো একটি যদি বেছে নিতে হয় তাহলে তিনি কোন্‌টি বেছে নেবেন–সাংবাদিকদের এ প্রশ্নের জবাবে ভুট্টো পাল্টা প্রশ্ন করেন, দুটির মধ্যে কোনো মৌল পার্থক্য রয়েছে কি?

## ৫ মার্চ, ১৯৭১

ক্লাসরুমে তালা, ছাত্র-শিক্ষক রাজপথে। মিলের শ্রমিক, আদালতের উকিল, অফিসের কর্মচারী সবাই রাজপথে। নেতার নির্দেশ, দাবি আদায় না করে কেউ ঘরে ফিরবে না। অসহযোগ আন্দোলন দেশের কোথাও না কোথাও মানুষ আত্মাহুতি দিচ্ছে। তবু বাঙালি মাথা নোয়াবার নয়। ঢাকাসহ সারাদেশে স্বতঃস্ফূর্ত অর্ধদিবস হরতাল, স্বাধীনতাকামী জনতার বিক্ষুব্ধ মিছিল, গণজমায়েত ও বজ্রশপথের মধ্যে পার হয় মুক্তি আন্দোলনের পঞ্চম দিনটি। টঙ্গী, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীতে পাকিস্তানি সেনারা মিছিলে গুলি চালায়। গুলিবর্ষণে অর্ধশতাধিক মিছিলকারী হতাহত হন। টঙ্গী শিল্পাঞ্চলে সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হন ৪ শ্রমিক। আহত হন ২৫ জন। টঙ্গীর শ্রমিক মিছিলে গুলির খবর ঢাকায় পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে ওঠে ছাত্র-শ্রমিক-জনতা। টঙ্গীর শহীদদের লাশ ঢাকায় আনা হয়। ছাত্রলীগের নেতৃত্বে ক্ষুব্ধ ছাত্র-শ্রমিক-জনতা লাশ নিয়ে মিছিল বের করে। চট্টগ্রামে





গুলিবর্ষণে নিহত হন ৩ জন মিছিলকারী। দিনটি ছিল শুক্রবার। মসজিদে মসজিদে জুমার নামাজের পর শহীদানের আত্মার শান্তি কামনায় অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ মোনাজাত। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে দুপুরের পর সব ব্যাংক খোলা রাখা হয়। বিকেলে সারাদেশে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিল। কবি-সাহিত্যিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মিছিল নিয়ে রাজপথে নেমে আসেন। ছাত্রলীগ ও ডাকসুর উদ্যোগে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণ থেকে মিছিল বের হয়। মিছিলকারী ছাত্রছাত্রীদের হাতে ছিল লাঠিসোটা। ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া গ্রুপ) উদ্যোগে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ছাত্র-গণজমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা নগরীতে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়। ১১ দফা আন্দোলনের অন্যতম নেতা তোফায়েল আহমেদ ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দান থেকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সরাসরি রিলে করার জন্য ঢাকা বেতার কেন্দ্রের প্রতি আহ্বান জানান।

এদিকে লাহোরে দেশের পূর্বাঞ্চলে সাম্প্রতিক আন্দোলনে নিহত শহীদদের গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জেডএ ভুট্টো রাওয়ালপিণ্ডির প্রেসিডেন্ট হাউসে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে ৫ ঘণ্টাব্যাপী আলোচনায় বসেন। বৈঠক শেষে পার্টির মুখপাত্রও আবদুল হাফিজ পীরজাদা মন্তব্য করেন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের প্রতিক্রিয়া যেভাবেই বিচার করা হোক না কেন, তা আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়। তিনি বলেন, পাকিস্তান এক থাকবে, না দুই পাকিস্তান হবে সে সম্পর্কে এখন আওয়ামী লীগকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পিপিপি মনে করে, আওয়ামী লীগের শাসনতান্ত্রিক ফর্মুলা হয়তো পাকিস্তানের সংহতি রক্ষা করতে পারবে না।

অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল আসগর খান বিকেলে করাচি থেকে ঢাকায় পৌঁছেন। তিনি রাতে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ধানমন্ডির বাসভবনে সাক্ষাৎ করেন। রাতে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ এক বিবৃতিতে বলেন, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট এবং বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে মিলিটারির বুলেটে নিরীহ-নিরস্ত্র মানুষ, শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্রদের হত্যা করা হচ্ছে। অবিলম্বে এ নরহত্যা বন্ধ করতে হবে। তিনি বলেন, সামরিক শক্তির ক্রমাগত বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান হচ্ছে, বাংলাদেশে বেসামরিক জনগণের ওপর নির্যাতনমূলক নীতি আরো জোরদার করা হবে। তাজউদ্দীন আহমদ বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা জেনে রাখুন, বাংলাদেশের জনগণের ওপর আজ যে নির্যাতন নেমে এসেছে, তারা বীরের মতো তা প্রতিরোধ করছে।

## ৬ মার্চ, ১৯৭১

সংগ্রামী বাংলা বিক্ষোভে উত্তাল। লাগাতার হরতালে অচল গোটা প্রদেশ। ঢাকাসহ সারা বাংলায় পালিত হয় অর্ধদিবস হরতাল। স্বাধীনতাকামী মানুষের অগণিত মিছিলে রাজধানী পরিণত হয় মিছিলের নগরীতে। সব মিছিলে অভিন্ন শ্লোগান : 'জয় বাংলা', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর–উত্তাল জনসমুদ্রের ক্ষুব্ধ গর্জন। 'পদ্মা-মেঘনা-যমুনা–তোমার আমার ঠিকানা' শ্লোগানমুখর সব মিছিল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির বাসভবন ও পল্টন ময়দান প্রদক্ষিণ করে সারাদিন। সভা-

সমাবেশ-মিছিলের পাশাপাশি চলে রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগের জনসভার প্রস্তুতি। শহরজুড়ে ৭ মার্চের জনসভার মাইকিং করা হয়।

প্রদেশে প্রথম কারা বিদ্রোহ ঘটে এই দিন। বেলা ১১টায় ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে গেট ভেঙে ৩৪১ জন কয়েদি পালিয়ে যায়। জেল পালানোর সময় প্রহরীদের গুলিতে ৭ কয়েদি নিহত ও ৩০ জন আহত হয়।

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কাজে যোগদান থেকে বিরত থাকেন। তবে বেলা আড়াইটা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত ব্যাংক ও বেসরকারি অফিস বেতন দেয়ার জন্য খোলা থাকে। সন্ধ্যায় ছাত্রলীগ মশাল মিছিল বের করে। শিল্পী, সাংবাদিক, শিক্ষক, ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ), গণশিল্পীগোষ্ঠী, উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, স্বজনী ও ফরোয়ার্ড স্টুডেন্ট বৱক এবং বাংলা ন্যাশনাল লীগের উদ্যোগে পৃথক সভা-সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মহিলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বাংলার বিক্ষুব্ধ, নারী সমাজ বাঁশের লাঠি, লোহার রড ও কালো পতাকা নিয়ে উপস্থিত হন। পরে তারা জঙ্গি মিছিল বের করেন। বিকেলে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় সাংবাদিক-জনসমাবেশ। ছাত্রলীগ ও ডাকসু নেতারা এক বিবৃতিতে ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দান থেকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সরাসরি বাংলাদেশের সব বেতার কেন্দ্রে সম্প্রচারের দাবি জানান।

প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান এদিন লে. জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত করেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া দুপুরে বেতার ভাষণে ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। ইয়াহিয়া বলেন, 'জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন স্থগিতের সিদ্ধান্তে পূর্ব পাকিস্তানি নেতৃত্ব যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন তাতে ধ্বংসকারী শক্তি রাস্তায় নেমেছে।' তিনি বলেন, 'ব্যাপক শক্তি প্রয়োগে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনা সম্ভব হতো বলে উপলব্ধি করলেও হত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ বন্ধ করার জন্য আমি ন্যূনতম শক্তি প্রয়োগের নির্দেশ দিই।' ইয়াহিয়া খানের বেতার ভাষণের পরপরই ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ মিছিল বের হয়।

প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণের পর বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির জরুরি বৈঠক বসে। রাওয়ালপিন্ডিতে পিপলস পার্টি চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ভাষণকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, '৬ দফার ভিত্তিতে সমঝোতার চেষ্টা সহজ কাজ নয়। এজন্য ৬ দফার রদবদল প্রয়োজন।' পেশোয়ারে পাকিস্তান মুসলিম লীগপ্রধান খান আবদুল কাইয়ুম, পশ্চিম পাকিস্তান পিডিপি প্রধান নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান ও কাউন্সিল মুসলিম লীগপ্রধান মিয়া মমতাজ দৌলতানা প্রেসিডেন্টের ঘোষণাকে স্বাগত জানান। লাহোরে কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতা এয়ার মার্শাল (অব.) নূর খান এক সমাবেশে বলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমানের দেশ শাসনের বৈধ অধিকার রয়েছে।' প্রেসিডেন্ট বেতার ভাষণে পরিস্থিতি অবনতির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর দোষারোপ করায় দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেন, '৬ দফা নয়, বরং ক্ষমতা ভাগাভাগির প্রশ্নই প্রকৃত বিরোধের কারণ।' লাহোরে বিকেলে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি বিএ সলিমী ও পাঞ্জাব প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হামিদ সরফরাজসহ ১৫ জনকে একটি বিক্ষোভ মিছিল থেকে গ্রেফতার করা হয়।





## ৭ মার্চ, ১৯৭১

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেদিন তার ঐতিহাসিক ভাষণে বাঙালি জাতিকে পাকিস্তানের শাসন-শোষণের নিষ্পেষণ থেকে মুক্তির দিশা দিয়েছেন। রমনার রেসকোর্সের (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে জানিয়েছেন পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙার আহ্বান। দেশমাতৃকার মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক দিয়ে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অমূল্যগাথা। বাংলার অবিসংবাদিত নেতা তার ভাষণে তুলে ধরেছেন বাঙালির ওপর পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের নির্মম চিত্র। চরম বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে বাঙালির পুঞ্জীভূত ক্ষোভকে নিজ কণ্ঠে ধারণ করে ঘোষণা করেন, 'বাংলার মানুষ মুক্তি চায়। বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়।' ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু বাঙালির জাতিগত আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নকে মূর্ত করে তোলেন। বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের রূপরেখা ঘোষণার পাশাপাশি স্বাধীনতা অর্জনে জাতিকে চরম ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান।

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ বাঙালি 'স্বাধীনতা সংগ্রামের রূপরেখা' তথা বাংলাদেশের 'স্বাধীনতার ভাষণ' হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত হয়ে আছে। এ ভাষণে জাতির জনক তার জলদগম্ভীর কণ্ঠে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন, 'সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না।' সেদিন রেসকোর্সে ১০ লাখের বেশি মানুষের সমাবেশে শত্রুর আসন্ন হামলা প্রতিরোধের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়ে তিনি নির্দেশ দেন–'আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।... প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল।'

বিকেল সোয়া ৩টায় বঙ্গবন্ধু সভামঞ্চে উপস্থিত হন। সফেদ পায়জামা-পাঞ্জাবি আর হাতকাটা কালো কোট পরিহিত শেখ মুজিব মঞ্চে এসে দাঁড়ালে বীর জনতা করতালি ও 'জয় বাংলা' 'জয় বঙ্গবন্ধু' শ্লোগানের মাধ্যমে নেতাকে অভিনন্দন জানায়। বঙ্গবন্ধু হাত নেড়ে প্রতি অভিনন্দন জানান জনতার সমুদ্রকে। তার চোখে-মুখে তখন সাত কোটি বাঙালির সুযোগ্য সিপাহসালার দুর্লভ তেজোদীপ্ততা, কাঠিন্য আর সংগ্রামী শপথের দীপ্তি।

বঙ্গবন্ধু তার প্রায় ২০ মিনিটের ভাষণে বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের দুর্গম-দুস্তর পথের প্রান্তে বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্ন বাস্তবায়নের স্মৃতিফলক বসিয়ে দেন। পৌঁছে দেন সংগ্রামে উন্মুখ জাতির কর্ণকুহরে স্বাধীনতার মন্ত্রণা। রেসকোর্সের মন্ত্রমুগ্ধ লাখ লাখ শ্রোতাকে আহ্বান জানান : 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশাল্লাহ'।

এদিকে বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্সের ভাষণ সরাসরি সম্প্রচার না করার প্রতিবাদে বেতারে কর্মরত বাঙালি কর্মচারীরা তাৎক্ষণিক ধর্মঘট শুরু করায় বিকেল থেকে ঢাকা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচারের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বেতার

কর্তৃপক্ষ রেসকোর্স থেকে সরাসরি সম্প্রচারের পূর্ব ঘোষণা দিয়ে পরে তা বাতিল করে। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ রিলে করা হবে–এ ঘোষণার পর সারা বাংলার শ্রোতারা অধীর আগ্রহে রেডিও সেট নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। বেলা ২টা ১০ মিনিট থেকে ৩টা ২০ মিনিট পর্যন্ত ঢাকা বেতারের দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। রবীন্দ্র সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' (পরবর্তীকালে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত) পরিবেশনের পর বঙ্গবন্ধুর ভাষণ রিলে করার পূর্ব মুহূর্তে আকস্মিকভাবেই ঢাকা বেতারে তৃতীয় অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ রিলে করতে না দেয়ার প্রতিবাদে ঢাকা বেতারের কর্মীরা কাজ করতে অস্বীকার করলে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়েই অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্সের পূর্ণ ভাষণ ঢাকা বেতারে প্রচার করা না হলে বেতার কর্মীরা কাজে যোগদান করবেন না বলে কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেন। গভীর রাতে সামরিক কর্তৃপক্ষ ঢাকা বেতারে বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত ভাষণের পূর্ণ বিবরণ প্রচারের অনুমতি দেন। পরদিন সকালে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ দিয়েই ঢাকা বেতার কেন্দ্র পুনরায় চালু হয়।

**৮ মার্চ, ১৯৭১**

পাকিস্তানের ২৪ বছরের নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলনকে ধাপে ধাপে স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের সংগ্রামে রূপদান শেষে বাংলার অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চের ভাষণে জাতিকে মুক্তির দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। সেই নির্দেশনা স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে সমগ্র দেশবাসীকে। পরদিন ৮ মার্চ সারাদেশে সংগ্রাম পরিষদ গঠনের ব্যাপারে ছাত্র, যুব ও পেশাজীবী সংগঠনের সদস্যদের ব্যাপক তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন পাড়া-মহল্লা, বাসভবন, ছাত্রাবাস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শীর্ষে কালো পতাকা উড়ানো হয়। সরকারি-বেসরকারি যানবাহন এবং প্রাইভেট মোটর গাড়ি কালো পতাকা লাগিয়ে চলাচল করে। সকাল সাড়ে ৮টায় ঢাকা বেতার কেন্দ্রে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ সম্প্রচার করা হয়।

ছাত্রলীগের সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী ও সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ এবং ডাকসুর সহ-সভাপতি অ.স.ম আবদুর রব ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখন এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, 'বাংলার বর্তমান মুক্তি আন্দোলনকে 'স্বাধীনতা আন্দোলন' ঘোষণা করে স্বাধীন বাংলার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানের ঐতিহাসিক জনসভায় যে প্রত্যক্ষ কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন, আমরা তার প্রতি সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য বাংলার সংগ্রামী জনতার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।'

ছাত্রনেতারা অন্য এক বিবৃতিতে সশস্ত্র বাহিনীর গুলিতে বাংলাদেশের স্বাধিকার সংগ্রামের নিরস্ত্র বীর শহীদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সব সরকারি-বেসরকারি ভবনে অনির্দিষ্টকালের জন্য কালো পতাকা উত্তোলনের আহ্বান জানান।

বাংলার রাজনৈতিক নেতারা পৃথক বিবৃতিতে ৭ মার্চ ঘোষিত বঙ্গবন্ধুর শর্ত মেনে নেয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানান। পিডিপি সভাপতি নূরুল আমিন





সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবের সঙ্গে পরামর্শক্রমে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতি বের করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আবেদন জানান। মুসলিম লীগ নেতা খান এ সবুর বঙ্গবন্ধুর দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেন, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আকস্মিক স্থগিত ঘোষণার পর যা ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে যা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে– এসবের জন্য পশ্চিমাঞ্চলের নেতারাই দায়ী। জাতীয় লীগ প্রধান আতাউর রহমান খান বঙ্গবন্ধু ঘোষিত স্বাধীনতার সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেন, এ সংগ্রামে বাংলাদেশের মানুষ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ। লক্ষ্য হাসিল না হওয়া পর্যন্ত এ সংগ্রাম চলবে। ওয়ালিপন্থি ন্যাপের প্রাদেশিক সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বলেন, অবিলম্বে বঙ্গবন্ধুর শর্ত মেনে নিয়ে দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে সরকারের সহায়তা করা উচিত।

গণঐক্য আন্দোলনের প্রধান এয়ার মার্শাল (অব.) এম আসগর খান বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তার বাসভবনে সাক্ষাৎ করেন। বেতার-টিভি শিল্পীদের একটি প্রতিনিধি দল বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করে মুক্তি আন্দোলনের অনুকূলে অনুষ্ঠান প্রচারের উদ্দেশ্যে ১০ মার্চ থেকে বেতার ও টেলিভিশনে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী সমিতি এবং ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুযায়ী কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

রাতে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ এক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু ঘোষিত নির্দেশের ব্যাখ্যা দেন। এতে বলা হয়, ব্যাংকগুলো সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত বাংলাদেশের ভেতরে নগদ জমা, বেতন ও মজুরি প্রদান, এক হাজার টাকা পর্যন্ত প্রদান করতে পারবে। স্টেট ব্যাংক বা অন্য কোনো মাধ্যমে বাংলাদেশের বাইরে টাকা পাঠানো যাবে না। বাংলাদেশের ভেতর চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম ও মানি অর্ডারের জন্য ডাক ও তার বিভাগ খোলা থাকবে। বাংলাদেশের বাইরে প্রেস টেলিগ্রাম পাঠানো যাবে। পুলিশ আইনশৃঙ্খলার দায়িত্ব পালন করবে এবং প্রয়োজনে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবকদের সহযোগিতা নেবে। উল্লিখিত অব্যাহতি ছাড়া অন্য সব আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানে হরতাল অব্যাহত থাকবে।

তাজউদ্দীন আহমদ আরেকটি বিবৃতিতে সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষের প্রেসনোটের প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, 'প্রেসনোটে পুলিশ ও ইপিআর গুলিবর্ষণ করেছে বলে যে প্রচারণা করা হয়েছে তা বাঙালিদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে। সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে বলা হলেও বিভিন্ন এলাকায় এখনো তাদের দেখা যাচ্ছে। আমরা আবারো দাবি করছি, সব সৈন্যকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে।'

লাহোরে সাবেক তথ্যমন্ত্রী নওয়াবজাদা শের আলী খানও পিডিপির পশ্চিম পাকিস্তান প্রধান নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান অবিলম্বে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে ঢাকা যাওয়ার অনুরোধ জানান। বাওয়ালপুর ইউনাইটেড ফ্রন্টের নেতা ও জাতীয় পরিষদের সদস্য মিয়া নাজিমুদ্দিন এক বিবৃতিতে পরিষদে যোগদান প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে অবিলম্বে তা মেনে নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

ব্রিটেন প্রবাসী প্রায় ১০ হাজার বাঙালি লন্ডনের পাকিস্তানি হাইকমিশনের সামনে স্বাধীন বাংলার দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

## ৯ মার্চ, ১৯৭১

যথারীতি সরকারি ও আধা-সরকারি ভবন এবং যানবাহনে কালো পতাকা ওড়ানো হয়।

বঙ্গবন্ধু ঘোষিত আন্দোলনের কর্মসূচি অনুযায়ী সচিবালয়সহ সারাদেশে সব সরকারি ও আধা-সরকারি অফিস, হাইকোর্ট এবং জেলা কোর্টে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। বঙ্গবন্ধু যেসব সরকারি অফিস খুলে রাখার নির্দেশ দেন কেবল সেসব চালু থাকে। ট্রেন, লঞ্চ, বাস, ট্যাক্সি, রিকশা ও অন্যান্য যানবাহন চলাচল করে। দোকানপাট ও হাটবাজার খোলা থাকে। অভ্যন্তরীণ রুটে বিমান চলাচল বন্ধ থাকে। সারাদেশে ব্যাংকিং কাজকর্ম চলে।

সকালে ন্যাপপ্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সন্তোষ থেকে ঢাকায় পৌঁছানোর পরপর বঙ্গবন্ধু তাকে ফোন করেন। টেলিফোনে দুই নেতা আলোচনার পর আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ কেন্দ্রীয় নেতারা প্রায় আড়াই ঘণ্টা বৈঠক করেন।

রাজধানীতে দিনের উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে– পল্টন ময়দানে 'স্বাধীন বাংলা আন্দোলন সমন্বয় কমিটি'র উদ্যোগে জনসভা। জনসভায় ন্যাপপ্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও বাংলা লীগপ্রধান আতাউর রহমান খান বক্তৃতা করেন। মওলানা ভাসানী বাংলাদেশের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়ার জন্য পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন–'পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হবে। পাকিস্তান অখণ্ড থাকবে না। অখণ্ড রাখবো না। ইয়াহিয়া, তোমার বাপেরও ক্ষমতা নেই, ঠেকায়। যদি পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের ভালো চাও, তাহলে কালই বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করে নাও। অনেক হয়েছে, আর নয়। তিক্ততা বাড়িয়ে আর লাভ নেই। 'লাকুম দ্বীনুকুম অলইয়াদ্বীন' নিয়মে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করে নাও।'

আতাউর রহমান খান বলেন, 'বঙ্গবন্ধু, আপনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। আপনি স্বাধীন বাংলার জাতীয় সরকার ঘোষণা করুন।'

সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জেন্ট জহুরুল হক হল ক্যান্টিনে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সংসদের জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় 'বাঙালি জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশ 'জাতীয় সরকার' গঠনের জন্য অনুরোধ জানানো হয় এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

ইসলামাবাদে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়, আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসবেন। সামরিক কর্তৃপক্ষ রাত ৯টা থেকে রাজশাহী শহরে প্রতিদিন ৮ ঘণ্টার কারফিউ জারি করে। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়, সেনাবাহিনীকে ছাউনিতে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে বলে ঘোষণার পর রাজশাহীতে হঠাৎ সান্ধ্য আইন জারির কারণ বোধগম্য নয়।





করাচিতে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ন্যাপপ্রধান ওয়ালী খান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনার জন্য ঢাকায় আসার কথা ঘোষণা করেন। জামায়াতে ইসলামীর প্রাদেশিক আমির অধ্যাপক গোলাম আযম এক বিবৃতিতে দেশকে চরম বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষার জন্য সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়ার প্রতি আবেদন জানান।

ইসলামাবাদে লে. জেনারেল টিক্কা খানকে 'খ' অঞ্চলের (বাংলাদেশ) সামরিক শাসক নিয়োগের ঘোষণা দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতিরা নবনিযুক্ত সামরিক গভর্নর জেনারেল টিক্কা খানের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা না করার সিদ্ধান্ত নেন।

জাতিসংঘের মহাসচিব উথান্ট প্রয়োজনে ঢাকা থেকে জাতিসংঘের স্টাফ ও তাদের পরিবারদের প্রত্যাহারের জন্য ঢাকার জাতিসংঘ উপ-আবাসিক প্রতিনিধিকে নির্দেশ দেন। জাপানের পররাষ্ট্র দফতর ঢাকায় অবস্থিত তার নাগরিকদেরও প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়। পশ্চিম জার্মানি সরকার তার দেশের নাগরিকদের ফিরিয়ে নেয়ার জন্য সামরিক বিমান পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

## ১০ মার্চ, ১৯৭১

চারদিকে অসহযোগ। বস্তুত একমাত্র সেনা ছাউনিগুলো ছাড়া কোথাও পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের কোনো আদেশ-নির্দেশ কেউ মানছে না। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে চলছে সমগ্র বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাসভবন পরিণত হয়েছে বিকল্প রাষ্ট্রপ্রধানের দফতরে।

শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে সারাদেশে সরকারি ও আধা-সরকারি অফিসের কর্মচারীরা কাজে যোগদানে বিরত রয়েছেন। বেসরকারি অফিস, ব্যাংক ও ব্যবসা কেন্দ্র খোলা রাখা হয়েছে, তা তারই নির্দেশে।

সরকারি-বেসরকারি ভবন, ব্যবসা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শীর্ষে, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, থানা ও হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বাসভবনে কালো পতাকা উড়ছে। সরকারি-বেসরকারি যানবাহনের পাশাপাশি পুলিশ বাহিনীর গাড়ি কালো পতাকা লাগিয়ে রাজপথে চলাচল করছে। অসহযোগ আন্দোলনের এই দিনে নারায়ণগঞ্জ জেলখানা ভেঙে ৪০ জন কয়েদি পালিয়ে যায়। জেল পালানোর সময় কারারক্ষী ও কয়েদিদের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধে ২৭ জন আহত হয়। সামরিক কর্তৃপক্ষ রাজশাহী শহরে অনির্দিষ্টকালব্যাপী জারি করা ৮ ঘণ্টার নৈশ কারফিউ প্রত্যাহার করে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বীয় বাসভবনে একদল বিদেশি সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেন, 'সাত কোটি বাঙালি আজ তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি চায়। এ ব্যাপারে আমরা কোনো আপস করতে রাজি নই।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সার্জেন্ট জহুরুল হক হল প্রাঙ্গণে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের উদ্যোগে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ, ডাকসুর সহ-সভাপতি আ স ম আবদুর রব ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল

কুদ্দস মাখন বক্তৃতা করেন। পরে ছাত্রলীগ ও ডাকসু নেতাদের স্বাক্ষরিত স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের এক বিবৃতিতে বাঙালি সৈন্য, ইপিআর ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের প্রতি পাকিস্তানি উপনিবেশবাদী সরকারকে সহযোগিতা না করার আহ্বান জানানো হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজে নিয়োজিত প্রতিটি মুক্তিসেনাকে সব ধরনের সাহায্যের জন্য অনুরোধ করা হয়।

বিকেলে ওয়ালীপন্থি ন্যাপের উদ্যোগে ঢাকা নিউমার্কেট এলাকায় পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ সভাপতিত্ব করেন। 'লেখক-শিল্পী মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ'-এর ব্যানারে লেখক ও শিল্পীরা রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমাবেশ শেষে মিছিল বের করা হয়। ফরোয়ার্ড স্টুডেন্ট ব্লক বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে জনসমাবেশের আয়োজন করে। সিভিল সার্ভিসের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের প্রতিনিধিরা এক সভায় মিলিত হয়ে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মেনে চলার আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

নিউইয়র্কে প্রবাসী বাঙালি ছাত্ররা জাতিসংঘ সদর দফতরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ছাত্ররা নিরস্ত্র বাঙালিদের হত্যার বিষয়ে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ দাবি করে জাতিসংঘ মহাসচিব উথান্টের কাছে স্মারকলিপি দেন।

গণঐক্যের নেতা এয়ার মার্শাল আসগর খান কয়েকদিন বঙ্গবন্ধু ও অন্য নেতাদের সঙ্গে আলোচনা শেষে সন্ধ্যায় করাচির উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক বিবৃতিতে বলেন, 'বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছাই আজ শেষ কথা। বাংলাদেশের জনগণের নামে আমি যে নির্দেশ দিয়েছি সচিবালয়সহ সরকারি ও আধা-সরকারি অফিস-আদালত, রেলওয়ে ও বন্দরগুলোতে তা পালিত হচ্ছে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রতিদিন সামরিক বাহিনীর লোকজন ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসা হচ্ছে। ক্ষমতাসীন চক্র প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোবৃত্তি নিয়ে বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে গভীর চক্রান্তে লিপ্ত।

করাচিতে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনাকালে ন্যাপপ্রধান ওয়ালী খান বলেন, তিনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে মতবিনিময়ের জন্য ১৩ মার্চ ঢাকায় আসবেন। করাচিতে ওয়ালি ন্যাপের পশ্চিম পাকিস্তান শাখার মহাসচিব মীর গাউস বখস নেজেঞ্জো বিবৃতিতে বলেন, আওয়ামী লীগপ্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের প্রস্তাব কেবল বাংলাদেশের নয় বরং সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান ও পাঞ্জাবের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে।

লাহোরে সাবেক পিডিএম প্রধান নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানের আহ্বানে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের সভায় বঙ্গবন্ধু জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগদানের জন্য যে পূর্বশর্ত দিয়েছেন তার প্রতি নীতিগতভাবে পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করা হয়। লাহোরে কাউন্সিল মুসলিম লীগের সভাপতি মিয়া মমতাজ মোহাম্মদ খান দৌলতানা বিবৃতিতে বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার অবিলম্বে ঢাকায় গিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা উচিত। করাচিতে কাউন্সিল মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতা জেডএইচ লারী বিবৃতিতে বলেন, আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও সেনাবাহিনীকে ছাউনিতে ফিরিয়ে নেয়ার দাবি করেছে তা অবিলম্বে পূরণ করা উচিত। তবে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সাপেক্ষে সামরিক আইন প্রত্যাহার ও জনপ্রতিনিধিদের





কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত দাবি দুটির বিবেচনা স্থগিত রাখা উত্তম। ইসলামাবাদে পাঞ্জাব আওয়ামী লীগের সভাপতি এম খুরশিদ রাতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

## ১১ মার্চ, ১৯৭১

হাইকোর্টের বিচারপতি, সচিবালয়ের সচিব সবাই চলছেন অসহযোগ আন্দোলনের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান যেন কার্যত ঢাকার সরকার। সরকারি-বেসরকারি সর্বস্তরের কর্মচারী তার নির্দেশ পালন করছেন। কেবল সামরিক দফতরে পাকিস্তানি পতাকা উড়ছে। আর কোথাও পাকিস্তানের পতাকা দেখা যায় না। সারাদেশে বেসরকারি ভবন ও বাসগৃহে উড়ছে স্বাধীন বাংলার পতাকা। বাংলাদেশের ভেতর ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগ স্বাভাবিক হয়। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে স্টেট ব্যাংক, তফসিলি ব্যাংক ও সরকারি ট্রেজারিতে স্বাভাবিক লেনদেন চলে।

বিমান চলাচল ছাড়া সড়ক, রেল, ও নৌ-চলাচল অব্যাহত থাকে। নগরীর বিপণিগুলো বিকেল পর্যন্ত খোলা থাকে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ছাত্র সংগঠন ও পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে রাজধানীতে সভা, সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

নারায়ণগঞ্জে ছায়াছবি প্রদর্শনীর আগে প্রেক্ষাগৃহগুলোতে পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীতের বদলে 'জয় বাংলা, বাংলার জয়' গানটি পরিবেশন করা হয়।

বরিশালে জেলখানা ভেঙে ২৪ জন কয়েদি পালিয়ে যায়। এখানে পুলিশের গুলিতে দুজন কয়েদি নিহত হয়। কয়েদি-কারারক্ষী সংঘর্ষে ২০ জন কয়েদি ও ২৫ জন রক্ষী আহত হয়। কুমিল্লায় জেলখানা ভেঙে পালানোর সময় কারারক্ষীদের গুলিতে তিনজন কয়েদি নিহত হয়। সংঘর্ষে পুলিশসহ শতাধিক আসামি ও কয়েদি আহত হয়।

ন্যাপ (ওয়ালী) বাংলাদেশ শাখার সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, পাঞ্জাব আওয়ামী লীগ সভাপতি এম খুরশীদ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রধান মমতাজ দৌলতানার বিশেষ দূত পীর সাইফুদ্দিন ও ঢাকায় নিযুক্ত জাতিসংঘের সহকারী আবাসিক প্রতিনিধি কে উলফ বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তার ধানমন্ডির বাসভবনে পৃথক বৈঠকে মিলিত হন।

রাতে এক সামরিক নির্দেশে বলা হয়, কেউ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকারি সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করলে অথবা সেনাবাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণে বা গতিবিধিতে অন্তরায় সৃষ্টি করলে তাদের সংশ্লিষ্ট সামরিক বিধি অনুযায়ী বিচার করা হবে।

দেশের বিভিন্ন স্থানে সেনাবাহিনীর রসদ সরবরাহের সময় জনতা বাধা সৃষ্টি করে। সিলেট ও যশোরে রেশন নেয়ার সময় সেনাবাহিনীর একটি কনভয়কে বাধা দেয়া হয়।

স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে দুটি বিবৃতি দেয়া হয়। পরিষদ নেতা নূরে আলম সিদ্দিকী, শাজাহান সিরাজ, আ স ম আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, গত ১০ মার্চ ভোরে চট্টগ্রাম বন্দরের ১৭ নম্বর জেটিতে এমএন সোয়াত নামে একটি অস্ত্রবাহী জাহাজ নোঙর করেছে। বন্দর শ্রমিকরা সে জাহাজ থেকে সমরাস্ত্র

খালাসের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করেছেন। স্বাধীন বাংলার নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্যই এ সমরাস্ত্র বাংলাদেশে আনা হয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা বাংলাদেশের জনসাধারণকে সজাগ করে দিচ্ছি। স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ অপর এক যুক্ত বিবৃতিতে সরকার প্রদত্ত যাবতীয় খেতাব ও পদক বর্জনের জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। রাতে আওয়ামী লীগের পক্ষে জনগণের উদ্দেশে প্রশাসনিক ও ব্যাংকিং সংক্রান্ত কিছু নির্দেশনামা ঘোষণা করা হয়।

সামরিক কর্তৃপক্ষ রংপুর শহরে আরোপিত রাত্রিকালীন কারফিউ প্রত্যাহার করে নেয়। টাঙ্গাইলে বিন্দুবাসিনী হাই স্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় ন্যাপপ্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বঙ্গবন্ধু ঘোষিত স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করে বলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান সাত কোটি বাঙালির নেতা। নেতার নির্দেশ পালন করুন।' জাতীয় লীগ প্রধান আতাউর রহমান খান এক বিবৃতিতে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উদ্দেশে বলেন, 'ভাবাবেগে বিহ্বল না হয়ে বাস্তব সত্যকে উপলব্ধি করুন। আসুন আমরা ভাই ও বন্ধুর মতো কোলাকুলি করে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিই।' পিপলস পার্টি চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো করাচি থেকে বঙ্গবন্ধুর কাছে তারবার্তা পাঠান। তারবার্তায় ভুট্টো বলেন, 'আমি শিগগির আবার ঢাকায় গিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করে উদ্ভূত সমস্যার একটি সমাধান বের করার জন্যও তৈরি আছি।' করাচিতে গণঐক্য আন্দোলনের নেতা এয়ার মার্শাল (অব.) আগসর খান সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'প্রেসিডেন্টের এখন উচিত আওয়ামী লীগ প্রধানের দেয়া শর্ত মেনে নিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে অবিলম্বে ক্ষমতা ছাড়া না হলে দেশের দুই অংশকে এক রাখা কোনোভাবেই সম্ভব হবে না।'

**১২ মার্চ, ১৯৭১**

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার ধানমন্ডির বাসভবনে স্থানীয় এবং পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে সিরিজ বৈঠক করেন। সকাল-সন্ধ্যা বৈঠকের ফাঁকে ফাঁকে তিনি বাসভবনের দোতলায় এসে ৩২নং সড়কে সমবেত মিছিলকারীদের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে সংগ্রামী শুভেচ্ছা জানান। প্রত্যেককে যার যার এলাকায় গিয়ে সংগ্রাম পরিষদ গঠনের নির্দেশ দেন। জাতীয় লীগ প্রধান আতাউর রহমান খান ও পাঞ্জাবের কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতা পীর সাইফুদ্দিন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে পৃথক বৈঠকে মিলিত হন। সারাদেশে এলাকাও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ছাত্র, শ্রমিক পেশাজীবী সংগঠনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভা-সমাবেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য দুর্জয় শপথ নেয়া হয়। বগুড়া জেলখানা ভেঙে ২৭ জন কয়েদি পালিয়ে যায়। চলচ্চিত্র প্রদর্শকরা অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে সারাদেশে অনির্দিষ্টকাল প্রেক্ষাগৃহ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেন।

পূর্ব রেলওয়ে কর্মচারী এবং চারু ও কারুশিল্পীরা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেন। জাতীয় শ্রমিক লীগের জরুরি সভায় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ঢাকা নগর





আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির সভায় সব ইউনিট ও ইউনিয়নকে সংগ্রাম পরিষদ গঠনের নির্দেশ দেয়া হয়।

জাতীয় পরিষদ সদস্য মোহাম্মদ জহিরউদ্দিন পাকিস্তান সরকারের খেতাব বর্জন করেন। রাওয়ালপিন্ডিতে এক সরকারি ঘোষণায় আগামী ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসের নির্ধারিত সম্মিলিত সশস্ত্রবাহিনীর কুচকাওয়াজ, খেতাব বিতরণ অন্যান্য অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়।

ময়মনসিংহে জনসভায় ন্যাপপ্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বলেন, আমি জানি, শেখ মুজিবুর রহমান কখনোই জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। আপনারা শেখ মুজিবের ওপর সম্পূর্ণ ভরসা রাখুন।

লাহোরে সংবাদ সম্মেলনে গণঐক্য আন্দোলনের প্রধান এয়ার মার্শাল (অব.) আসগর আলী খান বলেন, 'পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য এখন একটি মাত্র পথ খোলা রয়েছে তা হচ্ছে শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর।' তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে প্রথম ফ্লাইটে ঢাকা যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে বলেন, 'হাতে সময় খুব কম। আপনি ঢাকা গিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে বৈঠকে বসুন।'

লারকানা থেকে লাহোর যাওয়ার পথে মুলতান বিমানবন্দরে পিপলস পার্টি চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, 'পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সংহতি রক্ষার জন্য আমার দল সব ধরনের সাহায্যে প্রস্তুত।'

লাহোর ন্যাপের মহাসচিব সি আর আসলাম এক বিবৃতিতে বলেন, শক্তি প্রয়োগের নীতি অব্যাহত থাকলে পূর্ব পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতার মনোভাব শক্তিশালী হবে। প্রেসিডেন্টের অবিলম্বে শেখ মুজিবুর রহমানের চার দফা মেনে নেয়া উচিত।

লাহোর স্থানীয় বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিকসহ ছাত্র, শ্রমিক ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতারা এক যুক্ত বিবৃতিতে অবিলম্বে বঙ্গবন্ধুর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান। করাচিতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খলিল আহমদ তিরমিজি এক বিবৃতিতে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিকদের প্রতি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্গবন্ধু আহূত গণআন্দোলনের শরিক হওয়ার আহ্বান জানান।

রেডিও পাকিস্তান করাচি কেন্দ্রের খ্যাতনামা বাংলা খবর পাঠক সরকার কবীর উদ্দিন বেতারে বঙ্গবন্ধুর খবর প্রচারের নিয়ন্ত্রণ আরোপের প্রতিবাদে রেডিও পাকিস্তান বর্জন করেন।

প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ দলের নেতা ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের জন্য পাঠানো খাদ্য বোঝাই মার্কিন জাহাজের গতি বদল করে করাচি নেয়ার ঘটনায় উৎকণ্ঠা ও নিন্দা প্রকাশ করেন।

**১৩ মার্চ, ১৯৭১**

একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনে অন্যান্যের সঙ্গে প্রতিরক্ষা বিভাগের বেসামরিক কর্মচারীরাও শরিক হয়েছেন। তারা কর্মবিরতি পালন করে প্রতিদিন মিছিল-মিটিং করেন। সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষ ১৫ মার্চ সকাল ১০টার মধ্যে প্রতিরক্ষা বিভাগের বেসামরিক কর্মচারীদের কাজে যোগদানের নির্দেশ দেয়। সামরিক নির্দেশে বলা হয়, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজে যোগদানে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্টদের চাকরিচ্যুত ও পলাতক ঘোষণা করে সামরিক আদালতে বিচার করা হবে। নির্দেশ অমান্যকারীদের সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হবে।

সামরিক নির্দেশ জারির পরপরই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক বিবৃতিতে বলেন, 'যখন খোদ সামরিক শাসন প্রত্যাহারের জন্য আমরা বাংলার জনগণের দাবির কথা ঘোষণা করেছি, ঠিক তখনই নতুন করে এ ধরনের সামরিক নির্দেশ জারি করা পক্ষান্তরে জনসাধারণকে উস্কানিরই শামিল।' বঙ্গবন্ধু সামরিক কর্তৃপক্ষের প্রতি উস্কানিমূলক তৎপরতা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'জনগণকে যত ভয় দেখানো হোক না কেন, তারা তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।'

ঢাকার জাতিসংঘ ও পশ্চিম জার্মানি দূতাবাসের কর্মচারী, তাদের পরিবারবর্গ এবং ইতালি, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও কানাডার ২৬৫ জন নাগরিক বিশেষ বিমানে বাংলাদেশ ত্যাগ করেন। বিশিষ্ট শিল্পী জয়নুল আবেদিন ও সাবেক জাতীয় পরিষদ সদস্য আবদুল হাকিম পাকিস্তান সরকারের দেয়া খেতাব ও পদক বর্জন করেন।

সাবেক জাতীয় পরিষদ সদস্য আফাজউদ্দিন ফকির এক বিবৃতিতে অবিলম্বে বাংলাদেশে প্রতিরক্ষা বাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব একজন বাঙালি জেনারেলের কাছে হস্তান্ত র, বেঙ্গল রেজিমেন্টের সবক'টি ব্যাটালিয়নের পরিচালনা কর্তৃত্ব বাঙালি অফিসারদের হাতে অর্পণ এবং বিগত এক মাসে যে অতিরিক্ত পাকিস্তানি সৈন্য আনা হয়েছে তাদের বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাহারের দাবি জানান।

ভৈরবে এক জনসভায় ন্যাপপ্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বলেন, বর্তমানে পূর্ব বাংলা আসলে স্বাধীন। আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ সরকার গঠনের অপেক্ষায় আছি।

স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্য নূরে আলম সিদ্দিকী, শাজাহান সিরাজ, আসম আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন এক যুক্ত বিবৃতিতে বাংলাদেশ ত্যাগকারীদের বাড়ি-গাড়ি-সম্পদ কিনে বাংলার অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচারে সহযোগিতা না করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

সকালে রমনা পার্কে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ জনসভা করে। শীতলক্ষ্যায় অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের উদ্যোগে দীর্ঘ নৌ-মিছিল বের করা হয়। চট্টগ্রামে বেগম উমরতুল ফজলের সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত মহিলাদের এক সমাবেশে বাংলাদেশের জনগণের পরিপূর্ণ মুক্তি অর্জন না হওয়া পর্যন্ত বিলাসদ্রব্য বর্জন ও কালো ব্যাজ ধারণের জন্য নারী-পুরুষ সবার প্রতি আহ্বান জানানো হয়।





ন্যাপের সভাপতি খান আবদুল ওয়ালী খান ও ন্যাপ নেতা গাউস বক্স বেজেঞ্জো সকালে করাচি থেকে বিমানে ঢাকায় আসেন। ঢাকা বিমানবন্দরে ন্যাপপ্রধান সাংবাদিকদের বলেন, 'বর্তমান সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনার জন্য আমি খোলা মন নিয়ে ঢাকায় এসেছি। সামরিক শাসন প্রত্যাহার ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত শেখ মুজিবুর রহমানের দাবির প্রশ্নে আমি তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।'

লাহোর জাতীয় পরিষদের সংখ্যালঘিষ্ঠ ৫টি দলের পার্লামেন্টারি পার্টির নেতারা এক সভায় মিলিত হয়ে অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান। সভায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে অবিলম্বে বাংলাদেশে গিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনা করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের অনুরোধ জানানো হয়। সভায় কাউন্সিল মুসলিম লীগ, কনভেনশন লীগ, জামায়াতে ইসলামী, তমিয়তে ইসলাম ও জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের নেতাসহ কয়েকজন স্বতন্ত্র সাংসদ অংশ নেন।

## ১৪ মার্চ, ১৯৭১

টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, সর্বত্র বেসামরিক প্রশাসন চলছে আওয়ামী লীগের জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশে। একদিকে পাকিস্তান সরকারের নির্দেশ অমান্য, অন্যদিকে আরো বড় ত্যাগের জন্য প্রস্তুতি চলছে। জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগদানের প্রশ্নে বঙ্গবন্ধুর ৪ দফা পূর্বশর্ত মেনে নেয়ার দাবিতে রাজধানী ঢাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ছাত্র, শ্রমিক, যুব মহিলা, পেশাজীবী, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে সভা-সমাবেশ-শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ দেশ থেকে সম্পদ পাচার প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ঢাকায় বিভিন্ন পয়েন্টে চেকপোস্ট স্থাপন করে। জাতীয় শ্রমিক লীগ কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ প্রতিটি শ্রমিক এলাকায় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করে ট্রেনিং প্রদানের নির্দেশ দেয়। বাংলাদেশের জন্য খাদ্যশস্যবাহী 'মন্টেসেলো ভিক্টরি' নামে একটি জাহাজের গতিপথ পরিবর্তন করে চট্টগ্রাম থেকে করাচি নিয়ে যাওয়া হয়। ওসান এন্ডুরাস রামের সমরাস্ত্রবাহী আরেকটি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরের ১০ নম্বর জেটিতে নোঙর করে। বন্দরকর্মী ও শ্রমিকদের অসহযোগিতায় চট্টগ্রাম বন্দরের ১৬ নম্বর জেটিতে নোঙর করা অস্ত্রবাহী জাহাজের সোয়াতের সমরাস্ত্র খালাসের চেষ্টা করে কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়। ঢাকার নৌবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত লে. কমান্ডার ইমাম হোসেন এক বিবৃতিতে অবিলম্বে বাংলাদেশে অবস্থানরত সব অবাঙালি সৈন্যকে প্রত্যাহার করে বাঙালি সৈন্যদের তাদের স্থলাভিষিক্ত করার আহ্বান জানান। রাতে সংগ্রাম পরিষদের নেতা নূরে আলম সিদ্দিকী, শাজাহান সিরাজ, আ স ম আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন এক যুক্ত বিবৃতিতে বর্তমানে বাংলাদেশে ছুটিতে অবস্থানকারী কেন্দ্রীয় সরকারের বাঙালি কর্মচারীদের পশ্চিম পাকিস্তানে ফেরত না গিয়ে নিজ নিজ এলাকার সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানান।

সকালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ও ন্যাপ নেতা আবদুল ওয়ালী খান আলোচনা বৈঠক করেন। বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে রুদ্ধদ্বার কক্ষে প্রায় দেড় ঘণ্টা আলোচনা চলে। বৈঠকে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও জাতীয় পরিষদের আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির উপনেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এএইচএম কামরুজ্জামান ও ওয়ালী ন্যাপের কেন্দ্রীয় নেতা গাউস বক্স বেজেঞ্জো উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের বঙ্গবন্ধু বলেন, 'প্রেসিডেন্ট ঢাকা এলে আমি তার সঙ্গে কথা বলতে রাজি আছি।'

অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে সংবাদপত্র প্রেস কর্মচারী ফেডারেশনের উদ্যোগে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে সমাবেশ শেষে প্রেস কর্মচারীরা মিছিল করে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে গেলে তিনি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। বঙ্গবন্ধু বলেন, 'কেউ যদি আমাদের ওপর নির্যাতন চালাতে চেষ্টা করে তাহলে আমরাও তাকে সহজে ছেড়ে দেব না।' বঙ্গবন্ধু নিজেদের মুক্তির জন্য বাংলার প্রতিটি গৃহকে এক একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

সামরিক নির্দেশের প্রতিবাদে দেশরক্ষা বিভাগের বেসামরিক কর্মচারীরা নগরীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তারা ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি ও কর্মস্থল বর্জনের কর্মসূচি অব্যাহত রাখার অঙ্গিকার ঘোষণা করেন। ছাত্রলীগের উদ্যোগে লালবাগ বালুর মাঠে এক ছাত্র-জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ডিআইটি ভবন প্রাঙ্গণে টিভি নাট্যশিল্পীদের এক সমাবেশে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করা হয়। বাংলা একাডেমীতে লেখক সংগ্রাম শিবিরের উদ্যোগে লেখক সমাবেশ শেষে শোভাযাত্রা বের করা হয়। ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ) বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে জনসভার আয়োজন করে। সদরঘাটে ফরোয়ার্ড স্টুডেন্টস বৱকের উদ্যোগে জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় পল্টন ময়দানে কথাশিল্পী সম্প্রদায় কবিতা পাঠ ও গণসঙ্গীতের আসর বসায়। বরিশালে এক জনসভায় বাংলা জাতীয় লীগ প্রধান আতাউর রহমান খান শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার গঠন করার আহ্বান জানান।

রাতে বঙ্গবন্ধু এক বিবৃতিতে অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়ে নতুন নির্দেশ ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের জনগণের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে নির্মূল করা যাবে না। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা যাতে স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে মর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে পারে তা নিশ্চিত করতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।' বঙ্গবন্ধু বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা স্বাধীনতা অর্জন না করবো ততক্ষণ আমাদের সংগ্রাম পূর্ণোদ্যমে চলবে। এ লক্ষ্যে আমি যে কোনো আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকার এবং সম্ভাব্য যে কোনো বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।'

করাচির নিশাত পার্কে পিপলস পার্টির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জনসভায় পিপিপি চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের দুই অংশের দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব দেন।





**১৫ মার্চ, ১৯৭১**

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে সারা বাংলায় অফিস-আদালতে যথারীতি পূর্ণ কর্মবিরতি পালন করা হয়। দিনব্যাপী রাজধানী ঢাকায় সভা ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। সরকারি ও বেসরকারি ভবনের শীর্ষে এবং যানবাহনে কালো পতাকা ওড়ে। কালো পতাকার পাশাপাশি অনেক ভবনে-শীর্ষে স্বাধীন বাংলার পতাকাও তোলা হয়। সামরিক কর্তৃপক্ষ দেশরক্ষা বিভাগের বেসামরিক কর্মচারীদের কাজে যোগদানের নির্দেশ দিলেও তারা কর্মস্থলে যোগদানে বিরত থাকেন।

পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের অব্যাহত চাপের মুখে জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বৈঠকের জন্য সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান বিকেলে করাচি থেকে ঢাকায় আসেন। কোনো সাংবাদিক ও বাঙালিকে এ সময় বিমানবন্দরে প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি।

সকালে বেসামরিক কর্মচারীরা নাখালপাড়ায় সভাশেষে রাজপথে বিক্ষোভ মিছিল করেন। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে চিকিৎসকরা সমাবেশ শেষে বের করেন শোভাযাত্রা। বিকেলে কবি সুফিয়া কামালের সভানেত্রীত্বে তোপখানা রোডে মহিলাদের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বেতার ও টিভি শিল্পীরা দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন। উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্পীরা ভ্রাম্যমাণ ট্রাকযোগে গণসঙ্গীত ও পথনাটক পরিবেশন করেন নগরীর বিভিন্ন স্থানে।

নয়া সামরিক বিধি জারির প্রতিবাদে বিকেলে স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে ছাত্র জনসভা শেষে বিরাট জঙ্গি মিছিল বের করা হয়। ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে জনসভায় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ, ডাকসুর সহ-সভাপতি আ স ম আবদুর রব ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখন প্রমুখ বক্তৃতা করেন। জনসভায় গৃহীত প্রস্তাবে অবিলম্বে বাংলাদেশ থেকে অবাঙালি সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, বাংলাদেশ কেবল বাংলার সর্বাধিনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই নির্দেশ জারি করতে পারেন। বাংলাদেশের জনসাধারণ একমাত্র বঙ্গবন্ধুর নির্দেশই মানবে, অন্য কারো নয়।

খুলনায় শহীদ হাদিস পার্কে এক জনসভায় বাংলা জাতীয় লীগ প্রধান আতাউর রহমান খান অবিলম্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং জাতীয় সরকার গঠনের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ আজ বঙ্গবন্ধুর পেছনে একতাবদ্ধ। রেডিও, ইপিআর ও পুলিশ বাহিনী, সেক্রেটারিয়েট প্রভৃতি আজ আওয়ামী লীগ প্রধানের আজ্ঞাবাহী।'

করাচিতে পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো এক সংবাদ সম্মেলনে নতুন দাবি উত্থাপন করে বলেন, 'কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ ও পিপলস পার্টির সমন্বয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে হবে।' ভুট্টো বলেন, 'পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে

ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে এ দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রযোজ্য হতে পারে না। তিনি বলেন, কেন্দ্রে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হলে অবশ্যই তা পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে করতে হবে। দেশ শাসনের প্রশ্নে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে অবশ্যই পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ইচ্ছার মূল্য দিতে হবে।'

ভুট্টো বলেন, 'আমি জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলের নেতার ভূমিকা পালন করতে চাই না। কেননা এতে দেশের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম পাকিস্তান সব সময়ই পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বাঙালিদের দ্বারা শাসিত হতে থাকবে।'

আগের দিন অর্থাৎ ১৪ মার্চ করাচির জনসভায় পিপলস পার্টি প্রধান ভুট্টো পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের যে দাবি করেন, বাংলাদেশে ও পশ্চিম পাকিস্তানে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। ঢাকায় পিডিপি প্রধান নূরুল আমিন এ প্রসঙ্গে বলেন, একই পরিষদে দুটি মেজরিটি পার্টি থাকতে পারে না। জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগই একমাত্র মেজরিটি পার্টি। প্রবীণ রাজনীতিক আবুল হাশিম বলেন, ভুট্টো পাকিস্তানের ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী, অন্যথায় পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চান। কিন্তু জাতীয় পরিষদে তার স্থান বিরোধী দলের আসনে। ভুট্টোর কথামতো প্রেসিডেন্ট চললে পাকিস্তানের বিভক্তি অনিবার্য।

ন্যাপপ্রধান ওয়ালী খান সকালে পিডিপি প্রধান নুরুল আমিনের সঙ্গে তার বাসভবনে বৈঠকে মিলিত হন। করাচিতে জমিয়তে ওলামায়ে মহাসচিব মাওলানা মুফতি মাহমুদ পিপিপি প্রধানের প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, দেশে দুটি নয়, একটিমাত্র মেজরিটি পার্টি আছে আর সেটি আওয়ামী লীগ। সুতরাং শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা উচিত। দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে ভুট্টোর দাবি কেবল অযৌক্তিকই নয়, অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক।

করাচিতে এক সভায় বেশ কয়েকজন প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা বলেন, ক্ষমতা লাভের জন্য আওয়ামী লীগই একমাত্র দল। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের জন্য একমাত্র ভুট্টোই দায়ী। ভুট্টো যদি সত্যিই বর্তমান সমস্যার সমাধান চান তাহলে তার উচিত অবিলম্বে ঢাকায় গিয়ে শেখ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য প্রার্থনা জানানো।

## ১৬ মার্চ, ১৯৭১

ঢাকায় একমাত্র প্রেসিডেন্ট হাউস ছাড়া সর্বত্র কালো পতাকা উড়ছে। অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসেবে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুযায়ী কিছু সরকারি দফতর বাদ দিয়ে সব অফিস-আদালতে কর্মবিরতি পালন করা হচ্ছে। সকালে স্বাধীনতাকামী জনতার সর্বাত্মক অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিতে ঢাকায় প্রেসিডেন্ট ভবনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের মধ্যে দেশ ও দেশবাসীর ভাগ্যনির্ধারণী গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক শুরু হয়। বঙ্গবন্ধু সাদা গাড়িতে শোকের প্রতীক কালো পতাকা উড়িয়ে প্রেসিডেন্ট ভবনে আসেন।





এ সময় প্রেসিডেন্ট ভবনের অদূরে সংরক্ষিত এলাকার বাইরে দাঁড়িয়ে ছাত্র-জনতা 'জয় বাংলা' 'জয় বঙ্গবন্ধু' ধ্বনি দিয়ে প্রিয় নেতাকে অভিবাদন জানান। বেলা ১১টায় রুদ্ধদ্বার কক্ষে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দণ্ডধারী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও সংসদীয় ক্ষমতার অধিকারী শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে শুরু হয় একান্ত আলোচনা। বৈঠক চলে আড়াই ঘণ্টা। বৈঠক শেষে বঙ্গবন্ধু প্রেসিডেন্ট ভবনের প্রধান ফটকে দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের জানান, 'আমি রাজনৈতিক ও অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনা করেছি। আলোচনা চলবে। কাল সকালে আমরাই আবার বসছি।' প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে সরাসরি ধানমন্ডির বাসভবনে ফিরে বঙ্গবন্ধু দলের শীর্ষস্থানীয় সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। বিকেল পর্যন্ত এ বৈঠক চলে। রাত ৮টায় বঙ্গবন্ধু আবার সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। গভীর রাত পর্যন্ত এ বৈঠক চলে। দু'দফা সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনার ফাঁকে বিকেলে বঙ্গবন্ধু তার বাসভবনে কনভেনশন মুসলিম লীগ প্রধান ফজলুল কাদের চৌধুরীকে সাক্ষাৎ দান করেন।

ঢাকা হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে আইনজীবীদের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে আসাদুজ্জামান খান সভাপতিত্ব করেন। চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা শহীদ মিনারে সভা করেন। সভাশেষে মিছিল বের করা হয়। মিছিলে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ও শিল্পী মুর্তজা বশীর নেতৃত্ব দেন। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে ব্রতচারী আন্দোলনের অনুশীলন শুরু হয়। বিকেলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শিল্পী ও সাহিত্যিকরা কবিতা পাঠ ও গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন। বুলবুল ললিতকলা একাডেমির শিল্পীরা ধানমন্ডিতে দেশের গান পরিবেশন করেন। বিকেলে ডাক বিভাগের কর্মীরা বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে সমাবেশ শেষে রাজপথে শোভাযাত্রা বের করেন। টঙ্গীতে শ্রমিকরা জঙ্গি মিছিল বের করেন, নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যায় ডকইয়ার্ড শ্রমিকরা নৌ-মিছিল বের করেন। সারাদেশে সভা ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামে যে কোনো ত্যাগ স্বীকারের জন্য দৃঢ়সংকল্প ব্যক্ত করা হয়। দু'হাজারেরও বেশি অবাঙালিকে নিয়ে বিশেষ ব্যবস্থায় একটি যাত্রীবাহী জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দর থেকে করাচি রওনা হয়। জাতীয় শিপিং কর্পোরেশনের দুজন বাঙালি পরিচালক সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের কাছে শেয়ারহোল্ডারদের পক্ষ থেকে পাঠানো এক তারবার্তায় বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সংস্থার জাহাজে করে পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য ও সমরাস্ত্র আনার প্রতিবাদ জানান।

ভারত সরকার তার ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে সব বিদেশি বিমানের পূর্ব পাকিস্তান গমন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিদেশি বিমানের পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য পরিবহন বন্ধ করার জন্যই এ ব্যবস্থা নেয়া হয়। ভারতের সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ নয়াদিল্লিতে বলেন, 'জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারে বিশ্বাসী বিশ্বের প্রতিটি মানুষ ও সরকারের উচিত শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশকে অকুণ্ঠ সমর্থন দেয়া।'

ময়মনসিংহে এক জনসভায় ন্যাপপ্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আহ্বান

জানান। ন্যাপপ্রধান বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু ও পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানান।

শাসনতন্ত্র প্রণয়নের আগে আওয়ামী লীগ ও পিপলস পার্টির সমন্বয়ে একটি কোয়ালিশন সরকার গঠন সংক্রান্ত পিপিপি চেয়ারম্যান ভুট্টোর প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করে পশ্চিম পাকিস্তানি নেতারা পৃথক পৃথক বিবৃতি দেন। লাহোর কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রধান মিয়া মোমতাজ মোহাম্মদ খান দৌলতানা বলেন, 'পাকিস্তান একটি, সুতরাং দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রশ্ন উঠতে পারে না।' বাহাওয়ালপুরে যুক্তফ্রন্টের নেতা মিয়া নিজামউদ্দিন হায়দার বলেন, 'ভুট্টো প্রকৃতপক্ষে দুই শাসনতন্ত্র, দুই সরকার ও দুই দেশ চাচ্ছেন।' করাচিতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কাজী ফয়েজ মোহাম্মদ বলেন, 'গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দল একটি, অতএব সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে, অন্যের কাছে নয়।'

## ১৭ মার্চ ১৯৭১

'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।' বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে ছাত্রছাত্রী, তরুণ-যুবা স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ময়দানসহ রাজধানীর বিভিন্ন পাড়া-মহল্লায় কুচকাওয়াজ এবং রাইফেল প্রশিক্ষণ শুরু করে। ঢাকার বাইরেও স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও তরুণরা বাঁশের লাঠি নিয়ে প্রকাশ্যে প্রশিক্ষণে অংশ নেয়। তাদের অবসরপ্রাপ্ত বাঙালি সৈনিক ও পুলিশ সদস্যরা প্রশিক্ষণ দেন।

স্বাধীন বাংলার কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসকে 'প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে পালনের কর্মসূচি ঘোষণা করে। ২৩ মার্চ সকাল ৬টায় সরকারি-বেসরকারি অফিস-আদালত, শিক্ষা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং যানবাহনে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন, প্রভাতফেরি, শহীদদের কবর জিয়ারত, শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ, 'জয়বাংলা' বাহিনীর কুচকাওয়াজ এবং বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় ছাত্র-জনসভার কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

রাজধানীতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সভা ও শোভাযাত্রা বের করা হয়। বিভিন্ন অফিস-আদালত ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। হাজার হাজার মানুষ শহীদ মিনারে গিয়ে বঙ্গবন্ধু ঘোষিত স্বাধীনতা সংগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করার শপথ নেন। বিকেলে মোহাম্মদপুরে এক জনসভায় ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে শরিক হওয়ার জন্য স্থানীয় অবাঙালি নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আপনারা বাংলার মাটি ও মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান।'

## ১৮ মার্চ, ১৯৭১

স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর আগ পর্যন্ত স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী জনতার নির্দেশনার স্থল ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ধানমন্ডির ৩২নং সড়কের বাড়িটি। অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে





প্রতিদিন অগণিত মিছিল আসে এই বাড়ির সামনে। ভোর থেকে রাত পর্যন্ত জনতা বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে ভিড় জমায়।

সরকারি-বেসরকারি ভবনের শীর্ষে কালো পতাকা উড়িয়ে অফিস-আদালতে অনুপস্থিত থেকে সব শ্রেণির কর্মচারী চলমান অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সপ্তদশ দিবসের কর্মসূচি সফল করে তোলেন। ঢাকার রাজপথ ছাত্র-শ্রমিক-জনতার পদচারণায় প্রকম্পিত। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বিভিন্ন সংগঠন ও সমাজের সর্বস্তরের মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য দৃপ্ত শপথ গ্রহণ করেন।

বিভিন্ন স্তরের মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়কের প্রতি তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন জানাতে এলে বঙ্গবন্ধু প্রতিটি মিছিলের প্রতি 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়ে সমবেত জনতার শ্লোগান ও করতালির জবাব দেন। সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে তিনি বারবার বৈঠক থেকে উঠে এসে শোভাযাত্রাকারীদের উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। সমবেত মিছিলকারীদের প্রতি স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বাধিনায়ক বলেন, 'তোমরা চরম প্রস্তুতি নিয়ে ঘরে ঘরে সংগ্রামী দুর্গ গড়ে তোলো। যদি তোমাদের ওপর আঘাত আসে তা প্রতিহত করে শত্রুর ওপর পাল্টা আঘাত হান। মনে রাখবা, চরম ত্যাগের বিনিময়ে হলেও আমরা মূল লক্ষ্যে পৌঁছবই।'

অনকে সময় মিছিলকারীরা স্বাধীনতার সপক্ষে গ্লোগান দিতে থাকলে তিনি তাদের উদ্দেশে বলেন, 'তোমরা স্বাধীনতা পাবে, ধৈর্য ধরবো।'

বঙ্গবন্ধু সমবেত ব্যাংক কর্মচারীদের উদ্দেশে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, 'প্রয়োজন হলে বাংলাদেশের সমস্ত ব্যাংক জনগণের নিয়ন্ত্রণে আনা হবে।'

সকালে আওয়ামী লীগ প্রধান ও ওয়ালী ন্যাপপ্রধান ওয়ালী খান এক বৈঠকে মিলিত হন। বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে রুদ্ধদ্বার কক্ষে একঘণ্টা স্থায়ী এ বৈঠকে পশ্চিম পাকিস্তান ন্যাপের সভাপতি গাউস বক্স বেজোঞ্জাও উপস্থিত ছিলেন।

রাতে বঙ্গবন্ধু এক বিবৃতিতে সেনাবাহিনী তলব সংক্রান্ত তদন্ত কমিশন প্রসঙ্গে বলেন, 'আমরা এ ধরনের তদন্ত কমিশন চাইনি। আমরা চেয়েছিলাম সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও প্রকাশ্য তদন্ত। তাই আমি এই কমিশন মেনে নিতে পারি না।'

রাতে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়, ১৯ মার্চ বেলা ১১টায় প্রেসিডেন্ট হাউসে আওয়ামী লীগ প্রধান ও প্রেসিডেন্টের মধ্যে বর্তমান রাজনৈতিক সংকট সম্পর্কে তৃতীয় দফা আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

সকালে সেনাবাহিনীর সদস্যরা তেজগাঁও ও মহাখালীতে নিরস্ত্র ট্রাক আরোহীদের নির্মমভাবে প্রহর করে। এ ঘটনায় নগরীতে জনসাধারণের মধ্যে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। জনগণ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

রাতে এ ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির উপনেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম এক বিবৃতিতে বলেন, 'আমাদের বারবার প্রতিবাদ সত্ত্বেও সেনাবাহিনীর দায়িত্বজ্ঞানহীন কার্যকলাপ অব্যাহত রয়েছে। ক্যান্টনমেন্ট এলাকার সৈন্যরা সম্পূর্ণ বিনা

অজুহাতে নিরস্ত্র নিরীহ-নিরপরাধ-অসামরিক বাসিন্দাদের অপদস্ত, হয়রানি ও নির্যাতন করছে। ঢাকাসহ সারাদেশে সেনাবাহিনীর উস্কানিমূলক তৎপরতা অব্যাহত থাকায় জনগণ আজ বিক্ষুব্ধ। আমরা পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই এ ধরনের উস্কানিমূলক আচরণ তা যে কোনো মহলেই হোক না কেন, আর সহ্য করা হবে না। এর ফলাফলের দায়িত্বও উস্কানিদাতাদের সম্পূর্ণ বহন করতে হবে।'

বাংলাদেশের জন্য খাদ্যশস্যবাহী 'ইরনা এলিজাবেথ' নামে জাহাজের গতিপথ বদল করে চট্টগ্রাম থেকে করাচি নিয়ে যাওয়া হয়।

চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর সাম্প্রতিক গুলিবর্ষণ ও অন্যান্য ঘটনা সম্পর্কে সরেজমিন তদন্তের জন্য বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ৩ সদস্যের একটি দলীয় তদন্ত দল ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যায়। ঢাকায় বিমান বাহিনীর সাবেক বাঙালি সৈনিকরা স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে সংগ্রাম কমিটি গঠন করেন। সাবেক বিমান সেনারা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে তাদের সর্বশক্তি ও সম্পদ নিয়োগ করে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে যে কোনো ত্যাগ স্বীকারের শপথ নেন।

করাচিতে এক সংবাদ সম্মেলনে পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে আলোচনার জন্য তাকে ঢাকায় আসার যে আমন্ত্রণ জানান, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

## ১৯ মার্চ ১৯৭১

ঢাকার অদূরে গাজীপুরে পাকিস্তানি সেনার বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধে নামে সংগ্রামী জনতা। সেই জনযুদ্ধে চলমান অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগ করে নতুন মাত্রা। এর আগে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রংপুর, রাজশাহীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাক সেনা ও জনতার মধ্যে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষের ঘটনা ঘটলেও এদিনই প্রথম সংগ্রামী বাঙালি তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। গাজীপুরে সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে কমপক্ষে ৫০ জন স্বাধীনতা সংগ্রামী নিহত ও দুই শতাধিক আহত হন। সন্ধ্যায় শহরে অনির্দিষ্টকালের জন্য সান্ধ্য আইন জারি করা হয়। গাজীপুর রাজবাড়ীতে অবস্থানরত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈনিকদের ঢাকা সেনানিবাসে ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে তাদের নিরস্ত্র করার উদ্দেশ্যে সামরিক কর্তৃপক্ষ সকালে এক পাঞ্জাবি ব্রিগেডিয়ারের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি দল পাঠায়। সকাল থেকেই বেসামরিক লোকজন গাজীপুর চৌরাস্তায় ব্যারিকেড রচনা করে। নিরস্ত্র জনতা সেনাবাহিনীর শহরে প্রবেশে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করলে তাদের ওপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে। গুলিতে এখানে বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী হতাহত হন। সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণের খবর ছড়িয়ে পড়লে আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে দলে দলে মানুষ তীর-ধনুক, বল্লম-টেঁটা, দা-কুড়াল, বন্দুক প্রভৃতি নিয়ে ছুটে আসে। জনতা স্থানে স্থানে অসংখ্য ব্যারিকেড গড়ে তোলে। সৈন্যদের প্রতিরোধের জন্য জয়দেবপুর রেলগেটের ওপর রেলবগি ও গাছের গুঁড়ি দিয়ে সুদৃঢ় ব্যারিকেড তৈরি করে। দুপুরে রেলগেটের ওপর জনতা ও পাকসেনাদের মুখোমুখি বন্দুকযুদ্ধ হয়। রাজবাড়ী





এলাকায় বাঙালি সেনা ও পাকিস্তানি সৈন্যদের মধ্যে এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে গুলিবিনিময় হয়। রাজবাড়ীতে প্রবেশে ব্যর্থ হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনা দলটি ঢাকা ফিরে যাওয়ার সময় চৌরাস্তায় জনতা তাদের বাধা দিলে এখানে তুমুল সংঘর্ষ হয়। এ সময় সৈন্যরা আশপাশের গ্রামবাসীদের ওপরও হামলা চালায়। সৈন্যরা ঢাকায় ফেরার পথে টঙ্গী বোর্ডবাজারে জনতার প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়। সন্ধ্যায় সেনাবাহিনী গাজীপুরে সান্ধ্য আইন জারি করে তাদের খোয়া যাওয়া অস্ত্রশস্ত্র অনুসন্ধানের নামে নিরীহ ও নিরপরাধ লোকজনের ওপর পাশবিক অত্যাচার চালায়।

## ২০ মার্চ ১৯৭১

সারাদিন বীর বাঙালির দৃপ্ত পদচারণায় রাজধানী টালমাটাল। মিছিলের পর মিছিল এগিয়ে চলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার অভিমুখে। সেখানে শপথ অনুষ্ঠান শেষে একের পর এক শোভাযাত্রা বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে গিয়ে সমবেত হয়। বিকেলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নৌবাহিনীর সাবেক সৈনিকদের সামবেশে স্বাধীনতা সংগ্রামে সার্বিক সহযোগিতার লক্ষ্যে একটি সম্মিলিত মুক্তিবাহিনী কমান্ড গঠনের জন্য সশস্ত্র বাহিনীর সাবেক বাঙালি সৈনিকদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। বক্তারা বাঙালি সৈনিকদের কেবল বাংলাদেশে রাখা এবং অবিলম্বে বাংলাদেশ থেকে অবাঙালি সৈন্য অপসারণের দাবি জানান। সমাবেশ শেষে বাঙালি নৌ-সেনারা কুচকাওয়াজ করে বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির বাসভবনে যান এবং বাংলার মুক্তি সংগ্রামের সর্বাধিনায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার নেতৃত্বে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য শেষ রক্তবিন্দু দানের প্রতিশ্রুতি দেন। সংক্ষিপ্ত ভাষণ দানকালে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, 'যত বাধাই আসুক বাংলার মানুষের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম চলবে। আপনারা আন্দোলনে ভাটা পড়তে দেবেন না।'

## ২১ মার্চ, ১৯৭১

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত মুক্তি সংগ্রামের বিংশতিতম দিবসে হাজার হাজার মানুষের দৃপ্ত মিছিলে রাজধানী ঢাকা মিছিলের নগরীতে পরিণত হয়। 'জয় বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু' গ্লোগানে গ্লোগানে মুখরিত প্রতিটি মিছিল দ্রুত পায়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার হয়ে বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির বাসভবনে যায়। ব্যস্ততার মাঝেও তিনি বারবার এসে মিছিলকারীদের স্বাগত জানিয়ে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। বঙ্গবন্ধু সমবেত জনতার উদ্দেশে বক্তৃতাকালে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, 'মৌলিক প্রশ্নে কোনো আপস হতে পারে না। আপনারা চরম ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত হোন। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে। আমরা অনেক রক্ত দিয়েছি। প্রয়োজন হলে চরম ত্যাগ স্বীকার করব। তবু দাবি আদায় করে ছাড়বো। জনতার জয় অবধারিত। যত নির্যাতন-বুলেট চালানো হোক না কেন, জনতাকে স্তব্ধ করা যাবে না।

সারাদেশে যথারীতি সভা-সমাবেশ, শোভাযাত্রার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর কর্মসূচির প্রতি সমর্থন জানানো হয়। সরকারি অফিস-আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। সরকারি ও বেসরকারি ভবনের শীর্ষে কালো পতাকা উড়ানো হয়। মগবাজারে মহিলা সংগ্রাম পরিষদের

উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক মহিলা সমাবেশে সেনাবাহিনীর সাবেক বাঙালি সৈনিকদের নিয়ে একটি প্যারা মিলিটারি গঠনের আহ্বান জানানো হয়। নারায়ণগঞ্জে মহিলারা নৌ-মিছিল বের করেন। সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বিক্ষুব্ধ লেখক ও শিল্পীরা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। ব্রিটিশ সরকার বাংলাদেশে যাতায়াতের জন্য পাকিস্তানি বিমান ও জাহাজকে মালদ্বীপের ব্রিটিশ ঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি দেয়। ১৯ মার্চ গাজীপুরে জারিকৃত কারফিউ দুপুর ১২টায় ৬ ঘণ্টার জন্য প্রত্যাহার করা হয়। পরে সন্ধ্যা ৬টা থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য আবার কারফিউ বলবৎ করা হয়।

ঢাকায় স্বাধীন বাংলাদেশ শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদ আগামী ২৩ মার্চ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি পণ্য বর্জন সপ্তাহ পালনের কর্মসূচি ঘোষণা করে। সকালে প্রেসিডেন্ট হাউসে জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের মধ্যে পঞ্চম দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ছিলেন। এ বৈঠক দেড় ঘণ্টা স্থায়ী হয়। এর আগে বঙ্গবন্ধু তার বাসভবনে বিশিষ্ট আইনজীবী একে ব্রোহির সঙ্গে এক সংক্ষিপ্ত বৈঠকে মিলিত হন।

## ২২ মার্চ, ১৯৭১

সারাদেশে প্রস্তুতি। প্রতিরোধের প্রস্তুতি। ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনা চলছে। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা ঢাকায়। বঙ্গবন্ধু একদিকে আলোচনা অন্যদিকে দাবি আদায়ের জন্য অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রেখেছেন। তার নির্দেশে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে চলছে প্রতিরোধের প্রশিক্ষণ। রাজধানীতে বিভিন্ন সংগঠনের সভা ও শোভাযাত্রার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে শিশু-কিশোর এবং পল্টন ময়দানে সশস্ত্র বাহিনীর সাবেক বাঙালি সৈনিকদের সমাবেশ ও কুচকাওয়াজ।

পল্টনে বাঙালি যোদ্ধাদের সমাবেশে বক্তারা বলেন, 'বাংলার নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে অভূতপূর্ব ঐক্য গড়ে উঠেছে তাতে সাবেক সৈনিকরা আর সাবেক হিসেবে বসে থাকতে পারে না। আমাদের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের মূল্যবান সম্পদ। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমাদের এই সম্পদ কাজে লাগানোর দিন এসেছে। আমরা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ পালন করার জন্য প্রস্তুত।' সমাবেশ থেকে বিমান, নৌ ও স্থলবাহিনীর সব অবসরপ্রাপ্ত সৈনিককে নিজ নিজ এলাকার আওয়ামী লীগ, সংগ্রাম পরিষদ ও স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে সহযোগিতা করার আহ্বান জানানো হয়। অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল এমআই মজিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যের মধ্যে কর্নেল এমএজি ওসমানী (পরে জেনারেল) বক্তৃতা করেন। সাবেক সৈনিকদের কথা শোনার জন্য পল্টন ময়দানে বিপুল জনসমাগম ঘটে। উপস্থিত জনতা হর্ষধ্বনি ও হাততালি দিয়ে মুক্তিসংগ্রামে বাঙালি সৈনিকদের আনুষ্ঠানিক সমর্থনদানের ঘোষণাকে অভিনন্দিত করে। সভা শেষে বীর বাঙালি সৈনিকরা কুচকাওয়াজ করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে যান। সামরিক কায়দায় শহীদ বেদীতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা সংগ্রামকে





সর্বাত্মকভাবে সফল করে তোলার শপথ নেন। পরে তারা কুচকাওয়াজ করে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে যান এবং বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রাজধানী ঢাকার রাজপথে নামে অবিচ্ছিন্ন মিছিলের স্রোতধারা। স্বাধীনতা অর্জনের বলিষ্ঠ শপথের বজ্রনির্ঘোষ জয় বাংলা শ্লোগানে মুখরিত শোভযাত্রার গন্তব্যস্থল বঙ্গবন্ধুর বাসভবন। বঙ্গবন্ধু তার বাসভবনে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকবার সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করেন। বক্তৃতাকালে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'সাত কোটি মানুষের মুক্তি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে। এই সংগ্রামে আমরা অবশ্যই জয়ী হবো। বন্দুক, কামান, মেশিনগান কিছুই জনগণের স্বাধীনতা রোধ করতে পারে না।' তিনি জনগণকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে যে কোনো ত্যাগ স্বীকারের জন্য তৈরি থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'জয় আমাদের হবেই ইনশাল্লাহ।'

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সকালে আগামী ২৫ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠেয় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। প্রেসিডেন্ট হাউসের এক ঘোষণায় বলা হয়, পাকিস্তানের উভয় অংশের নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনাক্রমে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্যের পরিবেশ সম্প্রসারণে সুযোগ সৃষ্টির জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ২৫ মার্চ আহূত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

সকালে রমনার প্রেসিডেন্ট হাউসে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জুলফিকার আলী ভুট্টো আলোচনা বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠক প্রায় সোয়া ঘণ্টা স্থায়ী হয়। প্রেসিডেন্ট হাউসের অদূরে দাঁড়িয়ে জনতা বঙ্গবন্ধুর সমর্থনে ও ভুট্টোর বিপক্ষে শ্লোগান দেয়। বঙ্গবন্ধু ও ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনার প্রায় একঘণ্টা আগে ভুট্টো প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। বঙ্গবন্ধু প্রেসিডেন্ট হাউস ত্যাগের পরও ভুট্টো একঘণ্টা সেখানে অবস্থান করেন। ভুট্টো সন্ধ্যায় আবার প্রেসিডেন্ট হাউসে নিজের উপদেষ্টাদের নিয়ে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন।

প্রেসিডেন্ট হাউস থেকে নিজ বাসভবনে ফিরে আওয়ামী লীগ প্রধান সাংবাদিকদের বলেন, 'আমরা ৪ দফা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগ দিতে পারি না।'

দুপুরে প্রেসিডেন্ট হাউস থেকে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ফিরেই ভুট্টো তার উপদেষ্টাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন। এই বৈঠক শেষে ভুট্টোর নেতৃত্বে পিপলস পার্টির নেতারা সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট হাউসে যান। রাতে সেখান থেকে ফিরেই ভুট্টো হোটেল লাউঞ্জে এক অনির্ধারিত সংবাদ সম্মেলন করেন। তিনি বলেন, 'প্রেসিডেন্ট ও আওয়ামী লীগ প্রধান বর্তমান রাজনৈতিক সংকট নিরসনের জন্য একটি সাধারণ ঐকমত্যে পৌঁছেছেন। তবে এই ঐকমত্য অবশ্যই পিপলস পার্টির কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। জাতীয় পরিষদ অধিবেশন বসার আগে আওয়ামী লীগ, পিপলস পার্টি ও সেনাবাহিনীর মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তির প্রয়োজন রয়েছে। কেননা, বর্তমান পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীও একটি পক্ষ। কারণ তারা ক্ষমতায় এবং তারাই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে।'

রাতে কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রধান মিয়া মমতাজ খান মোহাম্মদ দৌলতানা, ওয়ালী ন্যাপপ্রধান খান আবদুল ওয়ালী খান, জমিয়তে উলামায়ে মহাসচিব মওলানা মুফতি মাহমুদ, ন্যাপ নেতা মীল গাউস বক্স বেজেঞ্জো ও সর্দার শওকত হায়াত খান প্রেসিডেন্ট হাউসে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে এক অনির্ধারিত বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠক দু'ঘণ্টা স্থায়ী হয়। গভীর রাতে পশ্চিম পাকিস্তানের উল্লিখিত নেতারা এক বিবৃতিতে বলেন, তাদের সঙ্গে আলোচনা না করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেছেন। প্রেসিডেন্ট আলোচনার জন্য মুসলিম লীগ সভাপতি খান আবদুল কাইউম খান ও জমিয়তে উলামায়ে প্রধান মওলানা শাহ আহমদ নুরানীকে ঢাকায় আসার আহ্বান জানান।

## ২৩ মার্চ, ১৯৭১

পাকিস্তান প্রজাতন্ত্র দিবসে ছাত্রসমাজ ঢাকাসহ সারাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে 'পূর্ব পাকিস্তান'-এর কবর রচনা এবং বাংলাদেশ নামে স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় অনিবার্য করে তোলে। বিক্ষুব্ধ বাংলায় স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গে আঘাতের 'পাকিস্তান দিবস' পালিত হয় 'ঐতিহাসিক লাহোর দিবস' হিসেবে। মুক্তি সংগ্রামের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আগেই ২৩ মার্চকে 'ঐতিহাসিক লাহোর দিবস' হিসেবে পালনের জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। এ উপলক্ষে তিনি সারা বাংলায় সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন।

পাকিস্তান দিবসকে ন্যাপ (ভাসানী) 'স্বাধীন পূর্ববঙ্গ দিবস' এবং স্বাধীন বাংলা ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ 'প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে পালন করে। বঙ্গবন্ধু সূর্যোদয়ের সময় ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডে তার বাসভবনে নিজ হাতে সবুজ জমিনে লাল বৃত্তের মাঝে সোনালি মানচিত্র অংকিত স্বাধীন বাংলার পতাকা তোলেন। এ সময় 'জয় বাংলা, বাংলার জয়' গানটি সমবেত কণ্ঠে পরিবেশিত হয়।

'পাকিস্তান দিবস' উপলক্ষে ঢাকার প্রেসিডেন্ট ভবন ও সেনাবাহিনীর সদর দফতর ছাড়া বাংলাদেশে আর কোথাও পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা ওড়েনি। সারা বাংলায় উড়েছে স্বাধীন বাংলার পতাকা। ঢাকার সেক্রেটারিয়েট, হাই কোর্ট, পরিষদ ভবন, ইপিআর ও রাজারবাগ পুলিশ সদর দফতর, ঢাকা বেতার ও টেলিভিশন ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রধান বিচারপতি ও মুখ্য সচিবের বাসভবনসহ সব সরকারি-বেসরকারি ভবন এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলার পতাকা তোলা হয়। জাতীয় পতাকার পাশাপাশি তোলা হয় শোকের কালো পতাকাও।

সারাদিন রাজপথে লাঠি-বর্শা-বন্দুকের মাথায় নতুন জাতি ও নতুন দেশের পতাকা উড়িয়ে হাজার হাজার মানুষ কোটি প্রাণের আমোঘ সঙ্গীত 'জয়বাংলা' মন্ত্রে গর্জে ওঠে। সারাদেশে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে স্বাধীন বাংলার পতাকা বিতরণ করা হয়। দৈনিক পত্রিকাগুলোতে বাংলাদেশের পতাকার নকশা ছাপানো হয়, যা দেখে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পতাকা তৈরি করে নিজ নিজ বাসগৃহে উত্তোলন করে।





## ২৪ মার্চ, ১৯৭১

সারাদেশে রাস্তায় রাস্তায় বীর বাঙালির মিছিল আর সেনানিবাসগুলোতে চলে নিরীহ বাঙালির ওপর একযোগে আক্রমণের জন্য পাকিস্তানি সেনাদের 'অপারেশন সার্চলাইট' প্রস্তুতি। ঢাকার মিরপুর, রংপুর, সৈয়দপুর, চট্টগ্রামে পাকসেনাদের ছত্রছায়ায় অবাঙালি বিহারীরা বাঙালি জনসাধারণের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুরে সামরিক সরকারের এজেন্টরা বোমাবাজি করে। ঢাকার মিরপুরে উস্কানিমূলক কার্যকলাপ চালানো হয়। চট্টগ্রাম ও রংপুরে জনতা-সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় অবাঙালিরা বাঙালি নিধনযজ্ঞ চালায়।

আওয়ামী লীগ প্রধানের নির্দেশে সরকারি অফিস-আদালত ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হরতাল পালিত হয়। সারা বাংলার গৃহে গৃহে স্বাধীন বাংলার পতাকার পাশাপাশি কালো পতাকাও ওড়ে। চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। টিভি কেন্দ্রে পাহারারত সৈন্যরা টিভি কর্মীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলে সন্ধ্যা থেকে ঢাকা টিভির অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়।

স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ নেতারা এক বিবৃতিতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র গণবিপ্লবকে আরো জোরদার করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে অগুনিত মিছিল আসে। সমাগত মিছিলকারীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দানকালে বাঙালি জাতির নেতা শেখ মুজিবুর রহমান জনসাধারণকে যে কোনো পরিণতির জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আমি চূড়ান্ত সংগ্রামের নির্দেশ দেয়ার জন্য বেঁচে থাকবো কিনা জানি না। স্বাধীনতা আদায়ের জন্য আপনারা আপনাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন।' আপনারা চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকুন। আর আলোচনা নয়, এবার ঘোষণা চাই। আগামীকালের মধ্যে সমস্যার কোনো সমাধান না হলে বাঙালিরা নিজেদের পথ নিজেরা বেছে নেবে। সরকারের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে তিনি বলেন, 'বাংলার জনগণের ওপর কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়া হলে তা বরদাশত করা হবে না। কারো চোখ রাঙানির কাছে আমরা মাথানত করবো না।' চট্টগ্রামে পাকসেনারা নৌবন্দরে ১৭নং জেটিতে নোঙর করা এমভি সোয়াত জাহাজ থেকে সমরাস্ত্র খালাস করতে গেলে বীর চট্টলার ৫০ হাজার মানুষ তাদের ঘিরে ফেলে। বিকেলে সেনাবাহিনী অস্ত্র নামানোর জন্য বন্দর শ্রমিকদের নিয়োগ করতে চাইলে শ্রমিকরা তাতে অস্বীকৃতি জানায়। পরে শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজার হাজার ছাত্র-শ্রমিক-জনতা বন্দরে গিয়ে হাজির হয়। জনতা জেটি থেকে কদমতলী পর্যন্ত ৪ মাইল পথের বিভিন্ন স্থানে ব্যারিকেড রচনা করে। সেনাবাহিনীর সদস্যরা জাহাজ থেকে কিছু অস্ত্র নিজেরাই খালাস করে। সেসব অস্ত্রশস্ত্র ১২টি ট্রাকে তুলে নতুনপাড়া সেনানিবাসে আনার চেষ্টা করে। ১৭নং জেটির পাশে ডবলমুরিং রোডের একটি ব্যারিকেডে দাঁড়িয়ে জনতা তাদের পথরোধ করে। রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত পাকসেনা ও হাজার হাজার লোক ব্যারিকেডের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকার পর সেনাবাহিনী গুলিবর্ষণ শুরু করে। তাদের বেপরোয়া গুলির মুখেও নিরস্ত্র জনতা

দুর্ভেদ্য ব্যারিকেড রচনা করে থাকে। এ রাতে সংঘর্ষে কমপক্ষে ২০০ শ্রমিক-জনতা শহীদ হন। ঢাকার মিরপুরে অবাঙালিরা সন্ধ্যায় সাদা পোশাকধারী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর লোকদের সহযোগিতায় জোরপূর্বক বাঙালিদের বাড়িঘর থেকে স্বাধীন বাংলার পতাকা ও কালো পতাকা নামিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করে এবং পাকিস্তানের পতাকা তোলে। রাতে বিহারিরা এখানে ব্যাপক বোমাবাজি করে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। কয়েকটি স্থানে বাঙালিদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগও করা হয়। গুলি ও ছুরিকাঘাতে বেশ কয়েকজনকে আহত করা হয়।

রেলওয়ে শহর সৈয়দপুরে সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণে কমপক্ষে শতাধিক নিহত হয়। আহত হয় কয়েক হাজার মানুষ। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সৈয়দপুর সেনানিবাসের পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রাম ঘেরাও করে এ গণহত্যা চালায়। শহরে কারফিউ দিয়ে সেনাবাহিনী ও অবাঙালিরা সম্মিলিতভাবে বাঙালিদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করে। নিরস্ত্র বাঙালিদের গুলি করে হত্যা করে। রংপুর হাসপাতালে সামনে ক্ষুব্ধ জনতা ও সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। পরে একে কেন্দ্র করে সেনারা রংপুর সেনানিবাস এলাকায় নিরস্ত্র অধিবাসীর ওপর বেপরোয়া গুলিবর্ষণ করে। এতে কমপক্ষে ৫০ জন নিহত ও বহু আহত হয়।

সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট হাউসে আওয়ামী লীগ ও সরকারের মধ্যে উপদেষ্টা পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে আওয়ামী লীগের পক্ষে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ ও ড. কামাল হোসেন উপস্থিত ছিলেন। দু'ঘণ্টা স্থায়ী এ বৈঠক শেষে তাজউদ্দীন আহমদ সাংবাদিকদের জানান, আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বক্তব্য শেষ হয়েছে। এখন প্রেসিডেন্টের উচিত তার ঘোষণা দেয়া। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, আওয়ামী লীগ আলোচনা আর দীর্ঘায়িত করতে প্রস্তুত নয়। রাতে আওয়ামী লীগের এক বিবৃতিতে জানানো হয়, আর আলোচনা করে কালক্ষেপণ করা যাবে না। পরিস্থিতি ক্রমে সংকটতর পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। সরকারকে অবিলম্বে তাদের ঘোষণা জানাতে হবে।

পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা বিকেলে পিআইএ'র একই ফ্লাইটে ঢাকা ত্যাগ করে। করাচি রওনার আগে ন্যাপ নেতা ওয়ালী খান ও গাউস বক্স রেজেঞ্জো বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তার বাসভবনে এক সংক্ষিপ্ত বৈঠকে মিলিত হন। পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো দুপুরে প্রেসিডেন্ট হাউসে জেনারেল ইয়াহিয়া ও তার উপদেষ্টাদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন।

চট্টগ্রাম, রংপুর, সৈয়দপুর ও মিরপুরের ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে গভীর রাতে আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ এক বিবৃতিতে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, একটি রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছানোর প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করার উদ্যোগ নেয়া হলে তার পরিণতি ভয়াবহ হবে।

## ২৫ মার্চ, ১৯৭১

২৫ মার্চ বিভীষিকাময় কালোরাত। এ রাতের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পাশবশক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরস্ত্র বাঙালি জাতির ওপর। হানাদার পাকসেনার





মেশিনগানের গুলি, ট্যাংক-মর্টারের গোলায়, আগুনের লেলিহান শিখায় রাজধানী ঢাকার বুকে নেমে আসে মৃত্যুর ঘনতমসা। আর আক্রান্ত রাতের ওপর উপ্ত হয় নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের। ২৫ মার্চের কালোরাতের বুক চিরে নবসূর্যোদয়ের মধ্য দিয়ে সূচিত হয় নতুন ইতিহাস, শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ।

স্বাধীনতা সংগ্রামী বাঙালির স্বাধীন স্বদেশের স্বপ্ন গুঁড়িয়ে দিতে সেই কালোরাতে পাকিস্তানি সেনারা রাজধানী ঢাকার বুকে মেশিনগান-মর্টার-ট্যাংক নিয়ে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে ৫০ হাজারেরও বেশি ঘুমন্ত নাগরিককে। একই সঙ্গে হত্যাযজ্ঞ শুরু হয় দেশের বিভিন্ন স্থানে। রাতে ইয়াহিয়ার বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাস, শিক্ষক কোয়ার্টার, পুলিশ-ইপিআর ব্যারাকসহ নতুন ও পুরান ঢাকার আবাসিক এলাকা এবং বস্তিবাসীর ওপর বর্বর আক্রমণ চালিয়ে সূচনা করে ৯ মাসব্যাপী ইতিহাসের নজিরবিহীন গণহত্যা, অত্যাচার, নিপীড়ন, নারী ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ। তারা বিপ্লবী বাংলাদেশকে অগ্নিবলয়ে নিক্ষেপের মাধ্যমে শুরু করে মানবতার বহ্নোৎসব।

সকালে প্রেসিডেন্ট হাউসে ভুট্টো-ইয়াহিয়া বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে তারা বাংলাদেশে গণহত্যার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বিকেলে সেনানিবাসে গিয়ে নিরপরাধ বাঙালিদের ওপর কাপুরোষিত সশস্ত্র হামলার নির্দেশ দেন। জেনারেল ইয়াহিয়া রাত ৮টায় ঢাকা ত্যাগ করেন, আর সেই সঙ্গে স্বয়ং সমাধি রচনা করে যান অখণ্ড পাকিস্তানের। রাত ৯টায় গোটা ঢাকায় খবর ছড়িয়ে পড়ে ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করেছেন। সেনানিবাসে সৈন্যরা যুদ্ধসাজে তৈরি হচ্ছে। এ খবর পেয়ে ছাত্র-জনতা সারা ঢাকা ব্যারিকেড রচনা শুরু করে।

বিকেলে সংবাদপত্রে পাঠানো এক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন স্থানে সেনাবাহিনীর ব্যাপক গণহত্যার প্রতিবাদে ২৭ মার্চ সারা বাংলায় হরতাল পালনের আহ্বান জানান। সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু অপর এক বিবৃতিতে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন, 'রাজনৈতিক সমাধান বানচালের উদ্দেশ্যে সামরিক মোকাবেলার নীতি অনুসরণ করা হলে এর অবশ্যম্ভাবী ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য সংশ্লিষ্ট মহলই দায়ী হবে।'

রাতে ইয়াহিয়ার ঢাকা ত্যাগের খবর পাওয়ার পর বঙ্গবন্ধু তার বাসভবনে উপস্থিত দলীয় নেতাকর্মী, সমর্থক, ছাত্রনেতা ও সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, 'আমরা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। কিন্তু জেনারেল ইয়াহিয়া খান সামরিক ব্যবস্থা, গ্রহণের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে চাচ্ছেন। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট অখণ্ড পাকিস্তানের সমাপ্তি টানতে চলেছেন।'

পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী 'অপারেশন সার্চলাইট' অভিযান শুরুর জন্য রাত সাড়ে ১১টায় ছাউনি থেকে বেরিয়ে আসে। ফার্মগেটের মুখে হানাদার বাহিনী প্রথম প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়। এখানে তারা লাউড স্পিকারে গোটা ঢাকার কারফিউ জারির ঘোষণা দেয়। ছাত্র-জনতা সেনাবাহিনীকে বাধা দিলে তারা মেশিনগানের সাহায্যে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পাখির মতো গুলি করে হত্যা করে। ডিনামাইট দিয়ে ব্যারিকেড উড়িয়ে দিয়ে শহরে প্রবেশ করে। রাস্তায় রাস্তায় শুরু হয় খণ্ডযুদ্ধ। সেনাবাহিনী

প্রতিরোধকারী বাঙালি যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে ট্যাংক-মর্টার-রকেড ব্যবহার করে। চারদিকে গুলি আর গোলার বিস্ফোরণ। মানুষের আর্তচিৎকার। মধ্যরাতেই সেনাবাহিনী পিলখানা, রাজারবাগ, নীলক্ষেত আক্রমণ করে। সেনারা পিলখানাও নীলক্ষেতে প্রচণ্ড প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়। রাত ২টার সময় হানাদার বাহিনী ট্যাংক, বাজুকা, মর্টারের মাধ্যমে নীলক্ষেত বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা দখল করে। প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর পিলখানা ইপিআর ব্যারাকের পতন হয়। ভোরের আগেই রাজারবাগ পুলিশলাইন হামলাকারীদের কব্জায় আসে।

পাকিস্তানি সেনারা নিরস্ত্র বাঙালির বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধ শুরু করলে মধ্যরাতের পর মুক্তিসংগ্রামের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার ধানমন্ডির বাসভবনে থেকে ঘোষণা করেন : 'পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আমাদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। ছাত্র-জনতা-পুলিশ-ইপিআর শত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম শুরু হয়েছে। আমি ঘোষণা করছি, আজ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। সর্বস্তরের নাগরিককে আমি আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা যে যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুন, যার যা আছে তাই নিয়ে দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। সম্মিলিতভাবে শত্রুর মোকাবেলা গড়ে তুলুন। আপনারা শেষ শত্রুটি দেশ থেকে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যান।'

রাত ১২টার পর বঙ্গবন্ধুর স্বকণ্ঠে এ ঘোষণা বেতারে একবার শোনা যায়। পিলখানা ইপিআর ব্যারাক ও অন্যান্য স্থান থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার লিখিত বাণী ওয়্যারলেসের মাধ্যমে সারাদেশে বার্তা আকারে পাঠানো হয়। এ ওয়্যারলেস বার্তা চট্টগ্রাম ইপিআর সদর দফতরে পৌঁছায়। চট্টগ্রাম উপকূলে নোঙর করা একটি বিদেশি জাহাজও এ বার্তা গ্রহণ করে। চট্টগ্রামে অবস্থানকারী আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক জহুর আহমেদ চৌধুরী বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী সাইক্লোস্টাইল করে রাতেই শহরবাসীর মধ্যে বিলির ব্যবস্থা করেন।

রাত ১টার দিকে সেনাবাহিনীর একটি দল ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের অদূরে শুক্রাবাদে ব্যারিকেডের মুখোমুখি হয়। এখানে প্রতিরোধ ব্যূহ ভেঙে হানাদাররা রাত দেড়টার দিকে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের সামনে আসে। সেনারা বাসভবনে এলোপাতাড়ি গুলি নিক্ষেপ করে ভেতরে ঢোকে। বঙ্গবন্ধুকে বন্দি করে শেরে বাংলা নগরের সামরিক বাহিনীর দফতরে নিয়ে যায়। পরে সেখান থেকে তাকে সেনানিবাসে নিয়ে আটক রাখা হয় আদমজী কলেজের একটি কক্ষে।

## ২৬ মার্চ, ১৯৭১

২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু ধানমন্ডির বাসভবন থেকে ঘোষণা করেন 'আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন।' তৎকালীন ইপিআরের (বিডিআর) ওয়্যারলেসে পাঠানো স্বাধীনতা বার্তায় তিনি ঘোষণা করেন : 'পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিতে পিলখানার ইপিআর ঘাঁটি, রাজারবাগ পুলিশলাইন আক্রমণ করেছে এবং শহরের লোকদের হত্যা করছে। ঢাকা,





চট্টগ্রামের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলছে। আমি বিশ্বের জাতিগুলোর কাছে সাহায্যের আবেদন করছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমি মুক্ত করার জন্য শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ, দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনসারদের সাহায্য চান। কোনো আপস নেই, জয় আমাদের হবেই। আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রুকে বিতাড়িত করুন। সব আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতাপ্রিয় লোকদের এ সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা।

রাস্তায় রাস্তায় শুরু হয় প্রতিরোধ যুদ্ধ। পুলিশ, ইপিআর, আনসার, সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালি সৈনিকসহ ছাত্র-তরুণের সঙ্গে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর সম্মুখসমর। ২৬ মার্চ প্রতিরোধ যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, সেনা ছাউনিগুলোতে। ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্টের উপ-অধিনায়ক মেজর জিয়াউর রহমান (পরবর্তীকালে সেনাপ্রধান এবং রাষ্ট্রপতি) বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা দিলে সারা জাতির মনে সাহস সঞ্চারিত হয়। সামরিক ও অসামরিক যোদ্ধাদের সমন্বয়ে নতুন রূপ নেয় স্বাধীনতার যুদ্ধ।

## নবম অধ্যায়

# বঙ্গবন্ধুর শাসনের সাড়ে তিন বছর
# উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ

**১৯৭২ সাল**

৮ জানুয়ারি : বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন।

১০ জানুয়ারি : কারাগার থেকে বেরিয়ে লন্ডন এবং দিল্লি হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

১২ জানুয়ারি : বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতির পদে ইস্তফা দেন এবং বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে নতুন রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করা হয়। বঙ্গবন্ধু সেদিনই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ঐদিন পোল্যান্ড ও বুলগেরিয়ার সরকারদ্বয় বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন।

১৩ জানুয়ারি : এদিন বাংলাদেশকে স্বধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে ঘানার সরকার।

১৪ জানুয়ারি : বঙ্গবন্ধু সংবাদ সম্মেলনে দেশে গণতান্ত্রিক পথে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ঘোষণা করেন।

১৫ জানুয়ারি : রমনার রেসকোর্স ময়দানকে 'সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান'-এ রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। সেদিনই সরকারি আদেশে দেশের সর্বত্র মদ, জুয়া, হাউজিসহ অনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

১৬ জানুয়ারি : ৩০ লাখ শহীদদের স্মরণে এদিন জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়। নেপাল সরকার এদিনই বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

১৭ জানুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সকল মুক্তিযোদ্ধার অস্ত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন। সেই সঙ্গে যে কোনো অবৈধ অস্ত্রশস্ত্রও জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন।

১৮ জানুয়ারি : এদিন প্রেসিডেন্ট ১৯৭২ সালের হাইকোর্ট অধ্যাদেশ জারি করে হাইকোর্ট গঠন করেন।

১৯ জানুয়ারি : মন্ত্রিসভায় কয়েকজন নতুন মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়।

২০ জানুয়ারি : যুগোস্লাভিয়ার সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন।





২১ জানুয়ারি : প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনা কমিশন গঠন এবং ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ করেন।

২২ জানুয়ারি : নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সকলের প্রতি শেখ মুজিবুর রহমানকে সাহায্যের জন্য অনুরোধ জানান ভারত থেকে বাংলাদেশে ফিরে মওলানা ভাসানী।

২৪ জানুয়ারি : পাকবাহিনীর দালালদের বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে বাংলাদেশ সরকার।

২৫ জানুয়ারি : তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চেকোস্লোভাকিয়ার সরকারদ্বয় বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

২৯ জানুয়ারি : বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে গণহত্যা ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে।

৩০ জানুয়ারি : পল্টন ময়দানে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা তাদের অস্ত্রশস্ত্র জমা দেন।

৩১ জানুয়ারি : মুজিববাহিনী প্রধান শেখ ফজলুল হক মণি, তোফায়েল আহমেদ, আব্দুর রাজ্জাক ও সিরাজুল ইসলাম খান বঙ্গবন্ধুর নিকট মুজিববাহিনীর অস্ত্র জমা দেন।

১ ফেব্রুয়ারি : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে মুজিববাহিনীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন।

৬ ফেব্রুয়ারি : সেনাবাহিনী প্রধান কর্নেল এমএজি ওসমানীকে জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি দেয়া হয়। এদিনই ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলা, থানায় শত শত গণকবর আবিষ্কৃত হয়।

৪ ফেব্রুয়ারি : ব্রিটেন ও ফ্রান্সসহ আটটি দেশের সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

৫ ফেব্রুয়ারি : বঙ্গবন্ধু 'প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল' গঠন করে ওই তহবিলে মুক্তহস্তে নগদ অর্থ শিশু খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য যে কোনো সামগ্রী দান করার জন্য দেশের বিত্তবান জনগণ এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশ ও আঞ্চলিক ও
আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতি অনুরোধ জানান।

৯ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে কিউবা সরকার।

১০ ফেব্রুয়ারি : জাপান সরকার স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে বাংলাদেশকে।

১১ ফেব্রুয়ারি : সরকার ৩১টি টাউন কমিটিকে পৌরসভায় উন্নীত করে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে এদিন শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত

বাংলাদেশের সকল ছাত্রছাত্রীর বিনামূল্যে বই বিতরণ করার ঘোষণা দেয়া হয়।

১৪ ফেব্রুয়ারি : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জন কেনেডির কনিষ্ঠ ভ্রাতা এডওয়ার্ড কেনেডি ব্যক্তিগত শুভেচ্ছা সফরে বাংলাদেশে আসেন। কানাডা সরকার বাংলাদেশকে স্বতন্ত্র স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

১৫ ফেব্রুয়ারি : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণে বলেন, শোষণমুক্ত সোনার বাংলা কায়েমই আমাদের লক্ষ্য।

১৭ ফেব্রুয়ারি : পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশে আটকেপড়া পাকিস্তানি এবং পাকিস্তানে আটকেপড়া বাংলাদেশিদের বিনিময়ের প্রস্তাব নাকচ করে দেয়।

২৪ ফেব্রুয়ারি : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মন্ত্রীদের বেতন এক হাজার টাকা নির্ধারণ করে দেন।

২৫ ফেব্রুয়ারি : ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার সরকারদ্বয় বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

২৭ ফেব্রুয়ারি : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুজিববাহিনীসহ মুক্তিযোদ্ধাদের সকল সংগঠনের বিলুপ্তি ঘোষণা করেন।

১ মার্চ : সোভিয়েত ইউনিয়ন সরকারের আমন্ত্রণে বঙ্গবন্ধু ৫ দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে মস্কো গমন করেন।

২ মার্চ : সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে বাংলাদেশের ৩৩০ কোটি টাকার অর্থনৈতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

৪ মার্চ : বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে শ্রীলঙ্কার সরকার।

৬ মার্চ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এদিনে ৬ দিনের রাষ্ট্রীয় সফর শেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে দেশে ফেরেন।

১০ মার্চ : সোয়াজিল্যান্ড সরকার বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

১১ মার্চ : গ্রিস সরকারও বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

১৩ মার্চ : সুইজারল্যান্ড সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

১৭ মার্চ : বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সফরে ঢাকায় আসেন। এদিনই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৫৩তম জন্মদিন ছিল।

১৮ মার্চ : বঙ্গভবনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের অন্যরা সাক্ষাৎ করেন।





১৯ মার্চ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী তাদের নিজ নিজ দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে একটি ২৫ বছরমেয়াদি শান্তি, সহযোগিতা ও মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

২৩ মার্চ : প্রেসিডেন্ট গণপরিষদ অধ্যাদেশ ও নির্বাচন কমিশন অধ্যাদেশ জারি করেন।

২৬ মার্চ : স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা দিবস পালন হয়। ঐদিনই সকল ব্যাংক, বীমা ও বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের ঘোষণা করা হয়।

৪ এপ্রিল : আওয়ামী লীগের প্রথম কাউন্সিল অধিবেশনে ভাষণ দেন শেখ মুজিব। ওই কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ মুজিবুর রহমানকে আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচন করা হয়। অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেব স্বীকৃতি দেয়।

৬ এপ্রিল : গ্যাবনের সরকার বাংলাদেশ একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

৭ এপ্রিল : জেনারেল আব্দুর রব এমসিএ এবং জেনারেল এমএজি ওসমানী সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেন।

১০ এপ্রিল : গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। ওই দিনই গণপরিষদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন করা হয়।

১১ এপ্রিল : ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে বাংলাদেশের সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়।

১২ এপ্রিল : আওয়ামী লীগের আটজন নেতা বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিপরিষদের সদস্য হিসেবে শপথ নেন।

১৪ এপ্রিল : দেশের সর্বত্র বাংলা নববর্ষ পালিত হয়। এদিনই মালাগাছির সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

১৬ এপ্রিল : সরকার দেশে ঘোড়দৌড় ও জুয়াখেলা নিষিদ্ধ করে। অ্যাডভোকেট জিল্লুর রহমান এদিনেই আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৭ এপ্রিল : যথাযোগ্য মর্যাদায় মুজিবনগরে প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়।

১৮ এপ্রিল : বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্য পদ লাভ করে। কমনওয়েলথের সদস্যপদ লাভ বাংলাদেশের প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।

২১ এপ্রিল : সিয়েরা লিওন-এর সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

২৫ এপ্রিল : বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় লাওস সরকার।

২৬ এপ্রিল : লাইবেরিয়ার সরকার স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় বাংলাদেশকে।

২৯ এপ্রিল : বাংলাদেশের সরকার প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভিয়েতনাম থেকে বিদেশি সৈন্য প্রত্যাহারের দাবি করেন।

১ মে : মহান মে দিবস পালন করা হয়। এই প্রথম বাংলাদেশে মে দিবসে সাধারণ ছুটি প্রদান করা হয়। এদিনই স্পিকার শাহ আব্দুল হামিদ ইন্তেকাল করেন।

৪ মে : পাকিস্তানের জিন্দাখানা থেকে বাংলাদেশিদের ফেরত আনার দাবিতে সারা ঢাকা শহরে জনতার বিক্ষোভ মিছিল হয়।

৮ মে : সারা দেশে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হয়।

১০ মে : বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে।

১১ মে : মেক্সিকো সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

১৭ মে : বঙ্গবন্ধু সরকার ভোগ্যপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

১৮ মে : বাংলাদেশ সরকার ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করে।

২১ মে : বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে সপরিবারে ঢাকায় আনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

২৪ মে : কবি কাজী নজরুল ইসলামকে ঢাকায় আনা হয় এবং তাঁর পরিবারকে একটি ভবন ও রাষ্ট্রীয় ভাতা মঞ্জুর করা হয়।

২৫ মে : প্রথমবারের মতো কবি নজরুল ইসলামের জন্মদিন কবির উপস্থিতিতে যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হয়। ঐদিনই আর্জেন্টিনা সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

২৬ মে : হাইতি সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

১ জুন : চিলি সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

৬ জুন : ইকুয়েডর সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে।

১০ জুন : সরকার ওয়াপদাকে পানি উন্নয়ন এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড নামে দুটো সংস্থায় বিভক্ত করে।

১৩ জুন : ড. কামাল হোসেন সংবিধানের খসড়া নিয়ে জাতীয় বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করেন।

১৭ জুন : বাংলাদেশ আইএমএফ-এর সদস্যপদ লাভ করে।

২১ জুন : বাংলাদেশকে জাম্বিয়ার সরকার স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের কথা ঘোষণা করে।

২২ জুন : বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সদস্যপদ লাভ করে।





২৮ জুন : রুমানিয়া সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

২৯ জুন : যোগাযোগমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলী গণপরিষদে রেল বাজেট পেশ করে।

৩০ জুন : অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ গণপরিষদে পেশ করেন জাতীয় বার্ষিক বাজেট।

৩ জুলাই : বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ব্যাংকের সদস্যপদ রাভ করে।

১২ জুলাই : আঞ্জানিয়া সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

১৩ জুলাই : বাংলাদেশ সরকার ১০ সদস্যবিশিষ্ট পে-কমিশন গঠন করে সচিব আব্দুর রবকে চেয়ারম্যান করে।

১৫ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানে আটকদের পরিবারের জন্য মাসিক ভাতা প্রদানের ঘোষণা করা হয়।

২১ জুলাই : মাল্টার সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। সে দিন ঢাকায় ছাত্রলীগের পৃথক দুটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। একটি হয় আসম আবদুর রব ও শাজাহান সিরাজের নেতৃত্বে এবং অন্যটি হয় নূরে আলম সিদ্দিকী ও আব্দুল কুদ্দুস মাখনের নেতৃত্বে।

২২ জুলাই : চট্টগ্রাম বন্দরকে সরকার ব্যবহার উপযোগী ঘোষণা করা হয়।

২৬ জুলাই : চিকিৎসা এবং অস্ত্রোপচারের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লন্ডনের উদ্দেশে যাত্রা করেন।

২৭ জুলাই : বঙ্গবন্ধু লন্ডনের হারলি স্ট্রিটস্থ একটি ক্লিনিকে ভর্তি হন।

২৯ জুলাই : বঙ্গবন্ধুর তলপেটে স্যার এডওয়ার্ড মুর সফলতার সাথে অস্ত্রোপচার করে পাথরে ক্ষত গলবৰ্ত্তাডার অপসারণ করা হয়।

৪ আগস্ট : ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে ১২ লাখ একর পতিত জমি বিনামূল্যে বন্দোবস্ত করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার।

৫ আগস্ট : বলিভিয়ার সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে।

৮ আগস্ট : বাংলাদেশ জাতিসংঘের মহাসচিব কুর্ট ওয়াইল্ড হেইমের নিকট জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের জন্য আবেদন করে। এদিনই সরকার দেশের সকল বীমা কোম্পানিকে জাতীয়করণ করে এক অধ্যাদেশ জারি করে।

১০ আগস্ট : জাতিসংঘে নিযুক্ত গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতিনিধি জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে।

২৪ আগস্ট : পানামা ও উরুগুয়ের সরকারদ্বয় স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

২৫ আগস্ট : জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদের প্রশ্নের নিষ্পত্তির জন্য নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের পুনরায় বৈঠক বসে। কিন্তু এদিনও চীন ভেটো দেয়।

২৯ আগস্ট : বাংলাদেশ সরকার দালাল আইন সংশোধন করে একটি অধ্যাদেশ জারি করে।

৩০ আগস্ট : দেশে খাদ্য পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য মন্ত্রিপরিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

১২ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশ সরকার দেশের ৫টি সাপ্তাহিক পত্রিকার ওপর রাষ্ট্রবিরোধীমূলক সংবাদ পরিবেশনের অভিযোগে শো-কোজ নোটিশ জারি করে।

১৪ সেপ্টেম্বর : ৪৮ দিন বিদেশে চিকিৎসাসহ স্বাস্থ্যোদ্ধারে থাকার পর বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরেন।

১৭ সেপ্টেম্বর : প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি মুহাম্মদ ইদ্রিস ১ অক্টোবর থেকে ভোটার তালিকা প্রস্তুতের কাজ শুরু হবে বলে জানান এবং '৭৩ সালের মার্চ মাসে সংসদের নির্বাচন ঘোষণা করেন।

১৮ সেপ্টেম্বর : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গণভবনে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের সম্মেলনে ভাষণ দেন।

২৪ সেপ্টেম্বর : প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা কমিশনের প্রথম সভার উদ্বোধন করেন।

২৫ সেপ্টেম্বর : ভ্যাটিকান বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

২৬ সেপ্টেম্বর : সৌদি আরবের বাদশাহ ফয়সলের নিকট জরুরি তারবার্তা প্রেরণ করেন বঙ্গবন্ধু। তার বার্তায় জানানো হয় বাংলাদেশের নাগরিকদের পবিত্র মক্কা শরীফে হজ পালনে সুযোগ প্রদান করার কথা।

২৮ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশ বিমানবাহিনী ২য় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়। এ উপলক্ষে কর্মকর্তাদের সম্মেলনে ভাষণ দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১ অক্টোবর : সরকার সারা দেশে ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু করে।

৫ অক্টোবর : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অবিলম্বে চোরাচালান রোধ করার জন্য সীমান্তে নৌ ও সেনাবাহিনী প্রেরণের নির্দেশ দেন।

১০ অক্টোবর : বিশ্ব শান্তি পরিষদ বঙ্গবন্ধুকে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তার অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সর্বোচ্চ সম্মানসূচক 'জুলিওকুরি' পুরস্কার প্রদান করে।

১২ অক্টোবর : স্বাধীন বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান গণপরিষদের সুচিন্তিত বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য ড. কামাল হোসেন গণপরিষদে পেশ করেন।

১৪ অক্টোবর : পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের প্রত্যাবর্তনে সহযোগিতা করার জন্য জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলের নিকট জরুরি বার্তা প্রেরণ করা হয়।





১৫ অক্টোবর : আন্তর্জাতিক রেডক্রস প্রদানের নিকট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান থেকে বাঙালিদের ফেরত পাঠাতে অনুরোধ জানান।

১৭ অক্টোবর : বাংলাদেশ জাতিসংঘের স্থায়ী পর্যবেক্ষক হিসেবে যোগদানের অনুমতি পায়।

১৮ অক্টোবর : বাংলাদেশ ইউনেস্কোর সদস্যপদ লাভ করে।

১৯ অক্টোবর : গণপরিষদে বাংলাদেশের খসড়া সংবিধানের ওপর সাধারণ আলোচনা হয়।

২৫ অক্টোবর : পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙালিদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলের বিশেষ প্রতিনিধি পাকিস্তানে যায়।

৩১ অক্টোবর : মেজর (অব.) জলিলকে সভাপতি এবং আসম আবদুর রবকে সাধারণ সম্পাদক করে গঠন করা হয় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)।

৪ নভেম্বর : বাংলাদেশের সংবিধান অনুমোদন পায় এবং ১৬ ডিসেম্বর থেকে তা কার্যকর হবে বলে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৫ নভেম্বর : জাপান সরকার যমুনা নদীতে সেতু নির্মাণে সাহায্য-সহযোগিতা করার আশ্বাস দেয়।

৬ নভেম্বর : কলম্বো পরিকল্পনা সাহায্য সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে বাংলাদেশ।

১১ নভেম্বর : শেখ ফজলুল হক মণির নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

২৩ নভেম্বর : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাশিয়ার মস্কোস্থ লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক 'পেট্রিস লুমুম্বা' পদক প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

৩০ নভেম্বর : জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ দানের প্রস্তাব জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

১০ ডিসেম্বর : মওলানা ভাসানীকে সভাপতি ও কাজী জাফরকে সাধারণ সম্পাদক করে 'ন্যাপ' কমিটি গঠন করা হয়।

১৬ ডিসেম্বর : বঙ্গবন্ধু সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ঐদিন সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে একটি বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন।

১৭ ডিসেম্বর : বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যরা সংবিধান মোতাবেক শপথ গ্রহণ করেন।

২২ ডিসেম্বর : বঙ্গবন্ধু ঢাকার মিরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে স্মৃতিসৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

২৮ ডিসেম্বর : খুলনায় আওয়ামী লীগ ও শ্রমিক লীগের নেতা অধ্যাপক আবু সুফিয়ানসহ দু'জন আঁততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

**১৯৭৩ সাল**

১ জানুয়ারি : ভিয়েতনাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার ও শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবিতে ছাত্র ইউনিয়ন বিক্ষোভ মিছিল করে। পুলিশ মিছিলে বাধা দান করে। বেধে যায় সংঘর্ষ। ফলে ২ জন ছাত্রনেতা নিহত হন এবং ৬ জন ছাত্র আহত হন।

১১ জানুয়ারি : শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান করে আওয়ামী লীগ ১০ সদস্যবিশিষ্ট পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠন করা করে।

২১ জানুয়ারি : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধাদের একটি সম্মেলন সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত হয়। ওই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

২৫ জানুয়ারি : নির্বাচন কমিশন নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল দলকে দলীয় প্রতীকী বরাদ্দ করে।

৩০ জানুয়ারি : নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা প্রকাশ করে। নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা ৩ কোটি ৫১ লাখ।

৩১ জানুয়ারি : আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন শ্রমিক লীগের আহ্বানে সারা ঢাকা শহরে হরতাল পালিত হয়।

১ ফেব্রুয়ারি : আওয়ামী লীগ তাদের দলের সকল প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে।

২ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশ সরকারের একটি সরকারি আদেশে ১৬টি শিল্প ইউনিট 'সেনাকল্যাণ সংস্থার' নিকট হস্তান্তর করা হয়।

৬ ফেব্রুয়ারি : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ ও ভোলা দুটি আসনসহ মোট আটটি আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। ৩০০ আসনে মোট ১০৯০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

৯ ফেব্রুয়ারি : জাতিসংঘের মহাসচিব ড. কুর্ট ওয়াইল্ড হেইম একদিনের সফরে বাংলাদেশে আসেন। ঢাকার তেজগাঁও বিমানবন্দরে তাঁকে বিপুল সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বাংলাদেশে এই প্রথম জাতিসংঘের কোনো মহাসচিবের সফর।

১৮ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশ এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের (ADB) সদস্যপদ লাভ করে।

২৮ ফেব্রুয়ারি : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পিজি হাসপাতালে অসুস্থ মওলানা ভাসানীকে এনে তাঁর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

৫ মার্চ : অসুস্থ মওলানা ভাসানীকে দেখতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পিজি হাসপাতালে যান। তাঁর চিকিৎসার খোঁজখবর নেন।

৭ মার্চ : নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২৮০ আসনে জয়লাভ করে। আওয়ামী লীগের এই বিপুল বিজয়ে গণতন্ত্রের ভারসাম্য হারিয়ে





ফেলে। বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেতে বাধাগ্রস্ত হয়।

১২ মার্চ : পার্লামেন্টারি দলের নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচিত হন।

১৮ মার্চ : আওয়ামী লীগ 'শপথ দিবস' পালন করে। এ উপলক্ষে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষণ দেন।

২৫ মার্চ : মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার ৫৪৬ জন মুক্তিযোদ্ধাকে জাতীয় খেতাব প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

৭ এপ্রিল : স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংসদের অধিবেশন বসে। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুনরায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। সংসদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন যথাক্রমে মোহাম্মদ উল্লাহ ও মোহাম্মদ বায়তুল্লাহ।

১২ এপ্রিল : বাংলাদেশ সরকারের নতুন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. কামাল হোসেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদি সম্পর্কে মতবিনিময় ও আলোচনা করার জন্য দিল্লির উদ্দেশে যাত্রা করেন।

২১ এপ্রিল : বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও স্বার্থপরিপন্থি কাজের অপরাধের জন্য বাংলাদেশ সরকার ৩৯ জন বাঙালি রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীর বাংলাদেশের নাগরিকত্ব বাতিল ঘোষণা করে।

২৪ এপ্রিল : সরকার ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচার করার কথা ঘোষণা করে। এ যুদ্ধাপরাধীরা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সদস্য।

২ মে : বাংলাদেশকে খাদ্যশস্য দিয়ে সাহায্য করার জন্য বিশ্বের নিকট আহ্বান জানান জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল।

১৫ মে : মওলানা ভাসানী ৩ দফা দাবিতে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন।

১৬ মে : বঙ্গবন্ধু অনশনরত মওলানা ভাসানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

১৭ মে : প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ত্রাণমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরী পদত্যাগ করেন।

২০ মে : সংসদের ৪টি আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দুটি আসনে আওয়ামী লীগ, একটি আসনে জাসদ এবং অন্যটিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচিত হয়।

২২ মে : মওলানা ভাসানী ৭ দিন পর বিরোধী দলীয় নেতাদের অনুরোধে তাঁর অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহার করেন।

২৩ মে : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বশান্তি পরিষদের সর্বোচ্চ সম্মানসূচক 'জুলিওকুরি' পদক প্রদান করেন।

২৯ মে : আওয়ামী লীগ দলীয় এমপি নূরুল হক ফরিদপুরের নড়িয়ায় তাঁর নিজ বাসভবনে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

৬ জুন : কর্নেল জিয়াউর রহমান ও কর্নেল সফিউল্লাহকে ব্রিগেডিয়ারের পদে পদোন্নতি দেয়া হয়।

৮ জুন : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট পেশ করেন ড. কুদরত-ই-খুদা।

১৮ জুন : বাংলাদেশ বিমানের প্রথম ভাড়া করা বোয়িং বিমান লন্ডন যাত্রা করে।

২৮ জুন : বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে বাংলাদেশে প্রথম একটি ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা বিল গৃহীত হয়।

১ জুলাই : বাংলাদেশ বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে।

৫ জুলাই : বাংলাদেশকে বন্যা নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক ব্যাংক ৫ কোটি ৫১ লাখ ডলার সাহায্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

১০ জুলাই : সরকার দীর্ঘদিনের বেতন কাঠামোয় বেতন-বৈষম্য ব্যাপকভাবে সমতা আনয়ন করে। সরকার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ১০টি জাতীয় বেতন স্কেল নির্ধারণ করে বেতন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করে।

১৩ জুলাই : বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে মরক্কো সরকার।

১৬ জুলাই : গঙ্গানদীর পানি বণ্টনের বিষয়ে দিল্লিতে ভারত ও বাংলাদেশের মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক শুরু হয়।

১৭ জুলাই : মৌরিতানিয়া, তিউনিসিয়া, আলজিরিয়া এই তিন দেশের সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

২৬ জুলাই : বঙ্গবন্ধু যুগোস্লাভিয়ায় রাষ্ট্রীয় সফর এবং কানাডার রাজধানী অটোয়ায় কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে ১৮ দিনের জন্য বিদেশযাত্রা করেন।

৩১ জুলাই : ৫ দিনের সফর শেষে যুগোস্লাভিয়া থেকে কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগ দিতে কানাডার রাজধানী অটোয়ায় যান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৩ আগস্ট : বঙ্গবন্ধু ১৮ দিনের সফর শেষে দেশে ফেরেন।

২৩ আগস্ট : আইভরিকোস্টের সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

২৯ আগস্ট : মওলানা ভাসানীর ৩ দফা দাবির পক্ষে জনসমর্থন প্রদর্শনে তাঁর অনুসারীরা সারা ঢাকা শহরে সাধারণ হরতাল পালন করে।

৬ সেপ্টেম্বর : প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য আলজিরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন।





৮ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের সদস্যপদ লাভ করে।

৯ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে স্বাধীন দেশ হিসেবে জায়ারের সরকার।

১০ সেপ্টেম্বর : প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন শেষে দেশে ফিরে আসেন। সম্মেলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন এবং প্রেসিডেন্ট বুমেদিন ও কিউবার প্রেসিডেন্ট ক্যাস্ট্রোর সাথে আলোচনা করেন।

১৫ সেপ্টেম্বর : সিরিয়া ও মিসর সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ বলে স্বীকৃতি দেয়।

১৯ সেপ্টেম্বর : আন্তর্জাতিক রেডক্রসের তত্ত্বাবধানে পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের প্রথম দলটি একটি বিশেষ বিমানে ঢাকায় আসে।

২৪ সেপ্টেম্বর : নাইজারের সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

৩০ সেপ্টেম্বর : গিনি বিসাউয়ের সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

২ অক্টোবর : মন্ত্রিসভায় দু'জন মহিলাসহ চারজন প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ দেয়া হয়।

৬ অক্টোবর : ক্যামেরুন সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

১০ অক্টোবর : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মাত্র ৪ মাসের মাথায় ব্রিগেডিয়ার শফিউল্লাহ ও জিয়াউর রহমানকে মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি দেন।

১৬ অক্টোবর : জর্ডানের সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

১৭ অক্টোবর : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর কন্যা শেখ রেহানা ও পুত্র রাসেলসহ জাপানের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন।

১৯ অক্টোবর : জাপানের প্রধানমন্ত্রী কাকুই তানাকার সাথে বঙ্গবন্ধু দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় মিলিত হন। বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু নির্মাণের জন্য জাপানের সহায়তার আশ্বাস পান।

২৩ অক্টোবর : দাহোমির সরকার স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

২৫ অক্টোবর : সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩৫৫৯৪ জন শিক্ষককে সরকারি কর্মচারী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

৪ নভেম্বর : কুয়েত সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

৫ নভেম্বর : ইয়েমেন সরকার স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে বাংলাদেশকে।

**১৯৭৪ সাল**

১৮ জানুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করেন। পদত্যাগের কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন– যেহেতু তাঁকে জাতির পিতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে সুতরাং তাঁর পক্ষে আওয়ামী লীগ প্রধান থাকা সম্ভব নয়। তিনি শুধু আওয়ামী লীগের নন, তিনি সকলের।

২০ জানুয়ারি : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রস্তাবে বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী এএইচএম কামরুজ্জামানকে আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং জনাব জিল্লুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করা হয়। সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর জনাব কামরুজ্জামান বাণিজ্যমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন।

২৪ জানুয়ারি : বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন মুহম্মদ উল্লাহ। তিনি ঐদিনই রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

২৮ জানুয়ারি : স্পিকার মুহম্মদ উল্লাহ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ায় স্পিকার পদ শূন্য হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মালেক উকিল জাতীয় সংসদের স্পিকার পদে নির্বাচিত হন।

২৯ জানুয়ারি : যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো ৫ দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ঢাকায় আগমন করেন।

৩০ জানুয়ারি : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো এক শীর্ষ বৈঠকে বসেন।

২ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশ-যুগোস্লাভিয়া যুক্ত ইশতেহার ঘোষণা করা হয়। যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো এদিনই ঢাকা ত্যাগ করেন।

৫ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে বিপুল ভোটে এদিন বিশেষ ক্ষমা বিলটি পাস হয়। এ আইনটি পাস হওয়ায় আওয়ামী লীগকে কঠোর সমালোচনায় পড়তে হয়।

১৯ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশ ও ইরাকের মধ্যে প্রথম বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হয়। এদিনই পানিসম্পদ মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

২২ ফেব্রুয়ারি : যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি তারাই আমাদের স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ঐদিন পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। একই দিন তুরস্ক ও ইরানের সরকারদ্বয় বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

২৩ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের লাহোরে ইসলামিক কনফারেন্সে যোগদানের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ





করেন। পাকিস্তানের তিন সামরিক বাহিনীর একটি সুসজ্জিত দল বঙ্গবন্ধুকে 'গার্ড অব অনার' প্রদান করে।

২৫ ফেব্রুয়ারি : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের লাহোর থেকে ঢাকায় ফেরেন। ঐদিনই মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত এক সংক্ষিপ্ত রাষ্ট্রীয় সফরে ঢাকায় আসেন। রাষ্ট্রপতি মুহম্মদ উল্লাহ এবং বঙ্গবন্ধু তেজগাঁও বিমানবন্দরে তাকে সংবর্ধনা দেন।

২৭ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশ সরকার অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রয়োগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

২ মার্চ : সরকারের নির্দেশে ৭৫টি ভুয়া তাঁত কারখানা বাতিল করা হয়।

৬ মার্চ : বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রয়োগে ৯৮১টি ভুয়া সিমেন্ট ও ঢেউটিনের ডিলারশিপ বাতিল করা হয়।

৭ মার্চ : শেরেবাংলা নগরে নতুন সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৮ মার্চ : আলজিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বুমেদিন হুয়ারি স্বল্পকালীন সফরে ঢাকায় আগমন করেন। সেদিনই তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

১১ মার্চ : বাংলাদেশের প্রথম মিলিটারি একাডেমি কুমিল্লা সেনানিবাসে উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এ সময় কুমিল্লা সেনানিবাসের জিওসি ছিলেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান।

১৩ মার্চ : হঠাৎ করে বঙ্গবন্ধু অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর শ্বাসনালি দিয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল।

১৯ মার্চ : চিকিৎসকদের পরামর্শে বঙ্গবন্ধু চিকিৎসার জন্য মস্কোর উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন।

৫ এপ্রিল : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের এক গ্রুপ অপর গ্রুপের অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে ৭ জন ছাত্রলীগ কর্মী নিহত হয়। নিহত সকলেই সূর্যসেন হলের আবাসিক ছাত্র ছিল।

৭ এপ্রিল : ৭ ছাত্রলীগ কর্মী হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ছাত্রলীগ সম্পাদক শফিউল আলম প্রধানকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

৯ এপ্রিল : পাকিস্তান-ভারত-বাংলাদেশ ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর হয় দিল্লিতে। ঐদিন ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধী ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের কথা ঘোষণা করেন।

১১ এপ্রিল : ২১ দিন চিকিৎসার পর মস্কো থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় ফিরে আসেন।

১৩ এপ্রিল : বঙ্গবন্ধু তাঁর মন্ত্রিপরিষদ এবং তাঁর দলের নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন।

১৪ এপ্রিল : মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাপ (ভাসানী), জাতীয় লীগ, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ, বাংলাদেশ গণমুক্তি ইউনিয়ন, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট

পার্টি (লেনিনবাদী), শ্রমিক-কৃষক সাম্যবাদী দলের সমন্বয়ে একটি 'যুক্তফ্রন্ট' নামে ৬ দলীয় ঐক্যজোট গঠনের ঘোষণা দেয়া হয়।

২৩ এপ্রিল : মওলানা ভাসানী পল্টন ময়দানে এক জনসভাতে বঙ্গবন্ধু সরকারকে উৎখাত করার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেন।

২৫ এপ্রিল : বার্মার প্রেসিডেন্ট নে উইন বাংলাদেশে এক রাষ্ট্রীয় সফরে আসেন।

৪ মে : দেশের খাদ্যদ্রব্য দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্য, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় আলোচনা হয়।

১২ মে : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ অন্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে ৫ দিনের সফরে দিল্লি যাত্রা করেন।

১৩ মে : নয়াদিল্লিতে ইন্দিরা গান্ধী ও শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিক বৈঠকে বসেন।

১৪ মে : বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কয়েকটি আনুষ্ঠানিক বৈঠকের পর ভারত ও বাংলাদেশ একটি যুক্ত ঘোষণায় স্বাক্ষর করে।

১৬ মে : বঙ্গবন্ধু তাঁর সফরসঙ্গীদের নিয়ে ৫ দিনের সফর শেষে দিল্লি থেকে দেশে ফিরে আসেন।

২৫ মে : মহিলা প্রতিমন্ত্রী বদরুন্নেসা আহমেদ লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন।

৩১ মে : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মা সায়েরা খাতুন মৃত্যুবরণ করেন।

৩ জুন : জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হয়। ঐদিনই ৩টি শোক প্রস্তাব ও ৯টি বিল পেশ করা হয়।

৬ জুন : বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রদানের প্রশ্নে স্বস্তি পরিষদের দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

১০ জুন : এদিন নিরাপত্তা পরিষদের একটি বৈঠকে বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রদানের জন্য সর্বসম্মত সুপারিশ গৃহীত হয়।

১১ জুন : চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সভাপতি এমএ হান্নান মর্মান্তিক এক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন। এমএ হান্নান প্রথম বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র পাঠ করেন।

১৫ জুন : ভারতের রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরি ৫ দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ঢাকায় আসেন।

২৭ জুন : পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো ৩ দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ঢাকায় আসেন। স্বাধীন বাংলাদেশে এটাই ভুট্টোর প্রথম সফর।

২৯ জুন : জুলফিকার আলী ভুট্টো সফর শেষে বাংলাদেশ ত্যাগ করেন।

১ জুলাই : বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও সমাজকল্যাণমন্ত্রী আলহাজ জহুর আহমেদ চৌধুরী মৃত্যুবরণ করেন।

৭ জুলাই : ছয়জন মন্ত্রী ও তিনজন প্রতিমন্ত্রীকে অপসারণ করে মন্ত্রিপরিষদের পুনর্বিন্যাস করা হয়।





৮ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বন্যা প্লাবিত এলাকা হেলিকপ্টারে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করেন।

১৭ জুলাই : বন্যা পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে। দেশের বিভিন্ন নদ-নদীর পানি বিপদসীমায় অতিক্রম করে।

৩০ জুলাই : দেশের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে ঢাকাস্থ বিভিন্ন বিদেশি মিশনগুলো গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে।

৩১ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় গণভবনে ত্রাণকেন্দ্র খোলা হয়।

১ আগস্ট : বন্যা পরিস্থিতির অবনতির কারণে রাজধানী ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রাম এবং সিলেটের সড়ক ও ট্রেন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়।

২ আগস্ট : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য সেনাবাহিনীকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন।

৩ আগস্ট : বন্যাদুর্গত এলাকায় ত্রাণসামগ্রী পৌঁছানোর লক্ষ্যে সেনা, নৌ এবং বিমানবাহিনীকে নিয়োগ করে সরকার।

৬ আগস্ট : সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করে মেঘনা নদীর পানি বিপদসীমার ৫ ফুট উপর দিয়ে বয়ে যাওয়ার খবর পাওয়া যায়।

১১ আগস্ট : উত্তরাঞ্চলের সাথে রাজধানী ঢাকার সড়ক ও ট্রেন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

১৮ আগস্ট : প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান জাতির উদ্দেশ্যে রেডিও ও টেলিভিশনে ভাষণ প্রদান করে জনগণকে সাহসের সঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে বলেন।

৭ সেপ্টেম্বর : রংপুর জেলার চিলমারী মহকুমার বন্যাদুর্গত এলাকাগুলো হেলিকপ্টারযোগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরিদর্শন করেন।

১৬ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশের বন্যার্তদের সাহায্যে ১০ লাখ ডলার অনুদান প্রদানের কথা ঘোষণা করে আলজিরিয়ার সরকার।

১৭ সেপ্টেম্বর : জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ বাংলাদেশের সদস্যপদ অনুমোদন করে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্যপদ লাভ করে।

২৩ সেপ্টেম্বর : জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিউইয়র্কের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন।

২৫ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশ জাতিসংঘ সদস্যপদ পাওয়ার পর প্রথম বাংলাদেশি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান ভাষণ দেন। সবচেয়ে বড় ব্যাপার বঙ্গবন্ধুই প্রথম ব্যক্তি যিনি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ দেন। ফলে বাংলাভাষা ও বাঙালি জাতির মর্যাদা বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

২৯ সেপ্টেম্বর : জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল কুর্ট ওয়াইল্ড হেইমের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান সাক্ষাৎ করেন।

১ অক্টোবর : মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ডের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ভবন হোয়াইট হাউসে বঙ্গবন্ধু সাক্ষাতে মিলিত হন।

৩ অক্টোবর : বঙ্গবন্ধু যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরার পথে ৪ দিনের সফরে তিনি ইরাকের বাগদাদে পৌঁছান।

৬ অক্টোবর : ইরাকের প্রেসিডেন্ট বকরের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু আলোচনায় বসেন। সে দিনই বাংলাদেশ ও ইরাকের মধ্যে দুটি পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

৭ অক্টোবর : ১০ দিনের যুক্তরাষ্ট্র ও ইরাক সফর শেষ করে বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

৮ অক্টোবর : খাদ্য ও কৃষিবিষয়ক সংস্থা (FAO) খাদ্য সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশকে সহায়তা করার জন্য যথাসাধ্য খাদ্যশস্য প্রদানের আশ্বাস দেন।

২৬ অক্টোবর : বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ মন্ত্রিপরিষদ থেকে ইস্তফা দেন।

২৯ অক্টোবর : যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী ড. হেনরি কিসিঞ্জার দুদিনের সফরে বাংলাদেশে আসেন।

৩০ অক্টোবর : মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে গণভবনে দীর্ঘ ২ ঘণ্টা আলাপ-আলোচনা করেন।

৪ নভেম্বর : যমুনা সেতু নির্মাণের স্থান নির্ধারণ এবং নির্মাণের ব্যাপারে জাপানি বিশেষজ্ঞ ও বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয়।

৫ নভেম্বর : প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ৯ দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে মিসর ও কুয়েতের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন।

১০ নভেম্বর : মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত ও বঙ্গবন্ধুর মধ্যে কায়রোতে অনুষ্ঠিত হয় শীর্ষ আলাপ-আলোচনা বৈঠক। সেদিনই তিনি কায়রো থেকে কুয়েত চলে যান।

১১ নভেম্বর : কুয়েতের আমির এবং বঙ্গবন্ধুর মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

১৪ নভেম্বর : ৯ দিনের সফর শেষ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন।

১৭ নভেম্বর : মওলানা ভাসানীর (ন্যাপ) দল থেকে একটি অংশ বের হয়ে নতুন দল ইউনাইটেড পিপলস্ পার্টি (ইউপিপি) গঠন করে।

২৬ নভেম্বর : পূর্ব জার্মানির প্রধানমন্ত্রী হোর্স্ট জিন্ডারম্যান ৪ দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে বাংলাদেশে আসেন।





৩ ডিসেম্বর : ঢাকা-দুবাই বিমান সার্ভিস চালু করা হয়। এদিন মালয়েশিয়ার রাজা টুংকু আব্দুল হালিম এবং রানী বারমায় সুবী ৪ দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ঢাকায় আসেন।

৯ ডিসেম্বর : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক বিশেষ সমাবর্তনে দেশের ৮ জন বরেণ্য ব্যক্তিকে অনারারি ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে।

১৫ ডিসেম্বর : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির উদ্দেশে রেডিও-টেলিভিশনে ভাষণ দেন। তিনি খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানান।

১৮ ডিসেম্বর : তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আবুধাবির উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন।

২০ ডিসেম্বর : বঙ্গবন্ধু তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফর শেষ করে ঢাকায় ফিরে আসেন।

**১৯৭৫ সাল**

৩ জানুয়ারি : বাংলাদেশ সরকার মজুদদার, কালোবাজারিদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য বিশেষ ক্ষমতাবিধি ১৯৭৫ ঘোষণা করে।

৫ জানুয়ারি : একদিনে ঢাকায় ৬টি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

১০ জানুয়ারি : ভোলা জেলার জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব মোতাহার উদ্দিন কতিপয় আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

২৫ জানুয়ারি : বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে শাসনতন্ত্রের চতুর্থ সংশোধনীতে একদলীয় শাসন ও রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার কায়েমের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ বিল পাসের পর কয়েকজন মন্ত্রী এবং সংসদ সদস্য নিজ পদে ইস্তফা দেন।

২ ফেব্রুয়ারি : যশোরের প্রাক্তন এমসিএ জনাব মোশাররফ হোসেন আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

৪ ফেব্রুয়ারি : সংসদ সদস্য মঈনুদ্দিনকে আততায়ীরা হত্যা করে।

১৮ ফব্রুয়ারি : বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠক বসে। বৈঠকে সকল মন্ত্রীকে সম্পদের হিসাব রাষ্ট্রপতির নিকট দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।

২৩ ফেব্রুয়ারি : নেত্রকোনার আওয়ামী লীগ এমপি আবদুল খালেককে গুলি করে হত্যা করা হয়।

২৬ ফেব্রুয়ারি : দুষ্কৃতকারীরা আলীজান জুট মিলকে অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করে।

৮ মার্চ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মওলানা ভাসানী কাগমারীতে এক বিরাট জনসভায় ভাষণ দেন।

২৬ মার্চ : সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ভাষণ দেন।

৩০ মার্চ : বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফর রহমান টুঙ্গিপাড়ায় তাঁর গ্রামের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর।

১৬ এপ্রিল : বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে মন্ত্রী পর্যায়ে ফারাক্কা বাঁধ প্রশ্নে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

১৮ এপ্রিল : গঙ্গা নদীতে ফারাক্কা বাঁধ চালু করার ব্যাপারে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে একটি অন্তবর্তীকালীন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

২৫ এপ্রিল : কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদানের জন্য জ্যামাইকার কিংস্টনের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১ মে : ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু দেখা করেন।

৩ মে : বঙ্গবন্ধু কমনওয়েলথ সম্মেলনে ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি পাকিস্তানকে বাংলাদেশের সম্পদ হস্তান্তরের আবেদন জানান।

১৯ মে : বাংলাদেশ ও গণচীনের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপিত হয় সরাসরি বাণিজ্য চুক্তি।

২০ মে : বাংলাদেশ এবং ডবিব্লউএফপির মধ্যে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

২৭ মে : সরকার ভেড়ামারায় ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে।

৫ জুন : বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে ১৫ কোটি ডলার ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

১৬ জুন : বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৫ সালের নিউজ পেপার অধ্যাদেশের অধীনে মাত্র চারটি দৈনিক পত্রিকা ও ১২২টি সাময়িকী প্রকাশিত হবে বলে জানানো হয়। বাকি সকল পত্রপত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল করা হয়। দৈনিক পত্রিকাগুলো হলো– দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক বাংলা, অবজারভার ও টাইমস।

১৯ জুন : রাষ্ট্রপতি ৬০টি জেলা ঘোষণা করেন। জানানো হয়, প্রত্যেক জেলায় একজন করে গভর্নর নিয়োগ করা হবে।

২২ জুন : বঙ্গবন্ধু সরকার ৬০ জেলার প্রশাসনিক কাঠামো ঘোষণা করে।

২৭ জুন : ঢাকা ও কাবুলের মধ্যে বিমান চলাচল চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

২৮ জুন : বাংলাদেশ সরকার একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড গঠন করে।

৪ জুলাই : সরকার দেশে ৩৩টি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী সরকারি সরবরাহ ও নিয়ন্ত্রণ আদেশ বহির্ভূত ঘোষণা করে।

৭ জুলাই : জাতীয় সংসদে জেলা প্রশাসন পুনর্গঠন সংক্রান্ত বিল পেশ করা হয়।

৯ জুলাই : জাতীয় সংসদ বাংলাদেশ জেলা পুনর্গঠন বিল অনুমোদন করে।





১৫ জুলাই : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামালের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা ক্রীড়াবিদ সুলতানার বিয়ে হয়।

১৬ জুলাই : সরকার রাষ্ট্রপতির আদেশে বাংলাদেশের ৬১ জেলার জন্য গভর্নর নিয়োগ করে তাদের নাম প্রকাশ করে।

১৮ জুলাই : বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় পুত্র শেখ জামালের সঙ্গে এটিএম সৈয়দ হোসেন সাহেবের তৃতীয় কন্যা পারভীন রোজীর বিয়ে হয়।

২১ জুলাই : বাংলাদেশের নবনিযুক্ত গভর্নরদের জন্য ২১ দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

২৩ জুলাই : জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রথম স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত হন কেএম কায়সার।

২৬ জুলাই : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বঙ্গবন্ধুকে ডক্টরেট অব ল'ডিগ্রি প্রদানের যে প্রস্তাব দেওয়া হয়, তা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হয়ে এ ডিগ্রি গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

৪ আগস্ট : রাষ্ট্রপতি ও বাকশালের চেয়ারম্যান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের ৬১টি জেলার বাকশালের সাধারণ সম্পাদক ও যুগ্ম সম্পাদকদের নাম ঘোষণা করা হয়।

৫ আগস্ট : বাংলাদেশের অন্যতম কবি, অসংখ্য গানের রচয়িতা সিকান্দার আবু জাফর মৃত্যুবরণ করেন।

৮ আগস্ট : বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিপরিষদে বন্দর, জাহাজ ও নৌপরিবহন মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হন।

১৫ আগস্ট : ইতিহাসের কলঙ্কময় দিন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবারের (শেখ হাসিনা ও শেখ রেহেনা ব্যতীত) সকলকে হত্যা করা হয়। বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহেনা তখন জার্মানিতে ছিলেন। তাই তারা বেঁচে যান। ঐদিনই সারা দেশে সামরিক শাসন জারি করে খন্দকার মোশতাক নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন। সেদিনই পাকিস্তান এই হত্যাযজ্ঞকে সমর্থন করে মোশতাককে স্বীকৃতি দেয়।

# বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (১৯৪৯-১৯৯৯)

১৯৪৯ : জুন ২৩ আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক (টাঙ্গাইল) এবং যুগ্ম সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান, খন্দকার মোশতাক আহমেদ ও একে রফিকুল হোসেন (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) ১৯৫৫ সালের ২৪ অক্টোবর ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে আওয়ামী 'মুসলিম' লীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ নাম গ্রহণ।

১৯৫০ : ইস্ট বেঙ্গল স্টেট একুইজিশন অ্যান্ড টেনান্সি অ্যাক্টের অধীনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলুপ্ত।

১৯৫০ : মূলনীতি কমিটির (Basic Principles Committee) রিপোর্ট উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের স্থলে কেন্দ্রের হাতে অধিক ক্ষমতাদানের সুপারিশ।

১৯৫০ : ঢাকায় গ্র্যান্ড ন্যাশনাল কনভেনশনে উর্দু ও বাংলাভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা এবং পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিনামাসহ বিকল্প মূলনীতি প্রস্তাব গ্রহণ।

১৯৫১ : মার্চ পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মাহমুদ আলী, সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ।

১৯৫২ : জানুয়ারি ২৬ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি ভঙ্গ করে পল্টন ময়দানের জনসভায় খাজা নাজিমুদ্দিনের ঘোষণা-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু।

১৯৫২ : জানুয়ারি ৩০ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ গঠন। আহ্বায়ক, কাজী গোলাম মাহবুব।

১৯৫২ : ফেব্রুয়ারি ২১ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ কর্তৃক বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে প্রদেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান। সরকার কর্তৃক ১৪৪ ধারা জারি। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিল। মিছিলে পুলিশের বেপরোয়া গুলি চালানো। পুলিশের গুলিতে শহীদ হন আবদুল জব্বার, আবদুল বরকত, রফিক, সফিউর রহমান, ওয়াজিউল্লাহ।

**১৯৫২ : এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা।**

**১৯৫৩ : জানুয়ারি গণতন্ত্রী দলের প্রতিষ্ঠা। সভাপতি কাজী মোহাম্মদ দানেশ। মাহমুদ আলী সাধারণ সম্পাদক।**

**১৯৫৩ : শেরেবাংলা ফজলুল হক কর্তৃক কৃষক শ্রমিক পার্টি প্রতিষ্ঠা।**

**১৯৫৪ : মার্চ পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন। এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ২১ দফা কর্মসূচি নিয়ে হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর**





**নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্টের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরাট বিজয়। ৩০৯টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগের মাত্র ৯টি আসন লাভ।**

১৯৫৪ : এপ্রিল একে ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন।

১৯৫৪ : মে ৩০ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল এবং '৯২-ক ধারা জারি। মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা পূর্ববাংলার গভর্নর নিযুক্ত।

১৯৫৪ : অক্টোবর ২৫ গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ কর্তৃক পাকিস্তান গণপরিষদ বাতিল ঘোষণা।

১৯৫৪ : পাকিস্তানের বাগদাদ প্যাক্ট (পরবর্তী সেন্টো)-এ যোগদান।

১৯৫৫ : জুন ৯ আবু হোসেন মন্ত্রিসভা গঠন।

১৯৫৫ : জুলাই ১০ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের মধ্যে ৫ দফা শর্তযুক্ত মারী চুক্তি সম্পাদিত।

১৯৫৫ : পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশকে একীভূত করে এক ইউনিট গঠন।

১৯৫৫ : পাকিস্তানের সিয়াটো সামরিক জোটে যোগদান।

১৯৫৬ : মার্চ পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র প্রণীত। পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত হয় এবং এক ধরনের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাধীন পার্লামেন্টারি সরকার পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। বাংলাভাষা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

১৯৫৬ : আগস্ট জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যুক্ত নির্বাচন (Joint Electorates) ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে আওয়ামী লীগের আহ্বান।

১৯৫৬-৫৭: কেন্দ্রে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে ১৯৫৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ রিপাবলিকান কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন। মন্ত্রিসভায় প্রথমবারের মতো পাকিস্তানের উভয় অংশ থেকে সমসংখ্যক সদস্য নেওয়া হয়। কিন্তু পশ্চিমা কায়েমি স্বার্থান্বেষী মহলের ষড়যন্ত্রের কারণে এক বছরের অধিককাল মন্ত্রিসভা ক্ষমতাসীন থাকতে সক্ষম হয়নি।

১৯৫৬ : সেপ্টেম্বর আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ সরকার গঠন।

১৯৫৬ : অক্টোবর পাকিস্তানের জাতীয় সংসদের যুক্ত নির্বাচন আইন পাস।

১৯৫৬ : ডিসেম্বর সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ছাত্রদের উদ্দেশে সোহরাওয়ার্দীর বক্তৃতায় পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি বিশেষ করে পশ্চিমা সামরিক জোটে যোগদানের সপক্ষে যুক্তি প্রদান।

১৯৫৭ : ফেব্রুয়ারি ৬-১০ আওয়ামী লীগের কাগমারী (টাঙ্গাইল) সম্মেলন অনুষ্ঠিত। এই সম্মেলনে বৈদেশিক নীতির প্রশ্নে দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়ে। স্বাধীন ও জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির সমর্থক এবং প্রগতিশীল হিসেবে পরিচিত অংশ মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়। একই বছর ২৫ জুলাই এরা ঢাকার

রূপমহল সিনেমাহলে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ পার্টি (ন্যাপ) গঠন করে।

১৯৫৮ : অক্টোবর ৭ মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা কর্তৃক ক্ষমতা দখল ও সামরিক আইন জারি।

১৯৫৮ : অক্টোবর ২৭ জেনারেল আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল। ইস্কান্দার মির্জা বিতাড়িত।

১৯৫৯ : আগস্ট ৬ জেনারেল আইয়ুব খান কর্তৃক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অযোগ্যতা সম্পর্কিত আদেশ এবডো (Elective Bodies Disqualification Order) ঘোষণা। এর অধীনে সোহরাওয়ার্দীর ৭৮ জন রাজনৈতিক নেতা ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত অযোগ্য ঘোষিত হন।

১৯৫৯ : অক্টোবর ২৬ জেনারেল আইয়ুব খান কর্তৃক মৌলিক গণতন্ত্রে অধ্যাদেশ ঘোষণা। এর অধীনে চার স্তরবিশিষ্ট একটি কাঠামো প্রবর্তন এবং ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত নির্বাচন (দেশের প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় সংসদসহ) পরোক্ষ পদ্ধতিতে একটি বিশেষ নির্বাচনীমণ্ডলী (Electoral college) কর্তৃক সম্পন্নের ব্যবস্থা।

১৯৬১ : ইউনিভার্সিটি অর্ডিন্যান্স জারি। এর অধীনে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন হরণ করে সরকারি নিয়ন্ত্রণে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৯৬১ : রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী।

১৯৬২ : জানুয়ারি ৩১ পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গ্রেফতার।

১৯৬২ : জুন পাকিস্তানের দ্বিতীয় শাসনতন্ত্র প্রণীত যা আইয়ুব সংবিধান নামে খ্যাত। এর দ্বারা প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থাধীনে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনসহ সামরিক-বেসামরিক আমলা কর্তৃক প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ক্ষমতা কাঠামোর সকল স্তরে বাঙালির অংশগ্রহণ উপেক্ষিত হয়।

১৯৬২ : জুন ২৪ 'আইয়ুব সংবিধান' প্রত্যাখ্যান করে একটি নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবিতে ৯ নেতার বিবৃতি। এরা হচ্ছেন শেখ মুজিবুর রহমান, হামিদুল হক চৌধুরী, আবু হোসেন সরকার, নূরুল আমিন, আতাউর রহমান খান, মাহমুদ আলী, ইউসুফ আলী চৌধুরী, (মোহন মিয়া), সৈয়দ আজিজুল হক, পীর মোহসেন উদ্দিন আহমেদ (দুদু মিয়া)।

১৯৬২ : জুলাই ১৫ রাজনৈতিক দল গঠন ও সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলবিধি আইন পাস।

১৯৬২ : সেপ্টেম্বর ১৭ হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালিত। পুলিশের গুলিতে একজনের মৃত্যু, অনেককে গ্রেফতার।





১৯৬২ : সেপ্টেম্বর ২৫ আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম এবং মুসলিম লীগের একটি অংশের সমন্বয়ে লাহোরে আইয়ুববিরোধী মোর্চা ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এনডিএফ) গঠিত।

১৯৬২ : অক্টোবর ২৬ পাকিস্তানের গভর্নর পদে মোনায়েম খানের নিযুক্তি।

১৯৬৩ : সেপ্টেম্বর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স জারি। এর অধীনে সরকার যে কোনো প্রকাশনা বন্ধ বা বাতিল ঘোষণার ক্ষমতা লাভ করে। এই আইন প্রয়োগ করে ১৯৬৬ সালের জুন মাসে ইত্তেফাক পত্রিকার প্রকাশনা নিষিদ্ধ এবং এর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

১৯৬৩ : ডিসেম্বর ৫ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু।

১৯৬৪ : জানুয়ারি ঢাকায় হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন। দাঙ্গা প্রতিরোধে আমীর হোসেন চৌধুরী শহীদ হন।

১৯৬৪ : মার্চ সার্বজনীন ভোটাধিকার আদায়ের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের নেতাদের দাবি।

১৯৬৪ : আইয়ুব সরকারের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় ছাত্র সংগঠন ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফেডারেশন (এনএসএফ) প্রতিষ্ঠা।

১৯৬৪ : জুলাই ২১ আওয়ামী লীগ পার্টি, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম ও জামিয়াতে ইসলামী এই পাঁচটি দল নিয়ে সম্মিলিত বিরোধী দল (কপ) গঠিত। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে 'কপের' মনোনয়নে আইয়ুবের বিরুদ্ধে ফাতেমা জিন্নাহর নির্বাচনী প্রতিযোগিতা।

১৯৬৫ : জানুয়ারি ২ একটি নির্বাচনীমণ্ডলীর মাধ্যমে পরোক্ষ পদ্ধতিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠান। মিস ফাতেমা জিন্নাহকে পরাজিত করে আইয়ুব খান নির্বাচিত।

১৯৬৫ : সেপ্টেম্বর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। এ সময় 'পূর্ব' পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার ভার পশ্চিম পাকিস্তানের 'ওপর' 'তত্ত্বের' অসারত্ব প্রমাণিত হয়।

১৯৬৬ : ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি পেশ।

১৯৬৬ : জুন ৭ রাজবন্দিদের মুক্তি ও পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আওয়ামী লীগ আহূত হরতাল পালিত। ৬ দফা এ আন্দোলনে মনু মিয়াসহ বেশকিছু শ্রমিক নিহত।

১৯৬৬ : সরকার কর্তৃক রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রচার হ্রাস কিংবা বর্জনের সিদ্ধান্ত। এর প্রতিবাদে কুদরত-ই-খোদা, কাজী মোতাহার হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, জয়নুল আবেদীনসহ বেশ কয়েকজন শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি দান।

১৯৬৬-৬৮: আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে মস্কো ও পিকিং কেন্দ্রিক বিভক্তি এবং পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও আন্দোলন প্রশ্নে মতপার্থক্য থেকে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এ সময়ে দ্বি-ধারায় আনুষ্ঠানিকভাবে বিভক্ত হয়ে

পড়ে। এক অংশের নেতৃত্বে থাকেন মওলানা ভাসানী (পিকিংপন্থি) এবং অন্য অংশের নেতৃত্ব দেন ওয়ালী খান ও অধ্যাপক মোজাফফর আহম্মদ (মস্কোপন্থি)।

১৯৬৭ : মে কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, কৃষক শ্রমিক পার্টি এনডিএফ ও আওয়ামী লীগের একটি অংশ নিয়ে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (পিডিএম) গঠিত।

১৯৬৮ : আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। এতে ৩৩ বাঙালি আমলা সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য ও রাজনীতিকের বিরুদ্ধে ভারতের সহযোগিতায় পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগ এনে তাদের গ্রেফতার করা হয়। এদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান, লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, আহমেদ ফজলুল রহমান সিএসপি, রুহুল কুদ্দুস সিএসপি, সার্জেন্ট জহুরুল হক অন্যতম। এদের বিচার অনুষ্ঠান সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালিদের মধ্যে পাকিস্তানবিরোধী এক অভূতপূর্ব জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফূরণ ঘটে।

১৯৬৮ : জুন 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনে শেখ মুজিবুর রহমানের জবানবন্দি : পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবি দাবাইয়া রাখার জন্য এই ষড়যন্ত্র মামলা।

১৯৬৮ : ডিসেম্বর ডাকসুর সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমেদ-এর নেতৃত্বে ১১ দফা কর্মসূচিভিত্তিক আইয়ুব শাসনবিরোধী ছাত্র মোর্চা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত।

১৯৬৯ : জানুয়ারি ৮ পাকিস্তানে পূর্ণাঙ্গ গণতন্ত্র ও জনগণের পূর্ণ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইয়ুব শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র করার অঙ্গিকার নিয়ে আওয়ামী লীগসহ ৮টি রাজনৈতিক দলের ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি (ডাক) গঠন।

১৯৬৯ : জানুয়ারি ২০ পুলিশের গুলিতে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান (আসাদ) শহীদ হন।

১৯৬৯ : ২৪ জানুয়ারি গণঅভ্যুত্থান দিবস। মতিউর, রুস্তম শহীদ।

১৯৬৯ : ফেব্রুয়ারি ১৫, বন্দি অবস্থায় ঢাকার ক্যান্টনমেন্ট 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হক শহীদ হন।

১৯৬৯ : ফেব্রুয়ারি ১৮ ইপিআরের গুলিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা শহীদ হন।

১৯৬৯ : ফেব্রুয়ারি ২২ দেশব্যাপী প্রচণ্ড আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানের মুখে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব কর্তৃক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার। শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল অভিযুক্তের মুক্তি লাভ। পল্টন ময়দানের জনসভায় মতিয়া চৌধুরীকে বাংলার অগ্নিকন্যা আখ্যা দেয়া হয়।

১৯৬৯ : ফেব্রুয়ারি ১৩ 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' থেকে মুক্তি লাভের পর সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে রেসকোর্স ময়দানে দেওয়া গণসংবর্ধনা সভায় শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধি প্রদান।





১৯৬৯ : মার্চ ২৫ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপক আন্দোলনের মুখে প্রধান সেনাপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের পদত্যাগ।

১৯৬৯ : নভেম্বর ২৮ গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর, এক ব্যক্তি এক ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচন অধিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জাতির উদ্দেশে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ভাষণ।

১৯৭০ : ফেব্রুয়ারি ২২ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেননগ্রুপ) কর্তৃক পল্টনের জনসভা থেকে স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ববাংলা প্রতিষ্ঠার ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা।

১৯৭০ : মার্চ 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার দুই নম্বর আসামি লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের নেতৃত্বে লাহোরে প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটি গঠিত। এক দফা পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি।

১৯৭০ : মার্চ ৩০ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক দেশের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে আইনগত কাঠামো আদেশ (এলএফও) জারি।

১৯৭০ : অক্টোবর ২৮ রেডিও টেলিভিশনে জনগণের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্বাচনী ভাষণ।

১৯৭০ : নভেম্বর ১২ এক প্রলয়ঙ্করি ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলীয় অঞ্চলে কয়েক লাখ মানুষের মৃত্যু। এই দুর্যোগ মোকাবেলায় কেন্দ্রীয় সরকারের ঔদাসীন্য বাঙালি জনমনে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি করে।

১৯৭০ : ডিসেম্বর ৭ ও ১৭ যথাক্রমে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। পশ্চিম পাকিস্তানের জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। নির্বাচনের পরপর ইয়াহিয়া খান কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী আখ্যাদান।

১৯৭০ : ডিসেম্বর ২০ পাকিস্তান পিপলস পার্টি জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের আসনে বসেন না বলে লাহোরে ভুট্টোর ঘোষণা।

১৯৭১ : মার্চ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে অফিস-আদালত ও প্রশাসন পরিচালিত হয়।

১৯৭১ : জানুয়ারি ৩ রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগ দলীয় নবনির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের শপথ গ্রহণ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন দলীয় প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৭১ : মার্চ ১ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা। প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ৩ মার্চ ধর্মঘট পালনের আহ্বান।

১৯৭১ : মার্চ ২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যারয়ের কলাভবন চত্বরে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে ডাকসু'র সহ-সভাপতি আসম আবদুর রব কর্তৃক স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন।

১৯৭১ : মার্চ ৩ ছাত্রলীগ আয়োজিত পল্টনের জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপস্থিতিতে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ কর্তৃক স্বাধীন বাংলাদেশের ইশতেহার পাঠ। ইশতেহার রচনা করেন স্বপন চৌধুরী, পতাকা তোলেন, আসম আবদুর রব এবং সভাপতিত্ব করেন নূরে আলম সিদ্দিকী।

১৯৭১ : মার্চ ৩-২৫ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন।

১৯৭১ : মার্চ ৭ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

১৯৭১ : মার্চ ৭ ছাত্রলীগের উদ্যোগে স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গঠিত।

১৯৭১ : মার্চ ১৬-২৩ ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনা ব্যর্থ।

১৯৭১ : মার্চ ২৩ 'পাকিস্তান দিবসে' পাকিস্তানের জাতীয় পতাকার পরিবর্তে পূর্ব পাকিস্তানের অফিস-আদালতসহ সর্বত্র স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড্ডয়ন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক ২৫ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আবার অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা।

১৯৭১ : মার্চ ২৫ মধ্য রাতের কিছু আগে ঢাকায় নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীর বর্বর গণহত্যা, আক্রমণ, নির্বিচারে গুলি, হত্যা, অগ্নিসংযোগ এসবের বিরুদ্ধে বাঙালিদের জাতীয় প্রতিরোধ সংগ্রামের সূচনা।

১৯৭১ : মার্চ ২৬ ও ২৫ মার্চের মধ্যরাতের কিছু পরে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চট্টগ্রাম থেকে আঃ হান্নান কর্তৃক ২৬ মার্চ প্রচারিত হয়। এর পরপর আবুল কাশেম সন্দ্বীপ কর্তৃক ওই স্বাধীনতা পুনঃপ্রচার। এরপর শহীদুল ইসলাম কর্তৃক ওই স্বাধীনতা ঘোষণা আবার পুনঃপ্রচার।

১৯৭১ : ২৭ মার্চ মেজর জিয়া (জিয়াউর রহমান) কর্তৃক একই বেতার কেন্দ্র থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের নামে স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠ।

১৯৭১ : ১০ এপ্রিল আগরতলায় নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে স্বাধীন বাংলা প্রবাসী সরকার গঠন।

১৯৭১ : ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়ার বৈদ্যনাথতলায় স্বাধীন বাংলা প্রবাসী সরকারের শপথ গ্রহণ। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ। কুচকাওয়াজে সালাম গ্রহণ করেন মাহবুব উদ্দিন আহমদ এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী ও সার্বিক ব্যবস্থাপনায় তৌফিক এলাহী চৌধুরী।

১৯৭১ : ১৬ ডিসেম্বর সৈন্যদের আত্মসমর্পণ ও স্বাধীন বাংলাদেশ মুক্ত।





১৯৭২-৭৪ :

১. গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র বাঙালি, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে ১ বছরের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন।
২. ধ্বংসপ্রাপ্ত ২৫৪টি ব্রিজসহ, রাস্তাঘাট ও কালভার্ট নির্মাণ। ধ্বংসপ্রাপ্ত রেলওয়ে ও বিমান চালু।
৩. বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মোতাবেক ভারতীয় সৈন্যের বাংলাদেশ ত্যাগ।
৪. জাতিসংঘের সদস্যপদসহ বহুদেশের স্বীকৃতি আদায়।
৫. বঙ্গবন্ধুর জুলিওকুরী শান্তি পুরস্কার লাভ।
৬. বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সদস্যপদ লাভ।
৭. মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট তহবিল গঠন।
৮. সবুজ বিপ্লবের ডাক।
৯. পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ।
১০. জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর প্রথম বাংলায় ভাষণ দান।
১১. জাপান সফরকালে যমুনা নদীর উপর ব্রিজ নির্মাণের প্রস্তাব।

১৯৭৫ : বঙ্গবন্ধু যখন তিল তিল করে তার কাঙ্ক্ষিত সোনার বাংলাকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তার এই অভাবনীয় সাফল্যে স্বাধীনতাবিরোধী পরাজিত শক্তি ভীত ও সন্ত্রস্ত্র হয়ে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতের অন্ধকারে কাপুরুষের মতো পৈশাচিক উন্মাদনায় সপরিবারে জাতির জনককে নির্মমভাবে হত্যা করে। শুধু তাই নয়; বঙ্গবন্ধুর নিকট আত্মীয়সহ স্বাধীনতাযুদ্ধে নেতৃত্ব দানকারী জাতীয় চার নেতাকে ওই হিংস্র হায়েনারা বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে।

১৯৮১ : ১৭ মে বঙ্গবন্ধু তনয়া বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কান্ডারি জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তন এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ।

১৯৮২-৮৫:নিরবিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা নেতাকর্মীদের নিয়ে দলকে পুনর্গঠন এবং বিভিন্ন জাতীয় কর্মসূচি পালন।

১৯৮৬ : জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং শক্তিশালী বিরোধী দল হিসেবে সংসদে আত্মপ্রকাশ।

১৯৮৭-৮৯ : গণতন্ত্রের পূর্ণ উদ্ধারের জন্য আন্দোলন। নূর হোসেনসহ বিভিন্ন নেতাকর্মীর আত্মহুতি।

১৯৯০ : জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে পুরো দেশজুড়ে স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন এবং স্বৈরাচারের পতন। সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন।

১৯৯১ : জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং জাতীয় সংসদের প্রধান বিরোধী দল হিসেবে জননেত্রী শেখ হাসিনার মুখ্য ভূমিকা পালন।

১৯৯২-৯৫: স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করার প্রতিবাদে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সর্বস্তরের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন।

১৯৯৬ : ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রহসনমূলক নির্বাচনের তীব্র নিন্দা ও সর্বস্তরের জনগণকে নিয়ে নব্য স্বৈরাচারিণী বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে সোচ্চার গণআন্দোলন ও গণজাগরণে খালেদা জিয়ার পতন। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে জনতার মঞ্চ স্থাপন।

১৯৯৬ সালের ১২ জুন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সাধারণ মানুষের ভোট-ভাত ও নাগরিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং বিজয়।

১৯৯৬ : সাধারণ মানুষের ভোট, ভাত এবং নাগরিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং অভাবনীয় সাফল্য। '৯৬ সালের ২৩ জুন জনগণের আশীর্বাদপুষ্ট জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথের মাধ্যমে সরকার গঠন।

১৯৯৬-৯৯: ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক প্রচেষ্টায় ঐতিহাসিক গঙ্গার পানিচুক্তির বাস্তবায়ন ঘটে। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর সংবিধানের আওতায় রাষ্ট্রীয় ও অখণ্ডভাবে প্রতিপূর্ণ ও অবিচল আস্থা রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদন।

বয়োজ্যেষ্ঠদের বয়স্কভাতা, গৃহহীনদের গৃহায়ণ তহবিল গঠন ও বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংক স্থাপন করে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম গ্রহণ।

মুক্তিযুদ্ধের অম্লান স্মৃতিকে নবপ্রজন্মের সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে 'শিখা চিরন্তনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন'।

১৯৯৮ : শতাব্দীর ভয়াবহতম বন্যাকে দৃঢ়তার মাধ্যমে মোকাবেলা।

বাংলাদেশের একক বৃহত্তম স্থাপনা বিশ্বের ১১ দীর্ঘতম সেতু ঐতিহাসিক বঙ্গবন্ধু সেতু ১৯৯৮ সালের ২৩ জুন শুভ উদ্বোধন।

মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ইউনেস্কো কর্তৃক শান্তি পুরস্কার লাভ।

সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারতের শান্তি নিকেতন কর্তৃক ডিগ্রি লাভ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদাত্ত আহ্বানে বহু সন্ত্রাসী স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য আত্মসমর্পণ।

ঢাকা-কলকাতা সরাসরি বাস যোগাযোগ।



# দশম অধ্যায়

## বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অসামান্য অবদান

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সেসময়কার প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর রয়েছে অসামান্য অবদান। তিনি শুধু এক কোটি বাংলাদেশিকে আশ্রয় ও খাওয়া-পরার ব্যবস্থাই করেননি, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করেন। আর বাংলাদেশের জন্য আন্তর্জাতিক বিশ্বের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা চালিয়েছেন। এমনকি মার্কিন রক্তচক্ষুর বিপরীতে এক অনন্য অবস্থানও নেন তিনি।

বাংলাদেশকে সহযোগিতার জন্য ভারতের বিরুদ্ধেও পাকিস্তান যুদ্ধ ঘোষণা করলে সেখানেও এক হয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধের নির্দেশ দেন। বাংলাদেশের লাখ লাখ শরণার্থীকে সেবাযত্ন করায় ইন্দিরা গান্ধীর এ কাজকে যীশু খ্রিস্টের কাজের সঙ্গে তুলনা করেছেন নোবেলজয়ী মাদার তেরেসা। 'তারা সবাই ঈশ্বরের সন্তান' শীর্ষক একটি বইয়ে তেরেসা এ বিষয়টি উল্লেখ করেন।

মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রাখা ইন্দিরা গান্ধীকে বাংলাদেশ সম্মাননা জানাচ্ছে স্বাধীনতার ৪০ বছর পর। সোমবার বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সম্মনানা 'স্বাধীনতার সম্মাননা' জানানো হবে তাকে। রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে সম্মাননা নেবেন তার পুত্রবধূ সোনিয়া গান্ধী। সোমবার বিকেল পাঁচটায় বঙ্গভবনে এক অনুষ্ঠানে এ সম্মাননা দেয়া হবে।

২৫ মার্চ ১৯৭১। ঢাকাসহ পুরো বাংলাদেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। রাতের অন্ধকারে নিরীহ, নিরস্ত্র বাঙালির ওপর অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র নিয়ে পাক হানাদার বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং হাজার হাজার নারী, পুরুষ, ছাত্র, শিক্ষক, চিকিৎসক ও সাংবাদিকদের নির্বিচারে হত্যা করে। বিভীষিকাময় এ অবস্থা থেকে বাঁচতে লাখ লাখ নারী-পুরুষ বাধ্য হয়ে পাশের দেশ ভারতে আশ্রয় নেয়।

ভারতের সেসময়কার প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ৯৮ লাখ ৯৯ হাজার ৩০৫ জন উদ্বাস্তুকে আশ্রয় দেন। তাদের থাকা-খাওয়া ও চিকিৎসাসহ অন্যান্য সাহায্য করেন। পরম মমতায় সেদিন ইন্দিরা গান্ধী শরণার্থীদের পাশে দাঁড়ান ও আশ্রিতদের সহায়তার জন্য ভারতবাসীকে অনুরোধ করেন।

শুধু উদ্বাস্তু বা শরণার্থীদের আশ্রয়ই নয়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রতিবেশী হিসেবে প্রতিবাদী অথচ নিরস্ত্র বাঙালিকে সাহস জোগান তিনি। ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক, যুবকদের গেরিলা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় ভারতে। এর ফলেই অনেকটা ঘুরে দাঁড়ানো সহজ হয় বাংলাদেশিদের। মুক্তিযোদ্ধারা ভারত থেকে প্রশিক্ষণ পেয়ে সশস্ত্র অবস্থায় বাংলাদেশে প্রবেশ করে একের পর এক গেরিলা যুদ্ধে পরাস্ত করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে।

মুক্তিযুদ্ধ চলার সময়েই, ১৯৭১ সালের ১৩ এপ্রিল বিশ্বনেতাদের উদ্দেশে ইন্দিরা গান্ধী বলেন, "পূর্ব বাংলায় যা ঘটেছে, তাতে ভারত সরকার নীরব থাকবে না।" পরে ১৭ মে তিনি পশ্চিমবঙ্গ আসেন। কারণ সেখানেই সবচেয়ে বেশি শরণার্থী আশ্রয় নেয়। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারকে এই বলে আশ্বস্ত করেন যে, শরণার্থী বিষয়ে কেন্দ্র তাদের পাশে আছে ও থাকবে।

এর আগেই ৩০ এপ্রিল '৭১ ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করতে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে দায়িত্ব দেন। ৯ মে তাদের হাতে দেয়া হয় হয় মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতে আগ্রহী বাংলাদেশের তরুণদের সশস্ত্র ট্রেনিং দেয়ার দায়িত্ব।

এছাড়াও শাসক পাকিস্তানিদের বাংলাদেশে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন আদায়ে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী সেসময় বিভিন্ন দেশ সফরও করেন। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ সহানুভূতি ও সমর্থন আদায়েও সক্ষম হয়।

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জন্য একটি ট্রান্সমিটার বরাদ্দ করেন ইন্দিরা গান্ধী।

১৯৭১ সালের মাঝামাঝি সময়ে হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে বিশ্বশান্তি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিরা বাংলাদেশ বিষয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।

সেখানে এক বিশেষ বার্তা পাঠিয়ে ইন্দিরা গান্ধী বলেন, "পূর্ববঙ্গের ঘটনায় ভারতের পক্ষে উদাসীন থাকা কঠিন এবং ইতিমধ্যে ২০ লাখ শারণার্থী ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। এসব উদ্বাস্তু যাতে সম্মানের সঙ্গে দেশে ফিরতে পারে সেজন্য পাকিস্তানকে বাধ্য করতে হবে।"

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার বঙ্গবন্ধুর মুক্তি এবং সামরিক সাহায্য বন্ধের বিষয়ে অক্ষমতা জানালে ইন্দিরা গান্ধী তাকে বলেন, "ভারতের পক্ষে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সাহয়তা বাড়ানো ছাড়া গত্যন্তর নেই।"

১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর কলকাতায় এক জনসভায় ইন্দিরা গান্ধী ভাষণ দেয়ার সময় পাকিস্তানি বাহিনী ভারতের বিভিন্ন বিমান ঘাঁটিতেও আক্রমণ করে। তিনি সেদনিই তার মন্ত্রিসভার ভাষণে বলেন, "আমি এ মুহূর্তে আমাদের দেশের এবং জনগণের গুরুতর বিপদের কথা উল্লেখ করে আপনাদের উদ্দেশ্যে বলছি, কয়েক ঘণ্টা আগে পাকিস্তান আমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করেছে। পাকিস্তানি বাহিনী হঠাৎ করে আমাদের এয়ার ফিল্ড, অমৃতসার, পাঠান কোর্ট, শ্রীনগর, অবন্তীপুর, উতরলেট এবং আগ্রায় আঘাত হেনেছে। এতদিন ধরে বাংলাদেশে যে যুদ্ধ চলে আসছিল, তা ভারতের বিরুদ্ধে পরিণত হয়েছে।"

এর পরপরই ভারত ও বাংলাদেশ বাহিনী মিলিতভাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং পাকবাহিনী বিভিন্ন রণাঙ্গনে পরাজিত হতে থাকে। মুক্তিযুদ্ধের বিজয়কে ত্বরান্বিত করতে ৬ ডিসেম্বর ইন্দিরা সরকার বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় অনেক সৈন্যও শহীদ হয়।



# একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বিদেশিদের অবদান

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বাংলার মানুষের গর্ব। লাখ লাখ মা বোন ভাই দের জীবন আর সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি প্রাণের স্বাধীনতা। বাংলার বীর সেনানিদের গৌরবগাঁথা বাংলার ইতিহাস তো বটেই প্রতিটি মানুষের হৃদয়েও সমুজ্জ্বল। বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বাঙালিদের পাশাপাশি কিছু মানুষ ছিলেন যারা এই দেশের না হয়েও মানবতার টানে এই গৌরবময় জয়ে রেখে গেছেন অসামান্য অবদান। আজ এই বিদেশিদের কির্তিগাথা নিয়ে কিছু কথা।

**ডবিৱউ এ এস ওডারল্যান্ড :** ডবিৱউ এ এস ওডারল্যান্ড (জন্ম : ৬ ডিসেম্বর ১৯১৭; মৃত্যু : ১৮ মে, ২০০১) একজন অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক। তিনি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ সমরে বীরোচিত অংশগ্রহণের জন্য বীরপ্রতীক সম্মান লাভ করেন। তিনি খেতাবপ্রাপ্ত একমাত্র বিদেশি মুক্তিযোদ্ধা। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাত্রে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানিদের গণহত্যার অভিযান শুরু করে। অবিলম্বে বাঙালিরাও প্রতিরোধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাঙালিদের এই প্রতিরোধ সংগ্রামে 'ওডারল্যান্ড' সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং এমনকি পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধেও অংশ নেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত একমাত্র বিদেশি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন তিনি। বাংলাদেশের প্রতি অপরিমেয় ভালোবাসার জন্য বাঙালি জাতির কাছে তিনি বিশেষভাবে সম্মানিত ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার গুলশানের একটি রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ ও অসামান্য নৈপুণ্যতার কারণে পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে বীর প্রতীক সম্মাননায় ভূষিত করেন। ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে কাজ করে অবসর নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় ফেরত যান বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা ডবিৱউ এ এস ওডারল্যান্ড, বীর প্রতীক। একমাত্র বিদেশি হিসেবে তাঁকে বাংলাদেশ সরকার এই খেতাবে ভূষিত করেছে। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত অত্যন্ত গর্ব ভরে ও শ্রদ্ধার্ঘ্য চিত্তে নামের সঙ্গে বীর প্রতীক খেতাবটি লিখেছিলেন তিনি। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায় পার্থের এক হাসপাতালে ২০০১ সালের ১৮ মে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

**এডওয়ার্ড কেনেডি :** ১৯৭১ এ বাংলাদেশ যখন স্বাধীনতার জন্য লড়ছে, তখন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতায় রিপাবলিকান পার্টি। আর তাদের সমর্থন ছিল পাকিস্তানের দিকে। এর মধ্যেই বাংলাদেশের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন সিনেটর এডওয়ার্ড।

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের শরণার্থীদের দুঃখ-দুর্দশা বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে এনেছিলেন এডওয়ার্ড কেনেডি। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশের শরণার্থীদের দুর্দশা নিজের চোখে দেখে এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে মর্মস্পর্শী একটি প্রতিবেদনও জমা দিয়েছিলেন তিনি।

'বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ও এ দেশের মানুষের প্রতি মমতা ও ভালোবাসা এভাবেই প্রকাশ করে গেছেন তিনি। এটা ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে।'

**অ্যান্থনি মাসকারেনহাস :** অ্যান্থনি মাসকারেনহাস (১৯২৮-ডিসেম্বর ৬, ১৯৮৬) জন্মসূত্রে ভারতীয় গোয়ানিজ খ্রিস্টান এবং বসবাস সূত্রে পাকিস্তানি। তিনি বাংলাদেশের

মুক্তিযুদ্ধের সময় কিছুকাল এদেশে সাংবাদিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন এবং এ বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। করাচি থেকে প্রকাশিত দ্য মর্নিং নিউজ-এর প্রধান সংবাদদাতা এবং পরবর্তীতে সহ-সম্পাদক পদে কর্মরত ছিলেন ১৯৬১ থেকে ১৯৭১ সালের মে মাস পর্যন্ত। একাত্তর সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশে এসে গণহত্যার তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। এরপর বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে লন্ডনের সানডে টাইম্‌স পত্রিকায় গণহত্যার তথ্যাদি প্রকাশ করেন। এজন্য তিনি স্বয়ং ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন। পত্রিকাটির ১৯৭১ সালের জুন ১৩ সংখ্যায় এ সকল তথ্যাদি প্রকাশিত হয়। এতে বিশ্ব বিবেক অনেকাংশেই জাগ্রত হয় এবং বিশ্ববাসী বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে জানতে পারে। তিনি উপমহাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলি অন্তরঙ্গ আলোকে প্রত্যক্ষ করে সংবাদিকসুলভ ভঙ্গিতে তা বর্ণনা করেছেন। তার লেখা বই হচ্ছে "দ্য রেইপ অব বাংলাদেশ" এবং "বাংলাদেশের রক্তের ঋণ"।

তার দ্য রেইপ অফ বাংলাদেশ গ্রন্থটি ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়। বইটির সেই প্রাথমিক সংস্করণে শেষ পঙক্তিতে তিনি মুক্তিযুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে আশা প্রকাশ করে বলেছিলেন :

আমরা সবেমাত্র একটি নতুন অন্ধকারের রাজ্যে প্রবেশ করেছি। অন্ধকারময় সুড়ঙ্গপথের শেষ প্রান্তে যেখানে আলোর রাজ্য শুরু, সেখানে পৌঁছতে আমাদের দীর্ঘ সময় লাগবে।

**সায়মন ড্রিং :** সাইমন ড্রিং (জন্ম : ১১ জানুয়ারি, ১৯৪৫) একজন আন্তর্জাতিক পুরস্কার বিজয়ী বৈদেশিক সংবাদদাতা, টেলিভিশন উপস্থাপক এবং প্রতিবেদন নির্মাতা। তিনি বিশ্বখ্যাত সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের বৈদেশিক প্রতিনিধি হিসেবে বিশ্বের অনেক জায়গা ভ্রমণ করে তরতাজা ও গুরুত্বপূর্ণ খবর পরিবেশনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন। এছাড়াও তিনি লন্ডনভিত্তিক দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ, বিবিসি টেলিভিশন এবং রেডিও সংবাদ ও চলতি ঘটনা তুলে ধরার লক্ষ্যে অনবরত কাজ করছেন। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর জঘন্য ও নৃশংসতার বিবরণ দৈনিকে তুলে ধরে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ভিয়েতনাম যুদ্ধ এবং বাংলাদেশের গণহত্যার ওপর প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন তাঁকে বিশ্বজোড়া খ্যাতি ও সুনাম এনে দেয়। সায়মন ড্রিং বাংলাদেশের গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী প্রথম বিদেশি সাংবাদিক যিনি নিজের জীবন বিপন্ন করে সরেজমিন প্রতিবেদন তৈরি করে সারা বিশ্বকে জানিয়ে দেন পাকিস্তানি বাহিনীর লোমহর্ষক নির্যাতন ও গণহত্যার কথা।

উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় ভরা ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাতে সাইমন ড্রিং হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে (পরবর্তীতে হোটেল শেরাটন, বর্তমানে হোটেল রূপসী বাংলা) লুকিয়ে ছিলেন। তৎকালীন পাকিস্তানে সামরিক আইনের তোয়াক্কা না করে ২৭ মার্চ তিনি মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহ করে ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় প্রতিবেদন আকারে প্রেরণ করেন যা ট্যাংকস ক্র্যাশ রিভোল্ট ইন পাকিস্তান শিরোনামে ৩০ মার্চ প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জনমত সৃষ্টিতে তাঁর এ প্রতিবেদনটি বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে সাড়া জাগিয়েছিল। উক্ত প্রতিবেদনে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে,





আল্লাহর নামে আর অখণ্ড পাকিস্তান রক্ষার অজুহাতে ঢাকা আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত ও সন্ত্রস্ত এক নগর। পাকিস্তানি সৈন্যদের ঠাণ্ডা মাথায় টানা ২৪ ঘণ্টা গোলাবর্ষণের পর এ নগরের...।

১৯৭১ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তাঁকে জোরপূর্বক দেশ থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। ইংল্যান্ডে ফিরে গিয়ে পুনরায় নভেম্বর, ১৯৭১ সালে কলকাতায় আসেন তিনি। সেখান থেকে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের যাবতীয় খবরাখবর নিরপেক্ষভাবে ঐ দৈনিকে প্রেরণ করতেন। ১৬ ডিসেম্বর তারিখে বিজয়ের দিনে যৌথবাহিনীর সাথে তিনিও ঢাকায় এসেছিলেন।

**সিডনি শ্যানবার্গ :** সিডনি শ্যানবার্গ ছিলেন দি নিউইয়র্ক টাইমস এর একজন সাংবাদিক। তিনি ১৯৩৪ সালের ১৭ই জানুয়ারী আমেরিকার ক্লিনটন মাসাচুয়েটসে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি দি নিউইয়র্ক টাইমসে যোগ দেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের হত্যাকাণ্ড তিনি খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেন। সে সময় তিনি ছিলেন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে। হোটেলের জানালা দিয়ে তিনি দেখেন ইতিহাসের এক ভয়ানক হত্যাকাণ্ড। তিনি যুদ্ধকালীন মুক্তিযুদ্ধের ওপর অসংখ্য খণ্ড খণ্ড প্রতিবেদন পাঠান যার অধিকাংশ ছিল শরণার্থী বিষয়ক। তার প্রতিবেদনে পুরো বিশ্ব জানতে পারে পাক বাহিনীর নির্মম হত্যাযজ্ঞ এবং ভারতে অবস্থিত শরণার্থী দের অবস্থা। তার অসংখ্য প্রতিবেদনের একটি নির্বাচিত সংকলন প্রকাশ করেছে ঢাকার সাহিত্য প্রকাশ। সংকলনটির নাম ডেটলাইন বাংলাদেশ-নাইন্টিন সেভেন্টিন ওয়ান। অনুবাদ ও সংকলন করেছেন মফিদুল হক।

**জে এফ আর জ্যাকব :** আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদান রাখা বিদেশি বন্ধুদের মধ্যে ভারতের লে. জেনারেল (অব.) জে এফ আর জ্যাকব হচ্ছেন বাংলাদেশের অনেক বড় একজন বন্ধু। স্বাধীনতা যুদ্ধে তার অসামান্য অবদানের জন্যে আমাদের বিজয় হয়েছিল ত্বরান্বিত। একাত্তরে তিনি ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের চিফ অব স্টাফ, তখন তার পদমর্যাদা ছিল মেজর জেনারেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে রেখেছিলেন অসামান্য অবদান। মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবদান ছিল অনস্বীকার্য। আর এক্ষেত্রে জেনারেল জ্যাকবের বিশাল ভূমিকা ছিল। সীমান্ত এলাকায় মুক্তিবাহিনীদের জন্য ক্যাম্প স্থাপন, মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পগুলোর পুনর্গঠন, তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া, অস্ত্র-রসদ জোগান দেয়াসহ মুক্তিবাহিনীর সাথে যৌথ অভিযানে এসে বাংলাদেশকে কাঙ্ক্ষিত জয়ে অসামান্য অবদান রাখে ভারতীয় বাহিনী। সর্বোপরি তার ভাষ্য থেকে জানা যায়, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ জেনারেল নিয়াজীকে লজ্জাজনক এবং নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছিলেন তিনি।

**রবি শংকর-জর্জ হ্যারিসন-কনসার্ট ফর বাংলাদেশ :** দি কনসার্ট ফর বাংলাদেশ হলো ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেন প্রাঙ্গণে দ্য বিটল্‌স ব্যান্ডের জর্জ হ্যারিসন ও ভারতীয় সেতার বাদক পণ্ডিত রবি শংকর কর্তৃক আয়োজিত দুটি দাতব্য সঙ্গীতানুষ্ঠান। এই সঙ্গীতানুষ্ঠান দুটি আয়োজিত হয় ১ আগস্ট ১৯৭১ সালে। এই অনুষ্ঠানে বিশ্ববিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পীদের এক বিশাল দল অংশ নিয়েছিলেন, যাঁদের মধ্যে বব ডিলান,

এরিক ক্ল্যাপটন, জর্জ হ্যারিসন, বিলি প্রিস্টন, লিয়ন রাসেল, ব্যাড ফিঙ্গার এবং রিঙ্গো রকস্টার ছিলেন উল্লেখযোগ্য।

এই কনসার্টের মাধ্যমে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) বাংলাভাষী জনগণের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদারদের সীমাহীন অত্যাচার-নিপীড়নের কথা জানতে পারে সারা বিশ্ব! এই কনসার্টের হাত ধরে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের পক্ষে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ দাঁড়িয়ে যায় বাংলাদেশের নিপীড়িত মানুষের পক্ষে! এ কনসার্টের মাধ্যমে পৃথিবীর মানবতাবাদী মানুষরা সোচ্চার হয়ে ওঠেন স্বাধীনচেতা বাঙালির স্বাধীনতার পক্ষে। এই কনসার্টের কারণে বিশ্বের সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও দুর্বল হতে থাকে চেঙ্গিসীয় পাকিস্তানিরা।

এই অনুষ্ঠানের গানের একটি সংকলন কিছুদিন পরেই ১৯৭১ সালে বের হয় এবং ১৯৭২ সালে এই অনুষ্ঠানের চলচ্চিত্রও বের হয়। গত ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে উক্ত চলচ্চিত্রটিকে একটি তথ্যচিত্রসহ নতুনভাবে ডিভিডি আকারে তৈরি করা হয়।

কনসার্ট ও অন্যান্য অনুষঙ্গ হতে প্রাপ্ত অর্থ সাহায্যের পরিমাণ ছিল প্রায় ২,৪৩,৪১৮.৫১ মার্কিন ডলার, যা ইউনিসেফের মাধ্যমে শরণার্থীদের সাহায্যার্থে ব্যয়িত হয়।

কমপক্ষে পঁচিশ হাজার মার্কিন ডলার সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ শুরু করলেও সেই কনসার্ট থেকে অবিশ্বাস্যভাবে প্রায় দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার মার্কিন ডলার তহবিল সংগৃহীত হয়। এই কনসার্টের সার্বিক তত্ত্বাবধানে থাকা ইউনিসেফ অর্জিত অর্থ বাংলাদেশি শরণার্থীদের জন্য ব্যয় করে।

**আন্দ্রে মালরো :** ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এই মালরো একাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য ফ্রান্সে সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। তার বক্তৃতা-বিবৃতি আর সাংস্কৃতিক আন্দোলন আন্তর্জাতিক প্রেরণা হয়ে উজ্জীবিত করেছিল সে সময় আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের। ফ্রান্স সরকারের উদ্দেশে তার করা আকুতি : 'আমাকে একটি যুদ্ধবিমান দাও, আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য জীবনের শেষ লড়াইটা করতে চাই।'



## *সহায়ক গ্রন্থ*


আসাদ চৌধুরী, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ;* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, দ্বিতীয় সংস্করণ

এইচ টি ইমাম, *বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১;* আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৪

এম আর আখতার মুকুল, *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা;* আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৮

এন্থনী মাসকারেনহাস, *দ্যা রেপ অব বাংলাদেশ* (অনুবাদ : রণাত্রি); পরমা, ঢাকা, ১৯৮৫

এ এ কে নিয়াজী (লে. জে.), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়াজীর জবানবন্দী;* কারেন্ট বুকস, ঢাকা,১৯৭৯

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহায়ক সমিতি (সম্পাদনা যতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়), *বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* (তৃতীয় সংস্কারণ); মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৭

কবীর চৌধুরী, *মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলদেশ,* লেখালেখি, ঢাকা, ২০১১

কে এম মোহসীন, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতহাস : পর্যালোচনা;* ইতিহাস সমিতি, ঢাকা, ১৯৯১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণালয় (দলিলপত্র), *বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধ;* মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৭

কবীর চৌধুরী, *মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলদেশ,* লেখালেখি, ঢাকা, ২০১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণালয় (দলিলপত্র), *বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধ;* প্রথম খণ্ড, পটভূমি (১৯০৫-১৯৫৮)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণালয় (দলিলপত্র), *বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধ;* দ্বিতীয় খণ্ড, (১৯৫৮-১৯৭১)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণালয় (দলিলপত্র), *বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধ;* চতুর্থ খণ্ড, মুজিবনগর, প্রকাসী বাঙালিদের তৎপরতা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণালয় (দলিলপত্র), *বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধ;* পঞ্চম খণ্ড, মুজিবনগর, প্রকাসী বাঙালিদের তৎপরতা

ছদরুদ্দীন, মুক্তিযুদ্ধ : *বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে;* ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮১

তাজউদ্দিন আহমদ, *সার্বভৌম গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্র;* বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, লন্ডন প্রচারিত ১৯৭১

তালুকদার মনিরুজ্জামান (অনুবাদ মোহাম্মদ সাহেব আলী এ কে এম কুতুব উদ্দিন), *বামপন্থি রাজনীতি ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়;* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮

দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান যুদ্ধ ১৯৭১ কলিকাতা

বদরুদ্দীন উমর, *একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক ভূমিকা;* জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬

[illegible]শনী ঢাকা

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী (সম্পাদনা), *বাংলাদেশের [illegible]*তীয় পর্ব,বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, সেনাসদর শিক্ষা পরিদপ্তরের পক্ষে এশিয়া পাবলিকে[illegible]াকা, ২০০৮

মঈদুল হাসান, *মূলধারা' ৭১*; ইউপিএল, ঢাকা ১৯৮৫

মুসদা ভাট্টি, *বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ব্রিটিশ দলিলপত্র;* জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৩

রেহমান সোবহান, *বাংলাদেশের অভ্যুদয় : একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য;* ভোরের কাগজ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪

রফিকুল ইসলাম (অধ্যাপক), *স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*; ঐতিহ্য, ঢাকা ২০০৪

রফিকুল ইসলাম, বীর উত্তম (মেজর), *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে;* অনন্যা (৫ম সংস্করণ), ঢাকা, ১৯৮১

রফিকুল ইসলাম, বীর উত্তম (মেজর পিএসসি), *একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে;* ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৮৩

শাহরিয়ার কবীর, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা;* মম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬

শক্তি চট্টোপাধ্যায়, *সাংবাদিকের চোখে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ;* বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৮৭১

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা;* জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা ২০০৯

সৈয়দ আলী আহসান, *যখন সময় এলো;* নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৯২

সিদ্দিক সালিক, *নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল* (অনুবাদ মাসুদুল হক); নভেল পাবলিকেশন, ঢাকা ১৯৮৮

সালাহ্উদ্দিন আহ্মদ, *বাঙালির সাধনা ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ;* সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা ১৯৯২

শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী;* ইউপিএল (৪র্থ মুদ্রণ), ঢাকা, ২০১৪